ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১-১৩৫২

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র সূচী

পৌষ—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

শিবং

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানা বিভিন্নমুখী শক্তি, নানা গতি উদ্দামভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, অথচ পারছে না—এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করেছে তারা সবাই এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা আছে যা অলঙ্ঘ্য। সমস্ত জড় অচেতন শক্তিকে কে যেন চালিয়ে নিয়ে চলেছেন এক সুনির্দ্দিষ্ট পথে। এমনি সুনিয়ন্ত্রিত এই পথ, এমনি অবধারিত এই গতি, যে অঙ্ক ক'রে আমরা গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান বিশেষকে আগে থেকেই জেনে নিতে পারি। মানুষের মন অনুভব করেছে, এসব নিয়ম আপনা থেকেই হচ্ছে না, একজন আছেন যিনি নিয়ম দিয়ে এই ভূর্ভুবঃস্বঃ বিশ্বলোককে বিধৃত ক'রে রেখেছেন সূত্রে মণিগণা ইব,—সূত্রে যেমন মণি সকল বিধৃত থাকে। সমস্ত বাধা সেই একের মধ্যে এসে অবাধ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত উদ্দাম গতিবেগ তাঁরি অন্তরে প্রবেশ ক'রে ছন্দোবদ্ধ নৃত্যের তালে বেরিয়ে আসছে, উন্মত্ত শক্তির সকল চঞ্চলতাকে তিনি নিয়মানুগ ক'রে দিচ্ছেন। ধ্যানের চক্ষে তাঁর এই রূপটিকে, এই প্রকাশটিকে আমাদের ঋষিরা দেখেছেন, বলেছেন 'শান্তং'। তাঁরা বলেছেন, শান্তির মানে এ নয় যে থেমে যাওয়া, এ নয় যে রোধ করা, এ নয় যে পলায়ন করা। তাঁরা যে প্রশস্তি মন্ত্রে বলতেন ওঁ শান্তিঃ,—তার মানে হ'ল, সব কিছুকে এড়িয়ে গিয়ে যে শান্তি, সে শান্তি নয়, সব কিছুকে ত্যাগ ক'রে যে মৃত্যুর শান্তি, নিস্পন্দ জড়ের শান্তি,—সে শান্তিও নয়। সব কিছুকে বহন ক'রে, মিলিয়ে নিয়ে, মিলে গিয়ে, যে সামঞ্জস্যের শান্তি,—এ সেই শান্তি। আমাদের পিতামহরা ঈশ্বরের এই শান্তরূপকে উপলব্ধি ক'রেছিলেন বলেই মানুষকে তাঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন সুখে বিগতস্পৃহ হ'য়ে, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনাঃ হ'য়ে, রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত হ'য়ে চিত্তে এই শান্তি অর্জনের সাধনা করতে। তাঁরা বলেছিলেন, তোমরা ঈশ্বরের পুত্র, তাঁরই সন্তান, তিনিই তোমাদের পরম সম্পৎ, তিনিই তোমাদের চরম গতি। তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে হলে তাঁরই মতন হ'তে হবে। তোমরা প্রশান্ত হও।

তখন মন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, কেন তিনি শান্তং? সমস্ত বিরুদ্ধগামী শক্তিকে সংহত ক'রে, সমস্ত বিক্ষোভ, সমস্ত চাঞ্চল্যকে সুসমাহিত ক'রে, সমস্ত আলোড়ন, সমস্ত অসংযমকে ছন্দোবদ্ধ গতিপথে সঞ্চালিত ক'রে, এই যে তিনি বসে আছেন মহাযোগীর মতো ধ্যানমৌন শান্ত হ'য়ে, এ কেন? এর কি প্রয়োজন? এই যে বলা হল মানুষকে তাঁরই সুরে সুর মিলিয়ে সর্বপ্রথম শান্ত হতে হবে, অচলপ্রতিষ্ঠ হতে হবে,—এ কেন? এর কি প্রয়োজন?—এর একটিমাত্র উত্তর, মঙ্গলের প্রয়োজন। শান্ত না হলে মঙ্গল নেই, যিনি অশান্ত, তিনি কেমন ক'রে মঙ্গল বিধান করবেন? যে-মানুষ ভেঙে পড়ে, যার ধৈর্য্য নেই,

ধৈর্য্য নেই,—তার দ্বারা কোন্ কাজ হবে জগতে? মানুষ যদি কামনা-বাসনায় ছুটোছুটি ক'রে মরে, দুঃখে শোকে খান্ খান্ হ'য়ে যায়, তবে কে করবে জগতের দুঃখমোচন, কে আনবে কল্যাণ, কেমন ক'রে আসবে মঙ্গল? উপনিষদের ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন, ব্রহ্মের শান্তি এই নিখিল বিশ্বের মঙ্গলকে বহন ক'রে আনছে, তাঁর শান্তির উৎসমুখ হ'তে মঙ্গলের ঝরণা পড়ছে ঝরে। তিনিই সব কিছুকে তাঁর শান্তি দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, তাঁরি ধ্যানমৌন শান্তি হ'তে বিদধাতি কামান্ সর্বান—সকলের কাম্যবিধান করছেন, সকলকে সেই পথে পরিচালিত করছেন যে-পথে তাঁর মঙ্গল ধারা প্রবাহিত। তাই উপনিষদের মন্ত্রে তিনি শান্তং, তিনি শিবং। তিনি শান্তং এবং সেই জন্যেই তিনি শিবং। শান্তি আছে তাই তো মঙ্গল আছে।

ভেবে দেখ, যদি এই শান্তি না থাকত, যদি তাঁর এই নিয়ম না থাকত, তাহলে সব গতি, সব শক্তি নিয়মবিহীনতার উন্মত্তপথে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, এই অপরূপ বিশ্বসংসার এক নিমেষে প্রাণহীন, গতিহীন, ছন্দোহীন মৃত মৃৎপিণ্ডে তালপাকিয়ে যেত। আমরা চিরাচরিত আরামের জীবনযাত্রাপথে একবার ভেবেও দেখি না, শুধু আমাদের নয়, এ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসন্ন ধ্বংস হ'ত। কে তাদের মুহুর্মুহুঃ ত্রাণ করছে, কে তাদের ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে দিচ্ছে, কে নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে সযত্নে মায়ের মতো তাদের বুকে ধরে রেখেছে!

যেমন ধরো বৈদ্যুতিক শক্তি, আগ্নেয় শক্তি। বৈদ্যুতিক শক্তিকে, অগ্নির শক্তিকে মানুষ মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত করেছে, কিন্তু তার আগে সে শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে, তবেই তার দ্বারা মঙ্গল সম্ভব হয়েছে। তারে বাঁধা সুনিয়ন্ত্রিত সংযমের পথে চালিত ক'রে যখন বিদ্যুতের শক্তির সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে শান্ত ক'রে আনা হয়, তখনি সে মানুষের কল্যাণ, মানুষের মঙ্গল আনয়ন করতে পারে, তার আগে নয়। সেই জন্যই শান্তং শিবং।

গীতা বলেছেন, এই শান্তিকে পেতে হবে জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞানযোগ মানুষকে জানায় তার আত্মার তত্ত্ব, তার আত্মার সঙ্গে তার সম্বন্ধ, এ দুইয়ের বন্ধন-রজ্জু,—যাকে বলি অহঙ্কার,—তার সম্বন্ধে। যিনি জ্ঞানী তিনি শান্তি লাভ করেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ আর শান্তিলাভই যদি মানুষের চরম উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে অনেক কিছুই যে বাদ পড়ে যেত। কি হবে জ্ঞানী হ'য়ে? কি হবে শান্ত হ'য়ে? জ্ঞান যে শুধু জানায়, জ্ঞান তো তাঁকে পাওয়ায় না। লক্ষ্যভেদ করবার আগে দৃঢ়বলে ধনুর জ্যা এবং তীরকে শান্তভাবে ধরে রাখতে হবে,—কিন্তু সেইখানেই যদি শেষ হ'ত তাহলে লক্ষ্যভেদ করাটাই যে বাদ পড়ে যেত।

তাই জ্ঞান আর শান্তি এ হ'ল প্রাথমিক, এ হ'ল সহায়। কিসের সহায়?—মঙ্গলের। কি তার লক্ষ্য?—মুক্তি। তবে কি মঙ্গলেই মুক্তি? গীতা বললেন, হ্যাঁ। কর্মের দ্বারাই কর্মের বন্ধনক্ষয়, আর কিছুতে নয়। এ তো হেঁয়ালী নয়, এ যে কত বড় সত্য তা আমরা অনেক সময় জেনেও জানি না। বৈদ্যুতিক শক্তির উদাহরণটা আর একবার নেওয়া যাক। তার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে সব কিছু জানা শেষ হলেই কি সার্থকতা এল? না। সে-শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত সংযতপথে চালনা করে দিলেই কি সার্থকতা এল? না, তাও নয়। তাকে দিয়ে কল্যাণ সাধন করিয়ে নিলেই ধীরে ধীরে সে শক্তি মুক্তি পাবে,—সে-শক্তি তার কাজের মধ্যদিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে চলে গেল, আর তার কোনো বন্ধন রইল না, কর্মের দ্বারাই তার কর্মবন্ধন ক্ষয় হয়ে গেল, সে মুক্তিলাভ করল।

গীতা বলেছেন, শুধু ইন্দ্রিয়সংযমে নয়, শুধু সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত হয়েও নয়, শুধু আত্মতত্ত্বদর্শন দিয়ে নয়, শুধু শান্ত হয়ে নয়, শুধু জ্ঞানী হয়ে নয়, তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ,—সর্বভূতহিতে অর্থাৎ মঙ্গলবিধানে রত থাকলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়, তবেই মুক্তি। জ্ঞান, এবং জ্ঞান হতে চিত্তের যে শান্তি, সে শুধু ওপরে ওঠবার একএকটি ধাপ। মানুষকে এরা উপযুক্ত করে মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্যে। যে জ্ঞানী নয়, যার চিত্ত অসংযত, অশান্ত, সে আজও মঙ্গলযজ্ঞের জন্যে তৈরি হয় নি। আগে সংযত হতে হবে, জ্ঞানের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, সাধনার দ্বারা মনকে শান্ত করতে হবে, তারপর মঙ্গলকর্মে ব্রতী হতে হবে। এরা হল তীর্থসলিলে স্নান, এরা হল শুচিবাস পরিধান। তারপর পূজায় বসা। তাই আগে শান্তং, তারপর শিবং।

কিন্তু শিবের অনুষ্ঠান,—সর্বভূতহিতসাধন, সে তো কাজ, তাহলে কি খেটে মরতে হবে নাকি? তাই তো আতঙ্কে অর্জুন বলেছিলেন, 'তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হাঁ, নিয়তং কুরু কর্মত্বং—আর সে কি যেমন তেমন খাটা!

> সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
> কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

—হে ভারত, কর্মে আসক্তিযুক্ত হ'য়ে অজ্ঞলোকেরা যেমন কাজ করে, বিজ্ঞলোক অনাসক্ত হয়ে লোকহিতসাধনের জন্যে ঠিক সেই রকম কাজ করবেন।

দেখ, ঐ রামকান্ত মুদী, দিনরাত দু'পয়সা লাভের লালসায় পায়ের ঘাম মাথায় ফেলতে ফেলতে সস্তার হাটে কিনে চড়া বাজারে বিক্রী করছে, পেটে খায় না, একখানা ভাল কাপড় নেই, কোনো রকম বিলাসিতা নেই, আলস্য নেই, যেন ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া। তার মতন খাটতে হবে নাকি? হাঁ, তারি মতন। অথবা ঐ যে ঘোর বিষয়ী দুকড়ি মল্লিক, মোটা মোটা কোঁকড়া কালো লোমে ঢাকা বুকের ওপর ঘামে মলিন পাঞ্জাবি ও পাকানো চাদর জড়িয়ে, ক্যাভেণ্ডার সিগারেটের টিনের বাক্সয় মকরদমার জরুরি দলিল দস্তাবেজ পুরে নিয়ে উকীলবাড়ী আর আদালতে ধর্ণা দেয়—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই,—সকল সময়ই হাজির আছে,—তার মতন হ'তে হবে নাকি?—হাঁ তারি মতন। মনে করা গেল, ধর্মজ্ঞান হয়েছে, এবার দুএকটা তত্ত্বকথার বাঁধা বুলি, একটু বিশ্রাম, একটু আরাম, বিষয় বাসনা ক্ষয় হয়েছে, সুতরাং কাজ-টাজ আবার কেন? বেশ একটু নিভৃত কোণ, খাটুনি নেই, ওসব বিষয়কর্ম মাথায় ঢোকে না, সাধুলোক, অতএব একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, আর ভক্তদের সেবাগ্রহণ—এ সব নয়, হাড়ভাঙা খাটুনি! "তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!"

গীতা বললেন, ঐ এক কথা, নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং। কাজের বাইরের রূপটা একই রকম। প্রভেদ হচ্ছে অন্তরে রামকান্ত মুদী

এবং ছুকড়ি মল্লিক কাজ করে, কিন্তু মঙ্গল করে না। তোমাকে যে-কাজ করতে হবে সে হবে মঙ্গল কাজ। মঙ্গল কাজ কি রকমের কাজ? অনাশ্রিত কর্মফল যার। কর্মফলটি পাবো, এই জন্যে কাজ করা নয়। লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকহিতের জন্যে যে-কাজ সেই হ'ল মঙ্গল কাজ। এ হ'ল কাজের অন্তরের কথা, বাইরে তা প্রকাশ হবে না। ঢাক বাজিয়ে দেশ উদ্ধার নয়, মনের সঙ্কল্প মনেই থাক্‌বে। বাইরে তোমার এমন উৎসাহ, এমন অধ্যবসায় দিয়ে কাজ করতে হবে, যা দেখে ঐ রামকান্ত মুদী, ঐ ছুকড়ি মল্লিকও বিস্ময়ে চমকে উঠবে, ভাববে তোমার মতন মুনাফাখোর আর বুঝি দুটি নেই। এই অবিরাম কাজের একটি সুনিভৃত অবসরে দিন শেষে একান্তে একবার তাঁকে ডেকে বলতে হবে, হে প্রভু, যা করেছি, যা দিয়েছি, যা পেয়েছি, যা এনেছি,—সব তুমি নাও, তুমি নাও। সেই যে যিনি মানুষের মনের দুয়ারে দুয়ারে ডাক দিয়ে ফিরছেন, সেই যে ভক্তির কাঙাল চির-ভিক্ষুক, সেই যে যিনি বলেন 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'—তাঁর ঝুলি ভরে দিয়ে বলতে হবে, নাও প্রভু, আমার যা-কিছু আছে সব নাও। আমার লাভ নাও, লোকসান নাও, পাপ নাও, পুণ্য নাও, আমার সম্মান নাও, নিন্দা নাও, আমার সমস্ত নিয়ে আমায় ভার-মুক্ত করো। এই হল কর্মের দ্বারা কর্মের বন্ধন ক্ষয়।

গীতা বলেছেন, মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ, কর্মফল যেন তোমার কর্মে প্রবৃত্ত হবার হেতু না হয়। এই কাজটি করলে আমার এই লাভ হবে, এই পুণ্য হবে, সুতরাং সেই লাভের লোভে, সেই পুণ্যের লোভে কাজটি আমার করা চাই,—এই ভেবে যেন আমি কর্মে প্রবৃত্ত না নই। তবে কি ভেবে, কোন্ উদ্দেশ্যে আমি কাজ করব? যজ্ঞার্থাৎ,—যজ্ঞার্থে, মঙ্গলানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে। এই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য।

> যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
> তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

—যজ্ঞার্থ-সম্পাদিত কর্ম ছাড়া অন্য কর্মানুষ্ঠানে মানুষ কর্মে বদ্ধ হয়। হে কৌন্তেয় তুমি নিষ্কাম হয়ে যজ্ঞার্থ কর্ম কর।

যজ্ঞার্থ সম্পাদিত কর্ম কি? ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এক বিরাট মঙ্গলযজ্ঞচক্র প্রবর্ত্তিত করেছেন, তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তাঁর প্রবর্ত্তিত সেই মঙ্গলযজ্ঞচক্রে যোগ দিতে। গীতা বলেছেন, তোমার কাজের উদ্দেশ্য যেন নিজের সুখ, নিজের পুণ্যসঞ্চয়, নিজের ভোগ না হয়, তোমার কাজের উদ্দেশ্য হওয়া চাই মানুষের হিতসাধন, গীতার ভাষায় যাকে বলা হয়েছে লোক-সংগ্রহ। পরের মঙ্গলের জন্যে যিনি কাজ করেন, মনে যাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, তিনিই যথার্থ অনাসক্ত হয়ে কাজ করেন। 'আসক্তি' কথাটাকে গীতা যে-বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার মানে হ'ল কর্মফলে আসক্তি। অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করবে মানে এ নয় যে, কাজে উঠে পড়ে লেগে যাবে না, এ নয় যে কাজে উৎসাহ থাকবে না, অধ্যবসায় থাকবে না। এর মানে এই যে কোনো ফলাকাঙ্খা করবে না। শুধু তাই নয়, গীতা বলেছেন, সমগ্র কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করবে।

গীতা বলেছেন, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,—কথাটা সকলেই জানেন,—কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নেই। অধিকার বলতে কি বোঝায়? রেলের এঞ্জিন বাষ্পে চলে, তাহলে বাষ্পেরই কি এঞ্জিন চালাবার অধিকার? না, তা নয়। যে-লোকটি এঞ্জিনে বসে কলকাঠি টিপছে তারই অধিকার, বাষ্পের নয়। তাকেই বলি চালক, বাষ্পকে বলি না। কেন? বাষ্প থাকলেও এঞ্জিন চলে না, যদি না ঐ লোকটি কলকাঠি না টেপে। বাষ্প এঞ্জিনের সঙ্গে নিজেকে এমন ক'রে জড়িয়ে ফেলেছে, যে তাকে এঞ্জিনেরই একটা অঙ্গ হতে হয়েছে, জড়িত হয়ে গেছে বলেই সে চলাবার অধিকার হারিয়েছে। কিন্তু ঐ লোকটি তেমন নয়। এঞ্জিনে থেকেও সে এঞ্জিন হতে পৃথক, তাই এঞ্জিন চালাবার অধিকার তারই। তেমনি কাজের বেলা। কাজের সঙ্গে যদি নিজেকে জড়িয়ে ফেলি, তাহলে আর কাজ করবার অধিকার থাকে না। কাজের থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে, কাজের ফলাফল 'থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রাখলে তবেই কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে এ বাণী সার্থক। তাই যিনি কর্মফলে নিরাসক্ত তিনিই কর্মী, আর যিনি তা নন, তিনি কুলী-মজুর। কুলীতে আর কর্মীতে এইখানেই প্রভেদ।

(আগামীবারে সমাপ্য)

তর্পণ

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

প্রলয় প্লাবনে যারা সর্ব্বহারা হ'য়ে—
এসেছিল, কোথা গেল মৃত্যু-স্রোত ব'য়ে?
ক্ষুধা-তৃষ্ণা রোগশোক অনন্ত ব্যথায়,
বুঝাবে অভাব কারে, সে কোন কথায়?
আশা, ভাষা, বলহীন বেদনা জর্জ্জর,—
মানুষের কঙ্কালেতে ও নহে বর্ব্বর।
ওই মুষ্টি ধরিত্রীর বক্ষ দীর্ণ ক'রে
যোগায়েছে অন্ন সবে, বাঁচাবার তরে।

গ্রীষ্মের দারুণ দাহ, বরিষার ধারা,—
হেমন্তে শিশির বায়ে, অকম্পিত কায়া?
মৃত্যু-জরা চির-দৈন্যে নিরলস হ'য়ে
নিত্যকার প্রয়োজন আনিয়াছে ব'য়ে?
স্বজন বান্ধব গেহ স্বাস্থ্য সব হারা,
মরণে বিরাম লভি চলে গেছে তারা।
অশ্রু ব্যথা হাহাকার সমবেদনায়,
কাজ নাই আজ আর। গূঢ় চেতনায়

সেই জন-নারায়ণ-গণে অর্পিলাম
বিজয়ার নিরঞ্জনে তর্পণ প্রণাম।

জঙ্গম

বনফুল

নটবরের হস্তে নিজেদের ডাক্তারের এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া শঙ্কর আহত হইল।

বলিল, "তা হতে পারে। কিন্তু তাঁকে এমনভাবে অপমান করাটা ঠিক হয় নি আপনার"

"নিশ্চয় হয় নি। কিন্তু একটি বোতল 'খাঁটি' তখন আমার মগজে চড়ে' আছে, বাজে 'ফরম্যালিটি' করতে দেবে কেন সে। শাদা চোখে একদিন 'অ্যাপলজি' চেয়ে আসব ভেবেছি—কিন্তু ফুরসতই পাচ্ছি না—"

আকর্ণ বিভ্রান্ত হাসি হাসিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শঙ্করও হাসিয়া ফেলিল ও উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কি ওষুধ বললেন? পিটুইট্রিন?"

"হ্যাঁ, পি-ডির"

"দেখি যদি আনতে পারি"

"আপনি গেলে তো বাপ বাপ করে' দেবে"

শঙ্কর চলিয়া গেল।

ডিসপেন্সারি কাছেই, পাঁচ মিনিটের পথ। গিয়া দেখিল, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেহ নাই। কলেরার মরশুম, দুইজনই 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন। ড্রেসার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার কাছে চাবিও ছিল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া সে ঔষধটা বাহির করিয়া দিল। শঙ্কর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল উনুন ধরিয়া উঠিয়াছে, জলও গরম হইয়াছে, নটবর ডাক্তার নিজেই মেয়েটির হাতে পায়ে শেক দিতেছেন। মেয়েটি অনেকটা যেন চাঙ্গা হইয়াছে। নটবর ইন্‌জেকশনটা দিলেন, ব্র্যাণ্ডি দিয়া একডোজ ঔষধ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন. তাহার পর বলিলেন, "এইবার স্যালাইনটার ব্যবস্থা করা যাক্"

শঙ্কর বলিলেন, "একবার দেওয়া হয়েছে শুনলাম"

"আর একটু দেওয়া দরকার। আমি পেট ফুঁড়ে দেব। এঁদের ভয় হয়। কেউ বলেন Intestine ছ্যাঁদা হয়ে যাবে, কেউ বলেন পেরিটোনাইটিস্ হবে। আমি কিন্তু বহুত দিয়ে দেখিছি কিছু হয় না—খুব ভাল ফল হয়। আর কত সহজে টপ টপ দেওয়া যায়। ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। চরণ ডাক্তারের আশায় কতক্ষণ আর থাকি। তিনি তাঁর প্রত্যেক রুগির প্রত্যেক কথার উত্তর দিয়ে প্রত্যেকের পথ্যের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে' সকলের সব রকম আবদার মিটিয়ে তবে আসবেন। আশ্চর্য্য লোক। অথচ ওঁকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাসও নেই আমার"

"চরণ ডাক্তারকে এরাই ডেকেছে নাকি"

"এরা ডাকবে কেন, আমি ডেকেছি। দায় কি এদের? দায় এই শালার। চরণবাবু বোধহয় ফি নিতে চাইবেন না, কিন্তু দিতে হবে কিছু। বলে রাখি। এই, শুনতা হ্যায়, চরণবাবুকো বোলায়ে হেঁ। আঠ রুপিয়া ফিস্ লাগে গা"

"হুজুর মাই বাপ, জো বোলিয়ে"

নটবর মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, "জো বোলিয়ে! জো বোলিয়ে কি রে! রুপিয়া হ্যায়?"

মেয়ের মা অশ্রু মুছিয়া সজলকণ্ঠে বলিল, "থারি লোটা বন্ধক দে করি কে রুপিয়া নাগব বাবু, বেটিকে মেরা বচাই দে—"

"এই গাইতে সুরু করেছে"

তাহার পর শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যা দেখছি, শেষকালে **I shall have to pay from my pocket**—এই ব্যাটারাই ফতুর করবে আমাকে। মেথর পাড়ায় এক মিশনারি সায়েব সেবা করে' বেড়াচ্ছে দেখলাম—তাকেও কতকগুলো কাজ দিয়ে আসতে হল। চাইলে 'না' বলতে পারলাম না। আর সত্যিই কাজ করছে লোকটা"

"মেথর পাড়াতেও কলেরা হয়েছে নাকি"

"চারটে মরেছে, দশটা ভুগছে"

"তাহলে আমার তো একবার যাওয়া দরকার সেখানে"

"নিশ্চয়। যান। যদি পারেন কিছু সাহায্যও করুন। হ্যাঁ আপনাকে সেই কথাটা বলে' নি। হরিয়ার নামে শুনলাম উৎপলবাবু নালিশ করেছেন। দারোগাও তার নামে বি, এল, কেস আগেই দায়ের করেছে। আমি কিন্তু বলে রাখছি হরিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবেন না আপনারা। তার বিরুদ্ধে একটি সাক্ষী পাবেন না। মিছিমিছি অপ্রস্তুত হবেন শুধু। হরিয়া, বিগুণ, কারু ফরিদ সকলের হয়ে লড়ব আমি। এই জেলার সেরা উকিলরা বিনা পয়সায় আমার হয়ে খেটে দিয়ে যাবে। উৎপলবাবুকে বলে' দেবেন কথাটা। তিনি সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করলেন না, কিন্তু একদিন তাঁকে এই শালার কাছে আসতে হবে তা বলে দিচ্ছি। তাঁকে বলে দেবেন শুধু যে সাক্ষী পাবেন না তা নয়—ধোপা পাবেন না, নাপিত পাবেন না, গোয়ালা পাবেন না, কিছু পাবেন না। এই গরীবরাই আপনাদের হাত পা এদের, পীড়ন করে' কোন সুখ পাবেন না আপনারা। এ কোলকাতা নয় মফস্বল। এখানে পয়সা ফেললেই সব জিনিস পাওয়া যায় না। এদের কাছে হুকুম হাকিম নয়, ভালবাসাই হাকিম! এই অসহায় দরিদ্রদের পীড়ন করতে ইচ্ছেও হয় আপনাদের? আশ্চর্য্য"

শঙ্কর একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"আমি তো কিছুই করি নি। উৎপল করেছে। পলাশপুর থেকে আসার পর তার সঙ্গে দেখাও হয় নি আমার। কলেরা নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে। তাকে বলব আপনার কথা"

"বলবেন"

নটবর স্যালাইন দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাহির হইয়া চলিতে সুরু করিল। পলাশপুর হইতে আসিয়া সত্যই সে উৎপলের সহিত দেখা করে নাই। কলেরার ওজুহাত পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল। সুরমার সান্নিধ্য সে এড়াইয়া চলিতেছিল। ও ফাঁদে সে আর পা দিবে না। ফাঁদটা যে তাহার মনেই এ খেয়াল তাহার ছিল না। নিপুদাকে, প্রমথ ডাক্তারকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এতগুলো গরীব লোকের নামে নালিশ করা হইয়াছে, রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন দেওয়া হইয়াছে—দুষ্টদমনের এত আয়োজন উৎপল সাড়ম্বরে করিয়াছে, তাহার সহিত দেখা হইলেই নিশ্চয়ই সোৎসাহে সে এইসব আলোচনা করিবে। শঙ্করকে চুপ করিয়া সব শুনিতে হইবে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। উৎপল তাহার উপরই সব ভার দিতে চাহিয়াছিল সে লয় নাই, লইতে পারে নাই, সমস্যার সমাধান করিবার কোন সদুপায় তাহার মাথায় আসে নাই, সুরমার প্ররোচনায় প্রতিবাদ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া উৎপলের কথাতেই অবশেষে সায় দিয়া সামান্য একটা ছুতায় ভীরুর মতো সে পলাশপুরে পলাইয়া গিয়াছিল।

মেথর পাড়ায় গিয়া সে দেখিল মিশনারি সাহেব মলমূত্রসিক্ত কতকগুলি কাপড় জামা বাখারি করিয়া তুলিয়া প্রকাণ্ড একটি গামলায় ফেলিতেছেন। গামলায় ফিনাইল-মেশানো শাদা জল রহিয়াছে। সারি সারি অনেকগুলি গামলা। সাহেবের সঙ্গে শঙ্করের আলাপ ছিল।

"গুড্ আফটারনুন মিষ্টার রয়"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "ডিস্ইন্ফেক্টিং সয়েল্ড্ ক্লোদস্"

শঙ্কর প্রত্যভিবাদন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব বাংলাও জানেন। বলিলেন, "আপনিও সেবা-কার্য্য করছেন?"

শঙ্কর ঘাড় নাড়িল।

"উত্তম, খুব উত্তম। আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি কি?"

"নিশ্চয়, কি করতে হবে বলুন"

"আসুন"

সাহেবের পিছু পিছু শঙ্কর ছোট একটা কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে এত অন্ধকার যে সে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। কিছু শুনিতেও পাইল না। মৃত্যুর স্তব্ধতায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন যেন। একটা নিদারুণ দুর্গন্ধ কেবল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সহসা সাহেব টর্চ জ্বালিলেন। তীব্র আলোকে প্রথমেই চোখে পড়িল ঘরের এক কোনে গোটা দুই প্রকাণ্ড শূকর বাঁধা রহিয়াছে। তাহার পর দেখিতে পাইল আর একধারে সারি সারি তিনজন শুইয়া আছে। দুইজনের মুখ ঢাকা, একজনের মুখ খোলা। যাহার মুখ খোলা মনে হইল সে যেন দুই চোখে কালো কালো ঠুলি পরিয়া আছে। সাহেব পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের উপর নাড়িতেই ভনভন করিয়া অসংখ্য মাছি উড়িয়া গেল। চক্ষু কোটর বাহির হইয়া পড়িল। চক্ষু দেখা যায় না খালি কোটর। ঠুলি নয় মাছির স্তূপ! হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সামর্থ্য নাই!

সাহেব ঝুঁকিয়া নাড়ি দেখিয়া বলিলেন, "নাড়ি নাই, তবু এ বোধহয় বাঁচিয়া আছে। এ লোকটাকে আমি হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি যদি এ দুজনের ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করেন বড় ভাল হয়—"

শঙ্করের মুখে কথা সরিতেছিল না।

বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে দুইটি মাত্র কথা সে বলিল, "এ কি!"

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই আপনার দেশ! Your country lives in huts not in palaces.—lives like this and dies like this—"

শঙ্করের আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বলিয়া ফেলিল, "I have read about Black Plague of your country too"

"No offence, please.—চলুন কাজ করা যাক। Let us be up and doing"

সাহেব বাহিরে আসিয়া ডিস্ইন্ফেক্টিংয়ে মন দিলেন।

শঙ্কর অকূল পাথারে পড়িল। একটি লোক নাই, কি করিয়া মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা করিবে সে। এ পাড়ার সকলে পলাইয়াছে। অন্য কোন জাত মেথরের মড়া স্পর্শ করিবে না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সে একটিমাত্র লোকের নাগাল পাইল। ফুলশরিয়া। ফুলশরিয়ারই শরণাপন্ন হইল। সে যদি কোন লোক জোগাড় করিয়া দিতে পারে। ফুলশরিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্কর তাহাকে ডাকিয়া কাজের ভার দিতেছেন! জরুর সে 'কোশিস্' করিবে। মেথরদের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি বর্ষণ করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর আবার মেথরপাড়ায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া দেখিল সাহেব তাঁহার 'ডিস্ইন্ফেক্টিং' শেষ করিয়াছেন।

"লোক পেলেন?"

"ডাকতে পাঠিয়েছি"

সাহেবের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মিটিমিটি করিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "পাওয়া শক্ত। কেউ আসবে না। এদেশের লোককে আমি চিনি"

সত্য কথাটা শুনিয়া শঙ্করের লজ্জা হইল। হঠাৎ রাগও হইল। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা এই বিদেশীটার! আমাদেরই অর্থে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া আমাদের দেশের মাটিতেই দাঁড়াইয়া আমাদেরই নিন্দা করিতেছে! আমাদের উপকার করিবার জন্য কে উহাকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল। উত্তরে একটা রূঢ় কথা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তাহার অবস্থাও কি অনুরূপ নয়? তাহাকে কে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল এখানে আসিতে! সাহেব কিছু না বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং অবলীলাক্রমে মুমূর্ষু কলেরা রোগীটাকে কাঁধে তুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

"আমি হসপিটালে চলি। আপনি অপেক্ষা করুন। শীঘ্র কেহ আসিবে না। জানোয়ার সব—"

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহেব চলিয়া গেলেন।

যতক্ষণ দেখা গেল শঙ্কর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। স্কুলের স্পোর্টে একবার সে ফার্ষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার অপেক্ষা বলিষ্ঠতর আর একজনের নিকট সে হারিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সেই ছেলেটা যখন 'কাপ' লইয়া চলিয়া গেল তখন তাহার যাহা মনে হইয়াছিল এই সাহেবকে দেখিয়া ঠিক তাহাই মনে হইল। সাহেবের মহত্ত্বে সে যতটা শ্রীত হইয়াছিল তাহার ওই 'জানোয়ার' কথাটায় ঠিক ততটাই বিরক্ত হইল সে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল যেন। মনে হইতে লাগিল এই যে ইহারা আমাদের সকলকে অশিক্ষিত বর্ব্বর মনে করিয়া অনুকম্পাভরে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে তাহার মূলে কি আছে, নিছক মানব প্রেম? স্বার্থ নয়? ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পর্য্যন্ত স্বদেশবাসীকে হীনচক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। আমাদের কবিও গাহিয়া গিয়াছেন—"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা"—। কাহার ভাষা! সত্যই কি আমরা মূঢ়, সত্যই কি আমরা মূক, সত্যই কি আমরা ম্লান? সত্যই কি আমাদের নিজের কোন বুদ্ধি নাই, সৌন্দর্য্য নাই, ভাষা নাই? বিদেশী যে মানদণ্ডের মাপে এসব কথা বলিতে শিখিয়াছি সেই মানদণ্ডটাই কি নিখুঁত? উহাদের চোখ দিয়া দেখিলে আমাদের হয়তো ম্লান দেখায়, উহাদের কান দিয়া শুনিলে আমাদের প্রাণের ভাষা হয়তো শোনা যায় না, কিন্তু উহাদের বিচারটাই কি শেষ বিচার? কলেরায় দলে দলে লোক মরিতেছে দলে দলে লোক পলাইতেছে, ইহা লইয়া ঠাট্টা করিবার কি আছে? উহাদের দেশে পালায় না? নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে! পলাইয়াছে তো হইয়াছে কি? উহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায় না? প্রাণের ভয় কাহার নাই! ও দেশের গরীবদের কথা কে না জানে। ও দেশের 'স্লাম' বাসীদের তুলনায় আমাদের দেশের গরীব লোকেরা তো দেবতা। উহাদের সাহিত্যে স্লামের যে পাশবিক ছবি আমরা পাই তাহা বীভৎস, এ দেশে ও ছবি কল্পনাও করা যায় না। আমাদের অনেক দোষ আছে—আমরা রুগ্ন, আমরা অশিক্ষিত, আমরা অসহায়—কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি পরাধীনতা নয়? নিরীহ হরিণ বিরাট একটা পাইথনের কবলে পড়িয়া নানারূপ অশোভন ভঙ্গীতে ছটফট করিতেছে। এই অশোভনতা যদি দোষ হয় তাহা হইলে আমরা দুষ্ট। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার মনের গ্লানি অনেকটা যেন কমিয়া গেল। কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবার অবসর পাইল না। ফুলশরিয়া আসিয়া হাজির হইল। বলিল যে ভজু এবং যোগীয়ার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল। কয়েকদিন আগে তাহাদের দুইজনেরই ছেলে বউ মরিয়াছে। এখন তাহারা কালালিতে বসিয়া মদ খাইতেছে। মড়া ফেলিবার কথা বলায় হা হা করিয়া হাসিয়া অশ্লীল ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিল। বাবু নিজে যদি গিয়া ছোঁড়াপুতাদের কান ধরিয়া টানিয়া আনেন তবে ঠিক হয়।

শঙ্কর বলিল—"দুটো ছোট খাটিয়া জোগাড় করতে পারিস?"

"হাঁ। উ আর কি ভারী বাত হে"

"তাই আন তাহলে। তোর আপত্তি আছে ছুঁতে? যদি না থাকে তাহলে তুই আর আমি একে একে এদের নিয়ে যাই চল—"

ফুলশরিয়া শিহরিয়া উঠিল।

"উ বাবু হম্ নেহি সেক্‌বো"

শঙ্কর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন গভীর রাত্রে শঙ্কর যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি দুইটা। সমস্ত দেহ মন অবসন্ন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। সে কাহাকেও উঠাইল না। উঠাইবার প্রবৃত্তিও হইল না। বাহিরের ঘরে তাহার এক-প্রস্থ বিছানা পাতাই থাকিত, বাহিরের ঘরের চাবিও তাহার কাছে ছিল, বাহিরের ঘরেই সে শুইয়া পড়িল। সাহেবের কথাগুলি তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল—your country lives in huts, not in palaces—lives like this and dies like this—তাহার ঘুম আসিল না। খানিকক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল—আলো জ্বালিয়া লিখিতে সুরু করিয়া দিল।

"যেমন করিয়া হোক ইহাদের আমি উদ্ধার করিব—তাহা করিতে গিয়া যদি আমার ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব যায় তবু আমি নিরস্ত হইব না।..."

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে একটা শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিল বারান্দায় একটা ছায়ামূর্ত্তির মতো কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।

"কে?"

ছায়ামূর্ত্তি আগাইয়া আসিল। ফুলশরিয়া।

"কি চাই এত রাত্রে?"

কম্পিতকণ্ঠে ফুলশরিয়া বলিল, "কুছু নেই"

শঙ্কর উঠিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই ফুলশরিয়া হঠাৎ আগাইয়া আসিল এবং তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

"এ কি!"

ফুলশরিয়া কিছুতেই পা ছাড়ে না। কি হইল? কাঁদিতেছে কেন! জোর করিয়া পা সরাইয়া লইতেই ফুলশরিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। একটি কথা বলিল না। নিজের অদ্ভুত আচরণে নিজেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু না আসিয়া সে কিছুতেই পারে নাই। কিছুতেই তাহার চোখে ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ হইতেই সে শঙ্করের বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরিতেছিল। মেথরের মড়া বাবু নিজে কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া গেলেন! এ কি মানুষে পারে? এ লোককে প্রণাম না করিয়া থাকা যায়?

শঙ্কর অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সকালে খোঁজ করিয়া শুনিল ফুলশরিয়া বাড়ীতে নাই। হাতে কোন কাজ ছিল না—মনে হইল উৎপলের কাছে একবার যাওয়া যাক। তাহার সহিত দেখা না করাটা অশোভন হইতেছে। সুরমা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তবে যাইবে এ কি তাহার পাগলামি। সেখানেও গিয়া দেখিল কেহ নাই। দারোয়ান বলিল বাবু এবং মাইজি একটা জরুরি 'তার' পাইয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বলিয়া যান নাই। (ক্রমশঃ)

কামবীজ ও রাসলীলা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

কলির মানুষ রামকে ঠেলিয়া দিয়া কৃষ্ণকে বড় করিল। বৈষ্ণব তার 'মহামন্ত্রে' রামের নাম আগে নিয়া কৃষ্ণের নাম পরে নিত। আগে বলিত—হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে, পরে বলিত হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। কিন্তু এখন বলিতেছে—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে প্রথমে, তারপর হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এরূপ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব—কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভাগবত ব্যাখ্যার মুখে বলিতেছেন—রাম অবতার, আর কৃষ্ণ অবতার—অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ ভগবানের কথা মনু বিরোধী হোক আর নাই হোক, সেদিকে কেহ চাহিতেছে না।

বৈষ্ণব স্মৃতি হরিভক্তিবিলাস দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তির কথা কিছুই বলেন না। এমন কি রাধার মূর্ত্তি বা ধ্যানের কোনো কথা তাহাতে নাই[১০]। ইহা গোপালভট্ট কর্ত্তৃক অনুমান ১৫১২ হইতে ১৫৩৪ খ্রীঃ মধ্যে রচিত। তখনও রাধা প্রসঙ্গ ভালভাবে চালু হয় নাই কি?

কামবীজ ও কামগায়ত্রী আলোচনা প্রসঙ্গেও আমরা রাধাকে পাই না। তন্ত্র হইতে কৃষ্ণমন্ত্র পাওয়া যায়। তাহাতে কামবীজ যুক্ত গোপীজনবল্লভায় স্বাহা—এইরূপ কৃষ্ণমন্ত্র[১১] আছে। ইহা তো সেই মহাভারতের কৃষ্ণ। দ্রৌপদী যে কৃষ্ণকে গোপীজনপ্রিয় বলিয়াছেন তিনি। কৃষ্ণমন্ত্রে রাধা নাই। রাধার কল্পনা অনেক পরে হয়। তবে কৃষ্ণকে কামদেব সাজানো হইয়াছে কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যেও। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্র। গীতার কৃষ্ণও কি কামদেব?

সুতরাং যদি কেহ বলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কামবীজের কথা প্রথম বলিলেন, তবে তিনি ভুল করিবেন। কারণ ক্লীঁ (অর্থে কামবীজ), হ্রীঁ (অর্থে মায়াবীজ) ও শ্রীঁ (অর্থে শ্রীবীজ)—আমরা তন্ত্রের মধ্যে পাই। তাহা ছাড়া দেখা যাইতেছে—মুরারির প্রায় ২০০ বৎসর পরে বিশ্বনাথ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজেরও

---

(১০) হরিভক্তিবিলাসে চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণের রীতি বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের উপাস্য দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণের কোনো কথা নাই। গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু রাধার মূর্ত্তি বা ধ্যানের কোনো প্রসঙ্গ নাই। এই হরিভক্তিবিলাসই বৈষ্ণবের প্রথম ও প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ। তাহাতে রাধা প্রসঙ্গ বা দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণের কথা বাদ দিবার কারণ কি? অথচ রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসকে সন্তুষ্ট করিতে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রন্থকার গোপাল ভট্ট ইহা আমাদের জানাইয়াছেন।

(১১) কামবীজ—ক্লীঁ। কামগায়ত্রী—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীঁ (শ্রীবীজ), হ্রীঁ (মায়াবীজ) ও ক্লীঁ (কামবীজ)। প্রথমেই এই তিনটির কোনোটিকে আগে পরে বা মধ্যে বসাইয়া শেষে তার সঙ্গে—গোপীজনবল্লভায় স্বাহা—বলিবে। এইরূপে ১৩ অক্ষরের তিন প্রকারের কৃষ্ণমন্ত্র হয়। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা—ইহা ১৮ অক্ষরের কৃষ্ণমন্ত্র। ইহাতে হ্রীঁ ও শ্রীঁ যোগ করিলে ২০ অক্ষরের কৃষ্ণমন্ত্র হয়, (তন্ত্রসার)।

প্রায় ১০০ বৎসর পরে বিশ্বনাথ। সুতরাং বিশ্বনাথের ব্যাখ্যা একশত বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থে যায় নাই। তাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তবে বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক কল' শব্দের ব্যাখ্যা অভিনব।

বৈষ্ণবগণ রাস শব্দের অর্থে বলেন—ইহা পরমরসকদম্বব্যাপার বিশেষ (—সনাতন গোস্বামী)। কোন্ রস শ্রেষ্ঠ তাহা বিচার করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস (—ভক্তি রসামৃতসিন্ধু)। কাজেই দেখা যাইতেছে—এই শৃঙ্গাররসময় ব্যাপারকেই তাঁহারা রাস বলিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণকে নিয়া রাস। কৃষ্ণের চরিতকথা আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিলাম। রাধার কাহিনীও জানিয়া নিতে হইবে। রাধার উদ্ভব কাহিনী অতি অদ্ভুত[১২]। রাসলীলা ততোধিক বিস্ময়কর।

কবে রাস হয় তাহা নিয়া দুই মত আছে। ভাগবত মতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাস হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে মধুমাসে (চৈত্র মাসে) শুক্লা ত্রয়োদশী রাত্রে রাস হয়[১৩]। গীতগোবিন্দ এই বসন্তকালে রাসের কথা বলিয়াছেন। বাঙলা দেশে (ভাগবত মতে) শরতকালের রাসই প্রচলিত, তবে আশ্বিন পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাহা অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিনই রাস হয়। জয়দেব বর্ণিত বসন্তকালের রাস শ্রীকৃষ্ণের রাস নয়—ভাগবত বলেন। ভাগবত মতে বলরামের রাস বসন্ত পূর্ণিমায় (বৈষ্ণব তোষিণী টীকায় সনাতন গোস্বামী)। বসন্তকালের রাস এখন হোলি (দোল) উৎসবে চাপা পড়িয়াছে। আবার বাঙলার প্রধান বৈষ্ণব-কেন্দ্র নবদ্বীপে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাস চাপা দিয়াছে পট-পূর্ণিমার তান্ত্রিক উৎসবে।

আমরা দেখিলাম বৈষ্ণবরা কিরূপে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে... গীতার কৃষ্ণকে পাশে ফেলিয়া রাখিয়া, রাসের কৃষ্ণকে—গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণকে সম্মুখে আনিয়া বসাইয়াছেন। আর তাঁকে পূজা করিতেছেন কামদেব বলিয়া, কামবীজে কামগায়ত্রী দিয়া। ভারত যুদ্ধের নায়ককে ইহার দ্বারা কি উপহাস করা হইতেছে না? ইহা ছাড়া রাসের সব কিছুই সুরুচিসঙ্গত নয়—এরূপ সন্দেহ কি প্রত্যেকেরই মনে আসে না? অন্য পরে কা কথা, রাসের বর্ণনা শুনিয়া স্বয়ং রাজা পরীক্ষিতও সন্দিহান হইয়া শুকদেবকে বলেন—ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মের দণ্ড দিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, অথচ তিনিই পরদার সম্ভোগ করিলেন...এ কেমন কথা! শুকদেব উত্তর দিলেন—ঈশ্বরদের ধর্ম্মাতিক্রমের সাহস থাকে, তেজস্বীদের তাহাতে দোষ হয় না...যাহারা ঈশ্বর নয় তাহারা এরূপ করিবে না (—ভাগ ১০ স্কন্ধ, রাসপঞ্চাধ্যায়)। ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। তারপর বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রজ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধি থাকিলেই রাস কি বস্তু তাহা বুঝা যাইবে না (—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)।—সুতরাং এ বিষয়ে মৌন থাকাই বুঝি বিধি।...তথাপি আমরা আলোচনাটা সমাধা করিব।

আমরা দেখিলাম মহাভারতে রাস নাই। হরিবংশে রাস আছে রাধা নাই। ভাগবতেও রাধা নাই, আছেন প্রধানা সখী। পরবর্ত্তী পুরাণে এই প্রধানা সখী হইলেন রাধা। গোলোক হইতে ভূলোকে আসিলেন রাধা। অযোনিসম্ভূতা রাধা। অধিকাংশেই বলিলেন তিনি পরকীয়া। কেহ স্বকীয়া করিলেন বিবাহ দিয়া। কিন্তু অধিকাংশের মত পরকীয়াটাই টিকিল। বৈষ্ণবরা বলিলেন স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়া বড় রস। তাই রাধার নাম আগে। কৃষ্ণের নাম পরে। যদি কেহ কৃষ্ণের নাম আগে বলিয়া রাধার নাম পরে বলে সে অনন্ত নরকে যাইবে (—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ১৩।৭৬)।

এখানে আর একটা কথা মনে করিয়া দিতেছি। কৃষ্ণই স্বয়ং

---

(১২) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত একেবারে ষোড়শী বেশে রাধাকে গোলোকে উপস্থিত করাইলেন। বলা হইল কৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে রাধা উদ্ভূত হইলেন। এইপ্রকার উদ্ভূত হইয়াই তিনি কৃষ্ণের দিকে ধাবিতা হইলেন। গোলোকে রাধার সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা হইল। একদিন কৃষ্ণ গোলোকে তাঁহার অন্য প্রেয়সী বিরজার সহিত বিহার করিতেছিলেন একটি পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর। সখীগণের দ্বারা রাধা এই গোপন সংবাদ জানিতে পারেন। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি সেই পাহাড়ের দিকে দৌড়িলেন। সেখানে রাধা ও বিরজার ঝগড়া হইল। কৃষ্ণ পাশ কাটাইলেন। বিরজা ও রাধা পরস্পরকে শাপ দিলেন। সতিনীর বিবাদে ইহা ছাড়া আর হইবেই বা কি? বিরজা দুঃখে ও অপমানে গলিয়া নদী হইয়া যান। তখন কৃষ্ণ রাধার মান ভাঙিতে আসিলে রাধা এই অবিশ্বাসী নাগরকে কটূক্তি করেন। সেখানে ছিলেন প্রভুভক্ত দ্বারপাল সুদাম। তিনি প্রভুনিন্দাকারিণী রাধাকে তিরস্কার করিলে রাধা সুদামকে শাপ দেন। সুদামও রাধাকে শাপ দেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নাটক তৈরি করার বাহাদুরী আছে!—এইভাবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত তার পাত্রপাত্রীগণকে গোলোক হইতে ভূলোকে নামাইলেন। রাধার শাপে সুদাম শঙ্খচূড় অসুর হইয়া গেলেন। সুদামের শাপে রাধা পৃথিবীতে গোপকন্যা হইয়া জন্মান ও শত বর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করেন।—এইবার রাধার জন্ম বিবরণ। বৃকভানু গোপের স্ত্রী কলাবতী। তিনি গোকুলে বায়ুগর্ভ ধারণ করেন এবং বায়ুমাত্র প্রসব করেন! তাহা হইতে অযোনি-সম্ভূতা রাধা জন্মলাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে এই রাধার ছায়ামূর্ত্তির সহিত বিষ্ণু অংশ সম্ভূত রায়ান ঘোষের বিবাহ হয়। কিন্তু রায়ান ক্লীব ছিলেন। রায়ান যশোদার আপন ভাই (ব্রহ্মবৈ প্রকৃতি খণ্ড ৪৮-৫০ অঃ)। পরে ব্রহ্মা আসিয়া কৃষ্ণের সহিত রাধিকার বিবাহ দেন (—ব্রহ্মাবৈ জন্মখণ্ড ৩ অঃ)।

রাধাতন্ত্র মতে স্বয়ং মহামায়া, বৃকভানুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি ডিম্ব দেন। সেই ডিম্ব ফাটিয়া রাধার জন্ম হয়। রাধা নিজে অপর দুই রাধাকে সৃষ্টি করেন। এই তিন রাধার মধ্যে বৃকভানুর ঘরে যে রাধা থাকিলেন তিনি কৃত্রিমা, অযোনিসম্ভূতা পদ্মিনী রাধাই পদ্মাক্ষয়া (—রাধাতন্ত্র ৭ম পটল)।

ক্রমে এই রাধার পূজা ও ধ্যানের ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল (—দেবী ভাগবত ৯।৫০ অঃ)।

(১৩) বৃন্দাবনে কোনো এক মধুমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী রাত্রে রাধিকার সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা হয়। এখানে রাধা নবযৌবন সম্পন্না। কৃষ্ণও নবযৌবন সম্পন্ন। রাধার ৩৩জন সখী সঙ্গে ছিলেন। সখীদের হাজার হাজার সঙ্গিনীও সঙ্গে ছিল। সুশীলা ও মঙ্গলার ১৬ হাজার করিয়া সঙ্গিনী। শশীকলা, যমুনা, জাহ্নবী, শুভা, দুর্গা ও কালিকার ১৪ হাজার করিয়া সঙ্গিনী। চন্দ্রমুখী, কদম্বমালা, পদ্মা, কমলা ও সরস্বতীর ১৩ হাজার করিয়া সঙ্গিনী। মাধবীর ১১ হাজার ও কুন্তীর ১০ হাজার সঙ্গিনী ছিল। এই হিসাবে ২ লক্ষ ২০ হাজার সঙ্গিনীর খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকাশ যে রাধিকার ৯ লক্ষ গোপিকা সখী ছিলেন। তাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও ৯ লক্ষ গোপরূপ ধারণ করিয়া রাসলীলা করেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা হয় রাসলীলার এই ১৮ লক্ষ গোপ গোপী রাধা ও কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব মাত্র (—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

ভগবান—এই মতবাদের প্রধান উদ্ভাবক ভাগবত। আবার রাস প্রসঙ্গেরও প্রধান উদ্ভাবক সেই ভাগবত। এই ভাগবতেই বলা হয়—রাস শ্রীকৃষ্ণের ১১শ বর্ষ বয়সের লীলা। কারণ কৃষ্ণ কেবলমাত্র একাদশ বৎসর নন্দগোপ গৃহে ছিলেন (৩।২।২৬ ভাগঃ)। কিন্তু দেখা যায় যুবক কৃষ্ণকে নিয়া রাসলীলা হইয়াছে। সঙ্গিনী যত সব যুবতী গোপবধূ। তাই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছি রাসলীলার নাম করিয়া বৈষ্ণব সমাজে কি একটা রহস্যময় ব্যাপার চালানো হইতেছে।

এইরূপ ক্ষেত্রে আসিয়া আমরা যখন দাঁড়াই, তখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিতে আহ্বান করিয়াছেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক[১৪]। তিনি ভাবিতে বলিয়াছেন যে—রাস কি রূপক নয়?···রাস বর্ণনার ভাষা কি (মিষ্টিক) সান্ধ্য ভাষা নয়··· রাসকে মদনানন্দ না ভাবিয়া প্রেয়স-প্রেয়সীভাবে জীব ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক মিলনরূপে গ্রহণ করাই কি সঙ্গত নয়?[১৫]

পরকীয়া তত্ত্ব জটিলতাপূর্ণ। মিষ্টিকগণ অনেক স্থলে মদ্‌ ধাতু ব্যবহার করেন। তাহা হইতে মত্ত ও মদন আসিয়া পড়িয়াছে। তান্ত্রিকগণ এই মদে পূর্ণাভিষিক্ত হন। নিত্যানন্দ এই মধুপানে প্রমত্ত হইতেন। বৈষ্ণবের রাধা কৃষ্ণকে অধর 'সুধা' পান করান, নিজেও কৃষ্ণের অধর সুধা পান করেন। চৈতন্যদেবের এই রাধাভাবই আরাধ্য ছিল।' হৃদয়ের বৃন্দাবনে তিনি এই রাসলীলা অনুভব করিতেন। তাঁর দিব্যোন্মাদ প্রলাপাদি এই ভাব আস্বাদনের অভিব্যক্তি।

অনেকে বলেন এ বিষয়ে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ যে কৈফিয়ৎ দেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। কৈফিয়তে বলা হয় যে—কৃষ্ণের শরীর পারমার্থিক নয়, প্রতিভাসিক। তেমনি এই রাসলীলা প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত। গোপীরা রাসে আসিলেও তাহাদের স্বামীগণ স্ত্রীদিগকে নিজের কাছেই পাইত। পদ্মপুরাণ অতিরিক্ত একটা কৈফিয়ৎ দেন। তাহাতে আছে যে—দণ্ডকারণ্যের যে সমস্ত ঋষি রামচন্দ্রে 'আসক্ত' ছিলেন তাঁরা এ জন্মে গোপী হন।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন—"নিত্য-রাধা নন্দঘোষ দেখেছিলেন। প্রেম-রাধা বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। কামরাধা চন্দ্রাবলী। কামরাধা, প্রেমরাধা, আরও এগিয়ে গেলে নিত্য রাধা।···(অমুক জিনিষটিও ছাড়িয়ে) গেলে প্রথমে লাল খোসা, তারপর ঈষৎ লাল, তারপর সাদা, তারপরে আর খোসা পাওয়া যায় না। ঐটি নিত্যরাধার স্বরূপ। যেখানে নেতি-নেতি বিচার বন্ধ হয়ে যায়। নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য্য আর রশ্মি। নিত্য সূর্য্যের স্বরূপ। লীলা রশ্মির স্বরূপ।" আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—"নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে বলেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়" [—নিত্য লীলা যোগ—Identity of the Absolute or the universel Ego and the phenomenal world—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ)।

---

(১৪) দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—'পরিচয়' পত্রে রাসলীলা প্রবন্ধ, ১৩৪৩। শ্রাবণ।

(১৫) দার্শনিক আণ্ডারহিলস্ বলেন—"The expression of mystic is inexpressible...hence the enormous part which is played in all mystical writings by symbolism and imagery."

দার্শনিক উপেনৃসিক্ বলেন—"Mystical sensations are sensations of the same category as sensations of love, only infinitely higher.

যে ফুল না ফুটিতে

শ্রীসুনীলকুমার বসু

আমার ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সময়ে নিজের চির-পরিচিত চেহারাখানা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু যৌবনের, এমন কি প্রৌঢ়ত্বের, একটা পলাতক চিহ্নও সেখানে দেখ্‌তে পাইনি। বয়স নামক যে একটা না-ধরা না-ছোঁয়া বস্তুর দ্বারা মানুষ নিজের জীবনের পরিমাপ করতে যায় সেটা একেবারেই ফাঁকি। কারণ বয়স হিসাবে আমাকে বৃদ্ধ বলা চলে না, এইটুকু বলা চলে যে আমি বৃদ্ধত্বের কোঠায় এসে পৌঁছেচি। অথচ দেহে আমার বার্দ্ধক্যের হিম শীতল স্তব্ধতা, মনে আমার জরা। আর মনে আমি বোধহয় কোন দিনই যুবক ছিলাম না, অন্তত যেদিন অমিয়ার বিয়ে হয়ে গেল, সেদিন থেকে মানসিক যৌবন অনুভব করেছি বলে বোধহয় না। সে যেন আমার মনটাকে চিরদিনের মত স্থবির করে দিয়ে গেছে। এই ভাঙা মন নিয়ে সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর পথটা অতিক্রম করে আসছি। মরুভূমির মত ধূ ধূ করা রুক্ষ সেই পথ, সেখানে না পেয়েছি স্নিগ্ধছায়া, না পেয়েছি বিশ্রামের স্থান। রৌদ্রতপ্ত কুঞ্চিত কপালে স্নেহ-হস্তের স্পর্শ পাই নি কখনও। তবু এক মুহূর্ত্তের জন্তেও নিজেকে অসহায় বোধ করেছি বলে মনে পড়েনা। কিন্তু যেদিন প্রৌঢ়ত্বের সীমা শেষে এসে দাঁড়ালাম, সেদিন হঠাৎ কিসের যেন অজানা আতঙ্কে মনটা শিউরে উঠ্‌ল। সেদিন প্রথম জান্‌লাম, এই বিরাট পৃথিবীতে আমি নিঃসম্বল, একা,—আর সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের বিবাগী মন আমার ছোটখাটো ভোগ-সুখের জন্ম উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। দিন যে আমার ফুরিয়ে এসেছে, এই কথাটা আকাশ, বাতাস, ফুল, সুন্দরী তরুণীরা একযোগে চক্রান্ত করে প্রতিনিয়ত জানিয়ে দিতে লাগ্‌ল। তাই এতদিন দু'হাতে পাথের ক্ষয় করতে করতে পথের শেষে এসে হঠাৎ নিজের উপরে যেন মায়া জন্মে গেল।

ট্রেতে করে চা' নিয়ে এল উদাসী। টেবিলের উপর নীচু হয়ে চা'য়ের সরঞ্জামগুলো নামিয়ে রেখে ও বল্লে, বুড়োবাবু, আপনার চা' দিয়েছি।

উদাসী আমাকে বুড়োবাবু বলে ডাকে। ওর ঐ ছোট্ট

ডাকটুকুর ভিতর দিয়ে যেন একটা বিরাট ইঙ্গিত আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। ও আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

বল্লাম, হাঁরে উদাসী, তোর মায়ের জ্বরটা কমে গেছে?

মাথা নীচু করে ও বল্লে, হ্যাঁ।

উদাসী জানে না যে ওকে আশ্রয় করেই আমার ছন্নছাড়া জীবনের বাকি কয়েকটা দিন পাড়ি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। ভবিষ্যত সম্বন্ধে যখন ক্রমাগত হতাশ হয়ে পড়ছিলাম, তখন হঠাৎ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত জুটে গেল উদাসী আর তার মা। ভেঙে পড়া মনটা আমার ওদের জড়িয়ে ধরে আবার সতেজ হয়ে উঠ্‌ল।

উদাসী দিনরাত আমার সেবাতেই ব্যস্ত থাকে। আমার লক্ষ্যহীন জীবনের খামখেয়ালি রুটিন, সেখানে না আছে কোন নিয়ম, না আছে শৃঙ্খলা। অথচ প্রতিমুহূর্ত্তের অপ্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্যটুকু উদাসী নিজের হাতেই রচনা করে, যা'তে দুরন্ত খামখেয়ালিপনার মধ্যেও কোন অভাব আমাকে অনুভব করতে না হয়। স্নানের ঘরে জল, খাবার টেবিলে এসে দেখি খাবার সাজানো রয়েছে, হাত বাড়ালেই পান ও সিগারেট পেয়ে যাই। যেন এক অদৃশ্য ভৌতিক শক্তি যথানিয়মে সব কিছু সুন্দর-ভাবে গুছিয়ে রেখে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বয়সে এ স্বাচ্ছন্দ্য কম লোভনীয় নয়।

পড়ার ঘরে, ঠিক উত্তরের দিকটায় আমি বসি। টেবিলে বই খোলাই থাকে; পড়ি না, কারণ ঐ কাজটি এতদিন ধরে অনেক পরিমাণে করে আসছি, কিন্তু মস্তিষ্ক-দাহ ছাড়া অন্য কিছু লাভ করেছি বলে মনে পড়ে না। পড়ার অজুহাতে মনকে ফাঁকি দিই। আজ শুধু ভাবতে ভাল লাগে।

অভ্যস্ত আসনে বসে আছি। রাস্তার এধারটায় একটুকরো মাঠের উপর ছেলেরা খেলা করছে। ওধারে বিনোদ মুদির দোকানে নিয়মিত বেচা কেনা চলছে। ঘরের ভিতর লঘু পদশব্দ শোনা গেল, এত লঘু যে অভ্যস্ত কান ছাড়া শুনতে পায় না। বুঝলাম, এক ছায়া মূর্ত্তি প্রবেশ করেছে ঘরে, যাকে ছোঁয়া যায় না, অনুভব করা চলে। আমি মুখ না ফিরিয়েই বল্লাম, কিরে উদাসী?

ও বল্লে, আপনার আজ বাইরে যাবার কথা ছিল, তাই মনে করিয়ে দিতে এলাম।

আমি বল্লাম, আজ আর বেরুব না, বড় ক্লান্ত।

এমনি আরও একদিনের কথা মনে পড়ল। সেদিনও ঠিক এইখানে বসেছিলাম, মাঠে ছেলেরা খেলা করছিল। হঠাৎ একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে আমার শূন্যপথচারী মন মর্ত্ত্যে নেমে এল। দেখ্‌লাম বিনোদমুদির দোকানে একটা হল্লা সুরু হয়েছে। বিনোদ চীৎকার করে কি যেন বলছে, আর একটা কিশোরী মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করছে। মেয়েটির এক হাত বিনোদের হাতের মধ্যে নিষ্পেষিত, আর একহাতে একটা দীর্ঘ বোতল। ধ্বস্তাধ্বস্তির মাঝে তার সঙ্কীর্ণ কাপড়খানা কোন মতেই আর টাল সাম্‌লাতে পারছে না। সবই দেখ্‌লাম অথচ মনে কোন দাগ পড়ল না। পরে জানতে পেরেছিলাম, লবণ চুরির অভিযোগে বিনোদ ওকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছিল।

মেয়েটিকে আমি চিনতাম, আমার ড্রাইভার ললিতের মুখে শুনেছি, ওর নাম উদাসী, মাঠের ওধারে ঐ ভাঙা খোলার ঘর থেকে ও বোতল হাতে করে বেরিয়ে আসে এবং অতি সন্তর্পণে বিনোদমুদির দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। ওর পরণে থাকে একখানা তালিময় জীর্ণ কাপড়—যা' ওর নব-জাগরিত কৈশোরকে অসুন্দর দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। ওর মুখে, চলা ফেরায় একটা যেন সঙ্কোচ জড়ানো থাকে, দুনিয়ার সবারই কাছে ও যেন অপরাধী। ও মেয়ে যে চুরি করতে পারে, এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না।

বিনোদের দোকানে সবারই বেচা কেনা শেষ হয়, কিন্তু কেন জানি না, এতটুকু তেল আর অল্প একটু লবণের জন্য ওকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বিনোদ আর তার—মামাতো ভাই সিধু সন্দেহজনকভাবে ওর দিকে চেয়ে হাসে। ওকে কখনও হাস্‌তে দেখিনি। ও যখন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তখন একটা সোরগোল ওঠে এবং বিনোদ, কিশোরী পানওয়ালা, আর জোনাব মিস্ত্রীর মধ্যে কি যেন একটা চটুল বার্ত্তা তড়িত প্রবাহের মত ইসারায় খেলে যায়।

পাড়ায় আমার বদান্যতার খ্যাতি ছিল, কেউ বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে এলে আমি কিছু অর্থ দিয়ে তাকে বিদায় করতাম। মুখের কথা আমার কাছে অর্থের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয়। ও বস্তু আমি কারো জন্যেই খরচ করি না, আর কার জন্যেই যে করব তাও বলা কঠিন। অর্থ আমার প্রচুর আছে, সারাজীবনের এই একমাত্র নিত্য সঞ্চয়ের উপর আমার মোহ একেবারেই নেই।

হ্যাঁ, যা' বলছিলাম। অনেকদিন কেটে গেছে, কতদিন তা মনে নেই। সন্ধ্যার একটু আগে ঠিক এইখানেই বসে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। মনটা উদাস, সন্ধ্যার ধূসর মাধুরিমা বহু-দিনের ওপার থেকে একটা পলাতক, পরাজিত স্মৃতির রেশ টেনে আন্‌ছিল বার বার। ভৃত্য সুধীর এসে জানাল, উদাসীর মা উদাসীকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। বিরক্ত হয়ে বল্লাম, আমার কাছে তাদের কি দরকার? বলে দে, দেখা হবে না।

সুধীর দ্বিধাগ্রস্তভাবে বল্লে, আজ্ঞে বড় কাঁদাকাটি করছে—।

আমি বল্লাম, তার আমি কি করব। বলে দে, আমার সঙ্গে দেখা হবে না। সুধীর চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর কি কারণে দরজার দিকে নজর পড়তেই দেখ্‌লাম কপাটে হেলান দিয়ে অতি সন্তর্পণে, অত্যন্ত লজ্জায় অপরাধিনীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে উদাসী। খুব বিরক্ত হবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনটা দেখ্‌লাম নরম হয়ে এসেছে। আজ উদাসী আমার অত্যন্ত কাছে রয়েছে, সেই দ্বিধাগ্রস্ত মেয়েটি, বিনোদের দোকানে যাকে প্রায়ই দেখ্‌তে পাই। দেখ্‌লাম ও আজকাল বেশ বড় হয়েছে। ওর পরণের কাপড়খানির দৈন্য দেখে মনে ব্যথা পেলাম। দরজার ওধার থেকে একটা দোদুল্যমান ঘোমটার খানিকটা অংশ দেখা গেল।

বড় কষ্টে পড়ে আপনার কাছে এসেছি বাবু, এ মেয়েটি ছাড়া আমার এ জগতে আর কেউ নেই।

মনে হ'ল এ সেই গতানুগতিক ভূমিকা যার একমাত্র লক্ষ্য কিছু অর্থলাভ। আমার অজ্ঞাতসারেই মণিব্যাগের দিকে আমার ডান হাতটা এগিয়ে গেছে।

আমরা ছোটলোক নই। কি করব বাবু, অদৃষ্ট খারাপ, তাই এই দুরবস্থা। মাঠের ওধারে ঐ খোলার ঘরটায় আমরা থাকি।

হঠাৎ মনে হ'ল এ কণ্ঠস্বর নিতান্ত বস্তিবাসীর নয়। অভয় দিয়ে বল্লাম, বল, কি বলতে চাও।

উদাসীর মা বলতে সুরু করলে—তার দুঃখের সকরুণ ইতিহাস। অনুভব করলাম, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ সে রোধ করতে পারছে না। উদাসী একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইল, দেখলাম তারও বড় বড় চোখ দুটি উদ্গত অশ্রুতে ভরে গেছে।

আঁচলে চোখ মুছে উদাসীর মা যা বল্লে, তার সারাংশ হচ্ছে এই যে—বছর চারেক আগে উদাসীর বাবা মারা যাবার পর থেকে বিনোদ মুদির ঐ খোলার ঘরখানিতে উদাসীকে নিয়ে সে থাকে, আর দাসীবৃত্তির দ্বারা জীবিকা সংস্থান করে। প্রথম প্রথম বিনোদ ভাল ব্যবহারই করত। ভাড়া বাকি পড়লে রাগ করত না এবং ধারে জিনিষ দিত। ক্রমে তার মতলবটা বোঝা যেতে লাগল। উদাসীকে দেখলেই সপারিষদ বিনোদ তার সাথে অসভ্য ইয়ারকি করত। এর পর উদাসীর মা আর উদাসীকে বিশেষ বাইরে বেরুতে দিত না, নিজেই বাইরের কাজ সেরে ফেরার পথে জিনিষপত্র কিনে আনত। এর ফলও বিশেষ ভাল হল না। কারণ, বিনোদ, কিশোর, জোনাব প্রভৃতি সকলে মিলিত হয়ে ওদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হল্লা করত। হঠাৎ একদা বিনোদ তার হিসেবপত্তর নিয়ে এসে দেখিয়ে গেল যে বাড়ী ভাড়া এবং দোকানের দেনা মিলিয়ে সে উদাসীর মায়ের কাছে প্রায় পঞ্চাশ টাকা পাবে এবং এও সে জানাতে ভুলল না যে যদি তার সাথে উদাসীর বিয়ে দেওয়া হয় তবে সে ঐ টাকার দাবী ছেড়ে দিতে পারে। উদাসীর মা রাজি না হওয়ায় গত পরশু রাত্রে বিনোদ ও জোনাব মাতাল হয়ে এসে তাকে আচ্ছা করে শাসিয়ে গেছে।

মনোযোগ দিয়ে শোনবার পর জিজ্ঞাসা করলাম, আমি তোমাদের কি সাহায্য করতে পারি? তুমি বরং বিনোদের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দাও না।

উদাসীর মা বলল, বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে আমি দিতে পারব না বাবু। ও মাতাল, লম্পট, এর আগে ও তিনবার বিয়ে করেছিল। দুটি বউকে ও নিজেই মেরে ফেলেছে, আর একটি বউ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছে। লতার মা ঝিয়ের কাছে শুনেছি আপনার বড় দয়া, তাই আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি ওকে না বাঁচান তবে ওরা জোর করে ওকে ধরে নিয়ে যাবে। যা' উদাসী, যা' মা, বাবুর পায়ে ধর গিয়ে। আপনার পায়েই এই বাপ-মরা মেয়েটাকে দিলাম।

অসহায় সন্ত্রস্ত মেয়েটি একটু এগিয়ে এল, বেশী এগোতে হয়ত সাহস করল না। আমি বল্লাম, থাক্, থাক্, আর আসতে হবে না।

কিছুক্ষণ আনমনে কি যেন ভাব্লাম, তার পর হঠাৎ বলে ফেল্লাম, দেখ উদাসীর মা, তোমার বড় বিপদ তা' বুঝতে পারছি, কিন্তু তোমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয়। তোমরা ও বাড়ী ছেড়ে এসে আমার বাড়ীতেই থাক না কেন? আমারও ত' লোক দরকার! পাঁচ বাড়ীতে কাজ করার চেয়ে এক বাড়ীতে করাই ত' ভাল।

উদাসীর মা বোধ হয় প্রথমটা বুঝতে পারল না, উদাসী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমি বল্লাম, মাইনে তোমরা দুজনেই পাবে, আর থাক্‌বার একটা ঘরও দেব তোমাদের। আমার বাড়ীতেই তোমরা কাজ কর। বুড়ো বয়সে একটু সেবার আমার দরকার, তোমার মেয়েটি বোধ হয় সে ভার নিতে পারবে।

উদাসী একবার আমার দিকে চেয়ে মাথা নীচু করে রইল। উদাসীর মা' কল্পনাও করতে পারে নি যে আমি এতটা উদারতা এবং দরদ দেখাব। প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সাম্‌লে নিয়ে সে নিজেই এসে আমার টকিং মোড়া পা' জড়িয়ে ধরল এবং অজস্র চোখের জলে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ জানিয়ে দিল।

সেই থেকে ওরা আমার আশ্রয়েই আছে। বিনোদের দোকানে সমানভাবে হল্লা চলে। ওরা নাকি আমার দুর্নামও রটাচ্ছে। কিন্তু আমি একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ, সুতরাং বিশেষ সুবিধা করে উঠ্‌তে পারছে না। উদাসীর মা'র দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। উদাসী আজ তরুণী। জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা ওকে একটা শান্ত মহিমায় অভিষিক্ত করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু যৌবনের উচ্ছসিত চাপল্য ও চেপে রাখতে পারে না। চলা-ফেরায় ওর ফেনিল উচ্ছলতা ঠিক্‌রে পড়তে চায়, কথাবার্ত্তায় ওর স্বাভাবিক স্তব্ধতা যেন কি রঙীণ ইঙ্গিতের ভারে ফেটে পড়তে চায়। একখানা লাল রঙের শাড়ী পরে ও যখন সারা বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় তখন বুঝি এই জরাগ্রস্থ বৃদ্ধের চোখেও আগুন লেগে যায়। বিধাতার কোন দুর্জ্জ্যের চক্রান্ত-প্রসূত তপভঙ্গ দূতের মত এই বৃদ্ধের কৌমার্য্যসাধনা বুঝি ভেঙে দিতে চায়!

এ বয়সে শরীরটা আর না মানে শাসন, না মানে সংস্কার। কথায় কথায় এমন বেঁকে বসে যে তাকে সোজা করা হয়ে পড়ে কঠিন। সেদিনও শরীরটা বড় খামখেয়ালিপনা সুরু করল, সকালে উঠেই অনুভব করলাম শ্লেষ্মা আর গায়ে ব্যথা। উদাসী গলায় কম্ফর্টার বেঁধে দিয়ে গেল। ও বল্লে, আপনার কি অসুখ করেছে বুড়োবাবু?

বল্লাম, হ্যাঁ, রে। ভাত খাব না, তোর মাকে বলিস্। উদাসীর ব্যবহারে একটা আন্তরিকতার ছোঁয়াচ পাই। ওর শাসনাধীনে এসে বাড়ীটার যেন শ্রী খুলে গেছে। ওর ব্যবহারে সব কিছুই সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। পড়ার টেবিলে বইগুলো অগোছাল হয়ে থাকে না, বারান্দায় কোন অনাবশ্যক কাগজের টুকরো জড় হয় না, বিছানা সব সময় সুন্দরভাবে পাতা থাকে। ফাঁকি দিতে গিয়ে সুধীর বেচারা উদাসীর কাছে ধমক খেয়ে মরে।

সারাটা দিন শরীর খারাপই ছিল। পরদিন সকালে উঠে একটু সুস্থ বোধ করছি, এমন সময় দরজার আড়ালে দেখা দিলেন উদাসীর মা। অনেকদিন থেকে একটা কথা বলব মনে করি, কিন্তু তা' আর বলাই হয় না বাবু, বলতে বড় ভয় হয়।

আমি বল্লাম, তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার কি বলার আছে।

আপনি রাগ করবেন না বাবু। আশ্রয় দিয়ে আপনি বাঁচিয়েছেন, নইলে যে কি হ'ত তা' ভগবানই জানেন। আমি চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব, কিন্তু মেয়েটাকে ত' আর রাখা যায় না। ও যে ষোল ছাড়িয়ে সতেরয় পড়ল।

হঠাৎ যেন একটা রূঢ় ধাক্কায় নূতন করে সচেতন হয়ে উঠ্‌লাম উদাসীর সম্বন্ধে। ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, ওর আবার কি ব্যবস্থা, ও ত' বেশ আছে এখানে।

উদাসীর মা বোধহয় আমার মনের ভাব্‌টা অনুমান করল। তারপর অনেক দ্বিধা ও সংগ্রামের সাথে দ্বন্দ্ব করতে করতে বল্‌ল, এই বলছিলাম যে ওর একটা বিয়ে—। একটা ছেলেও ঠিক করেছি। প্রেসে কাজ করে। এখন আপনার মতটা—

বিরক্ত হয়ে বল্লাম, আচ্ছা এখন যাও। আমার মনটাকে নিঙ্‌ড়ে কে যেন সব রসটুকু বের করে নিল। উদাসীর এই প্রাণ-ঢালা স্নেহ ও সেবা থেকে চিরদিনের মত আমাকে বঞ্চিত হতে হবে। চোখের সামনে ভবিষ্যতের ধূসর চিত্র একবার ছায়ার মত কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। উদাসীকে আট্‌কে রাখ্‌বার অধিকার আমার নেই, অথচ আমার গৃহে অবিসংবাদিত কর্ত্রীরূপে তাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কিন্তু উদাসীকে বঞ্চিত করে নিজেকে সার্থক করবার কোন উপায় নেই। সুন্দর প্রভাতটা যেন মরে গেল। পৃথিবীর সব কিছু হয়ে গেল তিক্ত, বিস্বাদ, এমন কি টোষ্টগুলোও। আকাশের সৌন্দর্য্যটা একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড বিশেষ। আমার জীবনের সাথে ও পাল্লা দিয়ে চলেছে, ওরও মৃত্যু নেই, আমারও না।

টোষ্ট্‌গুলো খান নি যে বুড়ো বাবু? ভাল হয় নি বুঝি? আমি করেছিলাম।

ও তাই নাকি? বলে আমি একটা টোষ্ট মুখে তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে উদাসী বল্‌ল, আপনার শরীর কি আজও খারাপ লাগছে?

মাত্র কয়েকটি কথা অথচ যেন ওর থেকে মধু ঝরে পড়ে। বঞ্চিতের সামনে সমৃদ্ধির ভাণ্ডার—আবার লোভ হয়। ডাক্‌লাম, উদাসী! ও জড়সড় হয়ে কাছে এল। বল্লাম, আচ্ছা, এখন যা'—

সারাদিন ভেবে ভেবে কাট্‌ল। কখন যে চান করেছি, কখন খেয়েছি, কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে উদাসীকে। হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। সোজা হয়ে বসে ডাক্‌লাম উদাসীর মাকে। সে এসে বল্লে, বাবু ডেকেছেন?

হ্যাঁ শোন, উদাসীর বিয়ের কথাটা ভেবে দেখ্‌লাম। ও চলে গেলে আমার বড় অসুবিধা হবে।

সে কথা আমি ভেবেছি বাবু। যদি চিরকালের মত ওকে আপনার পায়ে রাখ্‌তে পারতাম,—কিন্তু—

আমি বল্লাম, দেখ, একটা কাজ করলে হয় না? আমি যদি উদাসীকে বিয়ে করি তাহলে কেমন হয়?

সে কি কথা বাবু! আপনি কি বলছেন! আমি নিজের কানকে যে বিশ্বাস করতে পারছি না, উল্লসিত হয়ে ওঠে উদাসীর মা!

বিশ্বাস করা একটু কঠিন। তবু তোমার মেয়েকে আমি ঠিকই বিয়ে করব। কিন্তু সে যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে। আমার বাড়ীর কর্ত্রী হবে সে। আর কিছু নয়। মনে হ'ল, কথাটা বোধহয় একটু স্বার্থপরের মত শোনাচ্ছে।

উদাসীর মা আমার কথা বুঝল কিনা জানি না। কিন্তু তার আনন্দের দীপ্তি হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভাব্‌বার পর সে চলে গেল। লজ্জায় উদাসী সেদিন আর আমার সামনে এল না, চা' দিয়ে গেল সুধীর।

একদা এক শুভলগ্নে উদাসীকে আমি বধূরূপে গ্রহণ করলাম। উৎসব নেই, আলো নেই, আনন্দও কিছু বিশেষ ছিল না। একটা বিষণ্ণ রাত্রি। শুধু মন্ত্রোচ্চারণ আর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। উদাসীর মা, এমন কি উদাসীও একটু আহত হয়েছিল। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে আমি কি শেষে ঘটা করে বিয়ে করব? আমি চাই আমার সেবাকার্য্যে উদাসীকে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত করতে, এর জন্যে যে শাস্ত্রীয় ব্যাপারটুকু অপরিহার্য্য, তার আমি ত্রুটি করিনি। কিন্তু জীবনের উৎসব যার শেষ হয়ে গেছে, আজ সে কি কৃত্রিম আনন্দে মাত্‌বে? বাসরঘর থেকে উদাসীকে উঠিয়ে পাঠিয়ে দিলাম তার মায়ের কাছে।

বিয়ে হয়ে গেল। এতবড় একটা ব্যাপার, এতবড় একটা বিপ্লব—আমার জীবনে না হলেও অন্ততঃ উদাসীর জীবনে—এর কোন প্রতিধ্বনিই জাগল না। সংসার যাত্রা যেমন চলছিল তেমনিই চলল। উদাসীর মনে যে কোন দাগ পড়েছে, বাইরের থেকে তা' বোঝাই যায় না, হয়ত সে দাগ পড়েছে অন্তরের মণিকোঠার কোন্ গোপন কক্ষের দেয়ালে। রাত্রে আমার বিছানা পেতে মশারি গুঁজে দিয়ে সে বলে, আমি যাই?

ওর এই অনাড়ম্বর সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটির মধ্যে এক প্রকাশহীন বেদনা গুমরে কেঁদে মরে, তা বুঝতে পারি। আমার ঘরের একটি কোণে সারারাত্রি কাটিয়ে দিতে পারলে ও সৌভাগ্য মনে করে। আমার ঘর ওর স্বপ্ন, আমার শয্যা ওর দুরাশা।

গৃহিণীত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ও নিজের আচরণ থেকে দ্বিধা ও সঙ্কোচের শেষ রেশটুকুও ঝেড়ে মুছে ফেলেছে। সারাদিন ওর এক মুহূর্ত্তও অবসর থাকে না, এত বড় সংসারটার তদারক করতে হবে ত'! চাকর বাকর ওর ভয়ে সন্ত্রস্ত, কোথাও কারো একটুখানি খুঁত হবার উপায় নেই। জিনিষপত্র যাতে নষ্ট না হয় বা চুরি না যায়—সেদিকে তার কড়া নজর। অবশ্য তার সবচেয়ে কড়া নজর আমার উপর। আমি একটা বিরাট বিগড়ে যাওয়া এঞ্জিন বিশেষ—আমাকে সুস্থ রাখা ঠিক মত পরিচালনা করা, এসব ত' তাকেই করতে হয়। শাসনটা তার খুবই কড়া। আমি একেবারে ওর হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছি। ও এসে বলে, বুড়োবাবু, আপনার চানের সময় হয়েছে, এইবার বই রেখে উঠুন। আমি বলি, একটু পরে আসছি, তুই যা'। ও গভীর আপত্তি করে বলে, না, না, তা' হবে না। ডাক্তার কি বলে গেছেন মনে নেই? সময়ে খাওয়া আর সময়ে শোওয়া। আমি একটু হেসে বই ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। অন্তরের অধিকার থেকে যাকে বঞ্চিত করেছি—বাইরের অধিকারটুকুও তার কাছ থেকে কেড়ে রাখব, এ সাধ্য আমার নেই। উদাসীর কথামতই উঠি, বসি, খাই, চলি। সংসার করার নেশায় মাতাল হয়ে ওঠেও। গৃহিণীত্বের ফাঁকি-দিয়ে হৃদয়ের বিরাট ফাঁকটা ভরিয়ে নিতে চায়, ওর মায়ের মুখে কিন্তু হাসি নেই।

সর্দ্দি আর জ্বর লেগেই আছে। বড় বড় ডাক্তার আসেন, প্রেস্ক্রপশন করেন, ফিজ্ নেন এবং চলে যান। আমার অসুখ কমে কিন্তু সারে না। চিকিৎসকগণ জানেন না, আমি জানি, আমার অসুখ সর্দ্দি বা ব্রঙ্কাইটিস্ নয়, বার্দ্ধক্য, এর ওষুধ মৃত্যু। উদাসী আরও কাছে এসে পড়ে। আমার ওষুধ পথ্য ও সেবার ভার ত' তার হাতে। আমার জরাজীর্ণ জীবনটাই ত' তার হাতে।

দিনরাত শুয়েই থাকি, সর্দ্দিটা ক্রমে যেন বেড়ে চলেছে। আজ সকাল থেকে জ্বরটাও যেন জোয়াল হয়ে উঠল। উদাসী এসে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন আজ?

বল্লাম, জ্বরটা বোধহয় বেড়েছে। কপালে হাত দিয়ে দেখত।

এ অধিকার ওকে এই প্রথম দিলাম। আঃ কি ঠাণ্ডা, কি নরম ওর হাতখানা, আমার রোগতপ্ত কপাল যেন চন্দনের স্পর্শে জুড়িয়ে গেল। উদাসীর চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠ্‌ল, বল্লে, ওমা, কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ বলেন নি কেন। কি সর্ব্বনাশ! ডাক্তারকে এখুনি খবর দিতে হবে যে!

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, বল্লাম, তাই দে। আর বুকের ভিতরে একটা ব্যথাও বোধ করছি।

ডাক্তার এলেন। পরীক্ষায় জানা গেল আমার নিউমোনিয়া হয়েছে, একটা লাঙ্গ আক্রান্ত, সুতরাং ভয় নেই, তবে ভরসাও নেই। অতএব সাবধানে থাকা দরকার। এতদিন উদাসী ছিল সারা বাড়ীখানার হয়ে, আজ সে আমার শোবার ঘরটুকু নিয়ে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে একেবারে বদ্‌লে গেল। ডাক্তারের কাছে যা' যা' করতে হবে সব জেনে নিয়ে এই মুমূর্ষু জীবটাকে বাঁচাতে সে উঠে পড়ে লেগে গেল। উদাসীর মা ম্লান মুখে এসে দাঁড়ান, বোধহয় আমার সেবা করতেই, উদাসী তাকে কাছে ঘেঁষতে দিল না। আমার উপর অধিকার আজ তার একার। আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ওষুধ পথ্য খাওয়ান, টেম্পারেচার রাখা, মালিশ করা, মাথায় হাত দেওয়া—ইত্যাদি কাজ সে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে করতে লাগল। আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়েই থেকেছি। কিন্তু যখনই জ্ঞান হয়েছে তখনই দেখেছি আমার তপ্ত শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বাসভরা মুখে সেবার প্রতিমূর্ত্তি। ওকে দেখলে যেন নূতন প্রেরণা আসে, অতীতের ইতিহাসটা একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে জীবনের পাতায় আবার নূতন করে রেখাপাত করতে ইচ্ছা হয়। ওকে কতবার বসতে বলেছি আমার বিছানার পাশে, বসেনি ও সমানে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

পরদিন ডাক্তার এসে বল্লেন একজন নার্স রাখতে হবে, ডাক্তার চলে গেলে উদাসী তার স্বাভাবিক দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিল যে মরে গেলেও সে আমাকে নার্সের হাতে তুলে দিতে পারবে না। মনে ভাবলাম, জীবনটা যখন ওর হাতেই তুলে দিয়েছি তখন ও যা' করবে তাই হবে। সমানভাবে চলল সেবা, অর্থাৎ উদাসীর আত্মবলিদান। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, দিন রাত সে আমার পাশে। পরে শুনেছি, আমার অসুখের সময় উদাসী দুপুরে মাত্র একবার দুটি ভাত খেত। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এত কষ্ট ওর সইবে কি? ঐ সুকোমল দেহখানা কি এই অনাহার অনিদ্রার ভার বইতে পারবে? ওকে ওর শরীর সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে যেতাম। ও আমাকে কথা বলতে দিত না।

এইভাবে ভীষণ উদ্বেগের ভিতর দিয়ে কয়েক দিন কেটে গেল, আমি ক্রমে ভাল হয়ে উঠতে লাগলাম। কিন্তু উদাসীর যত্ন ও সাবধানতা একটুও কম্‌ল না। এখন নাকি ঐ দুটি বস্তুর আরও দরকার, ডাক্তার বলেছেন। স্নেহার্ত্ত পাখীর মত ও আমাকে দুটি পক্ষচ্ছায়ায় ঢেকে রাখল, গায়ে আর একটুও আঁচ লাগতে দিল না। রাত্রে ওকে ওর মায়ের ঘরে গিয়ে শুতে বলি, ও শোনে না, সুধীর হতভাগার উপর আমার ভার দিয়ে এক রাত্রির জন্যেও নাকি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। আমার ঘরের মেজেতেই সে নিজের বিছানা পাতে, অবশ্য শোবার জন্যে নয়, আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। কারণ, সে শোয় না, আমি জানি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে জেগে রাত কাটায়। কয়েক দিনের মধ্যে অন্নপথ্য করে আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

হঠাৎ এক প্রভাতে সুধীর আমার চা নিয়ে এসে হাজির। উদাসীর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে। কুসংস্কার মানি না, তবু হঠাৎ মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে গেল। খানিক পরে আস্তে আস্তে নীচে গেলাম। ওদের ঘরে ঢুকতেই উদাসী বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসল। শাসন করবার মনটা তার তেমনই আছে। বল্ল, একি! আপনি নীচে নেমে এসেছেন? ডাক্তার না আপনাকে চলাফেরা করতে বারণ করেছেন? যান এখুনই উপরে চলে যান, নইলে আবার শরীর খারাপ হবে।

একটা ম্লান হাসি ওর মুখে, সে হাসি ওর বুকজোড়া তৃপ্তির বার্ত্তা এনে দিচ্ছিল। বল্লাম, তোর অসুখ করেছে শুনে দেখতে এলাম।

ও ছোট্ট মেয়েটির মত উজ্জ্বল হয়ে উঠে বললে, কিছু হয় নি আমার, কোন অসুখই হয়নি। আপনি আমার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হবেন না। ওপরে যা'ন আর সাবধানে থাকুন গিয়ে। আমি আজ বিকেলে আপনার চা' দেব।

ওর কপালে হাত দিতেই মনে হ'ল, সামান্য অসুখ এ নয়। বল্লাম, তোর যে জ্বর হয়েছে—উদাসী, আর তুই বলছিস্ কিছুই হয় নি। যাই, আমি এখনই ডাক্তারকে আনতে পাঠাই।

ওর মা' কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে উদাসী বল্লে, না, না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, আমার কিছু হয় নি। সামান্য একটু জ্বর, দু'একদিনেই সেরে যাবে। ডাক্তার কিছুতেই ডাকবেন না। আর আপনি যান, ঠাণ্ডা লাগাবেন না, বলে ও দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল। আমি হতভম্বের মত চলে এলাম।

বিকালে চা নিয়ে এল সুধীর। উদাসীর জ্বর বেড়েছে। চা' হয়ে গেল বিস্বাদ। ডাক্তার এলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বল্লেন, বোঝা যাচ্ছে না। পরদিন সকালে আবার তিনি এলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। জ্বর এদিকে বেড়েই চলে। আমি বার বার নীচে যেতে পারি না। তাই ষ্ট্রেচারে করে উদাসীকে ওপরে আনালাম এবং সসম্মানে তাকে স্থান দিলাম আমার বিছানায়। আমি আশ্রয় নিলাম আমার পড়ার ঘরে। একটা নার্স নিযুক্ত করলাম। উদাসীর রক্ত পরীক্ষা করা হ'ল। কয়েক দিন পরে ডাক্তার গম্ভীর মুখে জানিয়ে গেলেন, টাইফয়েড্।

সেবা নিতে পারি কিন্তু দিতে পারি না। রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কিন্তু সেবা করতে পারি না। অথচ, আমার খুব ইচ্ছা হয়, তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই, তাকে একটু হাওয়া করি, কোন উপায়ে তার কষ্টের

একটু উপশম করি। জখম হয়ে যাওয়া দেহখানা নিয়ে বার বার ছুটে আসি তার কাছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারি না। উদাসী কি ভাবে কে জানে। জ্বর ওর আজ ক'দিন থেকে খুব বেশীই। মাঝে মাঝে যখন জ্ঞান হয় তখন যেন চারিদিকে চোখ মেলে কাকে ও খোঁজে। আমাকে দেখলে অদ্ভুত ব্যথাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আমার দিকে। বুঝি না, সে দৃষ্টির অর্থ অভিমান, না নিষ্ফলতা। কখন মনে হয় ও বুঝি আমার কাছে প্রতিদান চায় ওর সেবার, কিন্তু তাও ত' নয়। কারণ ও বলে, আপনি আমার কাছে মোটেই আসবেন না। আমি যদি বলি, কেন? ও বলে, রুগীর কাছে বেশী আস্‌তে নেই। আর তাছাড়া আপনিও ত' রুগী। খুব সাবধানে থাকবেন। আমি ত' আর দেখতে শুনতে পারি না।

আর একদিন, তখন নার্স ছিল না, ও বল্লে, আপনি আমাকে এ ঘরে আনলেন কেন? নীচেয় ত' বেশ ছিলাম?

বল্লাম, নীচের থাকলে আমি তোর দেখাশোনা করতে পারতাম না, তাই। ও আঁচলে মুখ ঢাক্‌লে। কিছুক্ষণ পরে ও আবার বল্লে, আমার জন্যে এত টাকা খরচ করছেন কেন? এত ওষুধ, ডাক্তার—এ সবের দরকার কি? না হয় নাই বাঁচ্‌ব।

আমি বল্লাম, এতদিন অন্ধের মত লক্ষ্যহীন হয়ে যে টাকা জমিয়েছে, আজ তা খরচ করার শুভ লগ্ন এসেছে।

ও বোধ হয় বুঝতে পারল না, ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লাম, তুই সেরে উঠলে তোকে চেঞ্জে নিয়ে যাব।

ও বল্লে, কোথায় নিয়ে যাবেন? এ প্রশ্ন যেন অসহায়, নির্ভরশীল, শিশুর প্রশ্ন।

আমি বল্লাম, তুই যেখানে যেতে চাস।

ও বল্লে, আমি ত' কোন ভাল জায়গার নাম জানি না। আপনি বলুন।

আমি বল্লাম, তোকে পুরীতে নিয়ে যাব, সমুদ্রের ধারে। একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার দীপ্তি জেগে উঠ্‌ল ওর চোখে। একটু পরে ও আবার বল্লে, আচ্ছা আমার অসুখ সারবে ত? আমার নাকি টাইফ—

দূর কে বলেছে! তোর সাধারণ জ্বর ছাড়া আর কিছু নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। নিশ্চিন্ত মনে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

এর কয়েক দিন পর থেকে উদাসীর অবস্থাটা ক্রমে গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে লাগল। ডাক্তার আর ওষুধের কোন বিরাম নেই। রোগ তবু কমে না। ওকে আজকাল বেশ দেখায়। মুখখানা শীর্ণ, চোখে দীপ্তি নেই, তবু বেশ দেখায়। একফালি শীর্ণ একাদশীর চাঁদের মত। মরা জ্যোৎস্নার মত একটা অমর, অপরাজেয় মলিন সৌন্দর্য্য ওর মুখখানা ছেয়ে থাকে। চোখ মেলে ও ওর মাকে বলে, জানো মা, অসুখ সারলে আমরা চেঞ্জে যাব। জেগেও ঐ কথা, জ্বরের ঘোরেও ঐ। এইভাবে কয়েকটা দিন কাটল। উদাসীর মা উদাসীর পাশে বসে থাকে, চোখ দিয়ে তার বেয়ে পড়ে অসহায় অশ্রু।

সেদিন ভোর রাত্রে নার্স এসে আমাকে ডেকে তুললে! পেসেণ্ট নাকি বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে আর জ্বরের ঘোরে বার বার আমার নাম ধরে ডাকছে। ছুটে এলাম ওর ঘরে। দেখলাম জ্বর তখন খুব বেশী, প্রলাপ সমানভাবেই চলছে আর থেকে থেকে কেবল ঐ একই কথা, জানো মা, সেরে উঠলে আমরা চেঞ্জে যাব। অনেকক্ষণ বসে রইলাম ওর পাশে। রাত্রি শেষের শেষ ছায়াটুকু মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে একটা ম্লান আলো এসে পড়ল ঘরের ভিতর, রোগীর রক্তহীন মুখের মত পাণ্ডুর। শীতের প্রভাতের সাদা কুয়াশায় কি যেন একটা বিষণ্ণতা আছে, প্রাণের রসটুকু যেন নিঙড়ে বার করে নিতে চায়। শুধু সাদা, উদাসীর মুখের মত ফ্যাকাসে সাদা, আমার ভবিষ্যতের মত ধূধূ করা সাদা।

আমার কুমারী ভাগ্যাকে কোলে নিয়ে বসে রইলাম। তার রোগতপ্ত কপালে না বুলালেম স্নিগ্ধ কর, না দিলাম চুম্বন। বার্দ্ধক্য যেন দ্বিতীয় বার ফিরে এল আমার দেহে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে উদাসী বল্ল, কে! চিনতে পারছি না? আপনি? একটু জল।

ফিডিং কাপে করে জল দিলাম ওর মুখে। বল্লাম, আমাকে চিনতে পারছ?

ও বল্লে, হ্যাঁ। আবার ওর চোখ দুটি বুঁজে গেল গভীর অবসাদে। পূবের জানালায় ফিকে হয়ে আসে কুয়াশা। বসে ভাবছি আলোর কথা। দেখতে দেখতে আলো এসে গেল দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথায়, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের জানালায়। ম্লান পাণ্ডুর সে আলো, রোগীর চোখের শেষ দীপ্তির মত।

উদাসী আবার জেগে উঠ্‌ল, অস্ফুট কাতর শব্দ করতে করতে চোখ মেলে চাইল আমার দিকে। দেখ্‌লাম ওর চোখ দিয়ে বড় বড় দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সকালের মলিন আলোর মনে হ'ল, ও জল নয়, জমানো বেদনা। বল্‌লাম, এখন কেমন লাগ্‌ছে?

ও বল্লে, বিশেষ ভাল না। তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্‌ল, আপনি—তুমি—কি সারা রাত আমার কাছে ছিলে?

উত্তরের অপেক্ষা ও করে না। আপন মনে বলে চলে, আচ্ছা, আমার অসুখ সারবেত? আর অসুখ সারলে চেঞ্জে নিয়ে যাবে ত আমাকে?

আমি বল্লাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আস্তে আস্তে ও ওর শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে আমার জীর্ণ হাত দুটি তুলে নিল, তারপর ওর বুকের উপর খুব জোরে চেপে ধরল। দেখলাম, ওর চোখে একটা পরম পরিতৃপ্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ও আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর বুকের উপর তেমনি ভাবে হাত রেখে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। কতক্ষণ তা' বলতে পারি না, হঠাৎ নার্সের ডাকে আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। মনে পড়ল, ওকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। নার্স তখন নিবিষ্ট মনে ওর নাড়ী পরীক্ষা করছে। আমি তাড়াতাড়ি ওষুধ ঢেলে এনে ওর মুখের কাছে ধরে ডাক্‌লাম, উদাসী। নার্স বল্লে, ওষুধের বোধহয় আর দরকার নেই।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমি। মাঠে ছেলেরা খেলা করছে, রাস্তায় জনস্রোত, বিনোদ মুদির দোকানে প্রাত্যহিক জটলা সুরু হয়েছে। উদাসী মরে গেছে, আমি মরলাম না।

আধুনিক জগতে ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

(২)

গোষ্ঠীগত ধর্ম্মাচার হইতে জাতীয় ধর্ম্মের (National Religion) উদ্ভব এবং জগতের তিনটি প্রধান ধর্ম্ম—ইহুদি ধর্ম্ম, জরথুষ্ট্র ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম—এ জাতীয় ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল, এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্‌ডাউগেল ধর্ম্মকে জাতীয় ও সার্ব্বজনীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। হিন্দুর, ইহুদির ও পারসীদের ধর্ম্মগুলিকে জাতীয় ধর্ম্ম বলা চলে এই হিসাবে যে উহাদের প্রত্যেকটি নিজ নিজ জাতীয় গণ্ডীর আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, জাতির বাহিরে কোন ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্মকে সার্ব্বভৌম বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম (Universal Religion) বলা হইয়াছে—তাহার কারণ, নীতিই উহাদের সার বস্তু এবং নীতি-ধর্ম্মের উৎকর্ষ বিশ্ব-মানবের কল্যাণ বিধান করে বলিয়া সকলের নিকট ধর্ম্মদ্বার সমভাবে মুক্ত। জাতীয় ও সার্ব্বভৌমরূপে ধর্ম্মের শ্রেণী ভাগ এক্ষেত্রে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশ্বসমাজের কল্যাণই যদি নীতির আদর্শ হয় তবে বিশ্ব-হিতার্থ ব্যক্তি-স্বার্থের বিসর্জ্জন—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ঐরূপ ত্যাগের নীতি-শিক্ষা তথা-কথিত জাতীয় ধর্ম্মের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে লাভ করা যায়। কঠোপনিষদে আছে,

> অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
> ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।

শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় অর্থাৎ সুখকর পরস্পর বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্ন রূপে জীবকে আবদ্ধ করে। যে এই দুয়ের মধ্যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। ভিক্টর হিউগো 'লা মিজারেবল' উপন্যাসে মাদাম ব্যাপটেস্টাইন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, প্রকৃতি তাহাকে মেষের মতই সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম প্রভাবে তিনি দেবী হইয়া উঠিয়াছেন। মানব প্রকৃতির দেবত্বে পরিণতি সম্ভব শুধু শ্রেয়ের গ্রহণে—ধর্ম্মভাবের সহিত নীতির এই নিবিড় সম্বন্ধ, যাহা উপনিষদের উক্ত শ্লোকটির মধ্যে পরিস্ফুট, তাহারই প্রতিধ্বনি জর্জ্জ ইলিয়টের Romolaর কয়েকটি ছত্রে এমন মনোজ্ঞ ভাষায় জাগিয়া উঠিয়াছে যে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে বোধকরি মার্জ্জনীয় হইবে: The highest form of happiness brings so much pain with it that we can tell it from pain by its being what we would choose before every thing else, because our souls see it is good. সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দুঃখের সহিত এতখানি বিজড়িত যে উহাকে আমরা প্রকৃত দুঃখ হইতে পৃথকরূপে তখনই বরণ করি, অন্তরাত্মা যখন উহার মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাইয়া থাকে। ইহাই ত্যাগের—প্রেয়কে বর্জ্জন করিয়া শ্রেয় গ্রহণের—পরমানন্দ। কিন্তু ঐ ত্যাগের আদর্শকে যদি সম্প্রদায় বা জাতির সঙ্কীর্ণ স্বার্থের চোরকুঠির ভিতর আবদ্ধ রাখা হয় তবে উহা পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ও লয়ালটির পরাকাষ্ঠা হইলেও পরম শ্রেয় নহে, বিশ্বজনীনও নহে। স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য খৃষ্টান ও মুসলমানের দীর্ঘ শতাব্দী জুড়িয়া রোমাঞ্চকর বিরোধ আর যাহা করুক—ধর্ম্মের বিশ্বজনীনতা প্রতিপন্ন করে নাই, কেন না ধর্ম্ম বিশ্বজনীন অথচ পরধর্ম্মের শত্রু এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ। সার্ব্বভৌমিকত্বের দাবী বহু নিন্দিত হিন্দু-ধর্ম্মও করিতে পারে—বলিদ্বীপ, জবদ্বীপ, শ্যামদেশ প্রভৃতি বহু স্থানে ঐ ধর্ম্ম এককালে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং শক ও হুন জাতি, এমন কি গ্রীকদের মধ্যেও কোন কোন রাজা ভারতীয় ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশিষ্ট ধর্ম্মের ট্রেড মার্ক ললাটে আঁকিয়া দিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধিই ধর্ম্মের বড় কথা নহে। পরধর্ম্মীর প্রতি মনোভাব ও আচরণের উপর ধর্ম্মের বিশ্বজনীনত্ব নির্ভর করে। যেখানে পরধর্ম্মের নিন্দা নিগ্রহ অপমান, যেখানে রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের মত ধর্ম্মসংঘ গড়িয়া তোলা হয় শুধু বিভিন্ন জাতির চারিত্রিক ও চিন্তাগত বৈশিষ্ট্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য, যেখানে বিভিন্ন জাতি লইয়া বিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা দিবা-স্বপ্নের মত বহু শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মগুরুগণের জ্ঞানদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেখানে এটি বা ওটি বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, একথা একটি ক্রূর পরিহাস—সত্যের অপলাপ মাত্র। পরধর্ম্মকে শ্রদ্ধা, উদার সহনশীলতা, সর্ব্বমানবের প্রতি সহানুভূতি ও সমদৃষ্টি, পরার্থে ত্যাগ—বিশ্ব-ধর্ম্মের ইহা মূল মন্ত্র।

ফরাসী দার্শনিক কম্‌ট্ (Comte) মানবতা ও জনহিত-ব্রতের উপর তাহার positivist দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিশ্ব-মানবের মিলন-ক্ষেত্র স্বরূপ এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ঐ মানব-ধর্ম্ম (humanism) মৃত-বৎস হইয়া জন্মিয়াছিল—কারণ, উহা ছিল ধর্ম্ম-সম্পর্ক-শূন্য কঠোর কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ মাত্র—আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব, যাহা মানুষের মনে ধর্ম্ম চেতনার রহস্য-জড়িত পবিত্র অনুভূতিকে জাগাইয়া তোলে, তাহার কিছুমাত্র উহাতে ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ঐরূপ সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবতার উপর হইলেও উহার মূলে আর্য্য-ধর্ম্মের যে পরম শক্তি নিহিত ছিল, তাহাই কালক্রমে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার খোসাটিকে ভেদ করিয়া বিশ্ব-ধর্ম্মের মহান বোধিদ্রুমে পরিণত হইয়াছিল। মরু-নদীর মত আর্য্যের সনাতন ধর্ম্ম একদিন যাগ-যজ্ঞ বিধির কুল-কুণ্ডলিনীর পাকে নিঃশেষে হারাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে ব্রহ্মদর্শনের মন্দাকিনী-ধারা তখনো বহিতেছিল, যাহা মুহূর্ত্তের জন্যও মানুষকে ভুলিতে দেয় নাই যে সে অমৃতের পুত্র। বুদ্ধদেব কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন নাই—যে অবিদ্যা সকল জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি মানবাঃ, সেই

অজ্ঞানকে দূর করিবার জন্ত জ্ঞানদীপ্ত কর্ম্মের সন্ধান দিয়াছিলেন। তাহার অহিংসা ও জীবে দয়া উপনিষদ-বর্ণিত সর্ব্বভূতে একাত্মবোধের ন্যায়ানুগ পরিণতি। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ গীতায় যে মহাশিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে তাহার সহিত বুদ্ধদেবের নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মূলগত সাদৃশ্য নিবিড় ও চমকপ্রদ। কামনা-বর্জ্জিত কর্ম্ম-নির্ব্বাণের উপায়, এই কথাই গীতা অন্ত ভাষায় বলিয়াছেন :

অসক্তঃ সততং তস্মাৎ কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্ত আচরণ্ কর্ম্ম হ্যাপ্নোতি পুরুষঃ পরম।

ধর্ম্ম জাতীয়ই হোক আর বিশ্বজনীনত্বের মুখোস পরিয়াই আসুক —উহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটাইতে হইলে একটি বিস্তীর্ণ মঞ্চ গড়িয়া তোলা আবশ্যক যেখানে সকল ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-কল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ঐরূপ মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া নয়— বিশ্বের মানুষকে কোন একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার কল্পনা ত মরীচিকা মাত্র!—ধর্ম্মভাবপ্রসূত সেবাব্রত লইয়াই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ এক কর্ম্ম পথে হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইতে পারে। মানব-সেবা সকল ধর্ম্মেরই মৌলিক বিধান। খৃষ্টীয় charity, ঐসলামিক জাকাৎ ও হিন্দুর দরিদ্র নারায়ণকে শ্রদ্ধয়া দেয়ং শ্রিয়া দেয়ং হ্রিয়া দেয়ং—বিভিন্ন ধর্ম্মের এই অনুশাসনগুলি মানব হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির একই উৎসের সন্ধান দিয়া থাকে। আজিকার জগতে যে অফুরন্ত কর্ম্মপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে তাহার অচল তটভূমির উপর নিশ্চেষ্ট বসিয়া শুধু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের দীপোজ্জ্বল ভেলা ভাসাইলে ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে না— গণ-ধর্ম্মকেও ঐ কর্ম্ম সলিলে অবগাহন করিতে হইবে এবং ঐখানে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত, রাষ্ট্র ও সমাজের সহিত সাক্ষাতভাবে আদান প্রদানের সুযোগ ঘটিতে পারে। ওখানে ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের, সমাজের সহিত সমাজের কোন বিরোধ থাকিবার কথা নয়—জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে আর্ত্তত্রাণ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণ জগতের অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে জনসেবা লইয়া উপস্থিত হইয়া তাহাদের শিক্ষা ও জীবন যাত্রার বিবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ঐ মহৎ কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূলে ছিল অনাসক্ত পরহিতৈষণা নহে, স্বধর্ম্ম বিস্তারের অন্ধ মোহ—যাহা দিগ্বিজয়ীর শক্তি-লিপ্সারই মত অগণিত ব্যক্তির আজীবন ত্যাগ সাধনার ঘৃতাহুতি ভস্মের উপর ঢালিয়া ব্যর্থতাকেই প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। অতীতে রাজ্য বিস্তারের হাত ধরিয়া যাহারা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাদের ঐ উদ্যমের সহিত রাজা অশোক ও মহাস্থবির দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিঃস্বার্থ কর্ম্মযোগের উদার আদর্শের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে নীতি-পদ্ধতির একটা গভীর পার্থক্য সহজে ধরা পড়িবে। তাহাদের কর্ম্মপ্রেরণায় জাতীয় স্বার্থের গন্ধ মাত্র ছিল না—ভিন্ন জাতির রীতি নীতি বা ধর্ম্মজ্ঞানের উচ্ছেদ তাহারা কামনা করেন নাই, চীনের নিজস্ব পিতৃ-তর্পণ ও তাও-ধর্ম্ম জাপানের সিনটোইজম্ এখনো ঐ সত্যের সাক্ষ্য দিবে—শুধু মানবতার মহান আদর্শকে বিশ্ব সমক্ষে ধরিয়া নিষ্কাম ত্যাগ ও কর্ম্মযোগের পথ-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

আজ কি রাষ্ট্র-জগতে, কি ধর্ম্মক্ষেত্রে নীতি পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রকে শুধু ধর্ম্মবিশেষের রক্ষক—Defender of faith রূপে খাড়া করিলে জাতীয়তার যে হিংস্র নগ্ন মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় তাহার রক্তাক্ত তাণ্ডব শুধু মধ্যযুগের ইতিহাসে অবরুদ্ধ নাই, আধুনিক জার্ম্মানির ইহুদি পেষণ-নীতি ঐ সমূহ-বিপদের দৃষ্টান্ত স্থল। রাষ্ট্রকে এখন সকল ধর্ম্মের রক্ষক হইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হইবে— নিজেকে গণ-ধর্ম্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া সুকৌশলে অথচ দৃঢ়হস্তে বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব বিরোধের মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। কোন অনুষ্ঠান নীতি-বিরুদ্ধ হইলে অথবা বিশ্ব-রুচিকে আঘাত করিলে তাহা নিষিদ্ধ করিবার অধিকার সকল সভ্য রাষ্ট্রের আছে। এমন প্রথা যদি প্রচলিত থাকে যাহা সভ্য জগতের চোখে মানুষ বা পশুর প্রতি নির্ম্মমতা ও নৃশংসতার পরিচায়ক তাহা বন্ধ করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন একদিন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানমত অনুষ্ঠিত হইত—ধর্ম্মতন্ত্র (theocracy) অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে ঐ সব কার্য্য এখন রাষ্ট্রের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নতি—জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের জীবন-যাত্রায় সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাত্রা বৃদ্ধি, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ—মোটকথা সর্ব্ববিধ ঐহিক কল্যাণ বিধানের পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত বর্ত্তমান জগতের অবস্থাগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রকে সমান ধাপে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন নিয়ম, প্রথা, সমাজ-পদ্ধতির সংস্কার, এমন কি আমূল পরিবর্ত্তনেরও যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রচলিত সামাজিক বিধিগুলিতে যাহাদের বিত্ত-স্বার্থ সংরক্ষিত তাহারা বাধা দিলে বিস্ময়ের কারণ নাই— কিন্তু ধর্ম্মনাশের শঙ্কা যিনি করিবেন, তিনি কাল-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ, জীবন-সংগ্রামেও অপটু। অনাগত মানবের ব্যবহারিক জীবনের কর্ম্মনীতি শাস্ত্র অনন্তকালের জন্ত বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং ঐ ন্যায়ের বিধান অপরিবর্ত্তনীয়—এরূপ যুক্তি কোন আধুনিক রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রকে শুধু জাতীয়তার রথচক্রে বদ্ধ থাকিতে হইলে যে-সব অনর্থের সূত্রপাত হয় তাহা আমরা মহাযুদ্ধের আকারে দেখিতে পাইতেছি। জাতীয় অর্থ-রাজ-সমাজনীতিকে একটি সার্ব্বজনীন নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে জগত-শান্তির সম্ভাবনা নাই, ইহা সকলে স্বীকার করেন। জগৎ-শান্তি সত্য-ধর্ম্মের অভীপ্সিত, ধ্যানের বস্তু—বিশ্ব-মানবের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত করিবার লক্ষ্য ও উপায়। ত্যাগ ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষকে অমৃত-সিন্ধুর তরঙ্গ শিখরে দোল দিয়া যায়— ধর্ম্মের কাছে ত্যাগের মহিমা আত্ম-বিলুপ্তির মধ্যে প্রকাশিত। রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরূপ—দেশ-মাতৃকার কল্যাণের জন্ত যখন জাতির বা শ্রেণীর অধিকারকে খর্ব্ব করিবার প্রয়োজন হয়— কালের ভৈরবী-চক্রে ক্ষুদ্র স্বার্থের বিসর্জ্জন বৃহৎ স্বার্থের অনুকূল হইয়া উঠে, আশ্চর্য্যরূপে—তখন তাহাই এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, যাহাকে আমরা বলি, জ্ঞান-দীপ্ত স্বার্থ (Enlightened-self-interest). কিন্তু ত্যাগই বল আর জ্ঞান-দীপ্ত স্বার্থই বল—ঐ বিচিত্র মনোবৃত্তিই শুধু ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক সুবর্ণ-সেতু বাঁধিয়া দিয়া উভয়ের সহযোগিতায় উভয়ের কাম্য বিশ্ব-শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

গুটিপোকার মত নিজের চারদিকে জাল বুনিয়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি আপন ফাঁদে আট্‌কাইয়া গিয়াছে, শুধু তাহা কাটিয়া বাহির হইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না—সূতাগুলির জট ছাড়াইয়া শিল্পীর নিপুণ হস্তে বোনা রেশমী কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম নয়নাভিরাম নমুনা রচনা করিতে হইবে। ইহার একমাত্র উপায়, জাতিগুলির পরস্পর সাহচর্য্য ও সহযোগিতায়—ত্যাগে, নীতির ও কর্ম্মের আদর্শে—বিশ্ব-সমাজের হিত-সাধন এবং সেই সঙ্গে জাতিকেও মহীয়ান করিয়া তোলা। সেইরূপ কর্ম্মযোগ—জনহিত ব্রতের মহান অনুপ্রেরণা সকল ধর্ম্মের কর্ম্মীদের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে একই কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মগুলি সখ্যতা সূত্রে বাঁধা পড়িবে, সৌভ্রাতৃত্বের আকর্ষণ, পরস্পরের উৎসবে যোগদান ও ভাবের আদান প্রদান অনুষ্ঠানগুলিকে সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে পারে, —এমন কি, বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে এক নূতন বিশ্ব-সভ্যতা গড়িয়া ওঠাও বিচিত্র নহে।

"ওরিয়েণ্টাল আর্ট"

সংঘমিত্রা

আর্টের মাপকাঠি নিয়ে ঝগড়া করব না, দুকথা বলব "ওরিয়েণ্টাল আর্ট" সম্বন্ধে। কথাটা কয়েক বছর যাবৎ বাংলা ভাষায় চলতি হয়েছে। কথাটার ভেতরে বোধহয় যথেষ্ট প্রাণরস আছে বলেই বাঙ্গালীর বাগ্দেবী এই যুগ্ম বাঙ্ময় প্রকাশকে আপন শিরে বহন করে আসছেন। বাংলার মাটী ও জলে পরিপুষ্ট বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক কখনো কখনো অদ্ভুত ফল প্রসব করে এবং তার একটি নিদর্শন হচ্ছে এই "ওরিয়েণ্টাল আর্ট"।

আমাদের কলাদেবী ওরিয়েণ্টাল হতে চাইছেন, ভালো কথা। কিন্তু আমাদের কমলাসনা বিদ্যাদেবী ওরিয়েণ্টাল মূর্ত্তিতে আমাদের হৃদয়-উৎসারিত ভক্তিঅর্ঘ্য নিচ্ছেন না এ আমাদের কলারসিক চক্ষু দেখেও দেখছে না। অথচ খেতাবটি তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছি "ওরিয়েণ্টাল"—যার প্রকৃত অর্থ আপাততঃ অনর্থক বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। কারু বোধহয় অজানা নয় যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য কোনকালেই শারীর বিদ্যা বা anatomy'র পদসেবা করেনি। কায়িক সৌকুমার্য্য-কে একেবারে আমল দেননি বলেই ভারতীয় ভাস্কর কায়, মন ও বাক্যের অগোচরকে গোচর করতে সক্ষম হয়েছেন অনেকাংশে, যার প্রমাণ পুরণো জীর্ণ মন্দিরগুলিতে প্রচুর আছে। ভারতীয় দেব অথবা দেবীমূর্ত্তি প্রধানত ধ্যানমূর্ত্তি, ধূলিধূসর ঐহিকের সম্পূর্ণ সম্পর্ক বর্জ্জিত, কিছুটা একঘেয়েও এই কারণেই। সে একঘেয়েমী ধ্যানজগতের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যময়, জীবনময় চপল সংসার তার সান্নিধ্যে ঘেঁসিতে পারে না। ভারতীয় ভাস্কর জীবনশিল্পী নন, ভাববাদের পূজারী। বাস্তব তাঁর কাছে তুচ্ছ, ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন সৃষ্টি করতে তিনি নারাজ। তাঁর খোদিত বিগ্রহে মানবতার ছাপ মেলে না, মেলে দৈব অনুগ্রহলাভের জন্য আকুতি। একথা কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলে না যে ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রগুলিতে আমরা এথেনীয়ান এক্রপলিসের সন্ধান পাব না। হেলেনিক সৌন্দর্য্যবাদ দেহবাদের দুহিতা, তাই গ্রীক ভাস্কর্য্য কায়িক সৌন্দর্য্যের খনি, জীবনের গতিভঙ্গিমা তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তার উৎকর্ষ আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু অধ্যাত্মমুখীন করে না। ভেনাস অব মিলোকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি না। অ্যাটিকা দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ভারতীয় বিগ্রহ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য শিল্পের সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয় মন অধ্যাত্মবাদী ছিল না, যেমন কাব্য নাটকের কথাই ধরুন। ভারতীয় কবি অরূপের কোন খোঁজ রাখেন না। (এখানে সংস্কৃত কবির কথাই বলছি।) রূপের জগতে তিনি বাঁধা পড়েছেন, ধরতে গেলে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীদেহের বিশেষ উপাঙ্গের যৌন সংকেত ফুটিয়ে তুলতে তাঁর প্রয়াস সংযমের মুখোস খুলে ফেলেছে, যম নিয়মের সামান্য বিধি নিষেধ মেনে চলেনি। সংস্কৃত কাব্য ও নাটক দেহবাদের যৌবনে আত্মোৎসর্গ করেছে। সংস্কৃত কাব্যের ভোগবাদী দৃষ্টি গ্রীক ভাস্কর্য্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ওদেশের ভাস্কর এদেশে যেন কবি হয়ে জন্মেছেন। এদেশের ভাস্কর কিন্তু বৈষয়িক ভোগবাদের ভৃত্য হতে চাননি, দেহের উপরে উঠতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই সুঠাম সুন্দর দেহ গড়তে পারেন নি তাঁর শিল্প-সৃষ্টিতে, গড়েছেন ধ্যানমূর্ত্তি। অঙ্গ উপাঙ্গের শোভনতায় প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি, হয়েছে ভাবের শোভনতার উপর। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটককে ভাববাদের আধিপত্যকে গ্রীক ভাস্করের দৃষ্টি দিয়ে যেমন বুঝতে পারা যায় না, তেমনি সংস্কৃত কাব্যের দৃষ্টি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের পাদপীঠ রচনা করেনি। কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্য্য, যা সত্যিকার আমাদের দেশের 'ওরিয়েণ্টাল আর্ট', তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়েছে এদেশের শ্বেতাঙ্গ-শাসন সূচিত হওয়ার অনেক পূর্ব্বেই। বাণী অর্চ্চনায় যে আধুনিকতম আর্ট প্রতিষ্ঠার দাবী ইদানীং বাঙ্গালী করছে, তাকে কোন প্রকারেই "ওরিয়েণ্টাল" বলা চলেনা।

উনবিংশ শতকে বাংলায় যে নবজীবনের সূত্রপাত হয়, তার বিকাশ নানাভাবে বাঙ্গালী জীবনে রূপায়িত হয়েছে, বিশেষ করে আর্ট ও সাহিত্যের সনাতনী গতিটির বিনাশ সাধন করে নূতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, যার ফলে আদি বাংলা কাব্যের পরিবর্ত্তে আমরা পেয়েছি "বাংলা উপন্যাস" এবং "বাংলা লিরিক"—যা এদেশের সনাতন ধারার ব্যতিক্রম। এই নবজীবনের অভিযান সমানতালে চলেনি, কখন মন্দাক্রান্তা ছন্দে পা ফেলে ফেলে চলেছে, কিন্তু কোন সময়েই সমে এসে পৌঁছয় নি। তাই জাতীয় আত্মবিকাশ এখন পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে। তার অতি ক্ষুদ্র নিদর্শন বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের দুর্বিপাকের গর্ভজাত আধুনিকতম তথাকথিত "ওরিয়েণ্টাল" আর্ট। আজকের বাঙ্গালী অন্তত একটি ক্ষেত্রে এথেনিয়ান এক্রপলিসের শরণাপন্ন হয়েছে। তার মানসজাত শিল্পকুসুম আজ দেহবাদের সৌরভ বিকিরণ করছে, স্থূল সৌন্দর্য্যের সুষমা বিলাস বঙ্গবাসীর অর্দ্ধজড়াতুর হতাশাকুল চিত্তকে অভিভূত করেছে। রাষ্ট্রনৈতিক হতাশার বিকৃত প্রসূন বলে এই সৌন্দর্য্য সমীক্ষাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেই। এই অদ্ভুত আর্ট প্রচেষ্টার পশ্চাতে এক প্রকাশব্যাকুল অন্তঃকরণ আপন অস্থিরতাকে গোপন করতে পারেনি। গ্রীক আর্টিষ্টের যৌন ভাববাদ কি করে স্থান ও কালের মহাব্যবধান অতিক্রম করে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বাংলার সংস্কৃতির অন্দরে প্রবেশ লাভ করল এ আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। স্বাজাত্যিকতার আচরণে বিজাতীয় রস সৃষ্টি ও আস্বাদনকে বাঙ্গালী বরণ করেছে, যা "ওরিয়েণ্টাল" এই অধুনা অতি প্রচলিত সংজ্ঞার মধ্যে স্পষ্ট সূচিত হচ্ছে। এর কারণ অবশ্য জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অগ্রগতির মধ্যেই আছে। বাঙ্গালী যুবকের কল্পিত মৃন্ময়ী সরস্বতীর কলেবরে আজ অ্যাথেনা ও অ্যাফ্রডাইট পুনর্জীবন লাভ করেছেন, এ শুধু গ্রীক আর্টের পুনরুত্থান মাত্র নয়, আরও কিছু। বাস্তব জীবনের রিক্ততাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস আজ ভোগবাদের পথে যাত্রা সুরু করেছে—যে ভোগবাদ কোনভাবেই ভারতীয় ভাস্করের নিরাকার অধ্যাত্মবাদের অনুচর নয়। যে বিজাতীয় প্রভাব সকল ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবন বরণ করে নিয়েছে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, সেই অপরিহার্য্য প্রভাবের অবাঞ্ছিত সংক্রামণ থেকে আমাদের "ওরিয়েণ্টাল আর্ট" নিষ্কৃতি পায়নি। জাতীয়তাবাদের অক্ষম আত্মপ্রতারণা জাতীয় অগ্রগতির সহজ সত্যকে কোনকালে অস্বীকার করতে পারে নি, এখনও পারছে না।

ফুলধনু

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্বোক্ত ছাত্রীদের হোষ্টেলের একটি সিঙ্গলসিটেড কক্ষ।
রচনা ও মায়া কথা কইছে

মায়া। চল না একটু, এমন কি অসুবিধে হবে তোমার।

রচনা। না ভাই, অসুবিধে নয়, আজ থাক।

মায়া। এমন করে একলাটি ঘরের ভেতরে বসে থাকবে, বাইরের আলোবাতাস নেবে না?

রচনা। আজ আর ভাই ভাল লাগছে না।

মায়া। কেন ভাল লাগছে না বল: নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

রচনা। বারে, হবে কি আবার! এমনি ভাল লাগছে না।

মায়া। উহুঁ, তা নয়, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। বল সত্যি করে কি হয়েছে!

রচনা। কিছু হয়নি, আর সত্যি করে তোমাকে কি বলব।

মায়া। প্রিয় সখি, আমি যদি বলতে পারি, আমাকে তুমি কি দেবে বল।

রচনা। খুব উদ্ভট করতে পার যাহোক।

মায়া। উদ্ভট্টি নয়, বলছি, শোন। (গম্ভীরভাবে) তুমি প্রেমে পড়েছ।

রচনা। (হেসে উঠে) ঠিক বলেছ। এখন কার সঙ্গে, তার নাম ঠিকানাটা বলে দাও, দেখা করে আসি।

মায়া। বলি; নোটবুক নাও, লিখে রাখ। আচ্ছা আজ থাক, কাল বলব।

রচনা। কাল কেন, আজই বল।

মায়া। আজ অন্য একটা কথা বলবার আছে, সেটাই বলি।

রচনা। কি?

মায়া। কাউকে বলবে না বল।

রচনা। না, বলব না।

মায়া। সত্যি বলছ, দেখো ভাই।

রচনা। সত্যি বলছি।

মায়া। আন্দাজ কর না।

রচনা। আমি অতো তোমার মত আন্দাজ করতে পারব না।

মায়া। তাহলেও একটু কর না।

রচনা। কাউকে ভালবেসেছ?

মায়া। মনে হচ্ছে তাই।

রচনা। সে তো ভাল কথা নয়।

মায়া। কুমারী ছাত্রীর পক্ষে বিষম বিপদের কথা; এখন কি উপায়, একটা পরামর্শ দাও।

রচনা। আমি ভাই ও সব ব্যাপারের কিছু জানি-টানি না, বরং সীমাকে ডাক, সে ভাল যুক্তি দেবে।

মায়া। তাকে বলে কাজ নেই, তার কেবল বর আর বর, তার বরের কাছেই সে একথা আগে ফাঁস করবে। মর্ পোড়ারমুখী, বিয়ে যেন আর কেউ করেনি।

রচনা। কোথায় ছেলেটির বাড়ী? কি করে?

মায়া। আমার মামাবাড়ীর দেশে বাড়ী। আমাদের কলেজেরই ফোর্থ ইয়ার সায়েন্সে পড়ে।

রচনা। তাই নাকি? কি নাম?

মায়া। নাম রবি। রবীন্দ্রনাথ রায়।

রচনা। (বিস্মিতভাবে) তাহলে সত্যি বল। চেনাশোনা হয়েছে তো?

মায়া। কোথা থেকে আর হবে! দূর থেকে দেখে ভুলেছি, কাছে তো আসিনি।

রচনা। তাহলে তিনি যে তোমাকেই পছন্দ করবেন, এ কি করে আশা করছ?

মায়া। পছন্দ করুন আর নেই করুন, আমার মনের কথাটা একবার জানান দরকার।

রচনা। কি করে জানাবে?

মায়া। তাইতো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

রচনা। চিঠি লিখে জানাও না।

মায়া। কুমার বন্ধুদের স্বভাব জান না বুঝি?

রচনা। কেন?

মায়া। বাঁকা-অক্ষরে-লেখা খাম ছেঁড়ার লোভ তাদের লুচি ছেঁড়ার লোভের চেয়ে বেশী।

রচনা। তাইতো, তাহলে কি হবে। এখন তো আর দূতীর যুগ নেই।

মায়া। কেন নেই? একটু হবে আমার দূতী?

রচনা। (সভয়ে) না ভাই, ও সব আমার পোষাবে না। আমার বড় ভয় করে।

মায়া। কেন, যদি নিজেই দূতী হয়ে যাও? তা ভাই, তোমাকে দূতীগিরি করতে দিতেও আমার ভয় হয়, এমন কমল মুখ দেখলে কি আর এ কালিন্দীর মুখ চোখে ধরবে!

রচনা। আমি বুঝি বড় সুন্দরী?

মায়া। আর একজনেরই মত, তবে সে পুরুষ। আমার কাছে একখানা ফটো আছে, দেখবে?

রচনা। ফটো?

মায়া। (ব্লাউসের ভেতর থেকে বার করতে করতে) হাঁ।

রচনা। বল কি! কোথা থেকে জোগাড় করলে?

মায়া। সে অনেক কথা। একবার দেখ, (ফটো দিলে) একবারই দেখ, দু'বার দেখো না।

রচনা একদৃষ্টে দেখতে লাগল

কি, কেমন?

রচনা। সুন্দর দেখতে তো।

মায়া। দাও, আর নয়। (ফটো নিয়ে) এই জন্তেই বলছিলুম, একবারই দেখ, দু'বার দেখো না। কি, মন দেবার মত চেহারা নয়?

রচনা। হাঁ, তবু ফটো দেখেছ, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ তাতে তো আর ধরা যায় না। চোখ দুটীতে যেন ভাই মায়া মাখান (জিভ্ কেটে)—যাদু মাখান আছে।

রচনা। (হেসে) কেন, মায়া মাখান থাকলেই বা ক্ষতি কি?

মায়া। আমি কি শ্রীমতী রচনা, যে চোখে লেগে-থাকব?

রচনা। কেরিয়ার কেমন?

মায়া। ব্রিলিয়্যাণ্ট না হলেও ভাল, তবে স্পোর্টসম্যান হিসেবে খুব ভাল।

রচনা। তাই নাকি? তাহলে ফিগারও বেশ ভাল?

মায়া। এত জিজ্ঞাসা কেন? কেড়ে নিতে চাও? শ্রবণ দিয়ে কি মরমে ঢুকছে নাকি? দেখো ভাই, গরীবের ধন ঘরে তোলবার আগেই চুরি করে নিও না।

বাইরে থেকে কে টোকা দিলে, রচনা!

রচনা। এস।

দরজা খুলে দিতে সীমা প্রবেশ করল

সীমা। বলি সখী, কুঞ্জে আছ?

মায়া। কুঞ্জে তো আছেন, কিন্তু মান হয়েছে, শ্যামের মুখ আর হেরবেন না।

সীমা। তাহলে ফিরে যাই।

দরজা বন্ধ করে দিলে

(সুরে) ফিরে যাই
ফিরে যাই
রাধা যখন হেরল না,
ফিরে যাই, ফিরে যাই।
বৃন্দাবনে কাজ কি আছে,
ফিরে যাই, ফিরে যাই।
মধুরায় কুব্জা ভাল,
ফিরে যাই, ফিরে যাই।

তারপর বিলাসিনী, খবর কি?

রচনা। আজ যে মেজাজ খুব শরীফ, কি ব্যাপার? বর্ধমান থেকে কি চিঠি এসেছে নাকি? কত পাতা?

সীমা। আসবে না, না এসে পারে? বিনিদ্র রজনীর বিস্তারিত ইতিহাস তো পড়নি।

মায়া। সেগুলো ক' পাতার?

সীমা। সেগুলি মধুকল্লোল সিরিজের এক একখানি চারশ কুড়ি পৃষ্ঠার উপন্যাস।

রচনা। একেবারে গুনে গেঁথে চারশ কুড়ি পৃষ্ঠা, কম বেশী নয়?

মায়া। হিসেব আছে ভাই, হিসেব আছে। উকিলের বৌ, ও কি কাঁচা কথা কইতে পারে!

সীমা। কথাটা কাঁচা নয়, তা সত্যি। শোন তবে, শতকে

রচনা। চারশ কুড়ি।

সীমা। এক ঘণ্টায় কত মিনিট?

রচনা। ষাট।

মায়া। ধন্য সীমাদি, সার্থক তোমার মাথা। তুমি সীমা নও, তুমি অসীমা! রচনা, বুঝতে পারছ না?

রচনা। না তো।

মায়া। কান্তর সঙ্গে রাত্রে সাত ঘণ্টা নিশিযাপন করেন, সেই সময় রচিত চারশ কুড়ি পৃষ্ঠার এক একখানি উপন্যাস।

রচনা। (অতি বিস্ময়ে) ও—মা!

মায়া। বাক্যস্রোত এমনি যে যদি লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে প্রতি মিনিটে একটি করে পৃষ্ঠা লেখা হয়ে যায়।

রচনা। কি স্পিড! এবার ভাই, একখানা গান গাও।

সীমা। তার আগে বল, বড়দিনের ছুটী হতে আর কতদিন বাকী?

রচনা। এই তো কাল জিজ্ঞেস করলে!

মায়া। রোজ একবার করে জিজ্ঞেস করলে অন্যায় হয় না।

সীমা। এইজন্যেই তো বলি বালিকা। বিয়ে হলে রচনা বরকে নিয়ে কি করবে, তাই আমি ভাবি।

মায়া। তখন ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

সীমা। ভাই, শ্বশুরই আমার জীবনটা মার্ডার করে দিলেন। বলেন, বৌমা, বাড়ীতে চুপচাপ বসে থেকে কি করবে, পড়। বাবাজীবন তো ছেলেমানুষ, মাথা চুলকোতেও পারলেন না, তার আপত্তি! আর বঙ্কপত্নী নির্ব্বাসিত হলেন এই অকাল-বানপ্রস্থ আশ্রমে।

রচনা। বর বর করে পাগল হল সীমাদি।

সীমা। হলে বুঝবে, এখন তার টের পাবে কি?

রচনা। বিয়ে করলে তো?

সীমা। তাই নাকি? (রচনার চিবুক ধরে) দেখি দেখি মুখখানা, বিয়ে করলে তো! তোমাকে না বিয়ে করে ছাড়বে কে? মুখখানি দেখে আমারও যে পুরুষ হতে সাধ যায়, কেমন নয় মায়া?

মায়া। তা সত্যি।

সীমা। দেখনা এবার এল বলে।

রচনা। কি এল?

মায়া। যা আসবার তাই এল।

সীমা। এল দয়িত, কান্ত, প্রাণেশ্বর, জীবনবল্লভঃ, নাথ, বঁধুয়া, প্রিয়তম।

মায়া। বর্ধমানে যে এ ডাক পৌঁছে যাচ্ছে সীমাদি। ভদ্রলোকের নথিপত্র দেখায় যে গোলমাল হয়ে যাবে।

সীমা। তা একটু যাক, তবু মনে পড়বে।

রচনা। তুমি তো এদিকে রোজ একবার করে ছুটীর দিন গুণছ, আর তিনি কি করেছেন?

সীমা। হায় পোড়াকপাল! টেবিলের উপর দু পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছেন।

রচনা। এত অনুরাগের এই প্রতিদান?

সীমা। পুরুষমানুষ কি আর ভালবাসতে জানে! সামনে পেলেই বলবে, দয়িতে, তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই!

মায়া। (মুচকি হেসে) আর—আর কি ?

সীমা। আর—বড়ই দুঃখের কথা, আর বান্ধবীদের বাড়ী বেশী যাতায়াত করবে।

মায়া। বন্ধুদের বাড়ী নয় ?

সীমা। হুঁ ভাবে এক। এমন বন্ধুদের বাড়ী, যাদের বাড়ীতে বান্ধবী হবার উপযুক্ত লোক আছে।

রচনা। তা বলে কি বিয়ে করলেই বান্ধবী ছাড়তে হবে নাকি ?

সীমা। ছাড়তে বলি না, সংখ্যা বাড়াতেই আপত্তি করি।

রচনা। কেন ?

সীমা। মায়া, তুমি রচনাকে বুঝিয়ে দাও কেন।

মায়া। একটি রাজভোগ তোমাকে যদি খেতে দেওয়া যায় রচনা, কতজনকে দিয়ে তা তুমি খেতে পার বল তো।

সীমা। কি সুন্দর তুলনা দিলে মায়া! বহু ধন্যবাদ, কথাটা মনে রাখবার মত, এবার বুঝলে রচনা ?

রচনা। বুঝেছি। নাও, এবার একখানা গান কর।

সীমা। কেন ?

রচনা। গান গাইবে, তার আবার কেন কি ?

সীমা। কি পুরস্কার মিলবে ?

রচনা। পুরস্কার আবার কি !

মায়া। বলা ঠিক হল না রচনা। চল, পুরস্কারটা মিলবে তেইশ দিন পরে।

রচনা। তার মানে ?

মায়া। তার মানে আর জেনে কাজ নেই।

সীমা। তাহলে ভরসা দিচ্ছ ?

মায়া। দিচ্ছি, তুমি এখন একখানা গান আরম্ভ কর।

সীমা। আমার ভাই, ভয় হচ্ছে দিনটা যদি না আসে।

রচনা। ও, বুঝেছি।

মায়া। বুঝেছ ? অতএব দিনটা আসবেই। সীমাদি, আর দেরী নয়। (ক্রমশঃ)

সাঁই গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম্-এ

রাজসাহী জেলার গ্রাম্য অঞ্চলে মুসলমান দরবেশ ও ফকিরদের ভিতর বাউল সঙ্গীত জাতীয় এক প্রকার গান প্রচলিত আছে—এইগুলি এতদঞ্চলে 'সাঁই' গান নামে সুপরিচিত। এই গানগুলি গুরুবাদী সঙ্গীত এবং এইগুলির ভিতর দিয়া লোকসমাজে গুরুবাদ বা স্বামীবাদ প্রচারিত হয়। 'সাঁই' স্বামী শব্দের অপভ্রংশ। বাংলার বাউল গানের আলোচনাক্ষেত্রে এই গানগুলির মূল্য অপরিমেয়। এখানে রাজসাহী জেলার পল্লী প্রদেশ হইতে সংগৃহীত তিনটি সাঁই গান উদ্ধৃত হইল।

(১)

গুরুচরণ শ্রীপাদ পদ্ম রাখব হৃদয় মাঝে
আমি আর কোনও ধন চাই না দয়াল পাই যেন সব কাজে
গুরু চরণ জপের মালা
চরণের গান গাই দুই বেলা
দূরে যাবে শমন জ্বালা হিদলে বিরাজে
গুরুর চরণ অনুসারে ও ভক্ত হৈতে পারলে তারে মিলে
কিশমৎ সাঁই দরবেশের চরণ
ধৈরে থাকলে কি করবে কাল শমন
স্বরূপ বলে যা কর সাঁই
যখন যা সাজে।

(২)

মিছে হাল বইয়ে কাল গেল রে
আমার কৃষি হইল না
বাবার ছিল লাখরাজ জমি
ত্রিশ বিঘার নাইরে কমি
ধনাই মণ্ডল কিরষাণ ছিল
জমির আইল ত খুঁজিয়া পাইল না
যখন জমিত্ লাঙ্গল জুড়ি
বদল দুইটা ধরে আড়ি
হাল ছেড়ে সবাই পালায়
আপন চিনেনা সে ত ঘুরে দেখে না
বুদ্ধি আর মঙ্গল এঁড়ে
পরের জমি খায়রে কেড়ে
খেয়ে দেয়ে হুঙ্কার মারে
সে যে আপন চিনে না
অমাবস্যার যোগ এল
সে যোগ আমার যায় রে চৈলে
গুরুর ভাগ্যের ফল না পেয়ে
অঙ্কুর হইল না প্রেমের অঙ্কুর হইল না।

(৩)

ও গুরু আমার পুর্ব্বের কথা মনে নাই
জানিতে চাই তাই
পুর্ব্বের কথা মনে হৈলে ভাসি দুনয়নের জলে
আর কি আছে কপালে দিবানিশি ভাবি তাই,
নাক থাকিতে নিশ্বাস বন্ধ
মুখ থাকিতে বাক্য বন্ধ
ও গুরু চক্ষু থাকিতে হৈলাম অন্ধ
শেষে কি হৈয়ে থাকিব ভবে জন্মঅন্ধ।

যুদ্ধকালীন ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-জগতে তিনটী উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ, ১৯৩৯ সন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ (Bank-deposit) বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিভিন্ন সনে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ তুলনা করিলেই ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ১৯৩৯ সনে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৪৯·৪৫ কোটী। ১৯৪৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৫৯·২৯ কোটী। অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ৫ বৎসরে নূতন গচ্ছিত আমদানী হইয়াছে ৫১০ কোটী টাকা যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৬ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্য্যন্ত তিন বৎসরে নূতন গচ্ছিত আমদানী হইয়াছিল মাত্র বিশ কোটী টাকা।

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এই অসম্ভব বৃদ্ধির কারণ সহজেই অনুমেয়। যুদ্ধকালীন ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গত কয়েক বৎসর হইতেই ভারত গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত নোট মুদ্রা প্রচলন করিতে হইয়াছে। এবং এই অতিরিক্ত নোট মুদ্রারই আবার কিয়দংশ জনসাধারণের হস্ত হইতে ব্যাঙ্কে জমা লাভ করিয়া গচ্ছিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের নোট-মুদ্রার প্রচলনের তালিকা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, নোটের প্রচলনের বৃদ্ধির সংগে সংগে ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার পরিমাণও প্রায় সমানুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে নোট প্রচলন ও গচ্ছিত টাকার বৃদ্ধির একটা তালিকা দেওয়া হইল :—

	প্রচলিত নোটের পরিমাণ	ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ
আগষ্ট ১৯৩৯	২১৬·৭৮ কোটী	২৪৯·৪৫ কোটী
মার্চ ১৯৪০	২৫২·২১ "	২৫৯·২৬ "
" ১৯৪১	২৬৯·২৫ "	২৮৪ ৬৪ "
" ১৯৪২	৪২১·০৬ "	৩২২·১৬ "
" ১৯৪৩	৬৫৫·১১ "	৪৯৩৬০ "
" ১৯৪৪	৮৯১·৭৪ "	৬৮৮ ৬৫ "

দেশে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন যে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দেশও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। দেশ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে প্রচলিত টাকার বৃদ্ধিতে নয়, উৎপন্ন ধনসম্পদের বৃদ্ধিতে। সুতরাং উৎপন্ন ধন-দৌলতের হ্রাস-বৃদ্ধি না দেখিয়া শুধু প্রচলিত টাকার পরিমাণ দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা যায় না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে যাহারা, (যেমন ব্যবসাদার, কণ্ট্রাক্টার, প্রভৃতি) অধিক অর্থোপার্জন করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ যদিও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কায়কারবারের সুযোগ কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ (Bank advance) বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সনে ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের মোট আমানতী টাকার শতকরা ৫৩.৩১ ভাগ টাকা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আগাম দিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে মোট দাদনের পরিমাণ কমিয়া ১৯৪৩ সনে মাত্র ২৩,৮৩ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে অবস্থার একটু উন্নতি দেখা যাইতেছে, এবং শতকরা ৩১·৫০ ভাগ টাকা আগাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। . . . . যে শুধু ভারতীয় ব্যাঙ্ক জগতেই ঘটিয়াছে তাহা নয়, সকল দেশের ব্যাঙ্কেই এই পরিবর্ত্তন অল্প বিস্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। মুদ্রা-প্রসারের ফলে ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তদনুপাতে ব্যাঙ্কের দাদনের সুযোগ বৃদ্ধি পায় নাই, বরং কমিয়াই গিয়াছে। সুতরাং ব্যাঙ্কের মোট টাকার তুলনায়, দাদনের টাকার হারাহারি ভাগ যে ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

তৃতীয়তঃ, ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা আগাম দেওয়ার সুযোগ কমিয়া যাওয়ায়, গচ্ছিত টাকার অধিকাংশ ভাগই ব্যাঙ্ক সকল গভর্ণমেণ্ট বণ্ড ও সিকিউরিটীতে লগ্নী করিতে বাধ্য হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কসমূহ শতকরা ২৫ ভাগের বেশী টাকা কখনও বণ্ডে নিয়োজিত করিত না। এখন সে স্থলে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ টাকাই বণ্ডে খাটিতেছে। ১৯৪২ সনে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শতকরা ৬৫.২ ভাগ টাকা বণ্ড ও সিকিউরিটীতে নিয়োজিত হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের এই সকল পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতের পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক ?

প্রথমতঃ, একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে যদিও ব্যাঙ্কসমূহের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। অল্প মূলধন লইয়া ব্যাঙ্কের কারবার করা অতিশয় বিপজ্জনক। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মূলধন বাড়াইবার জন্য শীঘ্রই নূতন আইন প্রণয়নের পরিকল্পনা শোনা যাইতেছে। যদি অনাবশ্যকভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী খর্ব করা না হয়, তবে নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি সাধন সর্ব্বতোভাবে কাম্য। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের পরে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে টাকার চাহিদা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। তখন ব্যাঙ্কসমূহ যদি যথেষ্ট পরিমাণে দাদন দিতে না পারে, তবে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টাকাই এখন বণ্ডে ও সিকিউরিটীতে নিয়োজিত আছে। যদি টাকার চাহিদা বাড়ে, তবে হঠাৎ বণ্ড সকল বিক্রয় করিতে গেলে বণ্ডের মূল্য কমিয়া যাইয়া ব্যাঙ্কসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আবার অন্যদিকে বণ্ড হইতে টাকা উঠাইয়া ব্যবসাতে খাটাইতে না পারিলেও অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে ব্যাঙ্ক পরিচালকগণের পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সতর্কতাপূর্ণনীতি অবলম্বন করা উচিত। তৃতীয়তঃ, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় বড় ব্যাঙ্কসমূহ নূতন শাখা অফিস খুলিয়া ব্যাঙ্কিং কার্য্যাবলীর প্রসার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। গত ১৮ মাসের মধ্যে নূতন শাখা অফিসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৮৮। ভবিষ্যতে আর নূতন অফিস না খুলিয়া পুরাতন অফিসগুলিকেই সব দিক হইতে উন্নতি বিধান করা ব্যাঙ্কিং কার্য্যপ্রণালীর দিক হইতে প্রশস্ত হইবে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে হয় ত ব্যাঙ্কসমূহের উপর চড়াও (run) ঘটিয়া অর্থ-সংকট দেখা দিবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, সেরূপ সংকট উপস্থিত ত হয়-ই নাই, বরং ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী আশাতীতভাবে সুপ্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর-কালে সুচিন্তিত নীতি অনুসরণ না করিলে দুর্দ্দিন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। যদিও নূতন আইন প্রণয়নের ফলে ব্যাঙ্কিং কার্য্যপ্রণালীর কিছুটা উন্নতিলাভ সম্ভাবনা, তথাপি এ কথা মনে রাখা উচিত যে আইন দ্বারা শুধু অপকার নিবারণ করা চলে, উপকার সাধন করা চলে না: ইংরেজিতে একটা কথা আছে,—"It is not good laws but good bankers that make good banking." কথাটা বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

গৃহ-নির্ম্মাণ

উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র শেষ জীবনে বলরাম দে ষ্ট্রীটে (এক্ষণে ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী ষ্ট্রীটে) একটি বৃহদায়তন বাটীতে বাস করিতেন, উহাতে এখনও তাঁহার ও পীতাম্বরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদি ও সেবাইতদিগের থাকিবার ব্যবস্থা উমেশচন্দ্র ও তাঁহার

উমাকালী মুখোপাধ্যায়

ভ্রাতা সত্যধন করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর উমেশচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেন, যদিও তিনি প্রায়ই পৈত্রিকভবনে মাতৃচরণ বন্দনা করিতে সস্ত্রীক আসিতেন এবং পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা ছিল না। খিদিরপুরে তাঁহার পিতামহের উদ্যানবাটীকা যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে ১৮৭৬-৭ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র একটি প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মিত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার ব্যারিষ্টারীতে প্রভূত আয় হইত এবং কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি চাকুরীর পক্ষপাতী ছিলেন না—যত বড়ই সে চাকুরী হউক না কেন—এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যধনকে এম্‌-এ পরীক্ষার পরে বিলাতে আই-সি-এস্‌-এর জন্য যাইতে নিষেধ করিয়া স্বাধীন এটর্ণির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র খিদিরপুরে অবস্থানকালে উমাকালী মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহিত প্রায়ই দেশহিতকর নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। উমাকালীকে লিখিত উমেশচন্দ্রের অসংখ্য পত্রে সেকালের রাজনীতিক বহু সমস্যার উল্লেখ আছে। সে পত্রগুলি আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে অনেক দেশ নায়কের জীবনীর উপকরণও পাওয়া যায়। পত্রগুলি উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ডকের জন্য উমেশচন্দ্রের বাটীটি আড়াইলক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া লন এবং উমেশচন্দ্র লণ্ডনে ক্রয়ডন নামক স্থানে একটি বাটী ক্রয় করিয়া উহার নামকরণ করেন— 'খিদিরপুর হাউস।' নিজবাসভূমির প্রতি তাঁহার এমনই মমতা ছিল।

পরবৎসর তিনি পার্কষ্ট্রীটে ৬ সংখ্যক (এক্ষণে ২৪ সংখ্যক) বাটীটি ক্রয় করেন। কটনের কলিকাতার ইতিহাস পাঠে প্রতীত হয় যে এই বাটিতে পূর্ব্বে বাঙ্গালার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট বাস করিতেন। পরবর্ত্তী ছোটলাটদের বাসের জন্য উক্ত বাটীটি গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ক্রয় করেন তজ্জন্য স্যর জন গ্রাণ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বেলভিডিয়ারে ছোট লাটদের বাসভবন স্থির করেন। উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা উহা বিক্রয় করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অভিমত

উমেশচন্দ্র সমাজ সংস্কার বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতেন কিন্তু হৈ চৈ করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন এবং য়ুরোপীয়ানগণের বাটীতেও সামাজিক নিমন্ত্রণে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বাল্যবিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বালিকাগণকে শিক্ষিতা করিয়া পরে বিবাহ দেওয়া উচিত এই মত পোষণ
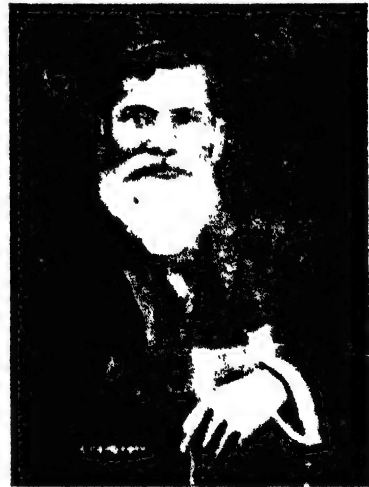
শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

করিতেন। ইংলণ্ডে উমেশচন্দ্র, দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া

ছিলেন তাহার প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে উহাতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে ছুইটী উমেশচন্দ্রের, একটি কর্ণেল জি-টি-হেলী, একটি দাদাভাই নৌরোজী, একটি স্তর এ-কটন্ কে-সি-এস-আই এবং আর একটি ফিরোজশাহ মেটার। উমেশচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ "ভারতবর্ষের জন্ত প্রতিনিধি-মূলক দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে অপর প্রবন্ধটির বিষয় ছিল" হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের সংস্কার। তাঁহার চারিকন্তা নলিনী, সুশীলা, প্রমীলা ও জানকী সকলেই এম্-বি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়া কন্তা এম-ডি উপাধিও লাভ করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় দেহরক্ষা করেন। বালবিধবা বিবাহের তিনি পোষকতা করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা মোক্ষদা দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্তা বিনোদিনী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (যে বৎসর উমেশচন্দ্র বিলাতে যান) জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে বিনোদিনীর বিবাহ হয় এবং বিবাহের ১৫ দিনের মধ্যে তিনি বিধবা হন। তাঁহার পিতা উমেশচন্দ্রের ভগিনীপতি ভাগলপুরের সরকারী উকীল শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত ও উদারচরিত্র ছিলেন। তিনি বিনোদিনীকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিতে মনঃস্থ করিলেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ভক্ত হাইকোর্টের উকীল স্বনামধন্ত দুর্গামোহন দাশের সহিত তিনি পরামর্শ করেন এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন তরুণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিনোদিনীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভাগলপুরে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। উমেশচন্দ্র ও দুর্গামোহন দাশ এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং মোক্ষদা দেবী রচিত 'কল্যাণ-প্রদীপ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে উমেশচন্দ্রের খুল্লতাত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন।* বিনোদিনীর বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। উমেশচন্দ্র তাঁহার এই ভাগিনেয়ীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিনোদিনী দেবী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ল ফ্যাকাল্টির ডীন্

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্ত নিযুক্ত হন। এই বৎসরে পুনরায় তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টির ডীন বা প্রধানাধ্যক্ষ এবং সিণ্ডিকেটের সদস্ত নির্ব্বাচিত হন। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে য়ুরোপীয়গণের একাধিপত্য ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই পদে অধিষ্ঠিত হন এবং পরবৎসর হাইকোর্টের প্রধান সরকারী উকিল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসরকাল উমেশচন্দ্র এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস যাঁহার নখদর্পণে ছিল, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ভাইসচ্যান্সেলার স্তার

ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

* মোক্ষদা দেবী তাঁহার খুল্লতাত ভৈরবচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বনপ্রসুন' নামক কাব্যগ্রন্থখানি যেমন ভক্তিভাজন অগ্রজ উমেশচন্দ্রকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সফলস্বপ্ন' নামক ইতিবৃত্তমূলক উপন্তাসখানিও তেমনই তাঁহার পরম শ্রদ্ধার পাত্র ভৈরবচন্দ্রকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। ভৈরবচন্দ্র অত্যন্ত উদারহৃদয় ও কোমলপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন এবং মোক্ষদা দেবীর কন্তা বাল্যকালেই বিধবা হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। বিধবা কন্তার বিবাহকালে তিনি তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভৈরবচন্দ্রের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, মোক্ষদা দেবী তাঁহার কল্যাণ প্রদীপের ৯১ পৃষ্ঠায় ভৈরবচন্দ্রকে যে আদি-সমাজের ব্রাহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা একান্ত অমূলক। তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দু আচার ব্যবহার মানিয়া চলিতেন। ভৈরবচন্দ্রের বংশধরগণের মধ্যে আরও কেহ কেহ মোক্ষদা দেবীর এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে উমেশচন্দ্রের কার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন।—

"In Mr. Woomes Chandra Boonerjee, we have lost a striking personality, a distinguished law-

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

yer who attained the highest eminence in his profession. As President of the Faculty of Law, as member of the Syndicate, and as our first representative on the Provincial Council, he gave evidence of his wide and varied culture and of his robust commonsense and sturdy independence of character; and the graduates of this University are indebted to him for his successful efforts in the cause of recognition of their legitimate claims to University appointments."

ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল

উমেশচন্দ্র ২৯শে মার্চ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত, ২৬শে মার্চ ১৮৮২ হইতে ২১শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ পর্য্যন্ত, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ হইতে ২১শে নভেম্বর ১৮৮৬ পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৬ মার্চ হইতে ৯ই নভেম্বর ১৮৮৭ পর্য্যন্ত ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্তর চার্লস পল একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল এডভোকেট জেনারেলের পদ অধিকার করিয়া থাকায় উমেশচন্দ্রকে উক্ত পদে বরণ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। উমেশচন্দ্রের জুনিয়র বা শিষ্যস্থানীয়গণের মধ্যে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, লর্ড সিংহ, স্তর আশুতোষ চৌধুরী, স্তর বিনোদচন্দ্র মিত্র, স্তর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, স্তর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি বহু ব্যারিষ্টার অনন্তসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কেহ কেহ হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল, ফেডার্যাল কোর্টের এডভোকেট জেনারেল, ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের প্রতিভা যে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবগণের সমতুল্য তাহা উমেশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে।

আত্মহত্যা

প, ন, ল

সদারুষ্টা স্ত্রী, অনূঢ়া কন্যা, চাকুরি-বিহীন পুত্র, বিধবা পিসি-মা, অর্থের অনাটন, পৈতৃক ঋণ—এই প্রকারের বহু সমস্যা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের পথ ক্রমশঃ বন্ধুর হইয়া পড়িতেছে। সুখ নাই, শান্তি নাই, সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা ও তার আনুষঙ্গিক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা। এইরূপ জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা সহজ। ঠিক করিয়া ফেলিলাম যে আজই রাত্রে আত্মহত্যা করিব।

সন্ধ্যার সময় ভাদুড়ী মশাইএর শেষ দর্শনলাভ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। চিরাচরিত অভ্যাস মত তিনি গীতা পাঠ করিতেছিলেন এবং তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গৃহিণীকে বুঝাইতেছিলেন। তন্ময় হইয়া গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথে মনের মধ্যে দুইটি প্রশ্নের উদয় হইল। প্রথম প্রশ্নটি এই—কি জন্য আত্মহত্যা করিবে? উত্তর পাইলাম—অশান্তি দূর হইবে এবং গভীর শান্তি লাভ করিব। দ্বিতীয় প্রশ্ন—মৃত্যুর পর কি হইবে? একদল বলেন যে মৃত্যুর পর জীব পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। অন্যদল বলেন যে মৃত্যুর পরও জীবন আছে।

তর্ক না করিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম যে মৃত্যুর পরও জীবন আছে। কিন্তু সে জীবন কোথায় এবং কিরূপ তাহার আকৃতি তাহা মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আত্মহত্যার পর আমার আত্মার কি দশা হইবে তাহা আমি জানি না। যদি মৃত্যুর পরও জীবন থাকে তাহা হইলে এই অশান্তির অপেক্ষা আরও ভীষণ অশান্তি আমার ভাগ্যে লেখা আছে কি না তাহা কে বলিতে পারে! বর্ত্তমান অশান্তির স্বরূপকে আমি চিনি এবং উহা আমার সহ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনাগত জীবন ও তাহার রূপ অনিশ্চিত। সে জীবন অধিকতর ভয়াবহ হইবে কি না তাহা সঠিক বলা অসম্ভব। অতএব আত্মহত্যা করিয়া অন্ধকারে লাফ দেওয়া নিছক মূর্খতা।

আত্মহত্যা স্থগিত রহিল। প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া অশান্তি দূর করিব। বাড়ীতে ফিরিয়া আমার ছাত্রদের লেখা

প্রাক্‌মোঙ্গল ইরাণে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

(২)

সেলজুক বংশের রাজত্বকাল ১০৩৭ হইতে ১১৯৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। সেলজুকেরা সুবিবেচনা ও দৃঢ়তার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সুশাসনের ফলে দেশে ধনবৃদ্ধি পাইল, গমনাগমন নিরাপদ হওয়ায় জ্ঞানিগণের সমাগম সহজসাধ্য হইল। শিল্প ও সাহিত্য ছিল ইঁহাদিগের নিকট নূতন আবিষ্কারের ন্যায়, তাই এ দুয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। মঙ্গলজনক পরিবেশ ফলে কবি, শিল্পী, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, ব্যবহারবিদ্ সকল শ্রেণীর বিদ্বজ্জনই, যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তিবলে, আপনা হইতেই আবির্ভূত হইয়া দেশের জ্ঞান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বোল্লিখিত ইবন্‌সিনা (Avicenna) (১)। যিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও বহুবিষয়িণী বিদ্যার পারদর্শিতা হেতু অভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার একখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ (Canons of Medicine) খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের জন্য ব্যবহৃত হইত, তিনি এই প্রাক্‌মোঙ্গল যুগে, সামানীর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়া মহনীয় সেলজুক যুগের ঠিক প্রারম্ভেই—খৃঃ ১০৩৭ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

সেলজুক অধিকারে স্থাপত্যে এবং কারুশিল্পের বিভিন্ন শাখায়, যথা মৃৎশিল্প, ধাতবশিল্প ও বয়নশিল্পে এ যুগের শিল্পিগণ শিল্পসৃষ্টির যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অনবদ্য (২)।

সেলজুক বংশে যে চারিজন বিখ্যাত নরপতি জন্মগ্রহণ করেন তুগ্রলের উত্তরাধিকারী আল্প্ আর্সলান্ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার পরবর্ত্তী নৃপতির নাম মালিক সাহ। মালিক সাহের পুত্রগণের মধ্যে তাঁহার চতুর্থ পুত্র সুলতান সঞ্জর অথবা সিঞ্জরই উল্লেখযোগ্য। ১০৯২ খৃঃ অব্দে মালিক সাহের দেহান্ত হইলে পর সিঞ্জর ও তাঁহার দুই ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া রাজ্যে অন্তর্দ্রোহ ঘটে। অবশেষে সিঞ্জরই ইরাণে রাজত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন।

সিঞ্জর খোরাসানের রাজপদ প্রাপ্ত হন ১০৯৬ খৃঃ অব্দে। সাহস, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতার জন্য তিনি সকল ঐতিহাসিকেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদের মৃত্যুর পর মামুদ নামক যে চতুর্দ্দশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হঠকারিতার সহিত তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত ও বন্দীরূপে গৃহীত হয়, তিনি তাহার প্রতি সস্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তো করিয়াছিলেনই পরন্তু তাহাকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিয়া রক্তের নিকট সম্পর্ক উদ্বাহসূত্রে আরও ঘনিষ্ঠতর করেন।

সুদীর্ঘ ত্রিসপ্ততি বর্ষ আয়ুষ্কাল মধ্যে সিঞ্জর বহুবার বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে অবশেষে পরাজিত হইতে হইয়াছিল ১১৪১ খৃঃ অব্দে চীনা তুর্কিস্থানের "কারা খিতাই" বংশীয় তুর্কমান দিগের নিকট। ১১৫৩ খৃঃ অব্দে গাজ্জ নামক এক যাযাবর দলের কবলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে চারি বৎসর কাল বন্দী জীবন যাপন করিতে হয়। অবশেষে তিনি কোনক্রমে পলাইতে সমর্থ হন। যাযাবর তুর্কমানগণ (Turcomans) মার্ভ ও পরে নিশাপুর অধিকার করিয়া অধিবাসীদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। বিংশ বৎসর খোরাসান শাসন করিয়া সিঞ্জর মার্ভনগরেই শেষ চত্বারিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মার্ভ হস্তচ্যুত হইলে পর তিনি ভগ্নহৃদয়ে ১১৫৭ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

সুলতান সিঞ্জরের মৃত্যুর সহিত যে শতাব্দের (খৃঃ অঃ ১০৫৫-১১৫৭) অবসান হয় পারস্যের শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা একটি বিশিষ্ট ও গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন আততায়ী দলের অবাধ লুণ্ঠন ও নৃশংস ধ্বংসলীলায় সেলজুকীয় শিল্প নিদর্শনগুলি প্রায়শঃ বিনষ্ট হইলেও সে যুগের কীর্ত্তিকাহিনী একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সিঞ্জরের কথা তাঁহার প্রায় সমসাময়িক কবি নিজামীর কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং একাধিক পারসীক চিত্রশিল্পী সুলতান সিঞ্জর ও তাঁহার নিকট বিচারপ্রার্থিনী বৃদ্ধা ভিখারিণীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন (৩)।

সেলজুক অধিকারে পারস্যের সাহ হইয়া পড়িলেন ইহাদিগের অধীনস্থ সামন্ত প্রজা মাত্র। কিন্তু চিরদিন সমানে যায় না। খৃঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে সোলঘরের আটাবেক (আটাবেগ) দিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে সেলজুক প্রতাপ ক্রমেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দের শেষপাদেও সেলজুক রাজবংশে শিক্ষা ও সুরুচির বিস্তার বড় কম ছিল না। ১১৮৪ খৃঃ অব্দে সেলজুকীয় রাজকুমার তুগ্রল (তুঘ্রল-ইবন্-আর্সলান্) জইনদ্দিন রাওয়েন্দি কর্ত্তৃক সংগৃহীত একখানি কবিতাবলীর নকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সেই পুঁথিখানি ইস্পাহানের অধিবাসী জামাল নামক এক চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়া লইয়াছিলেন। যে যে কবির কবিতা এই সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে

---

(১) ইঁহার পুরা নাম আবু আলি অল্ হসান ইবন আব্দুল্লা ইবন সিনা (খৃঃ অঃ ৯৮০-১০৩৭)।

(২) দৃষ্টান্তস্বরূপ রেখাচিত্রোক্তব 'সিলুয়েট্' (Silhouette) জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ অলঙ্করণে পরিশোভিত মৃৎপাত্র, রায়ী নগরীতে প্রাপ্ত তাম্র বস্ত্র ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত বিচিত্র কারুকার্য্যপূর্ণ একটি ভৃঙ্গারের (Ewer এর) উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহার প্রত্যেকটিই দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত।—A. U. Pope, Introduction to Persian Art, p. p. 11-12.

(৩) Sakisian, La Mimiature Persane du XIIe an XVIIe Siecle, p. 5.

সেই সেই কবির প্রতিকৃতি তাঁহার কবিতার উপরিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে (৪)।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত সেলজুক বংশের কয়েকটি শাখা খোয়ারজ্মের (খিভার) সাহদিগের অনধিকৃত সেলজুক বংশের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতে থাকে। এই সাহ বংশের উদ্ভব হয় খিভারই এক শাসনকর্ত্তা হইতে। সেলজুক বংশের শেষ সুলতান, মহম্মদ, চেঙ্গিজ খাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় মোঙ্গল আক্রমণের উত্তাল তরঙ্গে সারাদেশ প্লাবিত হয়। মোঙ্গল্ শক্তি প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইলেও তুর্কগণ এসিয়ার পশ্চিমাংশের অধিকার হইতে একবারে বিচ্যুত হয় নাই—কেবল স্থানত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে কিছু দক্ষিণাংশে সরিয়া যাইতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দেও 'শ্বেতমেষ' (আক্ কিউন্) ও 'কৃষ্ণমেষ' (কারা কিউন্) নামে পরিচিত ইহাদেরই দুই গোষ্ঠী সিরিয়া ও পারস্যের ইতিহাসে যে অংশ অভিনয় করে তাহা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই (৫)। মুঙ্গারি ও গোবি মরুবাসী যাযাবরদিগের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া যে মোঙ্গলেরা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে 'হিয়োংনু' অর্থাৎ যাযাবরদিগের বশ্যতাসাধক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে তাহারাই আবার দিগ্বিজয়ীরূপে আবির্ভূত হইয়া তুর্কশক্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল।

পারস্যে, সেলজুকীয় যুগে, চিত্র শিল্পের দিক দিয়া যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল কেহ কেহ তাহা আব্বাসীয় শৈলীরই বিশিষ্ট রীতি বলিয়া মনে করেন। বোগদাদ শৈলী সম্পর্কে এ কথা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ খৃঃ ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত মিশরের আয়ুবাইদ ও রুমের সেলজুকাইদ এই উভয় বংশের শিল্পেই মধ্যযুগের গ্রীক (বাইজান্টাইন) শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় (৬)। সে যাহা হউক খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে, পারস্যের অন্তর্গত সেলজুক রাজ্যে, পুস্তক চিত্রণার্থ পারসীক শিল্পীর নিয়োগ, গ্রীক প্রভাব মুক্তির কথাই সুচিত করে।

সে সময় ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্পর্ক কি ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল এস্থলে তাহার উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

আরব আক্রমণের মুখেই ভারতীয় শিল্পীরা পূর্ব্ব-ইরাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতকের তৃতীয়পাদের প্রথমাংশে রাজা ধর্ম্মশ্রী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শাক্যমুনির উপাসকেরা ইহার দীর্ঘকাল পরেও পূর্ব্ব তুর্কিস্থানে বাস করিতে থাকেন। খৃঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দেও তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ মোঙ্গল ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। মধ্য এসিয়ার আর্য্যেরা তাঁহাদের জাতি ও ভাষা উভয়ই হারাইয়াছিলেন মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া (৭)।

(৪) Huart, Les Calligraphes et les Miniaturistes Musal-man.

(৫) সমগ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া এই দুই গোষ্ঠী পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইয়া দেয়। ইহাদিগের রাজধানী যথাক্রমে তাব্রিজ ও কাজভিনে অবস্থিত ছিল এবং ইহাদিগের রাজ্য বিস্তৃত ছিল ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত।

(৬) Huart. op. cit., p 326 et seq.

(৭) E. Biochet, Musulman Painting, 12th to 17th Century, translated by Cicely Binyon, pp 68, 69 & 71.

আর্য্যভূমি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম্-এ বি-টি (ক্যাল) ডিপ্-এড্ (এডিনবরা ও ডাব্লিন)

কেহ কেহ অনুমান করেন বড় একটা তুষার স্রোতের পূর্বে আর্য্যদের আদিবাস উত্তরমেরু অঞ্চলেই ছিল। তখন বিচিত্র ভৌগলিক বিধানে মেরুর হাওয়া নাকি নাতিশীতোষ্ণ ছিল, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজ করিত। তুষার যুগের বিপর্য্যয়ের পর আর্য্যদের বাসস্থান মঙ্গোলিয়ার উত্তরাংশে সাইবেরিয়ার দক্ষিণাংশে, রুশিয়ার কতকাংশে এবং হাঙ্গেরী ও জার্ম্মানী প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। তখন কিন্তু মঙ্গোলিয়া হইতে বর্ত্তমান পারস্য উপসাগরের তীরভূমি পর্য্যন্ত সব সাগর ছিল। কোন একটী প্রলয়কালে সেই সাগরজলে উদ্বেলিত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিমে সরিয়া আসে। সেই জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বৈবস্বত মনু সপরিজনে তাঁহার ভাসমান আশ্রয়ে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া কারাকোরাম পর্বতে লাগেন, আর, সার্বর্ণিমনুর নৌকা আরারতে আসিয়া ঠেকে। এই জলোচ্ছ্বাসের পর মঙ্গোলিয়ার বর্ত্তমান 'হান হাই' বা শুষ্ক সাগর মরুরূপে পরিণত হয়, কাস্পিয়ান ও আরল সাগর স্থলের মাঝে বন্দী হইয়া পড়ে আর কাহারও মতে সাহারার স্থলে জল সরিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান মরুর উৎপত্তি হয়। খৃষ্টজন্মের প্রায় আট হাজার বৎসর আগে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ভূমধ্যসাগরের স্থলে আটলান্টিস জাতি ও সভ্যতার চিরতরে নিমজ্জন ঘটে বর্ত্তমানের আটলান্টিক মহাসাগর লুপ্ত আটলান্টিসের সাক্ষী—এই জলোচ্ছ্বাসের সমসাময়িক কিনা জানি না। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি ও মরুভূমিগুলিতে আর্য্যভূমি নিবেশিত হওয়ার কোন বিশেষ সম্ভাবনার কথা মনে হয় না। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুকুশ অবধি অঞ্চল ও প্রলয় কম্পনে উত্থিত গাঙ্গেয় অববাহিকাই মহাভারতোক্ত কুশভূমি সমন্বিত আর্য্যস্থানের সম্ভাবনাকেই অধিক মনে হয়। কারাকোরামের উত্তর পশ্চিমে মধ্য ও উত্তর পশ্চিমোত্তর ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ায় অধিকাংশে আর্য্যস্থান বোধহয় ককেসাসের দিক হইতেই প্রসারিত হয়। তবে ভারত কেন্দ্রীয় আর্য্যভূমিও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উৎকর্ষের সময়ে পশ্চিম প্রসারী হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ব্যাবিলনীয় বা বেবিরুষ সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের সভ্যতাকেন্দ্র ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র ব্যাবিলনই আবার বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশব দোলনায় পরিণত হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধিকায় আর্য্যদের আদি বাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রবর্ত্তিত আমাদের চিন্তাধারায় এ পরিবর্ত্তন বেশ একটু লক্ষ্য করিবার জিনিস। *

* এ বিষয়ে ৺বালগঙ্গাধর তিলক, বিনোদবিহারী রায়, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র প্রভৃতির মত অনুধাবন যোগ্য।...

পঞ্চসতী

শ্রীকুমারেশ রায়

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশকম্‌

আজিকার দিনে দুই চারিটি প্রাচীন-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী এবং এ যুগের অধিক সংখ্যক প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের লইয়াই আমাদের সমাজ গঠিত। সমাজের এই দুই প্রকার ব্যক্তির মধ্যে পঞ্চসতী সম্বন্ধে দুইটি ধারণা বর্ত্তমান দেখা যায়। যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা পঞ্চকন্যাকে পুরাণের নির্দ্দেশমত সতী বলিয়া নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া থাকেন। ঋষি-নির্দ্দেশ, অতএব এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। কিন্তু কেন এই নির্দ্দেশ এ প্রশ্ন তাঁহাদের মনের অন্তঃস্তলে উঠে না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এ যুগের প্রগতিশীল যাঁহারা, নির্ব্বিচারে কিছুই যাঁহারা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা পঞ্চকন্যার সতীত্বের নামে মৃদুহাস্য করিয়া থাকেন। বেশী দোষারোপ করাও যায় না। কারণ পঞ্চকন্যার সতীত্ব-প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন না হইলেও, তাহা সর্ব্বপ্রকার অন্ধবিশ্বাস ও লঘুচিত্ততার বাহিরে বলিয়া আজিও তাহা অনেকের কাছেই অবিদিত আছে বলিয়া মনে হয়।

কেন এই ঋষি-নির্দ্দেশ? কেন এই পঞ্চকন্যা সতীপর্য্যায়ভুক্তা? এ প্রশ্নের মীমাংসা যাহা তাহা কোনদিন ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে নাই, এবং প্রগতিবাদীর বৃথা বুদ্ধি-অভিমানকে উপেক্ষা করিয়াই বর্ত্তমান আছে। প্রশ্নটির মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পুরাণের ঋষিদের হাতেই আদর্শ নারীচরিত্র সীতা, সতী ও সাবিত্রীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, আদর্শ আদর্শই। আদর্শ হইবে সকলের লক্ষ্য, তাহা লাভ করিতে পারিলে উত্তম। কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, ঘটনা সমন্বিত জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যখন সকলেরই এক হইতে পারে না, তখন স্বভাবতঃই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা এই আদর্শের অন্তরায় হইতে পারে। সেই সকল অবস্থায় আদর্শের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে হয় কষ্টকর, নতুবা অসম্ভব, নতুবা অনাবশ্যক হয়। সে ক্ষেত্রে নারী যদি আদর্শের অনুসরণ করিতে না পারে তাহা হইলে সে নারী সমাজে বর্জ্জনীয় বা হেয় বলিয়া গণ্য হইবে না। সেই সকল অবস্থায় নারীর সাময়িক বিচ্যুতিকে অথবা আদর্শ-বিচ্যুতিকে উদারচেতা পৌরাণিক ঋষি সম্পূর্ণ উপেক্ষনীয় বলিয়া গণ্য করিতে ও তাঁহাদিগকে সতীর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চকন্যার সতীত্বের মূল নীতি এইখানেই।

যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলিব। অহল্যার কথা ধরা যাউক। স্বামী গৌতম মহাতপা ঋষি। তপস্যাই তাঁহার জীবনের কাম্য ও কর্ত্তব্য ছিল। এই অবস্থায় অহল্যা উপেক্ষিতা ছিলেন। উপেক্ষিতা স্ত্রীর সাময়িক বিচ্যুতি (প্রকৃতিগত নহে) মার্জ্জনীয়। মহর্ষি বাল্মীকির ইহাই ছিল উপদেশ। শ্রীরামের চরণস্পর্শে অহল্যা শাপমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করেন। কথাটি অর্থপূর্ণ। উপেক্ষিতা নারী জীবন লাভ করিতে পারে শ্রীরামের মত পত্নীগত প্রাণ স্বামীর স্পর্শে।

দ্রৌপদী। কুন্তী অজ্ঞাতসারেই পঞ্চপাণ্ডবকে আদেশ দিয়াছিলেন। তথাপি ধরিয়া লইতে পারি এই মাতৃ-আজ্ঞার কাহিনীটি কোনো দুর্লঙ্ঘ্য অবস্থার বা প্রয়োজনের স্বরূপ। সুতরাং দ্রৌপদীর আখ্যানে ইহাই বলা হইয়াছে যে কোনো বিশেষ কারণবশতঃ বিবাহ-সিদ্ধ বহুপতিত্ব নারীর সতীত্বের অন্তরায় নহে। বিশেষতঃ স্বামীর প্রতি আনুগত্য যখন সতীত্বের অপর একটী নীতি, স্বামী একাধিক হইলেও সে নীতি প্রযোজ্য।

একটী কথা বলা প্রয়োজন। দ্রৌপদীর বহুপতিত্ব পুরুষের বহুপত্নীত্বের অনুরূপ। বহুপত্নীত্ব যদি নিয়ম হয় (অবশ্য আদর্শ নহে) তবে বহুপতিত্ব কারণ সম্ভূত ব্যতিক্রম মাত্র কেন বলা হইতেছে। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার হিসাবে নিয়ম কেন হইবে না। তদুত্তরে বলা যায় যে অন্য চারিটি সতীর উদাহরণ ব্যতিক্রম তাহা আমরা এখনই দেখিয়াছি ও দেখিতে পাইব। তাহাদের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করার দ্রৌপদীকে ব্যতিক্রমভাবেই ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বহুপতিত্ব যদি নিয়ম হইত তাহা হইলে সতীত্বের প্রশ্নই উঠিত না, যেমন পুরুষের পক্ষে। নারীর সতীত্বের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াই ঋষিগণ বর্ত্তমান নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বহুপতিত্ব নিয়ম হইলে ইহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন মানিয়া লইলেন, কেন পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিলেন না, এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। তথাপি এ বিষয়ে একটী কথা বলিয়া এ প্রশ্নের উপসংহার করিব। চিরপ্রচলিত এবং সর্ব্বদেশ প্রচলিত নারীর একপতিত্বের, যাহা সতীত্বের প্রধান এবং মূল সংজ্ঞা, তাহার নীতি প্রকৃতির নিয়ম হইতে জন্মিয়াছে। ইহা মানুষ বা পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, যদিও মানুষের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। সন্তান জন্মের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক নারী বহুপতিত্ব সম্ভব নহে, যেমন এক পুরুষের বহুপত্নীত্ব সম্ভব! প্রকৃতির এই বিভেদের জন্যই সর্ব্বত্র এ পর্য্যন্ত নারীর সতীত্বের ধারণা ও প্রয়োজন গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্রৌপদীর জীবনের কথা স্মরণ করিলেও তাঁহার শেষ মধ্য জীবনে পঞ্চপাণ্ডবের পৃথক পতিত্বের কাহিনী পাওয়া যায়।

সুতরাং দ্রৌপদীর বহুপতিত্ব ব্যতিক্রম এবং বিশেষ অবস্থায় ইহা মার্জ্জনীয়, তাহাই তাঁহার কাহিনীর উপদেশ। দ্রৌপদী সম্বন্ধে আর একটী কথা পরে আলোচনা করিব।

কুন্তী। কুন্তীর তথাকথিত বিচ্যুতি স্বামীর আদেশ অনুযায়ী। এরূপ ক্ষেত্রেও নারীকে সতী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কুন্তীর কাহিনীতে ইহাই নির্দ্দেশ। বর্ত্তমানেও অপরাধ-তত্ত্বের একটি অনুরূপ সূত্র এই যে স্বামীর মৌন সম্মতি থাকিলে ব্যাভিচার হয় না। এবং এইরূপ কারণেই আর একটি নীতি এই যে বিবাহ-সম্পর্কিত সমস্ত অপরাধ স্বামী স্ত্রী কাহারও অভিযোগ ব্যতীত আদালতে গ্রহণ করা হয় না।

কর্ণ কুন্তীর কুমারী অবস্থার সন্তান। অপরিণত বুদ্ধির বশে

কুমারী অবস্থার সাময়িক ভ্রম (স্বভাবগত নহে) মার্জনীয়, কুন্তীর জীবনের এই অংশের উপর মহামুভব ঋষিদের ইহাই ছিল অভিমত। তাই তিনিও সতীপর্য্যায় ভুক্তা।

তারা ও মন্দোদরী। ইহাদের উদাহরণের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। বিধবার পুনর্বিবাহ সতীত্বের অন্তরায় নহে। দুইটি উদাহরণের তাৎপর্য্য এই হইতে পারে যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল এবং অধিক হওয়া উচিত বলিয়াও মনে করা হইল। পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাও সতী, ইহাই ছিল ইহাদের উপাখ্যানের মর্ম্ম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি দ্রৌপদী সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। সেটি এই। পঞ্চপাণ্ডবের অরণ্যবাসকালে একদিন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কৌশলে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রত্যেকের মনের নিগূঢ় কামনার কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ঘটনার আখ্যানভাগ লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। সকলেই জানেন বা মহাভারত হইতে জানিতে পারেন। তখন দ্রৌপদী সকলের সমক্ষে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার নিভৃত কামনা এই ছিল যে, কর্ণকে স্বামীরূপে পাইলে তিনি সুখী হইতেন। পঞ্চপাণ্ডব এই কথা শুনিয়া দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানাকথায় নিরস্ত করেন। মহাভারত রচয়িতা ঋষির এই দ্রৌপদী তথাপি সতীপর্য্যায়ভুক্তা। দ্রৌপদীর এই কাহিনীতে ঋষি যাহা নিহিত রাখিয়া গেলেন তাহা এই। কাহারও মনের কথা দিয়া তাহাকে বিচার করা চলিবে না। মন কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। সে আপনার পথ অবলম্বন করিবেই। তাহা লইয়া সংসার করা চলে না। কোনো নারীর অন্তরের কথা লইয়া তাহাকে সতী অসতী স্থির করিতে নাই। মন অন্যরূপ হইলেও, আচরণ নহে, নারীর সতীত্বে হানি হইবে না। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যায় বর্ত্তমানকালের মনস্বীদের দুই একটী মন্তব্য ও অভিমত। কোনো মনস্বী লেখক এই মর্ম্মে একটী কথা লিখিয়া গিয়াছেন, "If it were possible to know the mind of the chastest woman, there would have been scandal।" দ্বিতীয়টী অধুনা স্বীকৃত বিধি, মনোভাব কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত অপরাধ হয় না।

সুতরাং দেখিতে পাই আদর্শ হইতে কোন্ কোন্ ব্যতিক্রমে নারী সতী বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাই এই পঞ্চসতীর উদাহরণে প্রাচীন ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপেক্ষায়, স্বামীর আজ্ঞাক্রমে, কুমারী অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধিতে সাময়িক বিচ্যুতি সতীত্বের অন্তরায় নহে। অবস্থা বিশেষে বহুপতিত্বেও সতীত্বের হানিকর নহে। মনের অনিবার্য্য চিন্তামাত্রও নারীর সতীত্বের অন্তরায় নহে। পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাও অসতী নহেন। ইহাই ঋষিগণের উপদেশ ছিল, এই পঞ্চসতীর কাহিনীতে।

যে সকলস্থানে সাময়িক বিচ্যুতি বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। স্বভাবগত ব্যাভিচারের উদাহরণ পঞ্চসতীর মধ্যে নাই।

সুতরাং বলিতে হয় যে, ধর্ম্মের অনুশাসনের দোহাই দিয়া আমরা যে পঞ্চকন্যাকে সতী আখ্যা দিব ইহাও নহে, অনুদার মনোভাব লইয়া লঘু ধারণার বশে পঞ্চসতীকে বিদ্রূপ করিব ইহাও নহে। যে উদার মনোভাব লইয়া ব্যাস বাল্মীকি ইহাদের কাহিনী লিখিয়া সমাজকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই উদার মনোভাব থাকিলেই পঞ্চসতীর মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে।

উদ্ধৃত শ্লোকটীর শেষাংশ 'মহাপাতকনাশনম্' কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। নারী হত্যা বা নারীনির্য্যাতন মহাপাতক। নারীর কঠোর সতীত্বের দাবীতে অনেকেই নারীহত্যা বা অন্যভাবে তাহার উপর কঠোর নির্য্যাতন করিয়া মহাপাপ করে বা করিতে পারে। এই পঞ্চসতীর কথা স্মরণ রাখিলে সে মহাপাতকের প্রবৃত্তি কাহারও হইবে না। এই সকল অবস্থায় নারীকে সমাজে স্থান দিতে হইবে। ইহাই এই অংশের তাৎপর্য্য।

ইহাও সত্য বলিয়া মনে হয় যে, যদিও বৈধব্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থার কথা রামায়ণের যুগেই চিন্তা করা হইয়াছিল (তারা ও মন্দোদরীর উদাহরণ), তথাপি রামায়ণের পরবর্ত্তীযুগের সমাজ রামসীতার আখ্যানে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে সীতার আদর্শ ভিন্ন কিছুই মনঃপূত হইত না। অবশ্য ভুলিয়া যাইত যে তাহা হইলে রামের আদর্শ গ্রহণ করাও একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু সীতার পূর্ণ আদর্শ লাভ করা সকলের পক্ষে সর্ব্বদা এবং বিশেষ করিয়া সকল অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই মহাভারত রচনায় অন্য দুইটি নারী চরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহাতে সমস্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ সঙ্গতভাবে সহনশীল হয়, সমাজে অনর্থ না ঘটে, মহাপাতক না ঘটে এবং সমাজ রক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় উদারতাগুলি সমাজে স্থান পাইয়া তাহার প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। বাস্তবজগতের মানুষের পক্ষে কঠোর আদর্শের মোহে (যদি তাহা লক্ষ্য) বাস্তবকে এবং অবস্থাকে উপেক্ষা করা চলে না। সঙ্গত উদারতা বিসর্জ্জন দেওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। অবস্থা বিশেষে নারীকে মার্জ্জনা করিবার, অথবা নারীর পূর্ণ আদর্শের ব্যতিক্রম করিয়া তাহাকে মানুষের অধিকার দিবার একান্ত প্রয়োজন সমাজের আছে, সমাজের আপন কল্যাণেই, পঞ্চসতীর শিক্ষা তাহারই।

পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলাম যে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মত এই যে, মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্বকার যুগের গ্রন্থ, কারণ মহাভারতের প্রধান নারীচরিত্র সীতার আদর্শের নিম্নে। কিন্তু যদি উপরোক্ত যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে যাহা প্রচলিত ইতিহাস, যে মহাভারতই পরবর্ত্তীকালের, তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। [আগামীবারে সমাপ্য]

প্রতিভা শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুসুম

আজ যারা মানহীন ধরণীর চোখে।
কাল তারা হবে মানি ধ্রুবতারা লোকে।

কেন ভালবাসি মোরা কুসুমের হাসি।
ক্ষণ-পরে ঝরে যায় তাই ভালবাসি।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন

অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম্-এ

(২)

উদার, সর্বজনীন বৌদ্ধধর্মের আহ্বানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পীড়িত ভারতীয় জনগণ সহজেই সাড়া দিল এবং বুদ্ধদেবের তিরোধানের কিছুকাল পরেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নব ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী স্থাপিত হইল। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে ভারতীয় সংস্কৃতি গৌরবোজ্জ্বল মাহাত্ম্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধযুগে লৌকিক ধর্ম পরিবর্তিত হইল বটে, কিন্তু প্রাসার্য ও আর্য সংস্কৃতির সম্মিলিত ধারা বিচ্ছিন্ন হইল না, তাহা বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারার সহিত সংগত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিল, বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইতে বৈদিক আর্য ভাষা বিকৃত হইয়া বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার জন্মদান করিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রাকৃতে তাঁহার উপদেশ দান করিয়াছিলেন, শৌরসেনী প্রাকৃতের প্রাচীনতম রূপ পালি ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ লিখিত হইল। এই বৌদ্ধযুগে কৃত্রিম, অপ্রচলিত ভাষা সংস্কৃতের উদ্ভব হইল এবং এই সংস্কৃত ভাষায় এক অসাধারণ সমৃদ্ধশালী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শাখা মহাযান ধর্মের গ্রন্থাদি সংস্কৃতেই লেখা হইয়াছিল, বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অতুলনীয় সাধনা হইয়াছিল। বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য ও বিহার দেশের নানা স্থলে স্থাপত্যকলার অনিন্দ্য নিদর্শনরূপে শোভা পাইতে লাগিল, মূর্তি নির্মাণ এবং পূজা বৌদ্ধদের দ্বারাই ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল এবং মূর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হইতে লাগিল।১৬ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং ঐ সব দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।১৭ খৃষ্ট পূর্ব ৩০০ শতাব্দীর কাছাকাছি আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হইল। গ্রীকদের ভারতে অবস্থানের ফলে ভারতীয় জীবন, শিল্পকলা ও ভাবধারা গ্রীক প্রভাবে মণ্ডিত হইয়া উঠে। ভারতীয় মুদ্রায় মূর্তি চিত্র খোদিত করার প্রথা গ্রীক প্রভাবের ফল।১৮ গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় ভাস্কর্য্য, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপর সম্ভাব্য গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান। ভারতীয় সাহিত্যে যথা কালিদাস ও ভবভূতির গ্রন্থাবলীর মধ্যেও পণ্ডিতেরা গ্রীক প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে অতি কথন দোষে দুষ্ট হইয়াছেন এবং সব কিছুর মধ্যে গ্রীক প্রভাব সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা অনেক স্থলেই স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। হিন্দুদের উপর যেমন গ্রীব প্রভাব পড়িয়াছিল, তেমনি গ্রীকরাও হিন্দুদের কাছ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দু দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পিথাগোরাসের উপর সাংখ্যদর্শনের প্রভাব অনেকেই নির্ধারণ করিয়াছেন।১৯ গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ হিন্দু বিজ্ঞান হইতে অনেক কিছু লাভ করিয়াছিল, গ্রীকগণ এই দেশে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং তাঁহাদের বংশধরগণ গ্রীক নামের পরিবর্তে হিন্দু নাম গ্রহণ করিতেছিল। এইভাবে গ্রসমান ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রীক সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া লইল।

বুদ্ধদেব যে সর্বজনীন সার্বভৌম ধর্ব প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তিরোধানের কিছুকাল পরেই অন্তর্বিরোধের দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়। হীনযান শাখার শাস্ত্রাবলী পালিতে লিখিত এবং বুদ্ধ হীনযানীদের মধ্যে ভিক্ষুক ধর্ম প্রচারক রূপে সম্মানিত। মহাযান শাখার গ্রন্থাবলী সব সংস্কৃতে লিখিত এবং নাগার্জুন এই শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। মহাযান ধর্মে বুদ্ধ আর মানব নহেন, তিনি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। বুদ্ধের মূর্তি বিহারে বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। মহাযান ধর্ম অল্পকাল মধ্যেই ভারতীয় জনসাধারণের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং চীন, জাপান, তিব্বতে এই মহান বৌদ্ধধর্মই প্রবেশ লাভ করে। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মের কাছে পরবর্তী হিন্দুধর্ম অনেক বিষয়ে ঋণী। মহাযান ধর্মের ধ্যানী বুদ্ধ পরবর্তীকালের শিব ও বিষ্ণু মূর্তির সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, মহাযান ধর্মের ধ্যান এবং সন্ন্যাস সম্বন্ধীয় উপাদান শৈবগণ এবং ভক্তি ও প্রেমমূলক উপাদান বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন।২০। মহাযান হইতে বজ্রযান এবং বজ্রযান হইতে সহজযান ধর্মের উৎপত্তি হয়। এই সব ধর্মে অনেক দেবদেবীর উদ্ভব ও পূজা প্রচলিত হয় এবং কালক্রমে এই সব দেবদেবী নব হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূজিত হইতে থাকে। হিন্দুদের শক্তি পূজা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন, নেপালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে হিন্দুদের শক্তিমূর্তির অনুরূপ বোধিসত্ত্বের অনেক স্ত্রী দেখা যায়, ইঁহারাই শক্তিমূর্তির নানা বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেন, আবার অবলোকিত এবং বজ্রপাণিও শিবরূপে হিন্দুদের মধ্যে পূজা পাইতে থাকেন।২১ পশ্চিম বংগে পূজিত ধর্মঠাকুর এবং শীতলা দেবী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবদেবীর নামান্তর তাহা সহজেই অনুমেয়। জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা এই তিন মূর্তিও বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধম, ও সংঘের রূপান্তর তাহাও অনেকে স্থির করিয়াছেন।

অশোকের পরে উত্তর ভারতে মৌর্য অধিকার লুপ্ত হইল এবং প্রতাপান্বিত গ্রীকগণ উত্তর ভারত দখল করিয়া শাসন করিতে থাকেন, এই গ্রীকগণ ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং অনেকে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পরে গ্রীকগণ মধ্য এশিয়া ও ইরাণ হইতে আগত কতকগুলি জাতির নিকট পরাজিত হন এবং গ্রীকরাজ্য বিলুপ্ত হইয়া আসে। এই নবাগত জাতি শক, পহ্লব এবং ইউচি নামে পরিচিত ছিল, প্রথমে শকগণ এবং পরে পহ্লবগণ উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতে থাকেন, ইহার পর কুষাণগণ ভারতে আগমন করিয়া উত্তর ভারত অধিকার করিয়া শাসন করিতে থাকেন, এই সব বিদেশাগত জাতি রাজ্যলিপ্সু, বিজেতা

---

১৬ India through the ages by Sir Jadunath Sarcar. p. 26

১৭ Civilisation of India by Ramesh C. Dutta. p 53.

১৮ ভারতের শিল্পকলা—অসিতকুমার হালদার, পৃ ১৩৯

১৯ Indias past by Macdonell, p. 157

২০ India through the ages by Sir Jadunath Sarcar, p, 56

২১ Indian Theism by Macnicol, p, 184

রূপে ভারতে প্রবেশ করিলেও কিছুকালের মধ্যেই তাঁহারা ভারতের ধর্ম, আচার নীতি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বিশাল ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গঠনে নানা সহায়তা করেন। বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্মের প্রসার এই সব বিদেশীদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং সাহিত্যের লক্ষণীয় উৎকর্ষের পরিচয় ইঁহাদের কালে আমরা লক্ষ্য করিতে পাই। কুষাণদের পরে গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ইতিহাসের স্বর্ণময় যুগ বলা হইয়া থাকে। গুপ্ত রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান হয় এবং হিন্দু পুরাণাদি এই সময় হইতে লিখিত হইতে থাকে। অবশ্য বৌদ্ধপ্রভাব যে একেবারে তিরোহিত হয় তাহা নহে ; গুপ্ত যুগের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়।২২ বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম, ও বৌদ্ধধর্ম, আত্যন্তিক বিরোধপূর্ণ বিপরীত মুখী ধর্ম নহে এবং একটা হইতে বিচ্ছিন্ন অপরটার বিচার চলে না, উভয় ধর্মই পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং বৃহত্তর ভারতীয় ধর্মের অন্তর্গত। গুপ্ত যুগে কালিদাস প্রভৃতি কবি, আর্যভট্ট বরাহমিহির প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক অভ্যুদিত হইয়া এই যুগকে অপূর্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য এশিয়া হইতে বর্বর হূন দল ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। নির্মম অত্যাচারীর নৃশংস রূপে তাহারা এই দেশে আগমন করে, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস-লীলার দ্বারা তাহাদের ইতিহাস কলংকিত করিয়া রাখে। কিন্তু সর্বংসহা ভারত এইরূপ অত্যাচারী, বিদেশী বর্বর জাতিকেও উদার আশ্রয় দানে কুণ্ঠা করে নাই। ক্রমে ক্রমে তাহারা ভারতে বসবাস স্থাপন করিয়া ভারতের জল বায়ু দ্বারা পুষ্ট হইয়া উঠিল এবং এই দেশের আর্য নারী বিবাহ করিতে লাগিল। হূন এবং আর্য রক্তের সংমিশ্রণে রাজপুত প্রভৃতি জাতির উদ্ভব হইল। হূনদের বংশধর বর্বর পিতৃপুরুষদের স্মৃতি লোপ করিয়া ভারতীয় সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া গেল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল, রাজা হর্ষ বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হওয়ায় সপ্তম শতাব্দীতেও বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মাণ প্রতিপত্তি কিছু অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু তাহার পর কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম-প্রবর্তকদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম নিঃশেষিত হইয়া গেল এবং পুনরায় হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী ভারত ভূমিতে স্থাপিত হইল। ইহার পর বংগদেশে পাল রাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বেশিদিনের জন্য নহে, সেন রাজাদিগের রাজত্ব-কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধধর্মকে নিস্তেজ করিয়া দেয়।. যে বৌদ্ধধর্ম এককালে মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের ন্যায় সুপ্রখর আলোকচ্ছটায় সমগ্র ভারত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এই দেশ হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল ইহা বিস্ময়কর মনে হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ শংকরাচার্য প্রভৃতি যত শক্তিশালী প্রচারক হউন না কেন, তাঁহারা কখনো বৌদ্ধভাবাপন্ন সমগ্র ভারতবর্ষকে পুনরায় হিন্দুধর্মাপন্ন করিতে পারিতেন না। বৌদ্ধধর্মের বিলোপ অথবা আত্মগোপনের কারণ অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই বৌদ্ধধর্ম কোন নূতন কিংবা বিরোধমূলক ধর্ম নহে, তাহা পূর্বে দেখানো হইয়াছে. আবার বৌদ্ধধর্মের প্রয়োজন যখন নিঃশেষিত হইল তখন ইহা বৃহত্তর ভারতীয় ধর্ম দ্বারা গ্রাসিত হইয়া গেল। নব হিন্দু ধর্ম আর্য ও অনার্যকে সমানভাবে আশ্রয় দান করিয়াছিল, মূর্তি পূজা প্রচলন করিয়াছিল এবং লৌকিক আচার ও নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং এই হিন্দু ধর্মের উত্থানে সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ক্রমে আত্মবিলোপ করিয়া আপন সত্তা হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছিল।২৩

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে আর্যসভ্যতা এবং আর্য অনার্যের সম্মিলিত হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে নানা ধর্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, বার বার বৈদেশিক আক্রমণের সুতীব্র আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, আভ্যন্তরীণ কলহ ও সংঘর্ষ ভারতের অংগ প্রত্যংগ ছিন্ন করিয়াছে, কিন্তু অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির অব্যাহত গতি রুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত নব ধর্ম বলে দৃপ্ত মুসলমানগণ যখন লুণ্ঠন লোলুপ আক্রমণকারীরূপে ভারতে প্রবেশ করেন তখন আত্মনিষ্ঠ, নির্বিরোধী ভারতীয় সত্তা প্রবল আঘাতে বিক্ষুব্ধ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। মুসলমানগণ ঠিক সময়ে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, কারণ ধর্ম কলহে তখন লোকের মন বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত এবং রাজনৈতিক বিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রে তখন ভারতভূমি শতধা বিচ্ছিন্ন, তাই সহজেই মুসলমান বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এক হাজার বৎসর মুসলমানগণ ভারতে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবাসী হিন্দু এবং বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে acculturation অর্থাৎ পারস্পরিক সংস্কৃতি করণ হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির উপর ইসলামের প্রভাব কার্যকর হইয়াছে। সামাজিক আচার ব্যবহার, শিষ্টাচার, পরিচ্ছদ, একেশ্বর বাদী ধর্মের উৎপত্তি, দেশীয় সাহিত্যের উদ্ভব, ইতিহাস লিখিবার রীতি, শাল, মসলিন, কার্পেট প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্পের বিকাশ—মুসলমান প্রভাবের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।২৪ মোগল চিত্রে ইরাণী ও হিন্দুস্থানী এই দুই প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়।২৫ মুসলমানগণের পূর্বে যে সব বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছে তাহারা অত্যল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইসলামের সহিত ভারতীয় সমাজের মিলন অত সহজে হয় নাই। ইহার কারণ প্রাথমিক মুসলমানগণ স্থিরভাবে ভারতে বাস করিতে ইচ্ছা করে নাই। বস্তুতঃ আকবরের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা ভ্রাম্যমাণ আক্রমণকারীরূপে ভারতে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল লুণ্ঠতরাজের পর প্রস্থান করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আকবরের সময় হইতেই তাঁহারা এই দেশীয় লোকের মত স্থায়ীভাবে এখানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং তখন হইতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়। প্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম বিদেশাগত ধর্মকে আপনার করিয়া নিতে চেষ্টা করিয়াছে, আল্লাকে অবতার বলিয়া বরণ করিয়া এবং আল্লোপনিষদ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া ইসলামধর্মের সহিত অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণের সুপ্রবল স্বধর্মনিষ্ঠা তাহাদের ধর্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত মিলিত হইয়া এক অখণ্ড রূপ লাভ করিয়াছে। মোগল চিত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, মোগল স্থাপত্যেও উপরিউক্ত দুই সংস্কৃতির পরিণয় লক্ষ্য করা যায়—তাজমহল ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ। ভারতের দেশীয় সাহিত্যের বিকাশ ও পুষ্টি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা হইয়াছে। কবীর, মালীক মহম্মদ জায়সী, আবদুল রহীম খানখানা প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যের অতি প্রসিদ্ধ কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যের পদকর্তা, পল্লীগীতিকার এবং পদ্মাবতীর ন্যায় বৃহৎ

---

22 Aryan rule in India by E. B. Havull, P 185

২৩ Civilisation of In lia by Romesh Chandra Dutt, p. 68

২৪। India through the ages by Sir Jadunath Sarkar. p. 72.

২৫। ভারতের শিল্পকথা—অসিতকুমার হালদার।

কবিতা লেখক বহুতর মুসলমান কবির নাম সকলেই জানেন, মুসলমান বাদশাহ ও সুলতানগণের উৎসাহে ও আনুকূল্যে দেশীয় ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি অনুদিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমানের ধর্ম মূলতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের পর উভয় সম্প্রদায় পূজিত কোনো কোনো দেব দেবীর উদ্ভব হইয়াছে। ওলাদেবী, শীতলাদেবী, সত্যপীর, মাণিকপীর প্রভৃতি দেবতা উভয় সম্প্রদায় সবিশ্বাস শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন। যশোহর জেলায় মাণিকপীরের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক যে সব পাঁচালী মুসলমান ফকিরদের দ্বারা গীত হইয়া থাকে সেই সব পাঁচালীর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। মুসলমানের জারীগান ও হিন্দুর কবিগান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতাদের সমান তৃপ্তিদান করিয়াছে। হিন্দুর যাত্রা ও থিয়েটারে মুসলমানগণ দেবদেবী ও অন্যান্য পুরাণোক্ত চরিত্রের অভিনয় করিতে সোৎসাহ আনন্দ দেখাইয়াছেন—গ্রামের মধ্যে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি। এমন অনেক প্রথা, সংস্কার ও লোকাচার দেখা যায় যেগুলি হিন্দু-মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে একইরূপে বর্তমান রহিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের দর্শন-ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সংস্কৃতি করণ (acculturation) ক্রিয়াশীল হইয়াছে, মুসলমান আনীত সুফীমত ভারতীয় ভাব রাজ্যে দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পারস্যের অমর মুসলমান কবিগণের অপূর্ব গীতি ভারতের রসলিপ্সু পাঠকদের কর্ণে অক্ষয় সুধা বর্ষণ করিয়াছে। ভারতের মুসলমানগণ এই দেশের আদি আর্য ভাষা বৈদিক প্রসূত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় ভাষাগুলিকে বিদেশানীত আরবী, পারসী ও তুর্কী শব্দ নিচয় দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা এবং বাংলার বাহিরে যে উর্দু ভাষাকে সমগ্র মুসলমান সমাজের ভাষা বলিয়া প্রচলন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে তাহাও প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতজা পশ্চিমা হিন্দী হইতে উদ্ভূত। মুসলমান রাজত্বের অবসানে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দান অনুধাবন যোগ্য। রামমোহন রায় যেমন হিন্দুধর্মের সংস্কার করিলেন, সৈয়দ আহম্মদ খান প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ মুসলমান সমাজের সংস্কার করিয়া উদার, সার্বভৌম ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।২৬ ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে জাতীয় যজ্ঞের বেদীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূত রক্ত উৎসৃষ্ট হইয়াছে। উপরি উল্লিখিত সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে একমাত্র ধর্মবিশ্বাস ও কয়েকটী অবশ্য পালনীয় সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা কোথাও দৃষ্ট হয় না।

খৃষ্টধর্মী ইংরাজদের দ্বারা ভারত বিজয়ের পর ভারতবাসী পুনরায় এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। যেই সময়ে পাশ্চাত্য শ্বেতাংগ সভ্যতার বিজয় বৈজয়ন্তী এদেশে প্রোথিত হয় তখন রাজনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতায় দেশ পীড়িত ও জর্জরিত। সুতরাং দুরতিক্রম্য অন্ধকারাবৃত জীব যেমন নব প্রভাতের অরুণালোক সাগ্রহে বন্দনা করে, ভারতবাসীও তেমনি এই নবাগত বৈজ্ঞানিক বলদৃপ্ত উদার সভ্যতা ব্যগ্র আগ্রহে বরণ করিয়া লইল। ক্ষণকালের জন্য ভারতবাসী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্যের বিকৃত অনুকরণে নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিল। কিন্তু এই সময়টা আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর ক্ষণকালিক লজ্জাজনক যুগ। ইহার পর বংকিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষী আত্মবিভ্রান্ত জনসাধারণকে আত্মসমাহিত করিয়া দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বিংশ শতাব্দীর অধুনাতন কাল পর্যন্ত ভারতীয় সত্তার স্বাধীন এবং সম্যক বিকাশের পরিপোষক ও সহায়ক রূপেই পাশ্চাত্য ভাব ও সংস্কৃতির চর্চা হইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য জাতি আনীত খৃষ্টান ধর্ম এদেশে কখনো প্রবল আকার ধারণ করে নাই এবং যে সমস্ত লোক খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন কিংবা আছেন তাঁহারা নিজেদের সংস্কৃতি ও সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই, সুতরাং ভারতীয় খৃষ্টানেরা বৃহত্তর ভারতীয় সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারা কখনও বিকশিত হয় নাই। সুতরাং খৃষ্টান ধর্ম ও বিদেশাগত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়শীল ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা অন্তর্গৃহীত হইয়াছে, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরায় বিজয় সিদ্ধ হয়।

উপরিলিখিত আলোচনায় আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে অনন্ত বৈচিত্র্য এবং অফুরন্ত বিভিন্নতার মধ্যে অক্ষয়, অখণ্ড এবং অবিচ্ছেদ্য ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বার বার বিদেশাগত ধনসম্পদ-লোলুপ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তাহারা অজেয় ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতীয় সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এই অখণ্ড অজেয়তা তাহার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য তিনটী কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে—সমন্বয়সত্তা, সসিক্ষুতা এবং প্রসিক্ষুতা।২৭

বিদেশাগত প্রত্যেক জাতি ভারতে আসিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি গঠনে সহায়তা করিয়াছে এবং তাহাদের সৃষ্ট সংস্কৃতি তাহাদের ভারতীয় আদি সংস্কৃতি হইতে বিভিন্ন। ভারতে অবস্থিত আর্য সংস্কৃতি ইউরোপীয় অথবা ইরাণীয় আর্য সংস্কৃতি হইতে স্বতন্ত্র, ভারতস্থিত মুসলমানগণের সংস্কৃতিও আরব, পারস্য, মিশর অথবা তুরস্কবাসী মুসলমান সংস্কৃতি হইতে নিশ্চয়ই পৃথক এবং ভারতীয় খৃষ্টানগণও কখনো বোধহয় বাইবেল ও খৃষ্টের লীলাভূমিকে নিজেদের মাতৃভূমি মনে করেন না। এই সব বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি চঞ্চল স্রোতস্বিনীর ন্যায় এই দেশে প্রবাহিত হইয়া সকলে সঙ্গত হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিশাল বারিধি হইতে বিভিন্ন স্রোতধারা পৃথক করিবার উপায় নাই।

২৬। Modern religiios movement in India by Dr. Farguhar.

২৭। Indian Culture by Hirendra Nath Datta (Kamala Leotures), p. 18.

শবরী

শ্রীকমলরাণী মিত্র

আমি চাঁয় চেয়ে' বসে' থাকি কখন সে লগ্নখানি আসে,
তৃষাতুর দু'টী ব্যগ্র-আঁখি মেলি' দূর অনন্ত-আকাশে।
কখন যে বেলা প'ড়ে যায়, গৃহপানে ফিরে' যায় ধেনু ;
অস্তরাগ ক্রমশ মিলায়, দূরে বাজে রাখালের বেণু।

ডুবে' যায় গোধূলির বেলা দিগন্তের অনন্ত-অতলে,
ভেঙে' আসে দিবসের মেলা দিনান্তের তন্দ্রাতুর কোলে !
কেটে' যায় যুগযুগান্তর, কেটে' যায় সহস্র মরণ ;
বসে' আছি প্রতীক্ষ-অন্তর— আসিবে-যে সে-শুভ-লগন।

ক্রুক্‌স্ সাহেবের আধ্যাত্ম ও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

ত্রয়োদশ শ্রেণী

নানারূপ জটিল ঘটনা

(৫)

এই শ্রেণীর ভিতর আমি কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিব যেগুলি কোন একটি শ্রেণীর ভিতর ঠিক পড়ে না। ঐরূপ বারটির অধিক ঘটনার ভিতর আমি দুইটি মাত্র উল্লেখ করিব— একটি মিস্ কেট্ ফক্সের উপস্থিতিতে ঘটিয়াছিল। পাঠকবর্গের বুঝিবার সহায়তার জন্ত বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক।

বিগত বসন্তকালে একদিন সন্ধ্যাকালে মিস্ ফক্স আমার বাড়ীতে আসিয়া সিয়ান্সে বসিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যখন তাঁহার আসার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি তখন আমার এক আত্মীয়া ও আমার দুই পুত্র যাহাদিগের বয়স ১৪ ও ১১ তাহারা আমাদের খাবার ঘরে বসিয়াছিল—যেখানে সচরাচর সিয়ান্স বসিত এবং আমি আমার পড়িবার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম। সেই সময়ে মিস্ ফক্স গাড়ী করিয়া আসায় আমি দরজা খুলিয়া মিস্ ফক্সকে সোজাসুজি আমাদের খাবার ঘরে লইয়া যাই। মিস্ ফক্স বলিল সে আর উপরে যাইবে না, কারণ, সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে না, এবং তাহার শাল্ ও টুপী একটি কেদারার উপর রাখিল। আমি তখন খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমার দুই ছেলেকে আমার পড়িবার ঘরে গিয়া তাহাদের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে বলিলাম ও তাহারা তথায় যাওয়ার পর মধ্যের দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিয়া সেই চাবি নিজের পকেটে রাখিলাম—আমি এইরূপ বরাবরই করিতাম।

আমরা বসিলাম—মিস্ ফক্স আমার দক্ষিণ দিকে ও আমার আত্মীয়া আমার বাম দিকে। অক্ষরগুলি পরে পরে বলিয়া আমাদিগকে গ্যাস্ নিবাইতে বলিল ও তদনুযায়ী গ্যাস্ নিবাইয়া সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমরা বসিয়া রহিলাম ও আমি মিস্ ফক্সের দুই হাত আমার এক হাতে চাপিয়া সমস্তক্ষণই ছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই এই সংবাদ আমাদিগকে দেওয়া হইল—"আমরা আমাদের ক্ষমতা দেখাইবার জন্ত কিছু আনিতেছি।" এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ আমরা একটি ঘণ্টার ঠুনঠুনানী শব্দ শুনিলাম—সেই শব্দ এক স্থান হইতে আসিতে ছিল না—শব্দটি চলন্ত, ঘরের নানা স্থান হইতে আসিতেছিল—কখনও বা দেয়ালের নিকট হইতে—কখনও বা দূরের কোন স্থান হইতে—ঘণ্টাটি কখন বা আমার মাথা ছুঁইয়া, কখনও বা ঘরের মেঝেতে আঘাত করিয়া। এইরূপে পাঁচ মিনিটকাল ঘণ্টাটি ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ইহা আমার হাতের কাছে টেবিলের উপরে পড়িল।

যখন এই সব হইতেছিল আমরা কেহ নড়ি নাই এবং মিস্ ফক্সের দুই হাত আমার হাতে স্থিরভাবে ছিল। আমি বলিলাম— যে ঘণ্টাটি বাজিতেছিল সে তো আমার ছোট হাত-ঘণ্টা হইতে পারে না—কেন না উহা আমি আমার পড়িবার ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি। (মিস্ ফক্স আসিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই আমার একটি বই দেখিবার প্রয়োজন হয়—সেই বইখানি বইএর শেল্‌ফে এক কোণে ছিল ও তাহার উপর ঐ ঘণ্টাটি ছিল এবং বইখানি লইতে ঐ ঘণ্টাটি তাহার বামদিকে সরাইয়া রাখি। ঐরূপ ঘণ্টাটি তৎপূর্ব্বেই নড়ানর জন্ত উহা যে আমার পড়িবার ঘরে তৎকালে ছিল সে কথা সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ হইয়াছিল।) খাবার ঘরের দরজার বাহিরের হলঘরে গ্যাস্ উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল—সুতরাং যদি মিস্ ফক্সের কোন সহায়ক জোড়া চাবি লইয়াও উপস্থিত থাকিত (নিশ্চয়ই ছিল না) ও ঘণ্টাটি খাবার ঘরে আনিবার চেষ্টা পাইত তাহা হইলেও পড়িবার ঘর ও খাবার ঘরের মধ্যস্থ দরজা খুলিলেই খাবার ঘরে উজ্জ্বল আলো আসিয়া পড়িত।

আমি তৎক্ষণাৎ আলো জ্বালিলাম। সামনেই টেবিলের উপর আমার সেই হাত-ঘণ্টাটি পড়িয়া রহিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ পড়িবার ঘরে গেলাম এবং দেখিলাম যে সেই হাত-ঘণ্টাটি যেখানে থাকিবার কথা সেখানে নাই। আমি আমার বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আমার ছোট হাত-ঘণ্টাটি কোথায় আছে জান?" সে উত্তর করিল—"হাঁ, বাবা ঐখানে আছে" বলিয়া যেখানে সেইটি থাকিবার কথা সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। সেও তথা হইতে আনিতে গেল ও বলিল— "না, ওখানে নাই কিন্তু কিছু পূর্ব্বেই ঐখানে ছিল।" আমি বলিলাম "তুমি কি বলিতেছ—কেহ কি আসিয়া উহা লইয়া গিয়াছে?" সে বলিল "না কেহ তো ঘরে ঢুকে নাই—কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, উহা ঐখানে ছিল—কারণ আপনি যখন আমাদিগকে এই ঘরে আসিতে বলিলেন তখন আমার ছোট ভাই ঐ ঘণ্টাটি বাজাইতে আরম্ভ করে; তাহাতে আমার পড়ার বিঘ্ন হওয়ায় আমি তাহাকে বাজান বন্ধ করিতে বলি।" আমার ছোট ছেলে তাহার ভাইএর কথা সমর্থন করে বলে যে সে ঘণ্টা বাজানর পর তাহা যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই রাখিয়া দিই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি যাহা আমি বর্ণনা করিব তাহা এক রবিবারে আমার বাড়ীতে আলোতেই ঘটে এবং সেখানে কেবল হোম সাহেব ও আমার বাড়ীর লোকেরাই ছিল। আমি আর আমার স্ত্রী সেদিন পাড়াগাঁয়েই কাটাই এবং সেখান হইতে কিছু ফুল তুলিয়া লইয়া আসি। বাড়ীতে আসিয়াই ঝিকে সেই ফুলগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে বলি। অল্পক্ষণ পরেই হোম সাহেব আসেন ও আমরা খাবার ঘরে যাই; যখন আমরা বসিতেছিলাম ঝি আমাদের সেই আনীত ফুলগুলি একটি ফুলদানীতে সাজাইয়া আনিয়া দিল। আমি সেই ফুলদানীটি টেবিলের মধ্যস্থলে রাখিলাম—সেই টেবিলের উপর কোন চাদর ছিল না। মিষ্টার হোম সেইরূপ ফুল এই প্রথম দেখিলেন।

কয়েকটি ঘটনা ঘটার পর আমাদের কথাবার্ত্তা এইরূপ হইতে ছিল যে কতক ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে দ্রব্য অন্ত কঠিন দ্রব্যের ভিতর দিয়া আসিয়াছে—তাহা ব্যতীত ঐ সকল ঘটনা কোনরূপ বোঝা যায় না। তখনই এই লেখায় অক্ষরে এই সংবাদ আমরা

পাইলাম—"দ্রব্য অন্য দ্রব্যের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না—তবে কতটা আমরা করিতে পারি তাহা দেখাইব।" আমরা নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তখনই একটি জ্যোতির্ম্ময় কিছু পদার্থ সেই ফুলদানীর উপর ফুলগুলির কাছে ঘুরিয়া, শোভার্থে তাহার মধ্যস্থিত একটি ১৫ ইঞ্চি লম্বা চীনের ঘাস সেই ফুলের মধ্য হইতে আস্তে আস্তে আমাদের সকলের পূর্ণ দৃষ্টি গোচরে উঠিল ও হোম সাহেবও ফুলদানীর মধ্যে টেবিলের উপর নামিল—সেইখানেই থামিল না—টেবিলের ভিতরে ঢুকিল এবং আমরা সকলেই তাহা দেখিতে লাগিলাম যতক্ষণ উহা টেবিলের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ যাই সেই ঘাসটি অদৃশ্য হইল—আমার স্ত্রী যিনি হোম সাহেবের পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন দেখিলেন টেবিলের নীচে থেকে একখানি হাত হোম ও তাঁহার মধ্যস্থল হইতে সেই ঘাসটি ধরিয়া বাহির হইল। সেই হাত আমার স্ত্রীর কাঁধে সকলের কর্ণগোচর শব্দের সহিত মৃদু আঘাত করিল ও তাহার পর মেঝের উপর ঘাসটি ফেলিয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান করিল। দুইজনে কেবলমাত্র ঐ হাত দেখিতে পাইয়াছিল—কিন্তু ঘরে উপস্থিত সকলেই ঐ ঘাসের আমার বর্ণিতরূপে গতিবিধি দেখিয়াছিল। ঐ সময়ে হোম সাহেবের দুই হাত সর্ব্বক্ষণই টেবিলের উপর নিশ্চল ভাবে পড়িয়াছিল। যেখানে ঐ ঘাসটি অন্তর্দ্ধান করে সেখান হোম সাহেব হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে। টেবিলটি সচরাচর দূরবীণে যেমন এক অংশ অন্য অংশের ভিতর ঢুকিয়া যায় সেইরূপ ভাবে গঠিত—(telescopic dining table) উহা বিস্তীর্ণ করিবার জন্য এক ইস্ক্রু আছে। টেবিলের দুই পৃথক অংশ জোড়ের জায়গার মধ্যস্থলে সামান্য একটু চেরা দাগের ন্যায় ফাঁক ছিল—সেই ফাঁক মাপিয়া ফেলিলাম, উহা ⅛ ইঞ্চি মাত্র। ঘাসটির শির (stem) এত মোটা যে উহা নষ্ট না করিয়া অর্থাৎ না থ্যাৎলাইয়া, ঐ ফাঁকের ভিতর দিয়া আমি জোর করিয়াও ঐ ঘাসটি ঢুকাইতে পারি নাই; অথচ আমরা সকলেই দেখিলাম ঐ ঘাসটি কত সহজে ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে ঘাসের গায়ে আঁচড় বা চাপ দেওয়ার কোন চিহ্ন নাই।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাসমূহ বুঝিবার চেষ্টায় বিভিন্ন উপপাদক কল্পনা (Theories)

প্রথম মত। যে ঐ সমস্ত ঘটনাই ফাঁকিবাজি। নানারূপ কৌশলে নির্ম্মিত যন্ত্রের সাহায্যে বা হস্তের কৌশলে ম্যাজিকের মতন উৎপন্ন করা; সকল মিডিয়মরাই প্রতারক এবং দর্শকেরা বোকা।

এইরূপ কল্পনার দ্বারায় সামান্য দুই একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়। আমি এ কথা স্বীকার করি যে জনসাধারণ যে সকল তথাকথিত মিডিয়মদের কথা শুনিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঘোর প্রতারক; তাহারা জনসাধারণের অলৌকিক ঘটনা দেখিবার আগ্রহ দেখিয়া সহজে অর্থোপার্জ্জন করিবার পন্থা স্বরূপ এইরূপ প্রতারণা করিতেছে। কাহারও বা অর্থের প্রয়োজন নাই কিন্তু একটা খ্যাতিলাভের জন্যএই প্রতারণা করিতেছে। আমি নিজে খুব চতুর প্রতারকও দেখেছি, আবার এমন কতকগুলিও দেখেছি যাহাদের প্রতারণা সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত ঘটনা দেখেছে তাহারা কখনই ঐরূপে প্রতারিত হয় না। ঐ বিষয়ে অনুসন্ধানকারীরা প্রথমেই এইরূপ প্রতারণা যাহা সহজে ধরিতে পারা যায়—দেখিলে সহজে এই বিষয়ে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য সকল মিডিয়াম সম্বন্ধেই সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুবর্গের ভিতর বলিয়া বা খবরের কাগজে গালাগালি দিয়া বসা অস্বাভাবিক নয়। আবার অনেক প্রকৃত মিডিয়ামের কাছেও প্রথমে যে সমস্ত ঘটনা দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ মিডিয়ামের হস্তের বা পদের নিকটবর্ত্তী টেবিলের নড়াচড়া বা তাহাতে সামান্য আঘাতের শব্দ মাত্র। এরূপ নড়ানচড়ান বা শব্দ সহজেই মিডিয়াম বা কোন উপস্থিত ব্যক্তি করিতে পারে। তাহা ব্যতীত যদি অন্য কোন ঘটনা তখন না ঘটে—অনেক সময়ে হয় তো অন্য কিছু ঘটেও না—তাহা হইলে অবিশ্বাসী দর্শক ভাবিয়া বসে যে তাহার চাতুরী ধরিবার অধিক ক্ষমতা থাকায়, মিডিয়ামের চাতুরী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া, মিডিয়াম অন্য কিছু দেখাইতে ভরসা করে নাই। তিনিও এই সবই ফাঁকিবাজি বলিয়া খবরের কাগজে লিখিয়া বসেন এবং হয় তো বলেন যে অনেক সচরাচর বুদ্ধিমান লোক বলিয়া যাহারা পরিচিত, তাহারা কি করিয়া এইরূপ কারসাজি দ্বারায়—যাহা তিনি অতি সহজে বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাহাতে প্রতারিত হয় ও তাহার জন্য হয় তো দুঃখও প্রকাশ করিয়া বসেন।

একজন ব্যবসাদার যাদুকরের ম্যাজিক দেখানোর সঙ্গে—যাহা সে তাহার নিজের প্ল্যাটফরমের উপরে, নিজের হস্ত-কৌশলের ও লুকানো যন্ত্রপাতি ও সহকারীদের সাহায্যে করিয়া থাকে, আর হোম্ সাহেবের প্রদর্শিত ঘটনাবলির সঙ্গে বহু প্রভেদ—কারণ সেগুলি ঘটিয়াছে আলোয়, আমার ঘরে—যে ঘরে তাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যবহৃত—আমার বন্ধুদের দ্বারায় বেষ্টিত, তাহারা তো কেহ হোমের প্রতারণার সাহায্য করিবেই না—অধিকন্তু, যাহা কিছু ঘটিতেছিল তাহা অতি সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত হোম্ সাহেবের পরিধান বস্ত্রাদি—সিয়ান্সের পূর্ব্বে ও পরে বিশেষ করিয়া দেখিয়া লওয়া হইয়াছিল যে তিনি কোন কিছু সঙ্গে লইয়া আসেন নাই—তিনি এইরূপ সার্চ করিতে দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটার কালে আমি তাহার দুই হাত নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়াছি ও তাঁহার দুই পা আমার দুই পায়ে চাপিয়া রাখিয়াছি। কোনরূপ প্রতারণা যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক বলিয়াছি, তখনই তিনি সেগুলি করিতে রাজি হইয়াছেন এবং অনেক সময়ে তিনি নিজেই কিরূপে সন্তোষজনক পরীক্ষা হইতে পারে তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

আমি প্রধানতঃ হোম সাহেবের কথাই বলিতেছি, কারণ আমি যে সমস্ত মিডিয়াম লইয়া পরীক্ষা করিয়াছি তাহার ভিতর তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সকল মিডিয়ামের বেলায়ই আমি এরূপ বন্দোবস্ত করেছি যে, তাহাতে কোনরূপ প্রতারণা সম্ভব নয়—সুতরাং প্রতারণার দ্বারায় ঐ সকল ঘটনা ঘটে এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই সকল ঘটনার সমীচিন ব্যাখ্যা করিতে হইলে তাহার সবটাই তাহাতে বোঝা যায় কি না, তাহা দেখিতে হয়—এ কথাটা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। সামান্য দুই একটি ছোট

-খাটি ঘটনা দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে 'আমি সন্দেহ করি যে সকলগুলিই প্রতারণা' অথবা বলেন যে 'যতগুলি ঘটনা ঘটিল তাহার ভিতর কতকগুলি কিরূপ কারসাজি করিয়া হইতে পারে তাহা আমি বুঝিয়াছি—তাহা ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় মত। যাহারা সিয়ান্সে বসে তাহারা সাময়িকভাবে পাগ্‌লামী বা মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে তাহা তাহাদের কল্পনাপ্রসূত—তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই।

তৃতীয় মত। ঐ সমস্তটাই তাহাদের মস্তিষ্কের জ্ঞাতসারের বা অজ্ঞাতসারের কার্য্য (Conscious or unconscious cerebration).

পূর্ব্বোক্ত দুইটি মতের দ্বারায় অতি স্বল্প সংখ্যক ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়; এমন কি ঐ সকল ঘটনার পক্ষেও উহা সম্ভবপর ব্যাখ্যা নয়—দুই চারিটি কথা বলিলেই উহারা যে সম্ভবপর নয় তাহা দেখান যায়।

এখন আমি আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক শক্তির (spiritual theories) দ্বারায় এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যার বিষয়ে বলিব। মনে রাখিতে হইবে এই "স্পিরিট" বা "আধ্যাত্ম" কথাটি সচরাচর লোকে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করে না।

চতুর্থ মত। ঐ সমস্ত ঘটনা মিডিয়ামের আত্মার (spirit) শক্তির ক্রিয়া—ও হয় তো সিয়ান্সে উপস্থিত সকলের বা তাহাদের ভিতরে কতক লোকের ও মিডিয়ামের আত্মার সম্মিলিত শক্তির ক্রিয়া।

পঞ্চম মত। এই সকল ঘটনা সয়তান বা দুষ্ট অপদেবতার কার্য্য যাহারা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী অপরের রূপ ধারণ করিতে পারে—তাহাদের উদ্দেশ্য খ্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিশ্বাস শিথিল করাও লোকদিগের আত্মার সর্ব্বনাশ করা।

ষষ্ঠ মত। এই সমস্ত ঘটনা এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীবের কার্য্য; তাহারা পৃথিবীতেই থাকে কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অগোচর ও অস্থূল শরীরী (immaterial) কিন্তু তাহারা সময়ে সময়ে আমাদের কাছে তাহাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে পারে। ইহারা সকলেই দুষ্ট প্রকৃতির নয়—সকল দেশেই তাহারা নানা নামে পরিচিত—দানা, জিন, পরী ইত্যাদি।

সপ্তম মত। ইহা সমস্তই মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কার্য্য—ইহাই পুরামাত্রায় প্রেতাত্মাবাদীদিগের মত।

অষ্টম মত। এই সমস্ত ঘটনাই আধ্যাত্মিক শক্তির কার্য্য। ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মতবাদের সহকারী মাত্র—ইহাকে একটা স্বতন্ত্র মতবাদ বলা যায় না।

এই মত অনুসারে মিডিয়াম বা উপস্থিত লোকদিগের একটা সমবেত শক্তি বা গুণ আছে যাহাতে কোন বুদ্ধিমান সত্তা এই সমস্ত কার্য্য করিতে পারে। সেই বুদ্ধিমান সত্তা কে বা কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অন্য উপপাদক কল্পনা আবশ্যক।

ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে মিডিয়ামদিগের এমন কিছু আছে—যাহা সাধারণ লোকের নাই—সেই কিছুর একটা নামকরণ করা আবশ্যক—তাহাকে 'ক' বল বা একস্‌ (x)ই বল। সার্জেণ্ট (উচ্চ শ্রেণীর ব্যারিষ্টার) কক্‌স্‌ ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'আধ্যাত্মিক শক্তি'। ইহার সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা আছে যে আমি মনে করি যে এই 'আধ্যাত্মিক শক্তি' কথাটির অর্থ কি বুঝিবার নিমিত্ত ঐ ক্রুক্‌স্‌ সাহেবের নিজের ব্যাখ্যা দেওয়াই সমীচিন—তাহা নিম্নে দিতেছি:—

"কোন কোন অবস্থায় (কিরূপ অবস্থায় হয় তাহা এখনও ভাল জানা যায় নাই) কোন সীমাবদ্ধ দূরত্বের মধ্যে (কত দূরত্বের মধ্যে তাহাও স্থির হয় নাই) কোন কোন লোকের এরূপ স্নায়ুমণ্ডলীর সংগঠন আছে যে তাহা হইতে এমন একটা শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা তাহার মাংসপেশীর বা অন্য কোন প্রকার সংযোগ ব্যতীত দূরস্থিত কঠিন জড়পদার্থের দৃষ্টিগোচর স্থানচ্যুতি বা গতি বা নড়াচড়া ও তাহা হইতে শ্রুতিগোচর শব্দ উৎপন্ন করিতে পারে—ইহা আর অস্বীকার করা যায় না। সেই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকেই আধ্যাত্মিক শক্তি বলা হইতেছে। যেহেতু ঐরূপ শক্তির প্রকাশের জন্য ঐরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের স্নায়ুমণ্ডলীর আবশ্যক তখন সেই শক্তি যে সেই ব্যক্তির স্নায়ুমণ্ডলী হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত—যদিও কি প্রকারে তাহা হয় তাহা জানা যায় নাই। যখন আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া ও তাহা কিরূপে নড়িবে আমাদিগের অন্তর্নিহিত কোন কিছু—যাহাকে মনই বল বা আত্মাই বল—যাহাই আমাদের আমিত্ব—দ্বারায় নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়, তখন যে শক্তি আমাদের শরীরের বাহিরে অন্য কোন পদার্থকে নড়ায়, সে শক্তিও সেই আত্মা বা মন হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত করাও যুক্তিসঙ্গত। এবং যখন এইরূপে বাহিরে প্রকাশিত শক্তি অনেক সময়ে কোন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারায় পরিচালিত বলিয়া বোধ হয়, তখন সেই শক্তি ও (মিডিয়ামের) শরীরের অভ্যন্তরস্থ শক্তি এই অনুমান করাও যুক্তিসঙ্গত। এই শক্তিকেই আমি আধ্যাত্মিক শক্তি নাম দিয়াছি এবং তাহা মানুষের আত্মা বা মন হইতেই উৎপন্ন মনে করি। কিন্তু আমি ও অপরে যাহারা এই আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারাই এ সমস্ত ঘটনা ঘটে বলিয়া বিশ্বাস করি ও করেন, আমরা এ কথা বলিতেছি না যে অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন মানুষের (Psychic) আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারায় এই সকল ঘটনাই ঘটে, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন জীবের বুদ্ধিবৃত্তি সেই আধ্যাত্মিক শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে সময়ে সময়ে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করে না। প্রেতাত্মা বাদে যাহারা একান্ত বিশ্বাসী তাহারা ও এই আধ্যাত্মিক শক্তি যে মানুষের আছে তাহা বিশ্বাস করেন, তবে এই শক্তিকে তাহারা নামকরণ করিয়াছেন 'চৌম্বিক শক্তি' কিন্তু নামকরণটা সঙ্গত হয় নাই—(কারণ উহার চৌম্বিক শক্তির সহিত কোন সাদৃশ্য নাই) তাহারাও এ কথা মানেন যে প্রেতাত্মারা যে সমস্ত কার্য্য করেন তাহা কেবল মিডিয়ামের চৌম্বিক শক্তির সাহায্যেই হয়। আধ্যাত্মিক শক্তিবাদীদের ও প্রেতাত্মাবাদীদের মধ্যে কেবল এইমাত্র মতের পার্থক্য—সে আমরা বলি যে এ পর্য্যন্ত মিডিয়ামদের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্বের প্রমাণ অপর্য্যাপ্ত—প্রেতাত্মার অস্তিত্বের বা কার্য্যকারীত্বের কোন প্রমাণই নাই, আর প্রেতাত্মাবাদীরা ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন যে এ সমস্ত ঘটনাই মৃত ব্যক্তিদের আত্মার কার্য্য—তাহার অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ কেবল তথ্য সংগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে—দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরীক্ষার ও বহু মনস্তত্ত্ববিষয়ক তথ্য (psychological facts) সংগ্রহ করিতে হইবে; এবং তাহা মনস্তত্ত্বানুসন্ধান সমিতিদিগের কর্ত্তব্য—এইরূপ সমিতি গঠিত হইতেছে।"

ম্যালেরিয়ার দেশীয় চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামগুলিতেই ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব নৃত্য দেখা যাইত। ইহার তাড়নায় গ্রামবাসীগণ গ্রামের মায়া ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু আজ সহরে বাস করিলেও নিস্তার নাই। কলিকাতার মত সহরেও লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে ও কত লোক যে অকালে কালকবলিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু বাঙ্গালায় নহে, সুদূর পশ্চিম অঞ্চলেও এমন কি রাজস্থানেও ইহার প্রকোপ বড় কম নহে। সহরবাসীরা ম্যালেরিয়ায় সংক্রামিত হওয়ায় দেশবাসী আজ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ম্যালেরিয়ার ঔষধ কুইনাইন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া দেশময় হাহাকার উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ যদি আরও দীর্ঘকাল চলিতে থাকে তাহা হইলে কুইনাইন বর্ত্তমানে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহাও পাওয়া যাইবে না। কুইনাইনের দিকে চাহিয়া থাকিলে পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণ যেমন একদা মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সহরবাসীগণকেও সেইরূপ অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

একটা চলতি কথা, যে দেশে যে রোগ জন্মে সেই দেশেই তাহার ঔষধও পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর এদেশে নূতন নহে। বেদে* পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ার ন্যায় জ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং একটু চেষ্টা করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ এই দেশেই প্রস্তুত করা সম্ভব।

ম্যালেরিয়া জ্বরে আজ একটা দেশীয় ঔষধের কথা বলিতে চাই। এই ঔষধটী ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। ঔষধটী সকলেই ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। বিশেষভাবে পরীক্ষার পর সাধারণের নিকট এই ঔষধটী প্রকাশ করা হইল। ঔষধটীর প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—

নাটাকরঞ্জা বাঙ্গালা দেশে প্রচুর জন্মে। পল্লীগ্রামের বনে-জঙ্গলে যত্রতত্র ইহার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের ফল ঠিক কণ্টকময় লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে একটা বা দুইটা কখনও কখনও বা তিনটা বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ অত্যন্ত কঠিন। বীজগুলি দেখিতে অনেকটা কড়ির মত। ফলের উপরের আবরণ ভাঙ্গিলে ভিতরে শ্বেতবর্ণের শস্য বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তৈলাক্তভাব কাটিয়া যায়। এই নাটাকরঞ্জা ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া—তাহার চূর্ণ—৩ ভাগ এবং পিপুল চূর্ণ ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া শিউলী পাতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, ছাতিম ছালের রসে ও চিরতার ক্বাথে পৃথক পৃথক তিনবার ভাবনা দিয়া অর্থাৎ একবার শিউলী পাতার রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, পরে আবার শিউলী পাতার রসে মাড়িবে আবার শুকাইয়া লইবে এইরূপ. প্রত্যেকটার রসে বা ক্বাথে তিনবার করিয়া মাড়িয়া শুকাইয়া লইয়া ৪ রতি (৮ গ্রেণ) মাত্রায় বটী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঔষধের প্রত্যেকটী কুইনাইনের উত্তম প্রতিনিধি বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকই এই ঔষধের জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই ঔষধ প্রত্যহ ৩বার ৩টী বটী কেবলমাত্র জল দিয়া খাইতে হয়। তিন চার দিন সেবনেই জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। জ্বর বন্ধের পরও পনের বিশ দিন এই ঔষধ সকালে ও বৈকালে ২টী করিয়া বটী সেবন করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্বরের পুনরাক্রমণ দেখা যায় না। আমি দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদের উপর প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি যে, শতকরা ৮০জনের এই ঔষধে ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ হইয়াছে। এমন কি পুরাতন ম্যালেরিয়ায় এই ঔষধ সেবনে প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধির হ্রাস হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই জ্বরের পুনরাক্রমণ দেখা যায় না। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় শরীর বড় দুর্ব্বল করিয়া দেয় এমন কি ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে পর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার হ্রাস হয়। সেইজন্য যাহাতে পুনরায় জ্বরাক্রান্ত না হইতে হয় ও শরীরের বলক্ষয় না হয় সেজন্য জ্বর বন্ধ হইলে পর পুরাতন জ্বরের পাচন সেবন করিলে ভাল হয়। আয়ুর্ব্বেদের পুনরাবর্ত্তক জ্বরের পাচন (চরক), বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাচন, দাক্ষাদি পাচন প্রভৃতি কোন একটী বিষমজ্বরের পাচন সেবন করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণ হইবে না, শরীরও সুস্থ হইবে।

আমি যে ঔষধের কথা বলিলাম, ইহাই যে ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ঔষধ তাহা বলিতেছি না, আমার উপলব্ধির কথা এই ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের সময় দেশবাসীর গোচরীভূত করিলাম মাত্র। কত বিদেশী আমাদেরই ঔষধ, বনৌষধি লইয়া পরীক্ষা করিয়া কত ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কত ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা হইতেছে কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ আবিষ্কারে কাহাকেও সেরূপ যত্নবান দেখি না। সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া এখনও যদি আমরা বিদেশী ঔষধের দিকে তাকাইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের দুঃখ স্বয়ং ভগবানও মোচন করিতে পারিবেন না। তাই বলি, বিশেষজ্ঞগণ দেশীয় ঔষধগুলি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে এবং এমন দিন আসিবে যখন বিদেশীয়গণ আমাদের আবিষ্কৃত ঔষধ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

---

* তক্মন্ জ্বর (অথর্ব্ববেদ ৬।২১।১-৩) শরৎ, গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, সতত ও তৃতীয়ক জ্বর (অথর্ব্ববেদ ১।২৫।৪, ৫।২২।১—১৪)

সেই মুখখানি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

সেই মুখখানি স্মরি নিরালা সন্ধ্যায়
সর্ব্বকর্ম্ম করি' শেষ নিভৃতে বসিয়া
বসুধার কোলাহল হ'তে ! ডুবে যায়
আমার সকল সত্তা—ডুবে যায় হিয়া
অতলসৌন্দর্য্যনীরে ; রহে শুধু জাগি'
একটি রঙিন্ মোহ—আবেশ তরল—

অনুভূতি অনির্ব্বচনীয়। থাকি' থাকি'
প্লাবিত করিয়া দেয় শূন্য হৃদিতল
অব্যক্ত নির্ব্বেদ,—আর শুধু মনে লয়
রিক্ত করি' আপনারে সর্ব্বত্যাগী প্রায়,
বিলাইয়া জীবনের সকল সঞ্চয়
বিনিময়ে একবার পাই যদি হায়,

সেই মুখখানি—সান্দ্র মরণ-তিমিরে
জনমের মত যাহা রহিয়াছে ঘিরে !

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২)

১ কারুগণের[১] রক্ষণ। ২ বণিগ্‌গণের রক্ষণ[২]। ৩ দৈব উৎপাতের প্রতীকার[৩]। ৪ অসদুপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহকারীদিগের নিকট হইতে (দেশ) রক্ষণ[৪]। ৫ তপস্বি-বেশধারিগণ-কর্ত্তৃক মাণব-বিদ্যার প্রকাশন[৫]। ৬ শঙ্কা-রূপ-কর্ম্মের অভিগ্রহ[৬]। ৭ আশু-মৃতক-পরীক্ষা[৭]। ৮ বাক্য ও কর্ম্মের অনুযোগ[৮]। ৯ সকল অধিকরণ-রক্ষণ[৯]। ১০ একাঙ্গ-বধ-নিষ্ক্রয়[১০]। ১১ শুদ্ধ ও চিত্র দণ্ডকল্প[১১]। ১২ কন্যা-প্রকর্ম্ম[১২]। ১৩ অবিচারের দণ্ড[১৩]। ইতি 'কণ্টকশোধন'[১৪]-নামক চতুর্থ অধিকরণ।

সঙ্কেত :—১ কারু, কারুক—তক্ষ (সূত্রধর, ছুতার), অয়স্কার (লৌহকার, কামার), স্বর্ণকার (সেক্‌রা) ইত্যাদি। গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে অর্থ—কারুগণ যদি কূটকর্ম্মকারী হয় (অর্থাৎ প্রতারণা-পূর্ব্বক নিজ ব্যবসা চালাইতে থাকে) তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে দেশ (অর্থাৎ দেশবাসিগণের) রক্ষাবিধান। শ্যামশাস্ত্রীর মতে—কারুকগণের রক্ষা—protection of artisans. এস্থলে protection বলিলে বুঝায়—safeguard. মূল-প্রকরণ-ব্যাখ্যা-কালে আমরা দেখাইব যে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাই মূলানুগ ও সঙ্গত। 'Protection of' না বলিয়া 'protection from' বলাই উচিত। ২ বৈদেহক—বণিক্। যাহারা কম ওজনের বাট্‌খারা ব্যবহার করে, অথবা ওজন করিবার সময় প্রতারণা করে, তাহাদিগের নিকট হইতে রক্ষা—ইহাই গঃ শাঃ মহাশয়ের অভিমত—ও মূলানুগত অর্থ। শ্যাম শাস্ত্রীর অর্থ পূর্ব্ববৎ। ৩ উপনিপাত (মূল)—দৈব মহাভয় (গঃ শাঃ) ; national calamities (SH). ইনি 'national' শব্দটির পরিবর্ত্তে providential অথবা natural শব্দ প্রয়োগ করিলে ভাল করিতেন। ৪ গূঢ়াজীবিনাং রক্ষা (মূল)—যাহারা গোপনে উৎকোচাদি গ্রহণ দ্বারা প্রভু ও প্রজাগণকে প্রতারণা-পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহারা গূঢ়াজীবী ; তাহাদিগের নিকট হইতে রক্ষা (গঃ শাঃ)। Suppression of the wicked living by foul means (SH) ; 'suppression'এর পরিবর্ত্তে protection from বলা উচিত। ৫ সিদ্ধব্যঞ্জনৈর্মাণবপ্রকাশন (মূল) ; সিদ্ধব্যঞ্জন :—তপস্বি-বেশধারী ধূর্ত্ত চর। সিদ্ধ—মুণ্ডিত বা জটিল তপস্বী। ব্যঞ্জন—চিহ্ন। মাণব বিদ্যা—দ্রুতপ্রস্থান, অন্তর্দ্ধান, দ্বারমোচন ইত্যাদির মন্ত্র ; পরকীয়া-বশীকরণ বিদ্যা ইত্যাদি। Detection of youths of criminal tendency by ascetic spies (SH)—শ্যাম শাস্ত্রী প্রকরণের তাৎপর্য্য দিলেও 'মাণব'-শব্দটির ভাষান্তর করেন নাই—'detection of youths of criminal tendency'—এ অংশটি মূলানুগত নহে। ৬ শঙ্কাভিগ্রহ, রূপাভিগ্রহ ও কর্ম্মাভিগ্রহ। শঙ্কা—দ্বিবিধ—(১) নিজের পরের প্রতি ও (২) পরের নিজের প্রতি (গঃ শাঃ) ; suspicion (SH)। রূপ—সলোপ্ত্রদর্শন (গঃ শাঃ) ; লোপ্ত্র (লোত্র) —চোরাই মাল। রূপাভিগ্রহ—চোরাই মাল বা বমাল সমেত ধরা ; (seizure of) stolen articles (SH)। কর্ম্ম—সন্ধিচ্ছেদাদি (গঃ শাঃ) ; সন্ধিচ্ছেদ—সিঁধ-কাটা ; circumstantial evidence (SH)। অভিগ্রহ—চৌরাদির গ্রহণ। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—seizure of criminals on suspicion or in the very act. ৭ আশুমৃতক-পরীক্ষা—স্বয়ং মৃত, কি পর-কর্ত্তৃক মৃত—ইহার পরীক্ষা (গঃ শাঃ) ; examination of sudden death (SH) —ইহার তুলনা বর্ত্তমানে Coroner's inquest. ৮ বাক্যানুযোগ ও কর্ম্মানুযোগ। যুক্তিযুক্ত সামবাক্য-দ্বারা চোর-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাক্যানুযোগ ; কশা-প্রহারাদি দ্বারা চোর কি না বিচার (গঃ শাঃ)। Trial and torture to elicit confession (SH). ৯ অধিকরণ—ইহার অর্থ অধ্যক্ষ-প্রচারাখ্য দ্বিতীয় অধিকরণে উক্ত অধ্যক্ষ ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দ ; তাহাদিগের অত্যাচার হইতে প্রজা ও ধনের রক্ষণ (গঃ শাঃ)—ইহা মূলানুগত অর্থ। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে —protection of all kinds of Government departments. ১০ একাঙ্গের বধ—ছেদনাদি-বিকৃতি-সম্পাদন ; তাহার নিষ্ক্রয়—ক্ষতিপূরণার্থ অর্থদণ্ড (গঃ শাঃ) ; fines in lieu of mutilation of limbs (SH). ১১ দণ্ডকল্প—দণ্ডবিধি। শুদ্ধ—অক্লেশ-মারণ ; চিত্র—ক্লেশ-মারণ (গঃ শাঃ) ; death with or without torture (SH). ১২ কন্যা—অজাতরজস্কা বালিকা ; প্রকর্ম্ম—দূষণ—তৎসম্বন্ধী দণ্ডবিধি (গঃ শাঃ) ; sexual intercourse with immature girls. ১৩ অতিচার—অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন ইত্যাদি (গঃ শাঃ) ; atonement for violating justice (SH) ; violating law and order বলিলে ভাল হইত। কণ্টক-শোধন—দুর্গ-রাষ্ট্রাদির কণ্টক নাশ অর্থাৎ কাঁটা উঠাইয়া ফেলা—শত্রু-নাশ। Removal of thorns of public place (SH).

১ দাণ্ডকর্ম্মিক[১]। ২ কোশের অভিসংহরণ[২]। ৩ ভৃত্যগণের ভরণীয় (ব্যবস্থা)[৩]। ৪ অনুজীবিগণের বৃত্ত[৪]। ৫ সাময়াচারিক[৫]। ৬ রাজ্য-প্রতিসন্ধান[৭]। ইতি 'যোগবৃত্ত'[৮] নামক পঞ্চম অধিকরণ।

সঙ্কেত :—১ দণ্ড—গোপনে বিহিত দণ্ড ; উপাংশুবধঃ (গঃ শাঃ) ; তাহার প্রয়োগ—দণ্ডকর্ম্ম ; তৎসম্বন্ধীয় ব্যাপার—দাণ্ডকর্ম্মিক (গঃ শাঃ) ; concerning the awards of punishments (SH)। ২ কোশ—অর্থাদি—স্বর্ণ-রজত ইত্যাদি ; উহার অভিসংহরণ—পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংগ্রহ ; অর্থকৃচ্ছ্র ঘটিলে ইহা কর্ত্তব্য (গঃ শাঃ) ; replenishment of the treasury (SH)। ৩ ভৃত্য—শাস্ত্র-বিষয়ে, বুদ্ধিপরিচালনা ব্যাপারে ও নানা কর্ম্মে সাহায্যকারী—রাজ-কর্ত্তৃক ভরণযোগ্য ব্যক্তিমাত্রই ভৃত্য (গঃ শাঃ) ; তাহার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা এই প্রকরণে করা হইয়াছে ; concerning subsistence to Government servants (SH)। ৪ অনুজীবী —মন্ত্রী প্রভৃতি ; তাঁহারা প্রভুর প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন—তাহার উপদেশ এই প্রকরণে আছে (গঃ শাঃ) ; বৃত্ত—চরিত ; conduct of a courtier (SH)। ৫ শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণে মূলে ছাপা আছে—'সময়াচারিকম্', পাদটীকায় পাঠান্তর আছে—সাময়াচারিকম্। গণপতি শাস্ত্রী দ্বিতীয় পাঠটিই গ্রহণ করিয়াছেন ! সময়—ব্যবস্থা, আচার—অনুষ্ঠান ; সময় ও আচার সম্বন্ধীয় প্রকরণ (গঃ শাঃ) ; time-serving (SH)। ৬ রাজ্যপ্রতিসন্ধান—রাজ্যের প্রতিসন্ধান (বিপৎ-প্রতীকার) ; রাজার বিপৎ (ব্যসন) উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্রাদিকে রাজ্যে অভিষেক-পূর্ব্বক অমাত্যগণ রাজ্য-সম্বন্ধীয় যেরূপ ব্যবস্থা ও আলোচনা

করিয়া থাকেন, তাহা এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে (গঃ শাঃ) ; consolidation of the kingdom (SH)। ৭ একৈশ্বর্য্য—রাজপুত্রগণের মধ্যে একেরই একচ্ছত্র আধিপত্য যাহাতে হয়, তাহাই কর্ত্তব্য—ইহাই এ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বহুর যুগপৎ ঐশ্বর্য্য লাভে বিরোধ ও অরাজকতা আসিতে পারে (গঃ শাঃ) ; absolute sovereignty (SH)। রাজ্য-প্রতিসন্ধান ও একৈশ্বর্য্য একই প্রকরণে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব, বিষয় সাতটি হইলেও প্রকরণ মোট ছয়টি—সাতটি নহে। ৮ যোগবৃত্ত—গণপতি শাস্ত্রীবলিয়াছেন—'যোগ'-শব্দের অর্থ 'বিস্রব্ধ-ঘাতী' (বিশ্বাসঘাতক) ; 'বৃত্ত'-শব্দের অর্থ আচরণ—এস্থলে উহা উপাংশুদণ্ড (গোপনে বিহিত দণ্ড) প্রভৃতির সূচক্। মূলে স্পষ্ট বলা আছে যে—চতুর্থ অধিকরণে দুর্গ ও রাষ্ট্রের কণ্টক-শোধনের কথা বলা হইয়াছে ; বর্ত্তমান অধিকরণে রাজা ও রাজ্যের কণ্টক-শোধনের কথা বলা হইতেছে। যে সকল মুখ্য পুরুষ রাজা ও রাজ্যের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন, তাহাদিগের প্রতি রাজার কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য—তাহাই এ প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। সে আচরণ অবশ্য প্রকাশ্যে দণ্ডদান নহে—গোপনে দণ্ডবিধান।

১ প্রকৃতি-সম্পৎ১। ২ শম-ব্যায়ামিক২। ইতি 'মণ্ডলযোনি'৩ নামক ষষ্ঠ অধিকরণ।

সঙ্কেত :—১ প্রকৃতি—অমরকোষে বলা হইয়াছে যে রাজ্যের (অর্থাৎ রাজকর্ম্মের) অঙ্গই হইতেছে—প্রকৃতি। অমরের মতে সপ্ত প্রকৃতি—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল। ভানুজি দীক্ষিত অর্থ করিয়াছেন—স্বামী (রাজা ; পুরোহিত—শ্রীধরের মত), অমাত্য (মন্ত্রী), সুহৃৎ (মিত্র), কোষ (ভাণ্ডার) রাষ্ট্র (দেশ), দুর্গ (পর্ব্বতাদি দুর্গম স্থান), বল (সৈন্য) ; এতদ্ব্যতীত পৌরশ্রেণী-সমূহও গণনীয়। কামন্দকীয় নীতিসারেও বলা হইয়াছে—স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ (কোশ), বল ও সুহৃৎ—পরস্পরোপকারী এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য। পৌর-শ্রেণীসহ অষ্টাঙ্গ রাজ্যও কথিত হইয়া থাকে (ভানুজি দীক্ষিতের ব্যাখ্যা-সুধা-নামক অমর-টীকায় উদ্ধৃত)। মনুসংহিতায় দ্বিসপ্ততি (৭২) প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে। রাজনীতিতে দ্বাদশ রাজমণ্ডল প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে বিজিগীষু, অরি, মধ্যম, উদাসীন—এই চারিজন প্রকৃতি রাজমণ্ডলের মূলভূত। পররাষ্ট্রজয়েচ্ছু প্রজ্ঞোৎসাহ-সম্পন্ন রাজা বিজিগীষু। তাঁহার শত্রু অরি—যাঁহার রাজ্য বিজিগীষু আক্রমণ করিয়া থাকেন। অরি ত্রিবিধ—সহজ, প্রাকৃত ও কৃত্রিম। যিনি বিজিগীষু ও অরিকে পৃথগ্‌ভাবে নিগ্রহ করিতে সমর্থ, অথচ মিলিতভাবে বিজিগীষু ও অরির নিগ্রহে সমর্থ নহেন তিনি মধ্যম। আর যিনি অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম এই তিনের মিলিতভাবে নিগ্রহে অসমর্থ, পরন্তু পৃথগ্‌ভাবে উক্ত তিনের প্রত্যেকেরই নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহার নাম উদাসীন। এই চারজন মূল প্রকৃতি ব্যতীত মণ্ডলের উপাদান আরও আটটি, যথা—অগ্রভাগে চার—মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র ও অরিমিত্রমিত্র, আর পশ্চাদ্ভাগে চার—পার্ষ্ণিগ্রাহ (অরিপক্ষ) আক্রন্দ (বিজিগীষুর পক্ষ), পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ও আক্রন্দাসার। এই দ্বাদশটি প্রকৃতি লইয়া রাজমণ্ডল গঠিত। এই দ্বাদশের প্রত্যেকের—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ (কোশ), দণ্ড (বল)—এই পাঁচটি করিয়া দ্রব্যপ্রকৃতি আছে। অতএব, চার মূলপ্রকৃতি, আট শাখাপ্রকৃতি ও ষাটটি দ্রব্যপ্রকৃতি লইয়া মোট প্রকৃতি বাহাত্তর (৭২) [মনুসংহিতা ৭।১৫৫-১৫৭]। কৌটিল্য স্বয়ং বলিয়াছেন—স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড, মিত্র—এই সাতটি প্রকৃতি (অর্থশাস্ত্র ৬।১)। প্রকৃতি-সম্পৎ—প্রকৃতিসমূহের অপেক্ষিত গুণ-বাহুল্য। Elements of sovereignty (SH)। ২ শম-ব্যায়ামিক—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্ত্যর্থ আরভ্যমাণ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান—ব্যায়াম—"কর্ম্মারম্ভাণাং যোগারাধনো ব্যায়ামঃ" (অর্থশাস্ত্র ৭।২) ; যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ; যোগার্থ কর্ম্মারম্ভ—ব্যায়াম। শম—ক্ষেমার্থ কর্ম্মফলোপভোগকরণ ; ক্ষেম—প্রাপ্তের পরিরক্ষণ ; প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার্থ কর্ম্মফলোপভোগ শম। এই প্রকারে—যোগ-ক্ষেমের হেতু শম ও ব্যায়াম। Coucerning peace and exertion (SH). ৩ মণ্ডলযোনি মণ্ডলের যোনি অর্থাৎ উপাদান। The source of sovereign states (SH) বস্তুতঃ প্রকৃতি-সম্পৎ ও শম-ব্যায়াম মণ্ডলের উপাদান। source বা উৎপত্তি-ক্ষেত্র বলিলে উহা ঠিক বুঝা যায় না। পক্ষান্তরে গণপতি শাস্ত্রী যেরূপ ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারও কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মতে :—মণ্ডল—বিজিগীষু অরি-মধ্যম-উদাসীন—এই চারিটি অবয়ববিশিষ্ট ; আর যোনি—পরবর্ত্তী অধিকরণোক্ত ষাড়্‌গুণ্যের বিষয়। মণ্ডলও বটে, আবার যোনিও বটে মণ্ডলং চ তদ্ যোনিশ্চ—অর্থাৎ উহা মণ্ডলাত্মক ষাড়্‌-গুণ্যের যোনি (হেতু)। অবশ্য ইহা সত্য যে—পরবর্ত্তী অধিকরণে বলা হইয়াছে—ষাড়্‌গুণ্যের যোনি প্রকৃতি-মণ্ডল। তথাপি এ অধিকরণে মণ্ডলের উপাদানভূতা প্রকৃতির সম্পৎ ও শম-ব্যায়ামের কথা বলা হইয়াছে। এ কারণে মণ্ডলের যোনি (উপাদান) মণ্ডলযোনি—এরূপ অর্থ করাই সঙ্গত বোধ হয়।

১ ষাড়্‌গুণ্যসমুদ্দেশ১। ২ ক্ষয়-স্থান-বৃদ্ধি-নিশ্চয়২। ৩ সংশ্রয়-বৃত্তি৩। ৪ সমান-হীন-শ্রেষ্ঠগণের গুণ-ব্যবস্থাপন৪। ৫ হীন-কৃত সন্ধি৫। ৬ বিগ্রহানন্তর আসন৬। ৭ সন্ধিপূর্ব্বক আসন৭। ৮। বিগ্রহানন্তর যান৮। ৯ সন্ধ্যনন্তর যান৯। ১০ সম্মিলিত প্রয়াণ১০। ১১ যাতব্য ও অমিত্রের বিরুদ্ধে অভিযান-বিষয়ে চিন্তা১১। ১২ প্রকৃতিগণের ক্ষয়-লোভ-বিরাগ-হেতু১২। ১৩ সামবায়িক-বিপরিমর্শ১৩। ১৪ সংহিতপ্রয়াণিক১৪। ১৫ পরিপণিত অপরিপণিত ও অপসৃত সন্ধিসমূহ১৫। ১৬ দ্বৈধীভাব-সম্বন্ধীয় সন্ধি-বিক্রম১৬। ১৭ যাতব্যবৃত্তি১৭। ১৮ অনুগ্রাহ্য মিত্র-বিশেষ-সমূহ১৮। ১৯ মিত্র-হিরণ্য-ভূমি-কর্ম্ম-সন্ধি১৯। ২০ পার্ষ্ণি-গ্রাহচিন্তা২০। ২১ হীনশক্তিপূরণ২১। ২২ বলবান্ শত্রুর সহিত বিগ্রহপূর্ব্বক উপরোধের হেতুসমূহ২২। ২৩ দণ্ডোপনত বৃত্ত২৪। ২৫ সন্ধিকর্ম্ম২৫। ২৬ সন্ধিমোক্ষ২৬। ২৭। মধ্যম-চরিত২৭। ২৮ উদাসীন-চরিত২৮। ২৯ মণ্ডল-চরিত২৯। ইতি ষাড়্‌গুণ্য-নামক সপ্তম অধিকরণ।

সঙ্কেত :—১ ষাড়্‌গুণ্য—সন্ধি-বিগ্রহ-আসন-যান-সংশ্রয়-দ্বৈধীভাব। সন্ধি—পণ-বন্ধ ; বিগ্রহ—অপকার, যুদ্ধ ; আসন—উপেক্ষা, ঔদাসীন্য ; যান—অভ্যুচ্চয়, আক্রমণোদ্‌যোগ ; সংশ্রয়—পরশক্তির আশ্রয়-গ্রহণ ; দ্বৈধী-ভাব—একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহ—এইরূপে যুগপৎ সন্ধি ও বিগ্রহ অবলম্বন। Sixfold policy (SH)। ২ বৃদ্ধি—যে গুণ আশ্রয় করিলে নিজের দুর্গ-সেতু-বণিক্‌পথাদির উন্নতি ও পরশক্তির এই সকল কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে—তাহাই বৃদ্ধি বা অভ্যুচ্চয় ; ক্ষয়—উহার বিপরীত যে গুণাশ্রয়ে স্বকর্ম্মের উপঘাত হয় ও পরের ক্ষতি হয় না ; স্থান—যে গুণাশ্রয়ে স্বকর্ম্মের বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই হয় না। এই তিন প্রকার গুণের নির্ণয় এই প্রকরণে আছে। Determination of deterioration,stagnation and progress (SH)। ৪ সম—বিজিগীষুর সমানশক্তি-বিশিষ্ট অরি ; হীন—অল্পশক্তি ; শ্রেষ্ঠ (মূলে জ্যায়ান্)—অধিকশক্তি। সম-হীন-শ্রেষ্ঠ-শক্তিগণের গুণ-বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা-নির্ণয়। ৫ হীন অর্থাৎ অল্পশক্তি রাজা কোশ-দণ্ডাদি প্রদানপূর্ব্বক যে প্রকার সন্ধি করিবেন, তাহার বিবরণ এই প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণ একটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৬ বিগ্রহ—যুদ্ধ ; যুদ্ধ ঘোষণানন্তর

শত্রুর সহিত যুদ্ধ না করিয়া নিজরাষ্ট্রে স্থিরভাবে অবস্থান—এই প্রকরণের বিষয়। Neutrality after proclaiming war (SH)। ৭ অভিযানে অসমর্থ হইলে পরের সহিত সন্ধিপূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থান আসন। Neutrality after concluding a treaty of peace (SH)। ৮ পার্ষ্ণি গ্রহাদির সহিত যুদ্ধ-ঘোষণানন্তর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান। Marching after proclaiming war (SH)। ৯ পার্ষ্ণিগ্রাহ (পশ্চাদ্‌ভাগস্থিত শত্রুর মিত্রশক্তি) ইত্যাদির সহিত সন্ধিপূর্ব্বক অরির বিরুদ্ধে অভিযান। Marching after making peace (with rear enemies (SH)। ১০ সম-হীন-শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত মিলিয়া (সম্ভুয়—মূল) অরির বিরুদ্ধে অভিযান। March of combined powers (SH)। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম প্রকরণ একই (চতুর্থ) অধ্যায়ের অন্তর্গত। ১১ যাতব্য—যাহার বিরুদ্ধে অভিযান কর্ত্তব্য পারিভাষিক অর্থ—অরি-সম্পদ্‌যুক্ত অথচ ব্যসনী (বিপদ্‌গ্রস্ত)। অরি-ত্য অপকারী শত্রু। অভিগ্রহ (মূল)—অভিযান। যাতব্য ও 'অমিত্র—উভয়ের মধ্যে কাহার বিরুদ্ধে অভিযান করণীয় তদ্বিষয়ে বিচার (গঃ শাঃ)। Consideration about marching against an assailable enemy and a strong enemy (SH)। ১২ গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণে পাঠ—১২ ক্ষয়লোভ-বিরাগহেতবঃ প্রকৃতীনাম্‌। ১৩ সামবায়িকবিপরিমর্শঃ। শ্যাম শাস্ত্রীর সংস্করণে পাঠ—যাতব্যামিত্রয়োরভিগ্রহচিন্তা ক্ষয়লোভবিরাগহেতবঃ। প্রকৃতীনাং সামবায়িতবিপরিমর্শঃ। কিন্তু তিনি ইংরাজী ভাষান্তরকালে 'প্রকৃতীনাং' পদটির অন্বয় করিয়াছেন 'ক্ষয়লোভবিরাগহেতবঃ' এর সহিত—causes leading to the dwindling, greed and disloyalty of the army (SH)। 'সামবায়িত' মূল—'সামবায়িক' পাঠান্তর—শ্যাম শাস্ত্রীর পাদটীকায় ও প্রকরণের শিরোদেশে (পৃঃ ২৭০) দৃষ্ট হয়। মূল প্রকরণটির বিশ্লেষণ-দ্বারা বুঝা যায় যে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ধৃত পাঠই শুদ্ধ। ক্ষয়—গজ-বাজি-পুরুষ-ধনাদির অপচয়; লোভ—অতি তৃষ্ণা; বিরাগ—প্রদেষ; অমাত্যাদির মধ্যে ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ এই প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে (গোঃ শাঃ)। ১৩ সামবায়িক—সমবেত হইয়া যাঁহারা কার্য্য করেন, যথা—বিজিগীষু-পক্ষীয় রাজগণ; তাঁহাদিগের বিপরিমর্শ—গুরু-লঘু-ভাব-চিন্তা; considerations about the combination of powers ১১, ১২ ও ১৩ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ১৪ সংহিত—যাঁহার সহিত সন্ধি করা হইয়াছে। শত্রু ও বিজিগীষু পরস্পর সন্ধি (pact) করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে অভিযান (গঃ শাঃ); the march of combined powers (SH)। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদে মনে হয় যেন পরস্পর সন্ধিবদ্ধ রাজদ্বয়ের একযোগে একদিকে গমন অভিপ্রেত—কিন্তু মূলে বর্ণনা আছে—উভয়ের ভিন্ন দিকে গমন কর্ত্তব্য। ১৫ পরিপণিত সন্ধি—দেশ-কাল-কার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী কৃত সন্ধি; অপরিপণিত—উহার বিপরীত—দেশ-কাল-কার্য্য-ব্যবস্থা-বিহীন সন্ধি; অপসৃত সন্ধি—স্বপক্ষ হইতে যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সন্ধি (গঃ শাঃ); agreement of peace with or without definite terms and peace with renegades (SH); ১৪ ও ১৫ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অনুগত। ১৬ দ্বৈধীভাব—একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত যুদ্ধ; দ্বৈধীভাব অবলম্বনে যুদ্ধ ও সন্ধি; বিক্রম—বিগ্রহ, যুদ্ধ। Peace and war by adopting the double policy (SH)। ১৭ যাতব্য—যাহার বিরুদ্ধে বিজিগীষু অভিযান করিয়া থাকেন। গণপতি শাস্ত্রী যে কেন যাতব্য-পদের ব্যাখ্যা করিলেন—বিজিগীষু, তাহা বুঝা যায় না—সম্ভবতঃ ইহা অনবধানতা-প্রযুক্ত ভ্রমমাত্র। তাঁহার মতে—সমবেত রাজমণ্ডলের প্রতি যাতব্যের (বিজিগীষুর) আচরণ ও সামবায়িকগণের যাতব্যের প্রতি ব্যবহার—এ প্রকরণের বর্ণনা-বিষয়। The attitude of an assailable enemy (SH)। ১৮ মিত্র—বিজিগীষুর পর অরি; অরির পর মিত্র তাহার পর অরিমিত্র, অতঃপর মিত্রমিত্র ও অরিমিত্রমিত্র ইহাই রাজমণ্ডলের সম্মুখস্থ ক্রম। কোন্ কোন্ মিত্রকে সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করা উচিত—ইহাই বিবৃত হইয়াছে। Friends that deserve help (SH)। ১৭ ও ১৮ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। ১৯ মিত্রসন্ধি—মিত্রলাভার্থ সন্ধি; হিরণ্যসন্ধি—হিরণ্যলাভার্থ সন্ধি—এই দুই প্রকরণাংশ এক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভূমিসন্ধি—ভূমিলাভার্থ সন্ধি—ইহা একটি পৃথক্ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অনবসিত সন্ধির কথা বলা হইয়াছে—পোড়ো জমিতে উপনিবেশ স্থাপন ("ত্বং চাহং চ শূন্যং নিবেশয়াবহে' ইত্যনবসিতসন্ধিঃ"—কৌটিল্য ৭।১১); Interminable agreement (SH)। কর্ম্মসন্ধি—কোন কর্ম্মকরণার্থ সন্ধি ("ত্বং চাহং চ দুর্গং কারয়াবহে' ইতি কর্ম্মসন্ধিঃ"—কৌঃ ৭।১২); Agreement for undertaking a work; এই এক প্রকরণ (১৯) চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ২০ পার্ষ্ণিগ্রাহ—পশ্চাতে আক্রমণকারী প্রকৃতি। অরি বিজিগীষু যখন পার্ষ্ণিগ্রাহরূপে সম্মুখভাগবর্ত্তী শত্রুর পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করেন, তখন কি কর্ত্তব্য—তদ্বিষয়ে বিচার, considerations about an enemy in the rear (SH)। ২১ শক্তি ত্রিবিধ—প্রভু-শক্তি, মন্ত্রশক্তি, উৎসাহশক্তি; এই শক্তিত্রয়ের অপচয় হইলে তাহার পূরণ অর্থাৎ বর্দ্ধন (গঃ শাঃ); recruitment of lost power (SH)। ২২ প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বলবত্তর শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ বা দুর্গ প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষণের কারণসমূহ এই প্রকরণে কথিত হইয়াছে; এস্থলে উপরোধ অর্থে—শত্রু অপেক্ষা বলবত্তর অথবা শত্রুর সমান প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ, অথবা দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ। Measures conducive to peace with a strong and provoked enemy (SH); অনুবাদটি মূলানুগ হয় নাই। ২৩ দণ্ড অর্থাৎ বল দ্বারা উপনত অধঃকৃত দণ্ডোপনত; তদবস্থাপন্ন প্রকৃতির বলবান্ প্রকৃতির প্রতি আচরণ এই প্রকরণের বিষয়। Attitude of a conquered enemy (SH)। ২২ ও ২৩ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ২৪ দণ্ড অর্থাৎ বল দ্বারা শত্রুকে নিজ সমীপে যিনি উপনত করেন, তিনিই দণ্ডোপনায়ী, তাঁহার আচরণ এই প্রকরণের অন্তর্গত (গঃ শাঃ); Attitude of a conquered king (SH)। ইহা স্পষ্টই ভুল—conquering king হওয়া উচিত। ২৫ সন্ধিকর্ম্ম—সন্ধি করা; making peace (SH)। ২৬ সন্ধিমোক্ষ—সন্ধি-বন্ধন হইতে মুক্তি; breaking (peace) (SH)। ২৫ ও ২৬ প্রকরণ এক অধ্যায়ের অন্তর্গত। ২৭ মধ্যম—যাঁহার রাজ্য ও অরি উভয়ের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী (ভূম্যনন্তর), ও যিনি মিলিত বা অমিলিত অরি-বিজিগীষুর অনুগ্রহে, অথবা অমিলিত উভয়ের (প্রত্যেকের পৃথগ্‌ভাবে) নিগ্রহে সমর্থ, কিন্তু মিলিত উভয়ের নিগ্রহে সমর্থ নহেন—তিনি মধ্যম। মধ্যমের আচরণ ও মধ্যমের প্রতি বিজিগীষুর আচরণ এই প্রকরণের বিষয়। ২৮ উদাসীন—অরি-বিজিগীষু-মধ্যমের রাজ্যের বাহিরে যাঁহার রাজ্য, যিনি অতি বলবান্, যিনি মিলিত বা অমিলিত অরি-বিজিগীষু-মধ্যমের অনুগ্রহে সমর্থ, অথবা অমিলিত এই তিনের (প্রত্যেকের পৃথগ্‌ভাবে) নিগ্রহে সমর্থ, অথচ মিলিত তিনের নিগ্রহে সমর্থ নহেন—তিনিই উদাসীন। ২৯ মণ্ডল—দ্বাদশ রাজমণ্ডল—পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ২৭, ২৮ ও ২৯ প্রকরণ—একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ক্রমশঃ

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

পশ্চিম ইউরোপের রণাঙ্গন

পশ্চিম ইউরোপে মিত্রপক্ষের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। জেনারল আইসেন্ হাওয়ারের নেতৃত্বে ছয়টি আর্ম্মী এখন জার্ম্মানীর পশ্চিম সীমান্তে আঘাত হানিতেছে। তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্ম জার্ম্মান সেনাপতি রুণষ্টেড্ সৈন্ত সমাবেশ করিয়াছেন রাইন নদীর পশ্চিমে। নভেম্বর মাসের শেষভাগে এই রণাঙ্গনের অবস্থা এইরূপ ছিল—সুইজারল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তের নিকটে ফরাসী সেনা জার্ম্মানদের প্রতিরোধ ভেদ করিয়া রাইন নদীর তীরে পৌঁছায়; তাহারা মুলহাউস অধিকার করে; আরও উত্তরে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ মার্কিণ সেনার অধিকারভুক্ত হয়; লোরেণ-সার প্রদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাহারা জার্ম্মানীর মধ্যে প্রবেশ করে, এখানে সারের কয়েকটি কয়লার খনি তাহাদের হাতে আসে। আকেন্ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সেনা একটি গুরুত্বপূর্ণ চৌমাথা অধিকার করিয়াছে, কোলন্ ও ডুরেনের দিকে যাইবার পথ এখন উন্মুক্ত। গত ২৯শে নভেম্বর মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, কোলন্ অঞ্চলে যদি শত্রুর ব্যূহ ভেদ হয়, তাহা হইলে উহার সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক হইবে। এই অঞ্চলে মিত্রপক্ষের প্রবল আঘাত আসন্ন বলিয়া মনে হয়।

রাইনল্যাণ্ডের পূর্ব্ব সীমান্তে রাইন নদীর তীরে কোলন্ অবস্থিত। রাইনল্যাণ্ডের সমগ্র প্রস্থ অতিক্রম করিয়া মিত্রপক্ষের সেনা যদি কোলনে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই সাফল্যের সামরিক গুরুত্ব সত্তাই অধিক হইবে। তখন দক্ষিণ দিক হইতে রূঢ় অঞ্চলের বিপদ উপস্থিত হইবে, উত্তর দিক হইতে বৃটিশ সৈন্তও রূঢ় বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারিবে। জার্ম্মানীর রাইণল্যাণ্ড ও রূঢ় শ্রমশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই অঞ্চলের বহু কারখানা দক্ষিণ জার্ম্মানীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। কিন্তু সমগ্র শ্রমশিল্পকেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়া কখনও সম্ভব নয়। কাজেই, বর্ত্তমান অবস্থাতেও রাইণল্যাণ্ড ও রূঢ় যদি জার্ম্মানীর হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মানীর সমর-প্রচেষ্টায় উহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটিবে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গন

লালফৌজের শীতকালীন অভিযান এখনও আরম্ভ হয় নাই। শরৎকালে লালফৌজের ত্রিমুখী অভিযান চলিতেছিল; পূর্ব্ব প্রুসিয়া, ওয়ারস ও দক্ষিণ পোল্যাণ্ড ক্রাকাও ছিল তাহাদের লক্ষ্য। এই তিনটি রণাঙ্গনে লালফৌজ গত কিছুকাল নিষ্ক্রিয় ছিল; এই সময় লালফৌজ ও রুমানিয়ান সৈন্তের আক্রমণ চলে বুডাপেষ্টের উদ্দেশে। সম্প্রতি রুশ সেনাপতি পিট্রভ্ চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করেন; তাঁহার সেনাবাহিনী ডকলা গিরিবর্ত্মে পৌঁছিয়াছে। ২৯শে নভেম্বর দক্ষিণ হাঙ্গেরিতে লালফৌজ ড্রেভ্ ও দানীয়ুবের সঙ্গমস্থলে দানীয়ুব নদী অতিক্রম করিয়াছে; এই নূতন তৎপরতার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। কোন কোন সমর-সমালোচক মনে করেন—দক্ষিণ হাঙ্গেরিতে এই তৎপরতাই লালফৌজের শীতকালীন অভিযানের প্রারম্ভিক পর্ব্ব।

দক্ষিণ হাঙ্গেরিতে তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে ইহাই লালফৌজের চূড়ান্ত অভিযানের সূচনা কি না বলা যায় না। বস্তুতঃ কোন্ দিক হইতে কি ভাবে শীতকালীন অভিযান আরম্ভ হইবে, তাহা এখনও সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। যে যে অঞ্চলে লালফৌজ এখন পৌঁছিয়াছে, সেই সেই অঞ্চলের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ওয়ারস ও ক্রাকাও যদি রুশ সৈন্তের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সাইলেসিয়ায় যাইবার পথ উন্মুক্ত হইবে; ইহার পর তাহারা বার্লিন পর্য্যন্ত প্রসারিত সমতলভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে। পূর্ব্ব প্রুসিয়া রণক্ষেত্রের সামরিক গুরুত্ব অল্প; তবে, ওয়ারস ও ক্রাকাও অঞ্চলরক্ষী জার্ম্মান সৈন্তের পার্শ্বদেশ যাহাতে বিপন্ন না হয়, সে জন্ম জার্ম্মানরা পূর্ব্ব প্রুসিয়ায় প্রবলভাবে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাইয়াছে। ইহা ছাড়া, জার্ম্মানীর অভিজাত সামরিক শ্রেণীর আবাসভূমিরূপে পূর্ব্ব প্রুসিয়া রক্ষার একটা নৈতিক গুরুত্বও আছে। চেকোস্লোভাকিয়ায় লালফৌজের যে তৎপরতা প্রসারিত হইয়াছে, উহা উত্তরে ক্রাকাও এবং দক্ষিণে বুডাপেষ্টের মধ্যে একটি কীলক প্রবেশ করাইবার চেষ্টা। ড্রেভ্ এবং দানীয়ুবের সঙ্গমস্থলে জেনারল টল্‌বুখিনের সেনা যেখানে দানীয়ুবের পশ্চিম দিকে পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে তাহাদের পশ্চিমাভিমুখী আরও অগ্রগতি যদি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বুডাপেষ্টের পশ্চিম পার্শ্ব বিপন্ন হইবে। অতি সত্বর অষ্ট্রিয়ার দ্বাররক্ষী গ্রাৎস্ নগরের বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। ইহা ছাড়া ইতালীতে যুদ্ধরত ৮ম আর্ম্মীর সহিত টল্‌বুখিনের সৈন্তের মিলন ঘটিতে পারে।

বেল্‌জিয়ামে অশান্তি

বেল্‌জিয়ামের যে প্রাগ্-যুদ্ধকালীন গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনে জিয়ানো ছিল, সেই গভর্ণমেণ্ট এখন শত্রুর কবলমুক্ত বেল্‌জিয়ামের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। জার্ম্মানীর অধিকারে থাকিবার সময় সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যে বামপন্থী দল প্রতি দিন শত্রুর সহিত লড়িয়াছে, তাহাদের রাজনৈতিক আদর্শের সহিত এই প্রাচীনপন্থীদের মিল থাকা সম্ভব নয়—নাই-ও। অথচ, এই বামপন্থীদের প্রভাব জনসাধারণের উপর বিস্তারিত হইয়াছে; নিষ্কণ্টক হইয়া প্রাগ্-যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে হইলে ইহাদিগকে দমন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই, ইহাদের দুর্ব্বল করিবার জন্ম পিয়ারেলো মন্ত্রিসভা আদেশ দিয়াছিলেন যে, প্রতিরোধ-আন্দোলনের লোকদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই আদেশের প্রতিবাদে পিয়ারেলো-মন্ত্রিসভার দুই জন কম্যুনিষ্ট ও এক জন সোস্যালিষ্ট মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। তাহার পর বেল্‌জিয়ামে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে। গত ৩০শে নভেম্বর সংবাদ আসিয়াছে যে, পিয়ারেলো-মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্ম ষড়যন্ত্র হইয়াছিল; অতি কষ্টে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হইয়াছে। বেল্‌জিয়াম পার্লামেণ্ট পিয়ারেলো-মন্ত্রিসভাকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এই সময় কম্যুনিষ্টরা নাকি জনসাধারণকে কাজ বন্ধ করিতে অনুরোধ করে। ইহার পর বেল্‌জিয়ামের আর কোন সংবাদ আসে নাই। বেল্‌জিয়াম সংক্রান্ত সংবাদ যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। যে টুকরা টুকরা সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকৃত অবস্থাটা সুস্পষ্ট হইতেছে না।

বেল্‌জিয়ামের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বুঝিতে হইলে পশ্চিম ইউরোপের শক্তিগুলির (বৃটেনই তাহাদের প্রধান পাণ্ডা) যুদ্ধোত্তর-কালীন পরিকল্পনাটি জানা দরকার। আমরা দেখিয়াছি—পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে রুশিয়ার সহিত সুর মিলাইয়া মিঃ চার্চ্চিল পোলিস্ বামপন্থীদের দাবী সমর্থন করিয়াছেন, যুগোস্লোভিয়ার ব্যাপারে তাঁহারা টিটোকে সহজেই মানিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ বাল্টিক অঞ্চল ও বল্‌কানের ব্যাপারে রুশিয়ার সহিত তাঁহারা কোনরূপ বিতর্ক তুলিতেছেন না।

ইহা হইতে নিশ্চয়ই এইরূপ অনুমান করা চলে না যে, চার্চিল-মন্ত্রিসভা ইউরোপকে বামপন্থীদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন—সোভিয়েট রুশিয়ার নৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত বামপন্থীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই। বস্তুতঃ বাল্টিক ও বল্‌কানের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব তথা ঐ অঞ্চলের বামপন্থীদের দাবী ইহারা মানিয়া লইয়াছেন নিতান্ত বাস্তব বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া। বাল্টিক ও বল্‌কানে প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা যে আর প্রবর্ত্তন সম্ভব নয়, ইহা তাহারা বুঝিয়াছেন এবং এই সত্য সহজে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা—ভৌগোলিক কারণে যেখানে সোভিয়েট রুশিয়া অপেক্ষা তাঁহাদের প্রভাব বিস্তারের সুবিধা বেশী, সেখানে তাঁহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে; এই বিষয়ে তাঁহারা বদ্ধপরিকরও বটেন। তাহাদের প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন পরিকল্পনাও এই আশার ভিত্তিতে রচিত। Regional security অর্থাৎ তিনটি প্রধান শক্তির এক একটিকে এক একটি অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়ার কথা আমরা আজকাল শুনিতেছি। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য এই—রুশিয়া তাহার কম্যুনিজম্ লইয়া পূর্ব্ব ইউরোপে থাকুক, আমেরিকা তাহার মার্কিণ আভিজাত্য লইয়া পশ্চিম গোলার্দ্ধে অবস্থান করুক; আর বৃটেন তাহার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ লইয়া মোড়লী করুক পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্র-গুলিতে এবং এই সব রাষ্ট্রের প্রভুত্বাধীন এশিয়ার ও আফ্রিকার রাজ্য-গুলির উপর। বস্তুতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেল্‌জিয়ামের সাম্রাজ্যের সহযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধোত্তরকালে একটি স্বতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মণ্ডল গড়িবার আয়োজন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই অর্থ-নৈতিক মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া সহজেই যুদ্ধোত্তরকালীন দুর্দ্দিন অতিক্রম করা সহজ হইবে বলিয়া বৃটেন আশা করে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই স্বতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মণ্ডল ভাঙ্গিবার চেষ্টাই প্রকাশ পায়—যখন সে অবাধ বাণিজ্যের মহিমা কীর্ত্তন করে।

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—কেন বল্‌কান্ ও বাল্টিক অঞ্চলে প্রাগযুদ্ধকালীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া প্রগতিপন্থীদের প্রতিষ্ঠা সহজ হইতেছে, আর কেনই বা বেল্‌জিয়ামে প্রগতিপন্থীদের দমন করিবার এই অপচেষ্টা! বেল্‌জিয়ামের পিয়ারেলো, স্প্যাক্ প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলিয়াই কেবল এই অশান্তির উদ্ভব হয় নাই—তাঁহারা পশ্চিম ইউরোপের সমগ্র প্রতিক্রিয়া শক্তির অনুচররূপে কাজ করিতেছেন বলিয়া বেল্‌জিয়ামের সমস্যা এতদূর জটিল হইয়াছে। বেল্‌জিয়ামে যদি প্রাগ্‌যুদ্ধ-কালীন ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়, বেল্‌জিয়ান্ পুঁজিপতি দলের স্বার্থ যদি অটুট থাকে, তাহা হইলেই যুদ্ধের পর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যগুলির 'ব্লক' গঠন করিবার স্বপ্ন সফল হইতে পারে। আর যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে প্রগতিপন্থীদের দমন করিবার সুযোগ রহিয়াছে; এখন যদি তাহারা গোলযোগ সৃষ্টি করে, তাহা হইলে মিত্রপক্ষের রাইফেল্ ও বেয়নেট্ সামরিক প্রয়োজনের নামে তাহাদিগকে সায়েস্তা করিতে পারিবে। বস্তুতঃ মিত্রপক্ষের সেনাপতি আর্সকিন্ সামরিক স্বার্থরক্ষার প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে বেল্‌জিয়ামে বসিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য খুব অস্পষ্ট নয়।

চীন-যুদ্ধে সঙ্কট

চীনে জাপান সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ চীনে কোয়াংসী প্রদেশে জাপানীরা যেখানে পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে উত্তরে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত তাহারা এখন একটি লাইন স্থাপন করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়া হইতে হংকং পর্য্যন্ত প্রসারিত সরবরাহ-সূত্রে তাহারা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত; গোটা চীন এখন দুইভাগে বিভক্ত। জাপানীরা কোয়েচাও প্রদেশে আক্রমণ প্রসারিত করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে; কোয়েচাওর রাজধানী কোয়েলীয়াং হইতে চুংকিংএর দূরত্ব ২ শত মাইল। কোয়েলীয়াং জাপানের অধিকারভুক্ত হইলে কোয়েচাও প্রদেশের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত মার্কিণ বিমানঘাঁটিগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। যে ব্রহ্ম-চীন ও ভারত-চীন রাস্তা লইয়া এত আশা ও জল্পনা-কল্পনা, কোয়েচাও প্রদেশে জাপানীদের অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ না হইলে ক্রমে সেই পথও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—কোয়াংসী প্রদেশে জাপানীদের আক্রমণ প্রবল হইয়া উঠায় নানিংএর বিমানক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মার্কিণ সেনা চলিয়া আসিয়াছে।

জাপানের এই সাম্প্রতিক সাফল্যে চুংকিংএর আশু বিপদ ঘটে নাই। কিন্তু উত্তর চীনের সহিত দক্ষিণ চীনের উপকূলের অবাধ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে; হয়ত জাপান এই সংযোগসূত্র ইন্দ-চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ সেনা সম্প্রতি যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে খাস জাপানের সহিত মালয় ও ব্রহ্মদেশের সামুদ্রিক সংযোগ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন সেনার দক্ষিণ চীনে অবতরণের সম্ভাবনাও ঘটিয়াছে। এখন দক্ষিণ চীনে জাপান যে সাফল্য লাভ করিল, তাহাতে সে শীঘ্রই ইন্দ-চীন পর্য্যন্ত স্থলপথের সংযোগ স্থাপন করিয়া সমুদ্র পথ বিপন্ন হইবার অসুবিধা দূর করিতে পারিবে। দক্ষিণ চীনে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া ঐ অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সম্ভাবিত অবতরণ-প্রচেষ্টা রোধের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। দ্রুত চীনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া মাঞ্চুরিয়া-হংকং লাইন হইতে যদি জাপানকে ঠেলিয়া দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ঐ লাইনের পূর্ব্ব দিকে ধীরে ধীরে জাপানের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। চীনের পূর্ব্বাঞ্চলে "বম্ টোকিও" বিমানক্ষেত্রগুলি জাপানের হাতে আসিবে।

চীনের রাজনীতি

বহির্জগৎ হইতে চীন বিচ্ছিন্ন হইবার পর চীনের সামরিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে থাকে। গত তিন বৎসরের মধ্যে চীন কোন বড় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। অসম্ভব মুদ্রাস্ফীতির ফলে চীনের জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছায়। সরকারী কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দারুণ দুর্নীতি দেখা দেয়। জাপানের অধিকৃত চীন ও স্বাধীন চীনে ব্যবসা চলিতে থাকে; দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীরা উহা দেখিয়াও দেখে না। যায়গায় যায়গায় সামরিক কর্ম্মচারীরা এই অসাধু ব্যবসায়ের মুনাফার মোটা অংশ লয়। এদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে কুয়োমিণ্টাংএর প্রতিক্রিয়াপন্থীরা আধা-ফ্যাসিস্ত শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করে; জনমতের কণ্ঠ রোধ করিয়া দেওয়া হয়। কমুনিষ্ট-কুয়োমিণ্টাং বিরোধ এতদূর বাড়িয়া ওঠে যে, উত্তর চীনে কমুনিষ্ট শাসিত প্রদেশগুলির সীমান্তে চুংকিংএর কর্ত্তৃপক্ষ ৬ লক্ষ সেনা সমাবেশ করেন। চুংকিং-এর কুয়োমিণ্টাং পাণ্ডাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে চীনের এই সব সংবাদ বাহিরে প্রকাশ পাইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রণিক্‌লের' সংবাদ-দাতা চীন হইতে ফিরিয়া সেখানকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ করেন। তাহার পর আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' ও 'লাইফ' পত্রিকার সংবাদদাতা আরও অনেক কথা জানাইয়াছেন।

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি চীনস্থিত মার্কিণ সেনাপতি ষ্টিল্‌ওয়েলকে অকস্মাৎ সরাইয়া লওয়া হয়। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তখন বলেন যে, চিয়াং-কাই-সেক্ ষ্টিল্‌ওয়েলের অপসারণ দাবী করিয়াছিলেন বলিয়া এই ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় চীনকে প্রদত্ত সাহায্যে ষ্টিল্‌ওয়েল্ সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব চাহিয়াছিলেন। তিনি কমুনিষ্টদের সহিত আপোষ করিয়া কম্যুনিষ্ট সীমান্তের ৫ লক্ষ সৈন্য জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার দাবী জানাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই চিয়াং-কাই-সেকের সহিত তাহার বিরোধের সূত্রপাত। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ষ্টিল্‌ওয়েল্‌কে সরাইয়া

ইবার সময় বলেন-বে, তিনি তাঁহার কাজ করিলেন ; এখন পরবর্ত্তী ্যাপারের দায়িত্ব চিয়াং-কাই-সেকের।` চিয়াং ইহার পর মন্ত্রিসভার কছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। দক্ষ সেনাপতি জেনারল চেন্ চেংকে সমর চিবের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। পররাষ্ট্র সচিব টি, ভি, সুং ষ্টেট্ াউন্সিলারের পদ পাইয়াছেন, চিয়াংএর কুটুম্ব কুং অর্থসচিবের পদ হইতে বতাড়িত হইয়াছেন ; শিক্ষা-সচিবের পদ হইতে প্রতিক্রিয়াপন্থী লিং চিং পসারিত হইয়াছেন।

কমুনিষ্টরা সমস্ত দল লইয়া অস্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের দাবী ানাইয়াছিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাঁহাদের দাবী পূর্ণ না হইলেও এখন ম্যুনিষ্টদের সহিত একটা আপোষ হওয়া অসম্ভব নয়। ঝুনা প্রতিক্রিয়া-ীদের অন্ততঃ কয়েকজন চীনের মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। তিমধ্যে কম্যুনিষ্ট নেতা চৌ-এন্-লাই নাকি মীমাংসার আলোচনার ্ত চুংকিংএ আসিয়াছেন ; ইঁহার মাথার জন্য চুংকিং কর্ত্তৃপক্ষ মোটা ্রস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

টোকিওয় বোমা বর্ষণ

গত ৮ দিনে ৪ বার টোকিওয় বোমা বর্ষিত হইয়াছে। টোকিও ইতে ১৫ শত মাইল দক্ষিণে সাইপান দ্বীপের ঘাঁটী হইতে বহির্গত ইয়া সুপার ফোর্ট্রেস শ্রেণীর মার্কিণ বিমান এই আক্রমণ চালাইতেছে।

টোকিও, ইয়াকোহামা, কোবে, ওসাকা প্রভৃতি শ্রমশিল্প কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে বোমা বর্ষণের সামরিক মূল্য খুবই বেশী। জাপানের প্রধান সামরিক কারখানাগুলি খাস জাপানেই অবস্থিত। এই সব কারখানা চূর্ণ হইলে জাপানের সমর-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া, এতদিন জাপানীরা তাহাদের যে গৃহপ্রাঙ্গণকে শত্রুর পক্ষে অনধিগম্য মনে করিয়াছে, তাহাতে নিয়মিত বোমা বর্ষণের নৈতিক মূল্যও কম নয়।

ফিলিপাইন্‌সের যুদ্ধ

লেট্ দ্বীপে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। সম্প্রতি লিমনে জাপানের দুর্গ মার্কিণ সেনার আক্রমণে চূর্ণ হয়। তাহার পর, জাপান এই অঞ্চলে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করে ; এই চেষ্টার সময় বহু বার জাপ-সৈন্য-পূর্ণ জাহাজ মার্কিণ বিমানের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু তবুও জাপানের সৈন্য অবতরণ বন্ধ হয় নাই। লেটে অরমক্ অঞ্চলে এখনও প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। অরমক্ এই দ্বীপে জাপানীদের সর্ব্বশেষ প্রধান বন্দর।

ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ

ব্রহ্মদেশে চীনা সৈন্য ভামোতে প্রবেশ করিয়াছে। চিন্দুইন্ রণক্ষেত্রে ক্যালেভায়া মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই শীতকালেই উত্তর ব্রহ্ম শত্রুর কবলমুক্ত করিয়া চীনের সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইবে। অবশ্য, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ চীনে সামরিক অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে ; ব্রহ্মদেশে ও চীনে অবাধ সংযোগ স্থাপিত হইবার পথে অপ্রত্যাশিত নূতন বিঘ্ন ঘটিতেছে। ৩।১২।৪৪

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

াগুয়মান সমাজের Transitional Period যে শেষ হয়ে াসছে এবং সুফল যে শীঘ্রই দেখা যাবে, তা কদাচিৎ কয়েকটা ঘটনা েখে বুঝতে পারি। উৎশৃঙ্খলার মধ্যেও শৃঙ্খলা ও যুক্তি সুরু হয়েছে। কি দোষটুকু আপনা হতেই সরে যাবে। কয়েকটা বিবৃতিমূলক ঘটনার লেখ করলাম। ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আমি কয়েকটা গল্প লিখেছি।

"১৯৩৫ সালে একটা মেয়েকে উদ্ধার (?) করে তাকে জিজ্ঞাসা রি—স্বামী ছেড়ে অপরের সঙ্গে চ'লে এসেছ। পাপের ভয় নেই ামার। উত্তরে মেয়েটী বলে—না এতদিন পাপ করেছিলাম। তদিন দেহ দিয়েছিলাম একজনকে, মন দিতাম আর একজনকে। াজ দেহ ও মন একজনকেই দিয়েছি। এতদিন পাপ করেছি াজ করছি তার প্রায়শ্চিত্ত। বিব্রত হয়ে বোঝাই—তবু ত সে ামার স্বামী ; বিয়ে ত তোমাদের হয়েছে। উত্তরে সে বলে—'সে য়ে ত জোর করে দেওয়া। তা ছাড়া মন্ত্র যা কিছু পড়েছে, সেই ড়ছে আমি পড়ি নি। কি বলছেন, তবু সেটা বিয়ে। বলি দিতে ব ? সমাজের যূপকাষ্ঠে স্বার্থকে ? স্বার্থত্যাগটা তা হলে করা উচিৎ ্ মেয়েদেরই—পুরুষদের নয়। বেশ স্বামীর কাছেই ফিরে যাব, ন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। সঠিক উত্তর হওয়া ই।' আশ্বস্ত হয়ে বললাম—বেশ ত করনা। উত্তরটা সঠিক হলে ন্তু, যা বলব তাই শুনতে হবে। রাজী হয়ে মেয়েটী জিজ্ঞেস লে—'ছুটকী গোয়ালিনী ছিল পাড়ার এক দুধওয়ালী। 'মোটা সী স্ত্রীলোক। বয়স বছর চল্লিশ। মিশমিশে কাল তার গায়ের , কেরকেরে তার গলা। তার নাম করে মায়েরা শিশুদের ভয় াত, অ ওই ছুটকী। বিব্রত হয়ে জানালাম—হাঁ জানি। রে মেয়েটী বললে—আচ্ছা। এখন একটা পেস্তল দেখিয়ে তাকে আপনাকে বিয়ে করতে বাধ্য করি ত তাকে আপনি স্ত্রী বলে ন বিতে পারেন ? এরূপ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, তাই ধমকে উঠলাম—জ্যেঠামীর আর বায়গা পাও নি। পাশেই মেয়েটীর ভাই দাঁড়িয়েছিল। কেঁদে ফেলে সে জিজ্ঞেস করল—হাঁ রে, তুই কি বাপ ভাইয়ের মুখের দিকেও তাকাবি না। ফোঁস করে উঠে মেয়েটী বলতে লাগল—কি বাপ ভাই। লজ্জা করে না বলতে ? কেন তাকাব, তোমরা তাকিয়েছ আমার দিকে ? তোমরা ভেবেছ শুধু সমাজের কথা, বংশ গরিমার কথা। ছোট বোনের সুখের দিকে তাকিয়েছিলে কি ? এরপর আমাকে উদ্দেশ করে মেয়েটী বললে—আইনের উদ্দেশ্য কি একটা মেয়েকে বেশ্যা করা, আর ছেলেটাকে চোর করা। ছেলেটাকে জেলে দিলে, তাকে চোর করাই হবে। জেল থেকে ফিরে সমাজে মুখ দেখাতে না পারলে, সে চোরই হবে। আর আমার কথা ভেবেছেন কি ? স্বামী আমাকে আর নেবে ? শেষ চেষ্টা স্বরূপ মেয়েটাকে বোঝাই—ওত দুদিনের ব্যাপার। দুদিন পরেই ত ফেলে পালাবে। উত্তরে মেয়েটী বলে—'দুদিনের তৃপ্তিই বা আমাকে দেয় কে। এই দুদিন ত সারা জীবনেও পেতাম না। যদি পাই, ত তা আমার সারা জীবনের পাথেয় হবে। কিন্তু সে আমাকে ঠকাবে না। ভাল করে তাকে চিনে, তবে বেরিয়েছি। মেয়েরা শান্তভাবে বিচারের সুযোগ পেলে ভুল করে না। বিরক্ত হয়ে বলে উঠি—ফের্ জ্যাঠামী ! তবু যদি লেখাপড়া জানতে। উত্তরে মেয়েটী বললে—'দেখুন বাংলা দেশের মেয়েরা নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু তারা অশিক্ষিতা নয়। তা বোধ হয় আমার সঙ্গে কথা কয়েই বুঝছেন।'

জানিনা পুরুষের অলক্ষ্যে মা ঠাকুমার কাছে মেয়েরা অপর কোনও শিক্ষা পায় কিনা। যে শিক্ষার জন্য আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্য নিই, সে শিক্ষা হয়ত মেয়েরা ঘরে বসেই পায়। পল্লীগাথা আমরা মুখস্থ করিনি, কথকতা বা ব্রতকথা ও শুনি নি। পুতুল নাচও দেখি নি, পল্লীযাত্রাও—না। এ গুলোর মধ্যে কিছুটা শিক্ষণীয় থাকলেও থাকতে পারে যেগতিক বুঝে চুপ করেই গেলাম। (ক্রমশঃ)
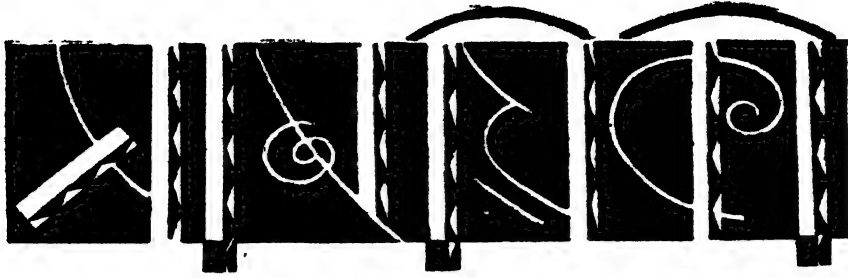
কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী—

বাঙ্গালার বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের ৬৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্নে তাঁহার দেশবাসীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এবং অধ্যাপক কালিদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করিয়া যে সম্বর্দ্ধনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন। দেশের প্রায় সকল খ্যাতনামা কবি ও বহু সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র ও উপহার দেওয়া হইয়াছে। সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে রৌপ্যাধারে মানপত্র ও একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। কবি তাঁহার অভিভাষণে তাঁহারই যোগ্য কথা বলিয়াছেন। আমরাও এই উপলক্ষে তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বঙ্গ ভারতীর সেবা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।

সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয়বৃন্দ—

সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও সার জগদীশপ্রসাদ উভয়েই বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা একযোগে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে অতঃপর আর কোন অভারতীয়কে গ্রহণ না করিয়া শুধু ভারতীয়গণকেই গ্রহণ করা উচিত। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে যেমন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ লোক গ্রহণ করিয়া থাকেন, তেমনই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেও তাঁহাদেরই লোক গ্রহণের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে শুধু ভারতীয় গ্রহণের প্রস্তাব বহুদিন হইতে করা হইতেছে। এবার সার নৃপেন্দ্রনাথ ও সার জগদীশপ্রসাদের মত প্রবীণ সরকার-সমর্থকের দল উহা সমর্থন করায় ঐ বিষয়ে হয় ত কর্তৃপক্ষের টনক নড়িবে।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ও ডাক্তার সাহা—

বিলাতে গত ৩০শে নভেম্বর বৈজ্ঞানিকগণের এক সভায় ডাক্তার মেঘনাদ সাহা ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেই বিচলিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার সাহা বলেন—বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের প্রথম দিকে ভারত সরকার দুর্ভিক্ষের কোন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেন নাই। কলিকাতার যে সকল সংবাদপত্র সরকারী আদেশ উপেক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষের সংবাদ ও চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, ডাক্তার সাহা তাহাদের প্রশংসা করেন। ঢাকা হইতে কলিকাতায় প্রেরিত পোষ্ট কার্ডের চিঠিও সে সময় সেন্সার করা হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় যখন অনাহারে লোক মরিয়াছে, তখন প্রভূত খাদ্যশস্য কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনে গভর্ণমেণ্ট-গুদামে পড়িয়া পচিয়াছে। কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে পুনরায় বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

ডাক্তার সাহার মত লোকের মুখে বিলাতের লোক এই সকল কথা শুনিয়া কি সত্যই এ জন্য উদ্বিগ্ন হইবে?

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা—

আগামী ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর সহরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার যে ২৬শ বার্ষিক সম্মিলন হইবে তাহাতে বাঙ্গালার গৌরব ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর বীর সাভারকরের অনুপস্থিতিতে অমৃতসরে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ও গত ২ বৎসর নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্য্যকারী সভাপতির কাজ করিতেছেন। স্বর্গত সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের পর গত কয় বৎসর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভারও নেতৃত্ব করিতেছেন। তিনি ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের সেবা করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করুন, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত বৎসর দিল্লী অধিবেশনের প্রস্তাব মত এবার কানপুরে আগামী ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হইবে। সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ গাঙ্গুলী—প্রধান কর্মসচিব অভ্যর্থনা সমিতি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—কানপুর

মহাশয়কে সাধারণ সম্পাদক করিয়া কানপুরে অভ্যর্থনা সমিতি সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখার, অধ্যাপক

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন—সভাপতি অভ্যর্থনা সমিতি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—কানপুর

হুমায়ুন কবির কিনা দর্শন শাখার, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান শাখার ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মূল-সভাপতি ও অন্যান্য দুইটি শাখার সভাপতির নাম এখনও স্থির হয় নাই। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সাময়িক পত্র প্রদর্শনীর ও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কর্মীবৃন্দের চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্য মণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল—

প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের বয়স ৭০ বৎসর হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বিলাতে উৎসব হইয়াছে। ৭০ বৎসর বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় যে ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা সত্যই অসাধারণ। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি কোন মিথ্যা আশার কথা না বলিয়া সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য জাতিকে অধিকতর উৎসাহের সহিত কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। জার্ম্মানীর পর জাপানের সহিত যুদ্ধের কথাও তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি যুবক চার্চ্চিলের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

গ্রামে ফিরিয়া যাও—

কলিকাতায় মেয়র সম্মিলনে যোগদান করিতে আসিয়া বোম্বায়ের মেয়র শ্রীযুক্ত নগিনদাস মাষ্টার বাঙ্গালার ছাত্রদের এক সভায় তাহাদিগকে সেই পুরাতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন—'গ্রামে ফিরিয়া যাও।' তিনি বাঙ্গালা দেশের আজিকার দুর্দশার কথা বিবৃত করিয়া ছাত্রদিগকে বলেন, তোমরা যদি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া গ্রামের দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা না কর, তাহা হইলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া সকল দেশনেতাই এই উপদেশ দিতেছেন। আমরা কিন্তু এমনই বধির হইয়াছি, যে কেহ সে কথায় কর্ণপাত করি না

রাঁচীতে সাহিত্য সম্মিলন—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রাঁচী শাখা ও রাঁচী হিনু পল্লীর ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে নভেম্বর হিনুতে বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তিন দিনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুধাকান্তি রায় ও সভাপতির অভিভাষণ ছাড়া তিনদিনই সভায় বহু কবিতা, প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন স্থানীয় দেশকর্মী শ্রীযুত সুকুমার হালদারকে তাঁহার ৮৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা করা হয় এবং তৃতীয় দিন সভারম্ভের পূর্ব্বে ই-আই-রেলের চিফ্ অডিটার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র রায়, ব্রহ্মানন্দ সেন, নলিনীকান্ত চৌধুরী, কালীশরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার—

গত ২৮শে আশ্বিন যশোহর জেলার বনগ্রামে স্থানীয় হাই স্কুলের নবনির্ম্মিত হলঘরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাধুজন পাঠাগারের দশম বার্ষিক উৎসব হইয়া

গিয়াছে। খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলে প্রাচার-পত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং কবি শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও ব্যারিষ্টার কবি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভারম্ভে সভাপতিকে এক মানপত্র দান করিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। আসিবার সময় কিছু কিছু চাউল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। পরিষদের অধিবেশন কালে তাঁহাদের কলিকাতায় থাকিতে হইবে, অথচ তাঁহাদের পক্ষেও সঙ্গে সঙ্গে রেশন কার্ড সংগ্রহ করা কঠিন। কাজেই তাঁহারা চাল আনিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। সরকারী অব্যবস্থা ও বিলম্বের ফলে লোক চাল সঙ্গে আনিতে বাধ্য হয়—অথচ সে

বনগ্রামে পাঠাগার উৎসব

পাঠাগারটি অল্পদিনের মধ্যে সাফল্য অর্জ্জন করায় বহু বক্তা পাঠাগার কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। পাঠাগারের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধুর এ বিষয়ে উদ্যম ও চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ বসু—

হাইকোর্টের প্রবীণতম এ্যাটর্নীদের অন্যতম দেবেন্দ্রনাথ বসু এম-এ মহাশয় গত ১৯শে আশ্বিন তাঁহার ৫৭, যতীন দাস রোডস্থিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ৺মহেশচন্দ্র বসু বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এবং ভ্রাতাদের মধ্যে ডাক্তার ৺নরেন্দ্রনাথ বসু, রায় সাহেব ৺যতীন্দ্রনাথ বসু চীফ্ ইন্টারপ্রীটার, ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এ্যাড্ভোকেট প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

চাউল আনার অপরাধ—

বাহির হইতে কলিকাতায় চাউল আনার অপরাধে কলিকাতার পুলিস একদিন ২৮ জন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। ২৮ জনের নিকট মোট ৫ মণ চাউল ছিল—অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের নিকট ৭ সের চাউল পাওয়া গিয়াছে। রেশন কার্ড পাইতে বিলম্ব হইবে জানিয়া তাহারা প্রত্যেকে ৭ দিনের উপযুক্ত খাদ্য সঙ্গে আনিয়াছিল। এ কথা নিশ্চিত যে কেহই বিক্রয়ের জন্য ৭ সের চাউল সঙ্গে করিয়া আনে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্যও নিজ নিজ জেলা হইতে

জন্য যদি লোককে অযথা হায়রাণ হইতে হয়, তবে তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। কিন্তু কাহার কথা কে শোনে?

অখাদ্যের গতি—

যে সকল খাদ্যদ্রব্য সরকারী গুদামে পচিয়া অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহাদের কি গতি হইতেছে, তাহা সম্প্রতি একটি মামলার বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ—জনৈক ব্যবসায়ী ৪ টাকা মণ দরে শ্রীরামপুর হইতে ৪৫০ বস্তা অখাদ্য আটা ক্রয় করে। তাঁহাকে এই সর্ত্তে ঐ মাল লইয়া যাইতে দেওয়া হয় যে—যে সকল অঞ্চলে রেশনিং প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেই সকল স্থানে ঐ আটা লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ী ঐ আটা ১০ টাকা মণ দরে কলিকাতাতেই বিক্রয় করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার ১৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ঐ অখাদ্য আটা যে আবার আমাদিগকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাই আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা?

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী—

গত ২১শে নভেম্বর হইতে ১৪ দিন ধরিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে ভারতের নানাস্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে আনিয়া তথায় বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতের ১০জন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে ঐ উপলক্ষে সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হইয়াছে—তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ঐতিহাসিক সার যদুনাথ সরকার

মহাশয় একজন। ভারতের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, সামরিক শিক্ষা বিভাগের অন্যতম কর্তা মিঃ বি, কে, তালুকদার, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মিঃ এ, নন্দী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বাঙ্গালী এই উৎসবে যোগদান করিবার সম্মানলাভ করিয়াছেন। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এইরূপ সাংস্কৃতিক মিলন নানা দিক দিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করে।

ধ্রুবানন্দ গিরির তিরোধান উৎসব—

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি গত ২০শে কার্ত্তিক সোমবার হুগলী জেলার অন্তর্গত ডুমুরদহ গ্রামস্থ উত্তমাশ্রমে তাঁহার নশ্বর দেহ রক্ষা করেন। তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী উত্তমানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং গুরুর তিরোধানের পর প্রায় ২৮ বৎসর কাল আশ্রমের আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামিজীর

স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি

তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে গত ১২ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার আশ্রমে পূজা, হোম, বেদপাঠ, গীতাপাঠ, নামকীর্ত্তনাদি যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। উৎসবান্তে সন্ধ্যার পর আশ্রমস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়।

বড়লাটের সদিচ্ছা—

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইএর সহিত বড়লাটের সাক্ষাতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বড়লাট নাকি মিঃ দেশাইকে বলিয়াছেন যে যদি কংগ্রেস বর্ত্তমানে গভর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগ বর্জ্জন করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের সকল নেতাকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং শাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে বড়লাট কংগ্রেস নেতাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন। সংবাদ সত্য হইলে এবং বড়লাটের এই প্রস্তাব কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে ভারতবাসী সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইবেন এবং যে অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য এদেশে ও বিলাতে ভারতের হিতকামী সকল নেতা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তাহা দূর হইবে।

কলিকাতায় মেয়র সম্মিলন—

এবার গত ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর কলিকাতা সহরে ভারত ও সিংহলের সকল প্রধান সহরের মেয়রদের বার্ষিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। উহা যদি শুধু সম্বর্দ্ধনা সভায় পরিণত না থাকিয়া সত্যই দেশবাসীদের নাগরিক অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তবে এই সম্মিলনের দ্বারা দেশ উপকৃত হইতে পারে। পরাধীন দেশে সহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার পথেও নানা বাধা বর্ত্তমান। সেই সকল বাধা দূর করিতে হইলে সমগ্র ভারতের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সেই সমবেত চেষ্টার সুবিধার জন্যই এই মেয়র সম্মিলন প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন সহরের মেয়রদের কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসী তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছে।

বস্ত্র সমস্যা—

কলিকাতার বাজারে পাতলা ধুতি বা সাড়ী পাইবার উপায় নাই। কোন দোকানেই সেরূপ বস্ত্র পাওয়া যায় না—অথচ নির্দ্দিষ্ট দাম অপেক্ষা বেশী দাম দিলে চোরা বাজারে হয় ত সেরূপ কাপড় সংগ্রহ করা যায়। ভারতের কাপড়ের কলসমূহে যে মিহি কাপড় বুনা হইতেছে না এমন নহে, অথচ সে সকল কাপড় কোথায় যাইতেছে, তাহা কেহই জানে না। প্রকাশ, সরকারী বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ শুধু মিহি কাপড় বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় ১৫০টি দোকান স্থির করিয়া দিবেন। বস্ত্র বিক্রয় লইয়া কলিকাতার বাজারে যে গণ্ডগোল চলিতেছে, তাহা দূর না হইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের পক্ষে কষ্টের সীমা থাকিবে না।

রেলযাত্রীর দুর্দ্দশা—

রেলযাত্রীর দুর্দশার অন্ত নাই। গভর্ণমেন্টই সেদিন স্বীকার করিয়াছেন যে গত কয় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা 'ভ্রমণ কমাও' বলিয়া যে আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। লোক বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এত কষ্ট ভোগ করিয়া রেলে যাতায়াত করে না। ট্রেণের সংখ্যা ও ট্রেণের কামরার সংখ্যা এত কম করা হইয়াছে যে যাত্রীর সংখ্যা কম হওয়া সত্বেও যাত্রী ধরিতেছে না। এ অবস্থায় লোক ঝুলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বি-এন-আরে নিম্ন শ্রেণীর যাত্রীরা গাড়ীর নীচে চাকার ডাণ্ডায় বসিয়া যাতায়াত করে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সম্প্রতি ভারত রক্ষা আইনে অর্ডিনান্স জারী করিয়া গাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া যাতায়াত নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু যাত্রীরা কি করিয়া যাতায়াত করিবে তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এ অবস্থায় লোক কি করিবে? ষ্টেশনে ২।৩ দিন বসিয়া না থাকিলে ট্রেণে স্থান সংগ্রহ করা যায় না—তাহাই কি সহজ উপায়?

গুলীতে মৃত্যু—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আলোচনায় জানা যায় যে, সম্প্রতি কোন বিশেষ ব্যক্তির গুলীতে জনৈক হেড্ মাষ্টারের বালিকা কন্যা

ও তাঁহার ভৃত্য আহত হইয়াছে। লোকটি নাকি শিয়াল মারিতে গিয়াছিল। রেলের গাড়ীতে উঠিতে গিয়া একটি লোক গুলীতে নিহত হইয়াছিল, সে সংবাদ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। একজন রিক্সাওয়ালাও বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন যে সৈন্যগণ যাহাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ভিন্ন অপর কোন কারণে বন্দুক ব্যবহার না করে, সেজন্য তাহাদের সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরও এই সকল ঘটনা হয় কেন?

আড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক ও বারাকপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এস-মল্লিক আই-সি-এস গত ২৮শে নভেম্বর আড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে যাইয়া ভাণ্ডারের শীতবস্ত্র বিতরণ পরিদর্শন করেন। ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী গত ৩রা ডিসেম্বর ভাণ্ডার দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাণ্ডারের কর্ম্মীদের উদ্যোগে যে হাসপাতাল নির্ম্মিত হইবে, তাহার কার্য্য যাহাতে সত্বর সম্পন্ন হয়, সে জন্য সকলেই সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

আড়িয়াদহ অনাথ-ভাণ্ডারে প্রচার-সচিব শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক

নোবেল পুরস্কার ও ডাক্তার সাহা—

খ্যাতনামা বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এখন বিলাতে। প্রকাশ, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনষ্টাইন প্রস্তাব করিবেন যে এবার পদার্থ বিজ্ঞানে ডাক্তার সাহাকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হউক। ডাক্তার সাহার সহিত শীঘ্রই আমেরিকায় অধ্যাপক আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎ হইবে। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সাহার এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দ লাভ করিবেন।

সহকারী ভারত সচিবের উক্তি—

লর্ড লিষ্টওয়েল বিলাতে নূতন সহকারী ভারত সচিব নিযুক্ত হইয়াই লণ্ডনে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিদের এক সভায় গত ২২শে নভেম্বর বলিয়াছেন যে—ভারতীয়গণকে তাহাদের শাসন ব্যবস্থা স্থির করিবার ভার এখনই প্রদান করা উচিত—তাহাদের সে অধিকার অবশ্যই আছে। তাহার পর তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিবে কি না, তাহা তাহারাই স্থির করিয়া লইবে। নূতন সচিবের এই উক্তিতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সকলেই প্রথমে এইরূপ বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন—কিন্তু যখন কার্য্যকাল উপস্থিত হয়, তখন সাম্রাজ্যবাদীর স্বরূপ সকলের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বিলাতে প্রচার কার্য্য—

ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ বিলাতে যাইয়া যে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন, তাহার সংবাদে ভারতীয় মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিকগণ শুধু বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা প্রচার করিতেছেন না, সকল বৈজ্ঞানিকই ভারতের প্রধান সমস্যার কথা কখনও বিস্মৃত হন না। তাঁহারা প্রায় সকল সভাতেই বলিয়া থাকেন—"যত ভাল ভাল যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাই করা হউক না কেন, কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" বিলাতের জনসাধারণ বৈজ্ঞানিকদের মুখে যে কথা শুনিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন হইবে কি না কে জানে?

বাসস্থান সমস্যা—

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কেসি গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতার কয়েকটি দরিদ্র পল্লীতে দরিদ্রগণের বাসস্থান পরিদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন—"যাহা দেখিয়াছি,তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। মানুষ এভাবে মানুষকে থাকিতে দিতে পারে না। এ অবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতি বা স্বার্থ ইহার অন্তরায় হইবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।" মিঃ কেসি যে উদ্দেশ্যেই এই সকল কথা বলিয়া থাকুন না, তিনি যে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি, তাহা তাঁহার উক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। এ অবস্থার প্রতীকারের জন্য যদি ধনী সম্প্রদায় ও দেশের নেতৃবৃন্দ অবহিত না হন, তাহা হইলে সত্যই দেশ ধ্বংস পাইবে। গভর্ণর ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিলেও কাজ অনেক সহজ হইবে।

অপচয়—

নেপালে ৩০ হাজার মণ চাউল নষ্ট হইয়াছে, মুন্সীগঞ্জে (ঢাকা) ৮ হাজার মণ আটা পচিয়া গিয়াছে, মাদ্রাজের তিরুর রেল ষ্টেশনে ২০ হাজার বস্তা চাউল নষ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছে,

—এইরূপ সংবাদ প্রতিদিন এখন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইতেছে। যে সময়ে লোক এক মুষ্টি অন্নের জন্য পথে পড়িয়া হাহাকার করিয়া মরিয়া গিয়াছে, সেই সময়ে যাহাদের দোষে এই সকল অনাচার ঘটিয়াছে, তাহাদের কি ভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত জানি না। আমাদের মনে হয়, এমন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যাহা ভবিষ্যতের দুষ্কৃতকারীদের সাবধান করিয়া দিতে পারে।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ৮৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৮ই নভেম্বর ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীটে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১০৫ বৎসর বয়স্ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ঐ সভায় পৌরহিত্য করেন। সভায় বহু বক্তা মৃণালবাবুর জীবনে দয়া ও প্রেমের সমন্বয়ের কথা বলেন ও তাহার উত্তরে মৃণালবাবু এক অভিভাষণ পাঠ করেন। সভায় তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন প্রার্থনা করা হয়।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

৯০ সহস্রাধিক রাজবন্দী—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে গত কংগ্রেস আন্দোলনে ধৃত ৯০ হাজার ৩শত ৫৬জন কর্ম্মী গত ১লা অক্টোবর কারারুদ্ধ ছিলেন, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ৬ মাসে মাত্র ৫০জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কয়জন সদস্যও আছেন। তাঁহাদের মুক্তি দানের পর দেশের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাজেই বাকী সকলকে এখন যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ভারত সরকার কোনরূপ বিপদাপন্ন হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

শোক সংবাদ—

ভারতের মধ্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয় কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী কীর্ত্তি চট্টোপাধ্যায় টাইফয়েড রোগে মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বর্গগত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি মধ্যপ্রদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র গার্লস হাই স্কুলে তিনি ছিলেন প্রথম শিক্ষয়িত্রী। তাঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে বাংলা ভাষা আজ মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে সমাদর ও সম্মান লাভ করিয়াছে।

পরলোকে ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই—

নানকিং শাসিত চীনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই গত ১০ই নভেম্বর একটা জাপানী হাসপাতালে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। চীনের স্বনামখ্যাত নেতা ডাঃ সান ইয়াট সেনের সহকারীরূপে তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেক্রেটারী রূপেও কার্য্য করেন। ১৯২৯ সালে ডাঃ সান ইয়াট সেনের মৃত্যুর পর ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই কুওমিংটাংএর কেন্দ্রীয় কার্য্যপরিচালন সভার সভাপতি হন। ১৯৩৩-১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তিনি তাহা এড়াইয়া চলিবার নীতি অনুসরণ করেন। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েই ইন্দোচীনের হাইফং-এ পলায়ন করিয়া জাপানীদের সহিত শান্তিপ্রস্তাব চালাইবার জন্য অনুরোধজ্ঞাপক এক প্রচার পত্র বিলি করেন। চুংকিং গভর্ণমেণ্ট এই কারণে তাঁহার দলবলসহ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করেন। গত ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে তিনি নানকিং গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারপদপ্রাপ্ত হন। ডাঃ ওয়াং চিং ওয়েইর মৃত্যুতে একজন খ্যাতিমান রাজনীতিজ্ঞের তিরোধান ঘটিল।

'এসো লক্ষ্মী—যাও বালাই'—

গত ১২ই নভেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের কলমে সরকারী চাকুরীর একটী বিজ্ঞাপন নজরে পড়িল। উক্ত বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের জন্য তিনজন সাব্-এডিটর লওয়া হইবে। তন্মধ্যে একজন মুসলমান, একজন অমুসলমান ও একজন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের। মাহিনা যথাক্রমে ২০০৲ ও ১১৫৲ টাকা। আবেদনের সহিত আবেদনকারীকে ৫৲ টাকা প্রাবেশিক ফিঃ দিতে হইবে। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের দার্জ্জিলিংস্থিত অফিসে পাঠাইতে হইবে। আর চাকুরীর মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত। যে বিজ্ঞাপনের শেষ তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর তাহার Interview কোন্ না জানুয়ারীতে হইবে? তারপর কথায় বলে 'ফুল্লো আর মলো'—অর্থাৎ চেয়ারে বসিতে না বসিতে ছুটী অর্থাৎ বিদায়গ্রহণ। কারণ চাকুরীর মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী। যে দেশের লোক অদৃষ্ট গোনাইতে ফুটপাতে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়, সে দেশের লোকের পক্ষে ৫৲ দিয়া দরখাস্ত করা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি এরূপ 'এসো লক্ষ্মী—যাও বালাই'-এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটঃ

হিন্দু : ২০৩ ও ৩১৫

মুসলীম : ২২১ ও ২৯৮ (৯ উইকেট)

মুসলীম দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে মাত্র ১ উইকেটে বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট বিজয়ী হয়েছে। ২৫শে নভেম্বর বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়।

হিন্দুদল টসে জয়লাভ ক'রে খেলার সূচনা করলে সোহনী ও মানকদকে দিয়ে। খেলার সূচনা মোটেই ভাল হ'ল না। মাত্র ২ রানে ২টো উইকেট পড়ে গেল। চারের বার মিনিট পর হিন্দু দলের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানে শেষ হ'ল। জি কিষণ চাঁদ ৭২ রান এবং ভিনু মানকদ ৫২ রান করলেন। আমীর ইলাহি এবং সৈয়দ আমেদের বোলিংয়ে হিন্দুদলের এ শোচনীয় অবস্থা হ'ল।

হাতে খেলার ৮০ মিনিট সময় নিয়ে মুসলীম দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে প্রথম দিনের খেলার শেষে তাদের ৭৫ রান উঠল। কে সি ইব্রাহিম ৪১ এবং আনোয়ার ২৭ রান করে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় মুসলীম দলের মোট ৯০ রানে প্রথম উইকেট পড়ল, আনোয়ার নিজস্ব ৩৮ রান করে আউট হ'লেন। এর পর মুস্তাক আলি ৯ রানে আউট হ'লে তাদের ১০৭ রানে ২য় উইকেট গেল। ইব্রাহিম নিজস্ব ৫২ রানে আউট হ'লেন, দলের রান তখন ৩ উইকেটে ১০৭। মুসলীম দলের বেশ ভাঙ্গন ধরলো। লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে রান উঠল ১৮৭। লাঞ্চের পর খুব তাড়াতাড়ি মুসলীম দলের ৩টে ভাল উইকেট পড়ল। মুসলীম দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২২১ রানে। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করলেন কে সি ইব্রাহিম ৫২। নাইডু ৫টা এবং সরভাতে ৩টে উইকেট পেলেন।

দ্বিতীয় দিনের ৩টে ৫ মিনিটে হিন্দুদল ১৮ রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে। দিনের শেষে ৩ উইকেটে হিন্দুদলের ৮৬ রান উঠল। ভি এম মার্চেন্ট এবং কিষণচাঁদ যথাক্রমে ২৩ এবং ১২ রান করে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনে হিন্দুদলের নট আউট ব্যাটসম্যানরা খেলা আরম্ভ করলেন। লাঞ্চের সময় ৪ উইকেটে হিন্দুদলের ১৭০ রান উঠল, কিষেণচাঁদ নট আউট ৪২ রান। লাঞ্চের পর রান খুব ধীরে উঠতে লাগল। ১৬৯ রানে দলের পঞ্চম উইকেট পড়ল; চা পানের সময় ৮ উইকেটে হিন্দুদলের ২৪৯ রান উঠল। কিষণ চাঁদ ৮৯ এবং সারভাতে ১৮ রান করে নট আউট আছেন। আমির ইলাহির সর্ট পিচ বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে কিষণ চাঁদ শতরান পূর্ণ করলেন। এ রান তুলতে সময় লাগল ৩৩৫ মিনিট। এদিকে দলের ৯টা উইকেট পড়ে গেছে। খেলার ৪৭৫ মিনিটে হিন্দুদলের ৩০০ রান উঠল। হিন্দুদলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ৩১৫ রানে, ৪৮২ মিনিট খেলার পর। কিষণ চাঁদ ১১৮ রান করে নট আউট রইলেন। আমীর ইলাহি ১৪৭ রান দিয়ে ৪টে এবং সৈয়দ আমেদ ৩৭ রানে ২টা উইকেট পেলেন।

মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হ'ল এবং আধ ঘণ্টায় ১ উইকেটে ১৩ রান উঠলে পর তৃতীয় দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময় শেষ হ'ল। চতুর্থ দিনে মুসলীম দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা পুনরায় আরম্ভ হল। ২৫৭ মিনিট খেলার পর ৭ উইকেট হারিয়ে মুসলীম দলের ২০০শত রান উঠল। ওপনিং ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম ৮৮ রান ক'রে তখনও নট আউট আছেন। চা পানের সময় ৭ উইকেটে ২০৩ রান দাঁড়াল। ইব্রাহিম নট আউট ৯০ রান।

ইতিপূর্ব্বে ইব্রাহিম ৭৯ রানে একবার অধিকারীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রক্ষা পেলেন। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে চা পানের জন্য খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ রইল। হাতে আর ১০৫ মিনিট সময়, জয়লাভের জন্য ৯৫ রান তুলতে হবে কিন্তু হাতে মাত্র ৩টে উইকেট। দলের মোট ২৯৪ রানের মাথায় ৯টা উইকেট পড়ে গেল। মুসলীম দল ৯ উইকেটে ২৯৮ রান তুললে ফাইনাল খেলা শেষ হয়ে গেল। ফলে মুসলীম দল মাত্র ১ উইকেটে হিন্দুদলকে ফাইনাল খেলায় পরাজিত করতে সক্ষম হল। মুসলীম দলের এ জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র কে সি ইব্রাহিমের; তাঁর ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্য্যের ফলেই মুসলীম দল পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট বিজয়ী হয়েছে বললে অন্যায় হবে না। কে সি ইব্রাহিম ১৩৭ রান ক'রে খেলার শেষ পর্য্যন্ত নট আউট রইলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী—১৯৩৭—মুসলীম; ১৯৩৮—মুসলীম; ১৯৩৯—হিন্দু; ১৯৪০—মুসলীম; ১৯৪১—হিন্দু; ১৯৪২ সালে খেলা হয়নি; ১৯৪৩ সালে—হিন্দু।

১৯৪৪ সালের পেণ্টাঙ্গুলার খেলা :

ব্যাটিংয়ে	এভারেজ
প্রথম—জে হার্ডষ্টাফ	১২৬

বোলিংয়ে—আব্দুল হাফিজ ২৫ ওভার বল, ৮ মেডেন, রান ৪৬, উইকেট ৩, এভারেজ ১৫'৩।

সেঞ্চুরীরান

ভি এম মার্চেন্ট—২২১ রান (নট আউট) পার্শিদলের বিপক্ষে
আর এস মোদী—২১৫ রান (ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে
কে সি ইব্রাহিম—১৩৭ (নট আউট) হিন্দুদলের "
ভিনু মানকদ—১২৮ পার্শিদলের "
জি কিষণ চাঁদ—১১৮ (নট আউট) মুসলীম দলের "
এম গাজালি—১০৮ রান অবশিষ্ট দলের "
গুল মহম্মদ—১০৬ " "
এম শতসিভাস—১০১ রান মুসলীম দলের "

সেঞ্চুরী পার্টনারসিপ

ভি মানকদ ও মার্চ্চেন্ট (৩য় উইকেটের জুটী)—২৩০ রান, পার্শি দলের বিপক্ষে, ২৫৫ মিঃ। গুল মহম্মদ ও এম গাজালি (৫ম উইকেটের জুটী)—১৬৮ রান, অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে, ২৪৫ মি। আর এস মোদী ও ডি শখঃ (৬ষ্ঠ উইকেট জুটী)—১৬৭ রান, ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে, ১৬০ মিনিট। আর এস মোদী ও আর কুপার (চতুর্থ উইকেটের জুটী) ১৫১ রান, ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে। হার্ডষ্টাক ও কম্পটন (তৃতীয় উইকেটের জুটী) ১৪২ রান, পার্শি দলের বিপক্ষে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রান

৪৭৯ পার্শি : ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে। ৫৭৪ (৫ উইকেট) হিন্দু : পার্শি দলের বিপক্ষে।

সর্ব্বাপেক্ষা কম রান :

২০৩ হিন্দুদল : মুসলীম দলের বিপক্ষে।

প্রদর্শনী ক্রিকেট ঃ

সার্ভিসেস একাদশ : ৩৪২ ও ২৩৮
ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাব : ৬১৫ (৪ উঃ ডি)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাব (ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া) এক ইনিংস ও ৩৫ রানে সার্ভিসেস একাদশ দলকে পরাজিত করেছে।

১লা ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ এমেনিটিশ ফণ্ড উপলক্ষে এই প্রদর্শনী খেলাটি আরম্ভ হয়। সার্ভিসেস একাদশ প্রথম ব্যাটিং পেয়ে সারাদিনে ৩৪২ রান তুলে। নির্দ্ধারিত সময়ের দু'মিনিট পূর্ব্বে সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটে ২৬০ রান করে। ভিনু মানকদ ৬৫ রান করেন। হাজারী ৪৫ রান মার্চ্চেন্ট ৩৩ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় মার্চ্চেন্ট ২০৫ মিনিট খেলে সেঞ্চুরী করলেন, যখন দলের মোট রান উঠেছে ৩৫৮। হাজারীর তখন ৭২ রান। লাঞ্চের সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেট দলের ৩৯৩ রান উঠেছে। মার্চ্চেন্ট ১২৭ এবং হাজারী ৮০ রান করে নট আউট আছেন। লাঞ্চের ২৫ মিনিট পর হাজারী তাঁর শত রাণ পূর্ণ করলেন। ২৬০ মিনিট উইকেটে থেকে তিনি ৭টা বাউণ্ডারী করলেন। দলের তখন ৪২৯ রান। হাজারী ৮৭ রানে একবার স্লিপে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে ছিলেন। দলের ৪৫২ রানে মার্চ্চেন্ট ১৫০ রান করলেন। মার্চ্চেন্ট এবং হাজারী জুটী হয়ে দ্রুত রান তুলতে লাগলেন। ২৮৬ মিনিট খেলে উভয়ে ৩০০ রান করলেন, হাজারী ১৩৯ এবং মার্চ্চেন্ট ১৬১। দলের ৫৬৯ রানে মার্চ্চেন্ট নিজস্ব ২০০ রান পূর্ণ করলেন ৩৩০ মিনিট খেলে। তাঁর রানে ১৮টা বাউণ্ডারী ছিল। চা পানের সময় মোট রান দেখা গেল ৫৭০, মার্চ্চেন্ট নট আউট ২০১ এবং হাজারী নট আউট ১৮০। চা পানের সময় মার্চ্চেন্ট অবসর গ্রহণ করলেন। মার্চ্চেন্ট এবং হাজারীর চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ৩৮২ রান উঠল। ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন খেলায় কোন উইকেটের জুটিতে এত অধিক সংখ্যক রান উঠেনি। এই রান গত বৎসরে অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে অধিকারী এবং মার্চ্চেন্টের প্রতিষ্ঠিত ৩৪৫ রানের রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো। মার্চ্চেন্টের অবসর গ্রহণের পর গুলমহম্মদ হাজারীর জুটী হলেন। চা পানের পর ৩৯৭ মিনিট খেলে হাজারী তাঁর নিজস্ব ২০০ শত রাণ পূর্ণ করলেন যখন দলের উঠেছে ৬১৪ রান। দলের ৪ উইকেটে ৬১৫ রান উঠলে বিজয় মার্চ্চেন্ট ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। সেদিনের খেলা শেষ হ'তে আর ৪৫ মিনিট বাকি, সার্ভিসেস একাদশ তাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ৫০ রান তুললে।

চতুর্থ দিনে সার্ভিসের দলের দ্বিতীয় ইনিংস পুনরায় আরম্ভ হ'ল এবং লাঞ্চের আধ ঘণ্টা পর সার্ভিসেস দলের ২৩৮ রানে ইনিংস শেষ হ'লে ভারতীয় দল এক ইনিংস ৩৫ রানে বিজয়ী হ'ল। সার্ভিসেস দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ডি কম্পটন ১২০ রান করলেন। সিমশনের ৫০ রানও উল্লেখযোগ্য। আমির ইলাহি ১০৯ রানে ৫টা এবং সি এস নাইডু ৪৩ রানে ৩টে উইকেট পেলেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

'বনফুল' প্রণীত উপন্যাস "জঙ্গম" (প্রথম অধ্যায়) ২য় সং—৪৲
সব্যসাচী-প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কবরের নীচে"—১৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত শিশুপাঠ্য উপন্যাস "বীরের দল"—১।০
শ্রীঅশোক সেন প্রণীত উপন্যাস "তৃষা হ"—২।০
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত—পঞ্চভাগ—চতুর্থ খণ্ড"—১।০
মহীউদ্দীন প্রণীত বিবরণ "দুর্ভিক্ষ"—১।০
শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী রচিত কাব্যে মহাপ্রভু-কথা "লীলাসঙ্গী"—১৲
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সীতা"—১।০
শ্রীবীণা দেবী প্রণীত গল্পপুস্তক "পুরুষের মন"—২৲
যাদুকর পি-সি-সরকার প্রণীত "সহজ ম্যাজিক"—১।০
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছোটদের "পথের পাঁচালী"—২।০
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "আবৃত্তি মঞ্জুষা"—২।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
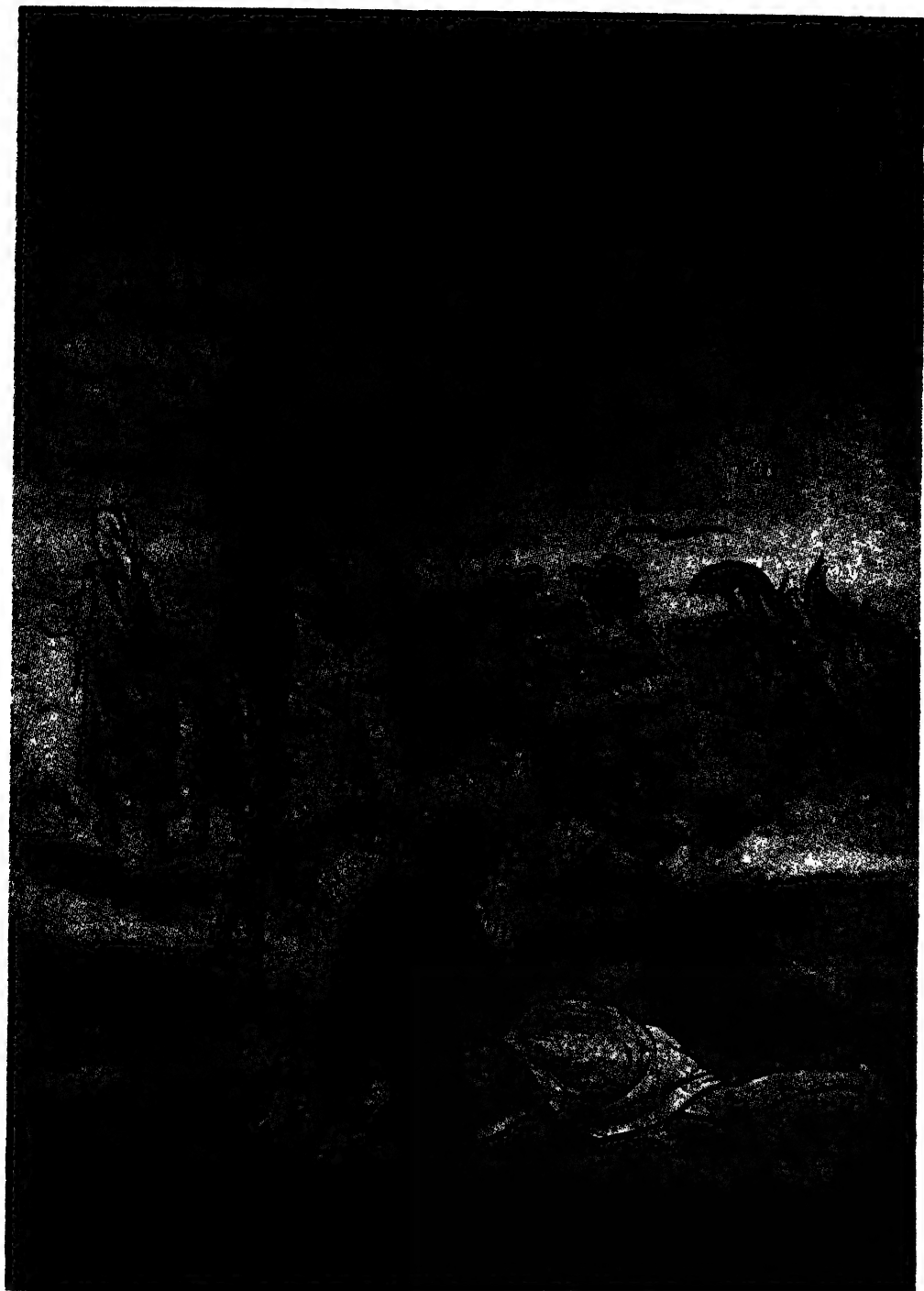
শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা মন্বন্তর ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম

রামচন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি ভবন

আশ্রম-পালিত বালকবৃন্দ। [প্রথম সারিতে দক্ষিণ হইতে বামে (+
ত) দ্বিতীয় বালকটীকে আশ্রমাধ্যক্ষ কলিকাতার রাজ-পথে কুড়াইয়া
য়াছেন।]
রামচন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি ভবনের একাংশ

(৩) আশ্রমাধ ক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ
(৪) রামচন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি ভবনের বালকবৃন্দ লাঠিখেলা অভ্যাস করিতেছে
(৫) রামচন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি ভবনের প্রবেশ পথ
(৬) রামচন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি ভবন— নবনির্ম্মিত ডিসপেন্সারী

(শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় গৃহীত আলোকচিত্র হইতে)

মাঘ—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

গীতায় কর্ম্মযোগ

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌

কর্ত্তব্য পরাঙ্‌মুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে শ্রীভগবান গীতাতে জগতের জীবকে কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং মনে হয় কর্ম্মযোগই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য; জ্ঞান ও ভক্তিযোগ উহার প্রাসঙ্গিক ও আনুসঙ্গিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখন কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলেন, "যদি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল তবে জ্ঞান ও ভক্তির অবতারণা করিলেন কেন, আর কেনই বা অর্জ্জুনকে 'তুমি যোগী হও' এ কথা বলিলেন? যুদ্ধ করিতে আত্মজ্ঞানের ও ভক্তির কি প্রয়োজন, আর যোগী হইবারই বা আবশ্যকতা কি? যুদ্ধ করিবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে—সে স্থানে উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? অতএব মনে হয় ভগবানের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—অর্জ্জুনকে বৈরাগ্য পথে লইয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।" যদি তাহাই হয় তবে এরূপ সুন্দর সুযোগ ছাড়িলেন কেন? যখন অর্জ্জুন বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন ও জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বধ করিয়া রুধিরে রঞ্জিত রাজ্য-ভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াই শ্রেয়।" যদি ভগবানের ঐরূপ উদ্দেশ্যই থাকিত তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অর্জ্জুনের ঐ কথা শুনে অর্জ্জুনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিতেন ভাল, ভাল, তোমার এরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হ'য়েছে দেখে বড় সুখী হ'লাম—এস অর্জ্জুন তোমাকে গেরুয়া পরাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়া দিই, তুমি এখনই (ধনুর্ব্বাণ ত ফেলিয়া দিয়াছ) হিমালয় যাত্রা কর। গেরুয়ার ত সেখানে অভাব ছিল না। কিন্তু কৈ তা ত করিলেন না। বরং তাঁহার এইরূপ মতি গতি দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার অবতারণা করিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন, অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা পূর্ব্বক, "অতএব তুমি যুদ্ধ কর" ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিলেন—কিন্তু একবারও বলিলেন না "অর্জ্জুন তুমি সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়ে গিয়া তপস্যা কর।" অর্জ্জুনও অবশেষে যুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। শুধু সম্মত হইলেন না, যুদ্ধও করিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন ও জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়স্বজন বধ করিয়া হৃত রাজ্য উদ্ধার করিলেন। ভগবান অর্জ্জুনকে যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং কর্ম্মকে যোগে পরিণত করিয়া কার্য্য করিতে হইলে যে কর্ম্মযোগী হওয়া আবশ্যক এবং জ্ঞান ভক্তিরও নিতান্ত প্রয়োজন তাহা পরে দেখাইব—আর অর্জ্জুনের মত দর্শনশাস্ত্রে

(বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শনে) সুপণ্ডিত ক্ষত্রিয় রাজপুত্রকে বুঝাইতে হইলে ভক্তাবতার ঈশা যেমন তাঁহার অশিক্ষিত ধীবর শিষ্যদিগকে প্রাকৃত কথায় ও উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন সেরূপ বুঝাইলে চলিত না—তাই সমস্ত দর্শন ও উপনিষদের সমন্বয় করিয়া অর্জ্জুনের সকল সন্দেহ শ্রীভগবান ভঞ্জন করিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে ? গীতাতে কর্ম্মযোগ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, আমরা সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের সহজবোধ্য করিবার জন্ত উহার স্থুল স্থুল বিষয়গুলির অবতারণা পূর্ব্বক অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কর্ম্মযোগ বুঝিতে হইলে আগে কর্ম্ম কি বুঝিতে হইবে—মীমাংসকদিগের মতে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি দৈব কর্ম্মই কর্ম্ম, অন্ত কর্ম্মকে তাঁহারা কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন যথাঃ "ভূতভাবোদ্ভব করো বিসর্গঃ কর্ম্মসজ্ঞিতঃ।" গীতা (৮-৩) সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্ঞীয় আহুতি দানাদি কিম্বা ধনদানাদি ক্রিয়াই কর্ম্ম শব্দের অর্থ। এই স্থলে ভগবান মীমাংসকদিগের বর্ণিত কর্ম্মগুলিই কর্ম্মসংজ্ঞায় গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত ও যাহা কিছু করা যায় সমস্তকেই কর্ম্মরূপে পরিগণিত করিয়াছেন। গীতাতে কর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা, ১ কর্ম্ম ও ২ বিকর্ম্ম+কর্ম্ম=বিহিত কর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম+বিকর্ম্ম=অবিহিত, নিষিদ্ধ কর্ম্ম+গীতাতে অকর্ম্ম শব্দেরও উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অর্থ কর্ম্ম অকরণ, বা না করা। শরীর ও মানস কর্ম্মও গীতার কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত যথা, খাওয়া, শোয়া, বসা, বেড়ান, চিন্তাকরা ইত্যাদি। এখন কর্ম্মকে কিরূপে কর্ম্মযোগে পরিণত করা যায় তাহাই দ্রষ্টব্য। এক শ্রেণীর সাধক (জ্ঞানমার্গী) আছেন যাঁহারা কর্ম্মকে অত্যন্ত ভয় করেন। তাঁহাদের মতে "কর্ম্মকাণ্ড বিষের ভাণ্ড" অর্থাৎ সুকর্ম্মই হউক বা কুকর্ম্মই হউক কর্ম্মই বন্ধনের মূল; কর্ম্ম করিলেই জীবকে শুভাশুভ ফল ভোগ জন্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে আসা যাওয়া করিতে হয় এবং যতদিন কর্ম্ম থাকে ততদিন উহার নিবৃত্তি নাই, এ অবস্থায় কোন কর্ম্ম করা অপেক্ষা কর্ম্ম একেবারে না করাই ভাল। কর্ম্ম যে বন্ধনের কারণ এ কথা শ্রীভগবানও অস্বীকার করেন না, তবে তাঁহার মতে সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, সংসারে আসিয়া কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না, সে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করিলেও তাহাকে প্রকৃতির গুণে কর্ম্ম করিতেই হইবে।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃপ্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।" গীতা (৩-৫)
ক্ষণেক না করি কর্ম্ম কেহ নাহি থাকে।
স্ববলে করায় কর্ম্ম প্রকৃতি সবাকে।

শুধু তাহাই নহে, কর্ম্ম না করিলে শরীর যাত্রাও চলিতে পারে না।

"শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।" গীতা (৩-৮)

অতএব কর্ম্ম না করিলে যখন উপায় নাই তখন কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে এমন ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে যাহাতে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে—কাঁচা পারা ব্যবহার করিলে রক্ত দূষিত হইয়া কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় শরীরে দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন করিয়া বিষবৎ কার্য্য করে, কিন্তু সেই পারা শোধন করিয়া যদি ব্যবহার করা যায় তবে রোগীর রোগ আরোগ্য করতঃ শরীরে লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়া অমৃততুল্য কার্য্য করে। সেইরূপ যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ তাহাকে শোধন করিতে পারিলে উহাই মুক্তির কারণ হইয়া অমরত্ব আনয়ন করে, অর্থাৎ কর্ম্মকে শোধন করিয়া কর্ম্মযোগে লইতে পারিলেই ঐরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এখন কর্ম্মকে কি উপায়ে শোধন করিয়া কর্ম্মযোগে পরিণত করা যাইতে পারে ইহাই আলোচ্য। ভগবান গীতাতেই ইহার তিনটি উপায় বলিয়া দিয়াছেন যথা :—

১। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ, ২। আত্মাভিমান বা অহঙ্কার বর্জ্জন, ৩। সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ। প্রথম উপায় যথা—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। গীতা। ২-৪৭
কর্ম্মে অধিকার তব, কর্ম্মফলে নাই,
ফল আশা কর্ম্মত্যাগ না করিবে তাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীব কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছে কর্ম্ম করিতে সুতরাং তাহার কর্ম্মে সম্পূর্ণ অধিকার আছে—কিন্তু ফল দৈবাধীন, কর্ম্মীর উহাতে কোন অধিকার নাই। সুতরাং ফলের আশা করা তাহার অনধিকার চর্চ্চা। এই শ্লোকে ভগবান পুরুষকার ও দৈব উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ঐ দুই মত সেকালেও প্রচলিত ছিল কিন্তু উহা গীতায় যেভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে ইহার মূল্য শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করা যায়, যদি কর্ম্মের উদ্দেশ্যই না থাকে তবে উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? উদ্দেশ্য ও ফলে ভেদাভেদ জ্ঞান না থাকাই এই ভ্রমের কারণ। কর্ম্ম মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য বা কারণ আছে, কোন কার্য্যই উদ্দেশ্যবিহীন হইতে পারে না। উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম উন্মাদে করে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কখনই করে না; আর ভগবানও গীতায় কোন স্থলে উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই। কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও ফল কখনই এক নহে। সম্পূর্ণ পৃথক। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন কেন ? উদ্দেশ্য—হৃত রাজ্য উদ্ধার ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন। যুদ্ধের ফল কি ? ফল—জয় পরাজয় বা লাভালাভ। অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিবার অধিকার আছে কিন্তু জয় বা লাভ ত দৈবের হাতে, উহাতে অর্জ্জুনের কোন অধিকার নাই; এই অবস্থায় জয় আশা করা কি অর্জ্জুনের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নয়। এ সম্বন্ধে একটি সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ উদাহরণ এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে—চাষা চাষ করে কেন? উদ্দেশ্য বীজ বপন, ফল—শস্য উৎপত্তি। উত্তমরূপে বীজ বপন করিতে যাহা প্রয়োজন তাহা চাষার হাতে, আর শস্য উৎপত্তি দৈবের হাতে।

এ অবস্থায় চাষের কাজ চাষা করিবে, ফলের জন্ত ব্যাকুল হওয়া চাষার অনধিকার চর্চ্চা—যেহেতু জমি চাষ ও ফসল উৎপত্তির মধ্যে এমন বহু অবস্থা আসিতে পারে যাহাতে ঐ আবাদের ফলে কিছুমাত্র শস্য উৎপন্ন না হইতেও পারে এবং যে অবস্থার উপর চাষার কোন হাত নাই যথা—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হইতে পারে, পঙ্গপাল, ইঁদুর, পাখী, কীট বিহঙ্গতে নষ্ট করিতে পারে, প্রবল জলপ্লাবনে নষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ অবস্থায় চাষা কিরূপে ফলাকাঙ্ক্ষা করিতে পারে? দৈবের মুখাপেক্ষী হইয়া যথাসাধ্য কার্য্য করাই চাষার একমাত্র পন্থা এবং উহাই বুদ্ধিমানের কথা। তবেই দেখা

যাইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়াও কর্ম্ম করা সুকঠিন নহে, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই হইতে পারে।

২য় উপায়—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"
গীতা—৩-২৭

প্রকৃতির গুণে হয় কর্ম্ম সমুদায়,
অহঙ্কারে মূঢ় ভাবে আমি কর্ত্তা তায়।

ইহাকেই বলে আত্মাভিমান—অর্থাৎ যা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তাহা আমিই করিতেছি, কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণেই হইতেছে। এই প্রকৃতাবস্থা বুঝিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। আমার দেহ ইন্দ্রিয়াদি কর্ম্ম করিতেছে অথচ আমি কর্ম্ম করিতেছি না, ইহা ধারণা করিবার ক্ষমতা অজ্ঞানীর কোথায়? যখন সে জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিবে 'আমি' আমার দেহ নয় এবং আমার দেহও 'আমি' নয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, 'আমি' চলিয়া গেলে পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে লয়প্রাপ্ত হয় তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু আমার অস্তিত্ব চিরদিনই সমান—উহার কখনই লয় হয় না, ইহা পরমাত্মার অংশ সুতরাং সনাতন, তখনই সে ধারণা করিতে পারিবে আমি কিছুই করি না। তাহার কর্তৃত্ব ভ্রান্তি মাত্র—সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং কর্ম্মযোগী হইতে হইলে জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম কখনই কর্ম্মযোগে পরিণত হইতে পারে না। গীতায় জ্ঞানের অবতারণার ইহাই মুখ্য কারণ।

৩য় উপায়—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং।"
গীতা—৯-২৭

যাহা কর যাহা খাও যতেক যজন,
তপ দান মোরে পার্থ করহ অর্পণ।

ভগবানের এ আদেশটি বড় কঠিন। 'আমাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর' ইহা কি সহজে কেহ করিতে পারে! আমি যাঁহাকে আমার সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিব তাঁহাকে না জানিলে না চিনিলে, তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তাহা না জানিলে আমি কিরূপে একজন অজানা অচেনা ব্যক্তিকে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারি। যখন জানিব তিনি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তাঁহাতেই আমার অবস্থিতি ও গতি এবং তিনি ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় নাই, তখনই আমার তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে ও শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইবে। আর ঐ ভক্তি দৃঢ় হইলে তখন তাঁহার কথায় নির্ভর করিবার কার্য্য করিতে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিব নচেৎ নয়। অর্জ্জুনেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রথমত ভগবানের উপদেশে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহার সখা বলিয়াই জানিতেন। পরে যখন ক্রমশঃ বুঝিলেন তিনি সাধারণ সখা নহেন, বিশ্বাধার বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বরূপ তখন আর সন্দেহ থাকিল না, বলিয়া উঠিলেন "তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব" তখন অর্জ্জুনের সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিতে বাধা রহিল না। সুতরাং তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে না পারিলে ঐরূপ অর্পণ সম্ভবপর হয় না এবং কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভও হয় না। অতএব কর্ম্মযোগীর পক্ষে জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিও অতি অমূল্য সামগ্রী। গীতায় ভক্তির অবতারণার ইহাই মুখ্য কারণ। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী না হইলে কর্ম্মযোগ-যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা অসম্ভব। আর এই জন্যই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়া যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হইতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে ভগবানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

ফুলধনু

(ত্র্যঙ্ক নাটক)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্-এ

চতুর্থ দৃশ্য

ময়দানের এক প্রান্ত। নীলকণ্ঠ, মায়া ও রচনা একটা প্রস্তরবেদীর উপরে এসে বসল।

মায়া। খুব হাঁটা হল আজ, নয় বাবা?

নীলকণ্ঠ। হাঁ, এবার একটু জিরোনো যাক। তোমার একটু কষ্ট হল মা?

রচনা। না না, কষ্ট হবে কেন? বেশ তো বেড়ান হল।

নীলকণ্ঠ। (হঠাৎ একটু দূরে কাকে দেখে) রবি যাচ্ছে না?

মায়া। কে? কে রবি?

নীলকণ্ঠ। ওকে তুমি চিনবে না, ওর বাবার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। (জোর গলায়) রবি! রবি! এখানে এস।

রবি প্রবেশ করল

রবি। আপনি! (নমস্কার করলে)

নীলকণ্ঠ। হাঁ, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি কিন্তু ঠিক চিনেছি। তোমার বাবা ভাল আছেন?

রবি। হাঁ।

নীলকণ্ঠ। কোন্ কলেজে পড়ছ? কোন্ ইয়ার হল?

রবি। সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি।

নীল। ও, মায়া, তোদেরই কলেজে যে রে। এটি আমার মেয়ে মায়া, এটি ওর বন্ধু রচনা। মায়া ফার্ষ্ট ইয়ার, রচনা সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। (পরস্পরের নমস্কার) সব বস, বস। (সকলে বসল) এখানে কি হোষ্টেলে থাক নাকি?

রবি। হাঁ।

নীলকণ্ঠ। এরাও হোষ্টেলে থাকে। তা ভাল, বাড়ীর জন্যে মন খারাপ হবে না, বেশ হৈ চৈ করে কেটে যায়। (রবির হাতে একটা চীনে বাদাম দেখে) কি খাচ্ছিলে? চীনে বাদাম?

রবি। (লজ্জায় পড়ে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে) না—ও—

নীলকণ্ঠ। লজ্জা কি! এতে আর লজ্জা কিসের! আছে না কি বেশী, সকলের হবে?

রবি। (পকেটে হাত দিয়ে দেখে) না তো—

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা নিয়ে আসি তাহলে। গল্প করতে করতে বেশ চলবে। (দাঁড়াল)

রবি। আমি নিয়ে আসছি। (দাঁড়াল)

নীলকণ্ঠ। (হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে) বস, আমি নিয়ে আসছি। মায়া রচনার সঙ্গে আলাপ কর। (বেরিয়ে গেল)

মায়া। বাবাকে বুঝি আপনি আগে থেকে চিনতেন?

রবি। হাঁ।

মায়া। একে আপনি কলেজে কোনোদিন দেখেননি?

রবি। (ইতস্তত করে) না—কই—

মায়া। তা হবে। আমাদের কলেজটা তো খানিকটা দূরে।

রবি। হাঁ, অনেকটা দূরে।

মায়া। রচনাদি, তুমি যে চুপ করে আছ, কথাটথা কও।

রচনা কিছু বললে না

আপনিই না হয় দুটো কথা বলুন।

রবি। হাঁ—তা—

মায়া। দেখুন, রচনাদি সুন্দর কবিতা লিখ্তে পারে।

রচনা। বাঃ, মিছে কথা।

মায়া। কে বললে মিছে কথা? তোমার একটা খাতা কবিতায় ভর্ত্তি দেখলুম না সেদিন।

রচনা। সে তো গান।

মায়া। কার লেখা?

রচনা। রবীন্দ্রনাথের।

মায়া। এঁর নাকি? (বলতেই রচনা মুখ তুলে চাইতেই দেখে রবি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; লজ্জায় পড়ে মুখ নামিয়ে নিলে)

আপনি কি গান লেখেন?

রবি। না।

মায়া। যদিও আপনি ঠাকুর নন রায়, তথাপি নামগৌরবে আপনার কিছু লেখা উচিত। নয় কিনা বলুন।

রবি। আমি তো কিছু লিখতে পারি না।

মায়া। শুধু ফুটবল খেলতেই পারেন?

রবি। একটু আধটু পারি।

মায়া। আপনি গান গাইতে জানেন না?

রবি। না।

মায়া। সে কি! গান তো সকলেই গাইতে জানে, আপনি জানেন না, আশ্চর্য্যের কথা। সত্যি বলছেন, জানেন না?

রবি। না, জানি না।

মায়া। তাহলে তো আপনি ভাল সার্টিফিকেট পাবেন না। গান গাইতে জানেন না, কবিতা লিখতে পারেন না, শুধু খেলতে পারেন। ঐ যে বাবা এসে গেছেন।

নীলকণ্ঠের প্রবেশ

নীলকণ্ঠ। (ঠোঙা বার করে) নাও, সকলে নাও। মায়া, দাও সবার হাতে।

মায়া। তুমিই দাও না বাবা।

নীল। তোমরা থাকতে কি আমাদের দেওয়া ভাল দেখায় নাকি?

মায়ার হাতে দিলে

কেমন রবি, আলাপ হল?

রবি। হাঁ।

নীলকণ্ঠ। ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে না। মায়া যে লাজুক! তাছাড়া রচনা মাটিও আমার কম যান বলে মনে হচ্ছে না। মায়া ঠোঙাটা তুমি রচনার হাতেই দাও, মা-ই আজ আমাদের বিতরণ করুন।

রচনা। মায়াই দিক না।

মায়া। না না, লক্ষীটি, তুমিই দাও ভাই।

রচনার হাতে দিলে

নীলকণ্ঠ। দাও মা দাও, তাতে আর লজ্জা কি! এখানে লজ্জা করবার মত কে আর আছে! মায়া তোমার ঘরের লোক, আমি তো বুড়োমানুষ, আর রবি বড় ভাল ছেলে, চেনাশোনা বেশী হলে আপনার জনের মত দাঁড়িয়ে যাবে দেখো।

রচনা সকলের হাতে হাতে দিলে

আজ যেটা চীনেবাদামে সুরু, সেটা যেন চপ্ কাটলেটে শেষ হয়!

মায়া। কেন বাবা?

নীলকণ্ঠ। কেন আবার কি! তোমাদের হাতে—আমি না হয় বুড়ো হয়েছি, রবি তো আর তা নয়—রবি কি শুধু চীনে বাদামই আশা করবে, চপ্ কাটলেট আশা করবে না? রচনা, চপ্ কাটলেট তৈরি করতে পার তো?

রচনা ঘাড় নাড়লে

বেশ বেশ, এই তো চাই। রন্ধনে দ্রৌপদী কথাটা আজও অচল হয়নি, তার মানে কি জান? তোমার কি মনে হয় রবি?

রবি। পুরুষরা মেয়েদের প্রশংসা করতে ভালবাসে বলে।

নীলকণ্ঠ। উত্তরটা শ্রুতিমধুর বটে কিন্তু ঠিক হল না। মায়া, তুমি কি বল?

মায়া। পুরুষরা মেয়েদের রান্নার কাজে বেঁধে রাখতে চায় বলে।

নীলকণ্ঠ। কথাটা উগ্র আধুনিকাদের উপযুক্ত হলেও ঠিক হল না। মা রচনা, তোমার কি মনে হয়?

রচনা। আমি আর কি বলব!

নীলকণ্ঠ। তাহলেও একটা বল।

রচনা। তেমন তো কিছু মনে হচ্ছে না।

মায়া। একটু মনে করে দেখ।

রচনা। আমার মনে হয়, পুরুষরা নানারকম জিনিস খেতে ভালবাসে বলে।

নীলকণ্ঠ। সাবাস, সাবাস! ঠিক বলেছ। এই না হলে নাম রচনা! কেমন রবি, ঠিক উত্তর হয়েছে কি না বল।

রবি। পুরুষদের পেটুক বলা হল।

নীলকণ্ঠ। তাই নাকি পায়ে লাগল তাহলে? রচনা, শুনছ, রবি কি বলছে?

মায়া। বাবা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এবার উঠা যাক।

নীলকণ্ঠ। (শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে) তাই তো তাই তো, আমার খেয়াল ছিল না। একদিকে রবি, অন্যদিকে রচনা, তার মাঝে মায়াময়ী তুমি, মায়া সৃষ্টি করছ, আমার হুঁশ ছিল না। চল সব। রবি, তুমিও এখন ফিরবে তো?

রবি। হাঁ, চলুন।

নীল। সন্ধ্যেটা বেশ কাটল। কাল আবার সকালের গাড়ীতে আমাকে ফিরতে হবে। চল,. ময়দানে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে মায়া, শরীরটা ভাল থাকবে, সহরের ভেতর যে বাতাস, তাতে তো আমাদের মফঃস্বলের মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। তবু যেন এখানে একটু মুক্তি আছে। রবি, তুমি তো প্রায় এখানে আস, না?

রবি। হাঁ, আসি।

নীল। বেশ বেশ, চল। ক্রমশঃ

আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

জানি না সে কোন্ আদিমযুগ থেকে, মানুষ বৃহস্পতিবারের বার-বেলাটাকে বেশ একটু ভয়ের চক্ষেই দেখে আসছে। আর হয়তো ওটা যারা যত মানে, তাদের ভুগতেও হয় তত বেশী। আমাদেরও তাই হয়েছিল, মুখে যতই যা বলি, কিন্তু মনে বৃহস্পতিবার বলে একটা খট্‌কা লেগেই ছিল, তাই পাঁজি দেখে বারবেলাটা কৌশলে এড়াবার জন্য বেলা ১২টার সময়ই বাড়ী থেকে রওনা হয়ে পড়লাম। সে দিনটি আজও মনে আছে, ১৯৩৮ সালের ১৩ই অক্টোবর। প্রাত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম।

বারবেলা এড়াবার কৌশল কিন্তু কাজে লাগেনি এবং প্রায় সকলেরই ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। তাই এখন বলা যাক্। যাবার পথে পাটনা ও দিল্লীতে নেমে কিছু কাজ সেরে যাবার কথা ছিল। প্রথমেই হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠবার সময় এমন ভীড় হয়েছিল সেদিন, যে জানালাদিয়ে গলে উঠাছাড়া আর উপায়ই ছিল না। আমার সঙ্গে পাটনা মিউজিয়ামে দেওয়ার জন্য এক ট্রাঙ্ক সোনার মোহর থাকায় বাধ্য হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে চাপরাশীদের সঙ্গেই যেতে হয়েছিল, নচেৎ এত হতো না। যাই হোক্, বাধ্য হয়েই শেষ পন্থা অবলম্বন কর্ত্তে হলো। পরদিন সকালে পাটনায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে সারাদিন সরকারি কাজকর্ম্ম সেরে আবার রাত্রি ৯টায় পাঞ্জাব এক্সপ্রেস্ ধরব বলে, ৫টা কুলীর মাথায় সমস্ত জিনিষপত্র তুলে, পাটনা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চাপরাশীর হাতেও অনেক দরকারি জিনিষপত্র ছিল, তার মধ্যে :আমার হাতবাক্সটার ভেতর ছিল সমস্ত টাকাকড়ি, টিকেট ইত্যাদি। গাড়ী এসে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াতে দেখা গেল,ট্রেনে ভীষণ ভীড়। ২।১ বার এদিক ওদিক কর্ত্তে কর্ত্তেই ট্রেন ছেড়ে দিল। তাই দেখে আমার চাপরাশী তাড়াতাড়ি এক যায়গায় উঠে পড়লো আর তার হাতে রয়ে গেল সেই হাতবাক্সটা। কুলীরা বলতে লাগলো যে তারা জানালা দিয়ে সব দিয়ে দেবে, আর আমিও যেন উঠে পড়ি। তাদের কথা শুনে আমিও উঠলাম বটে কিন্তু উঠেই দেখি যে কুলীদের কিছুই ভেতরে দেওয়া সম্ভব হয় নি। গাড়ী তখন বেশ জোরেই চলতে আরম্ভ করেছে—তবুও বাধ্য হয়েই আমায় নেমে পড়তে হলো। চাপরাশী কিন্তু আর নামতে পারে না। পরের জংসনে নেমে থাকবার জন্য তাকে তার করে দিলাম সারারাত্রি পাটনা ষ্টেশনে বসেই কাটলো। বলা বাহুল্য যে কুলী বেচারীদের দেবার মত পয়সাও আমার কাছে ছিল না। তার পরের গাড়ী ছাড়ে ভোর বেলায়, সেটাতে আবার আমায় তারা তুলে দিয়ে গেল। তাদের নাম ও নম্বর লিখে নিয়েছিলাম যদি কখনও সুবিধা হয় তো দিয়ে দোব। সেই রাত্রেই দিল্লী গিয়ে পৌঁছিলাম এবং পথে মোগলসরাই থেকে চাপরাশীকেও তুলে নিতে পেরেছিলাম। ইচ্ছা ছিল ২।১ দিন দিল্লীতে থেকে একটু বিশ্রাম করে যাব কিন্তু তা আর হলো না। ওদিকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য, এমন কি যদি সম্ভব হয় তো তখনই আধঘণ্টা পরে যে ট্রেন ছাড়ে তাতেই রওনা হবার কথা বলার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিজেই ষ্টেশনে অপেক্ষা কচ্ছিলেন। কোনও রকমে সেই রাতটা সেখানে বিশ্রাম করার অনুমতি পেয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে ওঠা গেল। পরের রাত্রে আবার গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম। সেখান থেকে লাহোর হয়ে, করাচি মেল ধরে, সিন্ধু দেশের দাদুনামক ষ্টেশনে পৌঁছিলাম ১৮ই তারিখে সকালবেলায়। পথে আর তেমন কোনও গোলযোগ হয় নি। ভাবলাম বৃহস্পতিবারের বারবেলার ধাক্কা বুঝি বা কেটে গেল। এখানে ষ্টেশনের waiting room এ থেকে স্নানাহারটা সেরে আবার রওনা হওয়া যাবে এই ব্যবস্থা ঠিক করে Refreshment Room এগিয়ে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, কি তারা খেতে দিতে পারে। মালিক জানালে, চা ইত্যাদি ছাড়া কিছুই তৈয়ারি থাকে না, Order দিলে করে দিতে পারে। চেহারা দেখে তাদের হাতে ভাত খাওয়ার প্রবৃত্তি হলো না, তাই বললাম যে যদি সম্ভব হয় তো চাপাটি ও মাংস করে দিতে পার। তাদের order দিয়ে আমি গেলাম স্নানটা সেরে নিতে। স্নান সেরে Bath Room থেকে বেরিয়েই দেখি 'Boy' চারখানা চাপাটি ও কিছু চপ জাতীয় জিনিষ রেখে গেল। ঐ ঘরে অপর কেউ না থাকায় আমি ভাবলাম যে ওটা আমারই খাবার, তবে বোধ হয় মাংস তৈয়ারি করার সুবিধা না হওয়ায় ঐ চপ জাতীয় জিনিষটি দিয়েছে; কাজেই ঐ বিষয় আর কোনও চিন্তা না করেই খেতে আরম্ভ করে দিলাম। একখানি চাপাটি ও কিছু চপ ভেঙ্গে খেয়েছি এমন সময় হঠাৎ 'Boy'টা এসে, কোন কথা না বলেই dishটা তুলে নিয়ে গেল। আমি কথা বলবো কি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম, ভাবতে লাগলাম ব্যপার কি! তার পর কিছু বুঝতে না পেরে বাহিরে দরজার কাছে এসে দেখি, Platformএ একখানি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তখনই ছাড়বে, তার দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন লোক ভয়ানক চিৎকার ও গালাগালি কচ্ছেন। বলছেন "যথেষ্ট সময় রেখে order দিয়েছিলাম তবুও আমার পুরা চারখানি চাপেটা করে দিতে পারে না! চপও কম দিয়েছ"। ব্যাপারটা তখন বুঝলাম যে আমারই উচ্ছিষ্টটা তাড়াতাড়িতে হয়ে ওঠে নি বলে তাকে চালান হয়েছে। ঘৃণায় ও লজ্জায় আমার আর তাদের কাছে জল পর্য্যন্ত খেতে ইচ্ছা হলো না। আমি যা খেয়েছিলাম তার বিল বাবদ তিন আনা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমি তখনই জোহীর পথে রওনা হয়ে গেলাম। আর মনে মনে বারবেলার কথাটাই ভাবতে লাগলাম।

এখান থেকে জোহী ১২ মাইল হবে, ভাল মোটর চলার রাস্তা আছে। Bus Service আছে তাতে জোহী যাওয়ায় কোনও অসুবিধা হলো না; এখানে P. W. D.র Inspection Bungalow আছে তাতেই এসে ওঠা গেল এবং আমার অত তাড়াতাড়ি চলে আসবার যা কারণ

ছিল, সেটা হচ্ছে তাঁবু প্রভৃতির গাড়ী এসে জাহু পৌছেছিল, সেগুলি ছাড়িয়ে নেওয়া। তাও করা হলো। তারপর Superintendentএর জন্ত আরও ২।১ দিন ওখানে অপেক্ষা কর্লাম। তিনি ১৯শে পর্য্যন্ত দিল্লীতে থেকে আসবেন এইরকম কথা ছিল। ২১শে পর্য্যন্ত ওখানে একাই থাকলাম, সঙ্গে কেবল এক চাপরাশী।

জোহী মারগাটী একটী Divisional Head. Qrs. S. D. O. কে তাদের ভাষায় বলে "মুক্তিয়ারকার" তাঁর অফিস সেখানে। ওখানকার কোনও সহরই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। পাকা রাস্তা প্রায় নাই বল্লেই চলে। বর্ষা বৎসরে মাত্র ২।৪ দিন মাত্র হয়, সেজন্ত সাধারণ কাঁচা রাস্তাতেই বেশ কাজ চলে যায়, প্রখর রৌদ্রে রাস্তার মাটি শুকিয়ে ভয়ানক ধুলা হয় সেজন্ত বেশীর ভাগ রাস্তাতেই খড় বা ছেঁড়া কাপড়ের কুঁচা ছড়ান থাকে। তাতে ধুলাটা কিছু কমে। সহরে তার উপরেই জল ছড়াবার কিছু ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ঝাঁট দেবার ব্যবস্থা করা মোটেই সম্ভবপর হয় না। বৃষ্টি হয় না বলে লোকেরা কাঁচা ইটের ঘর নির্ভাবনায় তৈয়ারি করে থাকে। ভীষণ রৌদ্রে বাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত ফেটে যায়, সেজন্ত লোকেরা কাদার সঙ্গে খড় কুঁচিয়ে এবং তুঁষ মিশিয়ে তাই দিয়ে সর্ব্বত্র Plaster করে রাখে। বাড়ীতে প্রায়ই জানালা রাখে না এবং যদি রাখে তো খুব উঁচুতে ছোট ছোট করে রাখে, যাতে বেশী গরম হাওয়া ঘরে না ঢুকতে পারে।

এখানে অনেক লোকের বাস, দোকান পসার অনেক কিছুই আছে। আজকাল Irrigation Deptএর কৃপায় প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়ে থাকে। কাপড়ের উপর ছাপার কাজ, সূচের কাজ, কাঠের জিনিষের উপর গালার পালিশের কাজ, মাটি ও দেওয়ালের উপর এনামেলের কাজ এখানকার বিখ্যাত। চাউল বা কাঁচা তরকারি এখানে খুব কম জন্মায়। চালান আসে অবস্থাপন্ন লোকেদের জন্ত। গম এখানে প্রচুর জন্মায়। এখানে গমকে "কড়্কী," কনক অর্থাৎ সোনার মত রং হয় বোলেই বোধহয় ঐ রকম নাম রেখেছে। বড় বড় রামছাগল এখানে খুবই পাওয়া যায়। একটী ছাগল সারাদিনে ৩।৪ সের পর্য্যন্ত দুধ দেবার কথাও শোনা যায়। এদের দুধে গন্ধ হয় না। অন্ত দুধ পাওয়া যেত না বলে ঐ দুধই খেতাম, দামও বেশ সস্তা, চার পয়সা সের। উট এখানকার যানবাহনের একমাত্র অবলম্বন। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেদের যেমন ২।১ বিঘা জমি থাকলেই কোনও প্রকারে চলে যায়, এখানকার তেমনি উট। চাষের জমি খুব কম লোকেরই থাকে। উট প্রায় ২ রকমের কাজে লাগে। এক রকমের উটে মানুষ ঘোড়ার মত চড়ে। তারা প্রায় ঘোড়ার মত বেগেই চলতে পারে। বসার জন্ত একটী কাঠের Frame, কুঁজটী বাহিরে রাখার জন্ত মাঝখানেই একটু ফাঁক থাকে, আর দুই পাশে, অর্থাৎ আগে ও পিছনে ২ জন মানুষ বেশ বসে যেতে পারে। তার পিঠে ঐ ফ্রেমের উপর বেশ ভাল করে গদী ও রেকাব, এঁটে নেওয়া হয়। মুখে লাগাম ও লাগান হয়। এই রকম উটকে তারা বলে "মোহ্রী"। এরা কিন্তু বোঝা নিয়ে চলতে পারে না। আর এক রকম উট হলো "লদ্দু" এরা মালপত্র নিয়ে আস্তে আস্তে চলে। উটের গায়ে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। এমন কি পিঠে উঠলে মানুষের গায়ে পর্য্যন্ত ভয়ানক গন্ধ হয়।

যানবাহনের একমাত্র অবলম্বন

এ বেচারি জীবের খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই। মরুভূমিতে তপ্ত বালির ওপর দিয়ে এরা ছাড়া আর কেউই চলতে পারে না। একবার খানিকটা জল খেয়ে নিলে, ২।১ দিন কিছু না হলেও চলে যায়; ছোট ছোট ঝাউ গাছের মত এক রকম নরম কাঁটা গাছ জন্মায়, তাই খেয়েই এরা জীবনধারণ করে।

কয়েক দিন জোহীতে অপেক্ষা করার পর ২১শে তারিখে Superintendent—Mr. N. G, Majumdar, Photographer—Mr. M, Sengupta এবং একজন Scholor—Mr. Krishna Dev. এসে পৌছিলেন। আমরা আমাদের মালপত্র বহন করার মত ১৬টী ও চড়ার মত ৫টী উট সংগ্রহ কল্লাম, কিছু কুলীও সংগ্রহ করা হল। এই সব ব্যবস্থা কর্ত্তে আমাদের আরও ২।১ দিন কেটে গেল। ক্যাম্পের প্রয়োজনে একটী মেথরেরও দরকার, তার ব্যবস্থাও হলো, কিন্তু তিনি বলে বসলেন হেঁটে হেঁটে তিনি কি করে যাবেন, একটী গাধা হলে বেশ হতো। বাধ্য হয়ে ৫৲ টাকা দিয়ে একটী গাধা তাঁকে কিনেই দেওয়া হলো, দেখলাম যে বিছানা-পত্র সমেত তিনি গাধার পিঠে চড়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে আমাদের পিছন পিছন আসছেন। অবশ্য গাধা মহারাজের উটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মরুভূমির দেশ, জলকষ্ট খুবই, গ্রামে অনেক কষ্টে অনেক বালি ও পাথর কেটে একটা করে কুয়া খোঁড়া হয়। জল অনেক নীচে তাই দড়ি দিয়ে হাতে টেনে তোলার সুবিধা হয় না। Persian Wheel জাতীয় একপ্রকার কাঠের তৈয়ারি চাকা, তাতে লাগান মালার মত কোরে ছোট ছোট হাঁড়ী। চাকাটী ঘুরালেই হাঁড়ীর মালাটী ঘুরতে থাকে—আর একটীর পর একটী হাঁড়ীতে একদিকে জল ভরতে থাকে ও অপর দিকে ঢালতে থাকে। অনেক দূর থেকে লোকেরা মাটীর কলসী ভরে সেই জল পান করার জন্ত নিয়ে যায়। যেমন জলকষ্ট ব্যবস্থাও তার তেমনি। স্নান তারা প্রায়ই করে না। কখনও ইচ্ছা হলে মাথাটা তারা ধুয়ে ফেলে মাত্র। বাসন প্রভৃতি শুকনা বালি দিয়াই মুছে ফেলে। যেখানে হ্রদ বা স্বাভাবিক প্রস্রবণ আছে তার আশপাশের মানুষরা কতকটা পরিষ্কার। অবশ্য আমি যা বল্লাম তা শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কথা নয়, সাধারণ লোক যারা সহর থেকে অনেক দূরে আছে তাদের কথাই বলছি। ঐ জাতীয় লোকদের খাওয়ার কথাটাও বেশ একটু মজার। খানিকটা লাল আটার সঙ্গে কিছু শাকজাতীয় জিনিষ, নুন, লঙ্কা ও পিঁয়াজ মিশিয়ে, জল দিয়ে মেখে ফেলা হয়। তারপর যাদের রুটী সেঁকবার তাওয়া নেই (অনেক লোকেরই থাকে না) তারা একটী পাথরের নুড়ীর গায়ে সেই মাখা আটাটা ঠিক ঘুঁটে দেবার মত করে চারদিকে লাগিয়ে নেয়। তারপর আরও গোটা কতক পাথর কুড়িয়ে এনে, তার উপর সেই আটা মাখান পাথরটা বসিয়ে, নীচে শুখনা উটের ঘুঁটে কুড়িয়ে এনে, আগুন জ্বেলে দেয়। কিছুক্ষণ পরে যখন সেটা বেশ সেঁকা হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে সেটাকে সেই পাথর থেকে ছাড়িয়ে ফেলে। এই রকম রুটী খাবার জন্ত ডাল, তরকারি ওদের প্রায়ই দরকার হয় না। সকাল বেলায় বাড়ী থেকে কাজে বার হবার সময় এই রকম একখানা রুটী মাথার পাগ্ড়ীর ভেতর নিয়ে রওনা হয়, তারপর যখনই ইচ্ছা হয় একটু ভেঙ্গে মুখে পুরে দেয়।

ওখানকার কথাবার্ত্তা হিন্দী বা উর্দ্দুর মত নয়। লিখবার সময় উর্দ্দু অক্ষর যদিও তারা ব্যবহার করে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। এই আলাদা ভাষার ভেতরেও অনেক সংস্কৃত শব্দ এরা ব্যবহার করে। যেমন ছেলেকে বলে 'পুট্র' এটা পুত্র কথারই অপভ্রংশ। এককে বলে "হিক্ড়ো", দুই হলো "ব্বা", তিনকে বলে "ট্রে" ইত্যাদি।

তারপর এখানকার পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই লম্বা ঢিলা পায়জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী পরে। পুরুষরা মাথায় পাগড়ী এবং স্ত্রীলোকরা গায়ে ওড়না ব্যবহার করে। ক্রমশঃ

অঙ্গের ভূষণ

শ্রীকমলচন্দ্র সরকার এম্‌-এ

অমন চোখ কেউ জন্মে দেখেনি; সর্বক্ষণ খুসীর দমকে নাচছে তো নাচছেই। যেন শিশির-ধোয়া ছুটো জোড়া পাতার ওপর সকালবেলার রোদ আর বাতাস এসে লেগেছে।

হাসিকে দুরন্তপনা শিখিয়েছে আসলে ওর ঐ দুই চোখ। মেয়েটা একমুহূর্ত্ত যদি স্থির হতে জানে! কথা থামে তো হাত-পার দৌরাত্মি্য থামে না। আর হাত পা গুটিয়ে যদি বসলো, তো মুখে অনর্গল খই ফোটার বিরাম নেই।

হাসির মনে আর দেহে সবে জোয়ার আসতে সুরু হয়েছে। তাই তার এত ছলছলানি, বাধা বাঁধনের বাঁধ থেকে এত উপচে পড়া। যে ওর পথে এসে দাঁড়াবে তার ওপর আছড়ে পড়বে, নিজেকে দেবে ছিটিয়ে ছড়িয়ে। চলনে কথাতে, হাসিতে গতিতে হাসির এমন একটা ভাব যেন সারা পৃথিবীটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবার ভার ওরই ওপর।

পাঁচজন মেয়ের মধ্যে হাসি প্রথম থেকে পঞ্চম কোনটাই নয়। ধরণধারণ ওর আলাদা। সকলে যা করে, ও সেটা গোঁ করে' ভোলে। শাসন মানে না, লজ্জার বালাই নেই। অচেনা লোকের সামনে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে' যেতে হবে এ ওর ধাতে সয়না। আর ওর সবচেয়ে ঘোরতর আপত্তি গলা খাটো করায়। বড় মেয়ের যে চেঁচিয়ে কথা বলতে নেই, এ কথা বলে' বলে' হাসির মা হার মেনেছেন। কথাগুলো হাসির কাণ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় হয়তো, কিন্তু ভেতরে তলায় না।…কি দায় বলতো! ভগবান যার যেমন গলা দিয়েছেন, সে তো সেইভাবে কথা কইবে। ফিস্‌ফিস্ করে' কথা বলবার দরকারই বা কি, আর লোকে তা কান পেতে শুনবেই বা কেন? কী যে বলে মা!… ধরো পরাণদার বাড়ীর নতুন বৌ ঐ মল্লিকা। হ'লই বা বৌ-মানুষ, তাই বলে' সমবয়সীদের সঙ্গেও কি কাণে কাণে কথা বলতে হবে! অথচ ফিস্‌ফিস্ করে' ছাড়া ও কথাই বলতে পারেনা, তাও আবার কাণের কাছে মুখ এনে। উঃ, এমন সুড়সুড়ি লাগে!…মার কাছে ঐ সব মেয়ে খুব ভালো, খু-উ-ব ভালো। মল্লিকার কথা বলার ধরণ মনে পড়লে হাসি হঠাৎ এমন জোরে হেসে ওঠে যে মা কাছে থাকলে আবার এক ধমক।

ব্যস্, এক দৌড়ে হাসি উধাও। কয়েকটা লাফে খিড়কির দরজা পেরিয়ে সোজা অসীমাদের বাড়ী। অসীমার গলা জড়িয়ে কাণের কাছে মুখ নিয়ে যায়।

—এই, করিস কি পোড়ারমুখি? পড়ে' মরবো যে—

—চুপ, রিহার্স্যাল হবে।

—সে আবার কি?

—আয়, কাণে কাণে বলি। মা বলেছে—বড় মেয়েদের—গলা যেন শোনা যায়না। বুঝলি?—কু-উ-

অসীমার কাণের পর্দা ফাটবার জোগাড়। বলে, উঃ, রাক্ষুসী দিলে আমায় শেষ করে'। দাঁড়া, মাসীমার কাছে গিয়ে নালিশ করছি; তখন বুঝবি মজা।

—ইঃ, নালিশ করবে না আরও কিছু! কাল সকালে উঠে তাহলে' আর তোর বিনুনি খুঁজে পাবিনা এই বলে' রাখলুম।

হাসিকে লক্ষ্য করে' পাড়ার লোকে বলে, বাপ্, দস্যি মেয়ে।

গভীর রাতের বেলা ঘুমন্ত মেয়ের কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিতে দিতে মেয়ের মা বলেন, আহা, একেবারে ছেলেমানুষ!

এই ছেলেমানুষটির ভারী এক বড়মানুষী সখ—গয়না পরবে, সাজগোজ করবে। একদিন না খেতে পাক্ হাসির তাতে যায় আসেনা; কিন্তু আধময়লা কাপড় একখানা পরবার নাম শুনলে বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসবে। নেহাৎ যদি দায়ে পড়ে' পরতে হ'ল সেদিন আর হাসি বাড়ী থেকে বার হবেনা, লোকজন এলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। সাজগোজ করবার ওর যে সামান্য দু'একটা উপকরণ তার সম্বন্ধেও ঠিক এমনি বায়নাক্কা। নিজের মনোমত না হলে' কার সাধ্যি কেউ কিছু হাসির গায়ে তোলে।

সখটা পাড়াগাঁয়ের গেরস্থ ঘরে যে একেবারেই বেমানান্ তা আপন-পর সকলেই জানে। জেনেও চুপচাপ আছে। এসব ব্যাপারে পর সামনাসামনি মুখ ফুটে কিছু বলেনা। আর যারা আপন, তাদের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা করে' দিয়েছে স্নেহের কুয়াশা।… গয়না বলতে হীরে জহরৎ জড়োয়া নয়, সোনাদানাও নয়। সোনার গয়না বলতে গেলে হাসি দেখেইনি। সামান্য একটা কাঁচপোকার টিপ তৈরী করে' বা রং মিলিয়ে দু'চার গাছা কাঁচের চুড়ি পরে' ও যদি খুসী থাকে, কেন আর তাতে বাদ সাধা!

আর মেয়েটাকে মানায়ও কি তেমনি! গড়নে যেন কোথাও এতটুকু খুঁৎ নেই—নিটোল দেহ। কেউ ওর হাত জোরে চেপে ধরলে মনে হবে আঙুলের দাগ বসে' গিয়েছে। গয়না পরবার হাত, সাজবার মতো দেহ। অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মালে ওর তো সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে মুড়ে রাখবার কথা।

সর্বাঙ্গে গয়না দেবার কথাই ওঠেনা; কিন্তু মেয়ে বড়সড়ো হচ্ছে, তার গায়ে একটুকরো সোনা না রাখলে যেন কেমন কেমন দেখায়। হাসির মা তাই এক কাজ করলেন। বাক্স থেকে নিজের বিয়ের সময়কার দু'গাছা বালা বার করে' নিলেন। নেবার পর ডাক পড়লো হাসির।

হাসি ছুটে এল লাফাতে লাফাতে—যেমন ওর স্বভাব। মাকে বাক্সের পাশে বসে' থাক্‌তে দেখে চট্ করে' সিদ্ধান্ত করে' নিলে। বললে, বন্ধ হচ্ছেনা বুঝি? দাঁড়াও মা, আমি পাশ থেকে চেপে ধরি, তাহলেই চাবী লাগবে।

—চাবী লাগাতে হবে না, দেখি হাত দেখি—

হাসি ঘাবড়ে গেল; হঠাৎ মা হাত দেখতে চাইছেন কেন? খানিক আগে হাসি পুঁইয়ের মেটুলি টিপে রং বার করছিল, তার

রাগ কি এখনও লেগে আছে? একটু থতমত খেয়ে বললে, এই সবে যাচ্ছিলুম মা ঘাটে হাত ধুতে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। হাত বার কর দেখি…

অমন যে দুরন্ত মেয়ে, দেখতে দেখতে তার হাবভাব বদলে গেল'। কি করে' বিশ্বাস করা যায়? এ যে আসল সোনা! সোনার গয়না হাসির জন্যে? ওর ভাবনা কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে' এল। ভাবলে, নিশ্চয় পরের জিনিষ, এখনি ফেরৎ দিতে হবে। তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মা ওর অবস্থা যেন লক্ষ্যই করেননি, এমনি ভাবে বললেন, দেখো, দাপাদাপি করতে গিয়ে যেন আবার জিনিষ দুটো ভেঙে তুবড়ে এনোনা।

…ও দুটো তাহলে তারই! আনন্দের আতিশয্যে হাসি করলে কি, টিপ করে' মার পায়ে এক প্রণাম করে' দে ছুট্। আর সে ত্রিসীমানায় নেই।

ঐশ্বর্য্য বলতে ঐ সামান্য দুটো বালা, তাও সেকেলে প্যাটার্ণের। কিন্তু তারই আদর দেখে কে? প্রথম আবিষ্কার করলে অসীমা। একদিন ভরসন্ধ্যেবেলা হাসির খোঁজে এসে দেখে নিবিষ্টমনে সে ঘরের কোণে বসে' রয়েছে। কাছে আসতে নজরে পড়লো, তার হাতে ব্যবহার করে' ফেলে দেওয়া বহু পুরোণো একটা দাঁতের বুরুশ। বাটিতে সাবান-জল করে' ওর সদ্য পাওয়া বালা মাজা-ঘসা করছে। পরিষ্কার জলে গয়না দুটো ধুয়ে, আঁচল দিয়ে হাসি মুছলে। তারপর অসীমাকে বললে, দেখলি, কেমন চকচকে হ'ল; কম ময়লা ছিল ফাঁকে ফাঁকে? বাবার খড়কে কাঠি দিয়ে এতক্ষণ খুঁটে খুঁটে বার করলুম।

তারপর দিনকতক হাসি নিজেই নিজের সঙ্গী। আপন মনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তো দাঁড়িয়েই রইল। পুকুরে যখন গা ধুতে গিয়েছে, জলের বুকে নিজের ছায়া দেখে বিভোর।

শুধু কি এই? ঐ যে পাড়ার নতুন বৌ মল্লিকার কথা হচ্ছিল, ওর কাছ থেকে হাসি একখানা গয়নার ক্যাটালগ আদায় করেছে। তার পর থেকে বাড়ীতে যত ছবিগল্পের বই আছে হাসি আর তা ছোঁয়না। সময় পেলেই ক্যাটালগের পাতা ওলটাচ্ছে। কাণবালা, কাণপাশা, জয়ন্তী চুড়ি, ভাটিয়া চুড়ি, পেণ্ডাণ্ট, ব্রোচ্ প্রভৃতি হাল ফ্যাসানের সব গয়নার নাম আর দাম ওর কণ্ঠস্থ। সেকেলে ধরণের গয়না—যেমন নথ, তাবিজ, বাজু, গোট, টায়রা—এদের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করতে হাসি খুব বেশী উদ্‌গ্রীব নয়।

মাঝে মাঝে আবার নিজের বিদ্যে নিজেই পরীক্ষা করে। অসীমাকে ডেকে এনে বলে বল্‌তো, ব্রেসলেট্ কোথায় পরে?

অসীমা অতশত জানেনা; কস্ করে বলে দেয়, কেন, গলায়।

হাসি এমন হেসে ওঠে যে ও বেচারী অপ্রতিভের একশেষ। জোর করে' বলে তবে কোথায়?

—হাতে রে মুখপুড়ি, হাতে।

অসীমা হেরে যাওয়াতে হাসি দ্বিগুণ উৎসাহে ক্যাটালগ মুখস্ত করতে আরম্ভ করল।

দিনকতক দেখে-শুনে মা একদিন বললেন, হ্যাঁরে, তোর কি সবই অনাছিষ্টি? ঐ ছাইপাঁশ-গুলো রাতদিন পড়ে' কি হচ্ছে? দু'দিন পরে যখন পরের বাড়ী যাবি তখন ওসব বায়নাক্কা বেরিয়ে যাবে।

বিন্দুমাত্র না ভেবে হাসি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, তখন তো আরও মজা। পরের বাড়ী যাবার আগেই তো একসেট্ গয়না পাবো।

এর সঙ্গে কথা কয়ে সময় নষ্ট। মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

দেখে-শুনে প্রতিবেশীরা বললে, দেখা যাক্, হাসির বাপ কত বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দেয়।

শুনে বিধাতা হাসলেন।

মেয়ের মা মনে মনে বললেন, আহা, মেয়ে আমার গয়নার নামে পাগল। একটু স্বচ্ছল ঘরে যেন ওর বিয়ে দিতে পারি।

বিধাতাপুরুষ এবারও হাসলেন।

শ্রাবণ মাসের এক সন্ধ্যায় হাসির বিয়ে হ'ল। বিয়ের রাতে মেয়েরা যখন হাসিকে সাজিয়ে দিলে তখন ওর সর্বশরীর কাঁপছে, নিজের দিকে তাকাতে পারছে না। নতুন-গড়া স্বর্ণালঙ্কারে ওর শরীরে এনেছে আগুনের দীপ্তি। বাবা মা দিয়েছেন চারগাছা চুড়ি। বরপক্ষ আশীর্বাদ করে গিয়েছে একটা হার দিয়ে। আর এক আত্মীয় দিয়েছেন চমৎকার দুটো কাণবালা। এত সব ওর জিনিষ! ওর নিজের! হাসির চোখে জল, মুখে হাসির আভাস, ঠোঁট কেঁপে উঠছে বারে বারে।…

বিয়ের পরই হাসিকে গ্রাম ছাড়তে হ'ল অনেকদিনের জন্যে। স্বামী রাণীগঞ্জের কলিয়ারীতে কাজ করে' দু'পয়সা করেছে। সেখান থেকে দূরে থাকা তারাপদর পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া বিয়ের পর স্ত্রীকে যখন তখন বাপের বাড়ী পাঠানোতেও তার মত নেই। কাজেই শ্রাবণ মাস পরের বছর যখন ফিরে এল, হাসি এলনা। এল অনেক পরে—প্রায় দেড় বছর বাদে। তারাপদ আসতে পারেনি, কাজ ছিল। হাসির এক খুড়তুতো ভাই রাণীগঞ্জে থেকে ওকে নিয়ে এল।

মেয়েকে দেখে মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁরে হাসি, একি চেহারা হয়েছে তোর? অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?

—না তো।

—বড্ড যে রোগা হয়ে গেছিস্। গায়ে তো গয়নাও একখানা নেই। তুলে রেখেছিস্ বুঝি?

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাসি সহজভাবে বললে, পথে-ঘাটে ঐ সব দামী জিনিষ নিয়ে কেউ বেরোয় বুঝি?

—বাঃ, তাই বলে' দু'একখানা গায়ে রাখতে হয় বৈকি। আচ্ছা, সে হবে'খন।—তোর জন্যে একটা ঝুমকো গড়িয়ে রেখেছি।—বোস্, আমি আসছি।

অসীমা আড়ালে লুকিয়ে ছিল। হাসিকে একলা পেতেই পেছন থেকে এসে তাকে জাপ্‌টে ধরলে।—কিরে, চিনতে পারিস?

—কি মনে হয়?

—আমার তো মনে হয় বিয়ে করে' তুই সব ভুলেছিস্।

শ্বশুরবাড়ী যাবার পর ক'খানা চিঠি লিখেছিস্ বলতো? আঙুলে গুণে বলা যায়।

—তাই নাকি?

—নয়ত কি?—বড়লোকের গিন্নী এখন, ভারিক্কি মানুষ, আমাদের আর মনে থাকবে কেন?—হ্যাঁরে, সত্যি কথা বল দিকি। তারাপদবাবুর জন্তে মন কেমন করছে না?

উত্তরে হাসি শুধু একটু হাসলে।

অসীমা ওর খোঁপায় একটা টান দিয়ে বললে, ছাখ হাসি, এতদিন বাদে দেখা, তুই যদি শুধু অমন করে মুখ টিপে টিপে হাসবি তো ভাল হবেনা বলছি। নতুন কি গয়না গড়ালি দেখা। হ্যাঁ রে—শ্বশুরবাড়ী থেকে আর কিছু দেয়নি?

—সে কি একটা রে?

—অনেকগুলো বুঝি?—উৎসাহে অসীমার দুই চোখ চক্‌চক্ করে উঠলো।

—এক গা বোঝাই।

—সত্যি নাকি? এনেছিস্ তো সেগুলো? দেনা বাপু বাক্সের চাবীটা—

—এনেছি বৈকি। কিন্তু বাক্স খুলতে হবেনা। গয়না আমার গায়েই আছে। দেখবি?

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এল হাসি। খুলে ফেললে গায়ের জামা। বললে, ঐ ছাখ, হাতে, পিঠে, গলায় আমার কত গয়না—

সেদিকে চোখ পড়তে অসীমা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে' চোখ বুঁজলো। শরীর তার কেঁপে উঠ্‌ল থরথর করে'।

আর হাসি উঠল হেসে। হাসতে হাসতে বললে, দূর পোড়ারমুখি, এইতেই ভয় পেয়ে গেলি? এমন গয়না কার আছে বল্‌তো? গা থেকে খুলে নেয় এমন সাধ্যি নেই কারও। একেবারে আঁকা হয়ে গেছে। রংটা একটু কালো, তা হোক্। আমার যা চিরদিনের সখ স্বামী তাই উপহার দিয়েছেন।—

অসীমার গলাজড়িয়ে কাছে টেনে নিলে।—বল্, রাক্ষুসী, এবার তোর গল্প শুনি।

অসীমার চোখ টল্‌মল্ করে' উঠেছে। হাসি তখনও হাসছে। সে সর্ব্বনেশে হাসির সামনে মানুষের কথা ফোটে না। অসীমাও কথা বলতে পারলে না। শুধু মনে মনে একান্ত অনুরোধ জানালে, ভগবান, একবার যে ক'রে হোক্ হাসির চোখে তুমি দু'ফোঁটা জল এনে দাও।

ভাগ্য

শ্রীকমল মৈত্র

সুধীর গুপ্ত কেরাণী—মার্চ্চেণ্ট আপিসের ৮৫ টাকার কেরাণী। একটী মাত্র মেয়ে নিয়েই তার সংসার। মেয়েটী বিবাহযোগ্যা—কিন্তু ক্ষয়রোগে ভুগ্‌ছে। যা মাহিনা পায় তাতে সংসার চলে যায় কিন্তু ঐ বনিয়াদী রোগটাই তাকে বিব্রত করে তুলেছে। মহা অশান্তিতে আছে সে।

এই সুধীর গুপ্ত একদিন ১০০৲ টাকা সরকারের 'প্রাইজ বণ্ড' কিনে বসল বোনাসের টাকা পেয়েই। কিনেই দুঃখ হল, আহা! টাকাটা থাকলে একবার ডাঃ নাগকে দেখান যেত। তার ভাগ্যে কিছু উঠ্‌বে না সে জানে। শুধু শুধু টাকাটা পাঁচ বছর আটকে থাকবে!

একদিন অপিসে গিয়ে শুনলো আজ result বেরিয়েছে। তাড়াতাড়ি নিজের নম্বর বার করে মেলাতে গেল বড়বাবুর ঘরে। কাগজ দেখে সে বসল একটা চেয়ারে। বড়বাবু বুঝলেন আশাভঙ্গ! প্রবোধ দিয়ে বললেন, "সবই ভাগ্য সুধীরবাবু! তবে টাকাটা থাকবে এই ভরসা"—সুধীর কোন কথা না বলে এগিয়ে দিল নিজের নম্বর আর কাগজটা! বড়বাবু মিলিয়ে দেখে আশ্চর্য্য হলেন। প্রসন্ন মুখে বলে উঠ্‌লেন Lucky dog. সব ভাগ্য সুধীরবাবু, সব ভাগ্য। দেখুন না আমিও শ'তিনেকের কিনেছিলাম কিন্তু—! থাক্ congratulation, খাওয়াচ্ছেন ত?" "নিশ্চয়ই"—বলে সুধীর বেরিয়ে এল।

পথে চলতে চলতে সে ভাবল, আজ সে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক! একটা taxi করে গেলে কেমন হয়! পরক্ষণেই মনে হল এ টাকা সে নিজের সুখের জন্ত খরচ করবে না! মেয়েকে ভাল করে তুলতে হবে আগে। তারপর তার বিয়ের খরচ আছে! কত কথাই সে ভাবতে লাগল। প্রথমেই বাড়ীটা বদল করা দরকার। তারপর সামনের পূজার ছুটীতে changeএ যেতে হবে মেয়েকে নিয়ে। কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট থেকে কিছু ফল কিনিল। ফুলও কিছু নিল। ফেরবার পথে ডাঃ নাগকে একটা call দিয়ে বাড়ীর দিকে চল্‌ল!

বাড়ীর কাছে আসতেই দেখ্‌ল কয়েকজন লোক তার বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একটা অজানা আতঙ্কে সুধীরের বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল! নিকটে গিয়ে যা দেখ্‌ল তাতে সে একেবারে নির্ব্বাক হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। তার মেয়ে মারা গেছে।... ...

শোক গভীর হলে বোধহয় শোক প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে না। সুধীরও চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফলের টুক্‌রীটা রেখে ফুল নিয়ে চলল শ্মশানে। নিজ হাতে 'চিতা' সাজিয়ে মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে—তার উপর ফুলগুলো ছড়িয়ে দিলে।......চিতা জ্বলে উঠ্‌ল।......

* * * *

এর কয়েকমাস পরে আবার গল্পের যবনিকা যখন উঠ্‌ল তখন দেখা গেল সুধীর ঠিক সেইরকমই আছে। সেই ছোট্ট বাড়ী থেকে রোজ আপিস যায় আর আসে। আসবার সময় একটু ঘুরে বিডন্ ষ্ট্রীটে সেবাসদনের কাছে দাঁড়ায়। তারপর একটী ফুল নিয়ে প্রস্তরমূর্ত্তির কাছে রাখে। দারোয়ান সুধীরকে রোজ বকে। তবু সে রোজ সন্ধ্যেবেলা ফুল দিয়ে আসে। সেদিন দারোয়ান পাগল ভেবে বেশ অপমান করে তাড়িয়ে দিলে।...সুধীরও হেঁটে পথ চলতে আরম্ভ করে...। হ্যাঁ—এটাও ভাগ্য! ভাগ্য ছাড়া আর কি?

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

(৭)

বাঙ্গালায় রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম যুগ

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে উমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে রাজনীতিক আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন, কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কি করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। তিনি অবশ্যই বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সহিত সংযোগ রাখিয়াছিলেন এবং যখন দাদাভাই নৌরোজী উক্ত সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে ভারতে আসেন এবং ইন্দোরের হোলকারের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ সাহায্য লাভ করেন তখন উমেশচন্দ্র তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যে একেবারে রাজনীতির চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। কলিকাতায় তখন কতকগুলি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু সেগুলিতে তিনি বিশিষ্টভাবে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেন তিনি যোগদান করেন নাই তাহা বুঝিতে হইলে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম যুগের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

যেমন সূর্য্যের আলোকরশ্মি সর্ব্বপ্রথমে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরেই পতিত হয়, প্রতীচ্য জ্ঞানের আলোকরেখা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যা ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত বঙ্গদেশেই সর্ব্বপ্রথমে নিপতিত হয় এবং পাশ্চাত্য প্রথায় রাজনীতিক আন্দোলন বঙ্গদেশেই প্রথম আরব্ধ হয়। মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালা আজ যাহা ভাবে, সমগ্র ভারত পরদিন তাহা ভাবে।' রাজনীতিক আন্দোলন বঙ্গদেশে আরব্ধ হইয়া পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইংরাজী আমলে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নেতারা গবর্ণর-জেনারেলদিগকে সম্বর্দ্ধনা বা অভিনন্দিত করা ব্যতীত অন্য কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় ওয়ারেন হেষ্টিংসের গবর্ণর জেনারেলের আসন হইতে অবসর গ্রহণকালে সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, উহাতে হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা মদনমোহন দত্তের পুত্র রসিকলাল দত্ত প্রমুখ দেশবাসিগণ স্বাক্ষর করেন। পরবর্ত্তী বড়লাটদেরও অবসর গ্রহণকালে ঐরূপ অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মসংস্কার এবং সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারেই তাঁহার প্রতিভা বিনিয়োজিত করেন নাই, পরন্তু দেশের রাজনীতিক অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্যও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি "ভারতবর্ষের বিচারপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে"* দেওয়ানী আদালতে দেশীয় এসেসর নিয়োগ, জুরী দ্বারা বিচারপ্রথা, রাজস্ব শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথগীকরণ, ফৌজদারী ও অন্যান্য আইন গ্রন্থ সঙ্কলন, নূতন আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সম্পাদক জন মার্শম্যান লিখিয়াছিলেন, রামমোহন রায় ও রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্রের সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গবর্ণর জেনারেলের পরামর্শ সভায় গ্রহণ করা উচিত।

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যও আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্যর চার্লস মেটকাফ্‌ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিলে দ্বারকানাথ উদ্যোগী হইয়া প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। সংবাদ পত্রের দ্বারা রাজনীতিক আন্দোলনে সুফল হইতে পারে জানিয়া দ্বারকানাথ 'বেঙ্গল হরকরা' নামক বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্রের অন্যতমস্বত্বাধিকারী হন। তিনি অন্যান্য সংবাদপত্রের—বিশেষতঃ ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরের' অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

* Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue systems of India and of the General character and condition of its Native Inhabitants, as submitted in evidence to the Authorities in England. By Raja Rammohun Roy. London 1832

অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তির সদ্ব্যবহার করিলে দেশের শাসননীতির সংস্কার সাধন করা যাইতে পারে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দ্বারকানাথ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন স্থাপিত করেন। মিঃ ডব্লিউ সি হ্যারি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর উহার সম্পাদক ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজনারায়ণ রায়, আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), দেওয়ান রামকমল সেন, রাধাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি উহার সভ্য ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ব্রুহাম ও অন্যান্য উদার-হৃদয় ইংরেজ বিলাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। উহার সহিত ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন সহযোগিতা করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ প্রথমবার ইংলণ্ডে গমন করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উক্ত সভার বিশিষ্ট সদস্য, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য জর্জ্জ টমসন, যিনি আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র ও অত্যাচারিতের বন্ধু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন—তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন। ইনি বিলাতে British India Advocate নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদকরূপে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে ছিলেন এবং ভারত বর্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত সম্বন্ধীয় তথ্য-সংগ্রহমানসে সানন্দে ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামক প্রতিভাশালী শিক্ষকের নিকটে শিক্ষিত হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা' সভা নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উহার পরিদর্শক ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার, সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠ ও রামগোপাল ঘোষ, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র রক্ষক রাজকৃষ্ণ মিত্র এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ দে। এই নব্য বাঙ্গালীদিগকে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নাম দিয়াছিলেন 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন।' জর্জ্জ টমসন এই সভায় সাদরে অভ্যর্থিত হন এবং তিনি তাঁহার অননুকরণীয় ওজস্বিনী ভাষায় নব্য বাঙ্গালীকে দেশ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণকে অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে উৎসাহ দেন। রাজনীতিক অধিকার লাভ ও বিস্তারের জন্য তিনি তাঁহাদিগকে অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিতে পরামর্শ দেন। তখন আফগান যুদ্ধ হইতেছিল, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' টমসনের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন এখন দুই দিকে কামান গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে—পশ্চিম বালাহিসারে—এবং কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়। এই সকল বক্তৃতার ফলে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে এক সভা স্থাপিত হয় (২০শে এপ্রিল ১৮৪৩)। এই সভার কার্য্যনির্বাহক সমিতিতে জর্জ্জ টমসন সভাপতি, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক, রামগোপাল ঘোষ ধনরক্ষক (পরে সহকারী সভাপতি), মিষ্টার জি, এ, রেমফ্রি, জি-টি-এফ-স্পীড, এম-ক্রো, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, ব্রজনাথ ধর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন ও সাতকড়ি দত্ত সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জর্জ্জ টমসন ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে রামগোপাল এই সভার সভাপতি হন। এই সভার মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সম্পাদনায় দেশের অনেক কাজ করিয়াছিল।

জর্জ্জ টমসন
(কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে)

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে)

রামগোপাল ঘোষ

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন অতি

হীন দশায় পতিত হয় এবং শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালীদিগের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী সমগ্র দেশের প্রতিনিধি নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। সেই জন্ত ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর প্রধানতঃ রামগোপাল ঘোষের চেষ্টায় দুইটি সভা সংমিলিত হয় এবং উহার নাম হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। প্রথম কার্য্যনির্বাহক সমিতিতে রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব সহকারী সভাপতি,

স্তর রাজা রাধাকান্ত দেব

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, দিগম্বর মিত্র সহকার সম্পাদক এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদস্ত নির্ব্বাচিত হন। পরে এই সমিতিতে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি যোগদান করেন। হরিশ্চন্দ্র ও রামগোপালের লিখিত এই সভা হইতে To the great Commoners of England যে সকল পত্র প্রেরিত হইত তাহাতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারে কিছু কল্যাণজনক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দুপেট্রিয়ট', কিশোরীচাঁদের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড', গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী' মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যতদূর সম্ভব রাজনীতিক জ্ঞান বিস্তার ও রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তখন প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কার বিষয়ক প্রশ্ন লইয়া ব্যাপৃত থাকিত। হরিশ, গিরিশ ও রামগোপাল দেশে যে স্বদেশপ্রেম জাগরিত করিয়াছিলেন তাহা হেমচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালী কবিকে ভারত-বিষয়ক কবিতা রচনায় অনুপ্রেরিত করিয়াছিল। এই সময়ে নবগোপাল মিত্র প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার বংশীয়গণের সাহায্যে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তন করেন। উহাতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন।

হরিশ্চন্দ্র, রাজা রাধাকান্ত,রামগোপাল, প্রসন্নকুমার, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের যথেষ্ট অবনতি হয় এবং এমন কোন সভা ছিল না যাহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সমগ্র দেশের কল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করে। কৃষ্ণদাস পাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হন। তিনি হিন্দুপেট্রিয়টেরও তখন সম্পাদক। তিনি অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু, তখনকার একজন সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন "A man of the people by birth, he disappointed his nation by spending his energies in Zemindary harness." তিনি "steered a middle course between authority and affinity,—between respect for "the powers that be" and the goodwill of his nation." কৃষ্ণদাস 'রায়বাহাদুর' ও 'সি-আই-ই' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

ভোলানাথ চন্দ্র স্বয়ং কোন রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই কিন্তু তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখার্জীর ম্যাগেজিনে (১৮৭৩-৬ খৃষ্টাব্দে) ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা বিষয়ক যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে দেশের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ ও প্রতিকারের উপায় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছিল। চরকা, বয়কট, এমন কি প্রয়োজন হইলে অসহযোগিতারও তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

গতি

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

আঁধারের বুকে আলোর দেবতা, চিনিতে পারি কি আমি ?
জীবন-মরণ-মন্থন-ধন চিরজনমের স্বামী !
ভগ্ন পাঁজর ব্যথা-জর্জ্জর নিদারুণ দুর্ভোগে
শত বঞ্চনা লাঞ্ছিত ফিরি, সঙ্কিত অভিযোগে।
চণ্ড আঘাতে ভঙ্গুর দেহ ভয়-ভারাতুর বহি,
নির্য্যাতিতের যাতনার ভার জীর্ণ বক্ষে বহি।
রক্তে রাঙানো বেদনায় নীল ধূলি-ধূসরিত বেশ,
বহ্নি দিয়াছে চিহ্ন আঁকিয়া দহনে শুভ্র কেশ।
নিরুদ্ধ শ্বাস রোদন বিলাপ অশ্রু হারানো আঁখি,
নির্ব্বাক মূক উদ্ভ্রান্ত মন,—সে মোরে চিনিবে নাকি ?
ঝড়ে ঝঞ্ঝায় প্রলয়ের স্রোতে যাহারা সর্ব্বহারা,
ক্ষুধা তৃষ্ণায় মহামারী গ্রাসে নিরুপায় যায় যারা,—
তারা কি পেয়েছে বিরাম ও পায়ে, লভেছে মুক্তি-লয় ?
কর্ম্ম-বন্ধ নিয়তি-নিগড় লেখা কি হ'য়েছে ক্ষয় ?
উহাদেরি সাথে অজানিত পথে মোর যেন মিলে ঠাঁই,
অগতির গতি, সেই মোর মতি—আনগতি নাহি চাই।

জঙ্গম

বনফুল

৪৫

পরদিন একটি পাচক সমভিব্যাহারে শিরিষবাবু আসিয়া পড়িলেন এবং শুধু অমিয়াকে নয় শঙ্করকেও লইয়া যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমিয়া বলিল, "আমি যাই কি করে' বল। হাসি-দি তাঁর ছেলেকে আমার কাছে রেখে গেছেন। কার কাছে রেখে যাই একে।"

চিবুকের তলাটা চুলকাইতে চুলকাইতে শিরিষবাবু বলিলেন, "রেখে যাবি কেন। ও চলুক আমাদের সঙ্গে"

"বাঃ, হাসিদি ফিরে এসে যদি ছেলে খোঁজেন ?"

শঙ্কর বলিল—"তার ফিরতে এখন দেরি আছে। তুমি নিয়ে যেতে পার ওকে—"

অমিয়া বলিল, "তাছাড়া বাড়িতে এতগুলি পোষ্য, তাদের দেখে কে।"

ইহার জন্ত শিরিষবাবু প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। "সেই জন্তেই তো রাঁধুনি বামুনটাকে সঙ্গে এনেছি। ও স্বচ্ছন্দে সব চালিয়ে দিতে পারবে। শঙ্করও আমাদের সঙ্গে চলুক। চারদিকে কলেরা হচ্ছে, এখন এখানে থাকা ঠিকও নয়।"

শঙ্কর বলিল, "কলেরা হচ্ছে বলেই আরও আমাকে থাকতে হবে।"

শিরিষবাবু জামাতার দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া আবার চিবুক চুলকাইতে সুরু করিলেন।

অমিয়া বলিল—"যাই বাবার চা-টা নিয়ে আসি। তুমিও খাবে না কি আর এক কাপ।"

"আন।"

শিরিষবাবু সোৎসাহে বলিলেন—"খাবে বই কি। আন,"

অমিয়া চলিয়া গেল।

শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল। মুশাই আসিয়া ডাকের চিঠি দিয়া গেল।

"ডাক এল না কি"

"হ্যাঁ"

শঙ্কর খামটা খুলিয়া দেখিল উৎপলের চিঠি।

উৎপল লিখিয়াছে—

ভাই শঙ্কর,

চিঠি পড়বার আগেই একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি। যা করেছি তার প্রেরণা মানব-সুলভ কৌতুহল, অন্ত কিছু নয়। লোভটা সামলাতে পারা গেল না। শুধু তাই নয়, সামলানো উচিত বলেও মনে হল না। আগে তোমাদের কাউকে কিছু বলি নি, কারণ বললেই তোমরা বাগড়া দিতে। সুরমা এখনও দেবার চেষ্টা করছে, যদিও এখন আর ফেরবার পথ নেই, সই করে' দিয়েছি। অর্থাৎ—ইন ব্রিফ—কিংস কমিশন পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আগে থাকতেই গোপনে গোপনে চেষ্টা করছিলাম—লেগে গেছে। মানব-মনীষার এই নবতম বহ্ন্যুৎসবটা স্বচক্ষে দেখবার কি যে আগ্রহ হচ্ছে আমার, তা তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করব না ; কারণ তোমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক, তোমাদের ধরণধারণ সবই স্বতন্ত্র। যাক সে কথা। এখন যে কোন মুহূর্ত্তেই উড়ব এবং চীন না কায়রো কোথায় গিয়ে যে হাজির হব তা জানি না। যতদিন না ফিরি সুরমা তার বাবার কাছে বম্বেতে থাকবে। তোমার সঙ্গে দেখা হল না, তাই চিঠিতেই গোটাকতক কাজের কথা বলে যাচ্ছি—অবধান কর। আগে যেমন ছিলে এখনও তেমনি তুমি জমিদারির সর্ব্বময় কর্ত্তা রইলে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক চেক্ দিয়ে গেলাম অর্থাৎ আমার অবর্ত্তমানে তুমি যা করবে তাতে আমার অগ্রিম সম্মতি রইল এবং আইনত সেটা পাকা করবার জন্তে আমার উকীলকেও অনুরূপ উপদেশ দিয়ে গেলাম। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু একটা কথা। দেশোদ্ধারের যে এক্সপেরিমেন্টটা আমরা সুরু করেছিলাম তাতে যে খুব সুবিধে হয় নি এতদিনে তুমিও সেটা বুঝেছ নিশ্চয়। অন্ত একটা লাইন ধরলে কেমন হয় ? অবশ্য কি লাইন ধরলে যে ভাল হবে সেটা তুমিই ভেবে-চিন্তে ঠিক কোরো।

মণির ব্যাপারে আমি যে বিকট কাণ্ড করে' এসেছি তার ফল কি হল ? আমার পদ্ধতি উল্টে দিয়ে নূতন কোন উপায়ে তুমি যদি সমস্যাটার সমাধান করতে পার কোরো, আমার কিছু আপত্তি নেই। বিবেক-দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবার দরকার কি—যাদের ক্ষতি হয়েছে—যদি ভাল মনে কর তাদের ক্ষতি-পূরণও করে' দিতে পার।

তোমার নিপুদা'র সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল। রিক্রুটিং আপিসে দেখি তিনি ওয়ারে নাম লেখাবার জন্তে এসেছেন। নেহাৎ পেটের দায়েই এসেছিলেন বলে' মনে হ'ল, যদিও অ্যান্টিফাসিষ্ট নানারকম বুকুনি ঝাড়লেন। এ কথা মনে হবার কারণ—যেই তাঁকে বললাম—'আপনি যদি চান সিভিল লাইনেই ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি আপনার—অমনি তিনি রাজি হয়ে গেলেন। ভাল একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি তাঁর। তিনি একটি অনুরোধ করেছেন। জমিদারি আমরা যদি বিক্রি করি মুকুন্দ পোদ্দার বা রাজীব দত্তকে যেন না দিই। এ অনুরোধের অর্থ কিছু বুঝলাম না। জমিদারি আমরা বিক্রি করব এ গুজব উঠল কি করে ? কেনারামও একদিন বলছিল একথা। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওই কেনারামটিকে সাবধান। বড় গভীর জলের মাছ উনি। আমাকে জানিয়ে গেছেন ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে—অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছেটা এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একটা মনোমালিন্ত করি। আমি যে গভীরতর জলের জীব এ খবর উনি জানেন না বলেই এ চেষ্টা করেছিলেন। পারতপক্ষে ওঁর সংস্পর্শ পরিহার কোরো। আমার মতে লোকসান-টোকসান যা হয়েছে তা 'রাইট অফ' করে' দিয়ে ব্যাঙ্কটা তুলে দাও। ধার হিসেবে না দিয়ে বন্ধুরে

বছরে গরীব প্রজাদের যা পারো দানই কোরো বরং কিছু কিছু। সব দিক থেকে নিরাপদ সেটা, দেখতে শুনতেও ভাল।

আর বিশেষ কিছু লেখবার নাই। চুম্বন গ্রহণ কর।

সুরমা খুব হাসিমুখে থাকবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর ভেতরটা যে টনটন করছে তা ঠিক ঢাকতে পারছে না, বোঝা যাচ্ছে একটু একটু। তবে সেটা আমার জন্যে না তোমার বিরহে, তা বুঝতে পারছি না ঠিক। ইতি—

উৎপল

অমিয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল।

"কার চিঠি?"

"উৎপলের"

"ডাকে আসবার মানে?"

"ওরা এখানে নেই। উৎপল যুদ্ধে যাচ্ছে"

"আর সুরমা?"

"সে বম্বে যাবে"

বাহির হইতে কে ডাকিল—"শঙ্কর দা"

শঙ্কর বাহিরে গিয়া দেখিল নিমাই ঘটক দাঁড়াইয়া আছে।

"কি খবর?"

"আমাদের গ্রামেও কলেরা লেগেছে"

"চৌধুরি মশাইকে খবর দাও তাহলে। আমাকে আজ কোলকাতা যেতে হচ্ছে"

"ও। কোলকাতায় কোথায় উঠবেন?"

"সপরিবারে যাচ্ছি যখন, ক্যালকাটা হোটেলেই উঠব। তেমন দরকার যদি বোঝ খবর দিও"

"আচ্ছা"

নিমাই ঘটক চলিয়া গেল।

সুরমা এখানে নাই এবং কিছুদিন এখন থাকিবে না এই বার্ত্তা শুনিয়া অমিয়া আর বাপের বাড়ি যাইতে আপত্তি করিল না।

শঙ্করও বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"চল আমিও তোমাদের সঙ্গে কোলকাতা পর্য্যন্ত যাই। উৎপলের সঙ্গে দেখা করা দরকার একটু—"

শিরিষবাবু সোৎসাহে বলিলেন—"বেশ তো, বেশ তো—"

৪৬

অমিয়াকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া শঙ্কর গড়ের মাঠে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। নির্জ্জনে নিজের সঙ্গে সে বোঝা-পড়া করিতে চায়। উৎপল সুরমা কাহারও সহিত তাহার দেখা হয় নাই। বিমর্ষচিত্তে সে বারম্বার আবৃত্তি করিতেছিল—ভালই হইয়াছে—ভালই হইয়াছে। আত্মগ্লানিতে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। গ্রামে সকলে যখন কলেরায় মরিতেছে তখন সে তাহাদের ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল কেন! এই না সেদিন উচ্ছ্বাসভরে লিখিতেছিল—আমি যেমন করিয়া হোক উহাদের উদ্ধার করিব? এই কি উদ্ধার করিবার নমুনা! কেন আসিল সে? অমিয়ার জন্ত আসে নাই, শ্বশুরের অনুরোধেও নয়, এমন কি উৎপলের সহিত দেখা করিবারও একটা বিশেষ আগ্রহ জাগে নাই তাহার, সে আসিয়াছিল সুরমার জন্ত। নির্জ্জনে এই রূঢ় সত্যটার সম্মুখীন হইয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। ছি, ছি, কেন এই হীন লোলুপতা! আত্মসম্বরণ করিবার সামান্ত এ শক্তিটুকু যাহার নাই সে করিবে পতিতোদ্ধার! চরিত্রের কোন সম্পদ আছে তাহার? বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সে হাসিম টাকাটা দিয়া নিজের ঋণপরিশোধের কল্পনা করিয়াছিল। অতি সহজেই তো রাজীব দত্তকে স্পষ্ট মিথ্যা কথাটা বলিয়া আসিল—আমি ওসবের মধ্যে ছিলাম না। পরোপকার করিবার ছুতায় সে এতদিন আত্মবিনোদন ছাড়া আর কি করিয়াছে। কেবল কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে সকলের উপর। যে তাহার অহংকে তুষ্ট করিতে পারিয়াছে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছে, যে পারে নাই তাহাকে নির্য্যাতন না করিলেও অনুকম্পা করিয়াছে। পরের অর্থে নিজের অহঙ্কারকে পরিতুষ্ট করিতে করিতেই তো জীবন কাটিল। গৌরব করিবার মতো তাহার নিজের কি আছে? কিছুই নাই।...নিঃস্ব ভিখারীর মতো অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। সহসা মনে পড়িল শাস্ত্রে বলিয়াছে—আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান। নিজেকে? অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিল—অন্ধকার গুহায় লুব্ধ পশুটা বসিয়া আছে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবিটা। শিহরিয়া উঠিল। ওই কদাকার পশুটাই আমি? আর কিছু নাই? মিথ্যা কথা। আমার অন্তরে এত স্বপ্ন, পশু কি কখনও স্বপ্ন দেখে? পশুর অন্তরে কি উচ্চাশা জাগে? আমার অহঙ্কার অসংযম অপৌরুষ অসন্তোষ অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার যে কল্পনা আদর্শলোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিতেছে তাহা কি পশুর কল্পনা? এতদিনের এত শ্রম এত সাধনা সব পণ্ড হইয়া যাইবে, পশুটারই জয় হইবে শেষে? সহসা তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর বেগে বহিতে লাগিল, চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অন্তরের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—কিছুতেই না, পশুটাকে আমি জয় করিবই। পরক্ষণেই মনে মনে হইল—কিরূপে? অন্ধকার অন্তর লোকে তাহার ব্যাকুল মন কেবলই প্রশ্ন করিয়া ফিরিতে লাগিল—কিরূপে? কিরূপে? কিরূপে? অন্ধকারের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল—বিলাস বর্জ্জন করিয়া কাজ কর। ভোগের শিখরে বসিয়া এতদিন কাজ করিবার অভিনয় করিয়াছ মাত্র, তোমার অন্ন অপরে উৎপাদন করিয়াছে, তোমার বস্ত্র অপরে বয়ন করিয়াছে, তুমি কেবল সাড়ম্বরে আস্ফালন করিয়াছ—আর কিছুই কর নাই। সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া এইবার কাজে লাগ। কাজ করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে। অপরকে ভাল করিবার দায়িত্ব তোমার নহে, কায়মনোবাক্যে নিজে তুমি ভাল হও। নিজে যদি ভাল হইতে পার তোমার সংস্পর্শে যাহারা আসিবে তাহারাও ভাল হইবে। মুখের উপদেশ দিয়া নয়, নিজের পবিত্র জীবন দিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ কর। অন্ত কোন পথ নাই। নিজের বিবেকের চক্ষে নিজেকে যদি নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতে পার তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহাই তোমার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্যই পালন করিবে সে। এবার ফিরিয়া গিয়া জমিদারির সর্ব্বময় কর্ত্তা আর সে হইবে না। উৎপলের জমিদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া শাসন-পরিষদ গড়িবে, নিজেদের হিতাহিত চিন্তা নিজেরাই করিবে। তাহাকে যদি নির্ব্বাচন করে

ভৃত্যের মতো সেবা করিবে সে। তাহার বেশী আর কিছু নয়। নিজে সে কৃষক জীবন যাপন করিবে। ফরিদ কারু বিপুণদের দলে মিশিয়া ঠিক উহাদেরই মতো বাস করিবে। উহাদেরই মতো নিজের হাতে চাষ করিয়া স্বোপার্জ্জিত অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবে। 'বাবু' আর সে থাকিবে না। মুশাইয়ের বাড়ির পাশে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া……কল্পনার ডানায় উড়িয়া উড়িয়া মন তাহার স্বপ্ন-রচনা করিতে লাগিল। আচ্ছন্নের মতো সে বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার চোখ বুজিয়া আসিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কতক্ষণ চোখ বুজিয়াছিল তাহাও সে জানে না।

অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ খুলিল তখন মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত একটা প্রেরণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল নিমাই ঘটক তাহার অপেক্ষায় হোটেলের সামনে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছে।

"নিমাই যে, কি খবর।"

"বড় দুঃসংবাদ। হরিদা কলেরায় মারা গেছেন, আর কুন্তলাদি সহমৃতা হয়েছেন তাঁর সঙ্গে"

"সে কি!"

"হ্যাঁ। প্রথম ডাক্তার চলে যাওয়ার পর থেকে গ্রামে তো আর ডাক্তার নেই। আপনি যেদিন আসেন সেই দিনই সন্ধে বেলা হরিদার কলেরা হয়, পাড়ার কে যেন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছিল, কিছু হয় নি। রাত্রেই তিনি মারা যান। কেউ কিছু জানে না। ভোরে মধুসূদন দেখতে পেলে বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া আর গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাকাডাকি করা হল, কোন সাড়া নেই। কপাট ভেঙে ঢুকে দেখা গেল উঠোনে চিতা জ্বলছে। তেল আর ঘিয়ের খালি টিন পড়ে রয়েছে। বাড়ীতে যত কাঠ কাপড় চোপড় ছিল তাই দিয়ে চৌকির উপর চিতা সাজিয়েছেন কুন্তলাদি আর তাইতেই পুড়েছেন স্বামীর সঙ্গে—টু শব্দটি পর্য্যন্ত করেন নি, কেউ জানতে পারে নি—"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"পুলিশ এ নিয়ে গোলমাল করছে, আপনার একবার যাওয়া দরকার"

"নিশ্চয়। চল"

বলিয়াই সে চলিতে সুরু করিল।

"এখন তো ট্রেণ নেই"

একথা শঙ্কর শুনিতে পাইল কি না বোঝা গেল না।

সে দ্রুতবেগে চলিতেই লাগিল।

সমাপ্ত

তরু দত্ত

শ্রীসমর সরকার এম্‌-এ, বি-টি, বি-এল্‌

তরু দত্ত সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে এই বাঙ্গালী মহিলা-কবি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু এই স্বল্প বয়সেই তিনি বিশ্বের নিকট যে-খ্যাতি অর্জন করেছেন তার তুলনা বিরল। একমাত্র ইংরাজ কবি টমাস চ্যাটারটন ব্যতীত আর কোন কবি এত অল্প বয়সে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হননি। বালক কবি চ্যাটারটন মাত্র ১৭ বৎসর নয় মাস বয়সে পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু নিজ প্রতিভাবলে তিনি অমরতা লাভ করেছেন। আমাদের দেশের এই বাঙ্গালী কবিটির কৃতিত্ব চ্যাটারটন অপেক্ষা কিছু কম নয় এবং এক হিসাবে তরু দত্তের কৃতিত্ব আরো বেশী বলা চলে। কারণ, চ্যাটারটন লিখেছিলেন ইংরাজী ভাষায় (যদিও তাঁর অধিকাংশ কবিতাই মধ্যযুগীয় ইংরাজীতে লেখা) আর তরু দত্ত লিখেছেন ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায়। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে একজন বিদেশিনীর পক্ষে অন্য দুটি ভাষায় এই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অভাবনীয়। হয়ত বহু পরিশ্রমের ফলে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, কিন্তু দুটি বিদেশী ভাষায় নিজের ভাবধারা এমন সাবলীল ভাবে প্রকাশ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বাস্তবিক তরু দত্তের ইংরাজী বা ফরাসী ভাষায় কবিতা পাঠ করে কেউ বুঝতে পারেন না যে একজন বিদেশিনীর কলম হ'তে এই অমৃতধারা নিঃসৃত হয়েছে। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'জিনিয়াস' তরু দত্ত ছিলেন তাই। তিনি তাঁর এই 'জিনিয়াসে'র সাহায্যেই এই অসাধ্য সাধন করেছেন। আজ প্রত্যেক সুপাঠকই তরু দত্তের কবিতার সঙ্গে পরিচিত। তবুও এ-কথা বোধ হয় বলা চলে যে তরু দত্তের কবিতার আরো সার্বজনীন প্রচার আবশ্যক। বিদেশী সাহিত্যে যে বাঙ্গালী কবি নিজ যোগ্যতা বলে অমরতা লাভ করে' বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করেছেন সেই কবির প্রতি বাঙ্গালীর যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। সাধারণ বাঙ্গালী, যাঁরা ইংরাজী বা ফরাসী সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত নন, তাঁরা অনেকেই হয়ত তরু দত্তের নাম পর্যন্ত শোনেন নি। নিজের দেশের এত বড় প্রতিভার প্রতি এই অনাদর অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কি থাকতে পারে?

বাঙ্গলার গৌরব এই তরুণী কবি রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৮৫৬ সালে ৪ঠা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে রামবাগানের দত্তবংশ শিক্ষা ও কৃষ্টির জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তরুর পিতা গোবিনচন্দ্র দত্ত খ্রীষ্টান ছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তরুর একটি ভ্রাতা ও ভগিনী ছিলেন। ১৮৬৫ সালে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তরুর ভ্রাতা অব্জু মারা যায়। তরুর ভগিনী অরুর জন্ম হয় ১৮৫৪ সালে এবং তিনি তরু অপেক্ষা ১৮ মাস বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। অরু ও তরুর শৈশব কেটেছিল কলিকাতায় তাঁদের পিতার বাগানবাড়ীতে। এই বাগানবাড়ীটি তরুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একটি কবিতাতে তিনি এই বাগানের ঘন পত্রপুষ্প, লিলিগাছে ঘেরা পুষ্করিণী ও casuarina বৃক্ষের বিশাল শাখার উল্লেখ করেছেন। এ হেন মধুর রহস্যঘেরা আবেষ্টনীর মধ্যে তরুর তরুণ কবিমন গড়ে উঠেছিল। মাতার নিকট হতে দেশীয় গল্পগাথা শুনে তরুর মন দেশীয় আদর্শে উদ্দীপিত হয়েছিল।

তিনি Ancient Ballads and Legends of Hindustan নামক পদ্যগ্রন্থ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই রচনা করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে গোবিনচন্দ্র সপরিবারে ইয়োরোপ যাত্রা করেন—তরুর বয়স তখন মাত্র তের। গোবিনচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল কন্যাদুটিকে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। তাঁর ইচ্ছা যে আশাতিরিক্ত পূরণ হয়েছিল তা' বলাই বাহুল্য। তরু দুটি ভাষার মধ্যে ফরাসী ভাষাটা বেশী শিখেছিলেন। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং ফরাসী ভাষার তাঁর রচনার চাতুর্য ও মাধুর্য বেশী দেখা যায়। দুই ভগ্নীতে কিছুদিনের জন্য একটি ফরাসী বোর্ডিংস্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারপরে তাঁরা ফ্রান্স পরিত্যাগ করে পিতার সঙ্গে প্রথমে ইতালী ও পরে ইংলণ্ডে যান। ১৮৭০ সালের প্রথম দিকে তাঁরা লণ্ডনে আসেন কিন্তু ১৮৭১ সালে তাঁরা কেম্ব্রিজে উপস্থিত হন। ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে গোবিনচন্দ্র সপরিবারে বাঙ্গালাদেশে ফিরে আসেন। কলিকাতায় তাঁর সেই পুরাতন প্রিয় বাগানবাড়ীতে তরু জীবনের শেষ চারিটি বৎসর অতিবাহিত করেন। এইখানে তিনি সঙ্গোপনে স্বপ্নালু মনে তাঁর কল্পনার বিন্যাস ও বিস্তার করেছিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নে নিবিড় মনোযোগ দেন।

কিন্তু তরু শুধু পড়াশুনা করেই ক্ষান্ত হলেন না—তিনি নিজ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারার প্রকাশের জন্য লেখনী গ্রহণ করলেন এবং ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে বিদেশী ইংরাজী ও ফরাসীভাষা গ্রহণ করলেন। তাঁর রচনা পড়ে মনে হলো তিনি যেন লেখ্‌বার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। কর্ণের যেমন সহজাত কবচকুণ্ডল ছিল, তরুর তেমনি ছিল লেখনী।

তাঁর হাতে ফরাসী রোম্যান্টিক কবিতা ইংরাজী কবিতাতে রূপান্তরিত হয়ে তদানীন্তন বিখ্যাত পত্রিকা 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হতে লাগ্‌লো। এই কবিতাগুলির সঙ্গে আরো কতগুলি কবিতা গ্রথিত করে তাঁর প্রথম কবিতার বই "A sheaf Gleaned in French Fields" প্রকাশিত হলো ১৮৭৬ সালে ভবানীপুরের সাপ্তাহিকসংবাদ প্রেস থেকে। তরুর জীবিতকালে তাঁর রচিত আর কোন বই প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং তাঁর খ্যাতিকে অনায়াসে "Posthumous" আখ্যা দেওয়া চলে। তরুর এই কবিতাগুচ্ছ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঁচা হাতের লেখা বটে, কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর প্রতিভার সাম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর রচনার দুর্বলতা ও সরলতার অত্যাশ্চর্য্য সংমিশ্রণ লক্ষিত হয় এবং তাঁর এই প্রথম রচনায় তাঁর প্রতিভা কেমন করে অনভিজ্ঞতা হেতু পূর্ণ স্ফুরণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তারও পরিচয় পাই। মাঝে মাঝে তাঁর ইংরাজী ছন্দ অনবদ্য হয়ে উঠেছে, আবার মাঝে মাঝে দেখা যায় তিনি ইংরাজী ছন্দের মূলসূত্রগুলিও মেনে চলেন নি। কিন্তু তবুও এই বইয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর যে-কাব্যগুণের সংস্পর্শে আসি তা অসামান্য। এই কবিতাগুচ্ছটি ইংলণ্ডে প্রথমে বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি—ফ্রান্সে বরং এর কিছু সমাদর ঘটেছিল। সমগ্র ইয়োরোপে মাত্র দুজন সমালোচক এইখানির সমালোচনা করেছিলেন: একজন হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক স্যার এড্‌মণ্ড্ গস্ (Sir Edmund Gosse) ও অপরজন খ্যাতনামা ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক Andre Theuriet. ফরাসী লেখকটি "Rivue des Deux mondes" নামক পত্রিকাতে বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বইখানি বড় অদ্ভুতভাবে স্যার এড্‌মণ্ডের নজরে পড়ে। ১৮৭৬ সালে আগষ্ট মাসে একদিন তিনি বিলাতের "The Examiner" নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক মিণ্টোর কাছে বসে সেই সময়ে সমালোচনার যোগ্য ভালো বই প্রকাশিত না-হওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন, এমন সময়ে পোষ্টম্যান একটা পাতলা মোড়কে অতি সাধারণ কমলারঙের একটা কবিতাপুস্তিকা দিয়ে গেল। বইয়ের উপর লেখা—"A Sheaf gleaned in French Fields, by Toru Dutt" হয়ত বইখানা ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে আশ্রয়লাভ করতো, কিন্তু অধ্যাপক মিণ্টো সেটা স্যার এড্‌মণ্ডের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"দেখুন, এর মধ্যে কিছু পান কি না।" স্যার এড্‌মণ্ড প্রথমে বইখানি নিতে চাননি, কিন্তু পরে যেখানা খুলে তাঁর চোখে পড়ে গেল এই পংক্তিগুলি :—

Still barred thy doors ! The far east glows,
The morning wind blows fresh and free,
Should not the hour that wakes the rose
Awaken also thee ?
All look for thee, love, light, and song,
Light in the sky deep, red above,
Song, in the look of pinions strong,
And in my heart. true love.
Apart we miss our nature's goal,
Why strive to cheat our destinies ?
Was not my love made for thy soul ?
Thy beauty for mine eyes ?
No longer Sleep
Oh, listen now !
I wait and weep,
But where art thou ?

এই পংক্তিগুলি পড়ে তিনি চমৎকৃত হয়েগেলেন এবং তরু দত্তের কবিতার যোগ্য সমালোচনা করে তাঁকে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন—যেমন করেছিলেন ম্যাথু আর্নল্ড, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থকে।

তরুর প্রথম রচনা হচ্ছে Lelonte de lisle নামক ফরাসী কবির সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত সমালোচনা। এই রচনাটি বেঙ্গল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে তিনি Josephin soulary নামক আর একজন ফরাসী লেখকের সমালোচনা করেন। এই সময়ে, ১৮৭৪ সালে জুলাই মাসে তাঁর দিদি, একমাত্র সাথী অরু কুড়ি বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তরুর মত অরুর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল না কিন্তু ডিজাইন আঁকায় অরুর খুব দক্ষতা ছিল। তরুর লিখিত "mlle. D' Arvers" নামক ফরাসী রোম্যান্স-খানি অরুর চিত্রিত করার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় যে অরু এই বইখানির একটি পৃষ্ঠাও দেখে যেতে পারেননি।

১৮৭৪ সালে জুন, জুলাই মাসে তরু বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ফরাসী আইন পরিষদে ভিক্টর হিউগো ও Thiers এর বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। "A sheaf gleaned in French fields" প্রকাশিত হবার পর ১৮৭৭ সালের প্রথমভাগে প্রসিদ্ধা ফরাসী Orientalist mlle. Clarisse Baderএর সহিত তাঁর পত্রালাপ সুরু হয়। এই আলাপ অত্যন্ত গভীর হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, কারণ মৃত্যু তরুকে অকালে হরণ করেছিল। ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে তরু যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন। তারপর একদিন ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট আমাদের এই প্রিয় কবিটী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স তখন হয়েছিল ২১ বৎসর, ৬ মাস, ২৬দিন।

তরুর পিতা শোকে মুহ্যমান্ হয়ে পড়্‌লেন। তাঁর শোক প্রশমিত হওয়ার পর তিনি তরুর কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে তরুর অনেক অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পান। প্রথমে ফরাসী-কবি Comte de Grammontএর সনেটের ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ একটি স্থানীয় পত্রিকাতে প্রকাশিত হলো, তারপর আর একটি পত্রিকার একটি

ইংরাজী গদ্যের অংশ প্রকাশিত হলো। এর পর গোবিন্দচন্দ্র আবিষ্কার করলেন একটি ফরাসী রোমান্স—Le Journal de mlle, D' Arvers—এইখানি mele. Clarisse Bader এর ভূমিকা সংলগ্ন হয়ে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী থেকে প্রকাশিত হলো। বইখানি লর্ড লিটনকে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এই বইটির মধ্যে তিনি আধুনিক ফরাসী সমাজের আলেখ্য দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। এর গল্পটি সরল, কিন্তু সুষ্ঠু প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে এটি মনোমুগ্ধকর হয়েছে। চরিত্রচিত্রণের মধ্যে অবশ্য ফরাসী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু চরিত্রগুলি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। বইখানির হিরোর চরিত্র ভারতীয় চরিত্রের অনুযায়ী হয়েছে। সাহিত্যবিচারে বইখানি অশেষ প্রশংসা দাবী করে। দুটি ভ্রাতার একটি সুন্দরী মেয়ের প্রতি অসীম অনুরাগ ও পরিণামে ভ্রাতৃহত্যা ও উন্মত্ততা—এই কাহিনী অত্যন্ত করুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তরু কোন স্থলেই ভাবাবেশের ফলে melodramatic বা কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েননি, বরং তাঁর ভাবের ঐক্য, সংযত ও বলিষ্ঠ লেখনীর গুণে এই করুণকাহিনীটি প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে। ফরাসী সমালোচক madame de saffray ও James Darmesteter এই বইখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন ও Darmesteter তাঁর Essais এর মধ্যে এর সমালোচনাকে স্থান দিয়েছিলেন।

তরুর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে Ancient Ballads and Legends of Hindustan—তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৮৮২ সালে লণ্ডন হতে এটি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যজগতে এই কবিতাগুলির সৌরভ কখনো ম্লান হবে না। শুধু এইগুলির সাহায্যেই তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। এই বইয়ের মধ্যে তিনি ইংরাজী পাঠকের রসাস্বাদনের জন্য ভারতীয় ক্লাসিকাল গল্পকে কবিতার রূপ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে অবশ্য অন্য কবিতাও আছে। আমাদের গর্বের বিষয় যে ভারত হতেই তরু তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। পুরাকালের চারণের মত কবি এই কবিতাগুলি সহজ, অনাড়ম্বর ভাবে গেয়ে গেছেন। হিন্দুধর্মের একটা সরল পবিত্র ভাব ও গাম্ভীর্য কবিতাগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কবিতাগুলির রচনারীতি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সামান্য রুক্ষতা সত্ত্বেও তিনি ইংরাজী ছন্দকে নিজস্ব করে নিতে চলেছিলেন। কতকগুলি কবিতা ছন্দমাধুর্যে মধুর হয়ে উঠেছে ও এত অল্প সময়ে ইংরাজী শেখা কোন বিদেশিনী কবির রচনা বলে বিবেচিত হবার কোন চিহ্নই তার মধ্যে পাওয়া যায় না। কতকগুলিতে হয়ত এই ছন্দমাধুর্যের অভাব ঘটতে পারে, কিন্তু যদি আমরা স্মরণ রাখি তিনি ইংরাজী অপেক্ষা ফরাসীই ভাল জানতেন ও আধুনিক ইংরাজীর প্রচলিত শব্দমালার সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না—তাহলে আমরা তাঁর কবিতার দোষের জন্য রূঢ় সমালোচক না হয়ে তাঁর কৃতিত্বের জন্য জয়গানই করবো। এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি সনেট আছে—সেগুলি অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর একটি কবিতা "Our Casuarina Tree" বর্ণনাচাতুর্যে, কল্পনার বিন্যাসে ও সুরের ঝঙ্কারে আমাদের মুগ্ধ করে।

তরুর প্রতিভার যখন পূর্ণবিকাশ হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে তাঁর অকালমৃত্যুতে আমরা একজন প্রতিভাময়ী কবিকে হারিয়েছি। উত্তর জীবনে তিনি কি হতে পারতেন সে-আলোচনা না করে, তিনি তাঁর স্বল্পজীবনে যা করে গেছেন সেইটুকুর যোগ্য সমাদর করলেই তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

পঙ্গু ভ্যাণ্ডার

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-এ

জংসন ষ্টেশন নবগাঁ।

শীতের সকাল। খুলনার গাড়ী আজ একেবারে রাইট টাইম। খাবারের বাক্স ঘাড়ে করিয়া পিতলের বালতি হাতে ঝুলাইয়া পঙ্গু আগাইয়া চলে। হুস্ হুস্ শব্দে সারাষ্টেশন কাঁপাইয়া গাড়ী প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়ায়।

নবগাঁ ষ্টেশন সহসা ঘুম হইতে জাগে। ৭টা ২০মিনিটে আর একটি দিন সুরু হয়।

চা গরম—

সিগরেট—বিঁড়ি পান—

খাবার—গরম—

এঃ রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া গলাটা ধরিয়া গিয়াছে। পঙ্গু ভাঙ্গা গলায় হাঁকিয়া যায়।

সিঙ্গাড়া—গরম সিঙ্গাড়া—সন্দেশ—

বিচিত্র কলরবে ষ্টেশন মুখর হইয়া ওঠে। গাড়ীর অর্দ্ধেকটা [illegible]ইয়া পঙ্গুর মনে হয়, কত বড় গাড়ী।

খাবার—সিঙ্গাড়া গরম—

এই খাবার এদিকে—

পঙ্গু থমকিয়া দাঁড়ায়। বাক্স বালতি নামাইয়া ডালা খুলিয়া ধরে। টুপিটা মাথায় একটু চাপিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করে, বলুন স্যার কি দেবো?

আছে কি?

সিঙ্গাড়া খান—কাঁচাগোল্লা—রসগোল্লা খান—

পান্তুয়া, ছানার জিলিপি—

কই দেখি সিংগাড়া চারখানি—

পাশের গাড়ীর একটি ছোট ছেলের ওদিকে ডাকিতে ডাকিতে গলা পড়িয়া গেল।

ও সিংআলা—ও সিংআলা—

কই গো খোকাবাবু খাবে কি?

খোকার মা আগাইয়া আসেন।

অ খাবারালা—খোকাকে সিংগারা দাও তো দুটি—

সিঙ্গাড়া ভাল হবে না মা। ঠোঙায় দুটি রসগোল্লা তুলিয়া পঙ্গু খোকার হাতে দেয়। ছোট ছেলেটিকে বাসি সিঙ্গাড়া খাওয়াইতে বাধে। পয়সা লইয়া পঙ্গু দৌড়ায়।

যাঃ খোকাকে সিঙ্গাড়া না দিয়াই লোকটা পলাইল।

ও সিংআলা—সিংআলা—

এক যায়গায় পঙ্গুর পাঁচ আনা বিক্রয় হইয়া গেল।

বেশ ভদ্রলোক। পাশের গাড়ীতে একটি মেয়ে ডাকে। ও খাবারালা—লক্ষীটি—পাশের গাড়ীতে কও কি—মহাদেব কাঁদে —খাবার খাবে—

এত বড় গাড়ীতে কি আর যায়গা নাই। পঞ্চু এক যায়গায় সবেমাত্র বাক্স নামাইয়াছে, কোথায় ছিল গোষ্ঠ ছুটিয়া আসে।

গরম—সন্দেশ—দেখে খাবেন বাবু—বড় সন্দেশ—

প্রতিদিন গোষ্ঠর এই কাজ। খদ্দের ভাঙ্গানো। অন্ত কেহ হইলে এতক্ষণ চটাচটি হইয়া যাইত। পঞ্চু কেবল গোষ্ঠর প্রবৃত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

সন্দেশের সাইজ বড় দেখিয়া বাবুর মাথা ঘুরিয়া যাইবারই কথা। কিন্তু পাঁচসিকে সেরের সন্দেশের চার পয়সার সাইজে অত বড় এক দলা আসে কোথা হইতে, বাবুর অত ভাবিয়া দেখিবার সময় নাই। হাটখোলার ননি ময়রার পচা সন্দেশ গোষ্ঠ প্রতিদিন কি পরিমাণে ভেজাল চালায় তাহা পঞ্চুর জানিতে বাকি নাই।

খাবার—খাবার চাই—চাই খাবার—

আরও মিনিট পাঁচেক পরে গাড়ী ছাড়ে।

জাল জুয়াচুরি। পঞ্চু কত দেখিল, কই বড়লোক হইল কে? সেই দারিদ্র্য ঘোচেনা। গোষ্ঠ বলিয়া নয়, কাহারও মনের কথা জানিতে পঞ্চুর বাকি নাই। ব্যবসা করিতে বসিয়া জাল জুয়াচুরি যেন না করিয়া উপায় নাই।

বিক্রীর অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে সন্দেহ নাই—এই সকালের গাড়ীতেই একদিন দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে। মহাজনের মাল কমিশনের উপর বিক্রী বৈ ত নয়, এবার খোরাকি ঘর ভাড়া বাদে মাসের শেষে কটি টাকা থাকে বলা কঠিন। তাহা ছাড়া—

বেয়াই—

বাক্স বালতি নামাইতে পারে নাই পঞ্চু, পিছনে পরেশ আসিয়া ডাকিল।

বেয়াই গো—পরেশ হাসি থামাইতে পারেনা।

খবর কি বেয়াই—হাস কেন?

হাসি থামাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া পরেশ এবার হাসিতে ফাটিয়া পড়ে।

হে-হে-হে-হে—

হাসো তুমি বেয়াই, কাজ আছে আমার।

ছেঁড়া একটুকরা মাদুর বিছাইয়া পঞ্চু বাক্স বালতি নামাইয়া বসিয়া পড়ে। আয়ের তো এই অবস্থা, এদিকে খাটিবার ক্ষমতাও দিন দিন যেন কমিয়া যাইতেছে। বিক্রী কম হইলে শুধু দৌড়িয়া মরিতে হয়। বয়স অবশ্য বাড়িতেছে, কিন্তু ৪০।৪২ বছর আর এমন কি বেশী। আসলে খাওয়া দাওয়া—

—খাবে কি খাও গো বেয়াই।

পরেশ এবার হাসি থামাইয়া আসিয়াছে—

—কেন, হয়েছে কি বেয়াই?

মাদুরের এক কোণে বসিয়া পড়িয়া পঞ্চুর মুখের কাছে মুখ লইয়া যায় পরেশ।

—তোমার বেয়ানের খোকা হয়েছে।

—বটে। এমন খবর ভোর বেলা?

—নায়েব মশাই গেলেন কিনা এই গাড়ীতে—

পরেশ উঠিয়া দাঁড়ায়। হাসিতে হাসিতে কোটের গলার বোতামটা আঁটিয়া দেয়।

—খরচ বাড়লো বেয়াই। বেয়ানের সেই আংটিটা?

—মনে আছে গো। কেমন ফাঁদে ফেলেছে দেখ্ছ—ভারি সেয়ানা—

পঞ্চুর চোখ এড়ায় না। পরেশের মুখের হাসি যেন মার খাইয়া গেল।

ফাঁদই বটে। ছেলের কাঙাল পরেশ। চার মেয়ে পরপর। একটি ছেলে হবে না পরেশের? পরেশের কতকালের অশান্তির সমাপ্তি হোলো।

ফাঁদই বটে। সেই যে মেয়েটি কত কষ্ট দুঃখ সহিয়া স্বর্গের কত দেবতাকে সাধিয়া পরেশকে এমন রত্ন আনিয়া দিল, পরেশ কি দামে সে রত্ন কিনিবে? কি, দাম পরেশ দিতে পারেনা?

সব দিতে পারে পরেশ। কিন্তু সেই যে একদিন বেয়ানের আঙুলগুলি হাতের ভিতর লইয়া একটি আংটি দিতে চাহিয়াছিল পরেশ। আপাততঃ সেটি দিতে হয়। ফাঁদই বটে।

পরেশ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

বড়খোকা কালিপদ যেবার হয়, পঞ্চু তখন পলাশগঞ্জে সাহাদের পাটের গুদামে কাজ করে।

কোথা হইতে কোথায় আসিল। জোর করিয়া বাড়ীর কথা ভুলিয়া থাকে পঞ্চু, অথচ আজ সহসা এমনি অসময়ে সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া পঞ্চুর মনের দরজায় ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। যশোদা, কালিপদ, মায়া, ভোঁদড়, টুনি, ছোটখোকা।

এখন অবশ্য যশোদা অপেক্ষা ছেলেমেয়েদের কথাই বেশী মনে পড়িয়া যায়। ভোঁদড়কে ভুলিয়া থাকা কঠিন।

পঞ্চুর বাড়ী যাইবার কথা পূর্বে চিঠি পত্র দিয়া জানানো থাকিলে ভোঁদড়ের সহিত গয়লাদের বাগানের পথেই দেখা হইয়া যাইবার কথা। পঞ্চু দূর হইতে দেখিতে পায়, বেঁটে-খাটো মানুষটি ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছে।

খালি পায়ে এক হাঁটু ধুলা মাখিয়া ভোঁদড় পঞ্চুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।

—বাবা তুমি এই গাড়ীতে এলে ত? আমি জানি।

—তুমি আর এতদূর কেন এলে বাবা?

—বাঘ বেরিয়েছে। পুঁটেদা দেখেছে কাল। দুই হাত যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিয়া গত রাত্রের বাঘটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্বন্ধে পিতার কিছু ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করে ভোঁদড়।

মাথায় পর্য্যন্ত ধুলো। চুলগুলি ঝাড়িয়া দেয় পঞ্চু।

—বাবা

—কি

—দিদির চুড়ি ভেঙ্গে গিয়েছে—আমার দোষ নেই—আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন?

ক্ষেতের আল বহিয়া চলে পঞ্চু ও ভোঁদড়। দুইদিকে ফসল—আখ, সরিষা, মটর অড়রের ক্ষেত।

—বাবা দাঁড়াও, আখ ভেঙ্গে আনি—

খান দুই আখ লইয়া পঞ্চুর আগে আগে চলে ভোঁদড়।

—করিমের ক্ষেতের আখ ভয়ানক মিষ্টি। বাবা তুমি একখানা খাও।

—বাবা, মা রাত্রে রাঁধে না। বলে, কড়কড়ে খা। দাদা হাটে যেতে চায় না। দাদা শুধু খাবে আর ডাং গুলি খেলবে। মা খুব মারে দাদাকে।

অনেকদিন পর গাঁয়ের পথে চলিতে চলিতে পঞ্চু নানা স্মৃতিতে উদাসীন হইয়া যায়, ভোঁদড়ের সব কথা কাণে যায় না।

ভোঁদড় আপন মনে বলিয়া যায়। আর মা দিদি শুধু আমড়া খায়। আর টুনির জর হয়। সীতে ঘোষ আবার মার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিল। খোকা আমার স্লেট ভেঙ্গে দিয়েছে।

আট দশ জন ভ্যাণ্ডার মিলিয়া রাঁধিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে। রাত্রে রাঁধিতে বসিয়া একএকদিন যশোদার কথা মনে পড়িয়া যায়।

পাঁচ সাত বছর আগে রতনপুরে কাজ করিবার সময় যেমন করিয়া মনে পড়িত তেমন নয় বটে। অদ্ভুত স্বভাব যশোদার।

এক একদিন বাড়ী গিয়া পঞ্চু বলিত: তোমাকে দিন রাত এত খাটতে হয়, আজ আমি রাঁধব।

উত্তর দিতে যশোদার দেরী হয় না: বেশ ত, আমি খাটের ওপর পা মেলে একটু ঘুমোই গে—বলিতে বলিতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত যশোদা।

বাধা দিত না পঞ্চু। হাসিলে এমন সুন্দর দেখায় যশোদাকে। টানা টানা বড় দুটি চোখের উপরে কালো একটি টিপ। যশোদা টিপ পরিতে ভুলিত না কোনও দিন। কাজের সময় আঁচল কোমরে জড়ানো, চুলের রাশ শক্ত করিয়া টানিয়া বাঁধা। হাসিলে এমন সুন্দর দেখায়।

আনন্দ ডাকিয়া যায়। খোলা চেপেছে পঞ্চুদা—লক্ষ্মীপুর প্যাসেঞ্জার লেট।

বাসি সিঙ্গাড়াগুলি একবার নতুন খোলায় ভাজিয়া লওয়া দরকার। শিবু, মন্মথ, নিতাই, হরেকেষ্ট উঠিয়া পড়ে।

যশোদা ঠিক ধরিয়া ফেলিত।

—অত দেখ কি হা করে, আমি নাকি বিয়ের ক'নে?

সেই উচ্ছ্বসিত হাসি। পঞ্চুর অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসে যশোদা।

বিয়ের ক'নে নয় বটে। কথাটা আর কাহাকেও বলিবার মত নয়, কিন্তু সেই যে কত বৎসর আগে চপল প্রকৃতির একটী মেয়ের সহিত পঞ্চুর প্রথম পরিচয়, তাহার পর কত দিন গেল, পঞ্চু যশোদাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারিল না। স্বভাব। স্বভাবের উপর মানুষের হাত আছে নাকি? চপল স্বভাব যশোদার। কিন্তু পঞ্চু ছাড়া সকলে ভুল বোঝে, চপলতাকে বেহায়াপনা বলিয়া ভুল করে।

যশোদা হাসে, দিনরাত হাসে। গান গায়। ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া বা ভাত চাপাইয়া দিয়া পুরাণো কত গানের সুন্দর দু'এক কলি গাহিয়া যায়।

হাসা, গান গাওয়া খারাপ কি? কিন্তু ঘরের বউ যশোদা। পাড়াগাঁ। দুর্নাম রটে যশোদার। পঞ্চু কানে আঙুল দেয়, দুঃখ পায়। যশোদার কানে আসে না এমন নয়, সে হাসে। হাতের কাছে আর কিছু না পাইলে ভোঁদড়কে রাগাইয়া প্রাণ ভরিয়া হাসে। অথবা উঠানে দাঁড়াইয়া গান ধরে—আমার একি হোলো গো সই। লোকে বোঝে না, ভুল করে।

ভুল করে, যশোদাকে শাসন করিয়া ফল হয় না। শিশুর মত সরল, অকপট, অসন্দিগ্ধ তাহার মন। সে মনে ব্যথা দিতে পঞ্চু পারে না। তাছাড়া যশোদা সম্বন্ধে কোনও কথা সে বিশ্বাস করে না। পঞ্চু ঘরে থাকে কতদিন? যশোদা তেমন হইলে পঞ্চুর সংসার আজ উৎসন্ন যাইত না? তিনখানা ঘর বাঁধিয়াছে সে, পাশে আরও একটু জমি কিনিয়াছে। যশোদার গলায় হার, হাতে চুড়ি। হিংসুটে লোকের চোখ টাটায়। পঞ্চুর চিনিতে বাকি নাই কাহাকেও, এই তিলতলায় তাহার জন্ম।

ঢং ঢং-ঢং-ঢং—লক্ষ্মীপুর প্যাসেঞ্জারের ঘণ্টা হইয়া গেল।

কত শত চিন্তা একটার পর একটা আসে। পঞ্চুর রাঁধিতে যাওয়া হয় না। হাত পা মেলিয়া যশোদা বসিয়া পড়ে। 'কই গো রানতে যাবে না?'

সহসা উঠিয়া পঞ্চুর মুখের কাছে মুখ লইয়া যাইত।—'হ্যাঁ গা অত ভাবো কি?' সেই উচ্ছ্বসিত হাসি। হাসিতে হাসিতে পঞ্চুর কোলে এলাইয়া পড়িত।

এঃ গাড়ী একেবারে প্লাটফর্মের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বালতিতে জল ফুরাইয়াছে—আবার টিউবওয়েলে দৌড়াইতে হইবে।

—খাবার—গরম—

এ ট্রেনটাতে ভালই বিক্রী হয়। অনেকদূর হইতে রাত জাগিয়া আসিয়া সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়ে, খাবারের ভালমন্দ বিচারের অবস্থা থাকে না। তবু বাসি সিঙ্গাড়াগুলি হাতে তুলিয়া দিতে পঞ্চুর ভয়ানক সঙ্কোচ হয়। উপায় নাই। মহাজন লোকসান দিতে রাজি নয়।

এই ট্রেনের পর আবার সেই দুপুরে কলকাতার গাড়ী। মাঝে কয়েকখানা লোকাল—সামান্য কিছু বিক্রী হয়।

বালতি গেলাস মাজা হয় নাই তিনদিন। মাল আনিতে হইবে সামান্য কিছু—সেরখানেক রসগোল্লা—গরম সিঙ্গাড়া গণ্ডা পাঁচেক। বাজারের দিকেও একবার যাওয়ার দরকার—গামছা একখানা না কিনলে নয়—ভোঁদড়ের একটা গরম জামা, কালিপদ কি একখানা বই কিনিতে লিখিয়াছে—নিতাই যদি বাড়ী যায়—

অমন হন্ হন্ করে যাস কোথা শিশির?

এই যে পঞ্চুদা—তুমি বিচার কর—

হোলো কি?

আজ কার পালা? মন্মথদার কিনা?

হ্যাঁ—বুধবারে মন্মথ।

বুঝলে পঞ্চুদা, রাঁধবার নামে সবারই শরীর খারাপ হয়—বলি আমি ছাড়া আর লোক নেই?

পঞ্চু মীমাংসা করিয়া দেয়। বেয়াই রাঁধবে আজ।

অন্তদিন হইলে কি হইত বলা যায় না। পরেশ আজ আর আপত্তি করে না।

—মন দিয়ে রেঁধ বেয়াই—নুনটুন বেশী না হয়—

ইঙ্গিত বুঝিতে পরেশের একটু বিলম্ব হয়। বুঝিয়া শুধু হাসে।

—ভাল কথা। বাজারে যাবে না বেয়াই?

—যাব একটু পরে।

—অমনি বন্ধু ঘোষালের দোকানে দশ হাত রঙীণ শাড়ীর দাম শুধিয়ে এস যদি—

পরেশ আজ এক যায়গায় বেশীক্ষণ বসিতে পারে না। একটা কথা পঞ্চু পরেশকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল—বেয়ানের আংটীটা কি শেষে রঙীণ শাড়িতে দাঁড়াইল? পঞ্চু মনে মনে হাসে।

ষ্টেশনে ভিঁড় বাড়িতেছে। একঘণ্টা পর পর দুটি লোকাল ছাড়িবে। পরেশ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল?

ভিজা গামছায় বাক্সের কাঁচের ডালা ভাল করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া পোঁছে পঞ্চু। পরেশের আনন্দ। আনন্দ হইবার কথাই বটে—তিন মেয়ের পর ছেলে।

—কানাই—ও কানাই—

পঞ্চুর এত নিকট দিয়া গেল, অথচ পঞ্চুর ডাক শুনিতে পায় নাই এমন ভাব। কেমন যেন একটু উপেক্ষার ভাব। অল্প বয়স—নতুন ভ্যাণ্ডারিতে লাগিয়াছে। পঞ্চুর হাসি পায়।

লক্ষ্মীপুর প্যাসেঞ্জারের দেরী নাই, পরেশ গেল কোথা? পরেশের বউ। পরেশের বড় মেয়ের সহিত কালিপদর বিবাহের কল্পনাটুকু সার্থক হইলে পরেশের বউ পঞ্চুর বেয়ান। আংটি না পাইলে বেয়ান হয়ত পরেশের উপর রাগ করিবে, না হয় অভিমান—হয়ত বা শুধু দুঃখ। একটা কিছু তাহার করাই স্বাভাবিক।

পিতলের বালতি ও দুটি গেলাস লইয়া পঞ্চু-পুকুর ঘাটে নামে। কিন্তু বেয়ান, পরেশ তোমাকে শুধু আংটিই দেবে তাতো বলেনি। হাতে চুড়ি, গলার হার দেবে বলেনি? পায়ে মল, কোমরে বিছে? তাও হয় ত দেবে বলেছিল। মিথ্যে?

বেয়ান, নবগাঁ ইষ্টিসানের খাবারওয়ালা ভ্যাণ্ডার একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে গেলে রাত্রে তোমাকে কি ব'লে আদর করবে?

পরেশের ওপর তুমি রাগ ক'রোনা, বেয়ান।

পঞ্চুর মনে হয় বেয়ান এতক্ষণে ঠিক বুঝিয়াছে। এমন করিয়া বলিলে কে না বুঝে?

কিন্তু পরেশ কি এমন করিয়া বুঝাইতে পারিবে? বেয়ান আংটিটা চাহিয়া বসিলে পরেশের চোখে হয়ত জল আসিবে।

পঞ্চুর চোখে জল আসে। পঞ্চুর অবস্থা তো পরেশের মত নয়—যশোদার কোন সাধ অপূর্ণ আছে? তবে পঞ্চু নিজের রোজগারে কতটুকু করিয়াছে? বিষয়ী বাপ বাঁচিয়া থাকিতে কিছু জমিজমা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে কোনও দিন নিতান্ত কষ্টে পড়িতে হয় নাই।

কষ্ট—নিতান্ত কষ্টে দিনকতক কাটিয়াছে বটে। পলাশগঞ্জ বাজারের পাটের আড়তের সেই কষ্টকর দিনগুলি। পাট কিনিতে এক একদিন অনেকদূর গাঁয়ে যাইতে হইল। ফিরিতে ফিরিতে বেলা গড়াইয়া যাইত। সেই অবেলায় গাঙে একটা ডুব দিয়া মনিবের বাসায় গিয়া হয়ত শুনিত ভাত নাই। তখন গদির বুড়া মুহুরি চন্দর চক্কোত্তিকে ধরিয়া কথাটা বড়বাবুর কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইহার পর ছয়টি পয়সা গাঁটে গুঁজিয়া পঞ্চু যখন গোপাল পাণ্ডার হোটেলে গিয়া বসিত তখন পুলের মুখে রাস্তার আলোটা জ্বলিয়া গিয়াছে। (আগামী মাসে সমাপ্য)

পঞ্চ সতী

শ্রীকুমারেশ রায়

২

বহু যুগ পূর্ব্বেই ঋষিগণ এই পঞ্চ সতীর কাহিনী লিখিয়া এক উদার সমাজের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। সে সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্যের, সঙ্গত স্নেহ ও ক্ষমার এবং নারীকে পুরুষের অনুরূপ অথচ যথাপ্রকৃতি অধিকার দিবার নির্দ্দেশ ছিল। সতীত্বের বিচারে আদর্শের অর্থাৎ সতীত্বের প্রধান সূত্রের সহিত মানবিকতা ও ব্যক্তিগত অধিকারের সর্ব্বাধিক সমন্বয়ে যাহা দাঁড়ায়, তাহাকেই সতীত্ব আখ্যা দিয়াছেন।

কিন্তু আজ একদিকে শুনিতে পাই নারীর উপর সমাজের কঠোর শাসনের কথা, অন্তদিকে শুনিতে পাই নারীর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার। এই অবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে এই কারণে যে—প্রকৃতপক্ষে আজ পর্য্যন্ত সমাজের কোনো অংশই অন্তরে ততখানি উদার হইতে পারেন নাই। সভ্যতার পূর্ব্ব-যুগের স্বার্থবুদ্ধি ও নারীর উপর পুরুষের একান্ত অধিকারের ধারণা এখনও সমাজের সকলের মধ্যে বর্ত্তমান। সমাজের উভয় অংশেরই সেই মজ্জাগত বিশ্বাস যে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা স্বতঃসিদ্ধ ও অপরিহার্য্য। সুতরাং সমাজের ধার্ম্মিক শ্রেণীর সিদ্ধান্ত সভ্য সমাজ রাখিতে হইলে নারীকেই একান্ত সতী হইতে হয়। অন্তদিকে এই বিশ্বাসেরই বশে প্রগতিবাদীকে, সাম্যের (equity) খাতিরে নারীকেও নিজের অনুরূপ স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার দিবার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। ইহা অবশ্যই উদারতা নহে, ইহা কেবল আপন স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার গত্যন্তরহীন উপায় মাত্র। কিন্তু সতীত্বের ধারণা তাঁহাদেরও ঠিক ধার্ম্মিক ব্যক্তিরই অনুরূপ। প্রভেদ এই মাত্র যে তাঁহারা নিজ প্রয়োজনে বলিতে চাহেন যে, সে সতীত্বের প্রয়োজন নাই। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে "ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রথাহীন" বর্ব্বর সমাজের পুনরাবর্ত্তন, ইহা তাঁহারা বুঝেন না তাহা নহে; কিন্তু নিজ স্বেচ্ছাচারিতা বজায় রাখিবার প্রয়োজনে তাঁহাদের যুক্তি অনুগামী বুদ্ধিতে ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। পৌরাণিক ঋষি পুরুষের এই অনুদার বর্ব্বর যুগের স্বার্থবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার নারী পুরুষ কাহাকেও দেন নাই পুরুষকেও নহে (প্রবন্ধের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য)। স্বেচ্ছাচারিতা বা ব্যভিচার ব্যতীত যে সকল ত্রুটী, সাময়িক বিচ্যুতি বা আদর্শ-বিচ্যুতি নারীর পক্ষে অবস্থা বিশেষে সম্ভব এবং নারীর যথাপ্রকৃতি ব্যক্তিগত অধিকার (পুরুষের অনুরূপ) এ সকলকেই তাঁহারা সতীত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে সেই অতীতের

স্বার্থবুদ্ধিজনিত সতীত্বের ধারণায়, অর্থাৎ একান্ত সতীত্বের ধারণায় আঘাত লাগে। তাই বর্ত্তমান সমাজের এক অংশ নারীর প্রতি কঠোর, অন্য অংশ পুরুষের অধিকারের ভ্রান্ত ধারণায় নারীর ব্যভিচারকেও প্রশ্রয় দিতে উদ্যত। বর্ত্তমান সমাজের পুরুষ নারীর সতীত্বের ধারণা ও স্বীয় ব্যবহার ঋষি-কল্পিত উদার এবং প্রকৃত সভ্য সমাজের উপযোগী এখনও করিতে পারেন নাই, এখনও অতীত অনুন্নত যুগের মত কেবল আপন নিকৃষ্ট স্বার্থেরই উপযোগী করিতে সচেষ্ট। তাই এত বাদানুবাদ। পুরুষ নারীকে উপেক্ষা করিবে অথচ নারীর নিকট কঠোর সংযম প্রত্যাশা করিবে, নারীর মনের চিন্তা মাত্রকেও শাসন করিবে (যাহা বিধাতারও অভিপ্রেত নহে), পুরুষকে তাহার বিবাহ-পূর্ব্ব ভ্রান্তি সত্ত্বেও সমাজে অংশ গ্রহণ করিয়া সংযত জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া চলিবে অথচ নারীকে তাহা দেওয়া যাইবে না, পুরুষের পিতৃত্বের অধিকার সর্ব্বদা থাকিবে—অথচ নারীর মাতৃত্বের অধিকার সর্ব্বদা থাকিবে না, বিপত্নীকের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অধিকার থাকিবে অথচ বিধবার, যাহার আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত, তাহার পক্ষে সে অধিকার থাকিবে না, এই সমস্ত ধারণা অন্তরে মজ্জাগতভাবে পোষণ করিয়া তাহার পরে নারীর কোন্ অধিকার পূর্ণ করিবার প্রয়োজন কেহ অনুভব করেন তাহাই প্রশ্নের বিষয়। পঞ্চ-সতীর উদাহরণের মধ্যে পুরুষের ন্যায় নারীর পক্ষে সম্ভাব্য ঐ সকল অবস্থায় এই উদার মীমাংসাগুলি ও তাহার নীতি যদি সমাজ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেন, যাহা পুরুষের অনুরূপ সমতার নীতিতে গ্রহণযোগ্য, তাহা হইলে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতার অথবা প্রগতির অকল্যাণকর ভাব বিলাসিতার কোনো প্রয়োজনই হইত না।

আর একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ধর্ষিতা নারীকে সমাজে সতী মর্য্যাদায় গ্রহণ করা যে উচিত, ন্যায় ও সহানুভূতির দিক্ দিয়া ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যাস-বাল্মীকি ইহাদের কথা কেন বলেন নাই। পঞ্চ সতীর মর্ম্ম যদি বর্ত্তমান ব্যাখ্যাই হয়, উক্ত ঋষিগণের হৃদয় যদি এতই উদার ছিল, তবে সে হৃদয়কে এরূপ নারী কেন বিচলিত করিতে পারে নাই? এ প্রশ্ন সঙ্গত।

ধর্ষিতা নারীর সম্বন্ধে ঋষিদের মতামত ছিল না, অথবা সে প্রশ্নের মীমাংসা তাঁহারা রাখিয়া যান নাই ইহা সত্য নহে। মতামত ও মীমাংসা তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, তবে প্রকারান্তরে। এরূপ নারীর উদাহরণ ঋষিগণ দেন নাই ইচ্ছা করিয়াই, দূরদর্শিতার বশে। তাঁহারা বুঝিতেন যে যদি এরূপ নারীর কথা তাঁহারা বলেন, তাহা হইলে সমাজে নারী ধর্ষণের সম্ভাবনা ও নারী ধর্ষকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। নারী ধর্ষককে প্রকারান্তরে সমাজে স্বীকার করিয়া লওয়ার বা প্রকারান্তরে উৎসাহিত করার সমূহ বিপদ্ ইহাতে আছে। সেরূপ বিপদ তাঁহারা কিছুতেই ডাকিয়া আনিতে পারেন না। তাই অত্যাচারিতা নারীকে সমাজে স্থান দেওয়ার উদাহরণ তাঁহারা দিতে পারেন নাই। সীতার চরম সতীত্ব রক্ষা প্রধানতঃ এই কারণেই করিয়াছিলেন, পূর্ণ আদর্শের মোহবশতঃ এতটা নহে। পঞ্চ সতীর মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ অত্যাচারের সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল, কিন্তু ঋষিগণ তাহা পরিহার করিয়াছেন এই কারণেই।

এই তত্ত্ববাদ কষ্ট কল্পনা নহে। কারণ এই যুগেই কিছুদিন পূর্ব্বে একবার মাতা পিতৃঘাতী ব্যক্তির এবং দলবদ্ধ নারী ধর্ষকদের কঠোরতর শাস্তি (অনিবার্য্য প্রাণদণ্ডের) বিধি করিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হয় এই কারণে যে তাহাতে মাতাপিতা হত্যার প্ররোচনা সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে এবং ধর্ষিতা নারীর দুর্বৃত্তদের হস্তে সতীত্বের উপর প্রাণ-হরণেরও আশঙ্কা আছে।

সুতরাং নারী অপহারকের অস্তিত্ব সমাজে আদৌ স্বীকার করিতে চাহেন নাই বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ ধর্ষিতা নারীকে সমাজে স্থান দিবার উদাহরণ দিয়া যান নাই। নহিলে সে উদারতার অভাব তাঁদের ছিল না। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনের গতি কিরূপ ছিল তাহা সীতা ও দ্রৌপদীর আখ্যানেই জানা যায়। রাবণ বলপূর্ব্বক সীতার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর লজ্জাশীলতার হানি করিয়াছিল। দুর্য্যোধন ও কীচক তাঁহাকে ঐরূপ অবমাননা করিয়াছিল; তাদের জীবন দিয়া সেই সকল বিশেষ পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, ইহাই ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। মাত্র নারীর শ্লীলতা ও মর্য্যাদাহানি সম্পর্কেই তাঁহারা এত সচেতন ও কঠোর ছিলেন। ইহার পরে তাঁহাদের সমাজে নারী ধর্ষকের কোনো স্থান ছিল না। তাঁহাদের সমাজে নারী স্বয়ম্বরা হইত, কিন্তু পুরুষের নারীর উপর কোনো প্রকার বলপ্রয়োগের অধিকার ছিল না।

কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ কি তেমনি কঠোরভাবে নারী অপহরণ-কারীকে বর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। ধর্ষিতা নারীর আশ্রম, তাঁহাদের সমাজে গ্রহণ করার প্রশ্ন, এ সমস্তই বর্ত্তমান সমাজের লজ্জাকর অবনতির চিহ্ন-স্বরূপ হইয়া আছে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে ইহাও স্বভাবতঃ প্রতিপন্ন হয় যে পুরুষের স্বেচ্ছাচার পৌরাণিকের মতে একান্ত নিষিদ্ধ ছিল।

তাই এই প্রশ্নই এখন মনে উঠে, তখনকার সমাজই বেশী উন্নত ছিল, না বর্ত্তমানের এই প্রগতিযুগের সমাজই অধিক উন্নত। তখনকার সমাজই নারীর অধিকার সম্বন্ধে বেশী উদার (Liberal) ছিল, না বর্ত্তমান সমাজই বেশী উদার। তখনকার সমাজই নারীর উপর বেশী সম্ভ্রমশীল (Chivalrous) ছিল, না এখনকার সমাজ। তখনকার সমাজ-গুরুদের জ্ঞান বেশী ছিল, না বর্ত্তমানের। পৌরাণিক ঋষির শিক্ষা আজিকার প্রগতির দিনেও হয়ত পথপ্রদর্শন করিতে পারে।

জানিনা পঞ্চ-সতীর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে অন্য কিছু মিলিতেও পারে। কারণ শাস্ত্র অপার এবং ব্যক্তিগত জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ইহাও জানিনা বর্ত্তমান তাৎপর্য্য, যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা অন্য কোথাও দেওয়া আছে কিনা। যদিও বা থাকে, তাহা হইলেও পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। আশাকরি কথাগুলি বাহুল্য হইবে না।

শিব

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

(২)

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, কোনো কিছুতেই অধিকার আমরা পাইনে যদি তা ত্যাগ করবার ক্ষমতা না থাকে। মনোরম সমতলভূমির সৌন্দর্য্য কি আমরা দেখতে পাই, যতক্ষণ সেই সমতলকে ত্যাগ করে পাহাড়ের চূড়ায় না উঠি? সম্পত্তিতে আমার কখন অধিকার?—যখন তাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করবার ক্ষমতা ধরি, যখন তাকে দানবিক্রয় করতে পারি। যে-শিশু মাতৃগর্ভে, সে কি মাকে চেনে? যখনি মায়ের সঙ্গে তার নাড়ীর বন্ধন কেটে যায়; যখন সে মায়ের দেহকে ত্যাগ ক'রে আসে তখনি সে মাকে চেনে। তেমনি কাজের বেলায়। কর্মফলে আসক্তি, কর্মফলের আশা আকাঙ্ক্ষা যেমন ত্যাগ করি, অমনি জন্মায় কর্মে অধিকার।

মানুষ জানুক বা না জানুক, মানুক বা না মানুক, এই পৃথিবীতে ভগবান এক সুবিপুল মঙ্গলযজ্ঞচক্র প্রবর্ত্তিত করেছেন, সমস্ত কর্মই সেই অক্ষর ব্রহ্ম হ'তে সমুদ্ভূত, ব্রহ্ম নিত্য সেই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। যিনি এই ব্রহ্মপ্রবর্ত্তিত মঙ্গলযজ্ঞচক্রের অনুবর্ত্তী না হন, তিনি ব্যর্থ জীবন-যাপন করেন, তিনি শুধু ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত, তিনি পাপাত্মা—অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।

ব্রহ্মপ্রবর্ত্তিত মঙ্গলচক্র,—এ কি শুধু কথার কথা, এ কি শুধু কবির কল্পনা? একবার চিন্তা ক'রে দেখ, কত বড় মঙ্গলযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে এই পৃথিবীতে, এই মানবজাতির প্রথম যাত্রার সূচনা থেকে। যখন সে জঙ্গলে থাকত, তার আচ্ছাদন ছিল না, ভাষা ছিল না, সমাজ ছিল না, যখন সে ছিল পশুভয়ে সশঙ্কিত,—তখনো কে তাকে প্রেরণা দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, কে তাকে ভেঙে পড়তে দেয় নি?—এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং,—ব্রহ্মপ্রবর্ত্তিত এই মঙ্গলযজ্ঞচক্র। তাঁরই প্রেরণায় মস্তিষ্ক সঞ্চালন ক'রে সে করল নানা অস্ত্রের আবিষ্কার, অগ্নিপ্রজ্বলন আবিষ্কার, ভাষা আবিষ্কার। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল তার সমাজ, তার প্রাধান্য, তার সভ্যতা। সমস্ত ইতর প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন ক'রে সে ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হল। আগে আগে সে বিদ্যুৎ দেখলে ভয় পেত, আগুন দেখলে ভয় পেত, অন্ধকারে ভয় পেত। ক্রমে সে অগ্নিকে তার নানা কাজে নিয়োজিত করলে, বিদ্যুৎকে আজ্ঞাবহ করলে, অন্ধকারকে নির্বাসিত করলে। কে মানুষকে এসবে প্রেরণা দিল?—এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং। ক্রমে মানুষের মৃত্যুভয় ভেঙে গেল, বহুর মধ্যে সে একের সন্ধান পেলে, যে "একঃ" বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং—যিনি বৃক্ষের মতো আকাশে স্তব্ধ হয়ে আছেন সেই এক, সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্তই পরিপূর্ণ—যখন মানুষ উদাত্তকণ্ঠে বলতে পারল, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
> মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

—অন্ধকারের পারে স্থিত সেই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জেনেছি, যাঁরা একে জানেন, তাঁরা মৃত্যুহীন হন—

তখন কে তাকে যেদিন চরমতম সত্য উপলব্ধির পথে চালিত করেছিল, কে তার চোখের ঠুলি ফেলে অপূর্ব আলোকের জ্যোতিতে তার চোখদুটিকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল?—এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং। এমনি করে মঙ্গলযজ্ঞ চলেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ,—আজও সে-যজ্ঞ শেষ হয় নি।

কিন্তু এত যুগযুগান্তর চলে গেল, তবুও তো কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হল না! মানুষের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাই অনেকে আজ সন্দিহান। তাঁরা বলেন, মানুষ ওপরে ওপরে সভ্য হয়েছে বটে, জ্ঞানী হয়েছে বটে, তবুও আজ তার ভেলভেটের দস্তানার আড়ালে তার বন্য বর্বর তীক্ষ্ণ নখর আছে লুকিয়ে। আগেকার দিনের অস্ত্রগুলো ছিল স্থূল, কর্কশ, আদিম। পাথর ছুঁড়ে মারত, তীর ছুঁড়ে মারত, হেঁটয় কাঁটা মাথায় কাঁটা দিয়ে পুঁতত। তাতে কতই বা ক্ষতি হত! আজ তার একটি মুহূর্ত্তের উৎপাতে একটা গোটা সহর ধূলিসাৎ হয়ে যায়, একটা বিরাট বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। তা ছাড়া সামাজিক জীবনে মানুষ পরস্পরের প্রতি যে অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করে,—সেগুলো আরো সূক্ষ্ম, আরো ধারালো। তাকে আর জ্বালা বলে ভয় হয় না, মালা বলে ভুল হয়! তার কলহের ভাষা আগে ছিল স্পষ্ট, অশ্লীল, উগ্র, প্রখর, কটু। আজও কলহ আছে, হিংসা আছে, তবে তার ভাষা এমন স্নিগ্ধ, এমন সুসভ্য, এমন মার্জিত, যে প্রথম অনুভবে তাকে আদর বলে ভুল হয়! নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার,—সেও প্রায় তেমনি আছে, প্রভেদটা শুধু বাইরের। গুহাবাসী মানুষ আগের দিনে তার লগুড় দিয়ে তার মোটা-মোটা হাড়ের রসদ, আর তারি সামিল তার নারীদের দখলে রাখত। আজ লগুড় নেই, আইন আছে। আজও পুরুষ মুখে যতই উদারতা প্রকাশ করুক না কেন, অন্তরে অন্তরে নারীকে তার নিজের বিষয় সম্পত্তির সামিল বলেই মনে করে। যখনই নারীর অধিকার সামান্য একটু বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব হয় ব্যবস্থাপক সভায়, অমনি দলবদ্ধ পুরুষ তেড়ে আসে,—লগুড় হস্তে নয়, কেননা মানুষ যে একটু সভ্য হয়েছে,—শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে।

মানুষ চেয়েছিল বিরোধকে দূর ক'রে দিতে, বিদ্বেষ মুছে ফেলতে, কলহ, মনোমালিন্য নিশ্চিহ্ন ক'রে ধুয়ে ফেলে সর্বমানুষের মনে ভ্রাতৃপ্রেম জাগাতে। খৃষ্ট এই প্রেমের জন্যে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ছেড়ে বনবাসী পথবাসী হয়েছিলেন, কত সাধক, কত মহাপুরুষ কত যে ত্যাগস্বীকার করেছেন তার আর শেষ নেই। আজও দেশে দেশে, সমাজে সমাজে কত যে মহাপ্রাণ, কত যে মহাপুরুষ এসে দেখা দিচ্ছেন, তার সংখ্যা নেই,—তবু বিদ্বেষ তো গেল না, তবু প্রেম তো জাগল না!

তবু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হলে চলবে না। নৈরাশ্য যদি মনকে এমনি ক'রে অধিকার ক'রে বসে, তাহলে তো মৃত্যুর কাছে, ধ্বংসের কাছে হার স্বীকার করা হ'ল। তাহলে কে আর করবে দুঃখমোচন, কে মোছাবে শোকের অশ্রু! তাহলে আর আনন্দ কোথায়! বলিষ্ঠ মন এ সংশয়কে, এ নৈরাশ্যকে দূর ক'রে দেয়, সে তার ধ্যাননেত্রে সমগ্র বিশ্বচরাচরে এক অতন্দ্রিত আনন্দকে হিল্লোলিত হ'তে দেখে, সে বলে—

> কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ।
> যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ॥

—কেই বা শরীর চেষ্টা করত, কেই বা জীবিত থাকত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকত? সে উপলব্ধি করে—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

—এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবগণ উপভোগ করছে।

সে জানে, নৈরাশ্য নয়, আনন্দময়, সমস্তই আনন্দময়। আনন্দ হতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মায়, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই তারা জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই এরা গমন করে, প্রবেশ করে,—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আমরা অধৈর্য্যের দ্বারা যেন নৈরাশ্যকে বহন ক'রে না আনি। আমরা যেন ভুলে না যাই এই জড় পৃথিবীকে এমন মনোরম ক'রে তুলতে স্বয়ং স্রষ্টার কত কোটি কোটি বৎসর লেগেছিল। কত যুগ গেল পৃথিবীকে শীতল হতে, তারপর বাতাস হল, জল হল, মাটি হল, মেঘ হল,—সেও কত কোটি কোটি বৎসরের ঘটনা। তারও কত শত যুগ পরে হল মানুষের আবির্ভাব। স্বয়ং বিধাতার যদি এত দীর্ঘ সময় লেগে থাকে পৃথিবীকে মনোরম করে তুলতে, মানুষের মঙ্গলযজ্ঞ কি এত সহজেই সমাপ্ত হবার?

তাই মানুষ আজও তার স্বাধীনতার স্বর্গ এ পৃথিবীতে গড়ে তুলতে পারল না, এখনো অনেক পথই তার রয়েছে বাকি। কত মতবাদ, কত বাদ-বিসম্বাদ মানুষকে টেনে এনেছে তার আত্মবিস্মৃতির আরামের কোটর থেকে সুবিপুল কর্মক্ষেত্রে,—কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত হয়ে গেছে, তবেই না মানুষের ক্রমোন্নতির এক অধ্যায় হতে আর এক অধ্যায়ের পাতা উল্টেছে! আজও সারা পৃথিবীময় চলেছে যুদ্ধ,—এক পথের সঙ্গে আর এক পথের যুদ্ধ, এক মতের সঙ্গে আর এক মতের যুদ্ধ। হিংসার সঙ্গে, ক্রূরতার সঙ্গে, মানুষের শঠতা, লোভের সঙ্গে চিরন্তন মানুষের মঙ্গলের যুদ্ধ। এ লড়াই তাকে লড়তেই হবে, ক্ষতবিক্ষত তাকে হতেই হবে, দুঃখের দুঃখ, দুঃসহ দুঃখ তাকে পেতেই হবে, তবেই তো হবে তার নবজন্ম। চেয়ে দেখো, মানুষের নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে পৃথিবী ধূমায়িত হয়ে উঠেছে, ব্যথায় নীল হয়ে উঠেছে। এই গর্ভবেদনা যে পেতেই হবে ধরিত্রীকে, তবেই যে সে জন্ম দেবে নতুন প্রাণের। এমনি করে আর এক অধ্যায়ের পাতা ওল্টাবে, শুরু হবে নবতর অধ্যায়। মানুষের সংসার এমনি করেই দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে, দুর্ভাগ্যের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে, কাঁটায় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়ে, অবশেষে পৌছবে তার চরমতম কল্যাণে। আগুনের স্পর্শমণি না ছোঁয়ালে, কেমন ক'রে সে সোনা হবে!

আমরা যখন দুঃখ সইব, তখন যেন ভুলে না যাই, এই দুঃখই দিচ্ছে ললাটে বিজয়টীকা এঁকে,—যেন ভুলে না যাই এই মঙ্গলের জয়যাত্রায় আমাদের এই দুঃখের অগ্নিশিখাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনি ক'রে দুঃখ সয়ে, এমনি ক'রে বিঘ্নবিপদের কণ্টকিত পথে কল্যাণের লক্ষ্যকে স্থির রেখে এগিয়ে চলার মাঝে যে কতবড় বীরত্ব রয়েছে, কত বড় গৌরব, আনন্দ রয়েছে, কী অতুলনীয় পরিতৃপ্তি রয়েছে,—তা কেমন ক'রে বুঝবে তুমি কর্মত্যাগী পলাতক? বৈরাগ্যের ভণ্ডামিতে আপনাকে ভুলিয়ে, এই যে তুমি জেনে রেখেছ সংসার অনিত্য, এই যে তুমি লুকিয়ে রেখেছ আপনাকে সংসারের শত কোলাহল হতে, যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে জয়যাত্রার যুদ্ধনির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছে,—এই যে তুমি পালিয়ে ফিরছ পর্বতে কন্দরে, লোকালয় হতে দূরে, এই যে তুমি তোমার সকল দায়িত্বকে ত্যাগ ক'রে এসেছ, সকল কর্তব্যকে পরের মাথায় উজাড় ক'রে তুলে দিতে দ্বিধা করো নি, কেবল নিজের পরকালটি নিয়েই আছ, ইহকালের দিকে একবার ফিরেও তাকালে না,—এই তোমার চরম স্বার্থপরতা, এই তোমার কর্তব্য হতে পলায়ন, এই তোমার দায়িত্ববহনের অক্ষমতা তোমায় কোন্ অন্ধতমসার পথে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে তা কি তুমি বুঝতে পার না?

তাই তো গীতায় বজ্রের গর্জনে এই নিষেধবাণী উঠেছে বেজে,—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি,—তাই তো গীতা পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে বলেছেন,—

নিয়তং কুরু কর্মত্বং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ।

—তুমি নিয়ত কর্ম করো। কর্ম না করার চেয়ে কর্মকরা অনেক ভাল।

আবার বলেছেন,—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।

—কর্মফলে অনাসক্ত হ'য়ে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, তিনিই প্রকৃত যোগী। যে নিরগ্নি, যে নিষ্কর্মা,—সে নয়।

আবার বলেছেন,—

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।

—কর্ম না করলেই যে মানুষ কর্মবন্ধন হতে মুক্তি পায় এমন নয়। সন্ন্যাস নিলেই যে সিদ্ধি হবে, এমনও নয়।

আবার বলেছেন,—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

—কর্মের ইন্দ্রিয়গুলি অবশ ক'রে যে-বিমূঢ়াত্মা মনে মনে বিষয়রস ভোগ করে, সে মিথ্যাচারী, সে ভণ্ড। তাই এই যে সুবিশাল মঙ্গলযজ্ঞচক্র সর্বগত ব্রহ্ম হতে এই পৃথিবীতে প্রবহমান, মানুষকে তাতে যোগ দিতেই হবে। যে না দেবে, সে

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।

যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে পাপাত্মা কি ব্যর্থ জীবন যাপন করে

সবাই মিলে দুঃখ স'য়ে, চোখের জলে, শ্রমের জলে, পাথর কেটে পথ ক'রে, বনকেটে নগর বসিয়ে, খালকেটে মরুভূমি উর্বর ক'রে, বিরামহীন দিন ও বিনিদ্ররাতের পরিশ্রমে মানবজাতির জ্ঞানের সঞ্চয় বাড়িয়ে দিয়ে, রোগ হ'তে পরিত্রাণের, বিপদ হতে পরিত্রাণের পথ সন্ধান ক'রে, মানুষের দুঃখবিজয়ের সাধনায় যে প্রবহমান মানুষের ধারা যুগে যুগে দেশে দেশে মঙ্গলের জয়যাত্রায় চলেছে,—আমাদের কি কোনো স্থানই হবে না সেখানে কোনোদিন? চিরকালই কি দূরে সরে থাকব, যাব না তাদের দলে কোনোদিন? আমাদের আরামকে ধিক্, আমাদের ক্লৈব্যকে ধিক, আমাদের সেই ব্যর্থজীবনকে ধিক! হে জগন্নাথ, হে মঙ্গলময়, ঐ যে তোমার রথ চলেছে, জগতের কত বিভিন্ন জাতি, কত স্বার্থত্যাগী মানুষ, কত বীর নরনারীর দল টেনে নিয়ে চলেছে তোমার রথ,—দাও, দাও আমাদেরও তোমার রথের কাছি ধরতে দাও, করো করো প্রভু, আমাদেরও মানবজীবন সার্থক করো। আমাদের শক্তি, আমাদের বল, আমাদের যা-কিছু সঞ্চয় সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিই, সেই তো বাঁচার মতো বাঁচা,—আর সবাই যে ব্যর্থজীবন যাপন করে।

উর্দু সাহিত্যে হালীর দান

মীজানুর রহমান এম-এ

বাংলার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও যেমন বাংলা সংস্কৃত নহে, তেমনি আরবী-ফারসীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও উর্দু আরবী-ফারসী নহে। হিন্দীও তেমনি সংস্কৃতানুরাগী হলেও হিন্দী হিন্দী, সংস্কৃত নহে। সকল ভাষারই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, থাকবে এবং থাকা দরকার। ভাষা কাহারো খাস সম্পত্তি নহে এবং হতে পারে না। মাতৃ-ভাষার উপর সকলেরই সমান অধিকার। আজও নিখিল ভারত উর্দু আন্জুমানের সভাপতি স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু।

মোগল বাদশাহদের আমলেই উর্দু ভাষার জন্ম। মোগলরা এসে ছিলেন ভারতের বাহির হ'তে। ভারতেই তাঁরা থেকে গেলেন। ভাবের আদান-প্রদানের জন্ম দরকার হ'লো নতুন এবং সহজ ভাষার। ফলে জন্ম হলো উর্দু। সৈনিকদের ছাউনীই উর্দুর সূতিকাগার। উর্দুর নামই তার প্রমাণ। 'উর্দু' মানে Camp বা সৈনিকের ছাউনী; 'Horde'-ই হয়েছে 'উর্দু'। তুরস্ক-তাতারদের সহিত ভারতের সম্পর্ক আজও বেঁচে রয়েছে এবং সম্ভবতঃ চিরদিন থাকবে 'উর্দু' নামের মারফতে। 'উর্দু' নাম তুর্কীদেরই অবদান।

তবে ভাষা হিসাবে উর্দু ভারতের বাহির হ'তে আমদানী করা মাল নহে। দিল্লীর আশে-পাশে প্রচলিত 'খড়ি বুলি' (প্রাকৃতের অপভ্রংশ)—গ্রিয়ারসণ যাকে বলেছে 'পশ্চিমা হিন্দী'—আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দ-সম্ভারে সজ্জিত, বিকশিত এবং পরিপুষ্ট হয়েই হয়েছে উর্দু। নতুন ভাষায় মোগলদের প্রভাব শুধু স্বাভাবিক নয়—অপরিহার্য্য। ইহাই উর্দুর মোটামুটি ইতিহাস। বাংলার সহিতও রয়েছে উর্দুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কেননা কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেই আধুনিক উর্দু গদ্যের জন্ম। আধুনিক উর্দু সাহিত্য, বিশেষতঃ উর্দু কবিতা, বিশেষ ভাবে ঋণী মরহুম শামসুল্ ওলামা মৌলানা খাজে আল্তাফ হোসেন হালীর নিকট।

হালীর জন্ম পানিপথে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৩১।১২।১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। হালীর জন্ম-ভূমিরূপেও পানিপথ ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে; হালীর পূর্ব-পুরুষ খাজে মালিক আলী সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বল্বনের রাজত্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিরাট হতে ভারতে এসে পানিপথে বসতি স্থাপন করেন। মালিক আলী ছিলেন হিরাটের পীর খাজে আবদুল্লাহ্ আন্সারীর বংশধর এবং খান্দানী, সুশিক্ষিত ও সম্মানিত মানুষ। ভারতের নাম-ডাক শুনেই তিনি এসেছিলেন নিজের দেশ ছেড়ে। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন এবং তদীয় পুত্র সোল্তান মোহম্মদ ছিলেন আলীম-ওলামা ও খান্দানী-পীরদের কদরদাঁ বা Patrons, তাঁহাদের প্রদত্ত জায়গীরের কল্যাণে হালীর পূর্ব-পুরুষগণ পানিপথে বেশ মান-সম্মানেই বসবাস করেন। ৯ বৎসর বয়সে হালী পিতৃহীন হন। শৈশবেই হালী সমগ্র কোরআন (মুখস্থ) করে 'হাফিজ' হন। সাবেক ধরণেই হালীর শিক্ষা অর্থাৎ আরবী এবং ফারসীই হালী অধ্যয়ন করেন।

হালী নিজের জীবন স্মৃতিতে বলেছেন: "লেখা-পড়ার জন্ম আমার ছিল অদম্য আগ্রহ। তবে রীতিমত পড়া-শোনার সুযোগ আমার তেমন হয়নি। দিল্লীর বাশেন্দা এবং পানিপথের অধিবাসী সৈয়দ জাফর আলী ছিলেন ফারসী সাহিত্য এবং হেকিমীর ইতিহাসে পারদর্শী। তাঁহার কাছে আমি ফারসীর কয়েকটী প্রাথমিক কিতাব পাঠ করি। আরবী পড়ি ইব্রাহিম হোসেন আন্সারীর নিকট। ভাই বলেন চাকুরী করতে। শিক্ষানুরাগের তাড়নায় বাড়ীর লোকজনকে না বলে চলে যাই দিল্লীতে ১৭ বৎসর বয়সে। বছর দেড়েক সুবিখ্যাত বক্তা এবং ওস্তাদ মৌলভী নওয়াজেশ্ আলীর নিকট আরবী ফারসী অধ্যয়ন করে বাড়ী ফিরি।"

দিল্লী কলেজ তখন চলছে বেশ জাঁকের সহিত। তবে হালী তার ধার দিয়েও যান নি। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজ তখনও বিরূপ। হালীর নিজের কথায়: "আমার সময়ে পানিপথে ইংরেজী শিক্ষার মোটেই প্রচলন ছিল না। যে সোসাইটীতে আমার উঠা-বসা, সেখানে শিক্ষা বলতে আরবী-ফারসীরই চর্চা। চাকুরী পাওয়ার উপায় হিসাবেই কেহ কেহ ইংরেজী শিক্ষার কথা বলতো।...দিল্লীতে যে মাদ্রাসায় আমি পড়তুম, সেখানে ইংরেজী পড়ুয়াদিগকে মনে করা হতো বিল্কুল্ অজ্ঞ।"

পানিপথে ফিরে এসে হালী নিজে নিজে কিছুদিন জ্ঞান-চর্চা করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যান হিসার জেলায় চাকুরী নিয়ে। ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের জন্ম হালীকে হিসার ছাড়তে হয়। আবার বাড়ীতে বসেই পড়া-শুনা। তারপর ঘটনাচক্রে পরিচয় হয় সুপ্রসিদ্ধ ফারসী-উর্দু কবি 'শিফ্তার' সহিত। শিফ্তা ছিলেন দিল্লীর রঈস এবং জাহাঙ্গীরাবাদের তালুকদার। শিফ্তার মোসাহেব রূপে তাঁর সহিত হালী থাকেন সাত বৎসর। শিফ্তার মৃত্যুর পর হালী যান লাহোরে—পান্জাব বুক ডিপোতে চাকুরী নিয়ে। এখানে হালীর কাজ ছিল ইংরেজী সাহিত্যের উর্দু তর্জমার সংশোধন করা। এই সূত্রেই হালীর সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিচয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরে উর্দু 'মুশায়েরা' বা কাব্য-মজ্‌লিসের সূচনা। হালী তখন লাহোরে। সুপ্রসিদ্ধ উর্দু-কবি মোহাম্মদ হোসেন আজাদই মুশায়েরার উদ্যোক্তা এবং পান্জাবের তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর কর্ণেল হলরয়েড উৎসাহদাতা। হালীও মুশায়েরাতে যোগ দেন এবং চার অধিবেশনে চারটী কবিতা পাঠ করেন।

দিল্লী অধ্যয়ন কালে হালীর সহিত পরিচয় হয় গালেবের। মির্জা গালেব উর্দু কাব্যসাহিত্যের শাহান্শাহ্। শায়েরীতে হালী গালেবের শিষ্য। কবি-সম্রাট হলেও গালেব কাব্য-চর্চায় অজ্ঞকে উৎসাহ দিতেন না। হালী সম্বন্ধে কিন্তু গালেব বলেন—'কাব্যচর্চ্চা ছেড়ে দিলে হালী করবে নিজের উপর অবিচার'। 'ইয়াদগারে গালেব' (গালেবের স্মরণে) রচনা করে গালেবের কাব্য-প্রতিভার চমৎকার আলোচনা করেন হালী।

বাল্যকাল হতেই কাব্যের প্রতি ছিল হালীর ঝোঁক। তবে উর্দু কাব্য-সাহিত্যের প্রচলিত রীতির প্রতি ছিল হালীর অশ্রদ্ধা। কেবল শরাব-সাকী, গুল্-চমনের কল্পনা-বিলাস হালীর ভাল লাগেনি। "Olb oustoms die hard". পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে নতুনত্বের বাসনা হালীর মনে আরো বেশী দানা বাঁধে। হালী এক কবিতায় বলেন—'মস্হাফী (ফারসী কবি) এবং মীরের (উর্দু কবি জমানা গোজরে গেছে; এবার পাশ্চাত্যের পালা।

লাহোর মুশায়েরায় পঠিত হালীর কবিতাগুলি নতুন ধরণের। 'বর্ষা-ঋতুর' এক জায়গায় হালী বলেন: "মেঘ-বাহিনী চলছে আগে আগে, বায়ু আসছে পেছনে। নানা রঙের বাহিনী—কেউ শাদা, কেউ কালো। আকাশে যেন সেনার ছাউনী—কেউ এগুচ্ছে, কেউ পিছুচ্ছে। লক্ষ বন্দুক নিয়েই যেন তারা যাচ্ছে যুদ্ধে।" "স্বদেশ-প্রেমে" হালী বলছেন: "দেশের ভাল চাও ত স্বদেশের কাউকে পর ভেবো না। হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, বৌদ্ধ হোক, ব্রাহ্ম হোক, সবকেই দেখবে মিঠা নজরে—সবকেই মনে করবে নয়নের পুত্তলী।"

কবিতাটীর সুর ও ঝঙ্কার শুধু সুন্দর নয়—অনবদ্য। হালীর কথাগুলিই তুলে দিচ্ছি:—

> "তুম আগার চাহতে হো মুল্ক কী খায়ের
> না কিছী হাম্-ওতান কো সমঝো গায়ের।
> হো মুছলমান ইছমে ইয়া হিন্দু
> বুদ্ধ মজহাব হো ইয়া কে হো ব্রাহ্মো—
> ছব্‌কো মিঠী নেগাহ ছে দেখো
> সমঝো আখোঁ কী পুৎলিয়াঁ ছব্‌কো।"

অর্থই অনর্থের মূল

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

অর্থ ও সভ্যতা

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নূতন রূপে পুনরাবর্তন করে গেল। যে নরমেধ যজ্ঞের অনল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তাতে বহুলোকের জীবনাহুতির পরই যে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তা নয়। ভবিষ্যতের অন্ধকার গহ্বরে আজ ধ্বংস ও মৃত্যুর বীজ বিক্ষিপ্ত। যারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো তারা স্বস্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেলে ভবযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেল; কিন্তু যারা রইল, তারাও অহর্নিশি মৃত্যুর করালগ্রাস দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত, মৃত্যুকে প্রতিমুহূর্ত্তে এড়িয়ে চলবার পরিশ্রমে তারা আজ ক্লান্ত ও অর্দ্ধমৃত। এ দুর্ভিক্ষ অজন্মার দুর্ভিক্ষ নয়, এ দুর্ভিক্ষ মুদ্রাস্ফীতি প্রসূত। গত দুইশত বৎসর ধরে বিজ্ঞান পৃথিবীর সভ্যতার আলোক শিখাটিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে, মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের বহুবিধ অনুষ্ঠান উদ্‌ভাবন করেছে, তার জীবনের পূর্ণতা ও সফলতাকে বৃদ্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই বিজ্ঞানই যদি আবার উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত না হয়, বিবেকের পরিবর্ত্তে যদি কুমতি এসে এই আরাধ্য বস্তুটির চালকের আসন গ্রহণ করে বসে, তবে তার দ্বারা যে মানবজাতির অমঙ্গল সাধন হয়, তার তুলনাও পৃথিবীতে বিরল। বিজ্ঞান যদি জ্ঞানকে ছাপিয়ে চলে যায়, মানুষের দৈহিক শক্তি যদি মানসিক শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে এবং জড়বাদ ও জড়বুদ্ধি যদি মানুষের মানুষ্যত্ব ও আত্মার প্রসারতার প্রাচীর উলঙ্ঘন করে যথেচ্ছাচারী হয়, তবে সে সভ্যতা হয়ে পড়ে অভিশপ্ত, তার উন্মাদ ও আত্মহারা প্রবল গতির প্রতি পদক্ষেপেই নিহিত থাকে তার অনিষ্ট ও ধ্বংসের স্থির সম্ভাবনা। তাই বৈজ্ঞানিক আত্মশক্তির এক অভূতপূর্ব্ব প্রেরণায় একদিন মানুষের কল্যাণের যে অমূল্য সম্পদ সৃজন করে, রাজনৈতিক কূটনীতি এবং মনের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই স্নেহের সম্পদই হয়ে পড়ে যুদ্ধবিপ্লবের সময় মানুষের ধ্বংসের এক মহামারণ অস্ত্র। মহাকলরবে বিজ্ঞানের দুর্দ্দমনীয় স্রোত গত দুইশত বৎসর ধরে পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সময়ের তুলনায় তার তাল অতি দ্রুত। কিন্তু জ্ঞান ও মানসিক প্রসারতা এই দ্রুত গতির প্রতিযোগিতায় পরাভব স্বীকার করে বহু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। তাই আজ যদি পৃথিবীর সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তবে বিজ্ঞানের গতিরশ্মি সংযত করে তার এই তালকে মন্থর করে জ্ঞানের সঙ্গে সমতা রক্ষা করাই হবে একমাত্র উপায়।

অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বেলাও সেই কথা। সেকাল অনেকদিন গত হয়ে গেছে, যখন প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণই ছিল মানুষের জীবনের সব কিছুরই স্থান। গ্রাম্য জীবনের গ্রাম্য অর্থনীতি দ্বারা সে হয়ে উঠত পালিত, যে গ্রামে সে জন্ম নিত সেই গ্রামই তাকে মিটাত তার আহার, বিহার, বসন ও ব্যসনের আকাঙ্খা, আর সেই গ্রামের কোলেই স্বচ্ছন্দে মাথা রেখে একদিন সে মিলিয়ে যেত প্রকৃতির কোলে। সেদিন তার অভিজ্ঞতা ছিল সীমাবদ্ধ, তাই তার আকাঙ্খাও ছিল স্বল্প। পরিপূর্ণতায় ঘটটি তার ছোট থাকায়, জীবনের স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সে উপভোগ করতে পারত শান্তির সঙ্গে। সেদিন যে রাঁধতো, সে চুলও বাঁধতো। পরিবারের স্ত্রীপুরুষ মিলে সকলে একত্রিত হয়ে প্রকৃতির জাগরণের সাথে সাথে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে যেত, মাঠে গিয়ে হলকর্ষণ করতো, ঘরে ফিরে আহার্য্যের যোগাড় হতো, বস্ত্রশিল্পে মনোযোগ দিত এবং অবশেষে দিনান্তে মাটির দাওয়ায় মাটির প্রদীপ জেলে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তো। টাকার বালাই সেদিন তাদের ছিল না; বিনির মার দুইটা বলদ, ক্ষেমির বাবার দশটা ছাগলের সাথে সোজাসুজি অদল বদল হয়ে যেত, বিনির মাও ছাগলের দুধ খেয়ে বাঁচতো আর ক্ষেমির বাবারও হাল চাষের প্রয়োজন মিটতো, অথচ তৃতীয় ব্যক্তি এই টাকা নামক বস্তুটির সেখানে মাতব্বরীর কোন আবশ্যক বা সুযোগই হতো না।

কিন্তু রইলো না এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়ে। বহুদিনের এই তন্দ্রাও নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ যেন জাগরণ শোনা গেল, হিমালয়-প্রান্তে তপস্যারত যতি কৃত্তিবাসের হঠাৎ যেন ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকের বহুদিনের ও বহু সাধনার ফল প্রসূত হল, গঙ্গোত্রী হতে জাহ্নবী উৎপত্তি হয়ে মহাকলরবে পুরাতন তটভূমি প্লাবিত ও ধ্বংস করে নূতন স্রোত ও নূতন ভাবে পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। এরই নাম হল ইউরোপে ইণ্ডাস্‌ট্রিয়াল রেভোলিউসন্ (Indtistrial Revolution) বা যন্ত্রযুগের আরম্ভ, যা অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে ইংলণ্ডকে প্রথমে এসে আলোড়িত করে তোলে। এতদিন জ্ঞানের স্রোত বইছিল প্রকৃতির কোলের উপর দিয়ে, প্রকৃতির সাথে সৌহার্দ্য ও সখ্য স্থাপন করে ভরে উঠেছিল তিল তিল করে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু এই শান্ত ও সুনির্ম্মল জ্ঞানশিখাটি হঠাৎ যেন সুদীপ্ত ও তীব্র হয়ে উঠলো, এতদিনের সখ্যতা ছিন্ন করে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার নেশা যেন মানুষকে উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো। মানুষ সেদিন আবিষ্কার করলো যন্ত্রকে। এই যন্ত্রদানবের সাহায্যে সে নির্ম্মমভাবে ধুয়ে মুছে ফেললো যা কিছু পুরাতনের নিদর্শন, নূতন সভ্যতা, নূতন কৃষ্টি ও নূতন সমাজ গড়ে উঠলো পৃথিবীর বুকে এক নিঃশ্বাসে। মানুষের এই উন্মাদ বিজয়াভিযানের নিকট প্রকৃতি নম্রনেত্রে পরাজয় স্বীকার করলো। এতদিনের জীবনযাত্রা-প্রণালীর হলো রূপান্তর, কাঠ ও প্রস্তরের সভ্যতাকে অধিকার করলো এসে ইস্পাত ও কয়লা—আর রাখালের বাঁশের বাঁশরীর ক্ষীণ ও সুমিষ্ট স্বরকে উপেক্ষা করে গর্জ্জে উঠলো কারখানার হুইসেল্। কানাইয়ের বাঁশীর সুর আকুলভাবে বৃথাই ঘুরে মরে, সে ধ্বনিতে ধেনুরাও আর গোষ্ঠে ফিরে আসে না, গ্রামের গোপিনীরাও তাতে আর আকৃষ্ট হয় না, মানুষের প্রতি বিন্দুচেতনা উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে ধূম্র উদ্‌গারিত কারখানার ওই ফোঁস ফোঁসানি শব্দের দিকে। গ্রাম ভাঙলো, সহর গড়লো, সংস্কারের অন্ধকার পর্দ্দা গেল সরে আর সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়লো প্রধানত তিন শ্রেণীতে—শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও পুঁজিপতি। এক একটা বিরাট কারখানা গড়ে উঠে, নানা দেশের

শতসহস্র লোক ঘর্মাক্ত কলেবরে কাজ করে চলে তাতে অহর্নিশি, আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তৈরী হয়ে আসে তা থেকে হাজার হাজার দ্রব্যসামগ্রী। কলকজা ও মাল উৎপাদনের জটিলতা সাধারণের উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে উঠে, তাই প্রতিটি কাজে হিড়িক পড়ে গেল কর্ম্মবিভাগের (Division of Labour)। সমস্ত জীবন ভরে হয়তো একজন মানুষ শুধু একটি আলপিনের ততোধিক ছোট মাথাটিই একভাবে তৈরী করে চললো, না রইল তাতে তার কোন বৈচিত্র্য, না রইল তাতে তার কোন সৃজনের ক্ষমতা। এই ভাবে সাধারণ মানুষ হারিয়ে ফেললো তাদের ভিতরকার সৃজনের অনুভূতি ও প্রেরণা এবং সে নিজেই পরিণত হলো একটি যন্ত্র বিশেষে! যে রাঁধে তার আর আজ চুল বাঁধার কোন অধিকার নেই, চুল বাঁধার মুষ্টিমেয় দল আলাদা হয়ে গেল। যান্ত্রিকযুগে এই রাঁধুনীদের বলা যেতে পারে Proletariate বা সর্ব্বহারাদের দল—আর চুল বাঁধার ভোগে যারা লিপ্ত তারা হলো মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দল। এই পরার্থশ্রমী বা সর্ব্বহারাদের দল পুঁজিপতিদের জন্ম বিপুল পরিশ্রমে বিরাট লৌহ চুল্লির সহযোগে নানাবিধ মুখরোচক ও উপাদেয় বস্তু তৈরী করতে থাকে এবং তার পরিবর্ত্তে এই ধনপতিদের উচ্ছিষ্টাংশের দ্বারা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কোন রকমে জীবনটাকে শেষদিন অবধি বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক যুগে শুধু রাঁধুনী ও চুলবাঁধার দল হলেই চলে না, আর একটা ব্রাহ্মণদলেরও প্রয়োজন, যারা এই রাঁধুনীদের পাককরা দ্রব্যগুলি পুঁজিপতিদের নিকট শুদ্ধভাবে পরিবেশনের ভার নেবে। এই দলটা হল এই যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা তথাকথিত চাকুরেজীবী। এরা ঠিক কলিকালের বামুন। কোন আধ্যাত্মিক শক্তিও নেই, অথচ অহঙ্কার আছে ষোল আনা। এরা একদিকে রাঁধুনীকে বোকৃবে, আবার অন্যদিকে ধনপতিদের নিকট যোড়হাতও করবে। যন্ত্রযুগের আগের যুগকে যদি ধর্ম্ম ও সাম্যের যুগ বলা যায়, তবে এই নূতন যুগকে কর্ম্ম ও বৈষম্যের প্রতীক বলে গ্রহণ করা চলে।

যন্ত্রযুগে মানুষ তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি হারাল বটে কিন্তু বাসনা তার বৃদ্ধি পেল শতগুণ। শিল্পী যে সামগ্রী বহু পরিশ্রমে ও বহু আরাধনায় কারুকার্য্যমণ্ডিত করে মানুষের ভোগের জন্য গড়ে আনে, যন্ত্র নিমেষের মধ্যে তার থেকে সহস্রগুণ বেশী দ্রব্য তৈরী করে বসে থাকে, যদিও সৌন্দর্য্যের খুঁটিনাটির দিক থেকে শিল্পীর উদ্ভাবিত দ্রব্যের নিকট সে হয়ে পড়ে অনেক ভোঁতা। মানুষও হঠাৎ যেন জীবনের একটা নূতন ধারা ও নূতন উদ্দেশ্য আবিষ্কার করলো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তাকে উপভোগ করতে হবে নানাভাবে, নানাদিকে ও নানা বৈচিত্র্যে। প্রকৃতিকে করতলগত করার আস্ফালনে জীবনের আধ্যাত্মিকভাব গেল হারিয়ে, পরজন্মে এল অবিশ্বাস এবং বস্তুতন্ত্র (Materialism) বা সাংসারিকতা অধিকার করলো মানুষের প্রতিটি দর্শনে। ওমর খৈয়ামের সাকী ও সুরার পাত্রই হলো মানুষের সব চেয়ে আদরের ধন। জন্মের পূর্ব্বেও জানিনা, মৃত্যুর পরও সব অন্ধকার, সুতরাং উপভোগ কর যে কয়দিন বেঁচে আছ অর্থাৎ সে দিনগুলোকে চেতনা দ্বারা উপলব্ধি করতে পার। সময়ের তাই আজ অনেক মূল্য, বিশ্রামটাও যেন অপব্যয়—আর নিদ্রাটাও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সেরে নেওয়া উচিত, কারণ নিদ্রায় চেতনা না থাকায় তাকে উপভোগ করা চলে না। সুতরাং শিল্পীর দ্রব্য সুন্দর ও নিখুঁত হলেও, সময় নেয় সে অনেক, কাজেই মূল্য পড়ে অনেক বেশী এবং সংখ্যার দিক থেকে উৎপাদন শক্তি তার অনেক কম। তাই এই নূতন ভাবধারার ইন্ধন যোগাবার ভার নিল এই যন্ত্রদানব—তার বহুবিধ কলা কৌশল দ্বারা অল্প সময়ে ও অল্প মূল্যে অসংখ্য ভোগসামগ্রী উৎপন্ন করে। যে ভোগসামগ্রী কেবলমাত্র রাজদরবারেই শোভা পেত, যন্ত্রযুগে তা গরীবের পর্ণ কুটীরে প্রবেশ লাভ করলো—(Luxuries of the king reached the door of the poor)। যন্ত্রের এই মহাশক্তির নিকট এতদিনের এই শিল্পীরা পরাজয় স্বীকার করে চোখের জলে চিরবিদায় নিল, হস্ত ও কুটীরশিল্প চিরদিনের জন্য শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। কাশ্মীরের পৃথিবী বিখ্যাত শাল ও ঢাকার মসলিনের হলো চিরমৃত্যু, আর তার পরিবর্ত্তে ম্যানচেষ্টারের যন্ত্রোৎপাদিত সস্তার বস্ত্র এসে ছেয়ে ফেললো ভারতের এই বিরাট বাজার।

কিন্তু এত জিনিষ, এত অলঙ্কার সামগ্রী কি করে অদল বদল হবে? বিনির মা এখন আর শুধু দুধ খেয়েই তৃপ্ত নয়, আর ক্ষেমির বাবাও শুধু মাঠে বসে কাজ করাটাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মেনে নিতে রাজী নয়। বিনির মার এখন প্রয়োজন অনেক, নানা রং-এর সাড়ী, চুলের ফিতে, কাঁটা, চুড়ী, বিনির জন্য সাবান ও নানারকম প্রসাধন সামগ্রী, বায়োস্কোপ দেখা, রেলে ইষ্টিমারে চড়ে বাপের বাড়ী যাওয়া ইত্যাদি আরো কত কি? সুতরাং বলদ নিয়ে সে কত জিনিষই বা কিনবে, একটা বলদে কত চুড়ী হয়, কটা কাঁটা হয় তারই বা হিসেব পাবে কোথায়—আর এমন সাবানওয়ালাই বা কি সব সময় খুঁজে পাওয়া যায়, যার সেই সময় আবার বলদেরও প্রয়োজন? সুতরাং এযুগে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বা Barter System অচল। এযুগে এখন একটি মোড়লের প্রয়োজন যাকে মধ্যস্থ মেনে সব জিনিষের অদল বদল তখনই হয়ে যায়। মোড়লের কথাই বেদবাক্য, সে যা বলবে সকলেই নির্ব্বিবাদে তা মেনে চলবে। ব্যাস, এই হলেই মোড়লের কাজ শেষ হলো, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। এই সর্ব্বেসর্ব্বা মোড়লটির নামই হল টাকা বা মুদ্রা, যার একমাত্র কাজই হলো একটা দ্রব্যের সম্বন্ধ আর একটা দ্রব্যের অদল বদল বা বিনিময় করানো—Midium of Exchange, এ ছাড়া আর কোন মূল্য বা কাজই নেই এর। মানুষের আকাঙ্খা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার জটিলতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এই টাকার মধ্যস্থতার প্রয়োজন এবং তার প্রাধান্যও বাড়াচ্ছিল তেমনই। তারপর যন্ত্রযুগের পণ্যবিনিময়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে তার প্রয়োজন হয়ে পড়লো অভেদ্য।

টাকার খেলা

পূর্ব্বেই বলেছি টাকার নিজের কোন মূল্য নেই, এ আমাদের আহারের সামগ্রীও নয়, বিহারের ভোগ্যও নয়—সোজাসুজিভাবে মানুষের কোন আকাঙ্খাই পূর্ণ করে না এই টাকা। কিন্তু তবুও এ নিয়ে মানুষের হিংসা, দ্বেষ, কলহ ও দ্বন্দ্বের অন্ত নেই, এই টাকাই হলো মানুষের ইহজগতের একমাত্র কাম্য এবং আরাধ্য-দেবতা। একেই বলে মায়া; যে নশ্বর জিনিষের নিজস্ব কোন মূল্য নেই, অথচ তাকে অবিনশ্বর করে ভাবা ও দেখা হয়—এরই নাম হলো মায়া এবং অর্থ নৈতিক দর্শনশাস্ত্রে এই দর্শনের নামই হওয়া

উচিত মায়াবাদ। কিন্তু টাকার নিজস্ব কোন মূল্য বা শক্তি না থাকলেও, এ যদি মানুষের জন্ত ঠিকমত পরিচালিত না হয় তবে এর দ্বারা জাতির যে ঘোর অমঙ্গল ও অনিষ্ট সাধন হয় তার তুলনাও পৃথিবীতে বিরল। গতযুদ্ধে জার্মানী এবং এই যুদ্ধে ভারত, এই দুই দৃষ্টান্তই এর প্রধান প্রমাণস্বরূপ। অন্যান্ত বিজ্ঞানের সাথে সাথে অর্থনীতি-বিজ্ঞানও প্রসারলাভ করেছে এবং তারই একটা শাখা হিসেবে টাকা বা মুদ্রা-বিজ্ঞানও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবহৃত হতো, তারপর কাগজী মুদ্রা বা নোটের প্রচলন হল, কিন্তু তার পশ্চাতে লোকের অবস্থার জন্ত ব্যাঙ্কে বা সরকারী তহবিলে জমা থাকতো তাল তাল সোনা। যখন খুসী ইচ্ছামত নোট দিয়ে সেখান থেকে সমমূল্যের সোনা নেওয়া যেত, আবার চাইলে সোনা জমা দিয়ে সেখান থেকে নোট পাওয়াও যেত। এই প্রথার নামই হলো স্বর্ণমান বা Gold Standard. ক্রমে মানুষের আরো বুদ্ধি খুললো, দেখলো যে এই স্বর্ণ জমা রাখার কোন স্বার্থকতা বা তাৎপর্য্যই নেই, সোনা যদি প্রকৃত ব্যবহারই না হলো তবে এ শুধু তার অপচয় ও অপব্যবহার, এ জমা না থাকলেই বা কি আসে যায়? যদি মানুষের ও দেশের ঠিক প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ কাগজীমুদ্রা মুদ্রিত করা যায় তবেও কাজকর্ম্ম ঠিক মতই চলে, অথচ কতকগুলি সোনাকেও আটক করে রাখা হয় না। তাই হলো। হালে একের পর এক দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করতে আরম্ভ করলো এবং দেশে নোটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন হিসেবে। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নিয়ম আছে, একটা সীমা আছে। সে নিয়ম ভঙ্গ করলে এবং সে সীমা অতিক্রম করলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে ঘোর অনিষ্ট এসে উপস্থিত হয়; অর্থ সেখানে হয়ে পড়ে যত অনর্থের মূল এবং তার ফলভোগ করতে হয় দেশের জনসাধারণকে। যে উন্নত বুদ্ধির দ্বারা মানুষ স্বর্ণমান ত্যাগ করেও দেশে মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়, সেই বুদ্ধিই যদি আবার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত না হয় এবং দেশের কল্যাণের জন্ত ব্যবহৃত না হয়ে সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়, তবে তার দ্বারা যে অশান্তি ও অমানুষিক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয় তার প্রমাণ হল বাংলার এই দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নয়, এ সেই অজন্মার দুর্ভিক্ষ নয়। এ দুর্ভিক্ষ হলো টাকার খেলার পরিণাম। গোলা ভরা ধান রয়েছে, মাঠের উপর থরে থরে সাজান শস্য রৌদ্র কিরণে ঝিলিমিলি খেলছে, মহানগরীর আলোকোজ্জ্বল পণ্যশালায় বিলাসীর খাদ্যসামগ্রী সমভাবে পরিবেশিত হয়ে চলেছে, তবুও লক্ষ লক্ষ নির্ব্বোধ মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে মরে গেল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের কোন কোণের এক বাত্তাস যেন টেপা হলো, আর অমনি আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের শক্তির মত শতসহস্র যোজন দূরে অবস্থিত বাংলার ঘরে ঘরে হাসির রেখা ফুরিয়ে গেল, সমাজ ভেঙ্গে চুরে চুরমার হলো, পরিবার গোষ্ঠী সব ছারখার হয়ে গেল, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ লোকের জীবনাহুতির কার্য্য সমাধা হলো। চমৎকার মানুষের এ বিজ্ঞান ও বুদ্ধির খেলা। গোড়াতেই বলেছি এ দুর্ভিক্ষের আদি কারণ অর্থনৈতিক, এর মূলে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন—এ হলো টাকা নিয়ে খেলা। কিন্তু টাকা নিয়ে খেলাতে মানুষের প্রাণ নিয়েও যে নির্ম্মমভাবে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে—এর পরিণতি যে কোথায় তা শুধু ভগবানই জানেন। তাই বলছিলাম যে এ দুর্ভিক্ষ প্রকৃতির অভিশাপ নয়, এ অভিশাপ মানুষের আত্মকৃত দুর্নীতির। আর এই দুর্নীতির প্রকৃত তথ্য জানতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে মুদ্রানীতি ও মুদ্রাস্ফীতির গোড়ার কথা।

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

এইবার অপর একটী ঘটনা বলি। ঘটনাটী ঘটেছিল, ১৯৩৭ সালে। বিবাহের পরেই এক নব-পরিণীতার সঙ্গে এক নব-পরিণীতের কলহ হয়। ব্যাপার কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায়। কলহের কারণ অতি সামান্ত। ছেলেটীর একটা গোঁপ ছিল। স্ত্রীর মতে সেটা ছিল ঝাঁটার মত। তাই সে সেটাকে কামিয়ে ফেলতে বলে। কিন্তু স্বামী কামায় না, আমি মেয়েটীকে বুঝিয়ে বলি—সামান্ত একটা গোঁপের জন্ত এতবড় বিরোধ, গোঁফ আছে ত হয়েছে কি। উত্তরে মেয়েটী বলে—দেখুন ওইটাই আসল কথা নয়। গোঁফ কামালে কি আর গজাত না। আসল কথা হচ্ছে, আমি হচ্ছি ওঁর আদরের স্ত্রী। নূতন বিয়ে হয়েছে, আকাশের চাঁদ চাইলেও ওঁর তা ধরা উচিৎ। আজ এতটুকু একটা আব্‌দার আমি করছি তা উনি রাখতে পারছেন না। এর পর ত আমি আরও অনেক বড় বড় আব্‌দার করব, তার ত তিনি কিছুই রাখবেন না। আমি বুঝতে পারছি লোকটার সঙ্গে আমার বনবে না। এর পর দু-একটা ছেলে-পুলে হলে আর সরে পড়তে পারব না। এখনই মানে মানে সরে পড়া ভাল। কলেজে ভর্ত্তি হয়েছি, ঠিক করেছি Nun হব। এর কয়দিন পরেই অপর একটী ঘটনা ঘটে, ঘটনাটি Transitional periodএর একটি বিশেষ নিদর্শন। একটী বছর চৌদ্দ বয়স্কের মেয়ে, একটা বছর ২০ বয়সের ছেলের কলার ধরে টেনে আনছিল। কৌতূহল হল—জিজ্ঞেস করলাম—হয়েছে কি খুকী? উত্তরে খুকি বলে উঠে—'দেখুন এই ছেলেটা আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছে, আমাকে অপমান করবার কি "রাইট্" আছে ওর, ছেলেটী ততক্ষণে কেঁদে ফেলেছে' কাঁদতে কাঁদতে সে বলে—দেখুন, ওর সঙ্গে পাড়ার বিধুর সঙ্গে খুব ভাব। মেয়েটী ঠাস্ করে ছেলেটাকে একটা চড় কসিয়ে বললে—যার সঙ্গে ভাব আছে তার সঙ্গে আছে। তোর সঙ্গে আমি কথা কই, তুই আমাকে চিঠি দিস্ কেন? ভাবিস কি তোরা, একজনের সঙ্গে ভাব করলেই সকলের সঙ্গে ভাব করতে হবে। মুর্খ কোথাকার। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ কথা সত্যি? এত ভাল কথা নয়। লজ্জিত হয়ে মেয়েটী বললে—না ঠিক true নয়, তবে half true, সেই ভাল যার শেষ ভাল, আমাদের বিয়েও ত হতে পারে। উত্তরকালে মেয়েটী পালিয়ে গিয়ে ওই বিধুকেই বিয়ে করে। মেয়েটীর সঙ্গে মুলাকাৎ করে, তাকে বাড়ী ফিরতে পরামর্শ দিই এবং গুরুজনদের বাধ্য হতে বলি। উত্তরে মেয়েটী বলে—"দেখুন গুরুজনকে ভক্তি করা উচিৎ, ঠিক যতটা করা উচিৎ ততটা, তার বেশীও না, কমও না।"

(ক্রমশঃ)

শরৎ সাহিত্যের একদিক

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শরৎচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব রচনা শক্তির দীক্ষা কোথা হইতে পাইলেন —ইহা জানিবার জন্ত আমার বড়ই আগ্রহ ছিল। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝিয়াছিলাম তিনি Continental Litt. বিশেষ কিছুই পড়েন নাই।—দুই চারিখানা ইউরোপীয় উপন্তাস যাহা তিনি পড়িয়াছিলেন—তাহা অনেক পরে,—তাঁহার শক্তির পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভের পরে। যাঁহারা মনে করেন শরৎচন্দ্র বিদেশী সাহিত্য হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছেন—তাঁহারা ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাস শরৎচন্দ্র বার বার পড়িয়াছিলেন কৈশোরে,—তাহা হইতে তাঁহার কল্পনা-শক্তির পরিপুষ্টি হয় এবং ঔপন্তাসিক মনের গঠন হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেই তিনি গুরু বলিয়া মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" খুব পুখানুপুখ রূপে পড়িতে গিয়া মনে হইল,— শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনাভঙ্গী, চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শের প্রেরণা পাইয়াছেন নিশ্চয়ই এই পুস্তক হইতে।

শরৎচন্দ্রকে তাই একদিন বলিলাম—"আমি একটা আবিষ্কার করেছি। আপনি লিখবার প্রেরণা পেয়েছেন 'চোখের বালি' পড়ে।" শরৎচন্দ্র বলিলেন—"তুমি ঠিক ধরেছ। আমি ঐ 'চোখের বালি' খানা পড়েছি ২৪ বার, আর রীতিমত ওর ওপর দাগা বুলিয়েছি। তবে আরেকখানা বইয়ের নাম তুমি করলে না কেন? আমি 'নষ্টনীড়ের' কথা বলছি। ওখানাও আমি অন্ততঃ বিশ বার পড়েছি। আমার সাহিত্য-রচনার দীক্ষা ঐ বই দুইখানা হতে।"

এই কথাগুলির আবেগোচ্ছ্বাসের অন্তরালে সত্য নিহিত আছে। বলা বাহুল্য, কোন একখানা বই কেন—একটা গোটা লাইব্রেরি পড়িয়াও একজন লোক শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিক হইয়া উঠিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের সৃজনশক্তি ও রসদৃষ্টি তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভার নিজস্ব সম্পদ। এখানে কেবল নানাবিধ প্রেরণার মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রেরণার কথাই বলা হইল।

শরৎচন্দ্র বলিতেন—"দেখ, অমুক প্লট প্লট ক'রে রবীন্দ্রনাথকে অস্থির করে। সে মনে করে একটা প্লট পেলেই বুঝি একখানা উপন্তাস লেখা হয়ে গেল। সে প্লটের জন্ত বিলিতি নভেলগুলো প'ড়েও অনেক সময় নষ্ট করে। আবার শুনেছি প্লটের জন্ত প্রত্যেক সন্ধ্যায় বায়স্কোপও দেখে। লিখতে জানলে প্লটের জন্ত কি আটকায়? আমি ত কোন প্লট ভেবে লিখতে বসিনা। একটা কোন চোখে-দেখা সত্য ঘটনা অথবা একটা ঘরসংসারের চিত্র নিয়ে সুরু করে দিই—তারপর কলম চলতে থাকে। কলম আমাকে যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে চ'লে যাই। তাতে যা হোক একটা কাঠামো দাঁড়ায়। তার পর যা স্বাভাবিকভাবে আসবার কথা তাই আসে। কোন একটা বিচিত্র জিনিষ জানি বলেই সেটাকে জোর ক'রে ঢুকোবার চেষ্টা করিনা। এতে যদি কোন প্লট না দাঁড়ায় তাতেই বা কি আসে যায়? আর কিছু হোক না হোক—বাঙ্গালী জীবনের একটা চিত্র তো ফুটে ওঠে। তা হলেই সাহিত্য হলো। ঘটনা ছাড়া যে চরিত্র বা জীবন ফুটবে না এমন তো কথা নেই। যেখানে বাইরের ঘটনা জোটে সেখানে ঘটনাকেই অবলম্বন করা যায়। যেখানে জোটে না—সেখানে মুখের কথায়—আচারে, ব্যবহারে হাবভাবে চালচলনে চরিত্র ফোটে,—জীবনও ফোটে। চরিত্রগুলি যে আমাদের মতই জীবন্ত।—তাদের মনন-শক্তি আছে, মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় আছে। তাদের মনের ভিতরে ভিতরে কি মহামারী কাণ্ডই না হচ্ছে! সেখানে ভাবের সঙ্গে ভাবের, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের কি কুরুক্ষেত্রই না হচ্ছে! মনের ভিতরকার সে ঘটনাগুলো বাইরের ঘটনার চেয়ে ঢের বেশী জলন্ত। সেগুলোর কথা লিখলেই তো প্লটও হয়—সাহিত্যও হয়।"

শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলো ছিল অনেকটা রক্ত-মাংসে জীবন্ত, রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনের উপন্তাসের চরিত্রগুলোর মত Ideas personified নয়। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলোকে বরং Persons idealised বলা যায়। যে মানুষকে শরৎচন্দ্র নিজের চোখে দেখেন নাই—সে মানুষকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিতে চাইতেন না,—অন্ততঃ প্রথম জীবনের রচনায়।

শরৎ সাহিত্য জীবন্ত মানুষেরই কল্পিত কাহিনী। তবে কি শরৎ সাহিত্য Photograph? তাহা নয় বলিয়াই তাঁহার চরিত্রগুলোকে বলিলাম Persons idealised. তিনি যে সব মানুষকে দেখিয়াছেন—তাঁহার মনের রঙে রঙিন্ হইয়াই তাহারা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। এজন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট রঙ্ চড়াইতে হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে রঙের উপর রসান দিতে হইয়াছে। এইরূপ Emphasis দিতে গিয়াই জীবন্ত চরিত্র Idealised হইয়াছে, কিন্তু অস্বাভাবিক বা অসত্য হইয়া উঠে নাই।

তাঁহার রচনার একটা প্রধান Technique হইল অরঞ্জিত বাস্তব চিত্র দিয়া অর্থাৎ Photograph দিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করেন—তাহার দ্বারাই তিনি পাঠকের বিশ্বাস ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে রঙ্ চড়াইতে আরম্ভ করেন—ফলে, সত্য কথাই রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন তাহার সঙ্গে অনেক অবাস্তবতাও বেশ সহজ ও স্বাভাবিক-ভাবেই চলিয়া যায়। যেখানে Photograph সেখানে শরৎ-চন্দ্রের একটা সজ্ঞান সতর্কতা আছে। তিনি যেখানে আলোক চিত্র মাত্র দিয়াছেন, সেখানে কোন অপূর্ব্ব বিচিত্র অথচ পরম সত্য ঘটনা বা বাস্তব দৃশ্যেরই অবতারণা করিয়াছেন। শুধু কথা সত্য হইলেই তো পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে না। সত্য হওয়া চাই, সেই সঙ্গে অনন্তসাধারণ বা অপূর্ব্ব হওয়া চাই। শরৎচন্দ্র তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতেন।

Landscape painting তাঁহার সাহিত্যে বড় নাই। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার কোন বিশেষ মমতা ছিল না। মানুষই তাঁহার চিত্ত জুড়িয়া ছিল। মানুষের বিচিত্র সুখ দুঃখের লীলাই তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। প্রকৃতি তাঁহার রচনায় পটভূমিকা, চালচিত্র বা আবেষ্টনীর কাজটুকু করিয়াছে, কোথাও প্রাধান্ত লাভ করে নাই। কোথাও কোথাও প্রকৃতি ও মানবজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেন—"প্রকৃতিকে প্রাধান্ত দিলে কবিতা হয়—প্রকৃত কথা-সাহিত্য হয় না—হইলেও তাহা unreal হয়। প্রকৃতির প্রতি অস্বাভাবিক দরদ কবিকল্পনা মাত্র।

যে সকল চরিত্র লইয়া কথা-সাহিত্য রচিত হয়, তাহাদের এক আধজন কবি-প্রকৃতির মানুষ হইতে পারে, বাকি প্রায় সকলেই সাধারণ মানুষ। তাহাদের প্রকৃতির প্রতি গভীর সহানুভূতি থাকিবার কথা নয়। ঔপন্যাসিক নিজে কবি হইলে তাঁহার কল্পিত প্রত্যেক চরিত্রকে কবি-ভাবাপন্ন করিয়া তোলেন। ফলে, প্রকৃতিই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে।"

শরৎচন্দ্রের কথা সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব এই যে, যেখানে আমরা মনুষ্যত্বের বা মহত্বের কোন প্রত্যাশা করি না, সেখানে তিনি মনুষ্যত্ব ও মহত্বের আকস্মিক আবির্ভাব দেখাইয়া আমাদের চিত্তে একটা বিস্ময়ানন্দের সৃষ্টি করেন। যে সম্পর্কে আমরা স্নেহ, মমতা, করুণা ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তির সঞ্চার প্রত্যাশাই করি না—ঠিক সেই সম্পর্কেই ঐ সকল বৃত্তির সঞ্চার দেখাইয়া তিনি আমাদের মুগ্ধ কৌতূহলের উদ্রেক করেন। কেবল সঞ্চার মাত্র নয়—ঐ সকল বৃত্তির অস্বাভাবিক প্রাবল্য দেখাইয়া আমাদের প্রচলিত ধারণার মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দেন। ইহাতে একটা অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে যে চমক্ জাগে তাহা আমাদের শুধু আনন্দ দেয় না—অভিনব সত্যেরও সন্ধান দেয়। শরৎচন্দ্র এইরূপ চরিত্রাঙ্কনের দ্বারা বলিতে চাহেন—মানবচরিত্র অতি জটিল,—বিচিত্র, রহস্যময় ইহার-গতি প্রকৃতি। ইহার সম্বন্ধে যাহারা একটা গতানুগতিক, বাঁধাধরা ধারণা পোষণ করে তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা জীবন-সত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। মানব-জীবনের উপরিভাগে সত্য ভাসিতে থাকে না—ইহা তাহার গভীর গহনতলে বিরাজ করে। সমগ্র জীবনটাকে আলোড়িত করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা মানবচরিত্র ও মানব জীবনকে এইভাবে আলোড়িত করিয়া দেখাইয়াছে—মানুষের মনোজগতে আমাদের প্রত্যাশার অতীত লোকে কত বিচিত্র লীলাই চলিতেছে, আমরা তাহার সন্ধান রাখি না। তাই কেবল অপ্রত্যাশিতের চমক নয়—সত্যের আবিষ্কারের আনন্দও আমরা ইহাতে লাভ করি।

শরৎচন্দ্র একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের অবতারণা করিয়া আমাদের চিরপোষিত ভাবধারায় সহসা আঘাত দেন, কিন্তু সে আঘাত আমরা বিচিত্রকে পাই। লেখক ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ ও ভাবসংঘর্ষের মধ্য দিয়া চরিত্রের ক্রমোন্মেষের ধারায় অনন্যসাধারণ কলাকৌশলে সে আঘাত আমাদের ভুলাইয়া দেন। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া জীবন-সত্যকে লাভ করিয়া আমরা আনন্দই পাই।

শরৎচন্দ্রের "মেজদিদি" গল্পটি তাঁহার এই বিশিষ্ট Technique-এর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর জা-এর বৈমাত্রেয় ভাই নিঃসম্পর্ক কেষ্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর সন্তানস্নেহের প্রাবল্য আমরা প্রত্যাশা করি না। এরূপ সম্পর্কে স্নেহাতিশয্য আমাদের সাধারণ বিশ্বাসে ঠিক স্বাভাবিক নয়। শরৎচন্দ্র হেমাঙ্গিনী চরিত্রটিকে দুই পরিবারের ভাবসংঘর্ষের মধ্য দিয়া এমন করিয়া গড়িয়াছেন ও এমনভাবেই ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে আমাদের প্রত্যাশা ও ধারণার অতীত ,স্তরে বাৎসল্য-রসের ক্রমোন্মেষ-ধারাটি সহজ, স্বাভাবিক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবের চমক, ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা মাতৃ-হৃদয়ের ক্রমবিকাশ ও তদ্দ্বারা একটি জীবন-সত্যের আবিষ্কার মেজদিদি গল্পটিকে অপূর্ব্ব রসসাহিত্যের নিদর্শন করিয়া তুলিয়াছে।

"রামের সুমতি" গল্পে এই সত্যের উপর প্রখরতর আলোক-পাত করা হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত বাৎসল্যের সম্পর্কটি ও মাতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক আকূতির উপর আরো বেশী Emphasis দেওয়া হইয়াছে। মেজদিদির কেষ্ট শান্ত সুবোধ ছেলে—স্বভাবতই স্নেহের পাত্র,—করুণা এখানে বাৎসল্য উন্মেষের সহায়তা করিয়াছে। রামের সুমতির রাম দুর্দান্ত, দুর্ললিত ও উচ্ছৃঙ্খল—বাৎসল্য উদ্রেক করিবার মত কোন গুণ তাহার মধ্যে নাই। রাম বৃন্দাবনের দুর্ললিত কালো ছেলেটির কথা মনে পড়ায়। নারায়ণীর চরিত্রে তাই যশোদার ছায়াপাত হইয়াছে।

রামের আচরণ অপ্রত্যাশিতের দূরত্ব আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবন হইতেই এ জীবন সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই এইখানে নারায়ণীর স্নেহাতিশয্য অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত হইলেও, অস্বাভাবিক হয় নাই। রামের আচরণ প্রীতিজনক নয়—স্বভাবতই কাহা[illegible] স্নেহ-ভালবাসা পাইবার অধিকার তাহার নাই। কেহই [illegible]হাকে ভালবাসে না—কাজেই নারায়ণীকে বেশী করিয়া ভালবাসিতে হইতেছে—সকলের ভালবাসার অভাব একা তাহাকে পূরণ করিতে হইতেছে। সর্ব্বত্র স্নেহ হইতে বঞ্চিত হওয়ার দুর্ভাগ্য নারায়ণীর মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহকে জোরালো ও তেজালো করিয়াই তুলিয়াছে। তাই স্নেহের মধ্যে একটা জেদেরও সঞ্চার হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রাম যে নারায়ণীর প্রথম যৌবনের শূন্য অঙ্কটিকে সন্তানেরই অনুকল্পরূপে জুড়িয়া বসিয়াছিল—এ কথাটিও ভুলিলে চলিবে না।

অপ্রত্যাশিতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র হেমাঙ্গিনী ও নারায়ণী দুইজনকেই সন্তানবতী রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

আপন গর্ভজাত সন্তানের দ্বারা উভয়ের মাতৃত্বের তৃষ্ণা মিটিয়াছে। তবু তাহারা পরের সন্তানকে আপন সন্তানের মত ভালবাসিতেছে। ইহাতেও অস্বাভাবিকতা নাই। এস্থলে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য, যে নারী নিজে জননী হয় নাই, সে মাতৃত্বের মহিমা বা মাধুর্য্য সম্যক উপলব্ধি করে না। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য, যে নারী নিজের সন্তান হয় নাই সে পরের ছেলেকে গভীরতর মাতৃমমতায় বুকের কাছে টানিয়া লয়। 'বিন্দুর ছেলের' বিন্দুর চরিত্রে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। নারীত্বের আদর্শ শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল অত্যুচ্চ। নারীত্বের স্বাভাবিক সহৃদয়তার মহিমা কীর্ত্তনের জন্যই শরৎচন্দ্র নারী-হৃদয়ের মাতৃ-বাৎসল্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। অমূল্য, রাম ও কেষ্ট উপলক্ষ মাত্র। ব্যাপারটি যতটা subjective, ততটা objective নয়। হৃদয়-মাধুর্য্যের উন্মেষ সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের ব্যাপার, তাহার বহিঃপ্রকাশের একটা অবলম্বন চাই। সেজন্য একজন অমূল্য, কেষ্ট কিংবা রামের প্রয়োজন। এই সত্যটি রামের সুমতিতে বেশি করিয়াই পরিস্ফুট হইয়াছে।

বিন্দুর ছেলে ও রামের সুমতির মধ্যে ভাবগত ঐক্য আছে। 'বিন্দুর ছেলে'র আখ্যানবস্তুতেও অপ্রত্যাশিত স্নেহ-সম্পর্কের অবতারণা আছে এবং ইহার মধ্যেও হৃদয়-সত্যের আবিষ্করণ আছে। তবে 'রামের সুমতি' ও মেজদিদির তুলনায় এক্ষেত্রে অপ্রত্যাশার মাত্রা কম। বিন্দু অমূল্যের খুড়ীমা এবং

মাতৃস্থানীয়া। আর বিন্দুর কোন সন্তানাদি হয় নাই, তাহার অঙ্ক শূন্যই ছিল। এক্ষেত্রে বাৎসল্যভাবের আতিশয্যটাই প্রত্যাশার অতীত। আতিশয্যটা প্রকট হইয়াছে অন্যান্য পারিবারিক সম্বন্ধের সহিত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে।

এই গল্পে আর একটি অপ্রত্যাশিত স্নেহ-সম্পর্কের সমাবেশ আছে। ভাসুর যাদবের অতিরিক্ত স্নেহ ভ্রাতৃবধূ বিন্দুর প্রতি। কথায় বলে ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক। উভয়ের মধ্যে হৃদয়ের পরিচয় দূরে থাকুক, বাহিরের পরিচয়ও থাকিবার কথা নয়। "বিন্দুর ছেলে"র বিন্দু যাদবের কন্যারও অধিক। দুইটী পাশাপাশি প্রবাহিত স্নেহ-প্রবাহের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে যেন মাধুর্য্যের সঞ্চার বেশি হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতা আছে, পূর্ব্ববর্তী কোন রসপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি নয় তাহা ছাড়া, প্রথমটিতে কতকটা ভাবাকুলতা আছে,—দ্বিতীয়টি যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যেন হৃদয়লোকের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ শরৎচন্দ্রের আলোকে সহসা আবিষ্কৃত।

বৈমাত্র অমূল্যধনের গর্ভধারিণী জননীর চেয়ে কাকীমার বাৎসল্য ঢের বেশি। ইহা কেবল অপ্রত্যাশিত নয়—একটু অস্বাভাবিকও মনে হইতে পারে।* এই তথাকথিত অস্বাভাবিকতার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে—বিন্দুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। অতিরিক্ত আত্মাভিমান তাহার চরিত্রে উৎকেন্দ্রিকতার (eccentricity) সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয় ঘটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্নপূর্ণার চরিত্র প্রকৃতিস্থ, বিন্দুর অপ্রকৃতিস্থ। অন্নপূর্ণা দরিদ্রকন্যা—দরিদ্রবধূ। বিন্দু ধনীর কন্যা—উপার্জ্জনক্ষম স্বামীর স্বেচ্ছাচারিণী পত্নী। যাদব ও মাধব দুই ভাইই নিরীহ, নিষ্ক্রিয়,—নারীদের ব্যাপারে উদাসীন। যেখানে শরৎচন্দ্র নারীহৃদয়ের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন, সেখানে পুরুষকে এইরূপ নিষ্ক্রিয় (passiue and inactevie) করিয়াই রাখেন।

এরূপ ক্ষেত্রে বিপর্য্যয়টা ঘোরালো হইবারই কথা। এই বিপর্য্যয় দুইটী পাশাপাশি সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। একটি সংঘর্ষ বিন্দুর চরিত্রের সহিত অন্নপূর্ণার চরিত্রের—আর একটি সংঘর্ষ বিন্দুর নিজের চরিত্রেরই মধ্যে। তাহার আত্মাভিমানও যত প্রবল—স্নেহাকুলতাও তেমনি প্রবল। কেহই ছোট হইতে চায় না। ফলে এই দুই-এর মধ্যে সংঘর্ষ। বিন্দুর Dual Personalityর দ্বন্দ্ব আমাদিগকে চমকিত করিয়া আমাদিগের কৌতূহলকে উৎকর্ণ করিয়া তোলে। এই Dual Personalityই বিন্দুর মুখের সঙ্গে বুকের মিল রাখিতে দেয় নাই। বিন্দু মুখে যাহা বলিয়াছে সব সময় বুক তাহাতে সায় দেয় নাই। ইহা আমাদের কেবল চমক জাগায় না—নূতন সত্যেরও সন্ধান দেয়।

* এক্ষেত্রে যাহা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে তাহা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবিত বা মৃত গল্পে কৈফিয়তের ছলে বলিয়াছেন—"পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো বেশি হয়। কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকেনা—তাহার উপর কোন সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি। কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না—এবং চাহেও না। কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।"

এই সত্যেই এই গল্পের সার্ব্বজনীন আবেদন (Universal appeal)। নতুবা অশিক্ষিত সমাজের দুইজন আমার্জ্জিত-বুদ্ধি স্ত্রীলোকের পারিবারিক কলহের কাহিনী সাহিত্যের দরবারে অমরতা লাভ করিতে পারিত না।

বাঙ্গালী সমাজের বিশেষতঃ বাঙ্গালী নারীজীবনের যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে কিছু কালের মধ্যে এইরূপ অন্ধ স্নেহের কাহিনী, এরূপ বাকসংযমের অভাবের নিদর্শন, যাহারা সন্ধি-সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে না এরূপ অমার্জ্জিত চরিত্র ও অসংস্কৃতবুদ্ধি নারীগণের গ্রাম্য জীবনের সুলভ কলহ, আদুরে দুলালীদের মত আবদার ও রাগ-অভিমানের পালা ক্রমে হাস্যকর, অস্বাভাবিক ও নিতান্ত গ্রাম্য ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু বিন্দুর ছেলে বিষয়-বস্তুগত দাবি হারাইলেও সাহিত্যরসের দাবি হারাইবে না। ইহাতে স্নেহ-বিপর্য্যয় ও স্নেহাকুলতাজনিত রস যেমন একদিকে ইহাকে উচ্চসাহিত্যে পরিণত করিয়াছে, দুই প্রবল মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বে যে মনস্তত্ত্বমূলক সত্যের আবিষ্কার ঘটিতেছে অন্যদিকে তাহা তেমনিই ঐ সাহিত্যকে বিশ্বজনীন আবেদনে মণ্ডিত করিতেছে। রচনাভঙ্গীর চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য-ত' ইহার সঙ্গে আছেই। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র স্নেহাবেগের বৈচিত্র্যই সৎসাহিত্য হইয়া উঠিত না, যদি না ঐ চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য সহযোগিরূপে উহার সহিত বিজড়িত না থাকিত।

শরৎচন্দ্র এই অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্য কেবল নারীচরিত্রের মধ্যে নয়, পুরুষ চরিত্রের মধ্যেও সৃষ্টি করিয়াছেন। 'দর্পচূর্ণ' গল্পটি একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের সমাজে সাধারণতঃ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি পুরুষ প্রভুভাবে দৃপ্ত এবং নারী দাসীভাবে তৃপ্ত; পুরুষের আদেশ-নিদেশ শাসন ও ইচ্ছা নারী নির্ব্বিচারে পালন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে। কতক সামাজিক প্রথানুসারে, কতক পতিপ্রেমলাভের আনন্দেই নারী সাধ করিয়া নিজের ইচ্ছাকে পতির ইচ্ছানুবর্ত্তিনী করিতেছে। "দর্পচূর্ণে" গতানুগতিক শরৎচন্দ্র এই চিত্রও দেখাইয়াছেন। ইহা কিন্তু গল্পের গৌণ অংশ। মুখ্যাংশকে উজ্জ্বল ও জলন্ত করিয়া তুলিবার জন্যই বিমলা-চরিত্রের সৃষ্টি।

'দর্পচূর্ণে' শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন,—পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ নরেন তাহার পত্নীর নিত্যনূতন অত্যাচার সহিয়া যাইতেছে—নিজে ভৃত্যের অধম হইয়া পত্নীর সমস্ত নিদেশ পালন করিতেছে—কিছুতেই তাহার পৌরুষ উদ্দীপিত হইতেছে না। শরৎচন্দ্র এই পুরুষ চরিত্রটিকে সহনশীলতার চরমাদর্শ করিয়া তুলিবার জন্যই তাহার পত্নীকে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিণী, অশিষ্টা, কঠোর-ভাষিণী ও হৃদয়হীনা করিয়া তুলিয়াছেন। নরেন তাহার পত্নীর প্রেম লাভ না করিয়াই তাহার কল্পিত প্রেমে আত্মহারা। নরেনের চরিত্রে কঠোরতা যে নাই তাহা নয়, কিন্তু সে কঠোরতা ও পৌরুষের প্রকাশও অপ্রত্যাশিত। সে নিজেকে দারুণ দণ্ড দিয়া নিজে চরম নিগ্রহ বরণ করিয়া নিগৃহিত পৌরুষের প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ পৌরুষের প্রতিক্রিয়া যে হয় না তাহা নয়—তবে বিলম্বে।

নরেনের চরিত্রে এই অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্র আমাদের কৌতূহলকে চমকিত করিয়া গল্পের রসসৃষ্টি করিয়াছেন।

নরেনের পত্নীর চরিত্রেও শরৎচন্দ্র অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার প্রত্যেক কথাটা—প্রত্যেক আচরণটি আমাদের চমকিত করে—সবই হিন্দু নারীর মুখে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অস্বাভাবিক বলিবার উপায় নাই। এমনভাবেই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে তাহার পক্ষে সবই যেন স্বাভাবিক মনে হয়। বিমলার মত আমরাও অবাক হইয়া যাই। তাহার দর্পচূর্ণ। আমরা যেভাবে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম শরৎচন্দ্র সে ভাবে তাহা না দেখাইয়া পাঠকগণকে চমকিত করিয়াছেন।

চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রাত্রি' গল্পে গদ্য কবিতায় পরিণত হইয়াছে তাহাই শরৎচন্দ্রের দর্পচূর্ণে গল্পের রূপ ধরিয়াছে।

অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতে গিয়া কোথাও কোথাও শরৎচন্দ্র স্বাভাবিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অলস ভাববিলাসের (Cheap Sentimentality) সৃষ্টিও করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'আঁধারে আলো' গল্পটির নাম করা যাইতে পারে। পতিতার কাছে প্রেমের আত্মোৎসর্গময় উচ্চাদর্শ আমরা প্রত্যাশা করি না। শরৎচন্দ্র কোন কোন রচনায় তাহাও দেখাইয়াছেন এবং তাহাতে আমরা চমকিত হইয়াছি—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। দীর্ঘ পরিসরের মধ্যে ধীরে ধীরে পতিতার হৃদয়ের রূপান্তর দেখাইয়া স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছেন। এই হিসাবে দেবদাসের চন্দ্রমুখী চরিত্রের রূপান্তর অপ্রত্যাশিত হইলেও অস্বাভাবিক মনে হয় না।

'আঁধারে আলো' গল্পের অল্প পরিসরের মধ্যে পতিতা নারীর একটা আকস্মিক রূপান্তর দেখাইয়া আমাদিগকে চমকিত করিয়াছেন কিন্তু জীবন সত্যের সঙ্গে আমরা তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি না।

১৫।১৬ দিন ধরিয়া সাক্ষাতের ফলে গঙ্গাস্নানের পথে সত্যেনের প্রতি বিজলীর প্রেম সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন তাহাতেও প্রেম সঞ্চার হয় নাই। এই কয়দিন ধরিয়া পতিতা, ধনীর সন্তান বলিয়া সত্যেনকে বন্দী করিবারই ফন্দীই আঁটিয়াছে। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অজ্ঞাত প্রণয়ীদের সম্মুখে কেহ বাঁদর নাচায় না—সঙ্ সাজায় না। সত্যেন পতিতার ইতরামিতে যোগ দিল না বলিয়াই তাহার প্রতি পতিতার সহসা শ্রদ্ধা জন্মিল এবং সেই শ্রদ্ধার পরিণতিই ভালবাসা। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ভালবাসা এমনি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, তাহাতে তাহার সাজসজ্জা বিলাস-বিভ্রম সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। যে জঘন্য আবেষ্টনীর মধ্যে পতিতা তাহার প্রেমাস্পদকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল—তাহার মধ্যে গণিকাদাস ইতর ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেরই সত্যেনের মতই মনোভাব জন্মিত। সত্যেনের অসাধারণতা সেখানে এমন কিছুই নাই। এই আকস্মিক ভালবাসা পতিতাকে তপস্বিনী করিয়া তুলিল। তারপর সত্যেনের পুত্রের অন্নপ্রাশনের দৃশ্যে তাহাকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে—তাহার জীবনের পরিবর্ত্তনটা দেখানোর জন্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে চমকও লাগে না—রসতৃষ্ণারও তৃপ্তি হয় না—ইহাতে স্বাভাবিকতাও খুঁজিয়া পাই না। এইরূপ Cheap sentimentality আমাদিগের মর্ম্মস্পর্শ করে না।

এইরূপ দুই-এক স্থলে শরৎচন্দ্রের এই বিশিষ্ট Technique সার্থকতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই চমৎকার রসসৃষ্টি করিয়াছে।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

৩

মূল: ১। প্রকৃতি-ব্যসন-বর্গ। ২। রাজা ও রাজ্যের ব্যসন-চিন্তা। ৩। পুরুষ-ব্যসন-বর্গ। ৪। পীড়ন-বর্গ। ৫। স্তম্ভ-বর্গ। ৬। কোশ-সঙ্গ-বর্গ। ৭। বল-ব্যসন-বর্গ। ৮। মিত্র-ব্যসন-বর্গ। ইতি 'ব্যসনাধিকারিক' নামক অষ্টম অধিকরণ।

সঙ্কেত:—১। প্রকৃতি—স্বামী, অমাত্য ইত্যাদি; ব্যসন—বিপৎ, গুণের প্রতিলোমতা, দোষ; বর্গ—সমূহ। The aggregate of the calamities of the elements of sovereignty (SH). ২। রাজা—স্বামী; রাজ্য—অমাত্যাদি পঞ্চ প্রকৃতি ও পঞ্চবিধ দ্রব্য-প্রকৃতি; considerations about the troubles of the King and the Kingdom (SH)। বস্তুতঃ, Kingdom বলিলে 'রাজ্যে'র যথার্থ অর্থ পরিস্ফুট হয় না। ৩। পুরুষ—men (SH)। ৪। পীড়ন—অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মরক ইত্যাদি শক্তির অপচয়-হেতুকে পীড়ন বলা হয় (গঃ শাঃ); group of molestations (SH)। ৫। স্তম্ভ—বিঘ্ন-বাধা রাজকার্য্যের বাধা সৃষ্টি (গঃ শাঃ), obstructions (SH)। গণপতি শাস্ত্রীর ধৃত পাঠ—"স্তম্ভনবর্গঃ"। ৬। কোশ—রাজার অর্থ; সঙ্গ—অপ্রদান (গঃ শাঃ); financial troubles (SH)। ৪, ৫ ও ৬—এই তিনটি প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৭। বল—চতুরঙ্গ সৈন্য—মৌল-ভৃতকাদি ভেদে ষড় বিধ। উহার ব্যসন—অমানিত, বিমানিত ইত্যাদি ৩৩ প্রকার (গঃ শাঃ); troubles of the army (SH)। ৮। মিত্র ব্যসনবর্গঃ—group of troubles of a friend (SH)। ৭ ও ৮ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ব্যসনাধিকারিক—ব্যসন—ঘটিত—concerming vices and calamities (SH).

মূল: ১। শক্তি-দেশ-কালের বলাবল-জ্ঞান। ২। যাত্রা-কাল-সমূহ। ৩। বলোপদান-কাল-সমূহ। ৪। সন্নাহগুণসমূহ। ৫। প্রতিবল-কর্ম্ম। ৬। পশ্চাৎ-কোপচিন্তা। ৭। বাহ্যাভ্যন্তর-প্রকৃতি-কোপ-প্রতীকার। ৮। ক্ষয়-ব্যয়-লাভ-বিপরিমর্শ। ৯। বাহ্য ও আভ্যন্তর আপৎসমূহ। ১০। দূষ্য ও শত্রুগণের সহিত (আপৎ)। ১১। অর্থানর্থ-সংশয়যুক্ত (আপৎসমূহ)। ১২। তাহাদিগের (প্রশমনার্থ) উপায়-সমূহের বিকল্প-জনিত সিদ্ধিসমূহ। ইতি 'অভিযানকারীর কর্ম্ম' নামক নবম অধিকরণ।

সঙ্কেত:—১। শক্তি—বিজিগীষুর স্বপক্ষের ও বিপক্ষের (অরি-পক্ষের) শক্তি-বিচার; দেশ-কাল-সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য।

সাধারণতঃ গৃহীত অর্থ—শক্তি-দেশ-কালের বলাবল-সম্বন্ধে জ্ঞান (গঃ শাঃ)—সূত্রেরও তাৎপর্য্য ঐরূপ। শ্যামশাস্ত্রীর ভাবান্তর অন্যরূপ—শক্তি-দেশ-কাল-বল-অবলের জ্ঞান—knowledge of power, place, time, strength and weakness (SH)। ২। যাত্রা—শত্রুর প্রতি অভিযান—তাহার কাল তদ্‌যোগ্য ঋতু (গঃ শাঃ); time of invasion (SH)। ১ ও ২ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৩। বল—মৌল-ভৃতকাদি ষড়্‌বিধ সৈন্য। তাহাদিগের উপাদানকাল—উদ্যোগের সময়। অমুক প্রকার সৈন্যের অমুক সময়ে সমুদ্যোগ কর্ত্তব্য—এইরূপ বিষয় এ প্রসঙ্গে বিচরিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); time of recruiting the army (SH)। ৪। সন্নাহ—শস্ত্রাবরণ-গ্রহণ—সৈন্য-সজ্জা। তাহার গুণ—কি কিরূপে শ্রেষ্ঠ হয়—তাহার বিচার (গঃ শাঃ); the form of equipment (SH); 'form' না বলিয়া 'merits' বলিলে ভাল হইত। ৫। প্রতিবল-কর্ম্ম—পরবলের অভিভবে সমর্থ সৈন্য—প্রতিবল; তাহার ক্রিয়া (করণ-প্রকার)—(গঃ শাঃ); the work of arraying a rival force (SH)। ৩, ৪ ও ৫ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৬। পশ্চাৎ——পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত শত্রু পার্ষ্ণিগ্রাহ ইত্যাদি। পশ্চাৎকোপ—পার্ষ্ণিগ্রাহাদিকৃত কোপ—দাহ ইত্যাদি; considerations of annoyance in the rear (SH)। ৭। বাহ্যপ্রকৃতিসমূহ—রাষ্ট্রমুখ্য অন্তপাল ইত্যাদি; আভ্যন্তর-প্রকৃতিসমূহ—মন্ত্রি-পুরোহিতাদি; তাহাদিগের কোপ অপমানাদি-জনিত চিত্ত-বিকার; তাহার প্রতিবিধান (গঃ শাঃ); remedies against internal and external troubles (S H)। ৬ ও ৭ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। ৮। ক্ষয়—সৈন্যক্ষয়; ব্যয়—হিরণ্য-ধান্যাদির অপচয়। লাভ—অভিযানের ফল—ভূম্যাদি-প্রাপ্তি। তাহাদিগের বিপরিমর্শ—লঘুত্ব-গুরুত্ব-বিচার (গঃ শাঃ); considerations about loss of men, wealth and profit (SH)। ৯। বাহ্যাপৎসমূহ—বাহ্য রাষ্ট্রমুখ্য অন্তপাল ইত্যাদি দ্বারা উৎপাদিত বিপৎসমূহ; আভ্যন্তরাপৎ—আভ্যন্তর মন্ত্রি-পুরোহিতাদি-কর্ত্তৃক উৎপাদিত বিপৎসমূহ; ইহাদিগের স্বরূপ ও প্রতীকার—এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); external and internal dangers (SH)। ১০। দূষ্য-শত্রু-সংযুক্তাঃ (মূল) দূষ্য—বিশ্বাসঘাতক পৌর-জানপদগণ ও তাহাদিগের নেতৃবৃন্দ; শত্রু—সহজ-কৃত্রিমাদি। তৎসংযুক্ত—তদুৎপাদিত আপৎসমূহ। তাহাদিগের স্বরূপ ও প্রতিবিধান এস্থলে কথিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); গণপতিশাস্ত্রী বিশেষ্যপদরূপে 'আপদঃ' (আপৎসমূহ) ধরিলেও শ্যামশাস্ত্রী 'পুরুষাঃ'—এইরূপ বিশেষ্য উহ্য করিয়াছেন—persons associated with traitors and enemies (SH)। মূল প্রকরণটি পড়িলে মনে হয় যে কোন ভাবেই অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। ১১। অর্থ—মিত্র-হিরণ্য-ভূমি ইত্যাদি; অনর্থ—উহাদিগের নাশ ও শরীর-হানি; সংশয়—অর্থ ও প্রাণের সন্দেহ। অর্থ-অনর্থ-সংশয়-যুক্ত-আপৎসমূহ (গঃ শাঃ); শ্যামশাস্ত্রীর মতে—অর্থ ও অনর্থের সংশয়—doubts about wealth and harm (S H)—ইহা মূলানুগ হয় নাই। ১২। তাসামুপায়বিকল্পজাঃ সিদ্ধয়ঃ (মূল)—তাসাং—তাহাদিগের—পূর্ব্বোক্ত আপৎসমূহের। উপায়—আপৎ-প্রশমনের উপায়—সাম-দান-ভেদ ও দণ্ড। ঐ সকল উপায়ের বিকল্প—প্রয়োগ-ভেদ; তজ্জনিত সিদ্ধিসমূহ অর্থাৎ প্রতিকারের স্বরূপ (গঃ শাঃ); success to be obtained by the employment alternative strategic means (SH); 'তাসাং' পদটির অনুবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১১ ও ১২ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। অভিযাস্যৎ কর্ম্ম (মূল)—অধিকরণটির নাম। অভিযাস্যৎ—যিনি অভিযানে উদ্যোগী—অচিরে অভিযান করিবেন—এমন বিজিগীষু। অভিযানের পূর্ব্বে অভিযানেচ্ছু বিজিগীষুর চিন্তনীয় বিষয়সমূহ এ অধিকরণে আলোচিত হইয়াছে।

মূল: ১। স্কন্ধাবার-নিবেশ। ২। স্কন্ধাবার-প্রয়াণ। ৩। বলব্যসনাবস্কন্দ-কাল-রক্ষণ। ৪। কূটযুদ্ধ-বিকল্প-সমূহ। ৫। স্বসৈন্যোৎসাহন। ৬। স্ববলান্যবল-ব্যায়োগ। ৭। যুদ্ধভূমি-সমূহ। ৮। পত্তি-অশ্ব-রথ-হস্তিকর্ম্ম। ৯। পক্ষ-কক্ষ-উরস্য (ব্যূহ)-সমূহের বল-পরিমাণানুসারে ব্যূহ-বিভাগ। ১০। সার-ফল্গু-বল-বিভাগ। ১১। পত্তি-অশ্ব-রথ-হস্তি-যুদ্ধ-সমূহ। ১২। দণ্ড-ভোগ-মণ্ডল-অসংহত (ইত্যাকার) ব্যূহ-সমূহের ব্যূহন। ১৩। তাহার প্রতিব্যূহ-স্থাপন। ইতি 'সাঙ্গ্রামিক' নামক দশম অধিকরণ॥

সঙ্কেত:—১। স্কন্ধাবার—শিবির, সৈন্যাবাসস্থান; তাহার নিবেশ—নির্ম্মাণ-বিধি (গঃ শাঃ); encampment (SH)। ২। স্কন্ধাবার অর্থাৎ কটকের (সেনার) দেশ-কালাদির অনুগুণ সন্নাহ-পূর্ব্বক অভিযান (গঃ শাঃ); march of the camp (SH)। ৩। বল-ব্যসন—অমানিত, বিমানিত ইত্যাদি ৩৬ প্রকার [৮ম অধিকরণ, ৭ম প্রকরণ দ্রষ্টব্য]। অবস্কন্দকাল—দীর্ঘকান্তার, জলহীন পথে গমন প্রভৃতির কাল; ঐ সকল হইতে সৈন্যসংরক্ষণ (গঃ শাঃ); protection of the army in times of distress and attack (SH); অনুবাদ মূলানুগ নহে। ২ ও ৩ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। ৪। কূটযুদ্ধ-বিকল্পসমূহ—কূটযুদ্ধ—কপটযুদ্ধ; বলব্যসন, অবস্কন্দকাল ইত্যাদি ছিদ্র পাইয়া শত্রুহিংসা; তাহার বিকল্প অর্থাৎ ভেদ-সমূহ; forms of treacherous fights (SH)। ৫। সংগ্রাম-গুণ-বর্ণনা দ্বারা নিজ-পক্ষীয় সৈন্যগণের অন্তরে যুদ্ধার্থ উৎসাহ-জনন (গঃ শাঃ); encouragement to one's own army (SH)। ৬। পরসৈন্যের অপেক্ষায় স্বসৈন্যের ব্যায়োগ—অর্থাৎ বিশিষ্টরূপে আয়োজন বা ব্যবস্থাপন—দিক্-সূর্য্য-বায়ু ইত্যাদির আনুগুণ্য যাহাতে হয় সেই প্রকারে ব্যূহরচনা; fight between one's own and enemy's armies (SH); শ্যামশাস্ত্রী মহোদয় 'ব্যায়োগ' অর্থে 'যুদ্ধ' বুঝিয়াছেন, কিন্তু ব্যায়োগ—বিশেষরূপ আয়োজন—গণপতি শাস্ত্রী মহোদয়ের এই অর্থ অতি সুসঙ্গত ও মূলানুগত; ৪, ৫ ও ৬ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৭। যুদ্ধের অনুকূল ভূমি—সম-স্থির ইত্যাদি প্রকার (গঃ শাঃ); battlefields (SH)। ৮। পত্তি—পদাতি—চতুরঙ্গ সৈন্যের যুদ্ধ-প্রক্রিয়া; work of infantry, cavalry, chariots and elephants (SH)। ৭ ও ৮ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ৯। পক্ষদ্বয়—পক্ষব্যূহাকারে স্থাপ্যমান সৈন্যের বাহিরের পক্ষাকৃতি দুইটি অংশ; কক্ষদ্বয়—উহার পশ্চাদ্ভাগস্থিত অন্তঃপার্শ্বদ্বয়; উরস্য—মধ্য। এই পাঁচ প্রকার বিশিষ্ট ব্যূহের বলের পরিমাণানুযায়ী ব্যূহ-বিভাগ-ব্যবস্থা এ প্রকরণের বিষয় (গঃ শাঃ); distinctive array of troops in respect of wings, flanks and front (SH)। মূলপাঠ—পক্ষকক্ষোরস্যানাং বলাগ্রতো ব্যূহবিভাগঃ। ১০। সার-ফল্গু-বল-বিভাগ—সারবল—পিতৃ-পৈতামহত্বাদি দণ্ড-সম্পদ্-বিশিষ্ট সেনা; ফল্গু-বল—তদ্বিপরীত ভীরু সৈন্য। তাহাদিগের উভয় শ্রেণীর তারতম্য-বিচার এই প্রকরণে করা হইয়াছে। Distinction between strong and weak troops (SH)। ১১। এই প্রকরণটির অর্থ স্পষ্ট। ৯, ১০ ও ১১ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ১২। দণ্ডব্যূহ (দণ্ডের আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যূহ), ভোগব্যূহ (সর্পকণাকৃতি), মণ্ডলব্যূহ (চক্রাকৃতি), অসংহতব্যূহ (ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে রচিত ব্যূহ)—এইগুলি প্রকৃতি-ব্যূহ—ইহাদিগের বিকৃতি-ব্যূহও আছে। সে সকলের রচনা-প্রকার এস্থলে কথিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); array of the army like a staff, a snake, a circle or in detached order (SH)। ১৩। দণ্ড প্রভৃতি ব্যূহের প্রতিঘাত করিতে পারে এরূপ নানাবিধ ব্যূহের স্থাপন-প্রক্রিয়া এ প্রকরণে কথিত হইয়াছে।

The array of army against that of an enemy (SH); ইহা ঠিক মূলানুগত হয় নাই; counter-array of army against that (previously mentioned array)—এইরূপ ভাবান্তর হওয়া উচিত ছিল। ১২ ও ১৩ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত। সাংগ্রামিক সংগ্রাম-সম্বন্ধীয়। Relating to war (SH)।

মূল: ১। ভেদোপাদানের (উপায়)-সমূহ। ২। উপাংশু দণ্ড। ইতি 'সজ্যবৃত্ত' নামক একাদশ অধিকরণ।

সঙ্কেত: ১। ভেদ—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটির নাম 'উপায়'। ভেদ—সজ্য বিশ্লেষের উপায়; তাহার উপাদান—গ্রহণ, অর্থাৎ প্রয়োগের পদ্ধতি-সমূহ এই প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); causes of dissension (SH) ২। উপাংশুদণ্ড—উপাংশু—গোপন; দণ্ড—বধ। উপাংশুদণ্ড—তূষ্ণীং দণ্ডঃ নিগূঢ়বধঃ (গঃ শাঃ); Secret punishment (SH) এরূপ ক্ষেত্রে 'দণ্ড' বলিতে 'বধ-দণ্ড'ই বুঝায়; কিন্তু মূলে নির্বাসনাদি দণ্ডেরও ব্যবস্থা আছে। এই দুইটি প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত। সজ্যবৃত্ত—সজ্য—শস্ত্রোপজীবিগণ সজ্যীভূত হইলেই মাত্র বল প্রকাশ করিতে পারে—রাজার অবিধেয় (রাজবিদ্রোহী) হইয়া থাকে। ঐরূপ সজ্যবদ্ধ রাজবিরোধী শস্ত্রোপজীবিগণকে রাজবশ করিবার নিমিত্ত রাজার কর্তব্য এই দুই প্রকরণে কথিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলা সরকারের চাউল রপ্তানীর প্রস্তাব

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের যে তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল নানাভাবে তাহা প্রতিরুদ্ধ হইলেও সে দুর্ভিক্ষের ক্ষত আজিও শুকায় নাই এবং এখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসংখ্য নরনারী অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাইয়া অর্দ্ধাহারে দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। বাংলাদেশের এই ভীষণ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ বিশেষ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ হয় নাই এবং যুদ্ধজনিত কিছু কিছু চাপ ছাড়া ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসা বন্ধ হওয়া প্রত্যক্ষভাবে ও মানুষের লোভী মনোবৃত্তি পরোক্ষভাবে দুর্ভিক্ষের জন্য যে দায়ী একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষুধার তাড়নায় অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া এবং একেবারেই খাইতে না পাইয়া মাত্র ৫।৬ মাসের মধ্যে বাংলার ৩০।৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করার পর বিশ্বব্যাপী তীব্র সমালোচনার প্রভাবে শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় ও বাংলা সরকারের সৌভাগ্যে দেশের খাদ্যসমস্যা কিছু পরিমাণ লঘু হয়। কিন্তু এত লোকের জীবনের বিনিময়েও এদেশে খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন ব্যাপারে মানুষের লোভীমনের লজ্জাকর দৌরাত্ম্য শেষ হয় নাই এবং সম্প্রতি ভারতসরকার খাদ্য ব্যবস্থার শৃঙ্খলা সম্পর্কে অনুসন্ধানাদির জন্য এস্ বাটলার নামক যে বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহার রিপোর্টে দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যবিভাগে ঘুষ প্রভৃতি দুর্নীতির প্রবল প্রকোপ বিরাজমান রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। যাহা হউক আগামী ২৯শে জানুয়ারী নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলনে ভারত সরকার মিঃ বাটলারের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা চালাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং দেশের অনেকেই আশা করিতেছেন যে গভর্ণমেন্টের ঔদাসীন্যের সুবিধা লইয়া যাহারা তীব্র অভাবক্লিষ্ট দেশবাসীর উপর জুলুমবাজী চালাইতেছিল, তাহাদের লোভ অতঃপর কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইবে। কিন্তু এদিক হইতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীর মুখ চাহিয়া খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার দুর্নীতি দূরীকরণে প্রয়াসী হইবার লক্ষণ দেখাইলেও গত দুর্ভিক্ষের পর হইতে বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্য সরবরাহের যে দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা এইবার ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্বত্যাগ প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে বাংলায় যথেষ্ট খাদ্য সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়োজনের অনুপাতে খাদ্য কতখানি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অবশ্য আমরা বলিতে পারিব না, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে যতদিন পর্য্যন্ত চাউল প্রভৃতি খাদ্যশস্যের দর যুদ্ধের পূর্ব্বের দরের তুলনায় চতুর্গুণ থাকিবে, ততদিন এই বিবৃতির যথার্থতা সম্বন্ধে জনসাধারণ অবশ্যই সন্দিহান থাকিবে। চাউলের বা আটার বর্দ্ধিত মূল্যের সহিত অন্যান্য যে কোন ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে, অতএব গভর্ণমেন্ট যদি যথেষ্ট পরিমাণ চাউলাদির জোগানের ব্যবস্থা করিয়া মূল্য নামাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে অসংখ্য লোক জীবনযাত্রার বর্দ্ধিত ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারিত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা না করিতেছেন, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে বিশেষ আশাবাদী হইতে জনসাধারণের পক্ষে অনিচ্ছুক হওয়া স্বাভাবিক। তাহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবস্থা যে বাংলা সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থনলাভ করিয়াছে এমন কোন কথা মন্ত্রীদের মধ্যে কেহ জোর করিয়া বলেন নাই, বরং বাংলার খাদ্যসচিব সুরাবর্দ্দি সাহেব এ সম্পর্কে এমন মনোভাব দেখাইয়াছেন যাহাতে মনে হয় বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে কিছুটা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর কলিকাতার খাদ্যসরবরাহের দায়িত্বত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চাউল রপ্তানী সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে সেগুলি জনসাধারণের আরও ভীতির উদ্রেক করিতেছে। বাংলাদেশের গত দুর্ভিক্ষের প্রথম অবস্থায় খাদ্যাদি জোগানে নিশ্চয়তা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল এবং যাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অর্থবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সংগ্রহের অবাঞ্ছিত আগ্রহে বাজারের অর্দ্ধেক মাল উপিয়া গিয়াছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন সিদ্ধান্তে এবং এখানকার চাউল বাহিরে চালান যাইবার সংবাদে সেই উদ্বেগের ভাব আবার সারাদেশের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাংলা সরকার বর্ত্তমান সংগ্রহনীতি মারফৎ যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে প্রায় ৩ হইতে ৫ লক্ষ টন চাউল বাংলার বাহিরে চালান দেওয়া চলিতে পারে এবং চাউল রক্ষার উপস্থিত ব্যবস্থাদি যেরূপ, তাহাতে অন্ততঃ ২৫ হইতে ৫০ হাজার টন চাউল বাংলার বাহিরে রপ্তানী না করিলে ভাণ্ডারের অভাবে বহুপরিমাণ চাউল খারাপ হইয়া যাইবে।

এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ বাংলা সরকার বাংলা হইতে কিছু চাউল রপ্তানী করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই পরামর্শপ্রার্থনার উত্তরে জানাইয়াছেন যে বাংলাদেশ হইতে চাউল রপ্তানীর পূর্ব্বে বাংলা সরকারের ভাল ভাবে যোগান ও সরবরাহের ব্যবস্থা পরীক্ষা করা উচিত এবং ভাবিয়া দেখা উচিত যেন এই রপ্তানীর ফলে তাঁহাদের খাদ্যনীতি কোন দিক হইতে ক্ষুণ্ণ না হয়। বলা বাহুল্য ভারতসরকার এই উত্তরে যে কথা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং বাংলাদেশ বর্ত্তমানে এমন এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিয়াছে যে এখন তাহার খাদ্যসরবরাহ ব্যাপারে সামান্য শৈথিল্য দেখা দিলে দ্বিতীয়বার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দেখা পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে বাংলা সরকারের ভাবা উচিত যে, রেশন অঞ্চলে যথেষ্ট খাদ্য আছে এই ভরসাতেই রেশনহীন অঞ্চলে চাউলাদির দাম কম থাকিবে, কিন্তু এই রপ্তানীর পর যদি কোনক্রমে প্রচারিত হয় যে রেশন অঞ্চলেও খাদ্যাদি কম পড়িয়াছে, তাহা হইলে বাংলার সর্ব্বত্র হু হু করিয়া চাউল প্রভৃতির দাম বাড়িয়া যাইবে এবং ১৯৪৩ সালের চাউল সংগ্রহের তাড়াহুড়া পুনরায় দেখা দিবার ফলে জনসাধারণের ক্লেশের আর সীমা থাকিবে না। তাছাড়া বাংলার রেশন অঞ্চলের জন্য ১০ লক্ষ টন বা যে পরিমাণ চাউলই সংগৃহীত হউক তাহা হইতে বাংলা সরকারের বাহিরে চাউল রপ্তানী করা সঙ্গত নয়; কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাম্প্রতিক বিবরণীতে দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন জেলায় গত মাসের তুলনায় এখন চাউলের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কয়েক দিনের মধ্যে চাউলের মণ ১২৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকায় উঠিয়াছে, এবং মুন্সিগঞ্জে বর্ত্তমানে চাউলের দর মণপ্রতি কুড়ি টাকা। বাজারের অবস্থা যেরূপ তাহাতে বিভিন্ন জেলায় চাউলের দর আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। চাউল খারাপ হইয়া যাওয়া দুঃখের সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু ভালভাবে ভাণ্ডারজাত করার ব্যবস্থা নাই বলিয়া বাংলার অসংখ্য গ্রামবাসীর অন্নাভাবে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও বাংলা হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী হইবে একথা চিন্তা করাও বাস্তবিক ক্লেশকর। অতীতের খাদ্যনীতিসংক্রান্ত কার্য্যাবলীর দ্বারা বাংলা সরকার এদেশের জনসাধারণকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করিয়াছেন, পুনরায় খেয়ালের বশে তাহাদের স্বার্থহানি করিয়া আবার তাঁহারা তাহাদিগকে দুঃখ দিবেন এরূপ অবশ্য আমরা আশা করি না। ভবিষ্যতে অনটনের সমস্ত দায়িত্ব স্কন্ধে লইবার সৎসাহস বজায় রাখিয়া বাংলা সরকার এদেশ হইতে একদানা খাদ্যশস্য বাহিরে পাঠাইবার কথা চিন্তা করিবেন, ইহাই বর্ত্তমানে সমগ্র দেশবাসীর একান্ত দাবী বলিয়া আমরা মনে করি।

ভারত সরকারের অর্থসচিবের পদ

ভারতসরকারের বর্ত্তমান অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যানের কার্য্যকাল বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইবে এবং এপ্রিল মাস হইতে তাহার স্থলে নূতন অর্থসচিব নিযুক্ত হইবার কথা আছে। এই বিশিষ্ট পদটি কাহার ভাগ্যে জুটিবে তাহা লইয়া কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সারা ভারতে জল্পনা কল্পনার অবধি ছিল না এবং অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর নিয়োগের সময় স্যার দেশমুখের নিয়োগ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করার পর হয়তো এক্ষেত্রেও একজন ভারতীয়কে এই পদে গ্রহণ করা হইবে। অধুনা ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায় ভারতসরকারকে জাতীয় সরকাররূপে প্রমাণ করিতে নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন এবং মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার শাসনপরিষদকে জাতীয়পরিষদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুরের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার পর দেশবাসীর ধারণা জন্মিয়াছিল যে, হয়তো এইবার ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতে জনকোম্পানীর আমল হইতে অনুসৃত তাহাদের শ্বেতাঙ্গপোষণের নীতি পরিত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং লর্ড ওয়াভেলের মত উদারপন্থী সামরিক বড়লাটের আমলে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন লাভ করা যাইবে। এই আশাবাদী জনসাধারণ ও সংবাদপত্রসমূহ এতদ্রে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ের নামও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সকল আশা ব্যর্থ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসকসম্প্রদায় ভারতের অর্থসচিব পদে পুনরায় একজন ইউরোপীয়কেই গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারতের এই নবনিযুক্ত অর্থসচিবের নাম স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ড্স্ এবং সামরিক অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি বড়লাটের দরবারে সবিশেষ পরিচিত। যুদ্ধের সময় সামরিক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন সম্ভবতঃ খুবই বেশী এবং সেদিক হইতে স্যার রোল্যাণ্ডসের নিয়োগের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিতে হয়তো সক্ষম হইব না, কিন্তু এ সম্পর্কে একথা না বলিয়াও পারা যায় না যে বড়লাটের কলিকাতা বক্তৃতা ও ভারত সচিব ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নানাবিধ বিবৃতিপাঠ করিয়া সরকারী পদসমূহ ভারতীয়করণের সদিচ্ছা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে আমাদের যে ভ্রান্ত আশা জাগিয়াছিল, এইবারকার শিক্ষার পর সেরূপ ভ্রান্ত আশা পোষণ করিবার জন্যও আমরা লজ্জা অনুভব করিতেছি। মোটের উপর যে সকল পদাধিকার লাভের ফলে শাসন যন্ত্রের উপর সত্যকার প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, অর্থসচিবের পদ তাহাদের অন্যতম; সুতরাং এপদে বড়লাটের সামরিক পরামর্শদাতা স্যার রোল্যাণ্ডসকে টানিয়া আনিয়া বসাইয়া দেওয়া কোন ভারতীয়কে ঐপদে প্রতিষ্ঠিত করা অপেক্ষা ঢের বেশী অর্থজ্ঞাপক, একথা আমরা এখন পরিষ্কারভাবে বুঝিয়াছি। এখন ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। এ সময় কোন ভারতবাসীকে অর্থসচিব নিযুক্ত করিলে তিনি হয় তো ভারতের দেনা পরিশোধের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে পারিতেন। এখন আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডসের মত রক্ষণশীল ব্যক্তি অর্থসচিব নিযুক্ত হওয়াতে ব্রিটিশ সরকারের এদিক হইতে তাগিদের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার ঝঞ্ঝাট কথঞ্চিৎ মিটিয়াছে। তাছাড়া তাঁহারা এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, ভারতের নূতন অর্থসচিব স্বয়ং ইউরোপীয় বলিয়া ষ্টার্লিং পাওনাই হউক আর যে পাওনাই হউক ইউরোপীয়দের স্বার্থ তিনি সহজে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না।

ভারতের শিল্পপ্রসারে বৈদেশিক মূলধন

ইংরাজ রাজত্ব শুরু হইবার পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের যে প্রসার দেখা দিয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে এদেশের পক্ষে লাভজনক মনে হইলেও আসলে তাহা কিন্তু ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূল। ভারতবর্ষ কাঁচামালের জোগানদার হিসাবে শিল্পপ্রধান দেশসমূহের সহিত কাজকারবার করিয়া আসিতেছে এবং তাহার নিকট হইতে নানাবিধ শস্য ও ধাতু লইয়া বিভিন্ন শিল্পোন্নত জাতি পৃথিবীর বাজারে শিল্পজাত পণ্যবিক্রয়ের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। ভারতের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল বলিয়া ভারতবর্ষ বরাবরই তাহার প্রয়োজন উপযোগী পণ্য ক্রয় করিতে পারে নাই, তাহা না হইলে এক গুণ দামে কাঁচামাল বেচিয়া সেই কাঁচামাল হইতে উৎপন্ন পণ্য ভারতবর্ষ চার গুণ মূল্যে এখনকার চেয়ে বহু গুণ বেশী কিনিতেও সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইত না। ব্রিটেনের স্বার্থ এবং নিজেদের শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তা—উভয় কারণেই ভারতসরকার এতকাল ভারতের দেশীয় শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ ও উৎসাহ দিয়া এদেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। আজ মহাযুদ্ধের প্রবল চাপে এবং যুগের হাওয়ার প্রভাবে ভারতবাসীর মনেও বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে এবং এখন ভারতবর্ষ শিল্পাদি প্রসারের দ্বারা নিজের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিবার

জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। জনমতের প্রভাবে ভারতসরকারও বর্ত্তমানে তাহাদের উগ্র স্বার্থপরতা কতকটা ঢাকিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ধীরে ধীরে ভারতে কিছু পরিমাণ শিল্প প্রসার ঘটিতেছে। যদিও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে যে সকল শিল্প ভারতবর্ষে বিশেষভাবে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই সমরপণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত এবং ভারতসরকার বেসামরিক প্রয়োজন মিটাইবার দিকে নজর দিয়া ভারতে শিল্পপ্রসারে মোটেই আগ্রহশীল নন, তবু এদেশের অর্থনীতিবিদগণ আশা করেন যে, যুগসমস্তার প্রভাবে বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে শিল্পপ্রসারের জন্য এমন এক প্রয়োজনবোধ সঞ্চারিত হইয়াছে যাহার ফলে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ নূতন শিল্প অবশ্যই গড়িয়া উঠিবে। এই শিল্পপ্রসারে ভারতসরকারের সহানুভূতির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ভারতবাসীর যোগ্যতা ও উপযুক্ত পরিমাণ মূলধনের। আজকাল যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে, দশ হাজার কোটি টাকার টাটা-বিড়লা পরিকল্পনা ছাড়াও আরও নানা পরিকল্পনা সম্প্রতি রচিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতসরকার এখন এমন এক ভাব দেখাইতেছেন যেন যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত অর্থব্যয় করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। বলা বাহুল্য এই দরিদ্র দেশে ব্যাপক আকারে শিল্প প্রসারের সঙ্গে শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য্য রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতির ব্যবস্থা করার মত অর্থ জনসাধারণ নিজেদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় বিদেশের কাছে মূলধনের জন্য হাত পাতা ছাড়া ভারতবর্ষের বাস্তবিকই উপায় নাই। তবে একথা নিশ্চিত যে নিরুপায় হইয়া বিদেশ হইতে মূলধন আনিলেও সেই ঋণের জন্য শুধু সুদ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন সর্ত্ত ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবে না। ভারতে রেলওয়ে বসাইবার সময় শতকরা ৫৲ টাকা হারে বিলাত হইতে টাকা ধার করা হইয়াছিল, এই উচ্চ হারের জন্য সুদ হিসাবে ভারত হইতে বহু কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু আজ ভারতবর্ষ দেনা শোধ করিয়া রেল-কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে সক্ষম হইতেছে। বর্ত্তমান দুঃসময়ে আমাদের হাতে যখন টাকা নাই তখন বিদেশ হইতে আমাদিগকে সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার করিতেই হইবে। টাটা পরিকল্পনাতেও বিদেশী মূলধন গ্রহণের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা জানি যে, স্বাবলম্বী হইবার জন্যই আমরা শিল্পপ্রসার করিতেছি এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিলে আমরা প্রথমেই নিজেদের ঋণমুক্ত করিয়া লইব। এ অবস্থায় যাহার নিকট হইতেই টাকা লই, সেই মূলধনের বিনিময়ে ভারতীয় শিল্পে উত্তমর্ণের কোনপ্রকার অধিকার আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ব্রিটেনের নিকট হইতেও আমরা শিল্পাদির প্রথম অবস্থায় মূলধন ও বিশেষজ্ঞ লইতে পারি এবং ব্রিটিশ সহযোগিতা পাইলে আমাদের ভালই হয় কিন্তু ব্রিটেনের স্বার্থপর মনোবৃত্তি আমাদের শিল্পপ্রসারে ব্রিটিশ সহায়তার বিনিময়ে ভারতীয় শিল্পে বখরা লাভের যে আশা রাখে, সেজন্যই ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের সাহায্যের আশা ত্যাগ করা সম্পূর্ণ বিধেয়। বরং এদিক হইতে আমেরিকা ভারতকে সাহায্যদানে সতত আগ্রহশীল এবং ভারতের বাজারের প্রতি আমেরিকার যে দৃষ্টিই থাকুক ভারতবাসীর জীবনমান বাড়াইবার জন্য এদেশে শিল্পাদি প্রসারের প্রয়োজন এবং ইহাতে তাহাদের পরোক্ষ লাভের কথা আমেরিকা কখনোই ভুলিয়া যায় না। আমেরিকান বিশেষজ্ঞ টাটা কোম্পানীর পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সুপরিচালনায় টাটা কোম্পানী প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি বা তাঁহার দেশ তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ছাড়া টাটা কোম্পানীর কোন বখরা দাবী করে নাই। সম্প্রতি আমেরিকায় ভারতের অর্থস্বাচ্ছল্য সৃষ্টির জন্য যে আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার বহু ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণ ভারতের শিল্পাদি প্রসারে টাকা দাদন করিতে আগ্রহশীল এবং এজন্য তাঁহারা সুদ পাইলেই সন্তুষ্ট হইবার মত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আমেরিকা হইতে টাকা আনিয়া ভারতের শিল্পোৎসাহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি শিল্পপ্রসারে সচেষ্ট হয় তাহা হইলে সারাদেশ যথেষ্ট উপকৃত হইবে এবং ভারতবর্ষের মত প্রভূত সম্ভাবনাময় দেশে শিল্পাদির লাভ হইতে অত্যল্পকালের মধ্যেই আমেরিকার দেনা শোধ করিয়া দেওয়া যাইবে। আমেরিকা এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্নদেশে দাদন দিয়া সেই সব দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছে। আমেরিকার রাজস্ববিভাগের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে প্রকাশ বিভিন্নদেশে আমেরিকার জনসাধারণ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ১৩৩৪ কোটি ডলার দাদন দেওয়া আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আমেরিকার মোট দাদনের পরিমাণ ৫৮০ কোটি ডলার, ইহার মধ্যে ক্যানাডায় ৪৩৭ কোটি ডলার ও ইংলণ্ডে ১০৩ কোটি ডলার। ভারতবর্ষে আমেরিকার বিশেষ কোন দাদন নাই বলিলেও চলে। ক্যানাডায় আমেরিকা সবচেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত করিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ক্যানাডার কোন ক্ষতি না হইয়া যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। আমেরিকার অর্থে ক্যানাডায় বহুপরিমাণ শিল্পপ্রসারের ফলে বর্ত্তমানে ক্যানাডার সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ক্যানাডার লোকসংখ্যা মাত্র এককোটি, অথচ এই দেশে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম পাঁচ বৎসরে যে পরিমাণ নূতন শিল্পাদি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বেকার কুড়ি বৎসরের চেয়ে বেশী এবং ১৯৩৯ সালে যেখানে ক্যানাডায় ৩৫০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য বৎসরে প্রস্তুত হইত সেখানে ১৯৪২ সালে ৭৫০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের প্রভূত অসুবিধার মধ্যেও শতকরা এই ১১৭ ভাগ পণ্য বৃদ্ধি অবশ্যই আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ। ক্যানাডায় অর্থস্বাচ্ছল্য সম্বন্ধে এই সকল কথা বলার অর্থ এই যে, ক্যানাডার মত স্বচ্ছলদেশেও আমেরিকার অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে এবং তাহাতে ক্যানাডা যে উপকৃত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতের শিল্পপ্রসারের প্রয়োজন যখন অসামান্য ও তাহার স্বদেশে যখন উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ অসম্ভব এবং তাহার সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ইংলণ্ড যখন সাহায্যদানের বিনিময়ে চিরকালের জন্য নিজের স্বার্থ সংস্থানের আশা পোষণ করিয়া থাকে, তখন ভারতের পক্ষে ইংলণ্ড ছাড়া অন্যদেশের অর্থের ও শিল্পকুশলতার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। যুদ্ধের প্রবল চাপে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আমেরিকার বিত্ত এত বেশী যে এই যুদ্ধের মারাত্মক ব্যয়ের পরও তথাকার জনসাধারণের হাতের সমস্ত টাকা লাভজনকভাবে স্বদেশে খাটানো সম্ভব নয়, এ অবস্থায় আমেরিকাবাসী যদি ভারতবর্ষের নিজস্ব শিল্পাদিতে ঋণ হিসাবে টাকা খাটাইয়া লাভ করিতে চায় তাহা হইলে শুধু তাহারাই লাভবান হইবে না, শিল্পাদি প্রসারের উপযোগী মূলধন পাইয়া ভারতবর্ষও যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

হিন্দুমহাসভার বিলাসপুর অধিবেশন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জাতীয় সাধন-মন্ত্রে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্বুদ্ধ ও মন্ত্র-পূত। এই জাতীয় জাগরণের আবহাওয়ার ভিতরে, হিন্দু জাগরণ আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিলাসপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শতাধিক বিশিষ্ট হিন্দুনেতা উহাতে যোগদান করেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর সভাপতি মহোদয়কে লইয়া ট্রেণ বিলাসপুরে উপস্থিত হইলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে পুরভাগে করিয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও সহস্র প্রতিনিধি সভাপতি ডক্টর মুখার্জ্জীকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বসু সি-আই-ই কর্ত্তৃক ডক্টর মুখার্জ্জী মাল্যভূষিত হইলে পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ হইতে সভাপতি বন্দনা ও মাল্যদানের পালা আরম্ভ হয়।

২৪শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নটায় বিলাসপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীকে লইয়া প্রায় আধমাইল ব্যাপী একটি শোভাযাত্রা বাহির হয় তিন ঘণ্টাপরে সম্মেলন মণ্ডপের নিকট যাইয়া শেষ হয়। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ ডাঃ মুঞ্জে অক্লেশে ছাত্র ও যুবকদের সহিত গল্প করিতে করিতে পদব্রজে শোভাযাত্রার সহিত গমন করেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বীর সাভারকর

ঐ দিনকার পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডক্টর মুখার্জ্জী বলেন "এই পতাকা হিন্দুস্থানের প্রকৃতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ইহার কুঙ্কুম রাগ নিঃস্বার্থ অনুগত্য ও স্বার্থ-ত্যাগের নিদর্শন। আমরা যে শক্তির উপাসনা করি তাহা প্রভুত্ব ও শোষণের জন্য নহে; অবিচার ও অত্যাচারের অবসানই আমাদের কামনা। আমরা যে শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা করিতেছি, তাহা সত্য, সাম্য, শৌর্য্য ও স্বাধীনতারভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন ভারতের ভূমির উপর এই পতাকা স্থাপিত না হইলে ইহার কোন মূল্য নাই।" তিনি আরও বলেন "অপর সম্প্রদায়ের অধিকার কাড়িয়া লইবার কোন ইচ্ছাই যখন হিন্দুদের নাই তখন পুনর্জ্জাগরণের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনকল্পে চরম দুঃখ বরণ ও আত্ম-ত্যাগ করিতে হিন্দুরা ইতস্ততঃ করিবে না।" ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রে বীর সভারকারের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে তাঁহার সহিত ওয়াভেলের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে উহাতে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা কিরূপ হইবে তাহার আলোচনা ত দূরের কথা, কেন্দ্রে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্বন্ধেও তাঁহার সহিত বড়লাটের কোনরূপ আলোচনা হয় নাই।

২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বীর সাভারকার বলেন—হিন্দুরা মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যত চেষ্টা করিয়াছেন মুসলমানদের দাবী ততই বর্দ্ধিত হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দিত। 'বর্ত্তমানে অন্ততঃ এককোটি হিন্দু আছেন যাঁহারা নিজদিগকে হিন্দু বলিতে গর্ব্ব অনুভব করেন।

এই মনোভাব তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে সুফল প্রসব করিবে।

উদ্বোধনের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বসু এডভোকেট হিন্দীতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। পাকিস্থানের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে এই অন্যায় অযৌক্তিক ও জাতীয়তা-বিরোধী দাবীর বিরুদ্ধে হিন্দুমহাসভা যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য ; এই বিষয়ে হিন্দুমহাসভা শুধু হিন্দুদিগকে নহে পরন্তু অহিন্দুদিগকেও পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সত্যার্থ প্রকাশের চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পর্কে সিন্ধুর মুসলিম লীগ কর্ত্তৃক ব্যবহার নিন্দা করেন এবং মহাকোশল প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও হিন্দুবহুল অঞ্চল বেরারকে হায়দারাবাদের নিজামের শাসনাধীনে আনয়ন করিবার জন্য মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি ডক্টর মুখার্জ্জী তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—সাম্প্রদায়িক সমস্যা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহাদ্বারা ভারতের যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা সংশোধন না করিতেছেন ততদিন পর্য্যন্ত মূল রাজনৈতিক বিষয়ে সকলের একমত হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই মীমাংসার প্রথম প্রচেষ্টা বৃটেনকেই করিতে হইবে এবং ইহার ব্যতিক্রম বিশ্বাসভঙ্গ এবং দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যে অবহেলা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বাধীনতা ও দাসত্বের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গঠিত ; ইহাদের বন্ধন হইতে পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি না হইলে বিশ্বে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে না।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের সঙ্গে বৃটেনের মীমাংসা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র যাহাতে হিন্দুর সর্ব্বনাশ না করে ইহা দেখিবার একমাত্র অধিকার হিন্দুমহাসভারই আছে। যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে কোনরূপ আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভবপর না হয় তবে বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামের সৃষ্টি হইবে এবং তাহার সহিত আমাদের সহস্র সহস্র দেশবাসীর অদৃষ্ট বিজড়িত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আত্মদানের সময় যদি আসে, হিন্দুর রাজনৈতিক ও ধর্ম্মমূলক অধিকার রক্ষায় ভারতব্যাপী দুঃখভোগ যদি প্রয়োজন হয় সে সংগ্রামে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে মহাসভা পশ্চাদপদ হইবে না।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া ডক্টর মুখার্জ্জী বলেন—যুদ্ধ শেষ হইবার পরে যে শান্তি সম্মেলনে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ভাগ্য নির্ণীত হইবে সেই শান্তিসম্মেলনে যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া দালালের মারফৎ ভারতের বক্তব্যপ্রকাশ না করিয়া ভারত আপনার মনোনীত মুখপাত্রদের মারফতেই আপন ব্যবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার দাবী করা হইয়াছে। এই কারণেই ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটান উচিত বলিয়া মনে করি। আসুন আমরা সকলদল একত্র হইয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পুনর্গঠন সমস্যা সম্পর্কে একযোগে আমাদের

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পতাকা উত্তোলন

সম্মিলিত দাবী উত্থাপন করি। জাতীয় পুনর্গঠনের ভিত্তিতে পরস্পরের স্বীকৃত নীতিতে ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করার পথেই আমাদের অগ্রগতি। সম্ভবতঃ এইরূপ দাবীর সহিত মুস্লিমলীগ সহযোগিতা করিবে না কিন্তু মুস্লিমলীগ ছাড়াও অন্যান্য এমন অনেক মুসলমান আছেন (রাজাজীর সাম্প্রদায়িক মীমাংসার সূত্র দ্বারা যাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে) যাঁহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইলে ভারতের জাতীয়তাবাদের পক্ষ অবলম্বনে প্রস্তুত আছেন।"

ভারতবর্ষের রিক্ততার কারণ সম্পর্কে বক্তা বলেন "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতাই তাহার অর্থনৈতিক দাসত্বের কারণ এবং স্বরাজই ভারতের দারিদ্র্য অবসান করিবার প্রথম ও অত্যাবশ্যক প্রতিকার।"

অতঃপর ডক্টর মুখার্জ্জী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে জাতি হিসাবে হিন্দুরা অবলুপ্ত হইতে পারে না; স্বাধীন দেশের স্বাধীন অধিবাসী হইবার জন্য তাহাদিগকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।

২৫শে ডিসেম্বর সকাল ৯ ঘটিকায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পৌরোহিত্যে মহাসভার বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠক হয়। এই বিতর্কমূলক বৈঠকে ২৫০ জন বিশিষ্ট সভ্য সমবেত হন। ডক্টর মুখার্জ্জী কখনও হাস্য-পরিহাসের অবতারণার দ্বারা বা কখনও দৃঢ়তার সহিত সকলকে সংযত করিয়া সভাপতির কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। ঐদিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উহাতে দর্শকের সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি লাভ করে। মণ্ডপের বাহিরেও লোকের সমাবেশ হয় এবং জনতা সভাপতির দর্শনপ্রার্থী হন। বীর সাভারকার সভামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় ২০ মিনিটকাল তাহাদের নিকট হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া মহাসভার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। সভার কার্য্য পরিচালনায় ব্যস্ত থাকায় সভাপতি ডক্টর মুখার্জ্জী বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন দিতে অক্ষম হন।

২৬শে ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকায় মহাসভার অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। অধিবেশন সমাপ্তির প্রাক্কালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ আবেগভরে যে পরিসমাপ্তি-বক্তৃতা দেন তাহা সমবেত কংগ্রেস বা অকংগ্রেসী সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনি তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় বলেন "অদ্য হিন্দুমহাসভার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। এই দিবস স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সত্য ও স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্ম-বলিদান করেন। স্বামীজির জন্ম ও মৃত্যু ব্যর্থ হয় নাই। এমন একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে যাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না; সেই উদ্দেশ্য হিন্দুস্থানের পুত্রকন্যাদের বন্ধনমুক্তি।"

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইহাও বলেন যে মহাসভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্য দিয়া মহাসভা দেশের নিকট যে কার্য্যক্রম উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা জাতীয় প্রতিষ্ঠানমাত্রেরই অনুসরণযোগ্য; সকলের সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে হিন্দুমহাসভাই ভারতের একমাত্র জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান এবং এই দিক দিয়া দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

উপসংহারে ডক্টর মুখার্জ্জী বলেন "আমি শুধু এই প্রার্থনা করি যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি যেন এই দেশেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করি। এই দেশে আমরা এমন একটি প্রকৃত হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করিতে চাই, যাহার উদ্দেশ্য অপরকে নিপীড়ন ও নির্য্যাতন করা নহে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সাম্য ও স্বাধীনতার মতবাদ প্রচার করা।"

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশনের সহিত নিখিলভারত হিন্দু মহিলা সভার এবং অখিল ভারত হিন্দু যুবক সভারও অধিবেশন হয়। মহিলা সভার সভানেত্রী হন শ্রীযুক্তা জানকী বাই যোশী এবং যুবক সভায় সভাপতি হন ভাইড গুরুজী। বীর সাভারকার শেষোক্ত দুই সভারই উদ্বোধন করেন।

মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত ও সমর্থন করেন। শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত এন-সি চ্যাটার্জ্জী বার-এট-ল অতি উচ্চাঙ্গের এক বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী এম-এল-এ প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনে যে তেজস্বিতার পরিচয় দেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব, 'সত্যার্থপ্রকাশের' অলচ্ছেদের তীব্র নিন্দা, বেরারকে মুসলমানগণ কর্তৃক নিজামের হাতে দিবার প্রয়াসের ও 'হিন্দুকোড' কে তাড়াতাড়ি আইনে পরিণত করিবার চেষ্টার বিরোধিতা করিবার সঙ্কল্প, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অধিকার স্বীকার করিয়া এবিষয়ে কতকগুলি নিরপেক্ষ নীতি-গ্রহণের সিদ্ধান্ত, কৃষক ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের জন্য পরিকল্পনা, রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী প্রভৃতি প্রধান। স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে বলা হয়—শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষ অখণ্ড ও অবিভাজ্য থাকিবে। গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করিবে। পার্থক্যমূলক কোন আইন প্রবর্ত্তিত হইবে না। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার পরিশ্রমের ফলভোগ করিবে এবং কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারিবে না।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

ফন্ রুণষ্টেডের পাল্টা আক্রমণ

পশ্চিম রণাঙ্গনে ফন্ রুণষ্টেড্ পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ১৯৪৪ সালের মধ্যেই জার্ম্মানী ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সেই ১৯৪৪ সাল শেষ হইতে না হইতেই আসিল জার্ম্মানীর পাল্টা আক্রমণ।

সম্প্রতি মিত্রপক্ষের ধুরন্ধররা জার্ম্মানীর পরাজয় এত হাতের কাছে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সামরিক ব্যাপার অপেক্ষা রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ পড়িয়াছিল বেশী। নাৎসী জার্ম্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির অবসান যাহাতে না হইতে পারে, সে জন্য তাঁহাদের একটা অশোভন আগ্রহ ও অসময়োচিত তৎপরতা দেখা দিয়াছিল। আজ যে বেলজিয়ামে ফন্ রুণষ্টেডের অভিযান চলিতেছে, সেদিন অবিমৃষ্যকারী রাজনীতিকের দল সেখানে আগুন জ্বালাইয়া তুলিতেছিলেন। বামপন্থী বেলজিয়ানরা যদি বিচক্ষণতার সহিত সঙ্ঘর্ষ এড়াইয়া না চলিত, তাহা হইলে এত দিনে গ্রীসের মত বেলজিয়ামও গৃহ-যুদ্ধের বহ্নিতে দগ্ধ হইত। ফন্ রুণষ্টেডের এই পাল্টা আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইবে, তাহার বিনিময়ে এই পক্ষের ধুরন্ধরদের যদি চৈতন্যোদয় হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল।

ফন্ রুণষ্টেডের এই আকস্মিক পাল্টা আক্রমণ সম্ভব হইবার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সরবরাহের অসুবিধার জন্য মিত্রপক্ষ সমানভাবে আক্রমণ চালাইয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহারা যখন সরবরাহ-ব্যবস্থার

উন্নতির জন্য জার্ম্মানীর সীমান্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যখন তাঁহাদের বিমানবাহিনীর পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল, সেই সময় ফন্ রুণষ্টেড্ গোপনে পাণ্টা আক্রমণের আয়োজন করেন ; তাঁহার আকস্মিক আক্রমণও এই কারণে সম্ভব হইয়াছে।

এই কথাগুলি অসত্য নয় ; তবে কৈফিয়ৎ হিসাবে ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল। ফ্রান্স ও বেল্‌জিয়ামের রাস্তা, রেলপথ, সেতু প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রথমে মিত্রপক্ষের বিমানবিহারী এইগুলির প্রতি আক্রমণ চালায় ; পরে গেরিলারা যতদূর পারে সরবরাহ-সূত্রগুলি ধ্বংস করে। সর্ব্বোপরি, পিছু হটিবার সময় জার্ম্মানরা ব্যাপকভাবে ধ্বংসকার্য্য চালাইয়াছিল। স্বভাবতঃ জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে সরবরাহ-সূত্রের অবস্থা ইহা অপেক্ষা উন্নত। মিত্রপক্ষের বিমান-আক্রমণে জার্ম্মানীর সরবরাহ-সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলেও সেখানে গেরিলার উৎপাত নাই ; পলায়নপর সেনাবাহিনী সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংসকার্য্য চালায় নাই। তাহার পর, ফ্রান্সের সেরবুর্গ, লা-হেভার, বোলোঁ, ক্যালে প্রভৃতি বন্দর মিত্রপক্ষের হাতে আসিলেও জার্ম্মানরা এইগুলি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। অভিযাত্রী বাহিনীকে রসদ ও গোলাগুলী সরবরাহের উপযোগী করিয়া ইহাদিগকে মেরামত করিতে অনেক সময় কাটিয়া যায়। এণ্টোয়ার্প অক্ষত অবস্থায় মিত্রপক্ষের হাতে আসিয়াছিল বটে ; কিন্তু যে সেলৎ মোহনায় এণ্টোয়ার্প অবস্থিত, সেখান হইতে ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে জার্ম্মানদিগকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নাই।

এইরূপ অবস্থায় খাস জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাইবার উপযোগী প্রচুর রসদ ও গোলাগুলী মিত্রপক্ষের সেনা স্বভাবতঃই পায় নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই—"জার্ম্মানী গেল" বলিয়া বাগাড়ম্বর করিতে কে বলিয়াছিল ? জার্ম্মান সেনা যে পশ্চাদপসরণের সময় সরবরাহ-সূত্র ও বন্দরগুলি অক্ষত রাখিয়া যাইবে না, ইহা ত জানা কথা ! শত্রুর পরাজয় সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছিল কোন্ সাহসে ? তাহার পর, আবহাওয়ার অবস্থা মন্দ থাকায় পর্য্যবেক্ষণ চালান যায় নাই বলিয়া ফন্ রুণষ্টেডের অতর্কিত পাণ্টা আক্রমণ সম্ভব হইয়াছে—এই যুক্তি শিশুসুলভ ; মিত্রপক্ষের সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের শোচনীয় অক্ষমতা ইহাতে ঢাকা পড়ে না।

ফন্ রুণষ্টেড্ প্রতিরোধ-সংগ্রামের নীতি হিসাবেই এই পাণ্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ হল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ৪ শত মাইল রণক্ষেত্রে জেনারল আইসেন্‌হাওয়ারের ৭টি আর্ম্মী (৪টি মার্কিণ, ১টি ব্রিটিশ, ১টি ক্যানাডীয় ও ১টি ফরাসী) এখন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সন্নিবিষ্ট। এই বিশাল সেনাবাহিনীকে ঠেলিয়া আট্‌লাণ্টিকের জলে নামাইয়া দিবার ক্ষমতা সত্যই জার্ম্মানীর আর নাই। হিট্‌লার তাঁহার নব-বর্ষের বক্তৃতায় সদম্ভে বলিয়াছেন বটে যে, ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিবে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইবে জার্ম্মানীর বিজয়ে। কিন্তু ইহা যে নিতান্ত অন্তসারশূন্য দম্ভ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলা অসম্ভব নয় বটে ; কিন্তু সুস্পষ্ট সামরিক বিজয়ের সম্ভাবনা সত্যই জার্ম্মানীর আর নাই। সে সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে দুই বৎসর পূর্ব্বে ষ্ট্যালিনগ্রাডে। ফন্ রুণষ্টেড্ পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়া মিত্রপক্ষের অভিযানের আয়োজন নষ্ট করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। বেল্‌জিয়ামের আর্ডেনীস্ অঞ্চলে অগ্রগতি নাৎসীসেনার প্রতিহত হইলেও তাহার এই উদ্দেশ্য যে সেখানে কতক পরিমাণে সিদ্ধ হয় নাই, তাহা বলা যায় না। এখন তিনি সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ প্রসারিত করিতেছেন। উদ্দেশ্য—সর্ব্বত্র তিনি মিত্রপক্ষের সমরায়োজন নষ্ট করিয়া দিবেন। এক দিকে মিত্রপক্ষের সমরায়োজনে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং অন্যদিকে জার্ম্মান জাতিকে উৎসাহিত করা এই পাণ্টা আক্রমণের উদ্দেশ্য। জার্ম্মান জাতিকে উৎসাহিত করিবার জন্য কিভাবে এই তৎপরতাকে ব্যবহার করা হইতেছে, হিট্‌লারের দম্ভেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—জার্ম্মানীর সামরিক বিজয়ের সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এই ভাবে বিলম্ব ঘটাইয়া তাহার লাভ কি ? ইহার উত্তরে বলা যায়—মিত্রপক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক বিরোধের সুযোগে উপকৃত হইবার আশা জার্ম্মানী এখনও ত্যাগ করে নাই। তেহেরাণ সম্মিলনীতে সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে মিত্রপক্ষে পরিপূর্ণ ঐক্যের কথা ঘোষিত হইলেও পরবর্ত্তী বিভিন্ন ব্যাপারে এই শিবিরে দারুণ মতানৈক্য দেখা গিয়াছে। ব্রেটন্ উড্‌স্ সম্মিলনীতে বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড কেনীজ আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কিণ অর্থসচিব মিঃ মর্গেন্‌থর সহিত একমত হইতে পারেন নাই ; ডুমার্টন্‌ওক্‌স্ সম্মিলনীতে বিশ্ব-নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণে প্রধান তিনটি শক্তি একমত হইতে না পারায় সম্মিলনী স্থগিত রাখিতে হইয়াছে ; মার্কিণ সেনেট্ ইঙ্গ-মার্কিণ তৈল-চুক্তি বন্ধ রাখিয়াছেন ; চিকাগোয় অন্তর্জ্জাতিক বিমান-সম্মিলনীতে বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দারুণ মতানৈক্য দেখা গিয়াছে। তাহার পর, সম্প্রতি মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ষ্টেটিনিয়াস্ ইটালী ও গ্রীস্ সম্পর্কে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই সব দেখিয়া জার্ম্মানী সাহসী হইয়া উঠিতেছে। একদিকে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির চিরন্তন সন্দেহ ; সম্প্রতি পোল্যাণ্ড সম্পর্কে এই সন্দেহ বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার পর, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! জার্ম্মানী আশা করে—দীর্ঘ কাল প্রতিরোধ চালাইতে পারিলে এই সন্দেহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বাড়িয়া উঠিবে ; তখন কূটনৈতিক কৌশলে সে মিত্রশক্তির নিকট হইতে আপোষ সন্ধি (Negotiated Peace) আদায় করিতে পারিবে। এই আশাতেই সে মরিয়া হইয়া দীর্ঘকাল প্রতিরোধ চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

পূর্ব্ব ইউরোপের রণাঙ্গন

দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে মার্শাল্ তলবুখিনের যে সেনাবাহিনী দানীয়ুব অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা সোজা উত্তর দিকে আসিয়া মার্শাল মেলিনোভস্কির সেনাবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে বুডাপেষ্ট এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে ; এখানে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ৫০ হাজার জার্ম্মান সেনার অধিনায়ক আত্মসমর্পণ করিতে চান নাই। এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী এখানে মৃত্যু পর্য্যন্ত লালফৌজকে প্রতিরোধ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। লালফৌজ এখন বুডাপেষ্টের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শত্রুসেনার প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটি সোভিয়েট বাহিনী অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। লালফৌজ ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে পৌঁছিবার প্রাকৃতিক বাধা হর্ণ নদী অতিক্রম করিয়াছে।

সমর বিশেষজ্ঞরা হাঙ্গেরিতে লালফৌজের তৎপরতাকে তাহাদের শীতকালীন অভিযান বলিয়া মনে করেন না। শীতকালে লালফৌজ কঠিন বরফের উপর দিয়া অভিযান চালাইয়া থাকে। এবার নাকি পূর্ব্বাঞ্চলে বরফ পড়িতে দেরী হইয়াছে ; তাই বরফ এখনও শক্ত হয় নাই। শীঘ্রই বরফ শক্ত হইয়া উঠিলে ওয়ারস ও ক্রাকাও অঞ্চলে লালফৌজের প্রচণ্ড আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা।

গ্রীসে অন্তর্দ্বন্দ্ব

সমস্ত ডিসেম্বর মাসটা গ্রীসে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। এখনও উহার মীমাংসা হয় নাই।

জার্ম্মানীর অধিকারে থাকিবার সময় গ্রীসে প্রবল প্রতিরোধ

আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই প্রতিরোধ সম্পর্কিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির নাম ই-এ-এম্ এবং ইহাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর নাম ই-এল্-এ-এস্। ইহারা জার্ম্মানীর কবল হইতে গ্রীসের একটা বিশাল অংশ মুক্ত করিয়াছিল এবং সেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিল। যুগোশ্লেভিয়ার মিহাই-লোভিচের মত গ্রীসেও জারভাস্ নামক এক ব্যক্তি প্রবাসী গভর্ণমেণ্টের অনুচররূপে কাজ করিতেছিল। তাহার সেনাবাহিনীর নাম ই-ডি-এ-এস্। ইহাদের সংখ্যা অল্প; রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও কম।

গত মে মাসে লেবাননে গ্রীসের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সেখানে পপেনড্রে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন; বামপন্থী দলের তিন জনও মন্ত্রিসভায় গৃহীত হন। এই প্রবাসী গভর্ণমেণ্ট এথেন্সে ফিরিয়া আসিয়াই ই-এল্-এ-এস্ কে অস্ত্র সমর্পণ করিতে আদেশ দেন; কিন্তু অন্ত বেসরকারী সেনাবাহিনীগুলিকে এই আদেশ দেওয়া হয় নাই। ই-এল্-এ-এসের প্রতি এই অন্যায় আদেশ দেওয়ায় বামপন্থী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। বামপন্থীদের দাবী ছিল—জার্ম্মানদের সহযোগীদের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দাবীও পূর্ণ হয় নাই। গ্রীস শত্রুর কবলমুক্ত হইয়াছে বৃটিশ সৈন্তের সহযোগিতায়। এই বৃটিশ সৈন্তের সহযোগিতায় পপেনড্রে-গভর্ণমেণ্ট বামপন্থীদের সায়েস্তা করিতে সচেষ্ট হন। ইহার ফলে গ্রীসে গৃহ-যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথমে গ্রীসের ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হন নাই। তাঁহারা অস্ত্রবলে বামপন্থীদের সায়েস্তা করিতে চাহিয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিল্ সদম্ভে গ্রীসে এই বল প্রয়োগের নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম ছিল—গ্রীক জাতিকে জোর করিয়া গণতন্ত্র গিলাইবার নৈতিক অধিকার তাঁহাদের আছে। তাঁহার এই নীতির বিরুদ্ধে বৃটেনের বামপন্থীরা প্রবল প্রতিবাদ জানান। ই-এল্-এ-এস্ তাঁহার দম্ভে ভীত হয় না, তাহারা সমানভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া দেয়।

মিঃ চার্চ্চিল স্পেনে গণ-সমর্থনহীন ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করিবার সময় বলিয়াছিলেন—সে দেশের রাজনীতি স্পেনীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার, তাহাতে অন্তের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। গ্রীসে প্রকৃত গণ-শক্তিকে দাবাইয়া রাখিবার সমর্থনে তাঁহার যুক্তি রাইফেলের ডগা দিয়া গণতন্ত্র গিলাইবার অধিকার তাঁহাদের আছে। ইতালীতে কাউণ্ট স্ফোর্জ্জার পররাষ্ট্র সচিব হওয়ায় বৃটেনের আপত্তি ছিল। এই আপত্তির সমর্থনে মিঃ চার্চ্চিলের কৈফিয়ৎ অদ্ভুত; তিনি বলেন—কাউণ্ট স্ফোর্জ্জা মার্শাল বাদোলিওর পতনে সাহায্য করিয়াছিলেন! ফ্যাসিস্ত ইটালীর অন্ততম প্রধান স্তম্ভ বাদোলিওর প্রতি গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহী চার্চিলের এই দরদ উপভোগ্য। প্রকৃত কথা—স্পেন, ইতালী ও গ্রীস ভূমধ্য সাগরীয় রাজ্য। এখানে প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যবস্থা অটুট রাখা বৃটেনের একান্ত প্রয়োজন; কারণ তাহা না হইলে বৃটেনের সহিত তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সংযোগের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হয়। বিশেষতঃ গ্রীসের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে প্যালেষ্টাইন, সুয়েজ ও মিশরের। এই স্বার্থ রক্ষার জন্ত যে ক্ষেত্রে যে কথা বলা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে মিঃ চার্চ্চিল তাহাই বলিয়াছেন—যুক্তির সহিত তাঁহার সকল কথার সম্পর্ক নাই। গ্রীসে বামপন্থীদিগকে নিরস্ত্র ও দমিত করিতে পারিলে সশস্ত্র সেনাবাহিনী ও পুলিস বাহিনীর সহযোগিতায় গণতন্ত্রের মুখোস পরিহিত যে কোনপ্রকার শাসনব্যবস্থা সেখানে চাপাইয়া দেওয়া যায়। জার্ম্মানীর সহযোগী ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা এড়াইতে পারিলেই প্রাগ্-যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোটা বাঁচাইয়া রাখা যায়। বিশেষতঃ ফ্রান্সের ব্যাপারে মিঃ চার্চ্চিল ভড়কাইয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সেও প্রতিরোধ-বাহিনীকে অস্ত্র ফিরাইয়া দিতে বলা হইয়াছিল। তাহারা আপত্তি করায় জেনারল ত গল্ প্রতিরোধ বাহিনীকে নিয়মিত সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং ফ্রান্সে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রভাবের পশ্চাতে সামরিক শক্তিও রহিয়া গেল। সেখানে জার্ম্মানীর সহযোগী বড় বড় শ্রমশিল্পপতিদের বিরুদ্ধে নির্ম্মমভাবে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

শেষ পর্য্যন্ত মিঃ চার্চ্চিলের দম্ভ কিছু কমিয়াছিল এবং সুর বদলাইয়াছিল। পূর্ব্বে যে চার্চ্চিল গ্রীসের প্রতিরোধ-দলকে গুণ্ডা ও দস্যু বলিয়া গালি দেন, পরে বড় দিনের সময় এথেন্স যাইয়া তাহাদের সম্পর্কে তিনি খুব নরম সুরে কথা বলিয়াছিলেন। এই সময় গ্রীসের ব্যাপারে একটা মীমাংসার চেষ্টা হয়; সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের দালালের দল ই-এ-এম-এর দাবী মানিতে—এমন কি সে বিষয়ে আলোচনা করিতে অস্বীকার করে। মিঃ চার্চ্চিল লণ্ডনে ফিরিবার পর এথেন্সের আর্কবিশপ দামাস্কিনোস্ প্রতিনিধিরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি নূতন গভর্ণমেণ্ট গড়িতে চেষ্টা করিতেছেন; পপেনড্রে পদ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাজা ২য় জর্জ্জ জানাইয়াছেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে আহ্বান না করিলে তিনি এথেন্সে ফিরিবেন না। এই তিনটি ব্যবস্থা ই-এম্-এর মনঃপূত হইবে। লেবাননে ই-এ-এম্ই প্রথম দামাস্কিনোস্‌কে প্রতিনিধি-রূপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল; তখন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। রাজা ২য় জর্জ্জ ১৯৩৬ সালে এই প্রতি-শ্রুতি দিয়া দেশে আসেন যে, তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তিনি মেটাক্সাসের এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাজেই ২য় জর্জ্জ গ্রীসে প্রিয় নন। গ্রীক্ বামপন্থীদের বহু দিনের দাবী—যুদ্ধের পর তিনি যেন দেশবাসীর বিনা আহ্বানে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরিয়া না আসেন। এই দাবী এখন পূর্ণ হইল। আর পপেনড্রে ব্যক্তিটি ত বর্ত্তমান অশান্তির মূলে ছিলেন। কাজেই তাঁহার অপসারণে প্রত্যেক স্বদেশভক্ত গ্রীক্ স্বস্তি বোধ করিবে।

কিন্তু দামাস্কিনোস্ যে ব্যক্তিকে যে ব্যকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিয়াছেন, সে ব্যক্তিটি ক্ষুদে ডিক্টেটার। ইহার নাম প্লাস্টিরাস্; দুইবার সে গ্রীসে ডিক্টেটারী করিয়াছে। সম্প্রতি ই-এল্-এ-এস্ সম্পর্কে সে অত্যন্ত অশিষ্ট মন্তব্য করিয়াছিল। এথেন্স সম্মিলনীতে ই-এ-এম-এর প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে প্লাস্টিরাস্ গোঁসা করিয়া সম্মিলন-কক্ষ ত্যাগ করে। এই ব্যক্তির নেতৃত্বে যদি গ্রীসে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, তাহা হইলে সমস্যা আরও জটিল হইবার সম্ভাবনা।

ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি

ফরাসী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট জেনারল ত গল্ ডিসেম্বর মাসে মস্কোয় যাইয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন। জার্ম্মানীর পরাজয়ের জন্ত দুইটি দেশের সহযোগিতার ব্যবস্থা ছাড়া চুক্তিতে এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত সম্মিলিত হইয়াছে যে, এই দুই দেশের মধ্যে একটি অন্তের বিপক্ষে কোন দলে যোগ দিবে না। এই সর্ত্তটি গুরুত্বপূর্ণ। যে সব প্রতিক্রিয়াপন্থী ভবিষ্যতে সোভিয়েট-বিরোধী দল গড়িবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা এই সর্ত্ত জানিয়া হতাশ হইবেন। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বামপন্থী দলের প্রভাব ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে; জার্ম্মানীর সহযোগী শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় প্রাগ্-যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও ফ্রান্স প্রগতিমূলক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হইল।

পোল্যাণ্ডের সমস্যা

লুবলিন কমিটী আপনাকে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে লুবলিন কমিটীকে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার বলিয়া মানিয়া লওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বৃটেন লণ্ডনের

পোলিস্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করে ; কাজেই, বৃটিশ সরকারের পক্ষে এখন লুব্‌লিন কমিটীর এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও উহা এখন হয় ত মানিবে না।

লুব্‌লিন কমিটীর এই সিদ্ধান্তে বুঝা গেল যে, লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের সহিত কোনরূপ আপোষ সম্ভব হইল না। পোলিস্ ইউক্রেন ও বীলো রুশিয়া সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী সম্পূর্ণ সঙ্গত। জাতিগত ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিভাগের নীতি মানিতে হইলে ঐ অঞ্চল সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উচিত। জনমতের যদি মূল্য থাকে, তাহা হইলেও ঐ অঞ্চলে অধিকার সোভিয়েট রুশিয়ার ; কারণ পোলিস্ ইউক্রেন ও বীলো রুশিয়ার অধিবাসীরা চিরদিনই সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী স্বজাতীয়দের সহিত মিলিত হইতে চাহিয়াছে। লর্ড কার্জন্ নিশ্চয়ই সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নাই ; তিনি ঐ অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার অধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রুশিয়ার এই সঙ্গত দাবী কিছুতেই মানিলেন না।

আমাদের দেশের কতকগুলি অর্বাচীন গ্রীস ও পোল্যাণ্ডের ব্যাপারকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিতে চায়। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে সোভিয়েট রুশিয়ার চাপে চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভা প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন আধা-ফ্যাসিস্ত গভর্ণমেণ্টের দাবী অস্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, আর গ্রীসে তাঁহারা জোর করিয়া একটা আধা-ফ্যাসিস্তত্ত্র চাপাইতে চাহিয়াছেন। দুইটি দেশের সমস্যা মূলতঃ সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আমাদের দেশের কতকগুলি গণ্ডমূর্খ মার্কিণ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সুরে সুর মিলাইয়া পোল্যাণ্ড ও গ্রীসের ব্যাপারকে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। পোল্যাণ্ডের যে গভর্ণমেণ্ট এখন লণ্ডনে জিয়ানো আছে, তাহারা ১৯৩৯ সালে শান্তি ফ্রণ্ট গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারাই হিটলারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্ভাগা চেকোশ্লোভাকিয়ার কতকাংশ পোল্যাণ্ডের কুক্ষীগত করাইয়াছিল। মিঃ চার্চ্চিল হয়ত গূঢ় উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ড সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী মানিয়া লইয়াছেন। বল্‌কান্ ও বাল্টিক অঞ্চলে রুশিয়ার দাবী মানিয়া লইয়া পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে বৃটেনের প্রভাব স্থাপনের নৈতিক অধিকার প্রতিপন্ন করাই হয়ত তাঁহার উদ্দেশ্য। বেল-জিয়াম্, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রে এবং স্পেন, ইতালী, গ্রীস এই তিনটি ভূমধ্য সাগরীয় রাষ্ট্রে সাম্রাজ্য-বাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভা যাহাতে গণ-শক্তির কণ্ঠরোধ করিতে না পারেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই প্রকার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানানও আবশ্যক। কিন্তু যেখানে তাঁহারা বাধ্য হইয়াই হউক, আর কূটনৈতিক উদ্দেশ্যেই হউক গণ-শক্তির দাবী মানিয়া লইয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের নীতির বিরোধিতা করা মূর্খতা।

প্রাচ্য অঞ্চলে

ফিলিপাইন্‌সে লেৎ দ্বীপে জাপানের প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে। এখন মিণ্ডোরো দ্বীপে জাপ-মার্কিণ সজ্ঘর্ষ চলিতেছে।

জাপ-সৈন্য চীনে চোয়েচাও প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া কোয়াংসী প্রদেশে আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। কেইয়াং তথা কুংমিং-চুকিং পথের আশু বিপদ দূরীভূত হইলেও ঐ পথ এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই ; কারণ কোয়াংসী ও য়ুনান সম-সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ। কোয়াংসী প্রদেশ হইতে য়ুনানে ও তাহার রাজধানী কুন্‌মিংএ আক্রমণ চালান এখনও অসম্ভব নয়। ইহা ছাড়া কোরিয়া হইতে ইন্দ-চীন পর্য্যন্ত স্থল-পথের সংযোগসূত্রে জাপান এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মদেশে ভামো মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে ; তাহারা এখন উত্তর ব্রহ্ম হইতে দক্ষিণ দিকে আগাইতেছে। ৬।১।৪৫

ছলনা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

আজ তুমি দুর্লভ দর্শন ;
আমার কপালে তাই,
প্রেম-শ্রাবণের নাই—
শীতল বর্ষণ ;
বিরহের নিদাঘে প্রখর,
আমরণ তনু জর্জ্জর।

*   *   *

এই ছল করো নিরন্তর,
রত তুমি কত কাজে
পাওনাকো তার মাঝে
তিল অবসর,
দেখা দিতে, দেখিতে আমার,
মুখে ছাই, এ ভালোবাসার।

*   *   *

যেথা প্রীতি, সেথা ব্যাকুলতা ;
ব'লোনা তোমার কাছে,
অজানা তা রহিয়াছে,
এ অদ্ভুত কথা ;
অনুরাগ, পবিত্র, মহান্—
সহেনা সে চাতুরী বা ভান।

*   *   *

ভেবে কভু দেখোনিকি নিজে ?
গেহের দাবী কী তুচ্ছ,
তার চেয়ে বহু উচ্চ,
স্নেহের দাবী যে ;
পেতে যদি দরদী হৃদয়,
সেই সত্য বুঝিতে নিশ্চয়।

*   *   *

কাজ, কাজ !—পচে গেল কান
শুনে শুনে যথারীতি,
এক বুলি নিতি নিতি,
নিশিদিনমান ;
কাজ নহে মিলন ছুটির ?
প্রেম শুধু খেলা কি হাসির ?

যাযাবর

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

কবিতা লেখার অবসর কোথা তাই
মোর জীবনের অনেক গিয়েছে ভেসে—
ভুবন ভরিয়া হাহাকার নাই নাই
যেন বেঁচে আছি সব হারাণোর দেশে।

ভাসে মোর চোখে কত পরিচিত গ্রাম
সুন্দর শোভা কুকুই নদীর ধারে—
নদী বয় শুধু ; নাইক গাঁয়ের নাম
ছাউনি সেথায় দেখা যায় সারে সারে।

অনেকে দেখিনু, মরিল ভিটার শোকে
সব থাকিতেও যাহারা সর্বহারা—
তাহাদের ছবি ভেসে ওঠে মোর চোখে
আমার দু-চোখে বহায় নয়ন ধারা।

ওর সাথে সাথে মোর কথা জাগে মনে
নিজ গ্রাম ছাড়ি পরবাসে হোল ঘর—
দেশে দেশে ফিরি ভাগ্য অন্বেষণে
পল্লীর কবি হইলাম যাযাবর।
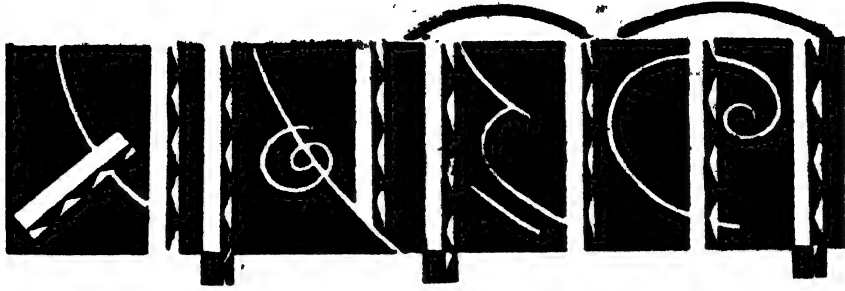
রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম "রামচন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি-ভবন"—

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বর্গত সত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার খড়দহ রহড়া গ্রামস্থিত চারিখানি বাগান ও বাড়ী তাঁহার পরলোকগত পুত্র-কন্যা রামচন্দ্র ও প্রীতির স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটী অনাথ আশ্রম স্থাপনের জন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে প্রদত্ত হয় এবং ঐ আশ্রম পরিচালনার জন্ত সতীশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী মিশনকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। আমরা সম্প্রতি উক্ত বালকাশ্রমের পরিচালন কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। রামকৃষ্ণ মিশনের নিষ্ঠাবান ও অক্লান্ত সন্ন্যাসী-কর্ম্মীগণ ইতিমধ্যেই একশত কুড়িটি শিশু ও বালককে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি বাংলা গভর্ণরের পত্নী মিসেস্ কেসি এবং বড়লাট পত্নী লেডী ওয়াভেল আশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গৃহীত কয়েকখানি আলোক চিত্র অন্যত্র প্রকাশ করা হইল। আশ্রমের শিশুদিগের মধ্যে ঢেরা চিহ্নিত (×) শিশুটাই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। তাহার বয়স আন্দাজ তিন বৎসর। আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ পুণ্যানন্দ স্বামী মহারাজ তাহাকে কলিকাতার রাজপথে কুড়াইয়া পান। সে নিজ পরিচয় সম্বন্ধে নাম—'বুলা', 'বর্ম্মা', 'বাবা নেই' 'মা', 'চিটাগঙ্গ' এইমাত্র বলিতে পারে। অনুমান হয় শিশুটী কোন বর্ম্মাপ্রত্যাগত পিতামাতার সন্তান। পিতামাতা সম্ভবত জীবিত নাই। যদি কোন ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি উক্ত বালকটীকে (প্রথম সারিতে দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয়) চিনিতে পারেন তো তাহা হইলে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইবেন। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এইরূপ একটী প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। রামচন্দ্র-প্রীতি-স্মৃতি-ভবন সে অভাব মোচনে যত্নবান। আমরা আশাকরি, সরকার এবং সর্ব্বসাধারণ এই অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানে মুক্তহস্ত হইবেন।

আইন সংস্কার ও হিন্দুর কর্ত্তব্য—

শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও গোরক্ষপুরের হিন্দী মাসিক কল্যাণ পত্রের সম্পাদক। তিনি যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দু আইন সংস্কার কমিটী হিন্দু সংহিতার সংস্কার সম্বন্ধে যে আইনের খসড়া প্রচার করিয়াছেন, উহা হিন্দু শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বহির্ভূত এবং হিন্দু সমাজ বিধানের মূল নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। উহা দ্বারা একই জাতি এবং পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিন্দু এবং বৃটীশ-ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ হিন্দু আচার এবং হিন্দু আইনের বিধান ইহা দ্বারা একেবারে বিলোপ করা হইতেছে। ইহা দ্বারা পিতৃশাসিত পরিবার, যৌথ পরিবার এবং একব্রততার পবিত্র বিধান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হইতেছে। আমি সে জন্ত সমগ্র হিন্দু জাতিকে সুনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা এই হিন্দু বিরোধী আইনের প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে সভা সমিতি করিয়া বড়লাট ও ভারত সরকারের আইন বিভাগের সদস্যের নিকট এই মর্ম্মে তার করুন যে, হিন্দুদের ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়, প্রস্তাবিত হিন্দু সংহিতা সংস্কারের প্রস্তাব যেন কেন্দ্রীয় পরিষদে পেশ করা না হয় এবং হিন্দু আইন কমিটী যেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।"

চার্চ্চিলকে তাড়াও—

মিঃ এচ্-জি-ওয়েল্সের মত বিলাতের সুপণ্ডিত চিন্তাশীল লেখক লণ্ডনের 'ট্রিবিউন' পত্রে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"চার্চ্চিলকে এখনই প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা প্রয়োজন। তিনি নিজের ও দেশের যে ক্ষতি সাধন করিতেছেন, তাহা বন্ধ করা দরকার।" এই উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। গত সাড়ে ৫ বৎসর যুদ্ধের মধ্যে থাকিয়াও নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া বিলাতের লোকের মনোভাব এইরূপই হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস, চার্চ্চিল সরিয়া গেলেই লোক সুখ-শান্তি ফিরিয়া পাইবে। এই সঙ্গে আর একজন বৃটীশ রাজনীতিকের মত আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি পার্লামেণ্টের শ্রমিকগণের সদস্য কাপ্তেন জন ডুগেল। তিনি বলিয়াছেন—"মিঃ চার্চ্চিল যতদিন প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন, ততদিন ভারতের সমস্যার সমাধান হইবে না।" এই কথাটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ম্যালেরিয়া তাড়াইবার উপায়—

গত ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার বঙ্গীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির রৌপ্য জুবিলী উৎসব হইয়া গিয়াছে; তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া খ্যাতনামা গ্রাম হিতৈষী কর্ম্মী মিঃ এল্-কে-এল্মহার্ষ্ট ম্যালেরিয়া নিবারণের ৬টি উপায়ের কথা বলিয়াছেন—(১) শিক্ষা বিস্তার (২) নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার (৩) পুকুরে মাছের চাষ (৪) রাস্তা, রেলপথ ও নদীর উন্নতি বিধান (৫) নূতন ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ ও (৬) স্বাস্থ্য চর্চ্চা। কিন্তু উপায় ত তিনি বলিয়া দিলেন, এ বিষয়ে কাজ করিবে কে? সরকারী আয়ের কত ভাগ এদেশে স্বাস্থ্যের জন্ত ব্যয় করা হয়? রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত

২৫ বৎসর ধরিয়া এই সমিতির মধ্য দিয়া যে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে সরকার কতটুকু সাহায্য করিয়াছেন ?

ভারতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী—

গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে বিলাতে শ্রমিক দলের যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিবার জন্য এখনই ভারতের রাজনীতিক নেতাদের মুক্তি প্রদান করা হউক। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রস্তাবটি শ্রমিক দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ অনুমোদন না করা সত্ত্বেও দলের প্রকাশ্য অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটের জোরে ইহা গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে বৃটীশ জনসাধারণের মনোভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রমিক দলের একজন সদস্য বলিয়াছেন—মিঃ চার্চ্চিল যখন কুইবেক, ওয়াশিংটন, কাসাব্ল্যাঙ্কা, তিহারণ ও মস্কো যাইতে পারেন, তখন তাঁহার পক্ষে এখনই দিল্লীতে যাইয়া ভারতীয় নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত।

শান্তিনিকেতনে বার্ষিক উৎসব—

গত ৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৪৩তম বার্ষিক উৎসব শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। নাইডু মহোদয়া তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শেষ করিবার ভার আমাদের উপর। যাহাতে অর্থাভাবে শান্তি নিকেতন তথা বিশ্বভারতীর কাজ বন্ধ হইয়া না যায়, আমাদের সে চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি সমিতির কথা আমাদের মনে পড়ে। সে সমিতি এ পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য কি করিয়াছেন, তাহা কেহই জানেন না। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থ চাহিলে সমগ্র দেশের লোকই অর্থ দিবে—কিন্তু সে চেষ্টা করিবার কি কোন লোক নাই ?

বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ আমদানী—

গত বড়দিনের সময় কানপুরে যে নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতি হইয়া ডাঃ জীবরাজ মেহটা একটি বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন—"ভারতে বিদেশ হইতে চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ আমদানী করার নীতি অতীব নিন্দনীয়। কারণ উহা দ্বারা ভারতীয় চিকিৎসকদের প্রতিভাকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে।" পরাধীন দেশে যে পদে পদে এইভাবে আমাদের লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহা আমরা জীবনের প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া থাকি। যে দেশে বিদেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অবাধে প্রসার লাভ করে ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অবহেলা প্রাপ্ত হয়, সে দেশে বিশেষজ্ঞ অনুসন্ধানের সময় যে বিদেশের প্রতিই লক্ষ্য থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ—

কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের মূলসভাপতিরূপে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা নানা দিক দিয়া প্রশংসার যোগ্য। তিনি ভারতের জনগণের ইতিহাসের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়া বলেন—"বাঙ্গালার মর্ম্মবাণী হইতেছে—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বিশ্বের কোন সংস্কৃতিতে মানুষের এমন মরমীর রহস্যময় আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিবেদন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতা ও মৈত্রীর ইহাই হইতেছে আসল বনিয়াদ। যাহা বিশ্বের কাজ ও সাধনার ভাণ্ডারে বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব দান, তাহা বাঙ্গালার আজিকার জীবন মরণ সমস্যার দিনে আমাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে।"

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও হাসপাতালের অস্ত্র চিকিৎসক ডক্টর জে-কে-দত্ত মহাশয়ের কন্যা কুমারী গীতা দত্ত এ বৎসর আশুতোষ কলেজ হইতে আই-এ

কুমারী গীতা দত্ত

পরীক্ষায় সংস্কৃতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১৫ টাকা গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি এবং (১) পাচেট সংস্কৃত প্রাইজ (২) সারদাপ্রসাদ প্রাইজ ও (৩) জ্যোৎস্না প্রাইজ লাভ করিয়াছেন।

দক্ষিণ শ্রীপুর সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ শ্রীপুর (খুলনা) সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ঔপন্যাসিক-নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার-রায়চৌধুরী প্রধান অতিথি হন। জেলার বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট সম্মিলনে প্রায় ৪।৫ হাজার লোক সমবেত হন। উদ্বোধন সঙ্গীত এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথি বরণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মীরা রায়চৌধুরীর অভিভাষণ পঠিত হয়। তারপর শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিভূষণ রায়চৌধুরী প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা

এবং শ্রীদেবীরঞ্জন সরদার, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু, শ্রীরাঘবদাস সরদার, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনকুল দেব প্রভৃতি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। "সাহিত্যের গতিভঙ্গী" সম্বন্ধে প্রধান অতিথির বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহে সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

পরলোকে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ—

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত রোমাঁ রোলাঁ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি যে সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণীয়। এই সাধনার বেদীমূলে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ নিজেকে উৎসর্গ করিয়া একাধারে যেমন সত্য-সুন্দরের পূজা করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি স্বাধীন মত প্রচারে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আজীবন আদর্শবাদের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। স্বার্থের লোভে ও পশুবলে বলীয়ান্ একটা জাতি যখন অপর একজাতিকে পদানত করিবার চেষ্টা করিয়াছে—তখনই তিনি তাহার বিপক্ষে নিজের স্বাধীনমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ ছিল—শান্তি। তিনি ছিলেন শান্তিবাদী ও শান্তিকামী। হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও পররাজ্যলোলুপতা দূর করিতে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাই অত্যাচারিত, উৎপীড়িত নরনারীর পক্ষে যখনই তিনি কোন স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন তখনই তাঁহাকে বলদৃপ্ত জাতির নিকট হইতে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি ছিলেন দিক্‌পাল সাহিত্যিক ও দার্শনিক। তাঁহার সাহিত্য সাধনার খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নোবেল পুরস্কার ও ফরাসী সাহিত্য-পরিষদের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যে যে সকল চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ এবং হাসি-কান্না লইয়াই নহে—তাঁহার প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে নরনারীর প্রাণের পরম সত্যটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি মনীষী রোমাঁ রোলাঁ ছিলেন—শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ' 'বিবেকানন্দ' ও 'গান্ধীজী'র জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারমুক্ত মন ভারতীয় কৃষ্টি ও স্বাধীনতার প্রতি সজাগ ছিল। ভারতের স্বাধীনতার সমর্থক হিসাবে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য ভারত চিরদিন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। রোমাঁ রোলাঁর তিরোধানে আমরা নিতান্ত নিকটতম বন্ধুর বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো—

কলিকাতা জিতেন্দ্রনারায়ণ শিশু বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ডাক্তার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা-ইটালীর ন্যাশনাল মেডিকেল ইনিষ্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ধাত্রী বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ও কলিকাতার সুবিখ্যাত জনসেবক দেশকর্ম্মী। উক্ত শিশুবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীতা হইয়াছেন।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—

প্রবীণ বৈষ্ণব সাহিত্যিক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ৭৮তম জন্ম দিবসে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে গত ২৩শে ডিসেম্বর এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী সভায় পৌরহিত্য করেন এবং অভিনন্দনের উত্তরে গোস্বামী মহাশয় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া বর্ত্তমান সমস্যায় মানব জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন।

সদস্যদের বেতন বৃদ্ধি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে সভায় গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী সার নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবে সদস্যদের বেতন মাসিক দেড়শত টাকার স্থলে দুইশত টাকা ও দৈনিক ভাতা ১০ টাকা স্থলে ১৫ টাকা করা হইয়াছে। ১৯৪৪এর ১লা জানুয়ারী হইতে সদস্যগণ ঐ হারে ভাতা ও বেতন পাইবেন। তিনটি সংশোধন প্রস্তাবই (১) ঐ বিষয়ে জনগণের মত লওয়া হউক—৫১ ভোট পক্ষে, ৮৩ ভোট বিপক্ষে (২) বেতন ১০১ টাকা করা হউক—৪৯ পক্ষে, ৭৮ বিপক্ষে (৩) বর্দ্ধিত বেতন ১৯৪৫এর জানুয়ারী হইতে দেওয়া হউক—পক্ষে ৪৮, বিপক্ষে ৭৭—অগ্রাহ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বেতন বা ভাতা আরও অধিক বৃদ্ধি করিলেও কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।

অধিক লাভ সম্বন্ধে অর্ডিনান্স—

১৩ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় অধিক লাভ করা ও মাল মজুত রাখা বিষয়ে নূতন অর্ডিনান্স বা বিশেষ আইন প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা ঐ সকল অপরাধে অপরাধী, তাহারা যাহাতে সত্বরে দণ্ডিত হয়, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে সাহায্যকারীরাও যাহাতে দণ্ডলাভ করে, নূতন আইনে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই আইনানুসারে যদি দলে

দলে প্রকৃত অপরাধী ধৃত ও দণ্ডিত হয়, তবে দেশের লোক ভয় পাইয়া ঐ সকল জুয়াচুরি হইতে নিবৃত্ত হইবে—নচেৎ কাগজে কলমে ত অনেক আইনই আছে, সেজন্য কাহারও কোন মাথা ব্যথা দেখা যায় না।

বসন্ত ও কলেরা—

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, বাঙ্গালা দেশের মোট ৯৭টি মিউনিসিপালিটির মধ্যে কলেরা, বসন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে ৩৪টি মিউনিসিপালিটীতে কলেরা ও বসন্ত উভয়ই, ৩২টিতে শুধু কলেরা ও ৩১টিতে শুধু বসন্ত দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপালিটীগুলির অর্থভাণ্ডার প্রায় শূন্য, লোকাভাব—কাজেই কে এই ব্যাপক ব্যাধির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে? সমগ্র জগতই কি ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে?

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—

গত ১০ই ডিসেম্বর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ৮৪তম জন্মোৎসব ভারতের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনে, বিশেষ করিয়া হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য দেশবাসী সকলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার অমর কীর্ত্তি। সম্প্রতি তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশ্বনাথের এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। মন্দিরটি যাহাতে তাঁহার জীবিতাবস্থায় সম্পূর্ণ হয়, সেজন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। পণ্ডিতজী আরও সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন লাভ করুন, ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

মার্কিণ মনীষীদের দাবী—

১২৭জন খ্যাতনামা মার্কিণ মনীষী ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ দূত লর্ড হালিফ্যাক্সকে এক পত্র লিখিয়া এখনই যাহাতে ভারতের রাজনীতিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়, সেজন্য দাবী জানাইয়াছেন—ঐ দলে জন গান্থার, লুই ফিসার, পার্ল বাক প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আছেন। ইহার পর মিঃ চার্চ্চিল কি করিবেন?

মজুত খাদ্যের পরিমাণ—

ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য বিভাগ গত ১২ই ডিসেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন যে কলিকাতা সহরবাসীর ৪ মাসের চাহিদার উপযুক্ত খাদ্য জমা আছে। কলিকাতায় সহরে প্রতি মাসে ২২ হাজার টন চাউল ও ১৪ হাজার টন আটা প্রয়োজন হয়। কিন্তু কলিকাতায় মোট ৮৬ হাজার টন চাউল ও ৬২ হাজার টন আটা জমা হইয়া আছে। খবর ঠিক হইলে ভাল কথা। ইহা ছাড়াও ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৫ সালে বাঙ্গালা দেশের জন্য বাহির হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গম পাঠাইতে রাজী হইয়াছেন।

পাঞ্জাবের ব্যবস্থা—

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের ৯জন সদস্য এখনও বিনা বিচারে আটক আছেন এবং ১২জন সদস্যকে মুক্তিদান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপর এরূপ নিষেধাজ্ঞা আছে যে তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা পরিষদের সভায় যোগদান করাও সম্ভবপর হয় না; পরিষদের সভায় উপস্থিত হওয়াও অপরাধজনক কিনা তাহা আমরা জানি না। পাছে তাঁহারা পরিষদে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধে ভোট দেন, সেইজন্যই কি তাঁহাদিগকে এভাবে বাহিরে রাখা হইয়াছে?

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—

বাঙ্গালা দেশ যে ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, সে কথা গত ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা সরকারী দপ্তরখানায় সাংবাদিকদের এক সভায় সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাদেশিক ডিরেক্টার মেজর এম, জাফরও স্বীকার করিয়াছেন। গত জানুয়ারী (১৯৪৪) মাসে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ৭০ হাজার অধিক লোক বাঙ্গালা দেশে শুধু ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ১৭ হাজার অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। এখনও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সঠিক হিসাব প্রস্তুত হয় নাই। সমগ্র ১৯৪৪ সালে কত লোক যে এই একমাত্র ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব প্রকাশিত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগে যে কম লোক মারা গিয়াছে, এমন নহে।

বাগবাজারে সাহিত্য সভা—

বাগবাজার পল্লীর অধিবাসীবৃন্দের উদ্যোগে সম্প্রতি স্থানীয় অনুরূপা বালিকা বিদ্যালয় ভবনে এক সাহিত্য সভা হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কালীপদ তর্কাচার্য্য

বাগবাজারে সাহিত্যসভা

সভার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পল্লীর কবি শ্রীযুত হেরম্বনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তাঁহার 'ছন্দশ্রী' পুস্তক হইতে সভায় কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত গীত হইয়াছিল।

[illegible]

ভারতীয় [illegible] উদ্যোগে পৃথিবীর [illegible] বৃহৎ সমাজ-সেবক দল [illegible] হইতেছে। ইহার সভ্য সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী হইতে পারে। এই সকল সভ্য ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবে। এই কর্মীদল সংগঠিত করিবার জন্য তালিমী সংঘ, চরকা সংঘ, গ্রাম্য শিল্প সমিতি, গো-সেবা সংঘ ও হরিজন সেবা সংঘ—এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হইতে ২।৩ জন করিয়া সভ্য লইয়া 'সমিতি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। এই ধরণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও ইহাতে সদস্য প্রেরণ করিতে পারিবে। 'সমিতি' শুধু এই সংঘগুলির পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিবে। ইহা বর্তমানের সংঘগুলির প্রতিনিধিদের মারফত পরামর্শ দিয়া সংঘগুলির উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিবে। তবে সমিতির প্রধান কার্য্য হইবে ঐ সকল সংঘকে সমিতিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের শাখাগুলিতে এক লক্ষ গ্রামের সেবক কর্মীদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা ও পরে গ্রামাঞ্চলে তাহাদের কার্য্যের তদারক করা। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্মীরাই এই দল গঠনের উদ্যোগী। কাজেই এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

সাধু ভাস্বানী সম্বর্দ্ধনা—

সিন্ধু দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত সাধু ভাস্বানি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। গত ১০ই ডিসেম্বর সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সাধুজীকে ভাগবতরত্ন উপাধিও প্রদান করা হয়। ভাস্বানী শুধু পণ্ডিত নহেন, দেশকর্মী। তাঁহার আদর্শ সর্ব্বত্র অনুকরণের যোগ্য।

সাধু ভাস্বানী

দেশদ্রোহী কে ?

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার মহম্মদ কুদরত-ই-খোদা এবার কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে এমন একটি কথা বলিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি বলিয়াছেন—"সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া ফেলিয়া আমরা সমগ্র ভারতকে সমবেত ভাবে নিজেদের এক সমাজ, এক জাতি বলিয়া জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করি—ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাহারা প্রাদেশিকতার প্রচার করে অথবা অন্যরূপে সমাজে বিভেদ ঘটাইবার ব্যবস্থা করে, তাহারা সকলেই দেশদ্রোহী।"

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। [illegible] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয় [illegible] আসন গ্রহণ [illegible] এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] কুদরতে খোদা, রায় বাহাদুর [illegible] [illegible]পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিভিন্ন [illegible] সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] প্রদর্শনীর ও শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সাময়িক পত্র [illegible] উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থান হইতে [illegible] প্রতিনিধি সমাগম হইয়াছিল।

সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী—

ই, আই, রেলের জেনারেল ম্যানেজার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ এবার কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে বৃহত্তর বঙ্গ শাখায় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—"অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশের মহত্ব স্বীকৃত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত না বাংলার শিল্প বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতেছে, ততদিন অন্যান্যদের নিকট সে কোন সম্মান পাইবে না। সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আজ কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন, বিশ্বভারতী ও অরবিন্দ আশ্রম কার্য্য করিতেছে—এই আশ্রমসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৃহত্তর বাঙ্গালার দৃষ্টিভঙ্গী।"

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস—

গত ২০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় তথায় সভাপতি হইয়া আমাদের জীবনের বর্ত্তমান সমস্যার কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মুখে ভগবানের নাম বলিব অথচ তাঁহারই সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিব, উচ্চাঙ্গের সুকুমার সৌন্দর্য্যবোধ শক্তির চর্চ্চা করিব অথচ চারিদিকের বীভৎসতা, শূন্যতা ও সামাজিক ভেদাভেদ দেখিয়া ঘৃণা বোধ করিবে না, ব্যক্তিগত জীবনে নীতি মানিয়া চলিব অথচ নাগরিকতার ক্ষেত্রে অন্যায়ের আসন কায়েম রাখিব ও আন্তর্জাতিকতায় ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব—এই মনোভাব লইয়া বিশ্বশান্তি বা মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করা অসম্ভব।"

চুংকিংয়ে জিনিষের দাম—

রয়টার খবর দিয়াছেন, চীনের চুংকিং সহরে মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষের দাম নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইয়াছে—একটি [illegible]—৫০ পাউণ্ড, এক জোড়া জুতা—২০ পাউণ্ড, একটি পোষাক—২০০ পাউণ্ড, এক বোতল মদ—১১০ পাউণ্ড, মুখে লাগাইবার রং একটি ১০ পাউণ্ড, আধ সের মাখন ১০ পাউণ্ড। সংবাদ নূতন বটে চুংকিংএ এখন শুধু কোটিপতিরাই বাস করেন। সেখানে [illegible] বাঙ্গালা দেশের মত লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে কিনা জানি না।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ঃ ২৪৮ ও ১৫৭

যুক্তপ্রদেশ ১৭৬ ও ১৫৪

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বাঞ্চলের খেলায় বাঙ্গালা প্রদেশ মাত্র ৭৫ রানে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করেছে। বাঙ্গালা টসে জয়লাভ করলে পি বি দত্ত এবং অসিত চ্যাটার্জি ব্যাট করতে নামলেন। দলের মাত্র এক রানে এ চ্যাটার্জি কোন রান না করেই আউট হলেন। পি সেন এসে পি বি দত্তের জুটি হলেন এবং দ্রুত রান তুলতে লাগলেন। লাঞ্চের সময় দলের রান উঠল ১০৪। লাঞ্চের পর দলের ১২৫ রানে পি বি দত্ত গান্ধির বলে আউট হলেন। দত্ত ৫৮ রান করলেন, তার মধ্যে ৬টা বাউণ্ডারী ছিল। খেলা আরম্ভ থেকে তিনি ১৪৪ মিনিট উইকেটে খেলে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। পি সেনের জুটী হলেন হার্কার এবং কোন রান না করেই বিদায় নিলেন। দলের এ ভাঙ্গনে এন চ্যাটার্জি ব্যাট করতে নামলেন। দলের ১৩৩ রানে পি সেন ৬৩ করে গান্ধীর বলে উইকেটের পিছনে ধরা দিলেন। পি সেন এবং পি বি দত্ত উভয়ের জুটিতে ১২৪ রান তুললেন। পি সেন ১৫৩ মিনিট খেলে ৬৩ রান তুলেন তার মধ্যে ৭টা বাউণ্ডারী ছিল।

এন চ্যাটার্জি দর্শকদের সমস্ত আশার উপর ব্যাট চালিয়ে মাত্র ৬ ক'রে অজিজের বলে সহিদুল্লার হাতে স্লিপে ধরা পড়লেন। তাঁর খেলার সব চেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে—তিনি খুব বেশী সময় বোলারদের সম্মান দিয়ে তাঁদের খেলার প্রাধান্য বিস্তার করতে সুবিধা দিয়ে ছিলেন। ১৬৩ রানে বাঙ্গলার ৫টা উইকেট পড়ে গেল। মহারাজা ২৭ রান করলেন। পার্থসারথি করলেন ২১ রান। দলের ভাঙ্গনের মুখে কে ভট্টাচার্য্যের ৩১ রান এবং ভাত্রেকারীর ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলার প্রথম ইনিংস ৫-৫ মিনিটে ২৪৮ রানে শেষ হ'ল। এস গান্ধি ৩৬ ওভার বলে ৭টা মেডেন এবং ৬৭ রানে ৫টা উইকেট পেলেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রারম্ভে যুক্তপ্রদেশ দল ব্যাটিং আরম্ভ করলে। আরম্ভ খুব ভাল হ'ল না। মাত্র ১ রানে প্রথম উইকেট পড়ে গেল। যুক্তপ্রদেশ দলের ৬১ রানে ৬টা ভাল উইকেট বাঙ্গলা দল পেয়ে গেল। এস গান্ধি ২৯ রানে এবং কাজলেকার কোন রান না করেই আউট হলেন। এর পর রামচন্দ্র জালালুদ্দিনের জুটিতে খেলাটী অনেক ঘুরে গেল। ৩২ রান করে দলের ৯৮ রানে রামচন্দ্র এবং জালালুদ্দিন ২৯ রান করে দলের ১৩০ রানে আউট হলেন। মজিদ আউট হলেন ৩২ রান ক'রে, দলের রান তখন ১৬৭। হাতে আর মাত্র একটী উইকেট। শেষ উইকেট দলের ১৭৬ রানে নেমে যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে গেল। এন চৌধুরী এবং ভোত্রিকারী প্রত্যেকে ৩টে করে উইকেট পেলেন। কমল ভট্টাচার্য্য সাত ও'ভার বলে ২৫ রান দিয়ে ২টী উইকেট নিলেন।

বাঙ্গালা দল ৭২ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে পি দত্ত এবং অসিত চ্যাটার্জিকে দিয়ে। আরম্ভেই বাধা পড়ল; দত্ত হাঁটুতে বাধা পেয়ে অবসর নিলেন। পি সেন এসে চ্যাটার্জির জুটী হলেন। দলের ২৪ রানে পি সেন ১০ রান করে আউট হলেন। এন চ্যাটার্জি খেলতে নামলেন। সকলেই আশা করলেন একসঙ্গে দু' ভাইয়ের খেলা ভাল হবে। কিন্তু এবারও নির্ম্মল চ্যাটার্জি দর্শকদের হতাশ করলেন, মাত্র ২ করে আউট হলেন। চায়ের সময় বাঙ্গালার ২ উইকেটে রান উঠল ৩৪। অসিত চ্যাটার্জি এবং পি বি দত্তের রান তখন যথাক্রমে ১৬ ও ২।

চায়ের পর খেলা অনেকখানি ঢিলে পড়ে গেল। চ্যাটার্জি ১৬ রানে আউট হলেন। পি বি দত্ত উইকেটের পিছনে একবার ধরা পড়তে গিয়ে বেঁচে গেলেন। যাই হ'ক গান্ধির বলে পি দত্ত ১০ রান ক'রে একেবারে বোণ্ড হলেন। ৪১ রানে দলের চারটে ভাল উইকেট পড়ে গেল। এম সেন এবং হার্কার খেলতে লাগলেন। এম সেন মেহারার বলে আউট হলে বাঙ্গলার ৫ উইকেটে ৭৪ রান উঠল। এর পরই খেলা বন্ধ হয়ে গেল। হার্কার ১৪ রান করে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করলেন মহারাজ এবং পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটসম্যান হার্কার। দলের ৮৯ রানে হার্কার (৬ষ্ঠ উইকেট) আউট হলেন। ২০০ মিনিট খেলে বাঙ্গালার ১৫৭ রান উঠলে পর বাঙ্গালার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। পার্থসারথির ৩০ রান এবং কে ভট্টাচার্য্যের নট আউট ২৪ রান উল্লেখযোগ্য। এবার গান্ধির বোলিং ভাল হ'ল, ৪৪ রানে ৪টা উইকেট পেলেন। মেহেরা পেলেন ৩টে উইকেট ১৯ রান দিয়ে।

লাঞ্চের দশ মিনিট পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশ তাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলেন। বালেন্দুসাহ এবং মেহেরা ব্যাট করতে নামলেন। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ১২ রান উঠল। বালেন্দু এবং মেহেরা যথাক্রমে ৮ ও ৩ রান করে লাঞ্চ

করতে গেলেন। চায়ের সময় রান উঠল ৯৯, এদিকে ৫টা উইকেটে পড়ে গেছে। কানসেলকার এবং খাজা তখন ব্যাট করছিলেন।

চায়ের পর আবার ভাঙন সুরু হ'ল। খাজা ৬৪ মিনিট স্বচ্ছন্দে খেলে ৩৪ রান করলেন; তার মধ্যে চারটা বাউণ্ডারী ছিল। খাজা এবং কানসেলকারের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটী ৪২ মিনিটকাল স্থায়ী ছিল। দলের ১৪৯ রানে ৯টা উইকেট পড়ে গেলে, সেদিনের মত খেলা বন্ধ হ'ল। কানসেলকার ৩৭ রান করে নট আউট রইলেন। এন চৌধুরী ৪৯ রানে ৪টে, এম সেন ২১ রানে ৩টে এবং কে ভট্টাচার্য্য ৩৪ রানে ২টি উইকেট পেলেন।

চতুর্থ দিনের মাত্র ১২ মিনিট খেলার পর ১৫৪ রানে যুক্তপ্রদেশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। কানসেলকার ৪০ রান নট আউট রইলেন। চৌধুরী এদিকে ২টি উইকেট নিলেন ৪৯ রানে। বাঙ্গালা প্রদেশ ১৫৪ রানে যুক্তপ্রদেশ দলকে পরাজিত করলে।

পশ্চিমাঞ্চলের খেলা

মহারাষ্ট্র : ৩৭২ ও ৩৬২ (৭ উই: ডিক্লে)

নওনগর : ১৩১ ও ১১৫

মহারাষ্ট্র দল ৪৮৮ রানে নওনগরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় ডি বি দেওধর উভয় ইনিংসে শতাধিক রান ক'রে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

মহারাষ্ট্রদলের প্রথম ইনিংসে প্রফেসর দেওধরের ১০৫ রান, গোখেলের ৫৮ রান, রিজির ৫২ এবং যাদবের নট আউট ৮২ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুবারক আলি ৯৬ রানে ৬টা উইকেট পেলেন।

নওনগরের প্রথম ইনিংসে যাদবেন্দ্র সিংহের ৪২ রান একমাত্র উল্লেখ করা যায়। সিদ্ধি মাত্র ১৮ রানে ৫টা উইকেট পেলেন।

মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭ উইকেটে ৩৬২ রানে উঠলে প্রফেসর দেওধর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। দেওধর নিজে ১৪১ রান করলেন। এর পর উল্লেখযোগ্য রান হচ্ছে পরাণজপির নট আউট ৬৫ রান এবং গজালির ৪৬ রান।

নওনগর দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১১৫ রানে শেষ হ'ল। সিদ্ধি ২৯ রানে ৪টে উইকেট পেলেন। তৃতীয় দিনেই খেলাটি শেষ হ'ল।

বরদা : ৩১৪ ও ৫১২ (৩ উইকেট, ডিক্লিয়ার্ড)

মহারাষ্ট্র : ২০৫ ও ২৬৭

পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় মহারাষ্ট্র দল ৩৫৪ রানে বরোদার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। এই খেলায় বিজয় হাজারী দুই ইনিংসেই শতাধিক রান করে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ ছাড়া বরোদা দলের শতাধিক রান করেছেন, নিম্বলকার এবং অধিকারী। বরোদা দল বিশেষ শক্তিশালী সুতরাং তাদের বিজয় গৌরব কিছু আশ্চর্য্যের নয়।

বরোদা প্রথম ইনিংস : বিজয় হাজারী ১২৭,, ভি এন রায়জী ৬৮ (যাদব ৬৪ রানে ৩টি, সিদ্ধে ৯৯ রানে ৩টি ও সোহনী ৫১ রানে ২টি উইকেট পেলেন।

দ্বিতীয় ইনিংস : ভি এন রায়জী ৫৩, নিম্বলকার ১১৭, অধিকারী নট আউট ১৬৪ রান এবং বিজয় হাজারী নট আউট ১৬২ রান।

মহারাষ্ট্র। প্রথম ইনিংস : রানে ৭২, সোহনী ৩৩ এবং প্রফেসর দেওধর ৩৯। বিজয় হাজারী ৫১ রানে ৩টি এবং আমীর ইলাহি ৭০ রানে ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংস—প্রফেসর দেওধর ৬০ এবং পরাঞ্জপে ৬৩।

ব্যাডমিণ্টন ঃ

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে পাঞ্জাব এবং ডবলসে বোম্বাই বিজয়ী হয়েছে। ফলাফল : পুরুষদের সিঙ্গলস : দেবীন্দর মোহন (পাঞ্জাব) ১৫-১০ এবং ১৫-৩ পয়েণ্টে প্রকাশনাথকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে—কে এস রঙ্গনেকার ও ডি-জি মাগউই (বোম্বাই) ১৫-৭, ৬-১৫, ১৫-১২ পয়েণ্টে এস-এল জিয়ানী ও ডি চরঞ্জিৎকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে—প্রকাশনাথ ও মিস সুন্দর দেওধর ১৩-১৩, ১৫-১১ পয়েণ্টে ডি জি মাগাউই ও মিসেস ডি মলহোত্রকে হারিয়ে দেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস তারা দেওধর ১১-৪ ও ১১-৫ পয়েণ্টে মিস সুন্দর দেওধরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে—মিস এফ তলায়ার খাঁ ও মিস এস চিনয় (বোম্বাই) ১৫-৪, ১৫-৯ পয়েণ্টে মিস সুন্দর দেওধর ও মিস তারা দেওধরকে পরাজিত করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কালকূট"—২৲
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ"—২।০
বাণীকুমার ও পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রণীত "স্বরলিপিকা"—২।০
অন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত "বিনুর বই"—২।০
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মনোবীণা"—৸০
নির্মল দাশ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "কাঁসির ডাক"—১।০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সমুদ্রজয়ী কলম্বাস"—১৲
সব্যসাচী-প্রণীত রহস্যোপন্যাস "জীবনের মোহ"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

প্রথম ফসল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
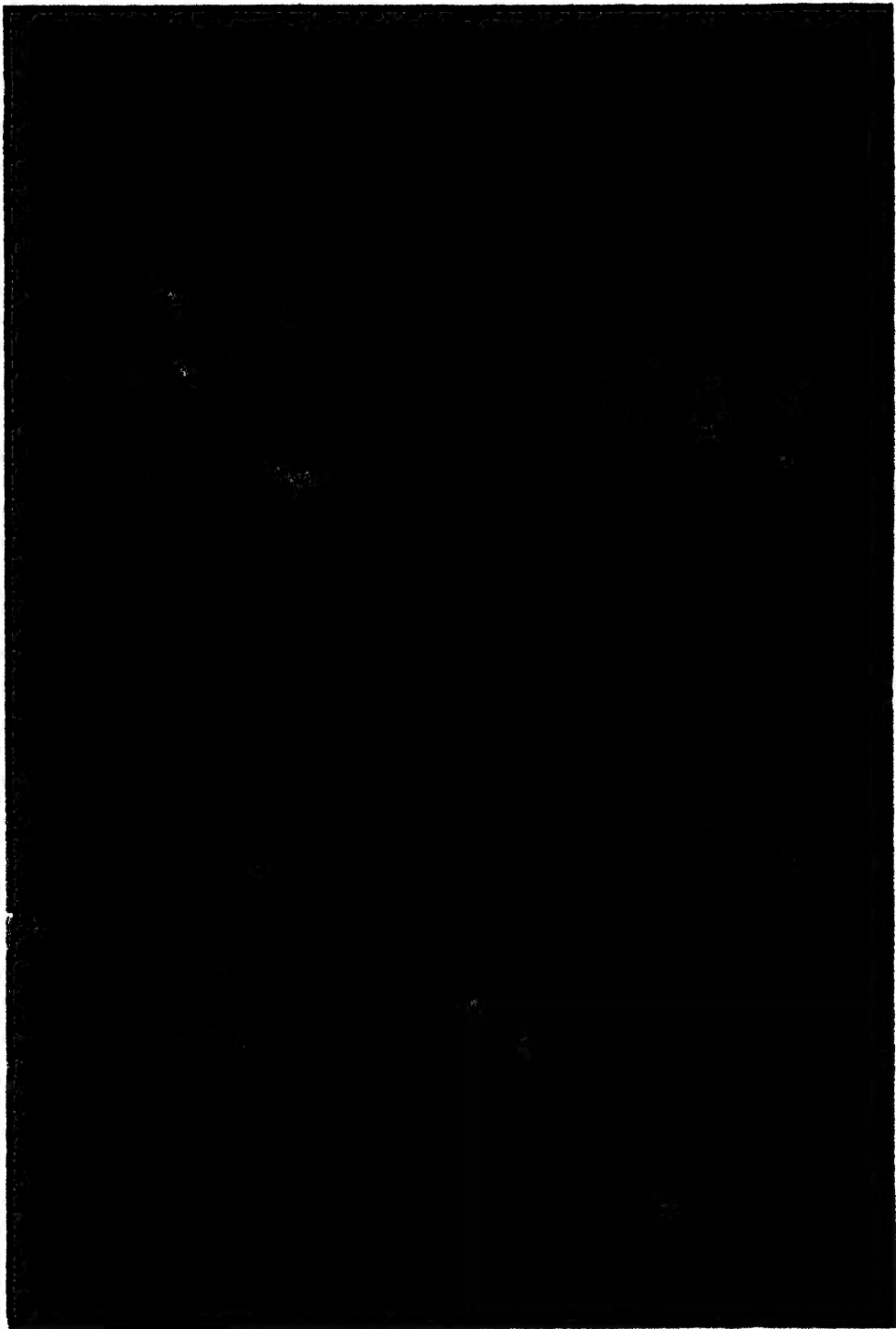
গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীর কয়েকখানি চিত্র
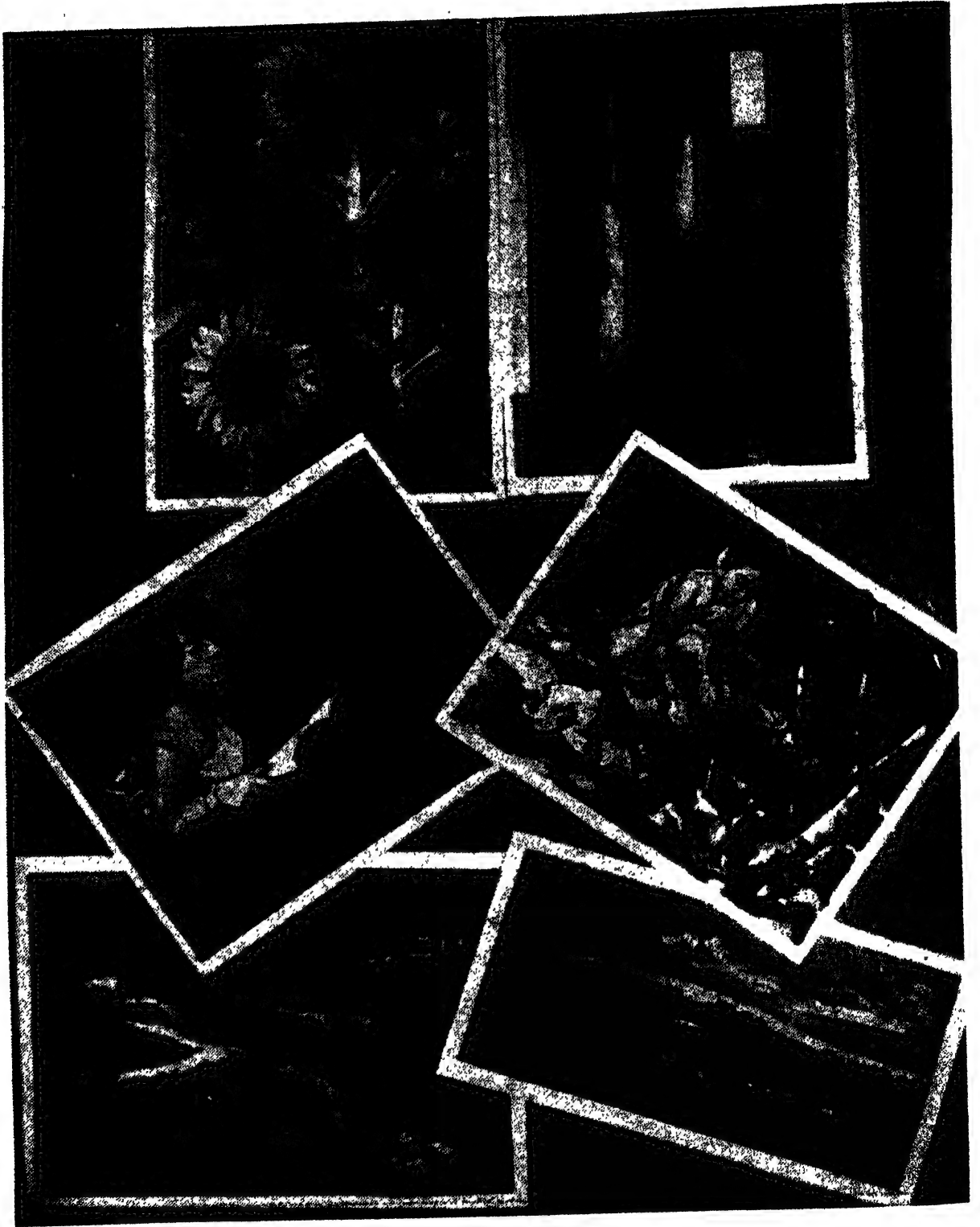
(১) সূর্য্যমুখী—নরেশ সেনগুপ্ত অঙ্কিত

(২) গোয়ালিনী (তৈলচিত্র)—দেবকুমার রায়চৌধুরী অঙ্কিত

(৪) কপোত (তৈলচিত্র)—সমর ঘোষ অঙ্কিত

(৫) রাজগীর কুণ্ড (তৈলচিত্র)—সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল অঙ্কিত

ফাল্গুন—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

একটি প্রাচীন কথাচিত্র

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি

ভারতবর্ষের প্রাচীন কাহিনীসমূহের অধিকাংশ রাজামহারাজা এবং ধনবান্ বণিক্ ও নাগরিকসম্পর্কিত শৌর্য্য-প্রেমাদিমূলক এবং অলৌকিক ঘটনাবিষয়ক। দরিদ্র পল্লীগৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয় উহাতে কম পাওয়া যায়। কিন্তু কম বলিয়াই ঐরূপ ঐতিহাসিক উপাদানের মূল্য অত্যন্ত অধিক। দুঃখের বিষয়, আমাদের পুরাবিদ্‌গণ এখনও প্রাচীন ভারতের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে বিশেষ যত্নশীল হন নাই।* অথচ আনন্দের কথা এই যে, ঐতিহাসিক ছাড়াও কদাচিৎ দুই-এক ব্যক্তির মধ্যে এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি মাদ্রাজের "জার্নাল অব্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্‌ট্‌রী" পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৪১) দশকুমারচরিত নামক সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থবর্ণিত গোমিনীকথা অবলম্বনে রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা পাঠ করিয়া "দি জার্নাল্ অব্ ফিল্‌ম্ ইন্‌ডাস্‌ট্‌রী" পত্রিকার ব্যবস্থাপক-সম্পাদক আমাকে বোম্বাই হইতে লিখিয়াছিলেন, "The description of Gomini's personality in your article appears to be so good that we are going to recommend it to members of the Indian Motion Picture Producers' Association in connection with a short film which could well be titled 'Portrait of a Dravidian Beauty." যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি উল্লিখিত গোমিনী কথা এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

দ্রাবিড়দেশে কাঞ্চী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে শক্তিকুমার নামে একজন ক্রোড়পতি শ্রেষ্ঠিপুত্র বাস করিতেন। শক্তিকুমারের বয়স যখন আঠার বৎসরের মত, তখন একদিন তিনি চিন্তা করিলেন, "যাহাদের স্ত্রী নাই এবং যাহাদের ভার্য্যা আত্মানুরূপ গুণশালিনী নহে, তাহাদের সুখের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গুণবতী স্ত্রী লাভ করিবার উপায়ই বা কি আছে?" শ্রেষ্ঠিপুত্রের মনে হইল, অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে, কন্যা তাঁহার মনোমত নাও হইতে পারে। তখন তিনি কার্ত্তান্তিক অর্থাৎ দৈবজ্ঞের বেশে সুলক্ষণা কন্যার সন্ধানে বাহির হইলেন। যাইবার সময় একপ্রস্থ পরিমাণ (কোন হিসাবে কিঞ্চিদধিক দেড় সের, অন্য হিসাবে চার কিংবা পাঁচ সের) শালি ধান্য বস্ত্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন।

* পালিভাষায় লিখিত জাতকের গল্পগুলি হইতে কেহ কেহ প্রাচীন ভারত সমাজের বিবরণ সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দৈবজ্ঞবেশী শক্তিকুমারকে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ স্থির করিয়া লোকে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিত এবং আপন আপন কন্যাদির লক্ষণ বিচারের জন্ম তাঁহাকে অনুরোধ করিত। ইহাদের মধ্যে যদি সুলক্ষণা সবর্ণকন্যা দৃষ্ট হইত, অমনিই শ্রেষ্টিপুত্র বলিতেন, "ভদ্রে, বল দেখি, কেবলমাত্র আমার এই একপ্রস্থ শালি ধান্য দ্বারা তুমি আমাকে উপযুক্ত ভাবে ভোজন করাইতে পার কিনা।" দুঃখের বিষয়, সকলেই উহা অসম্ভব মনে করিত; কেহই অসম্ভবকে সম্ভব করাইবার জন্ম আগ্রহ দেখাইত না। ফলে, শক্তিকুমার সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে অবজ্ঞা এবং উপহাসের পাত্র হইয়া ফিরিতেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন শক্তিকুমার কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী শিবিদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক দরিদ্র-কুমারীকে লক্ষণাদি বিচারের জন্ম তাঁহার নিকট আনা হইল। কন্যাটির নাম গোমিনী। মাতাপিতৃহীনা অনাথা কন্যাকে উহার ধাত্রী দৈবজ্ঞসমীপে উপস্থিত করিয়াছিল। গোমিনীর গাত্রে অলঙ্কারাদি ছিল না। তাহার গৃহখানির অবস্থাও শোচনীয় দেখা গেল। কিন্তু কন্যাটিকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শক্তিকুমার বুঝিলেন যে, এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যা সহজে মিলিবার নহে। গোমিনীর কোন অবয়ব অতি স্থূল কিংবা অতি কৃশ ছিল না; আবার অতি হ্রস্ব কিংবা অতি দীর্ঘও ছিল না। সর্ব্বাবয়ব বেশ মসৃণ এবং পরিচ্ছন্ন। অঙ্গুলিসমূহের ভিতরের দিকটা রক্তবর্ণ; করতল যব, মৎস্য, কলশ প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গল চিহ্নে অলঙ্কৃত। গোমিনীর গুল্ফ-সন্ধিদ্বয় সমাকার; পদযুগল মাংসল এবং শিরাবিহীন; জঙ্ঘাদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগ ক্রমিক মাংসলতা-সম্পন্ন। তাহার জানু উরুযুগলের পীবরতার মধ্যে দুর্লক্ষ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। নিতম্বভাগ সুন্দররূপে দ্বিধাবিভক্ত; কিঞ্চিৎ চক্রাকারও বটে, চতুরস্রও বটে। নাভিমণ্ডল ক্ষুদ্র, ঈষৎ নিম্ন এবং সুগভীর। উদরে তিনটি সুস্পষ্ট বলিরেখা। পয়োধরযুগল সমগ্র বক্ষোদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত; উহার নিম্নাংশ বিশাল এবং চুচুক উন্নত। সুকুমার বাহুলতায় পর্ব্বসন্ধি লক্ষিত হয় না; উহা অংসদেশের উন্নতাংশে অতি সুন্দরভাবে মিশিয়াছে। করতলের চিহ্নগুলি ধন, ধান্য এবং বহুপুত্র লাভ সূচিত করিতেছে। মণির ন্যায় নখাবলী কোমল এবং চাকচিক্যশালী। অঙ্গুলিসমূহ ঋজু ও তাম্রবর্ণ; উহার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া শেষ হইয়াছে। গোমিনীর কণ্ঠদেশ শঙ্খের ন্যায় বর্ত্তুলাকার এবং উন্নতাবনত। মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় মনোহর। ওষ্ঠাধরের মধ্যভাগ বৃত্তাকার; দন্তের শুভ্র রেখা উহার রক্তিমাকে বিভক্ত করিয়াছে। চিবুক অসংক্ষিপ্ত এবং সুদৃশ্য। গণ্ডদেশ পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় গঠিত। ভ্রূলতাদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত, ধনুর ন্যায় বক্র, গাঢ় নীলবর্ণ এবং চাকচিক্যময়। নাসিকা অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত তিলকুসুমের ন্যায়। চক্ষুর্দ্বয় গাঢ় নীল, শ্বেত এবং রক্ত এই ত্রিভাগ দ্বারা শোভমান; উহা আয়ত, মনোহর, অতি চঞ্চল কিন্তু মন্থর দৃষ্টি সম্পন্ন। ললাট অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য। চূর্ণকুন্তলরাজি নীলকান্তমণির মত সুরম্য। কর্ণযুগল দীর্ঘ ও সুন্দর; উহা দ্বিরাবৃত্ত কুণ্ডলীকৃত পদ্মমৃণালের অলঙ্কারে শোভিত। গোমিনীর কেশকলাপ অজস্র, অনতি-কুঞ্চিত, সুদীর্ঘ, সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, চকচকে গাঢ় নীলবর্ণ এবং সুগন্ধ; উহার প্রান্তভাগও কপিলবর্ণ নহে।

গোমিনীর রূপ দেখিয়া এবং লক্ষণাদি বিচার করিয়া শক্তিকুমার ভাবিলেন, "ইহার আকৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে, এই কন্যা নিঃসন্দেহ গুণবতী। আমার হৃদয়ও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পরীক্ষা করিয়া ইহাকেই বিবাহ করিব। ভ্রমবশতঃ একবার সুযোগ অবহেলিত হইলে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হয়।" অতঃপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গোমিনীর দিকে চাহিয়া শক্তিকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, এই একপ্রস্থ শালি ধান্য দ্বারা আমাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবার মত কোন কৌশল কি তোমার জানা আছে?" প্রশ্ন শুনিয়া গোমিনী তাহার ধাত্রী বৃদ্ধা দাসীটিকে চক্ষুর ইঙ্গিতে ধান্য গ্রহণ করিতে বলিল। দাসী শ্রেষ্টিপুত্রের হস্ত হইতে ধান্য লইয়া তাঁহাকে পাদপ্রক্ষালনের জল দিল এবং গৃহদ্বারসমীপে একটি ধোয়ামোছা স্থানে তাঁহাকে বসাইল।

এদিকে গোমিনী প্রথমে ধান্যগুলিকে কিছুক্ষণ পা দিয়া মাড়াইল। তারপর রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া ধানগুলি বারবার নাড়িয়া দিতে লাগিল। শেষে একটি দৃঢ় এবং সমতল স্থানে ধান্য রাখিয়া নালীপৃষ্ঠ (নালীভিতর-ফাঁপা মুষল বিশেষ) দ্বারা আস্তে আস্তে আঘাত করিতে লাগিল। শীঘ্রই তণ্ডুলের গাত্র হইতে তুষ পৃথক হইয়া আসিল। তুষগুলি ধাত্রীর হস্তে দিয়া গোমিনী বলিল, "মা, অলঙ্কার পরিষ্কার করিবার জন্য স্বর্ণকারদিগের তুষের প্রয়োজন হয়। এই তুষগুলি স্বর্ণকারের কাছে বেচিয়া যে কয় কাকিনী (কোন হিসাবে ১ কড়ি, কোন হিসাবে ২০ কড়ি) পাইবে, তাহা দ্বারা কিছু কাঠ, একটা ছোটমত রন্ধনস্থালী (মাটির হাঁড়ি) এবং দুখানি শরা আন। কাঠগুলি যেন শক্ত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত ভিজা বা বেশী শুষ্ক না হয়।"

অতঃপর গোমিনী তণ্ডুলগুলিকে উলূখলে ফেলিয়া মুষল দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। উলূখলটি অর্জ্জুন কাষ্ঠ নির্ম্মিত; উহা অনতিনিম্ন, মুখ-খোলা এবং বিস্তীর্ণ গহ্বরবিশিষ্ট ছিল। মুষলটি ছিল খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত; উহা দীর্ঘ, গুরুভার এবং অগ্রভাগে লৌহপত্র বেষ্টিত। উহার সর্ব্বাঙ্গ সমান; তবে ঠিক মধ্যস্থলটা কিছু সরু ছিল। উলূখলে বারবার মুষল নিক্ষেপ ও উত্তোলন করিবার সময় গোমিনীর হস্তের কর্ম্মপটুতা এবং সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইতেছিল। সে বারবার অঙ্গুলি দ্বারা তণ্ডুল তুলিয়া ছাড়িয়া দিতেছিল এবং মুষল পাতিত করিতেছিল। তারপর সূর্প দ্বারা তণ্ডুল হইতে কিংশারুক (কুঁড়া) ঝাড়িয়া ফেলা হইল। তখন সেই তণ্ডুল বার বার জলে প্রক্ষালিত করিয়া গোমিনী চুল্লিপূজা সমাপন করিল এবং তণ্ডুলের পাঁচ গুণ পরিমাণ উষ্ণ জলে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিল। উত্তাপে তণ্ডুল নরম হইল; শেষে প্রস্ফুটিত হইতে হইতে ভাত ক্রমে সুসিদ্ধ হইয়া আসিল। তখন গোমিনী অগ্নি সংবরণ করিল এবং স্থালীর মুখে ঢাক্‌না দিয়া মণ্ড (মাড়) গালিয়া ফেলিল। তারপর স্থালীর মধ্যে দর্ব্বী (হাতা) প্রবেশ করাইয়া ভাতগুলি দুই একবার নাড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিল। শেষে সমস্ত অন্ন সুসিদ্ধ হইলে সে স্থালীটিকে উপুড় করিয়া রাখিল। যে কাষ্ঠখণ্ডগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় নাই, এইবার জল ছিটাইয়া উহার অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইল। অতঃপর গোমিনী সেই অঙ্গারগুলিকেও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিল। সে বৃদ্ধা দাসীকে বলিল, "অঙ্গার বেচিয়া যে কতিপয় কাকিনী

পাইবে, তদ্দ্বারা শাক, ঘৃত, দধি, তৈল, আমলকী এবং চিঞ্চাফল (তেঁতুল) যে পরিমাণ পাওয়া যায়, লইয়া এস।"

ঐ দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইলে, গোমিনী দুই তিনটি উপদংশ (ব্যঞ্জন বা তরকারী) রন্ধন করিল। তারপর ভাতের মাড়টুকু নূতন শরাতে করিয়া আর্দ্র বালুকার উপর রাখিল এবং তালবৃন্ত-দ্বারা ব্যজন করিয়া উহা শীতল করিল। এই মাড়ে লবণ (কাহারও মতে, হরিদ্রামরিচাদি চূর্ণ সহ) সম্ভার দিয়া উহা অঙ্গারধূম দ্বারা সুবাসিত করা হইল। অতঃপর গোমিনী সেই আমলকী উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পদ্মগন্ধি করিল। অবশেষে ধাত্রী দ্বারা শক্তিকুমারকে স্নান করিতে অনুরোধ করা হইল। গোমিনী নিজে স্নানশুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রকে স্নানার্থ তৈল এবং পিষ্ট আমলকী প্রদান করিল। শক্তিকুমার স্নান সারিয়া আসিলেন।

স্নানের পর শক্তিকুমার মেজেতে একটি ধোয়ামোছা স্থানে ফলকের উপর বসিলেন। আঙ্গিনার কলা গাছ হইতে একখানি পাণ্ডু হরিতবর্ণ (অর্থাৎ ঈষৎ পক্ব) পাতার একচতুর্থাংশ কাটিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে দেওয়া হইল। গোমিনী শরা দুইটি ধুইয়া পাতার উপর রাখিল; শক্তিকুমার অঙ্গুলিতে উহা স্পর্শ করিয়া রহিলেন। প্রথমে গোমিনী অন্নমণ্ড পরিবেশন করিল। উহা পান করিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার পথশ্রম বিদূরিত হইল; সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। তারপর গোমিনী দুই হাতা ভাত আনিয়া দিল এবং একটু ঘৃতের সহিত সূপ (ব্যঞ্জনবিশেষ) ও উপদংশ পরিবেশন করিল। এই উপকরণ-গুলি দিয়া খাওয়া শেষ হইলে, শক্তিকুমার ত্রিজাতকমিশ্রিত (অর্থাৎ দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র চূর্ণ সংযুক্ত) দধি এবং কালশেয় (ঘোল) ও কাঞ্জিকা (কাঁজী) সহযোগে অবশিষ্ট অন্ন নিঃশেষ করিলেন। সমস্ত ভাত শেষ করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পানীয় প্রার্থনা করিলেন। গোমিনী একটি নূতন ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিল। অগুরুধূম, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পাটলাপুষ্প এবং প্রস্ফুটিত পদ্মের সাহায্যে সুগন্ধীকৃত জল ভৃঙ্গারের নাল দিয়া শরার উপর পড়িতে লাগিল। শক্তিকুমার শরাতে ঠোঁট লাগাইয়া আকণ্ঠ নির্মল জল পান করিলেন। ভৃঙ্গারের নাল হইতে শরাবে জলের পতনশব্দ তাঁহার কর্ণকে তৃপ্ত করিতেছিল; সূক্ষ্ম জলকণা তাঁহার চক্ষুর পক্ষে সংলগ্ন হইয়াছিল; জলের স্পর্শ-সুখে তাঁহার কপোলদেশে রোমাঞ্চ হইতেছিল; নাসাপথে সুগন্ধ প্রবেশ করিতেছিল; আর জিহ্বা জলের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতে-ছিল। পিপাসা মিটিলে শক্তিকুমার শিরঃসঞ্চালন পূর্ব্বক গোমিনীকে আর জল ঢালিতে নিষেধ করিলেন। গোমিনী তখন অপর একটি পাত্রে তাঁহাকে আচমনের জল দিল। তারপর বৃদ্ধা দাসী উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া হরিতবর্ণ (অর্থাৎ, অশুষ্ক) গোময় দ্বারা মেজে মুছিয়া লইল। শক্তিকুমার সেই স্থানে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া কিছুক্ষণ ঘুমাইলেন।

শক্তিকুমারের পরীক্ষায় গোমিনী উত্তীর্ণ হইল। শ্রেষ্ঠিপুত্র তখন যথাবিধানে তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। দুঃখের বিষয়, কিছুকাল পরে গোমিনীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এক গণিকাকে আনিয়া অবরোধ-বাসিনী করিলেন। গোমিনী নীরবে সমস্ত সহ্য করিল। শক্তি-কুমারকে সে সর্ব্বদা অনলসভাবে দেবতার ন্যায় পরিচর্য্যা করিত। পতির প্রেয়সী গণিকার সহিত সে প্রিয়সখীর অনুরূপ ব্যবহার করিত। গৃহকার্য্যে তাহার দক্ষতার তুলনা ছিল না। স্বামীর পরিজন তাহার উদার ব্যবহারে বশীভূত হইল। পরিশেষে তাহার গুণের বশবর্ত্তী হইয়া শক্তিকুমার কুটুম্বদিগকে গোমিনীর আয়ত্ত করিয়া দিলেন। তিনি নিজেও গোমিনীকে শরীর ও প্রাণের অধীশ্বরী করিলেন। এইরূপে শক্তিকুমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের ভোগাধিকারী হইলেন।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, আর্থ-নীতিক এবং গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই চিত্রসম্পর্কিত স্থান কাল পাত্রের বিষয় পরে আলোচনা করিব। প্রথমে তথ্যগুলি সম্পর্কে দুই চারিটি কথা বলা উচিত।

বিবাহ সম্বন্ধে দেখা যায়, বণিক্‌পুত্র শক্তিকুমার প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সবর্ণা পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন। অভিভাবকেরাই পাত্রী স্থির করিতেন; তবে বর নিজেও মনোমত কন্যা খুঁজিয়া লইতে পারিত। মধ্যযুগের নিবন্ধকারগণের রচনা পাঠে এদেশে বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে যে, তৎকালে সমাজে সর্ব্বদাই অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ হইত। কিন্তু গোমিনীর বক্ষস্থলের যে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাকে নিতান্ত বালিকা মনে করা একেবারেই অসম্ভব। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন যে, অনাথা কন্যা বলিয়া যথাসময়ে গোমিনীর বিবাহ হয় নাই। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। "দশকুমারচরিতে"র প্রায় সমকালে রচিত বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" দেখিতে পাই, বিবাহের পূর্ব্বে থানেশ্বর-রাজকন্যা রাজশ্রী "তরুণীভূতা" এবং "যৌবনম্ আরুরোহ"; তখন তাঁহার "পয়োধরোন্নতি" তদীয় পিতাকে কন্যার পাত্র সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেই পয়োধরোন্নতির স্বরূপ বোধহয় গোমিনীর বর্ণনা হইতে কিছু বুঝা যায়। আসল কথা এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতামত অনেক ক্ষেত্রে বাচনিক এবং আদর্শমূলক। উহা সর্ব্ব ক্ষেত্রে সমাজের প্রকৃত অবস্থার দ্যোতক নহে।

নারীর সুগঠিত দেহ এবং শুভলক্ষণাদি সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ভারতীয় ধারণা গোমিনীর রূপবর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়। দুঃখের বিষয়, তাহার গাত্রবর্ণ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নাই। কাহিনীটি হইতে মধ্যবৃত্ত নরনারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও কিছু ধারণা হয়। সম্ভবতঃ, পুরুষেরা দেশপর্য্যটনে বাহির হইলে উত্তরীয় ব্যবহার করিত এবং অবিবাহিতা নারীগণ গৃহমধ্যে কেবল অধোবাস পরিধান করিতেন। ভারতের অনেকস্থলে প্রাচীন যুগের যে সমুদয় রঙীণ এবং শিলাঙ্কিত চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে সাধারণতঃ নারীগণের পরিধানে অধোবাস এবং মস্তকোপরি অবগুণ্ঠন দেখা যায়। অবিবাহিতা কন্যারা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন না। যাহা হউক, অঙ্কিত নারীগণের বক্ষস্থলে কুচপট্ট বা অনুরূপ কোন আবরণ সাধারণতঃ দেখা যায় না। নারী ও পুরুষ উভয়েই নাভির কিঞ্চিৎ নিম্নভাবে নীবী বন্ধন করিতেন এবং সম্পন্না মহিলারা নীবীবন্ধের উপরে মেখলা ধারণ করিতেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীগণ কঞ্চুক, চোল বা কূর্পাস সংজ্ঞক বক্ষআবরণ পরিধান করিতেন বলিয়া মনে হয়। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ উরুদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত আবরণকারী চণ্ডাতকও ব্যবহার

করিতেন। যাহা হউক, গোমিনীর উখিত চুচুকের উল্লেখ হইতে মনে হয়, সে কোনরূপ বক্ষ-আবরণ পরিধান করিয়া অপরিচিত শক্তিকুমারের সম্মুখীন হয় নাই।

মেয়েরা সাধারণতঃ পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতেন না। বিবাহ-ব্যাপারে রন্ধন-কৌশল পাত্রীর সর্ব্বপ্রধান গুণ বিবেচিত হইত। ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করা এবং ভাত ও অন্নমণ্ড প্রস্তুত করার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ গোমিনীর কাহিনীতে দেখিতে পাই। সেকালেও এখনকার মত স্থালী, শরাব, দর্ব্বী প্রভৃতির সাহায্যে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হইত। স্নানের জন্য তৈল ও পিষ্ট আমলকীর প্রয়োজন হইত। আমলকী সে যুগের সাবান। কামসূত্রের (৪:১৭) ফেনকবস্তুটি সাবান জাতীয় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আহার্য্য বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাই ভাত, অন্নমণ্ড, ঘৃত, ত্রিজাতক-চূর্ণ মিশ্রিত দধি, শাকচিঞ্চাদিসংযোগে প্রস্তুত উপদংশ, সূপ, ঘোল এবং কাঁজী। মৎস্য, দুগ্ধ এবং মিষ্ট দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই। এই উপলক্ষে লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি কতিপয় আবশ্যক বস্তু গোমিনীকে সম্ভবতঃ কিনিতে হয় নাই। ভোজন এবং উচ্ছিষ্ট-পরিষ্করণ অনেকটা আধুনিক কালেরই মত। সেকালের সুপ্রচলিত ক্ষুদ্র মুদ্রা ছিল কাকিনী। স্বর্ণকারেরা তুষ ক্রয় করিতেন। অঙ্গারের ক্রেতা ছিলেন সম্ভবতঃ স্বর্ণকার এবং কর্ম্মকার। সামান্য পরিমাণ তুষ এবং অঙ্গারের বিনিময়ে যে সমুদয় দ্রব্য ক্রীত হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়, ঐ বিবরণ সর্ব্বথা অতিরঞ্জনহীন কিনা, বলা কঠিন। তবে খাদ্যদ্রব্যাদি যে অত্যন্ত সুলভ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপরে যাহা লিখিত হইল, গোমিনী কথার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ আরও দুই চারিটি তথ্য অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ; ইহার ইতিহাসও বহু শতাব্দী ব্যাপী। সুতরাং কোন্ যুগ এবং ভারতের অন্তর্গত কোন্ জনপদ সম্পর্কে বর্ণনাটি সর্ব্বাংশে প্রয়োজ্য, তাহাই নির্ণীত হওয়া অধিক প্রয়োজনীয়। স্থানকাল প্রসঙ্গে প্রথমে স্থানের কথা ধরা যাউক।

আহার্য্য মধ্যে আটার অভাব এবং ভাতের প্রাধান্য দেখিয়া বুঝিতে পারি, ঘটনাটি ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তের কিংবা দক্ষিণভাগের হইতে পারে। কিন্তু তণ্ডুল প্রস্তুত করার ব্যাপারে আমাদের সুপরিচিত ঢেঁকির অভাব, খাদ্যবস্তু মধ্যে দুগ্ধ-মৎস্যাদির অভাব অথচ তেঁতুলের প্রাধান্য, ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, ঘটনা বাংলা অঞ্চলের নহে। এই সম্পর্কে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে (বিশ্ববিদ্যালয় সং, পৃঃ ৩৭৯-৮০, ৫১৭.১৯) বাঙালী শ্রেষ্ঠী ধনপতির ভোজনের বিবরণ লক্ষণীয়। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে উল্লিখিত প্রকারের অন্নমণ্ড, ত্রিজাতকসংযুক্ত দধি এবং কাঞ্জিকা সাদরে গৃহীত হইত বলিয়া মনে করার কারণ নাই। কিন্তু আধুনিক মাদ্রাজী আহারের সহিত শক্তিকুমারের ভোজ্যবস্তুর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই জানেন যে, ঘোল এবং "সংভার" সংজ্ঞক টক্ ডাল মাদ্রাজীখানার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সুতরাং গ্রন্থকার সার্থক ভাবেই দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিল দেশের অন্তর্গত কাঞ্চীপুর (বর্ত্তমান কোঞ্জীবেরম্) এবং কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী অঞ্চলকে কাহিনীটির পটভূমিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। দশকুমারচরিত রচয়িতা আচার্য্য দণ্ডী দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে। গ্রন্থখানিতে প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত মাদ্রাজীর দৈনন্দিন জীবনের এই অপূর্ব্ব বিবরণ হইতে বুঝা যায়, ঐ কিংবদন্তী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গোমিনীর বিবরণটি কোন্ যুগ সম্পর্কে আলোকপাত করে, এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে দণ্ড্যাচার্য্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বাণভট্টকৃত হর্ষচরিতের প্রস্তাবনায় মহাকবিগণের তালিকা মধ্যে আচার্য্য দণ্ডীর নাম দেখা যায় না। বাণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে হর্ষচরিত রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং "দশকুমারচরিত" সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। গ্রন্থখানিতে জয়সিংহ নামক অন্ধ্ দেশের জনৈক নরপতির উল্লেখ আছে। অবশ্য নামটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক হওয়া অসম্ভব নহে। তবে যদি অনুমান করা যায় যে, স্বদেশীয় রাজা বলিয়া এস্থলে কবি একজন সত্যকার অন্ধ্ রাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, সত্যই জয়সিংহ নামক প্রাচ্যচালুক্যবংশীয় একজন নরপতি আনুমানিক ৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্ধ্ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

অশ্রুবাষ্প ভারাক্রান্ত শরতের সোণালী আকাশ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

অশ্রুবাষ্প ভারাক্রান্ত শরতের সোণালী আকাশ,
দুর্গতের হাহাকারে অবরুদ্ধ কলহংস-ভাষ।
দুগ্ধ-শুভ্র নীহারিকা—অশরীরী প্রেত আত্মাগুলি
অব্যক্ত গুঞ্জন সুরে নভঃস্থল তুলিছে আকুলি'।

ক্ষুধার্ত্তের পাণ্ডুমুখে "মাগো দুটি অন্ন দাও" ধ্বনি
শতাব্দীর অর্দ্ধপথে জৈত্ররথে একি আগমনী!

যে জাতি ডুবিয়া আছে পঙ্কলিপ্ত বন্যাত-সলিলে,
দুঃখের কলঙ্ক-চিহ্ন তার রুক্ষ ললাটে লিখিলে
ক্ষয়ক্ষতি নাহি কিছু জয় পরাজয় সমজ্ঞান;
জীবধাত্রী বসুন্ধরা যাত্রাপথে চির বহমান।

ধরাপৃষ্ঠ হ'তে কারা লুপ্ত হ'ল কোন্ অভিশাপে,
সুজলা সুফলা বঙ্গ অন্নহীন কোন্ মহাপাপে?

দীর্ণ বক্ষ ভেদি' ওঠে মুমূর্ষুর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
অশ্রুবাষ্প রুদ্ধ ম্লান শরতের মলিন আকাশ।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[তৃতীয় পর্ব]

সূর্য স্বপ্ন

১

চর ইসমাইল।

চারশো মাইল দূরে বসিয়া আজ স্বপ্ন দেখিতেছি। ছবির মতো মনের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে একটা অপরিণত তটরেখা—নারিকেল আর সুপারীবনের ঠিক নীচেই যেখানে তেঁতুলিয়ার জল মাথা কুটিয়া মরিতেছে। যেখানে বোম্বেটে পর্তুগীজদের শেষ চিহ্নও দিনের পর দিন অবলুপ্ত হইয়া আসিতেছে—জলের তলায় ছয় ফুট উঁচু মানুষগুলির সাদা কঙ্কালে পঞ্জরে জমিতেছে জলজ শৈবাল, মোটা মোটা হাতের রন্ধ্রগুলির মধ্যে কুচো চিংড়িরা নিরাপদ বাসা বাঁধিয়াছে। আর করোটির মাঝখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার আস্তানা—নীল রঙের দাঁড়াগুলি দিয়া তাহারা সন্ধানী বৈজ্ঞানিকের মতো দিগ্বিজয়ী জলদস্যুদের মস্তিষ্কে ছিদ্র করিতেছে। চর ইসমাইলের বর্বর জীবনের উপর দিয়া যেমন করিয়া নামিয়াছে স্তিমিত আর নিরুত্তেজ সভ্যতা—আর যেমন করিয়া চারশো মাইল দূরের নাগরিক শান্তির নিরাপদ পরিবেষ্টনীতে বসিয়া আমি চর ইসমাইলের গল্প লিখিতেছি। আমারই সিগারেটের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে চক্রাকারে, নানা সম্ভব অসম্ভব মুখ সেই ধোঁয়ায় রেখায়িত হইয়া উঠিতেছে—ডি-সুজা, ডি-সিল্‌ভা, পোষ্ট-মাষ্টার—আরো কত কে?

একটা উপমা মনে পড়িতেছে। ছায়াছবির পর্দায় মৃত্যু-তরঙ্গিত রণক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া যেন নিশ্চিন্তে রোমাঞ্চিত হইতেছি। কিন্তু ছায়াছবির আলোকে ছাড়া যাহারা বৃহত্তর জীবনের রূপ দেখিতে পায়না, স্বপ্ন ছাড়া তাহাদের আর সান্ত্বনা কোথায়!

* * *

চর ইসমাইলের উপর দিয়া দশটা বৎসর কাটিয়া গেল।

আদিম সমাজের গলিত লাকাস্তূপের উপরে আরো ঘন হইয়া নামিতেছে সর্বগ্রাসী মৃত্তিকার আবরণ। জল আর মাটি—জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি যাহারা মূলহীন স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের শিকড় আরো নিবিড় হইয়া মাটির মধ্যে থিতাইয়া বসিয়াছে। পলি মাটি, মাখনের মতো কোমল আর স্নিগ্ধ মাটি—নদী মাতৃক বাংলাদেশের সকরুণ ভালোবাসার মধু নির্য্যাস দিনের পর দিন বিদ্রোহীদের জীর্ণ করিয়া লইতেছে। রক্তের ফসল নয়—শস্যক্ষেত্রের সোনার ফসল। বোম্বেটে জাহাজের অভিযান স্বপ্ন নয়—আউ, আমন আর বোরোধানের কামনা। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মধ্যে অস্পষ্ট রূপ লইয়া যে মানুষগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, বাংলাদেশের একটা পরিপূর্ণ রূপ আজ তাহাদের গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

দশ বৎসর।

পৃথিবী জুড়িয়া জলিয়াছে যুদ্ধের আগুন। আর তাহারি ছোঁয়া লাগিয়া ক্ষুধার আগুন লেলিহ হইয়া শিখা মেলিয়াছে বাংলা দেশে।

দশবৎসর বয়স বাড়িয়াছে বলরাম ভিষকরত্নের। টাকের আশেপাশে স্বল্পাবশিষ্ট চুলগুলিতে সাদার রং ধরিয়াছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়িয়াছে—চোখের দৃষ্টি আসিয়াছে কিছুটা ক্ষীণ হইয়া। গত বছর সহরে গিয়া বলরাম বাঁ চোখের ছানী কাটাইয়া আসিয়াছেন, চশমাও লইয়াছেন। তবু চোখ দিয়া মাঝে মাঝে জল পড়ে, আশংকা হয় দৃষ্টি হয়তো একদিন নিবিয়া যাইবে চিরকালের মতো। ভাবিয়া বলরামের কান্না পায়। সংসারে আপন বলিতে কেউ নাই, সুদূর ফরিদপুরে আত্মীয়-বান্ধব যাহারা আছে, তাহারা যে দুঃসময়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইবে, আশ্রয় দিবে, এমন ভরসাও বড় নাই। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলরামের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি—কিছু সুযোগ পাইলেই দু হাতে লুটিয়া পুটিয়া লইবার সাধু-চেষ্টাতে ত্রুটি করিবে না এতটুকুও। তাহাদের প্রতি বলরামের কোনো আশা বা বিশ্বাস নাই। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় বেশি একা, বড় বেশি অসহায় বলিয়া মনে হয়। কেমন করিয়া যে এই দূর বিদেশে এতগুলা বৎসর তাঁহার কাটিয়া গেল, ভারী বিস্ময় লাগে সে সব কথা ভাবিতে। আত্মীয়হীন-বান্ধবহীন। নিজের কবিরাজী, ধান চাল সুপারীর ব্যবসা—মহিষের বাথান, নোনা জলের পুকুর। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব দু চার-জন কি একেবারেই মেলে নাই? মিলিয়াছিল বৈ কি। খাসমহলের যোগেশবাবু, সেই সরকারীবাবু মণিমোহন, আর সেই খেয়াল-ক্ষ্যাপা পোষ্ট্‌মাষ্টারটা—

পোষ্ট্‌মাষ্টার। মনের মধ্যে চমক লাগিল বলরামের। কী অদ্ভুত লোক—কী আশ্চর্যভাবেই বলরাম তাহাকে ভালোবাসিয়া-ছিলেন। কালো সুশ্রী চেহারার মানুষটা, জিলজিলে বুকের চামড়ার নীচে হাড়গুলি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঁকি মারে, হাতে গলায় একরাশি তাবিজ। হাঁপানির টান উঠিলে মুমূর্ষু কাত্‌লা মাছের মতো হাঁ করিয়া হাঁপাইত লোকটা। আজ কত দেশ বিদেশই না ঘুরিয়াছে। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিত—শুনিয়া কখনো কখনো ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিত বুকের ভিতরটা। কত ঠাট্টাই যে করিত মুক্তোকে লইয়া!

সেই মুক্তো! আবার একটা চমক খাইলেন বলরাম। সমস্ত চেতনার অন্তরাল হইতে উদ্গত হইয়া যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল একটা তীব্র গ্লানি আর বেদনার তরঙ্গ। হাঁ একদিন বলরাম ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন—নিজের এলো-মেলো, ছত্রিশ ভাবে ছড়াইয়া পড়া জীবনটাকে স্থির ও নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এই মুক্তোকে কেন্দ্র করিয়াই। কিন্তু কী ফল হইয়াছিল তার? সেই ঝড়ের রাত্রি—সেই অবাঞ্ছিত সন্তান—দু জনের মাঝখানে ভাঙন ধরিল সেই প্রথম। তারপরের দিন-

গুলি ভালো করিয়া মনে পড়েনা, দুঃস্বপ্ন এবং অপমানের রাশি রাশি বিষাক্ত অন্ধকারে সেই সব দিনগুলি যেন ঘনীভূত আর ভারমন্থর হইয়া স্মৃতির উপরে চাপিয়া বসিয়া আছে।

বাঁধিবার আগেই ঘর ভাঙিল। কোথায় গিয়াছে মুক্তো? বলরাম জানেন না। নোনা জল আর নোনা মাটির দেশ, নদী প্রত্যেকদিন নতুন করিয়া পাড় ভাঙিতেছে, নতুন চড়া জাগাইয়া তুলিতেছে দূর দিগন্তে। সেই নদীর ভাঙন একদিন মুক্তোকেও ছিনাইয়া লইয়া গেছে, বলরামের বুকে ভাঙা-পাড়ির মতোই রাখিয়া গেছে খাঁ-খাঁ করা একটা শূন্যতা। নতুন চড়ার মতো কোথায় গিয়া যে নতুন ঘর বাঁধিয়াছে মুক্তো বলরাম তাহা জানেন না। জাগিবার কৌতূহলও তাঁহার নাই, কেবল—

বলরাম জোর করিয়া ভুলিবার চেষ্টা করিলেন প্রসঙ্গটা। বুকের মধ্যে যে ক্ষত-চিহ্নটা জাগিয়া আছে, কী লাভ, সেটাকে আঘাত করিয়া, নিষ্ঠুরভাবে রক্তাক্ত করিয়া। অন্যমনস্ক হইবার আপ্রাণ প্রয়াসে দেওয়ালের দিকে তাকাইলেন বলরাম। সমস্ত ঘরটার চেহারাই বদলাইয়া গেছে বিস্ময়করভাবে। দেওয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা প্রায় দুবৎসর যাবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে—চলেনা। কাচের উপর ধুলা জমিয়াছে, মাকড়সারা জাল বাঁধিয়াছে কায়েমী-স্বত্বের মতো। দেওয়ালের গায়ে গ্রুপ ফোটোগ্রাফখানির একটি মানুষকেও আর চিনিতে পারা যায় না। সেই রঙীন চীনা ছবি-গুলি কবে ধূলার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেছে—শুধু গুপ্তপ্রেস কোম্পানীর একখানি দেওয়াল-পঞ্জী দুলিয়া দুলিয়া চর ইসমাইলের দিনগুলিকে গণিয়া চলিয়াছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলরাম গড়গড়ার নলটা টানিয়া লইলেন। রাধানাথ ধরাইয়া দিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ আগেই, বলরামের খেয়াল ছিল না। বহুক্ষণ ধরিয়া আপনা আপনি পুড়িয়া পুড়িয়া তামাকটা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। জোরে জোরে গোটা কয়েক ব্যর্থ টান দিয়া বলরাম নলটাকে বিরক্তভাবে দূরে সরাইয়া দিলেন। সময় পাইলে পৃথিবীর যা কিছু এক সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া শত্রুতা সাধে নাকি!

আবার রাধানাথ ঘরে ঢুকিল। দশ বছরেও তেমনিই আছে লোকটা, উল্লেখযোগ্যভাবে এমন কিছুই বদলায় নাই; শুধু মাথার চুলগুলি এখানে ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে এক একটি শাদা গুচ্ছে পাকিয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ এক রাশ খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াছে। চোখের দৃষ্টি তেমনি কৌতুক আর ধূর্ততায় উজ্জ্বল, শুধু চোখ দুইটার নীচে চামড়ায় দুই তিনটা করিয়া ভাঁজ পড়িয়াছে মাত্র।

রাধানাথ আসিয়া কহিল, বাবু?

—কী খবর?

—কালুপাড়ার মজাঃফর মিঞা দেখা করতে এসেছে।

বলরাম নিজের মধ্যে, বর্তমানের মধ্যে যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিলেন। মনের সামনে হইতে যেন খানিকটা দুঃস্বপ্নের কুয়াশা আকস্মিক ভাবে মিলাইয়া গেল। বলরাম বলিলেন, ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

মজাঃফর মিঞা একটা লাঠি ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মণিমোহনের সেই মজাঃফর, বেহেস্তনিবাসী আস্রাফ মিঞার পুত্র। বয়স এখন সত্তরের সীমা ডিঙাইয়াছে। মেহেদী রাঙানো দাড়ির বাহার আর নাই, অবিমিশ্র শুভ্রতা বুক পর্যন্ত নামিয়াছে। আর সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে না সে; চলিতে চলিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করে, হাত পাগুলি কাঁপিতে থাকে শিশুর মতো অক্ষম অসহায়তায়। হাতের মধ্যে কম্পিত লাঠিটা মেজেতে বাধিয়া খট্ খট্ শব্দ হইতেছে, মুখটা নড়িতেছে অনবরত, মনে হয় গালের মধ্যে কী একটা পুরিয়া দিয়া সে আপ্রাণ চেষ্টায় সেটাকে চুষিয়া চলিয়াছে।

বলরাম বলিলেন, বোসো মিঞা শায়েব, বোসো।

লাঠির উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া, বাঁকা পিঠটাকে অতি কষ্টে সোজা করিয়া অষ্টাবক্র ভঙ্গিতে মজাঃফর মিঞা আসন গ্রহণ করিল। বলিল, আদাব। কিন্তু দন্তহীন মুখের ভিতর হইতে শব্দটা স্পষ্ট ফুটিয়া বাহির হইল না—খানিকটা অর্থহীন ধ্বনির রূপ লইল শুধু। অভ্যস্ত কান বলিয়াই বলরাম মজাঃফর মিঞার কথাগুলি বুঝিতে পারেন; সাধারণ লোকের কাছে সেগুলি আত্মপ্রকাশের খানিকটা জৈবিক কাকুতি ছাড়া আর কিছুই নয়—অনেকটা বোবার মর্মান্তিক বো-বো করার মতো।

বলরাম ভালো করিয়া একবার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন মজাঃফর মিঞার। প্রথমেই চোখে পড়িল অশোভন আকারের সুদীর্ঘ পায়ের পাতা দুইটার দিকে। বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো কুঞ্চিত চামড়া—ক্ষয় হইয়া আসা নখগুলির আগায় আগায় লাল মাটি শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। গায়ের ময়লা জামাটা হইতে রসুন আর ঘামের একটা মিশ্রিত দুর্গন্ধ উঠিয়া আসিয়া ঘরটাকে ভরিয়া দিল।

বলরাম বলিলেন, ব্যাপার কী মিঞাসাহেব?

—ধানের দর তো খুব চড়েছে। এই বেলা সব বিক্রী করে দেব নাকি?

—কত চড়েছে?

—পনেরো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলরাম চিন্তা করিলেন খানিকক্ষণ। এবারের ধানগুলি যেন লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া বহিয়া আসিয়াছে। দর পড়িতেছে—অবিশ্রান্ত আর অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়া চলিতেছে। গোলার মহাজনেরা প্রত্যেকদিন নতুন দর দিতেছে, চাহিদার আর বিরাম নাই। বাহিরের পৃথিবীতে কী যে ঘটিতেছে বলরাম তাহা ভালো করিয়া জানেন না, খবরের কাগজ মাঝে মাঝে কিসের যে বার্তা লইয়া আসে, তাহাও খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে না তাঁহার কাছে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি গ্রাহক, তাহাতে আরও দশটা খবরের সঙ্গে বলরাম জানিতে পারিয়াছেন—পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে। আর এবারের যুদ্ধটা কেবল সুদূর ইংলণ্ড আর জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই, তাহার তরঙ্গটা ভারতবর্ষের কূল-উপকূলেও আসিয়া ঘা মারিয়াছে। বর্মা নাকি বেদখল হইয়া গিয়াছে—কলিকাতায় বোমা পড়িতেছে। চর ইসমাইলের উপর দিয়াই আজকাল পাখীর মতো ডানা মেলিয়া দিয়া সারে সারে বিমান উড়িয়া যায়—গুরু-গর্জনে চর ইসমাইলের নারিকেল আর সুপারীর বন চমকিয়া মর্মরিত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ বাধিয়াছে বই কি। তেল পাওয়া যায় না, লবণ পাওয়া যায় না, কাপড়ের জোড়া ২৲ টাকা হইতে ছয় টাকায় উঠিয়াছে। চারিদিকে কিসের একটা অনিশ্চিত সংকেত। দূরের

নদী দিয়া সৈন্যবাহী ষ্টিমার চলিয়া যায়—ইহাও বলরামের চোখে পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ভয় করে, যেন অনাগত বিপদের একটা মহাকায় কৃষ্ণচ্ছায়া সমস্ত চর ইসমাইলের উপর দিয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে ধানের দর। অসম্ভব-ভাবে বাড়িতেছে—অশুভভাবে পড়িতেছে। বলরামের অবচেতন মন হইতে কী একটা যেন সাড়া দিয়া বলে এ লক্ষণ ভালো নয়; এ যেন মরিবার আগে সান্নিপাতিক জ্বরের রোগীর হঠাৎ ভালো হইয়া ওঠা—নিভিবার পূর্বে প্রদীপের একটা আকস্মিক অগ্নিময় অন্তিম উচ্ছ্বাস।

বলরামের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া মজাঃফর মিঞা প্রশ্ন করিল, কী করা যাবে বাবু?

অভিনিবেশ সহকারে আবার খানিকটা ধূমপান করিয়া লইলেন বলরাম। ভয়টাকে অতিক্রম করিয়া ঘরের মধ্যে লোভ আসিয়া উঁকি মারিতেছে। যা হইবার তাহা পরে হইবে, আপাততঃ সেজন্য আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছু লাভ নাই। আরো কিছুদিন দেখাই যাক না। ধান উঠিতে না উঠিতেই এই—গোটা বর্ষাকাল তো এখনো সম্মুখেই পড়িয়া আছে। ধৈর্য্য কিছুটা ধারণ করাই ভালো, ভবিষ্যতে অন্তত ঠকিতে হইবে না।

বলরাম বলিলেন, যাক না আর কদিন।

মজাঃফর মিঞা যেন কিছুটা ক্ষুন্ন হইল—বলরামের কথাটা যেন তার ভালো লাগিল না। কম্পিত আঙুলগুলিতে দাড়িটা আঁচড়াইয়া লইল একবার—নখের খড়ি-ওড়া দাগ টানিয়া টানিয়া চুলকাইয়া লইল বাদুড়ের ডানার মতো কালো কালো পা দুখানা। তারপর বলিল, কিন্তু কাজটা বোধ হয় ভালো হচ্ছে না বাবু। যাদের ক্ষেত-খামার আছে তাদের ভাবনা নেই, কিন্তু মুস্কিলে পড়েছে জন-মজুর আর ছোট ছোট আধিয়ারেরা। চালের দর এত বাড়লে ওরা খায় কী। তা ছাড়া শুনলাম জেলেরা নাকি এর মধ্যেই উপোস করতে সুরু করেছে। এমন চললে দেশে যে আকাল দেখা দেবে।

বলরাম উষ্ণ হইয়া কহিলেন, তার আমরা কী করব? আমরা তো দর বাড়াইনি। এখন অল্প দামে যদি গোলা খুলে সব ছেড়ে দিই, তা হলে শেষ নাগাদ নির্ঘাৎ পস্তাতে হবে এ তোমাকে বলে রাখলাম বড় মিঞা। তা ছাড়া অসুবিধে কি আমাদের নেই? তেল, নুন, চিনি কিছু পাওয়া যায় না—যা মেলে তার দাম পাঁচ-গুণ। কিছু বেশি পয়সা যদি না পাই, তাহলে কী খেয়ে বাঁচব বলতে পারো?

—তা ঠিক। কিছুক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল মজাঃফর মিঞা। বলরামের প্রজা সে, তাঁহারই জোত-জমার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং কর্তার ইচ্ছার উপরে কথা কহিয়া লাভ নাই, সে ক্ষেত্রে তাহার নিজের স্বার্থও জড়াইয়া আছে। যা দিন আসিতেছে, কিছুই তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

আর এই তো, এতখানি তো বয়স হইল মজাঃফর মিঞার। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তি সে আর কোনোদিন অনুভব করে নাই। গতবার যখন লড়াই লাগিয়া-ছিল—সেও খুব বেশিদিনের কথা নয়, তাহার বড় নাতির বয়স হইবে—তখনকার কথা তাহার ভালো করিয়াই মনে আছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াছিল, ধান-চালের দর চড়িয়াছিল। কিন্তু এবারের মতো এমন একটা অশুভ সম্ভাবনা যেন আসিয়া দেখা দেয় নাই। এবারে কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, মাথার উপর দিয়া বিমান উড়িয়া যায়, ধরণ-ধারণ সব কিছুই আলাদা। কাজেই আগে হইতে হুঁশিয়ার থাকা ভালো—যা পারা যায় দুই হাতে কুড়াইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! কী হইবে জেলে আর জন-মজুরদের জন্য দুর্ভাবনা করিয়া? যাহার কপালে যাহা আছে তাই ঘটিবে—মাঝে হইতে নিজের ফাঁক পড়িলে কোনো লাভ নাই।

মজাঃফর মিঞা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে?

—তা হলে আর কী। যাক আরো কটা দিন।

তবুও মজাঃফর মিঞা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল: জমিরকে চেনেন বাবু, জমির?

—কে জমির? কাসেম খাঁর ব্যাটা?

—হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। বাঁদীর বাচ্চা বড় গোলমাল সুরু করেছে।

—গোলমাল? বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন: কিসের গোলমাল?

—ভয় দেখাচ্ছে। বলছে এখন ধান চাল সব ছেড়ে না দিলে লুট পাট হয়ে যাবে। লোকে ক্ষেপে উঠছে—খেতে না পেলে—

তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা উঠিয়া বসিলেন বলরাম: লুটপাট হয়ে যাবে! গায়ের জোরের কথা আর কি। সে সব দিনকাল ছিল দশ বছর আগে, যখন চোত্ত মাস পড়লে আর নৌকো আসত না এ তল্লাটে। এখন সহরে খবর দিলে দু ঘণ্টার মধ্যে ঠাণ্ডা মেরে যাবে সমস্ত। তুমি যাও বড় মিঞা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। শেষ পর্যন্ত আমি তো আছি।

—সেলাম।

লাঠিটায় ভর দিয়া ক্লিষ্ট ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল মজাঃফর মিঞা। তারপর খট খট শব্দ করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দূরে চাহিয়া রহিলেন বলরাম। মজাঃফর মিঞার কথা মুছিয়া গেল মন হইতে, মুছিয়া গেল চারিদিকে ঘনাইয়া আসা কী একটা অভিশাপের অনিবার্য সংকেত বাণী। নারিকেল কি দুলিতেছে বাতাসে, সুপারীর সারি চামরের মতো মাথা দুলাইতেছে, নিবিড় নীলিমার বুক জুড়িয়া অভিসার চলিয়াছে লক্ষ্যহীন মেঘের—শরতের শুভ্র হংসবলাকার মতো। নীচের নদীর ধূসর বিস্তারটা আবছায়া হইয়া চোখে পড়িতেছে। এই নদী—ঝড়ো-হাওয়ায় সিংহের মতো গর্জাইয়া ওঠা দুরন্ত নদী। শান্ত হইয়া গিয়াছে—মৃত্যুর মতো ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া নিশ্চুপ মারিয়া পড়িয়া আছে। বছর তিনেক আগে মস্ত বান ডাকিয়াছিল একবার। দৌলত খাঁর বানের পরে এমন ভয়ংকর কাণ্ড আর দেখেন নাই বলরাম। এই চর ইসমাইলেই কম্‌সে কম দুশো মানুষ বেমালুম সাবাড় হইয়া গেল, জেলে-পাড়াটাকে মাটির বুক হইতে একবারে মুছিয়া নিয়াছিল বলিলেই হয়।

সে কী দুঃস্বপ্ন!

মনে পড়িতেই বলরাম আতংকে চমকাইয়া উঠিলেন। কে চাহিয়াছিল এমন হটাৎ ওই রকম একটা মৃত্যুর তরঙ্গ আসিয়া সব কিছু ভাসাইয়া নিবে—নিশ্চিন্ত মানুষের উপরে প্রলয়ের মূর্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে। মেঘলা ভোরে মানুষগুলি টোকা মাথায় পরিয়া যখন জাল লইয়া নামিল, অথবা এক মালাই নৌকা ভাসাইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে দূরের চরে কাজ করিতে গেল, তখন কে জানিত তাহারা আর ফিরিবে না? সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাস বহিতেছে অল্প অল্প। আর মেঘের ছায়ায় নদীর জল মেঘের রঙ মাখিয়াছে। দিনটা এমনি করিয়াই কাটিল। তারপর সন্ধ্যা যেই ঘনাইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়িতে লাগিল, বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিল, নদীর জল মাতলামি সুরু করিল। তারপরেই পূর্ণ মূর্তি ধরিয়া ভাঙিয়া পড়িল সাইক্লোন। পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—বাতাসের কোনো ঠিক ঠিকানাই নাই। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া একটা প্রচণ্ড দমকা আসে, চাল উড়াইয়া দেয়, গাছ উপড়াইয়া ছুটিয়া যায় দিগন্তের দিকে। ভয়ার্ত মানুষ কল্পনা করিতে থাকে এইটাই শেষ দমকা, এইবারে বুঝি বাতাস মন্দা হইয়া আসিবে। কিন্তু বৃথা আশা—বিলীয়মান গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাওয়ার আগেই আবার দূরের নারিকেল বন হাহাকার করিয়া ওঠে, মানুষ চোখ বুজিয়া কান চাপিয়া বসিয়া থাকে—আর একটা। তারপরে আর একটা, আরো একটা, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। কত মানুষ যে ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, তাহার হিসাব কে রাখে।

কিন্তু দেবতার অনুগ্রহ ওইখানেই থামিলে তবু কথা ছিল। রাত তখন কয়টা হইবে বলরামের খেয়াল নাই, হয়তো দুইটা। লোকে বলে: নদীর দিক হইতে অমানুষিক ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া আকাশটাকে যেন চিড় ফেলিয়া দিয়া গর্জন করিল বরিশাল গান। দক্ষিণের দিগন্তটা একটা বিচিত্র অগ্নিলেখায় মুহূর্তে ঝলকাইয়া উঠিল। তারপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাতে হাজার হাজার ফেনার শুঁড় ছোঁয়াইয়া হাজার হাজার পাগলা হাতীর মতো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসিল। কোথায় রহিল নদীর কূল, কোথায় বা রহিল গ্রাম, কালো আকাশের তলায় কালো জল যেন বিশ্ব-সংসারকে একেবারে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল।

উপরে ঝড়—ঘর ভাঙিতেছে, মড় মড় করিয়া গাছ নামিতেছে মাথার উপরে; নীচে বন্যা—দশহাত প্রমাণ জলোচ্ছ্বাস মানুষকে ভাসাইবার জন্য কল্পনাতীত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। চর ইসমাইল কিছুটা উঁচু—এদিকের ভদ্রপাড়া পর্যন্ত সে জলটা পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু নীচের দিকে বন্যা কোনোকিছুকে এতটুকুও ক্ষমা করিল না। দুদিন পরে যখন জল নামিল, তখন দেখা গেল হাজিয়া-যাওয়া ধানক্ষেতের রাশি রাশি কাদার মধ্যে ঢোলের মতো ফুলিয়া আছে মরা গরু, মাথা ভাঙা সুপারী গাছের আগায় বিকট গন্ধ গলিত মানুষের দেহ আটকাইয়া আছে। তারপর তিন মাস ধরিয়া চলিল কলেরা, চলিল কত কী। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মধ্যে কতগুলা অমানুষিক দুঃস্বপ্নের দিন কাটাইয়া মানুষ আবার সুস্থ আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

কিন্তু এ আবার কী! এ আবার কোন কালযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল! ঝড় নাই, বন্যা নাই, দেবতাদের কোনো নিষ্ঠুর অকৃপা নাই এবারে। বরং অন্যান্য বছর যেমন হয়, তেমনিই ক্ষেত ভরিয়া সোনার বরণ ধান ফলিয়াছে। তবু ভয় করে। মনে হয় কিছু একটা ঘটিবে—তেমনি দুর্যোধনের মতো—তেমনি ভয়ংকর মৃত্যু-উৎসবের মতো। কিন্তু কী ঘটিবে? বলরাম বুঝিতে পারেন না, কেবল থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত চেতনাটা সন্ত্রস্ত আর সংশয়-ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

না, না, ওসব কিছু নয়। কত আশা করিয়া কত স্বপ্ন দিয়া ঘর বাঁধিয়াছে মানুষ। চর ইসমাইলের বর্বর জীবনের উপর নামিয়াছে মন্থর শান্তি—মধুর বিশ্রান্তি। দশ-পনেরো বছর আগে এরা মারামারি করিত, খুনোখুনি করিত—জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অবধি ছিলনা। কিন্তু নদী মরিয়াছে, মানুষগুলিও বদলাইয়া গেছে আমূল। এখন দাঙ্গা করিবার আগে গ্রামের লোকে আদালতে মামলা করিতে ছোটে। আগে প্রতিপক্ষকে ভাজা দিয়া ফুঁড়িয়া ফেলিয়া লাল নদীর জলে ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হইত, এখন খুনোখুনির আগেই উকীলের পরামর্শ জোগাড় করিয়া আনে। তিন বছর আগে সেই যে ঝড় হইয়া নদী নিঝুম মারিয়াছে, তার পর হইতেই একটা মৃতসই 'কাইতান' (তরঙ্গ-তাণ্ডব) আজ অবধি চোখে পড়িল না। এমন শান্তির রাজ্যে মানুষ সুখে থাকুক, স্বস্তিতে থাকুক আর দুর্ভিক্ষে কাজ নাই। বলরাম আবার তাকিয়ার গা এলাইয়া দিলেন।

ডাকিলেন, রাধানাথ?

বাঁহাত দিয়া মুখটা মুছিতে মুছিতে অপ্রস্তুতভাবে আসিয়া দেখা দিল। রাঁধিতে রাঁধিতে ঝোলটা চাখিতেছিল সে—ডাক পড়াতে চটপট উঠিয়া আসিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে গোঁফে কিছু ঝোল লাগিয়া আছে। হাত দিয়া মুখ মুছিয়া আবার হাতটাকে সে কাপড়ে মুছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলেন না কি, বাবু?

—হাঁ, তামাক দে আর একটু। বেরুতে হবে—ওপাড়ার দিকে রোগী দেখবার তাগিদ। আর কী ম্যালেরিয়াই লেগেছে এবারে, দশ বছরে এমন জ্বর তো দেখিনি এখানে। এবারে জ্বরেই দেশ সাবড়ে যাবে দেখছি।

—আজ্ঞে, মারে কৃষ্ট রাখে কে? আপনি ভেবে আর কী করবেন?—অযাচিতভাবে খানিকটা ধর্মকথা আর সান্ত্বনা বাক্য শোনাইয়া রাধানাথ তামাক আনিতে গেল।

ক্রমশঃ

আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন জোহীতে থেকে, লোকজন উট ইত্যাদি জোগাড় করে, আমরা আবার উত্তরের দিকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রথম দিনই প্রায় ১৪ মাইল উট্রপৃষ্ঠে জোহী থেকে ত্রীঘ্‌রথীন্‌ এসে পৌছলাম। আগেই বলেছি উট প্রায় ঘোড়ার মত জোরেই চলে, তাই ভাল রেকাব ও জিন্‌ থাকা দরকার, হঠাৎ পা থেকে রেকাব খুলে গেলেই মানুষ পড়ে যেতে পারে। আমি এর আগে আর কখনও উটে চড়ি নি, তাই কেবলই ভয় হচ্ছিল, যদি পড়ে যাই, বিশেষ করে যখন খুব উঁচু নীচুর উপর দিয়ে চলে তখন একেবারে পড়ে যাবার মতই হয়। দূর থেকে ঐ ত্রীঘ্‌রথীন্‌ গ্রামটি ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট মাটির বাড়ী, মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দূরে একটা কুয়া, তাতে লাগান জল-তোলার Persianwheel জাতীয় কাঠের কল। দলে দলে মেয়েরা জল নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কোট প্যান্ট ও টুপি দেখবার জন্য অসংখ্য ছেলেমেয়ে এমন কি বুড়োরাও ঘিরে দাঁড়াত। এখানে যে বাড়ীটিতে আশ্রয় পেলাম, সেটা এখানকার এক জমিদারের। জমিদারকে এরা বলে "বড়েরা"। ঘরখানি একেবারে মেটে। সাধারণ জমি থেকে প্রায় ৪ হাত উঁচু। ছাদটিতে কড়ি বরগা দিয়ে কাঁচা ইঁট সাজান, তার উপর মাটি, চুণ ও খড় কুঁচান দেওয়া। বৃষ্টির বালাই নেই ব'লে ছাদ পেটানর হাঙ্গামা নেই। ঘরটিতে সাধারণ ভাবের দরজা জানালা লাগান আছে, আর দেওয়ালে আমরা যেমন রং বা কলি দিই সেই রকম তারা আগাগোড়া গাঢ় সবুজ রঙের এনামেল্ করেছে। হঠাৎ দেখলে দেওয়ালটা কাচের বলে মনে হয়। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও নবাবি আমলের ঐ ধরণের এনামেল করা ইট গৌড়, মালদহ প্রভৃতি স্থানে আজও দেওয়ালের গায়ে দেখা যায়। বাড়ীর চারদিকে যে দেওয়াল আছে তার চারদিকের কোণে চারিটি গোল উঁচু towerএর মত করেছে। তাতে ওঠার জন্য ঐ towerএ গায়ে ঘুমান সিঁড়ি করেছে। যখন কোনও শত্রু তাদের আক্রমণ করতে আসে তখন ওর উপর চড়ে তারা দেখে বা গুলী চালায়।

৺ননীগোপাল মজুমদার

ওখানে পৌঁছে আমাদের গায়ে ভয়ানক ব্যথা হলো। ২।১ দিন ওখানে থাকার পর আবার আমরা উত্তরের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। এবার এসে উঠলাম ত্রীঘ্‌ থেকে ১১ মাইল দূরে Naigaz ডাকবাংলায়। এটা একটা আধুনিক ধরণের বাংলো। অনেক বড় বড় সাহেব-সুবা এখানে সরকারী কাজে এসে থাকেন। দাদু থেকে বরাবর এই পর্য্যন্ত Motor চলার মত পাকা রাস্তা আছে। এখান থেকে দাদু ও জোহীতে ফোনের ব্যবস্থা আছে। আমরা এরপর ক্রমাগত উত্তরের দিকে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের দিকে যাব বলে আগে থেকেই উটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সিন্ধু সরকারের সেচ্-বিভাগের একটা খাল সিন্ধু নদী থেকে কেটে বরাবর এখান পর্য্যন্ত আনা হয়েছে। আবার বেলুচিস্থানের দিক থেকে একটা স্বাভাবিক প্রস্রবণ বরাবর একটা নদীর আকার ধারণ করে এই পর্য্যন্ত এসেছে। এইটাই গজ্‌নদী। বর্ষাকালে এটা এতই ভীষণ আকার ধারণ করে যে এর জলকে আয়ত্ত করার জন্য এখানে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে এবং এখানকার ডাকবাংলা ও ফোন এই উদ্দেশ্যেই রাখতে হয়েছে।

আমরা কয়েকদিন এখানে থেকে ৭ই নভেম্বর সকালে এই গজ্‌নদী ধরে বরাবর অগ্রসর হতে লাগলাম। এই পথটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম ছিল। উঁচু-নীচু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রায় তিনঘণ্টা আমরা ক্রমাগত চলেছি আর ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল যে, "এই বুঝি পড়ে গেলাম"। ৫।৬ মাইল আসার পর এই নদীর একটা শাখা যেখানে অন্য দিকে ঘুরে গেছে, সেটি পার হয়েই একটা সমতল জমি দেখে, এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের ঠিক নীচেই আমরা আমাদের তাঁবুর জন্য জায়গা বেছে নিলাম। তাঁবুর জায়গাটা কতকটা সমতল হলেও
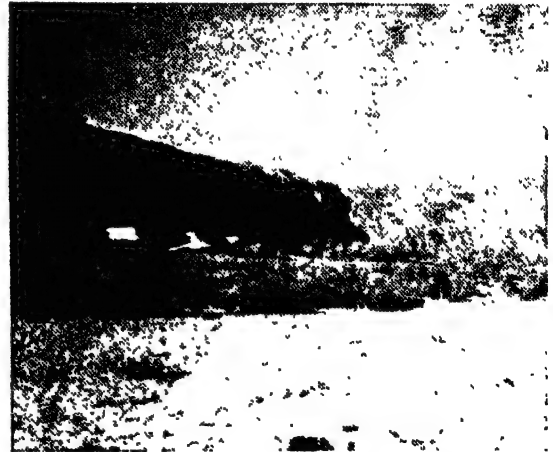
রোহিল-জো-কুণ্ড ক্যাম্প" (যেখানে ডাকাতরা গুলি করে ননীগোপাল মজুমদারকে হত্যা করে)
—আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সৌজন্যে

প্রকৃতপক্ষে একটা পাহাড়ের অংশ—চারিদিকেই পাহাড়, উঁচু ২০০ ফিটের কম নয়। মাঝখান দিয়া গজ্‌নদী এঁকে বেঁকে, কোনও রকমে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। কোথাও ২ ফিটের বেশী জল নেই। জল অতি চমৎকার স্বচ্ছ কাচের মত কোনও গর্ত্তের ভিতর দিয়া জল যাবার সময় বেশ খানিকটা জল সেখানে থেকে যায়, তার ভেতর মাছও জন্মায়। ঐরূপ গর্ত্তকে ওখানে "কুণ্ড" বলা হয়। "রোহীল জো কুণ্ড" বলে আমাদের তাঁবুর কাছেই ঐরূপ একটাগর্ত্ত ছিল। ঐ জলে সাঁতার কেটে লাফালাফি করে মাছ ধরে

বেশ আনন্দ পাওয়া যেতো। ঐ জায়গাটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছিল। ঝাঁকড়া, ঝাকড়া, ছোট, ছোট, কাঁটাগাছ ছাড়া আর কোনও গাছ বিশেষ নজরে পড়ে না। নদীর ভাঙনে, পাহাড়ের ধারগুলি দেখলে মনে হয়, গাদা গাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাথর যেন তক্তা চেরাইয়ের মত সমানভাবে কেটে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে। এখানকার পাহাড়ে কোনও গাছপালা হয় না, কাজেই জন্তু জানোয়ারও প্রায়ই থাকতে পারে না। আমাদের তাঁবুর ঠিক সামনেই একটা পাহাড়ের উপর গিয়ে দেখা গেল যে সেখানেও কিছু প্রাচীন গৃহাদির চিহ্ন রয়েছে; তাই খনন কোরে, পাথরের নুড়ী দিয়ে গাঁথা দেয়াল ও ঘর তার ভেতর থেকে পাওয়া গেল প্রায় ৪।৫ হাজার বৎসর আগের সব মাটীর জিনিষ পত্র। রং দিয়ে তাতে সুন্দর সুন্দর মানুষ ও পাখী আঁকা। চক্‌মকি পাথরের যন্ত্রপাতি, ছুরী ইত্যাদি। ঐ জিনিষগুলির গঠন এবং পাখী ও মানুষের আকৃতি থেকে বিশেষজ্ঞেরা তার বয়স সহজেই বুঝতে পারেন। এসব ছাড়াও আরও কতকগুলি ভারি মজার জিনিষ এখানে সেখানে পাওয়া গেল। একদিন কুড়িয়ে পেলাম একটা পাথরের শঙ্খ। দেখলে মনে হয় কে যেন ওটা নিখুঁত ভাবে পাথর কেটে কেটে তৈয়ারি করেছে। তারপর পেলাম একমুঠো পাথরের চাঁদা মাছের মত দেখতে এক রকম মাছ। তারা সব এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে রয়েছে। সত্যকার মাছের মতই তাদের চোখ মুখ ও লেজ বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। তার পর পেলাম এক গোছা পাতা ও গাছ সমেত পাথরের দল। একটা মৌচাকের মত পাথরের টুকরা, তাতে অসংখ্য ছিদ্র, হয়তো Sponge জাতীয় কোনও জিনিষ হবে। এগুলিকে ইংরাজিতে Fossil বলে। বহুদিন পর্য্যন্ত মাটির ভেতর থেকে থেকে এইরূপ পাথরের—আকার ধারণ করে যা সম্পূর্ণ পাথরই হয়ে যায়। এই রকম একটা গাছ বহুদিন মাটির ভেতর থেকে, থেকে, রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কোনও জায়গা, ই, আই, রেল কোম্পানী খনন করায় সময় সম্পূর্ণ পাথর অবস্থায় পায়। বর্ত্তমানে কলিকাতার যাদুঘরে তা সযত্নে রাখা আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সকল জিনিষগুলি সংগ্রহ করা স্বত্বেও, আনা সম্ভব হয়নি কেবল মাত্র মৌচাকের মত একটা পাথর কোনও প্রকারে এসে গেছে।
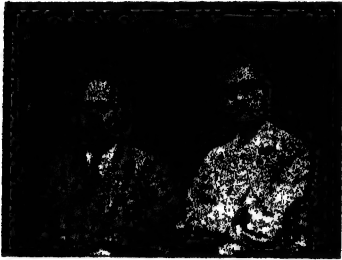
মিঃ সেনগুপ্ত ও লেখক

আমরা যে পাহাড়ের নীচে তাঁবু করেছিলাম সেই পাহাড়ই হলো বেলুচিস্থানের সীমানা। একেই "কির্থার রেঞ্জ" বলা হয়। এটা কালাত রাজ্যের অন্তর্গত বলে সেই পাহাড়ের এক অংশকে "জাড়ো কালাত" বলে।

আমরা ওখানে তিনটি তাঁবু গেড়েছিলাম। একটাতে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার, একটাতে আমি, সেনগুপ্ত এবং কৃষ্ণদেব থাকতাম এবং অপরটিতে চাপরাশীরা থাকতো। উটওয়ালারা ও কুলীরা সব নদীর ধারে তাদের উট নিয়ে আগুন জেলে থাকতো। খাবার জিনিষ ওখানে না পাওয়া গেলেও আমরা অন্য স্থান থেকে মোটামুটি আনিয়ে রাখতাম। আমরা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানর জন্য জোহীই আমাদের নির্দ্দিষ্ট ডাক ঘর ছিল। নবাবি আমলে যেমন ঘোড়ায় ডাক নিয়ে যেত তেমনি সরকারি চিঠি পত্র আনা ও পাঠাবার জন্য আমরা উটের ব্যবস্থা করেছিলাম। এখান থেকে জোহী প্রায় ৪০ মাইল। এই উঁচু নীচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি উট গিয়ে আবার ফিরে আসতে প্রায় ৩।৪ দিন লেগে যাবার কথা, তাই প্রত্যহ ডাক পাবার জন্য আমরা মধ্যে "ত্রীষ মঞ্জিল"তে আরও একটা উটের ব্যবস্থা রেখেছিলাম। একটা উট এখান থেকে ত্রীষ যাতায়াত করত আর একটা উট "জোহী" থেকে "ত্রীষ" যাতায়াত করত, তাতে কারুরই খুব বেশী কষ্ট হতো না এবং আমরাও রোজই ডাক পেতাম। ক্রমশঃ

ফুলধনু

(নাটক)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মফস্বল সহরের পাকা বাড়ীর এক কক্ষ। গৃহকর্ত্তা গোলক—রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্‌সপেক্‌টার—সতরঞ্চির উপর বসে সামনের স্তূপীকৃত মাদুলি এক ধরণের মোড়ক দিয়ে ভর্ত্তি করছেন। মোড়কগুলি একপাশে স্তূপীকৃত করা রয়েছে। আশেপাশে কাগজ, খাম, আঠার শিশি, দোয়াতদানি ইত্যাদি অবিন্যস্তভাবে ছড়ান রয়েছে। ভদ্রলোক একমনে কাজ করে যাচ্ছেন, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রেমেন্দ্র গুড়গুড়ি নিয়ে প্রবেশ করল।

গোলোক। প্রেমেন, তুমি তামাক নিয়ে আসতে গেলে কেন? হারাধন কি এখনও বাজার থেকে ফেরেনি?

প্রেমেন। না।

গুড়গুড়ি রাখলে

গোলোক। তাই তো, এত সব কাজ বাকী। বেটা যেখানে যাবে, সেখানেই আড্ডা জমিয়ে বসবে। আজ এই কবচ না পাঠালেই নয়। আজ ডাকটা কি দেখেছ? কোনও অর্ডার নেই তো?

তামাক টানতে লাগলেন

প্রেমেন। দেখেছি, কিছু নেই।

গোলোক। নেই? বেশ হয়েছে। বেঁচেছি বাবা, একা আর কতদিকে সামলাই। শুধু 'রোপক' আর 'রোপক'! লোকের মুখে আর কথা নেই। হবে না? এক লাখ হ্যাণ্ডবিল ছড়ালুম কি শুধু শুধু? আমি এই বলে রাখছি, তুমি দেখবে প্রেমেন, একদিন 'রোপক' জগদ্বিখ্যাত হবে। পেটের যত ছোট আর যত বড় অসুখই হোক না কেন, 'রোপক' একেবারে

একমেবাদ্বিতীয়ম্, এটি সর্বজনবিদিত সত্য হবে। আচ্ছা দেখ, কোনও মনিঅর্ডার বা ইনসিওর আসেনি ?

প্রেমেন। পিয়নকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বললে, না।

গোলোক। তাই তো, বাঁকুড়ার সনাতন কার্মেসীর টাকাটা আজ ছমাস ধরে বাকী পড়ে রয়েছে, কি জানি কেন পাঠাচ্ছে না। তাছাড়া দেখ, রতনখালির সেই দালালটিরও আর কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রেমেন। রবি একটা চিঠি দিয়েছে।

(পোষ্টকার্ড বার করল)

গোলোক। রবি দিয়েছে ? কি লিখেছে ?

প্রেমেন। একজামিন সামনে, বড় ব্যস্ত রয়েছে। ভাল আছে।

গোলোক। (কাজ করতে করতে) রাখ, পরে দেখব এখন। ভাল থাকলেই হল। তারপর দেখ প্রেমেন, সেই নারায়ণগঞ্জের হাকিম সাহেব কি লিখেছেন জান ? লিখেছেন, আপনার 'রোপক' দাওয়াইরাজ্যের আকবর। দাওয়াইরাজ্যের আকবর ! কি সুন্দর কথা ! হাকিম সাহেব একেবারে সাহিত্যিক দেখছি।

প্রেমেন। (ইতস্তত করে) আপনাকে একটা কথা বলবার জন্যে—

গোলোক। কি কথা ? বলতে চাও তো যে ছড়ান টাকাগুলো সব বাকী পড়ে রইল, আবার নতুন মাল বাজারে ছাড়ছি কেন ? না ছেড়ে কি করি বাবা বল। একটা জিনিসকে জগদ্বিখ্যাত করতে হলে কি সোজা 'রিস্ক' নেওয়া দরকার ? জোচ্চোর দু'দশজন হবেই, ফাঁকি বিশ পঁচিশজন মারবেই, তাতে তো দমলে চলবে না। সাহস করে এগোতে হবে।

প্রেমেনের স্ত্রী সুষমা প্রবেশ করল

গোলোক। কি মা, কি খবর ? জান প্রেমেন, 'রোপকে' মার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সেরেছে, এইটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দিয়েছে। তবে রোপক জিনিসটি ঘরে ঢুকে অবধি মার আমার দ্বিপ্রাহরিক ঘুমটা গেছে, এটাই মুস্কিল হয়েছে। বুড়ো মানুষ, আমি আর কত পারি, একটুতেই চোখ দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মা আমার রোজ দু'শ মাদুলি নিশ্চিন্তে ভর্তি করে দিচ্ছেন বলেই তো এত অর্ডার সাপ্লাই করতে পারছি।

সুষমা। রোপকের এবার একটু দাম বাড়ান দরকার কাকাবাবু।

গোলোক। হবে মা হবে, ক্রমশ হবে। জিনিসটা সবাইকে আগে চিনতে দাও। সেই চিনতে দেওয়ার জন্যেই তো এত মহামূল্য বস্তু হলেও মাত্র এক আনা দামে দিচ্ছি। একটা জিনিসকে জগদ্বিখ্যাত করা তো চারটিখানি কথা নয় মা। কমপক্ষে আরও লাখ দশেক হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে হবে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর, উদয়পুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, রায়পুর, নাগপুর— সব জায়গাতেই বিজ্ঞাপন পাঠান চাই। টুরিং সিনেমা কোম্পানীতে স্লাইড দিতে হবে ; খবরের কাগজে আরও বড় করে ব্লক দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। অনেক কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। আমাকে শীগগির একবার কলকাতা যেতে হবে।

সুষমা প্রেমেনকে কি বলার জন্যে ইঙ্গিত করলে ;
প্রেমেন ইঙ্গিতে জানালে, তুমি বল।

সুষমা। রবির তো পরীক্ষা সামনে।

গোলোক। হাঁ।

প্রেমেন। পরীক্ষা দিয়েই বাড়ী চলে আসুক বলে লিখব কি ?

গোলোক। লিখতে পার। তবে সে যে ছেলে, চুপ করে এসে বাড়ীতে বসে থাকতে চাইবে কি ?

সুষমা। রোপকের কাজ এত বেড়েছে—

গোলোক। পাগল হলে মা ! রবি এসে রোপকের কাজে আমাকে সাহায্য করবে ! তার চেয়ে তাব ততক্ষণ সময় খেলার মাঠে দৌড়লে কাজ হবে।

সুষমা। না না, তার জন্যে নয়। এবার পরীক্ষা দিয়ে—

প্রেমেন। হাঁ, এবার দিলেই ভাল হয়, আর দেরী করে লাভ কি !

গোলোক। কিসের দেরী ?

প্রেমেন। একজামিনের পর রবির এবার—

গোলোক। কি পড়া উচিত বলছ ? তা আমি বলি—তুমি কি ভাল মনে কর ?

প্রেমেন। পড়বে তো নিশ্চয়ই, তবে তার আগে ওর বিয়েটা দিলেই ভাল হত বলে ওর বৌদির মনে হয়।

গোলোক। তাই নাকি মা ?

সুষমা। না না, তা নয় কাকাবাবু, তবে আপনার অনেক কাজ, তাছাড়া রোপকেরও তো কাজ বাড়ছে, তাতে আপনাকে সাহায্য করতে—

গোলোক। নতুন বৌমা এসে আমার রোপকের পুরিয়া তৈরি করবেন ! তুমি হাসালে মা। তোমার মত লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে সবাই কি এই বুড়োর কাজে লাগবে বলতে চাও !

সুষমা। অনেক জায়গা থেকেই তো কথা আসছে, এবার একটু খোঁজ নিলে হয় না ?

গোলোক। আজকালকার ছেলে মা, তার মতটা আগে নিয়েছ ?

সুষমা। মত সে করবে, সে নিয়ে আপনি ভাববেন না।

গোলোক। তাহলে তো ভাল কথা। তাহলে আমি তো যাচ্ছি, বৃন্দাবন ভায়ার খোঁজ নিয়ে আসব। বৃন্দাবনকে তোমরা জানবে না প্রেমেন, আমার বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, যেন ভাই। দুজনেই ইস্‌পেকটার ছিলুম এক ষ্টেসনে কয়েক বছর, রবি তখন ছেলেমানুষ।

প্রেমেন। আপনার মুখে তাঁর নাম শুনেছি।

গোলোক। তা শুনবে, সেটা আশ্চর্যের নয়। আমাদের গোলোক বৃন্দাবন—নামেও যেমনি মিল, কাজেও তেমনি ছিল। লোকে বলত, যত বড় ধড়িবাজই হোক না কেন, গোলোক বৃন্দাবনকে এড়াতে পারবে না, গোলোকে গিয়ে যদি ধরা না পড়ে, বৃন্দাবনে গিয়ে ধরা পড়বেই।

হাসতে লাগলেন

সুষমা। কোথায় তিনি থাকেন ?

গোলোক। ব্যারাকপুরে, এখন কি করছে কে জানে !

অনেকদিন কোন খবর পাইনি। হাঁ জান মা, রবি যখন বছর ছয়েকের, সেই সময় তার একটি মেয়ে হয়। ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে আমি বলেছিলুম, ভায়া, আমার রবির ঘর আলো করবার জন্তে মা-মণিটিকে আমায় রেখো।

সুষমা। সে মেয়েটি এখন কি করছে? বিয়ে হয়ে যায়নি তো?

গোলোক। তা তো জানি না। মনে হয় তো হয়নি, না হলে অন্তত একটা নেমন্তন্ন-চিঠিও পেতুম। ঐ তো তার একমাত্র মেয়ে। আমাকে কি এত সহজে ভুলে যাবে?

প্রেমেন। তাহলে তাঁকে একটা চিঠি দিলে হয় না?

গোলোক। চিঠি দেওয়ার চেয়ে ভাল খবর পাওয়া যাবে তার ভাইঝির ওখানে। শ্যামবাজারে তাদের বাড়ী।

সুষমা। তিনি আপনাকে চেনেন বুঝি?

গোলোক। হাঁ। বছর চার আগে একবার রাস্তায় বৃন্দাবনের সঙ্গে দেখা হতে ধরে নিয়ে গেছল।

প্রেমেন। তা হলে তো কলকাতায় গেলে খোঁজ নিয়ে আসতে পারবেন।

প্রায়-বৃদ্ধ-ভৃত্য হারাধন প্রবেশ করিল

গোলোক। তা পারব, বাজার শেষ হল হারাধন?

হারাধন। আজ্ঞে হাঁ।

গোলোক। বাজার শেষ হল না তোমার বাজারের শেষ হল?

হারা। আজ্ঞে—

গোলোক। হারাধনকেও একবার বল মা, ছোটটি থেকে রবিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে।

হারাধন। কি কথা বৌদিদিমণি?

সুষমা। ছোটদাদাবাবুর বিয়ে হবে।

হারাধন। (হাসিমুখে) সত্যি কথা?

গোলোক। সত্যি নয়তো কি মিথ্যে নাকি? বিয়ের কথা মিথ্যে হয়?

হারাধন। (ইতস্তত করে) তা নয়, তবে দাদাবাবু এখনো পড়ছেন।

গোলোক। পড়ছেন বলে কি চিরকালই পড়তে হবে, বিয়ে করতে হবে না? প্রেমেন বলছে, সুষমা বলছে, এবার রবির বিয়ে হওয়া দরকার। তা তুমি কি বলতে চাও যে তার পড়াশোনার জন্তে সেটা হওয়া উচিত নয়?

হারাধন। তা বটে। এবার বিয়ে হওয়া দরকার।

গোলোক। তোমাকে আমার সঙ্গে পরশু কলকাতা যেতে হবে হারু। বিয়ের কথাবার্ত্তা কওয়া দরকার।

হারাধন। সে তো ভালই।

গোলোক। ভালই ত বলছ, কিন্তু খরচের কথাটা একবার ভেবেছ? জান মা, কলকাতা গেলেই দোকানগুলো যেন পকেট থেকে পয়সা তুলে নেবার জন্তে মুকিয়ে আছে।

হারাধন। তা সত্যি, বেটারা যেন ফাঁদ পেতেছে। বাবু এক পা করে যান আর একটি করে জিনিস কেনেন; যখন বাড়ী ঢুকি বৌদিদিমণি, আমার মাথায় তখন একটি বোঝা।

গোলোক। শোনো কথা বৌমা, ছুটো জিনিস যদি বইলে হারু, তো বলে বসল বোঝা।

হারাধন। আজ্ঞে, ছুটো জিনিস তো আপনি কোনদিন কেনেন না।

গোলোক। খুব হয়েছে। এবার যে পঞ্চাশটা জিনিস কিনতে হবে, সে খেয়াল আছে? বিয়ের ব্যাপার, সে তো আর সামান্ত কথা নয়। তাহলে হারু, কলকাতা যাবার তো উদ্যোগ করতে হয়। কিন্তু রোপকের কাজটা কদিন বাদ পড়ে যাবে না।

সুষমা। আমি যতটা পারি করব কাকাবাবু।

গোলোক। তাই তো চাই মা, এই তো চাই। তোমরা শুরু না লাগলে কোনও কাজ কি ষোল আনা সফল হতে পারে? একটা জিনিসকে জগদ্বিখ্যাত করা তো আর সামান্ত কথা নয়। কি বল হারু?

হারু। আজ্ঞে হাঁ।

গোলোক। তাহলে এস হারু, (গুড়গুড়ির নল রেখে দিয়ে) একটু চেপে কাজে লাগা যাক। অন্তত হাজার খানেক কবচ কালকের ভেতরই তৈরি করে ফেলা যাক। পরশু তো আবার কলকাতা যেতে হবে! রবির বিয়ে, অনেক কাজ। তাহলে পরশুই কলকাতা যাই, কি বল প্রেমেন?

প্রেমেন। পরশু শুক্রবার, সেই ভাল।

গোলোক। হারু, তাহলে তোমার অন্ত সব কাজ সেরে এস, বেশী দেরী কোরো না।

সুষমা। আমিও একটু পরে এসে লাগছি।

গোলোক। না মা না, তোমার শুধু মিড্‌ডে ডিউটি, এখন নয়। এখন তোমার অন্ত কত কাজ! মায়ের আমার উৎসাহ দেখছ প্রেমেন?

প্রেমেন। বিয়ে বাড়ীর নামেই এত উৎসাহ।

গোলোক। তা বলে কি তুমি বলতে চাও যে বিয়ের কথা হবার আগে মায়ের আমার কম উৎসাহ ছিল? মোটেই না। তাছাড়া উৎসাহ তো হবেই, রবির বিয়ে। কি বল হারু?

হারু। (এক গাল হেসে) ছোট দাদাবাবুর বিয়ে!

গোলোক। তাহলে কাথাবার্ত্তা সব পাকা করে রাখা যাক, পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই—

হারা। পরীক্ষার আর কতদিন বাকী?

গোলোক। পাগলার আশা দেখ মা! তা বলে কি তুমি বলতে চাও যে কালই বিয়ে দিতে হবে? হারু আমাদের চেয়েও ব্যস্তবাগীশ—দেখছ মা?

হারু। ছোট দাদাবাবুর বিয়ে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোষ্টেলে রচনার কক্ষ, রচনা ও মায়া কথা কহিছে

রচনা। তুমি কম মেয়ে নও বাবা।

মায়া। কিসে কম নয় দেখলে?

রচনা। সেদিন কি কথাবার্ত্তাই না জুড়ে দিলে, এদিকে এত লজ্জা!

মায়া। বেশী লজ্জা করলেই তো মুস্কিল হত আরও। আমি

কোথায় ভাবলুম, তুমি কত আলাপ-টালাপ করে ব্যাপারটা সহজ করে তুলবে, না তুমিই লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে রইলে। তখন আমি কথাবার্ত্তা না করে কি করি বল।

রচনা। এবার নিবেদনটা করে ফেল, আর ভাবনা কি!

মায়া। ভাবনা অনেক।

রচনা। কি ভাবনা?

মায়া। ভাবনা হচ্ছে, পাছে 'না' বলে বসে।

রচনা। কেন 'না' বলবে?

মায়া। তুমি যে চোখে পড়েছ।

রচনা। তাই নাকি? লক্ষ্য করেছ বুঝি?

মায়া। সত্যি ভাই, এমনি করে তোমার দিকে চাইছিল, যদি দেখতে।

রচনা। হিংসে হচ্ছিল না?

মায়া। আর কেউ হলে হত। কিন্তু লক্ষ্মী দিদিটি আমার বলেই হচ্ছিল না। আর কারুর জন্যে ছেড়ে দিতে মন সরবে না, শুধু রচনারাণীর জন্যেই—

রচনা। এত বড় স্বার্থত্যাগ!

মায়া। কথাটা কি মেকি মনে হচ্ছে নাকি? যাচাই করে দেখতে চাও?

রচনা। না ভাই, যাচাই করবার ইচ্ছে নেই, তোমার ধন তোমারই থাক।

মায়া। চল আজ বেড়িয়ে আসি।

রচনা। কোথায়?

মায়া। বৃন্দাবনে। আরও দু পাঁচটা দিন যাক, তারপর একটা কাণ্ড করে বসব ভাবছি।

রচনা। কি কাণ্ড?

মায়া। বল না কি হতে পারে।

রচনা। আমার বলে কাজ নেই, তুমি বল।

মায়া। ফুলের মালা পরিয়ে দেব।

রচনা। (অতি বিস্ময়ে) ও—মা!

মায়া। কেন লজ্জা কি? মুখে বলার চেয়ে অনেক সহজ হবে।

রচনা। ধন্য তোমার সাহস বাবা।

মায়া। এ আর কি সাহস ভাই! দয়িতের জন্যে প্রেমিকারা যে সব দুঃসাহসিক কাণ্ড করেছে, এ তার কাছে ছেলেখেলা।

রচনা। (কৌতুকের স্বরে) কি সব দুঃসাহসিক কাণ্ড করেছে বলতো শুনি।

মায়া। ঘনান্ধকার রাত্রিতে প্রিয়পরিজন ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছে, বিস্তীর্ণ মরুভূমি নিঃসঙ্গিনী হয়ে পার হয়েছে, ছদ্মবেশ পরে দেশে দেশে ফিরে বেড়িয়েছে—

রচনা। তারপর?

মায়া। তারপর প্রিয়তমের জন্যে প্রিয়তমা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে গেছে—

রচনা। পড়তে গেছে—পড়েনি তাহলে?

মায়া। পড়েনি শুধু চেহারাটা কুৎসিত হয়ে যাবে বলে।

রচনা। তাই নাকি? তারপর?

মায়া। তারপর দয়িতের জন্যে প্রেমিকারা দিপ্রাহরিক নিদ্রা ত্যাগ করেছে।

রচনা। বল কি! সোজা ত্যাগ নয়তো।

মায়া। হাঁ। চিন্তায়, বেদনায় আঁখি দুটীর পাতা বুঁজতে চায়নি, শুধু নিরর্থক চেয়ে থাকলে দুঃখ বাড়বে জেনে উপন্যাসের পাতায় চোখ রেখে দিন কাটিয়েছে।

রচনা। তারপর?

মায়া। তারপর সেই অতি দুঃসহ বেদনাকে সহনীয় করবার জন্যেই গোলাপ ফুলের মালা ছেড়ে গাঁদা ফুলের মালা পরেছে।

রচনা। অর্থাৎ?

মায়া। অর্থাৎ সব্যসাচীকে ছেড়ে সাত্যকিকে বিয়ে করেছে।

রচনা। বড়ই দুঃখের কথা। এখন তুমি কি করবে ভাবছ?

মায়া। বরমাল্য অর্পণ করেও যদি বরকে না পাই, তাহলে রথচক্র তলে পড়ে গিয়ে বলব, প্রাণনাথ, দাসীকে একান্তই যদি চরণকমলে স্থান না দাও, হৃদয়পদ্মে সখীটিকে বসাও।

রচনা। মজা মন্দ নয়, সখীটিকে কাঁদে ফেলতে চাও।

মায়া। এখন অধীনাকে অনুগৃহীত করে একখানা গান কর।

রচনা। তুমি গাও, আমি শুনি।

মায়া। আমার গানের সময় যেদিন আসবে, সেদিন একখানা কেন, বিশখানা গাইব।

রচনা। সেটা কবে?

মায়া। কি জানি কবে। এখন একখানা গাও ভাই।

রচনার গান

গান

শুনতে যে গান চাও গো তুমি
সে গান কেমনে বল গাই,
যে গান আমার কণ্ঠে দোলে
তোমার ছন্দ তাতে নাই।
তোমার আমার একই আকাশে
যে চাঁদ দেখি নিয়ত হাসে
সে চাঁদ তোমার বাসরজাগায়
আমারে কাঁদায় ভাই—
কেমনে সে গান বল গাই

(রচনা: দেবনারায়ণ গুপ্ত)

গান শেষ হইবার একটু আগে বাইরে দরজায় টোকা দিয়ে কে ডাকলে, দিদিমণি!

মায়া। এস, ভেতরে এস।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। আপনাকে একজন ডাকছেন।

মায়া। আমাকে? (পরিচারিকা ঘাড় নাড়তে) কি নাম, বলেছেন?

পরি। রবীন্দ্রনাথ রায়।

মায়া। রবিবাবু? রচনাদি—(থেমে গিয়ে) আচ্ছা তুমি যাও, যাচ্ছি আমি। ভিজিটিং রুমে আছেন তো?

পরি। হাঁ।

প্রস্থান

মায়া। দেখছ রচনাদি?

রচনা। এখানে এসেছেন!

মায়া। চল ভাই তুমি শুদ্ধ।

রচনা। আমি পারবনা ভাই, তুমি যাও।

মায়া। (রচনার হাত ধরে) তুমি না গেলে হবেনা, চল।

রচনা। ডাকছেন তো তোমাকে, আমাকে আবার কেন? তোমাদের কথাবার্ত্তায় অসুবিধে হবে।

মায়া। না গো না, চল।

রচনা। তবে দাঁড়াও একটু।

পাউডারের কৌটো নিয়ে আয়নার কাছে গেল

মায়া। দাও ভাই আমাকেও একটু।

উভয়ে প্রসাধনে রত হইল

রচনা। চল, চল এবার, ভদ্রলোক বসে আছেন।

মায়া। চল। (ক্রমশঃ)

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

যে পলিটিক্সে সেণ্টিমেণ্ট নেই, সেই পলিটিক্সই আসল পলিটিক্স। রুশকে তুর্কি আক্রমণ করতে দেখে, আফগানিস্থান যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে রুশ আক্রমণ করে ত সে রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দেয় না। এ ক্ষেত্রে অবিচার সহ্য করে চুপ করে থাকাই প্রকৃত পলিটিসিয়ানের পরিচয়। প্রেম সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। যে প্রেমে সেণ্টিমেণ্ট বা মোহ নেই সেই হচ্ছে আসল প্রেম। আসল প্রেমের সঙ্গে স্বার্থ বোধের বিরোধ নেই। Traditional প্রেম হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের নিজ পরিবারের ও স্ব-সমাজের (অবস্থা ভেদে) স্বার্থ অটুট রেখে যে প্রেম হয়, সেই প্রেমেই সত্যকার প্রেম। এইরূপ প্রেমে জ্ঞানী লোক মাত্রেরই বাধা না দিয়ে সাহায্যই করা উচিত।

বলপূর্ব্বক নারীকে অপহরণ করলে অপহারকের উপর নারীর প্রেম জন্মায় কিনা, তা বিবেচনার বিষয়। আমার মতে সেরূপক্ষেত্রে মেয়েরা সর্ব্বসময়ই অপহারকের প্রতি অনাকৃষ্ট থাকে। আদিমযুগে অপহরণ দ্বারা (বলপূর্ব্বক) নারীকে জীবনসঙ্গিনী করার প্রথা ছিল। নারীরাও এ বিষয়ে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার সকল আদিম অভ্যাসই ত্যাগ করেছে। বলপ্রকাশকের উপর কোনও অবস্থায়ই নারীর শ্রদ্ধা থাকে না। মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সে অপহারকের বিরুদ্ধাচরণ করে, প্রতিশোধও নেয়। ত্রিশ বৎসর একসঙ্গে থাকার পরও ক্বচিৎবিশেষ অপহারকের প্রতি মমতা জন্মে নি, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সিন্ধুর কোনও জমিদারের বাটী থেকে এইরূপ একটা মেয়ে ৪০ বৎসর পরে মুক্তি পায়। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে অপহারকের নামে এজাহার দেয়। পুত্রাদি জন্মালেও তারা নিরস্ত হয় না। আশ্রয়ের অভাবে বা ভয়ে, কেউ কেউ অপহারকের গৃহে থাকতে বাধ্য হলেও আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া মাত্র তারা চলে আসে। এরূপ অবস্থায় পুত্রাদি হলে তারা হয় স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত, পঙ্গু বা নির্ব্বোধ। আদিম যুগের মনোভাব যে নারীর মন থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে তা নয়। নিম্ন শ্রেণীর কোনও কোনও নারী এখনও চায় পুরুষ তার উপর পীড়ন করুক। কিন্তু সেই পীড়ন চায় সে নিজ পতির কাছ থেকে, পরপুরুষের কাছ থেকে নয়। নিম্ন সমাজে এমন মেয়ে আছে যারা স্বামীর কাছে প্রহার না খেলে স্বামীকে ভালবাসে না। আমাদের এক প্রজা তার স্ত্রীকে প্রায়ই মারত। একদিন বিরক্ত হয়ে প্রজাটিকে তেড়ে যাই। তার স্ত্রী কিন্তু এতে আপত্তি প্রকাশ করে। সে বলে উঠে—"মোর স্বামী মোরে মারছে, আর ত কেউ মারেনি। ঘরোয়া ব্যাপারে আপনারা আসেন কেন?" এইরূপ মনোবৃত্তি আদিম মনেরই পরিচয়। সাধারণতঃ মেয়েরা বল প্রকাশ পছন্দ করে না। আত্মসম্মানের হানিকর ব্যবহার তারা অপছন্দই করে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। উৎকট যৌন স্পৃহাই এর কারণ। অনেক সময় উহা উৎকট রোগেও পরিণত হয়। এই রোগকে বলে নিম্‌ফো-ম্যানিয়া। এই রোগীরা পাগল হয়ে পুরুষ খোঁজে। লজ্জা সরম তাদের থাকে না। এই রোগের সুযোগ যে সব দুর্ব্বৃত্তরা নেয় তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এ ছাড়া আর এক প্রকারের যৌনস্পৃহা আছে ইহা নিম্‌ফো-ম্যানিয়ার মত উৎকট না হলেও ক্ষতিকর। এই রোগীরা প্রত্যক্ষভাবে পুরুষ খোঁজে না, পরোক্ষভাবে খোঁজে। নাচার হয়ে তারা প্রার্থনা করে, কোনও পুরুষ তাকে হরণ করুক। এ সম্বন্ধে জনৈক ভদ্রলোকের কাছে একটা গল্প শুনি। গল্পটার মধ্যে কোনও সত্য নাও থাকতে পারে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যটা আমি অস্বীকার করি না।

"সে ছিল কালী মাইতির মেয়ে। বয়স তার ২২ কি ২৩। ১৩ বছর বয়সে সে বিধবা হয়। সাগর পারে সে প্রাতঃকৃত্য করছিল। হঠাৎ ভিন দ্বীপের, দেশী পটুর্গীজ কজন ছোকরা তাকে চেপে ধরে। সে চীৎকার করে, কিন্তু তারা তার মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। তারা তাকে জোর করেই হরণ করে। প্রথমে তারা তাকে তুলে নিয়ে যায় ডি সুজার বাড়ী। সেখান থেকে তারা তাকে সরায় মির্জ্জা পেট্রানের বাড়ী। শেষে কাকদ্বীপের পিলসুজা তাকে নেকা করে। গাঁয়ের ছোকরারা সাড়ে তিন মাস পরে তাকে উদ্ধার করে। মেয়েটা কিন্তু আর ফিরতে চায় না। সে বলে, পিলসুজা তাকে নেকা করেছে, সে খসম ছেড়ে যাবে না। বুড়া মা বাপ মেয়ের পায়ে ধরে কাঁদে। ছোকরার দল বলে—দিদি তেকে আমরা গাঁয়ের লক্ষী করে রাখব্। কিন্তু কোনও ফল হয় না। ছোকরারা তখন যদু মাষ্টারের কাছে যায়। যদু মাষ্টার ছিল মামলার ও সলা পরামর্শে ওস্তাদ। উত্তরে যদু মাষ্টার বলে—বাপু, সমাজে যদি কয়েকজন বখা মেয়ে থাকে ত তাদের ধরে রাখবার জন্ত কয়েকজন বখা ছেলেরও দরকার। একটু moralityর standard কমাও দেখি।" মাষ্টার মশাই আরও বলেন—"তোমরা যদি ওকে একটু ভুলিয়ে রাখতে ত ওর এ সর্ব্বনাশ হত না। গাঁয়ের মেয়ের উপর একটা দরদও তোদের থাকত। বেশী ক্ষতি ওর তোরা নিশ্চই করতিস্ না। আসলে ও ইচ্ছে করেই গিয়েছে বুঝলি।" এর কয়েক দিন পরেই মেয়েটা তার খসমের ঘর থেকে অপহৃত হয়। পূর্ব্বের মতই নাকি সে চেঁচায়। প্রথমে তাকে সরান হয় রাধু মণ্ডলের ঘরে। তার পর কিছুদিন সে হিরুবাগের বাড়ী থাকে। তার পর নিরো দাস তাকে সাগাই বিয়ে করে। পালবাবুদের সাহায্যে পিলসুজা তাকে উদ্ধার করলে সে কিছুতেই ঘোমটা খোলে না। মাথায় তার লাল সিঁদুর। কেঁদে ফেলে সে বলে—বাবে গোসামীর ঘর ছেড়ে, কেন্ যাব আমি। পালবাবু ধমক দেন—পিলসুজা তোর খসম নয়? মেয়েটা উত্তর করে—ভয়ে বলছিলাম। ছুরী মারবে বলছিল তাই।

(ক্রমশঃ)

বিচার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

সরকারী কাজের জন্ত বাংলা ও আসামের সীমান্তে বাসা বাঁধিতে হইয়াছে কিছুদিন। যেখানে আছি—একদিকে সমতল ভূমি, অন্তদিকে পাহাড়ের আবেষ্টনী।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে গারোদের 'চাং'। সুস্থ সবল পাহাড়িয়া নরনারীদের পাহাড়ে ওঠা নামা দেখিতে বেশ লাগে। 'চাং' তাহাদের রাত্রিবাসের জন্ত—দিনের বেলা উহার সহিত তাহাদের সম্পর্ক বেশী নয়। সারাদিন তাহারা পাহাড়ে পাহাড়ে কাঠ কাটিয়া বেড়ায়, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে চাষের ক্ষেত্র তৈয়ারী করে—পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত পরিশ্রমে মায়াকানন সৃষ্টি করে তাহারা।

পাশের সমতল ভূমিতে গাছপালায় ঘেরা অসংখ্য বিচ্ছিন্ন পল্লী। এক একটি পল্লীতে দুই চার ঘর লোকের বাস। পাহাড়ের ধারে নিম্নভূমিতে বহুকাল হইতে বাস যাহাদের—তাহারাও সরকারী বিধিব্যবস্থায় আদিম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। বাড়ীঘর উহাদের পরিচ্ছন্ন—নারীদের অসীম কর্ম্মনিপুণতায় লক্ষ্মীশ্রীকে তাহারা আটকাইয়া রাখিয়াছে। গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের চলাফেরা। তকতকে উঠানের অনেকখানি জুড়িয়া বস্ত্র বুনিবার তাঁত। সারাদিন তাহাদের কাজের অন্ত নাই। চাষের সময় তাহারা ধানগাছ রোপন করে, ধান কাটা হইয়া গেলে ক্ষেত্র হইতে আঁটি বাঁধিয়া ধান লইয়া আসে, ধান ভানিয়া চাউল তৈয়ারী করে, চরকায় সুতা কাটে, তাঁতে কাপড় বোনে—আহার ও বস্ত্রের জন্ত তাহারা পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। পুরুষেরা করে শুধু হল কর্ষণ এবং শস্ত পাকিলে শস্ত কাটার কাজ। আর সব কাজ—মেয়েদের। বৎসরের মধ্যে নয় মাস পুরুষদের বিশ্রাম—ঘরের উঠানে বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাওয়া এবং পাড়ার পুরুষদের সঙ্গে নানা আজগুবি গল্প। ফলে এই সমাজ এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছে—বহুকাল। জীবনীশক্তিহীন পুরুষের পাশে কর্ম্মনিপুণা হাস্তময়ী নারীর সদাসঞ্চরমান গতি যেন অদ্ভুত লাগে।

পাশাপাশি বাস করিতেছে দুই জাতি—গারো ও হাজং। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মিল নাই কোথায়ও—না চেহারায় না ব্যবহারে। নিকটে থাকিয়াও পরস্পরের ছোঁয়াচ তাহারা সাধ্যমত এড়াইয়া আসিয়াছে অদ্ভুতভাবে।

ব্যতিক্রম যে নাই তা নয়। কিন্তু ইহা এত নগণ্য যে তাহার উল্লেখ করা চলে না। তবু এমনি একটা ব্যতিক্রমের বালাই আমি বলিব।

প্রত্যুষে আমার বস্ত্রাবাসের সম্মুখে পদচারণা করিতেছি। শীতের আমেজ দেখা দিয়াছে। গারো পাহাড় ঝাপসা কুয়াসার প্রলেপে নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে—সূর্য্যোদয়ের পর হইতে অল্পে অল্পে তাদের আচ্ছন্নভাব কাটিতেছে যেন। মনে হইতেছে—এই শ্যামাঙ্গী তরুণীটির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—এইবার সে তাহার বহিরাবরণ ফেলিয়া দিয়া যেন উঠিয়া বসিবে।

হৈ হৈ শব্দে চকিত হইয়া পাহাড়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে চাহিলাম। একদল লোক চলিয়াছে পাহাড়ের দিকে। তাহাদের মধ্যে একজনের হাত দড়ি দিয়া বাঁধা—সে নতমুখে চলিয়াছে আর তাহারই পাশে চলিয়াছে একটি যুবতী পাহাড়িয়া রমণী। তাহাদের ঘিরিয়া চলিয়াছে ক্ষুদ্র একটি দল। শুনিলাম—আসামী গ্রেফ্‌তার করিয়া যাওয়া হইতেছে গারো পাহাড়ে বিচারের জন্ত।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত কৌতূহল হইল। আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। দেখিলাম—আসামীর গা ঘেঁসিয়া চলিতেছে যুবতীটি, আর তাহাকে কি যেন বলিতেছে সান্ত্বনা বাক্যের মত। কিন্তু যুবকটি নির্ব্বাক—সে বদ্ধহস্ত অবস্থায় নতমুখে চলিয়াছে।

* * * *

বিচারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলায় বিচারের স্থান। মৃগচর্ম্মাবৃত মোড়ায় বিচারকের আসন—তাহার পাশে আর একটি মোড়ায় 'রাইটারের' বসিবার ব্যবস্থা। বিচারক গ্রামের লস্কর, আমাকে দেখিয়া আর একটি মোড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

বিচার দেখিবার জন্ত অনেক লোক জমিয়াছে—তাহাদের মধ্যে গারো আছে এবং নিম্নভূমিবাসী হাজং আছে। জনতার মধ্যে কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। লস্কর বিচারকের গাম্ভীর্য্য লইয়া জনতার দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার লাঠি উঁচাইয়া হাঁকিল—চোপ্, চোপ্।

বিচারক গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল—আসামী হাজির ?

আসামীকে বিচারকের সম্মুখে আনা হইল—সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণীটিও তাহার পাশে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। বিচারক ভ্রূকুটি করিল।

—বাদী ?

—হাজির হুজুর।—এক বৃদ্ধ পাহাড়িয়া গারো হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল।

লস্কর তাহাকে তাহার অভিযোগ বর্ণনা করিতে আদেশ করিল। রাইটার কাগজ ও পেন্সিল লইয়া অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইল।

বাদীর অভিযোগের মর্ম্ম এই। আসামী দুইদিন পূর্ব্বে 'আন্‌থাংসিআ'র* চেষ্টা করে। টিলার ধারে একটি গাছে চড়িয়া যে ডালে সে বসিয়াছিল তাহাই কাটিতেছিল। তাহার মতলব ছিল এই যে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই ডালের সঙ্গে নীচে গভীর খাতে পড়িয়া যাইবে এবং তাহার জীবনেরও অবসান হইবে।

গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও লস্করের মুখে হাসির আভাস দেখা দিল, কহিল—কোন দুঃখে ও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল ?

---

* আন্‌থাংসিআ—আত্মহত্যা

—দুঃখ কিসের ? ওর তো সুখ হুজুর। ওরা চেয়েছিল আমার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে। ও মরলে আমার মেয়ে নালিশ করতো যে আমিই তার স্বামীকে মেরে ফেলেছি। ওরা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না হুজুর।

আমি বিস্মিত হইলাম—অভিযোগের অভিনবত্ব দেখিয়া। বন্য পার্ব্বত্যজাতির মধ্যেও কি ইহা সম্ভব? নিজের স্ত্রীকে বিধবা করিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা লওয়া—ইহা কি সত্য হইতে পারে? লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—আসামীর দিকে। সে তেমনি মাথা নত করিয়া আছে—আর তাহার স্ত্রী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে বিহ্বল দৃষ্টিতে। অভিযোগ শুনিয়া সে একবার ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাহার অভিযোগকারী পিতার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

লস্কর কহিল—সাক্ষী আছে ?

—আছে হুজুর।......তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইল—তাহারা অভিযোগকারীর কথা সমর্থন করিল।

ইহার পর আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তাহার কিছু বলিবার আছে কিনা। সে কিছু বলিবার আগেই তাহার স্ত্রী তেজের সহিত বলিয়া উঠিল—মিথ্যে কথা হুজুর। আমার বাপের কথা আগাগোড়া মিথ্যা। 'মান্তি'১ সাক্ষী—সব সাজানো। আমার স্বামী নির্দ্দোষ।

জনতার মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি প্রবল হইয়া উঠিল। একজন টিট্‌কারি দিয়া বলিল—ইস্! স্বামীর ওপর দরদ তো খুব। তোর স্বামী—'সাংমা'২ না 'মারাক্'৩?

যুবতী তড়াক করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—মারাক্, মারাক্। আমাকে 'খামা'৪ করে উ 'মারাক্' হইছে—তোদের কিরে তাতে মুখপোড়া?

তাহার কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিচারক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নমুখে জনতার দিকে চাহিল। সর্দ্দার বেত উঁচাইয়া হাঁকিল—চোপ্, চোপ্।

লস্কর পুনরায় আসামীকে কহিল—তোমার কিছু বলার আছে? তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। যে নিজের প্রাণ নিতে চায় তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে।

আসামী একবার মুখ তুলিয়া বিচারকের দিকে চাহিল, কি যেন বলিতে চাহিল—তারপর চারিদিকে একবার চাহিয়া পুনরায় মাথা নত করিল। তাহার স্ত্রী তখন চঞ্চল হইয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া তাহার মুখটি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিল—'খেনা'৫ কিসের—তুই বল্ না। তুই কি আমাকে আমার ঐ দুষমন্ বাপের কাছে রেখে মরতে চেয়েছিলি। আমাকে বিয়ে করার পর থেকেই ও যে কি ব্যাভার করে বল্ না খুলে হুজুরের কাছে।

তথাপি তাহাকে কোনও কথা বলিতে না দেখিয়া সে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ঝাঁজের সহিত বলিল—ইঃ, আমাকে 'খামা' করে 'খ্‌াসা'৬ হইছে মরদের। মুগে 'কুসিক্‌দোংজা'।৭ তুই বা না দেখি আমার ছেড়ে কোথায় যাবি।

তারপর সে হাতজোড় করিয়া বিচারকের দিকে চাহিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই। তাহার স্বামী নির্দ্দোষ—সে কখনও আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে নাই। আর সে নিজের জীবন নষ্ট করিতেই বা যাইবে কেন? তাহাকে বিবাহ করিয়া জাতি দিয়া তাহার স্বামী গারো হইয়াছে বটে—কিন্তু তার অভাব কিসের? তাহার মত 'জিক্'১ সে কোথায় পাইত? তাহার মত 'মুক্‌ছা'২ আর কে তাহাকে দিতে পারিবে? কিন্তু এই হাজং যুবাকে বিবাহ করিবার পর হইতে তাহার বাপের সঙ্গে 'জিগ্রিকা'৩ লাগিয়াই আছে। সে চায়—কি ভাবে তাহাদের জব্দ করিবে। জামাতার বিরুদ্ধে এই অসম্ভব অভিযোগ তাহার বাপের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। ঐ বুড়ার এটুকু বুদ্ধি নাই যে তাহার এই অভিযোগ কেহ বিশ্বাস করিবে না। বাপের সঙ্গে ঝগড়া হয় কয়দিন আগে—তাহাদের জমিজমা লইয়া। তাহার মা নাই—এখন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে। বাপের কাছে সে বলিয়াছিল যখন সে তাহাদের দেখিতে পারে না—তখন তাহারা 'দেন্‌থাং'৪ থাকিবে,—সে জমিজমা অর্দ্ধেক তাহাদের দিয়া দিক। তাহার পিতা তাহাতে স্বীকার করে না—বরং তাহাদের জব্দ করিবার জন্য এই মিথ্যা মামলা সাজাইয়াছে। ঐ বুড়া ভাবে যে তাহার স্বামীকে কোনও রকমে সরাইতে পারিলেই আবার তাহার বিবাহ দিবে। যাহারা তাহারা বাপের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া গেল উহাদের সাথেই গোপনে পরামর্শ করিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়া মামলা করিয়াছে। উহাদের পরামর্শ সে গোপনে শুনিয়াছে। ইহার পরই তাহারা ঐ বুড়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—সর্দ্দাররা আজ ভোরে যাইয়া তাহার স্বামীকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আনিয়াছে।

আমি মুগ্ধ হইয়া এই পাহাড়িয়া যুবতীর আবেগপূর্ণ কথাগুলি শুনিতেছিলাম। প্রতি কথায় স্বামীর প্রতি তাহার অদম্য ভালবাসা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। সে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। বোধ হয় চক্ষুলজ্জা সে এখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই—তাই সে এতগুলি লোকের সম্মুখে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু ঐ যুবতীর অকুণ্ঠিত স্বর, তাহার বিহ্বল দৃষ্টি বুঝাইয়া দেয় যে এই নারী তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইয়াছে—তাহার লজ্জা করিবার আর কিছু নাই।

যুবতীটি অনুনয় করিয়া বলিল—হুজুর, আমরা 'ন্যায্য' বিচার চাই। ঐ বুড়ার 'থলা' মামলার দায় হতে আমাদের উদ্ধার কর হুজুর।

লস্কর মাথা ঝাঁকাইয়া কহিল—তোমার স্বামী যে নির্দ্দোষ তার প্রমাণ?

—প্রমাণ আছে হুজুর। তারপর জনতার মধ্যে একজনকে দেখাইয়া বলিল—আমার সাক্ষী ও। ও বলুক—ওর বাপের সঙ্গে আমার ঐ শয়তান বাপের পরামর্শ হয়েছে কিনা। ওর বাপকে ঐ বুড়া লোভ দেখিয়েছে কিনা। আমার স্বামীকে তাড়িয়ে ওর সাথে আমার বিয়া দেবে এ ষড়যন্ত্র হয়েছে কিনা। বল্ না ভাই থোক্সং, তুই কি জানিস্ বল্।

১ মান্তি—দেবতা। ২ সাংমা। ৩ মারাক্—গারোদের পদবীর মধ্যে দুইটি। ৪ খামা—বিবাহ। ৫ খেনা—ভয়। ৬ খ্‌াসা—লজ্জা। ৭ কুসিক দোংজা—রা' নাই, কথা নাই।

১ জিক্—স্ত্রী। ২ মুক্‌ছা—ভালবাসা। ৩ জিগ্রিকা—ঝগড়া। ৪ দেন্‌থাং—পৃথক।

যুবক সত্যই সাক্ষ্য দিল যে সত্যই এইরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এবং সে তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

গারো যুবকটির সত্য বলিবার স্পৃহা দেখিয়াও আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার কথা শুনিয়া আবার জনতার মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল। সর্দ্দার বেত উঁচাইয়া হাঁকিল—চোপ, চোপ।

বিচারক কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া কি যেন ভাবিল—তার পর মুখ তুলিয়া বলিল—আসামী নির্দ্দোষ। ওর হাতের বাঁধন খোল। তারপর অভিযোগকারীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তোমাকে এই মিথ্যে মামলা আনার জন্ত শাস্তি পেতে হবে। তোমার জরিমানা—তিনকুড়ি দশ টাকা। আর তোমার মেয়ে জামাইকে জমি জায়গার অর্দ্ধেক ভাগ করে দিতে হবে আজই। তুমি বেইমান, মিথ্যাবাদী, শয়তান। তোমার এমন 'ডেঙ্গু' বুদ্ধি যদি আবার দেখি তাহলে আমার এলাকা থেকে দূর করে দেব।

বুঝিলাম—বিচার ঠিকই হইয়াছে। নেহাৎ অপরিপক্ক মাথা লইয়া অবিশ্বাস্ত ঘটনার সৃষ্টি করিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছিল—মনে করিয়াছিলাম হয়তো পাহাড়িয়া বিচারকের বিচারেও তেমনি প্রহসন হইবে। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

যুবতীটির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সহাস্তে কহিল—আমরা যেতে পারি এখন হুজুর?

বিচারকের অনুমতি লইয়া দম্পতি হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম অনেকক্ষণ।

* * * * *

বিচার প্রাঙ্গণ জনশূন্ত হইয়া গেলে লস্কর সহাস্য মুখে কহিল—বিচার দেখলেন আমাদের? আমরা পাহাড়ি বুনো মানুষ—বাঘ, হাতীর সাথে লড়াই করে আমাদের বাঁচতে হয়—আমাদের আর বুদ্ধি কত হবে। আপনাদের মত হাকিম নহি, উকিল মোক্তার নহি—গাছতলায় আমাদের আদালত বসে। এসব দেখে কি আপনাদের মন খুসী হয়? সরকার বাহাদুর তবু অনেক নিয়ম করেছেন আজকাল। ঐ যে 'রাইটার' দেখলেন—ও সাক্ষীর জবানবন্দী লেখে, হুকুম যা হয় তাও লেখে—নথী পাঠাতে হয় ওপরে। এসব হালে আমদানি—আগে মুখে মুখেই আমাদের সব কাজ হ'তো। আমাদের যাদের বিচার করতে হয়—তারা প্রায়ই নিরক্ষর—তাই কিছু লেখাপড়া জানা 'রাইটারে'র ব্যবস্থা। আমাদের হুকুমের বিরুদ্ধে আপিলও চলে কিনা আজকাল। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কহিলাম—বিচার দেখে খুব খুসী হয়েছি লস্কর। বোধ হয় এর ওপরে আর আপীল চলবে না।

লস্কর কহিল—বোধ হয়। এ সবই সাজানো কিনা। আগে কিন্তু এসব বুদ্ধি আমাদের ছিল না। ক্রমে ক্রমে সভ্যের উপর আমাদের আগ্রহ চলে যাচ্ছে—বোধ হয় সভ্য হচ্ছি আমরা। এই বলিয়া সে একবার প্রাণখোলা হাসি হাসিল। তারপর কহিল—আর আমাদের পক্ষে স্থায় বিচার করা সহজ বৈকি। আমার এলাকার প্রত্যেক ঘরের খবর আমার জানা আছে। ঐ যে আসামীকে দেখলেন—ওকে বহুকাল থেকে জানি। এই পাহাড়ের পল্লীতে পল্লীতে দুধ কিনে ও বিক্রি করতে নীচে যায় গোয়ালাদের কাছে। কি করে ঐ মেয়েটির সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল একমাত্র এই বনের দেবতাই বলতে পারেন। কিন্তু ওদের ভালবাসার গতি আমরা জানতাম। আমাদের লজ্জার কথা যে আমাদেরই একজন মেয়ে ঐ অকর্ম্মণ্য জাতের এক ছেলেকে বেছে নিল—জীবনের সঙ্গীরূপে। মেয়েটির বুড়ো বাপকে দোষ ঠিক দেওয়া যায় না। কোন্ বাপই বা এতে মাথা ঠিক রাখতে পারে বলুন দেখি। কিন্তু বিচার তো আমাকে ঠিকই করতে হবে। মিথ্যা তো কিছুতেই চলতে পারে না। তাছাড়া, একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে—জিত তো আমাদেরই। স্বেচ্ছায় জাত দিয়েছে আমাদেরই মেয়ের জন্ত অন্ত জাতের ছেলে—যে জাতকে আমরা চিরকাল ঘেন্না করে এসেছি। সে তার ঘর বাড়ী, সমাজ, বাপ মা, ভাই বোন সব ত্যাগ করেছে আমাদের ঐ মেয়েটির জন্ত। আমাদের জিত হয়নি আপনি বলতে চান্?

আমি তাহার কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম—প্রেমের দেবতার খেলা শুধু সভ্য সমাজেই চলতি নয়—অবাধ মুক্ত জীবন যাহাদের তাহাদের সঙ্গেও তাঁর কৌতুক ক্রীড়ার অন্ত নাই। তবে সভ্য সমাজে প্রেমের ব্যাপারে যে লুকোচুরি চলিতে দেখে, যে গ্রন্থি সহজ জীবনকে জটিল করিয়া তোলে—মুক্ত সমাজে বোধ হয় তাহারই অভাব। ঐ মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে প্রেমের সহজ উদার পথ বাছিয়া লইয়াছে—প্রেমকে সে ধন্ত করিয়াছে। জানি না প্রেমের দেবতা পরে উহাদের জীবনে আবার কি খেলা খেলিবেন। কোনও দিন তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবেন কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম—তাহাতে ঐ মেয়েটির কুণ্ঠাহীন প্রেমের কাছে নত না হইয়া উপায় দেখিলাম না। প্রার্থনা করিলাম—উহারা সুখী হোক, জীবন উহাদের সার্থক হোক।

নব জীবনের নূতন গান

শ্রীসুভদ্রা রায় বি-এ

আলোর জোয়ারে এসো হে নূতন
প্রাণহীনে তুমি দাও গো প্রাণ,
বিগত দিনের ব্যথা ও বেদনা
করে দাও তুমি তাহারে ম্লান;

ঘুচাও হে দেব! মানুষ জাতির
শাসন-শোষণ কালিমা যত
নূতন মন্ত্রে গাও হে আজিকে
নব জীবনের নূতন গান।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

(৮)

'ইণ্ডিয়ান লীগ' ও 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সভায় পরিণত হইলে কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক নেতা একটি সার্ব্বজনীন সভা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ

শিশিরকুমার ঘোষ

আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক সভা স্থাপন করিলেন। কালীমোহন দাশ ও যোগেশচন্দ্র দত্ত এই সভার সম্পাদক এবং শিশির-কুমার উহার সহকারী সম্পাদক হন। কয়েক মাস পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে

আনন্দমোহন বসু

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপন করেন, আনন্দমোহন বসু উহার সম্পাদক এবং সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহকারী হন। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা অনেক ছাত্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র একটী গৃহে—যাহার অবস্থা ইন্দ্রনাথের ভাষায়—টানা পাখার "দড়ি আগে ছিঁড়ে কিম্বা কড়ি আগে পড়ে,"—তাহাতে যে সভার অধিবেশন হইত তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট বা প্রবীণ দেশবাসীর নিকট প্রথমে তেমন প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। দুইটী সভাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ন্যায় 'ইণ্ডিয়ান' বা 'ভারতীয়' নাম গ্রহণ করিলেও উহাতে ভিন্ন প্রদেশবাসীরা বেশী যোগদান করেন নাই ও উহার প্রভাবও সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "ইণ্ডিয়ান লীগ বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানটীর প্রাণ ছিলেন।" ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনও অনেক কার্য করিয়াছিল, তন্মধ্যে, বোধ হয়, সর্ব্বপ্রধান কার্য্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার ওজস্বিনী ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার দ্বারা নবীনগণকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। আর একটি কায উল্লেখযোগ্য—সিভিল সার্ভিসের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন এবং লালমোহন ঘোষকে ইংলণ্ডে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ। লালমোহনের বাগ্মিতায় জন ব্রাইট প্রমুখ বাগ্মীরাও বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং এদেশে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আর একবার লালমোহনকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন এবং তৎকালে লালমোহন উদারনীতিক দলের পক্ষ হইতে পার্লিয়া-মেণ্টে সদস্যপদপ্রার্থী হন। মহাত্মা গ্ল্যাডষ্টোন তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন

লালমোহন ঘোষ

কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আইরিশ ভোট তাঁহার প্রতিকূল হওয়ায় তিনি বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র তীক্ষবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত সভায় যোগদান করা অসম্ভব ছিল। তিনি যশের কাঙালী হইয়া 'কথা পেঁথে শুধু নিতে করতালি' সাধারণ্যে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তৎসময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার রূপে তিনি জানিতেন কখন কাহার নিকট কি ভাবে বলিলে সুফল ফলিবে। তিনি য়ুরোপীয় ও দেশীয় সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতেন এবং ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি জানিতেন কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী এবং রাজপ্রতিনিধির আবাসস্থান হইলেও, স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির মত, যতই প্রভাবশালী ব্যক্তির মত হউক না কেন, কখনও বহু ধর্ম্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবাসীর মত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। যতক্ষণ না ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হইবে, যতদিন না ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া সকলে একতার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, ততক্ষণ

আবেদন নিবেদন সমস্তই বিফল হইবে। ইংলণ্ডে তিনি কয়েকজন উদারহৃদয় ইংরাজের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন সত্য ও ন্যায় একদিন জয়যুক্ত হইবে। তিনি সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যখন যে কোন কারণেই হউক না কেন, সমগ্র দেশবাসী একতার বন্ধনে মিলিত হইবে এবং এই জন্ত তিনি কলিকাতার কোন রাজনীতিক সভায় উৎসাহসহকারে যোগদান করেন নাই। শীঘ্রই এই শুভযোগের পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হইল।

উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্লাডষ্টোন

লর্ড লিটনের আমলে আফগান যুদ্ধ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, । আইন ঘোষণা প্রভৃতিতে দেশে অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি
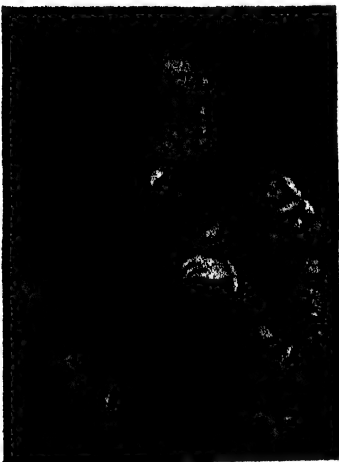
মার্কুইস অব রিপণ

হইয়াছিল। ইংলণ্ডে উদারনীতিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি হইলে যখন পুণ্যস্মৃতি উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী পদে বৃত হইলেন তখন তিনি উদার-হৃদয় লর্ড রিপণকে ভারতে রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিলেন। মার্কুইস অব রিপণের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ রাজপ্রতিনিধি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার শাসনকালে আফগানিস্থানে লর্ড লিটন কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তি পুনঃ সংস্থাপিত হয়, দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদত্ত হয়, শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা-বিস্তারের পথ প্রসারিত হয় ও স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। তিনিই মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা বাণী অনুসারে রাজকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে পার্থক্য কার্য্যতঃ দূরীকৃত করিয়া জজ রমেশচন্দ্র মিত্রকে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই বিচার বিষয়ে সাদা কালার পার্থক্য দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং য়ুরোপীয়গণের নিকট নিন্দা ও অপমানের ভয়ে ভীত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'কালা আইন'

যে সকল য়ুরোপীয় এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের সাধু সংকল্প লইয়া 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেন পুর্ব্বে তাঁহাদিগকে বিচার করিবার অধিকার দেশীয় বিচারপতিগণের ছিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে—সেই স্বর্ণ যুগে—যখন ঘুষ খাইয়া আমলারাই যাহা ইচ্ছা করিয়া এবং বিচারকরা সহি করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন—তখন মফঃস্বলে দেশীয়গণ কিরূপ বিচার পাইতেন তাহা পুলিশ কমিশনের সাক্ষ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক দেওয়ানী মোকদ্দমায় এই সকল য়ুরোপীয়কে মুন্সেফ ব্যতীত অন্যান্য বিচারকগণের বিচারাধীন করেন। সেই স্বর্ণ যুগের সুখের দিনের কথা স্মরণ করিয়া পরবর্ত্তী যুগের একজন সাহিত্য-রসিক য়ুরোপীয় সিভিলিয়ান আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

'Oh ! for the p lmy days, the days of old !
When Writers revelled in barbaric gold ;
When each auspicious smile secured a gem
From Merchant's store or Raja's diadem ;
When 'neath the pankha frill the Court reclined ;
When Amlah wrote and Judges only signed !'

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদিগকে মুন্সেফদেরও বিচারাধীন করা হয়। মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে কয় নামক কোন ব্রিটিশ বালক একটি বিলে ৪৲ স্থলে ৪০৲ টাকা বসাইয়াছিল বলিয়া সুপ্রীম কোর্টে তাহাকে বিচারের জন্ত আনা হয় এবং মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্ত মীরাটের অনেক রাজকর্ম্মচারীকে কলিকাতায় আনাইতে হয়। ইহা দেখিয়া তদানীন্তন ব্যবস্থাসচিব পুণ্যশ্লোক জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে ব্রিটিশ প্রজাগণকে বিচার করিবার কিছু ক্ষমতা মফঃস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে প্রদান করিবার জন্ত কয়েকটি আইনের খসড়া করেন, উহা অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানগণ 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' নামে অভিহিত করেন এবং উহা যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয় তজ্জন্ত প্রবল আন্দোলন করেন। বেথুনকে অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানগণ অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিলেন 'ভারতবর্ষের ক্রিমহিলার' রামগোপাল ঘোষ বেথুনের ব্ল্যাক অ্যাক্ট সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক লিখেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে য়ুরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচার্যাল এণ্ড হর্টিকালচার্যাল সোসাইটীর সহকারী সভাপতির পদ হইতে অপসারিত করেন। এই ঘটনায় বিরক্ত হইয়া মিষ্টার (পরে বাঙ্গালার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর) সিসিল বীডন সদস্য পদ ত্যাগ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে

মিঃ পিকক পুনরায় য়ুরোপীয়গণকে কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারী মোকদ্দমায় দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণের বিচারাধীনে আনিবার প্রয়াস পান। সেবারেও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছিল। দেশীয়গণ কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা জর্জ্জ টমসন তখন দ্বিতীয়বার ভারতে আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতার তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাটীতে অতিথি ছিলেন। তিনি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র ও প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন। ইংলিশম্যানের সম্পাদক কব্ হ্যারী লিখিয়াছিলেন যে "চারিজন মিত্র উক্ত দিনটীতে জয়লাভ করিয়াছেন।" রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতার কোনও স্থানে

ড্রিংকওয়াটার বেথুন

তিনি "শ্রীবৃদ্ধিকারী"দের যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে বে-আইনী করিয়া তাঁহাকে য়ুরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফটোগ্রাফিক সোসাইটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, যদিও সার্ভেয়ার-জেনারেল মেজর থুলিয়ার, একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল এটকিন্সন প্রভৃতি কতিপয় উচ্চপদস্থ সদস্য রাজেন্দ্রলালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মেজর থুলিয়ার সভার কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ স্বীয় সদস্যপদ ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটরা (কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে) জাষ্টিস অব দি পীসের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন এবং য়ুরোপীয় আসামীরও বিচার করিতে পারিতেন। কিন্তু মফঃস্বলের দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটরা পারিতেন না। কিশোরীচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথমে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মোকদ্দমায় য়ুরোপীয় ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া তিনি পুলিস কমিশনারের বিরাগভাজন হন এবং রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হন।*

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ কর্ত্তৃক এই সকল আইন Black Acts বা "কালা আইন" নামে অভিহিত হইলেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ যথার্থই বলিয়াছিলেন উহা 'ধলা আইন' ("White Act miscalled Black")

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আইন সংস্কারের চেষ্টা হয়।

ক্রমশঃ

* বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত 'কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষার পড়া

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

সকাল বেলা। কল্‌কাতার এক রাজপথের পাশে একটি বাড়ির নিচের তলার ঘরে একটি ছেলে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়্‌ছে। বার্ষিক পরীক্ষা এসে পড়েছে, তাই গৃহশিক্ষকের আসার আগেই সে নিজে-নিজে বাংলা সাহিত্যের পড়া করছে। একটি পদ্যের এক অংশ সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে—

আমি যেন হই দয়াবান ;
কিছু না থাকিলে মোর
অধরের হাসিটুকু
কাঙালেরে করি যেন দান।

তার পর পদ্যাংশটুকুর গদ্য করছে—

অ্যাঁ—আমি যেন দয়াবান্ হই। অ্যাঁ—অ্যা—আমার কিছুই না থাকিলে যেন অ্যাঁ—অ্যা—অধরের হাসিটুকু অ্যাঁ—('কাঙালেরে' গদ্যে 'কাঙালকে')—অ্যাঁ—কাঙালকে দান করি—ই—ই—ই।

তারপরে ব্যাখ্যা—

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে হে ভগবান, তোমার কৃপায় আমি যেন উঁউম্—দয়াবান মানে কৃপাশীল মানে দয়ালু হো-ও-ই। অ্যাঁ—ভিখারি আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে উঁম্—আমার যদি কিছুই মানে দান করিবার মতো কোনো জিনিসই না থাকে, তবে আমি যেন অ্যাঁ—অ্যা—অধরের মানে মুখের হাসিটুকুও অন্তত কাঙালেরে মানে সেই ভিখারিকে দান করি মানে দিই-ই। অর্থাৎ তাহার সংগে যেন অন্তত হাসিয়া কথা বলি—মানে তাহাকে কড়া কথা না বলিয়া যেন হাসিমুখেই বলি যে ভাই আমার কিছুই দেওয়ার মানে দান করিবার ক্ষমতা মানে শক্তি না-আ-ই। (ক্লাস্-এ স্যার এরকমই ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, ছেলেটির ঠিক মনে আছে। পরীক্ষায় যদি এটা এসে যায় তবে ঠিক এরকম লিখে দিলে দশের মধ্যে অন্তত ছয় মারে কে ?)

বাইরে রাস্তায় একজন ভিখারি এসে জানালার ধারে দাঁড়াল। তার শীর্ণ দেহ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, মাথায় ধুলিরুক্ষ বড় বড় চুল, পরণে মাটিবর্ণ শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া। অতি দীন কণ্ঠে সে বল্‌লে,—খোকাবাবু, একটা পয়সা দাও বাবু।

—আঃ !—খোকাবাবুর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। বার্ষিক পরীক্ষার বাকি আছে মাত্র চারটি দিন। সকালবেলা পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বসেছে, তার কি যো আছে ? কোত্থেকে এক আপদ এসে জুটেছে। সে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল,—হবে না—হবে না, আগে যাও।

—দাও একটা পয়সা বাবা।—ভিখারি আবার মিনতি করে বলল,—দু'দিন কিছু খাইনি বাবা গো।

—ধেত্তোর !—বলে ছেলেটি উঠে এসে দড়াম্ করে জানালার কবাট বন্ধ করে দিল। তারপর আবার নিজের জায়গায় গিয়ে পরীক্ষার পড়া করতে লাগল,—আমি যেন হই দয়াবান।—

পঞ্চু ভ্যাণ্ডার

শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম্-এ

মাসের শেষে এক একদিন কোশ পাঁচেক রাস্তা হাঁটিয়া পঞ্চু বিকালের দিকে বাড়ী গিয়া উঠিত। গ্রীষ্মের রোদে পুড়িয়া পঞ্চুর চোখ মুখ লাল, রাগে যশোদা অনেকক্ষণ কথা বলিত না। পরে কাছে ডাকিয়া বসাইত। তারপর তামাক টানিতে টানিতে ধীরে ধীরে সাহাদের পাটের কারবারে লাল হইয়া যাওয়ার ইতিহাসটুকু আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলিয়া যাইত।

পঞ্চু শুনিয়া যাইত। সারাদিন পথ হাঁটার ক্লান্তিতে ঘুম আসে, যশোদা দুইবার ডাকিয়া গিয়াছে।

যশোদার সহিত প্রথম আলাপ একটু বিচিত্র ধরণের হইত।

—ভাত বাড়া আছে। খেয়ে দেয়ে কালিপদকে নিয়ে শুয়ো—

—কেন তুমি যাও কোথা?

—গয়লাদের পুকুরে।

—এত রাতে পুকুরে?

—মরতে।

মোটা একগাছা দড়ি আনিয়া পঞ্চুকে দিত যশোদা।

—হাত দুটো বাঁধো।

রাগে যশোদার চোখে যেন আগুন ছোটে।

—খবরদার, যদি আমার পেছন পেছন যাবে—কেলেঙ্কারী হবে।

পঞ্চু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

—আর দেখ, কাল সকালে যখন লাশ ভেসে উঠবে, খবরদার যদি মুখে আগুন দাও—

কত কাণ্ড বাধাইত যশোদা। অথচ সেই পলাশগঞ্জের চাকুরি কত সহজেই গেল। সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

পুকুরের ওপাশের ঘাটে নামে কে? পঞ্চু বালতির উপর রেকাবি রাখিয়া গেলাস ধুইয়া তুলিতেছিল।

—পঞ্চুদা, পঞ্চুদা—ও পঞ্চুদা—

মাষ্টারমশায়ের মেয়ে আরতি। হাতে একটা চুবড়ি।

কিগো ছোটমা—তুমি এ ঘাটে—

মেয়েরা সাধারণতঃ এ পুকুরে নামে না—বিশেষতঃ ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীর।

—পিসিমা এসেছেন। পিসিমা বলেন কি জান পঞ্চুদা—ঘাটে না ধুলে শাক ধোয়া হয় না—

—তাই ব'লে তুমি এলে কেন ছোটমা—পীতু—

—তোমার পীতু কাজে আসেনি—মার জ্বর এসেছে—

ছোড়দা বাজারে—কে আসবে শুনি?

—তুমি আর এসো না মা—বরং আমাদের একটা খবর—

—ভালকথা—ও পঞ্চুদা—কদিন ধরে মা তোমাকে খুঁজেছেন এখখুনি একবার এসো—বড্ড দরকার—

—আমি ত সদাই হাজির—কি দরকার বল ত মা—

অত্যন্ত শান্ত স্বভাব মেয়েটির। পঞ্চুর কথায় এবার মুখ নিচু করিয়া হাসে।

—দরকার আমি জানিনা-জানিনা-জানিনা—

হাসিতে হাসিতে মেয়েটি উঠিয়া যায়। পঞ্চু যেন কতকটা আন্দাজ করিতে পারে।

মাষ্টারমশায় মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। সেই সংক্রান্ত হয়ত কিছু।

মেয়েটির বয়স খুবই কম। মাষ্টারমশায় একটু ব্যস্ত-বাগীশলোক। মায়ার সমবয়সী হইবে-না, মায়ার চেয়ে দু' এক বছরের বড়। একটা হিসাব লইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে পঞ্চু।

—এই যে পঞ্চু।

টিকেট কালেক্টর হরেনবাবু।

পঞ্চু বালতি নামাইয়া হাত যোড় করিয়া নমস্কার করে।

—সরস্বতী পুজোটা করে ফেলা যাক—কি বল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনারা লাগলেই হবে বাবু—

—তোমরা আছ কজন?

—আজ্ঞে আমরা দশজন আর বিঁড়ি ভ্যাণ্ডার আটজন—

—সব ব'লে দিও—এবার বেশী বেশী চাঁদা—

পঞ্চু আসিয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছে হরেনবাবুকে। লোকটা অত্যন্ত কুট প্রকৃতির। এমন লোক নাই যাহার সহিত ঝগড়া না বাধে হরেনবাবুর।

অনর্থক ঝগড়া বিবাদ করিয়া মানুষ কি সুখ পায়? টিকিট-কালেক্টর ভ্যাণ্ডারের উপর একটু প্রভুত্ব ফলাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? যাহার যেটুকু প্রাপ্য—তাছাড়া মানুষের কাছে একটু বিনীত হইয়া থাকা—

—নরেন যাও কোথা?

পান বিঁড়ি ভ্যাণ্ডার নরেন। ভ্যাণ্ডারদলের ভিতর সর্বাপেক্ষা ছোট নরেন। সুন্দর, সুশ্রী চেহারা—বছরখানেক কাজে লাগিয়াছে।

নরেন আমতা আমতা করে।

—যাব একটু বাজারের দিকে—

একটু লাজুক বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান বেশ।

—এত বেলায় বাজারে? নেয়ে খেয়ে নাও—প্লাটফরমে বসলে বিক্রী কিছু না কিছু হয়ই। খাটবার বয়েস তোমাদের—রোদে হট্ হট্ ক'রে ঘুরে—

—না একটু কাজ আছে—

নম্র স্বভাব। মুখ তুলিয়া কথা বলেনা পঞ্চুর সঙ্গে। ধবধবে রং। সুন্দর স্বাস্থ্য। পঞ্চু ভাল করিয়া দেখে ছেলেটিকে। মায়ার মুখখানি মনে পড়ে।

মায়ার কথা মনে পড়ে: বাবা তুমি চ'লে গেলে মা শুধু মারে আমাকে—

ভোঁদড় কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পঞ্চুর গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে, বাবা—বাবা—আমাকেও মারে—

—শরীরের দিকে একটু নজর রেখ বাবাজী—সময়মত নাওয়া খাওয়াটা—

—না—চুল কাট্‌তে হবে—তাই বাজারের দিকে—

—ও—তা বেশ—বেশী দেরী টেরী—

মাথা নাড়িয়া নরেন চলিয়া যায়।

চুল কাটিতে বাজার পর্য্যন্ত না গেলেও চলে। ঘাড় কামাইয়া চুল ছাঁটার কি যে ফ্যাসান উঠিয়াছে। শিশির, নিতাই, হরেকেষ্ট দুদিন অন্তর বাজারে দৌড়ায়। নরেনকে বারণ করিলেও হইত।

শালপাতা ফুরাইয়াছে।

—ও জগবন্ধু—খানকয়েক পাতা যদি দাও ভাই—এবেলা আর বাজারে যাওয়া হয় না—

পাতাগুলি দুই হাতে মুড়িয়া ছোটবড় ঠোঙা তৈরী করে পঙ্কু।

এ মাসের শেষে একবার বাড়ী না গেলে নয়। নরেনকেও আগে বলিয়া রাখিতে হইবে। মায়ার সঙ্গে চমৎকার মানাইবে—তবুও যশোদাকে একবার দেখানো দরকার। তারপর একদিন নরেনের মায়ের সঙ্গে গিয়া দেখা করা—লক্ষ্মীপুর লোকালে গেলে সারাদিন নষ্ট—

নরেন—নরেনের আপত্তি আছে নাকি কিছু? মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই বটে। না না ছেলেটি ভাল। কোন্ ক্লাস পর্য্যন্ত যেন পড়িয়াছে। ছোট নোটবুকখানায় ইংরাজীতে নাম লিখিয়াছে। পঙ্কু একদিন লুকাইয়া দেখিয়া লইয়াছে—নরেন জানে না।

কি দরকার ওর নবগাঁ ষ্টেশনে পচিয়া মরা। নরেনের জন্য ভাবনা কিছু নাই—নিজের উন্নতির পথ সে নিজেই করিয়া লইবে। ভাবনা বরং খানিকটা কালিপদর জন্য। পড়াশুনা তো করেই না। গত চিঠিতে যশোদা লিখিয়াছিল, প্রসন্ন ঠাকুরের যাত্রাদলে বাঁশী বাজানো শিখিতেছে।

অবশ্য মাষ্টার মশায় একটু ব্যবস্থা করিলে রেলের ভিতর একটু কাজ করিয়া দিতে পারেন। একদিন বলিয়া রাখিয়াছে পঙ্কু—আর একদিন ভাল করিয়া বলিতে হইবে। কালিপদকে এবার আনিয়া মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে রাখলে কেমন হয়? কাজকর্ম করিবে, থাকিবে।

নিতাই আসিয়া খবর দেয়।

—পঙ্কুদা মহাজন ডাকে তোমায়—

কেন রে?

—কি হিসেব নিয়ে কি গণ্ডগোল।

থার্টিকোর ডাউনের ঘণ্টা।

—হ্যাঁ পঙ্কু, ছোটবাবুর বাড়ীর দিকে কাঁদে কে বলত?

—কই বাবু আমি তো শুনিনি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

বিঁড়ি ভ্যাণ্ডার তারক আসিয়া খবর দিল ছোটবাবুর বৌ মারা গেছে।

—কই ছোটবাবুর বাড়ীতে অসুখ—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—কলকাতা হাঁসপাতালে ছেল—

—আহা বড্ড নরম লোক ছোটবাবু—

—ওঃ কতকগুলো ছেলেমেয়ে—

গাড়ী দেখা যায়। ভিড় ভাঙ্গে। বাক্স কাঁধে করে পঙ্কু।

—খাবার—খাবার গরম—

—পান—বিঁড়ি পান—

এক যায়গায় বাক্স নামাইয়া কিছু বেচিতে না বেচিতে আর এক যায়গায় ডাক পড়ে। বেলা বেশী হইয়া গিয়াছে বলিয়াই হয়ত এ ট্রেণে বেশ বিক্রী।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পাশের গাড়ীর একটি মেয়েকে পঙ্কু দেখিতেছে। কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে। চেনা মুখ। কোথায় দেখিয়াছে পঙ্কু ভাবিয়া পায় না।

—সিঙ্গাড়া—সন্দেশ গরম—

—পঙ্কুদাদা ও পঙ্কুদাদা—

পঙ্কু আগাইয়া যায়। কই পঙ্কু এখনও চিনিতে পারিতেছে না।

—পঙ্কুদাদা ভাল আছ?

হ্যাঁ, এবার চেনে পঙ্কু। রতনপুরের নিবারণ চাটুজ্যের মেয়ে। পলাশগঞ্জের পাটের আড়তের পর নিবারণ চাটুজ্যের খাবারের দোকানে ঢোকে পঙ্কু।

রতনপুর অঞ্চলে নিবারণ চাটুজ্যে তখন মস্ত বড় ব্যবসায়ী। পাঁচ সাত রকমের কারবার চালায়। প্রায় বছর দেড়েক পঙ্কু দোকানে কাজ করে।

পুলের মুখে ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবলের পাশে নিবারণ চাটুজ্যের খাবারের দোকানখানি সহসা মনে পড়িয়া যায়। বলাই, ভরত, তিনু ঠাকুর, বংশী ঠাকুর—সরস্বতী পূজার পূর্বে কদমা বিরখণ্ডী গাড়ীতে আসিত, বুড়ো নিত্যানন্দের কথাও মনে পড়ে। দোকানের সামান্য কর্মচারী বই ত নয়—কিন্তু নিবারণবাবুর বউএর স্নেহ যত্ন পঙ্কু কোনও দিন ভুলিতে পারিবে?

—দিদিমণি তোমায় দেখছি, কিন্তু চিনছি না—বয়েস হয়েছে—বাবু কেমন আছেন?

—ভাল—তুমি রতনপুরের দিকে যাও না পঙ্কুদাদা?

—না যাওয়া হয় না—তোমার ছেলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়। পঙ্কুর সহসা মনে হয় গাড়ীতে উঠিয়া মাকে প্রণাম করা উচিত ছিল।

—দিদিমণি—দিদিমণি—মাকে একবার এদিকে ডাক—একটা কথা কই—

গাড়ীর সহিত পঙ্কু দৌড়ায়।

—মা? মা তো অনেক দিন মারা গেছেন—

পঙ্কু থামিয়া যায়। গলা বাড়াইয়া মেয়েটি আরও কথা বলে পঙ্কুকে। শোনা যায় না।

ষ্টেশন আবার নিস্তব্ধ হইয়া আসে। মাদুর বিছাইয়া পঙ্কু বসিয়া পড়ে। নাওয়া খাওয়া সারিতে হইবে। প্লাটফর্মের পাশে রোদে কম্বল মুড়ি দিয়াছে শিশির। জ্বর আসিতেছে নিশ্চয়ই।

ইঞ্জিন-বিহীন খানচারেক মালগাড়ী গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। শালপাতার একটা বড় ঠোঙা লইয়া শীর্ণ দুটি কুকুরে ঝগড়া বাধাইয়াছে। ইঞ্জিনে জল দেওয়ার উঁচু কলটা হইতে হুড়হুড় করিয়া জল পড়িয়া যায়।

রতনপুরের খাবারের দোকান। ওঃ খাবারের দোকানে লাভ

বটে—তবুও খারাপ জিনিষ দিতে কেউ ছাড়ে না—দুর্গন্ধ কলের তেল, সাতবাসি চিনির রস, পোকা ধরা ময়দা—

ব্যবসাদারের প্রকৃতি। ইচ্ছা থাকিলেই হয়। পঞ্চুর অবসর স্বপ্ন। রতনপুরে রেল রাস্তার উপর একখানি পরিচ্ছন্ন খাবারের দোকান। টাটকা ছানা—কলু বাড়ীর তেল—এক নম্বর ময়দা। কালিপদ কেনা বেচা করে—ভিছু ঠাকুরকেও টানিয়া লওয়া চলে। নরেন যদি রাজি হয়। খরিদ্দার আসে—দরজা খোলা—তেল দেখুন, ঘি দেখুন, ময়দা দেখুন। বসিয়া খাইবার জন্ত একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার—কর্পূর দেওয়া ভাল জল। খাওয়ার শেষে ভাল পান একটি দিলে কেমন হয়?

কে একটা লোক দুপুরের গাড়ী ফেল করিয়া কাঠের ভাঙ্গা বেঞ্চিটাতে মাথায় হাত দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হরেকেষ্ট একটি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ জমাইয়াছে। রানিং এর উড়িয়া ঠাকুর দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে প্লাটফর্মের উপর খানিকটা পানের পিক ফেলিয়া গেল।

পঞ্চু উঠিয়া পড়ে।

রোদটুকু ছাড়িয়া যাইতে বেশ কষ্ট হয়। অদূরে একটি পারাবত দম্পতি গভীর আলাপে মুখর।

ছোটবাবুর বাড়ীর কান্নার শব্দ এখন স্পষ্ট শোনা যায়। ফাষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম হইতে সহসা উচ্চ হাসির রোল ভাসিয়া আসে।

—চিনলে মেয়েটাকে পঞ্চুদা?

—না।

—কেন বাজারের কিরণকে চিনতে না—ঐ যে নগেন ডাক্তার যাকে নিয়ে দিনকতক—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—

—ঐ সেই—আমাকে খুব চেনে—ওঃ দেমাক কি এখন, কলকাতায় বড় খদ্দের ধরেছে।

পঞ্চুর সহসা মনে পড়িয়া যায়, নরেন কাল অনেক রাত্রে হরেকেষ্টর সহিত বাজার হইতে ফিরিয়াছে। নরেনকে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।

রৌদ্রোজ্জ্বল রেল লাইনের উপর দিয়া পঞ্চু, হরেকেষ্ট ঘরের দিকে যায়। যতদূর দৃষ্টি যায় লাইন গিয়াছে—এই লাইনই পঞ্চুর গাঁয়ের পাশ দিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের জানালা খুলিয়া তিলডলা ষ্টেশনের সিগন্তাল দেখা যায়। হু হু করিয়া বাতাস বহিয়া যায়। হরেকেষ্ট গলা ছাড়িয়া গান ধরে—

বিদেশী বন্ধু লাগি রে—
নয়ন আমার দিবানিশি ঝুরে।

—ঐ কিরণ—শুনছো পঞ্চুদা—

—হুঁ।

—এক একদিন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত। কপাল —কাচা খুলতে দেরী হয় তো কপাল খুলতে দেরী হয় না—

বিদেশী বন্ধু লাগি রে—

খাওয়া দাওয়া সারিয়া মহাজনের হিসাব মিটাইয়া আসিতে আসিতে এক্সপ্রেসের টাইম হইয়া যায়।

শীতের বেলা। এক্সপ্রেস ছাড়িয়া যাইতে যাইতে আবার সন্ধ্যা হইয়া আসে।

বাবু চুল কাটিয়া চমৎকার দেখাইতেছে নরেনকে—পঞ্চু দূর হইতে দেখে। কোঁচার আগা ফুলের মত করিয়া নীল রঙের সার্টের পকেটে গোঁজা—ইহার পর নরেন এক একদিন সিগারেট মুখে দিয়া কাহারও সহিত যখন কথা বলে—বিঁড়ি ভ্যাণ্ডার বলিয়া মনে হয়না নরেনকে।

এক্সপ্রেসের গার্ড দত্ত সাহেবকে নরেনের জন্ত ধরিয়া পড়িলে কেমন হয়? নরেনের জন্ত আর ভাবনা কি, নিজের ভবিষ্যত সে নিজে গড়িয়া তুলিবে।

—বেয়াই।

—বাজারে আজ আর যাওয়া হয়না বেয়াই—আজ আবার রান্নার ভ্যাজাল আছে—

পরেশ শুধু হাসে। কিছু না বলিতেই বেয়াই বুঝিয়াছে।

ছোটবাবু ষ্টেশনে আসিয়া বুকিং আফিসে বসিয়াছেন। মাষ্টারমশায় হইতে হিন্দুস্থানী পোর্টার গোপালরাম পর্য্যন্ত সাত আটজনে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। গোষ্ঠ, নিতাই, জগবন্ধু দৌড়াইয়া গেল।

লক্ষ্মীপুর প্যাসেঞ্জার দেখিয়া পঞ্চু উঠিয়া পড়ে। কলিকাতার গাড়ীখানায় কিছু বিক্রী হয় বটে, কিন্তু বেশী পরিশ্রম করিয়া বাঁধিতে গেলে শুধু ঘুম আসে, বড় কষ্ট হয়।

বিয়ের দিন আজ। দু'গাড়ী বোঝাই বর ও বরযাত্রী আসিয়া পৌঁছাইল, সঙ্গে নগেন কামারের ব্যাঁকপাই বাজনা।

ছোটবাবু বাসার দিকে উঠিয়া গেলেন।

প্লাটফরমের সিঁড়িতে জ্যোৎস্নায় বসিয়া নগেন চোখ বুঁজিয়া বাঁশীতে ফুঁ দেয়। এমন বাজায় নরেন। চাঁদের আলোয়, বাঁশীর সুরে, বরযাত্রীর আনন্দ কোলাহলে শীতের সন্ধ্যা মশ্‌গুল্‌ হইয়া উঠে।

আশ্চর্য্য। পঞ্চুর চোখে জল আসে। নগেন বড় করুণ সুরে বাজায়।

চাদর গায়ে দিয়া ছোট মাদুরের উপর জড়সড় হইয়া নরেন ঘুমাইয়াপড়িয়াছে। ছেলেমানুষ। এখনও পরিশ্রমে অভ্যস্ত হয় নাই।

জ্যোৎস্না আসিয়া মুখে পড়িয়াছে নরেনের। অঘোরে ঘুমাইতেছে। ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না ডাকিলেও নয়।

—নরেন—ও নরেন—

ঘুম ভাঙ্গে না। নরেনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে স্বপ্নে ডুবিয়া যায় পঞ্চু।

সারাদিন উপবাস ও পরিশ্রমের পর বিবাহের পূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নরেন। অনেক রাতে লগ্ন।

সাজিয়া গুজিয়া মায়া কোথায় লুকাইল? বিবাহের পূর্ব্বে নরেনকে দেখিতে নাই মায়ার? তাহা হউক, লুকাইয়া একবার দেখিয়া যাক্ নরেনকে।

নরেনের নিপুণ অঙ্গুলি বাঁশীর পরিচিত রন্ধ্রপথে সঞ্চরণ করিয়া ফেরে।

আনন্দ ডাকিয়া যায়।

—আঁচ উঠে গেছে পঞ্চুদা'।

গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টের চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীশম্ভুনাথ শীল

অধুনা শিল্পীদের অর্থসঙ্কটের সুযোগ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ধনতন্ত্রের 'অক্টোপাশ' মানবজাতির কৃষ্টি ও সভ্যতার অন্যতম বাহন ললিতকলাকে আত্মসাৎ করিতে বদ্ধপরিকর। অর্থের বিরাট অঙ্কে অভাবগ্রস্ত শিল্পীর মোহ হওয়া বিচিত্র নয় তবে তাঁহারা যেন নিজস্ব বৃত্তিকে খর্ব না করেন। ছাত্রশিল্পীদের বিশেষ করিয়া এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই মহান উদ্দেশ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টা বর্তমান বর্ষের প্রদর্শনীর মধ্যেই রূপায়িত। আর্ট স্কুলের সপ্তদশ বার্ষিক প্রদর্শনীর।আয়োজনে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। প্রদর্শনী কক্ষের চতুর্দিকে পরিচ্ছন্নতার ভাব দৃষ্ট হয়। চিত্রগুলি সমস্তই ফ্রেমে সজ্জিত। অন্যান্য বৎসরে এই ব্যবস্থা ছিল না। ইহা সুরুচির পরিচয় এবং সেজন্য দর্শকদের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। অধিকন্তু নির্বাচন কমিটী থাকায় অসুন্দর ও অপ্রয়োজনীয় চিত্রের বাহুল্য বর্জিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন মিসেস্ আর, জি, কেসি। এঁর পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন মনে করি না, জন কল্যাণ কার্য্যে এবং বিশেষ করিয়া শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতে তিনি অদ্বিতীয়। গত এক বছরে ইনি আর্ট স্কুলের ছাত্রদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন ও নানাপ্রকারে স্কুলের অবস্থার উন্নতি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং শিল্পী এবং তাঁর ন্যায় পৃষ্ঠপোষক আমাদের একটি মূল্যবান মূলধন বলিলে অত্যুক্তি হবে না।

তৈল চিত্রের মধ্যে শ্রীমুরলীধর টালীর 'আমার মা', ৭নং চিত্রটি প্রদর্শনীর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। চিত্রটিতে রঙের সমন্বয় সত্যই অপূর্ব। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের দীপালোকে পাঠ—১৩নং আয়তনে বেশ বড়। বর্ণবৈচিত্র্য আরও সঙ্গতিপূর্ণ হইলে চিত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইত। শ্রীআগুনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিত্র আরও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। তাঁহার চিত্রে নূতনত্ব নাই। ল্যাণ্ডস্কেপগুলির মধ্যে মিঃ সফীউদ্দিন আহমেদের দূরকার চিত্রগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও চিত্রে নীলরঙের আধিক্য বিসদৃশ মনে হয়। ঘোষাল মহাশয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যটি ৪৩নং অনুজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও অসুন্দর হয় নাই। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীসুপ্রভাত নন্দন ও শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরীর চিত্রগুলির মধ্যে পশ্চিমের অনেক শিল্পীর প্রভাব দৃষ্ট হয়। এঁদের নিকট আমরা কিছু আশা করিয়াছিলাম। 'you must oopy the Masters and oopy them again, and its' only when you've absolutily proved you are a good oopyist that you may be permitted to paint a radish from nature.'—Degas. এই অমূল্য উপদেশটি সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ড্রইং-এর দুর্বলতাকে প্রশ্রয় বিশেষতঃ ছাত্রজীবনে কোন মতেই দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। Still Life চিত্রে মিঃ সফীউদ্দিন আহমেদ, শ্রীরতনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ কে, এস, আহমেদ, শ্রীপরিমল রায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

জল রঙ চিত্রে শ্রীমুরলীধর টালীর আমার বন্ধু চিত্র—১০৩ নং ও কলিকাতায় শীতের প্রভাত—১১২নং সত্যই অভিনব। টালী মহাশয়ের রঙের স্নিগ্ধতাই তাঁহার চিত্রের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এবারের প্রদর্শনীতে জলরঙ চিত্রের সংখ্যা বেশী। ইহার মধ্যে শ্রীরমেন দত্তর বারাণসীর চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। এঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। শ্রীরতনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও ধৈর্য্য সহকারে আঁকা উচিৎ ছিল। ইহা ব্যতীত মিঃ কে, এস, আহমেদ, শ্রীযুক্ত আইভলা মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীভূষণ দাসগুপ্ত, শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীধীরেন শীল প্রমুখ আরও অনেকে জল-রঙ চিত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

ভাস্কর্য্য বিভাগ হইতে তেমন কোন উৎকৃষ্ট ধরণের মূর্ত্তির পরিচয় নাই। শ্রীরমেশচন্দ্র পালের বুদ্ধের আবক্ষ মূর্ত্তিটি ভালই হইয়াছে। অধিকাংশ রিলিফ ডিজাইন পৌরাণিক দেবদেবী অবলম্বনে গঠিত। ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীচৈতন্তের জ্যোৎস্না উপভোগ, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসের বুদ্ধের গল্প, শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য দর্শন এবং শ্রীমতী নমিতা সাহার অনাথপিণ্ডদ প্রমুখ চিত্রে শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়; শ্রীগৌরীশঙ্কর পাল ও শ্রীগোপেন রায়ের চিত্রে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। লিথোগ্রাফের মধ্যে মিঃ কে এস আহমেদের ১৯৪৩এর বাংলা ও মিঃ কামরুল হাসানের বন্যা বিধ্বস্ত মেদিনীপুরের দৃশ্যগুলি খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। 'কাঠ-খোদাই' চিত্রে শ্রীমুরলীধর টালী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, মিঃ সফিউদ্দিন ও শ্রীহরেন দাস বলিষ্ঠ বুদ্ধি চালনার কৌশল দেখাইয়াছেন। স্কেচে শ্রীমতী কমলা রায় চৌধুরী সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। উত্তরকালে ইনি উন্নতি লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য যাঁহারা স্কেচে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরনেন দত্ত, শ্রীপিনাকী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীধীরেন শীলের নাম করা যাইতে পারে। কমার্সিয়াল পোষ্টার ও ডিজাইনে শ্রীপান্নালাল মুস্তাফীর লে-আউটে নূতনত্ব আছে তবে তাঁহার রং-এর ব্যবস্থা আরও সংযত হওয়া উচিৎ ছিল। গ্রীটিং কার্ডের রং-এর ব্যবস্থা করিয়া তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরা বাজার' সময়োপযোগী হইয়াছে।

প্রাক্তন ছাত্রের মধ্যে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের গঙ্গায় সূর্য্যাস্ত ১নং শ্রীসমর ঘোষের পসারী—২নং চিত্রে অভিনবত্ব আছে। শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত, শ্রীবাসুদেব রায়ের চিত্রগুলি সুন্দর বললেও অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট নূতন চিত্র আশা করিয়াছিলাম। শ্রীসুনীল পালের লামার মস্তক শান্ত ও সৌম্য ভাবের আবেশময় দৃষ্টি মূর্ত্তিটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর LiLTH Crapper No. 62, Henry Bom's daughter No. 61, এবং Still Life প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ। তাঁহার উৎকৃষ্ট আরও চিত্র আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের Sea Be1oh No 87 পুরাতন চিত্র। বহু প্রদর্শনীতে চিত্রটি দেখিয়াছি। তাঁহার solitude No 89 চিত্রে মাতৃভাব চোখে পড়ে না। মিঃ জয়নাল আবেদীনের স্কেচগুলি উপভোগ্য হইলেও তিনি ড্রইং-এর দিকে নজর দিলে চিত্রের সৌন্দর্য্যহানি হইত না। মিঃ আনওয়ারুল হকের চিত্রে রঙের বিদেশী আবহাওয়া চোখে পড়ে। পরিশেষে ছাত্রদের দ্বারা অঙ্কিত W. V. S Postersএর coloured Print খুব মনোজ্ঞ হইয়াছে। মিসেস্ কেসী ইঁহাদের পুরস্কৃত করিয়াছেন।

এ বছর প্রদর্শনীতে আট সহস্রাধিক টাকার চিত্রাদি বিক্রীত হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের শিল্প প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শক সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মনে হয় এবারের প্রদর্শনী সাফল্য লাভ করিয়াছে। সেজন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি কারণ তাঁহার অদম্য চেষ্টা ও দক্ষ ব্যক্তিত্বকে এই প্রদর্শনী এতখানি গৌরব অর্জন করিতে পারিতনা। আমরা ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরণের প্রদর্শনী আশা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য*

ডক্টর মনোমোহন ঘোষ এম-এ, পি-এইচ্-ডি

যদিও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল পালরাজগণের শাসনকালে, তবু এর উল্লেখযোগ্য উন্নতির আরম্ভ বাংলার তুর্ক ও আফ্‌গান শাসনকর্তাদের আমলে। কিন্তু উন্নতির গৌরবকে যে কেউ কেউ এই বিদেশাগত রাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবপ্রসূত বলে কল্পনা করেছেন তা হয়ত সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য না হতে পারে। বিদেশাগত রাজশক্তির প্রভাবে সাহিত্যের প্রসারের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দুর্লভ নয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেণীর ঘটনা হচ্ছে নর্ম্যান বিজয়ের ফলে ইংরাজী সাহিত্যের নবীন বিকাশ। স্বাভাবিক কারণে বাংলা দেশে তুর্ক-আফ্‌গান শাসকদের আগমনের ফলে তেমনটি ঘটে নি। ইংল্যাণ্ড বিজয়ী নর্ম্যানগণ ছিল শিক্ষা সভ্যতায় তৎকালীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি ফরাসীদের একাংশ। তাই সংস্কৃতিতে অপেক্ষাকৃত হীন ইংল্যাণ্ডবাসীদের সাহিত্যকে তাঁরা উন্নত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যে তুর্ক-আফগানেরা বাহুবলে এদেশের শাসনকর্তার পদ দখল করতে পেরেছিলেন তাঁদের না ছিল নিজস্ব উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি, না ছিল বিদ্যা-গৌরব। তাই রাজশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা দেশের সংস্কৃতিতে বিদেশাগত কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটল না। অপরন্তু সেই শাসকসম্প্রদায় ও তাঁদের অনতিসংখ্যক পার্ষদবর্গ দু'এক পুরুষের মধ্যে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে বহুল পরিমাণে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হলেন। তারই ফলে বাংলা ভাষা অধিকাংশ স্থলে তাঁদের ব্যবহার্য্য ভাষা হয়ে দাঁড়াল এবং তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে উৎসাহ দিতে কিয়ৎ-পরিমাণে বাধ্য হলেন। বাংলার যে অগণ্য নরনারী বিজেতার অনুসৃত ইস্‌লাম ধর্ম্মকে স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগের ফলে গ্রহণ করলো, তাদের কাছ থেকেও রাজশক্তি কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপারে প্রবল প্রেরণা এসেছিল। এই হল বাংলা সাহিত্যের প্রসারে ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী শাসকদের উৎসাহদানের সত্য ইতিহাস।

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, তুর্ক ও আফ্‌গান শাসকগণের হাতে বাংলা সাহিত্য যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তজ্জন্য তাঁরা বিশেষ প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে মনে রাখা উচিত যে, কেবল এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা সাহিত্য যথোচিত পরিপুষ্টি লাভ করে নি। এই পরিপুষ্টির প্রধান প্রেরণা এসেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক্ থেকে। এদেশের যে সংখ্যাবহুল অধিবাসী নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজ পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মকে আঁকড়িয়ে ছিলেন তাঁরাই নবজীবন সঞ্চার করলেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বিদেশাগত রাজগণের শাসনকালে বহুলোক পিতৃপুরুষের অনুসৃত ধর্ম্মসম্প্রদায় ত্যাগ করল। তাদের মধ্যে একদল ঐহিক সুখসুবিধার প্রলোভনে বা বলপ্রয়োগের ফলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করলেও, হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটিতে এদেশের অবহেলিত ও নির্য্যাতিত জনগণের একাংশ যে ইস্‌লামের গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃভাবের আকর্ষণে নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রবেশ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী সূফী সাধকগণের ব্যক্তিগত প্রভাবও বহু লোককে এই ইস্‌লামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এই সব ঘটনার প্রতি তৎকালীন হিন্দু নেতাদের দৃষ্টি না পড়ে পারে নি। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তথা সমাজ-ব্যবস্থা যে দেশের অগণ্য জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে উপযোগী নয় এ সত্যটি তাঁরা—অন্ততঃ যাঁরা বিশেষ চিন্তাশীল—বুঝতে পারলেন; তাঁরা দেখ্‌লেন যে ইস্‌লামের গণতন্ত্র, ভ্রাতৃভাব এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মতত্ত্ব ও আচারানুষ্ঠানের সরলতা হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে সহজেই আকৃষ্ট করছে। তাই তাঁরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের কথা চিন্তা করলেন।

এই চিন্তার নানা ফলের অন্যতম হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে সহজসাধ্য ও সহজবোধ্য ভক্তিধর্ম্মের প্রচার এবং সেই ভক্তিধর্ম্ম বোঝবার সুবিধার জন্য লোকপ্রিয় গীতের আকারে দেশভাষায় রামায়ণ ভাগবতাদি সংস্কৃত গ্রন্থকে বা মনসা চণ্ডী আদি দেবতার লোকপ্রচলিত আখ্যানকে আরো সুপ্রচারিত করা। হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করবার জন্য এই যে বিশেষ উপায় অবলম্বন, এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ,' মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও বিজয় গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল'। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে এ তিনখানি গ্রন্থের স্থান অতুলনীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি-ধারার নির্দ্দেশক এ তিনখানি গ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। পুরুষানুক্রমে গায়কদের মুখে ও লিপিকারের হাতে মূল গ্রন্থগুলির পাঠে এত বিকৃতি ঘটেছিল যে ঐ সকল গ্রন্থের দ্বারা ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্বের কোনো প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রায় অসম্ভব ছিল। বলা বাহুল্য এরূপ ঘটনা এদেশের বিদ্বৎসমাজের পক্ষে মোটেই গৌরবকর ছিল না। এদিক দিয়ে বাঙালী জাতিকে আত্মনিন্দা থেকে বাঁচাবার প্রথম সার্থক প্রয়াস করেছেন সুবিখ্যাত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়। যথেষ্ট পরিশ্রমসহকারে বহু পুঁথির পাঠ বিচার করে কয়েক বছর আগে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের যে অভিনব সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত করেছেন তা বাঙালীর বিদ্যাচর্চ্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরই সঙ্গে তুলনীয় ঘটনা হচ্ছে বর্ত্তমান সালে (১৯৪৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত মালাধর বসু কৃত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" সুসমালোচিত (critical) সংস্করণের প্রকাশ। একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এ নূতন সংস্করণ অধ্যাপক মিত্রের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। তাঁর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" সুসম্পাদিত প্রাচীন বাংলা গ্রন্থগুলির অন্যতম। কি পাঠ-বিচার, কি গ্রন্থ ও গ্রন্থকার-সম্পর্কিত নানা প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা-এ উভয় ক্ষেত্রেই সুবিজ্ঞ সম্পাদক অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

পাঠ নির্বাচন ব্যাপারে অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে সর্ব্বত্র একমত হতে না পারলেও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে তিনি যে সকল মাল্-মশলা ব্যবহার করে' বর্ত্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন সে সব ব্যবহার করে' এর চেয়ে মালাধরের অধিকতর প্রামাণিক পাঠ প্রস্তুত করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। স্থানাভাবে তিনি কোনো কোনো পুঁথির (যেমন গ ও চ পুঁথির) পাঠান্তর উল্লেখ করেন নি। তা করলে ভালো হইত। তবে এই কাগজ-ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণের দিনে এ বিষয়ে জোর করা অন্যায় হবে। বাংলা দেশের সমস্ত বাংলা পুঁথির সন্ধান এখনো করা হয় নি। কালে হয়ত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের" পুঁথি আরো আবিষ্কৃত হবে কিন্তু তাদের দ্বারা বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ যে খুব বেশী পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হবে নানা কারণে তা আমাদের মনে হয় না, অর্থাৎ অধ্যাপক মিত্র সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" বহুকাল যাবৎ অনতিক্রান্ত থাকবে। স্থানাভাবে এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না।

পাঠবিচারের পরেই আলোচ্য—সম্পাদকের বহু তথ্যসবলিত

---

* মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৯৪৪।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা। এই ভূমিকায় তিনি মালাধর বসুর জীবন ও সময়, বর্ত্তমান সংস্করণের মূলীভূত পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকের বিবরণ, উত্তর ভারতের ভাষা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের স্থান, শ্রীমদ্‌-ভাগবত ও ভক্তিবাদ, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের কৃষ্ণলীলা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, মালাধরের রচনার বিশেষত্ব, তাঁহার ভাষা এবং শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের সঙ্গে ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ আদি গ্রন্থের সম্পর্ক অতি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পাঠক তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস্‌-জিজ্ঞাসুর নিকট পরম মূল্যবান্‌ বিবেচিত হবে। অধ্যাপক মিত্র এই প্রসঙ্গে একটি প্রচারিত মতের প্রতিবাদ করেছেন। মালাধর গ্রন্থারম্ভে একস্থানে বলেছেন :—

> ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
> লৌকীক কহিল লোক শুন মহাসুখে ॥ ১৭ ॥

এই পয়ারের পংক্তি দুটি দেখে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে মালাধর সংস্কৃত জানতেন না, কেবল পণ্ডিতের মুখে ভাগবত কথা শুনে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রচনা করে গেছেন। অধ্যাপক মিত্র ভাগবত হরিবংশ বিষ্ণু-পুরাণ আদি নানা সংস্কৃত গ্রন্থ বিশেষ করে ভাগবতের সঙ্গে সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের বহু স্থলে এমন আক্ষরিক সাদৃশ্য দেখিয়েছেন যাতে মনে হয় মালাধর বসু সংস্কৃতে অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু অধ্যাপক মিত্র দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত গ্রন্থ মালাধরের রচনার আদর্শ হলেও তিনি ভাগবতের কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। তাঁর আগে কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে বাংলায় রামচরিত কাব্য রচনা করেছিলেন মালাধরও তেমনি ভাগবতাদি-প্রোক্ত কৃষ্ণ-লীলার কাহিনী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করে গেছেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় মালাধরও বীর রসকে নিজ কাব্যের প্রধান উপজীব্য করেছেন। কারণ চৈতন্যের আগে বাঙালী পাঠকেরা ভাগবতের দার্শনিক তত্ত্ব বা ব্রজের মধুর রস বুঝতে সক্ষম ছিলেন না। আবার কৃত্তিবাসের মতো মালাধরও কৃষ্ণলীলাকে বাঙালীর ছাঁচে ঢেলে বর্ণনা করেছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ভাত খাচ্ছেন, মথুরায় গুয়া, কলাগাছ ও কামরাঙার গাছ আছে, দুয়ারে দুয়ারে গুয়া, নারিকেল পোতা আছে ইত্যাদি। এরূপ রীতিতে রচিত "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" তৎকালীন বাঙলার লোকসমাজে যে কিরূপ সমাদরে গৃহীত হয়েছিল তার অন্যতম প্রমাণ মালাধরের পরবর্তী কৃষ্ণ চরিতাখ্যায়কদের উপর তাঁর প্রভাব। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই প্রভাব সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের কোনো দৃষ্টি পড়ে নাই। অধ্যাপক মিত্রের এতৎ সম্পর্কীয় আলোচনা এ বিষয়ে আমাদিগকে এক মূল্যবান্‌ তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। তিনি যে মালাধরের রচনাকে Wyoliff কৃত বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। Wyoliff যদি Morning star of the Reformation, তবে মালাধর অবশ্যই ভারতের আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মের সাহিত্যিক অগ্রদূত। কারণ তাঁরই শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার পরে অনেকটা তাঁর বইএর প্রভাবে উত্তর ভারতের নানা প্রদেশের লেখকেরা কৃষ্ণচরিত রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এই বিষয়টির যথাযুক্ত আলোচনা করে অধ্যাপক মিত্র ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকেও কিয়ৎপরিমাণে সহজবোধ্য করেছেন। এরূপ নানা উপাদেয় আলোচনায় "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের" ভূমিকা সমৃদ্ধ। যদি কোনো কোনো পাঠক এতে তাঁর মতবিরোধী কথা—এমন কি দু'একটি সূক্ষ্ম ত্রুটিও বা'র করতে পারেন তবু এ ভূমিকার মূল্যবত্তা অস্বীকার করা দুঃসাধ্য হবে। ইতঃপূর্ব্বে (অংশতঃ) বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্কার করে অধ্যাপক মিত্র যে যশঃ অর্জ্জন করেছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্ত্তমান সংস্করণের দ্বারা তাঁর সে যশঃ দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং এ বই প্রকাশ দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদ্যাপ্রচারের গৌরব বাড়িয়েছেন।

রজনী-গন্ধার বিদায়

জসীম উদ্‌দীন্‌

শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদ নামিছে চক্রবালে।
রজনী-গন্ধা রূপসীর আঁখি জড়াইছে ঘুম-জালে!
অলস চরণে চলিতে চলিতে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে,
শিথিল শ্রান্তি চুমিছে তাহার সারাটি অঙ্গ ধ'রে!
উতল কেশেরে খেলা দিতে শেষ উতল রাতের বায়ু;
ঘুমাতে ঘুমাতে কাঁপিয়া উঠিছে ঝরিয়া রাতের আয়ু!
রজনী-গন্ধা রাতের রূপসী ঘুমিছে শ্রান্তি ভরে—
অঙ্গ হইতে ঝরিছে কুসুম একটি একটি কোরে।
শিয়রে চাঁদের দীপটি-ঘুমিয়া হইয়া আসিছে ম্লান,
রাত-বিহগীর কণ্ঠে এখন মৃদু হোয়ে এল গান।
পূর্ব্ব তোরণে আসিছে রূপসী রঙীন উষসী-বালা,
হস্তে লইয়া রাঙা দিবসের অস্ফুট কুসুম-ডালা।
রজনী-গন্ধা ঘুমায় আলসে শিথিল দেহটী তা'র,
লুটাইয়া পড়ে মৃত্তমরণে স্বপন-নদীর্‌ পার।
ভুবন ভোলানো মরি মরি ঘুম—অপরূপ, অপরূপ!
বিধাতা বুঝিবা ধ্যান করিতেছে যুগ যুগ রহি চুপ!
এ—রূপ বহিয়া সহিতে পারে না, ভোরের রূপসী উষা,
রজনী-দুলের অঙ্গ হইতে হরিয়া লইছে ভূষা—।
শাড়ীতে তাহার তারা ফুলগুলি দলিয়া গিয়িছে পায়ে
ভেঙেছে রাতের পাখীর বাঁশরী উদাস বনের বায়ে!
শিয়রে চাঁদের মণি-দীপ-খানি থাপড়ে নিবায়ে দিল
অঙ্গ হইতে শিশির ফোঁটার গহনা কাড়িয়া নিল।

থামিল বনের ঝিঁঝির কণ্ঠে ঘুম-পাড়ানিয়া সুর,
জোনাকী পরীরা দীপগুলি ল'য়ে চলিল গহন-পুর।
মৃত আঁধারা কবরে লুকাল, মহা রহস্য তা'র
আঁচলে জড়ায়ে ধীরে ধীরে ধীরে রজনী রুধিল দ্বার।

চারিদিকে নব আলোকের বন্যা; চির পরিচিত সব,
মহা কোলাহলে আরম্ভ হলো দিনের মহোৎসব।
এখন শুধুই লোক জানা জানি, মুখ-চেনা-চিনি আর
দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া 'খাজিনা' খুলিল দ্বার।

কোথায় ঘুমাল রজনী-গন্ধা, কি-বা রহস্য-জাল,
সারা রাতি তারে জড়াইয়াছিল? কে খোলে সে জঞ্জাল!
রাতের রজনী-গন্ধা ঘুমায়, চির বিস্মৃতি-পুরে,—
শুধু র'য়ে র'য়ে কি করুণ বাঁশী বেজে ওঠে বহুদূরে!—

পরভৃত-কথা

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বিলাসী সমাজ ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে নারী সন্তানের প্রসূতি হইলেও ধাত্রী নহে। সন্তান পালনের ঝঞ্ঝাট ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জননী স্বীয় সুখ বিসর্জনে স্বীকৃতা নয়, তাই প্রসবান্তে সন্তানের সকলভার ধাত্রীমাতার উপর ন্যস্ত করিয়া নারী নিশ্চিন্ত বিলাসে কালাতিপাত করে। মনুষ্যসমাজে এই রীতি আধুনিক হইলেও পাখীদের মধ্যে এমনি জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে বহুকাল পূর্ব হইতেই। বসন্ত সমাগমে কলকাকলীতে কাননভূমি মুখর করিয়া তোলে যে পিককুল, উহারা কদাপি সন্তানপালনে অভ্যস্ত নহে। নীড়নির্মাণের শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে ইহারা নারাজ। গাছে গাছে গান গাহিয়া আহারবিহারে রত এই বিলাসী বিহঙ্গদের ডিম হইতে শাবক জন্মাইবার ও তৎপরে তাহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য দিনের পর দিন ধৈর্য সহকারে আত্মনিয়োগ করিবার প্রবৃত্তি নাই। বাসা বাঁধিয়া সংসারবন্ধনে আটকা পড়িতে ইহারা ইচ্ছুক নহে সেইজন্য ডিম প্রসব করিবার পরে ডিমে তা' দেওয়া বা শাবকের আহার্য-ব্যবস্থাদি যাবতীয় কর্তব্য ইহারা সুকৌশলে অন্য পাখীর উপরে চাপাইয়া দেয়। ইহাদের এই স্বভাব, রীতি ও কার্যাবলী অনুধাবন করিলে বিস্ময় লাগে এবং ইতরপ্রাণীর বুদ্ধিচাতুর্য বিষয়ে বিশেষ তথ্যাদি পাওয়া যায়।

ধাত্রীমাতা অন্য জাতীয় পাখীর যত্নে কোকিলছানার শৈশব কাটে বলিয়া কোকিলকে পরপুষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয়। বহুকাল হইতেই এটা জানা ছিল ইহাতে নূতন কথা কিছু নাই ; কিন্তু এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে কোকিলের বিলাসী স্বভাব ও দুষ্টবুদ্ধির পরিচয় মেলে। আমরা কোকিল ছানাকে কাকের বাসায় দেখিয়া থাকি। অনেকের ধারণা আছে যে কোকিল অন্যত্র ডিম পাড়ে ও সুযোগ বুঝিয়া উহা কোন সময়ে ঠোঁটে করিয়া আনিয়া কাকের বাসায় রাখিয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে ইহা সত্য নহে। তাহারা বলেন কোকিল কাকের বাসাতে আসিয়া ডিম পাড়ে। এতদ্বিষয়ে এডগার চান্স তাঁহার Cuckoo's Secret পুস্তকে ও অলিভার পাইক তাঁহার Secrets of the Cuckoo শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনাদির উল্লেখে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণীতে অনেক মজার ব্যাপার জানা যায়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে কোকিল যাযাবর পাখীদের অন্যতম।* কোকিল ঐ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অবস্থান করে। শীত সমাগমে সে দেশের কোকিল হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া বাস করে। আমাদের দেশে কোকিল বসন্তসখা হইলেও উহারা যাযাবর পাখী নহে। পক্ষীবিদ্‌রা বলেন, বর্ষাসমাগমে কোকিলের সাড়া পাওয়া যায় না তাহার কারণ উহারা তখন নীরব হইয়া গাছের পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে। বসন্ত সমাগমে আসে কোকিলের প্রজননঋতু। এই সময় পুং-কোকিলেরা মধুর স্বরে গাছের ডালে বসিয়া ডাকিতে থাকে। সেই ডাকে আকৃষ্ট হইয়া স্ত্রীকোকিল আসিয়া উহাদের সহিত মিলিত হয়।

স্ত্রী-কোকিল স্বভাবত একদিন অন্তর একটি করিয়া ডিম প্রসব করে। প্রসবকাল আসন্ন হইলে অন্যান্য পাখীর মতই প্রসবের অব্যবহিত পূর্বে কয়েক ঘণ্টা কাল উহারা কোন বৃক্ষশাখায় বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে নিস্তব্ধ ও নীরবে বসিয়া থাকে। প্রসব সময়ে প্রয়োজন হইলে পুং-কোকিল পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট কোন পাখীর বাসায় গিয়া সেখানকার পাখীদের বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে। সে পাখীরা উহাকে তাড়া করিতে আসে ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসা ছাড়িয়া দূরে গমন করে। এদিকে সুযোগ বুঝিয়া স্ত্রীকোকিল ঐ বাসায় প্রবেশ করে। বাসায় ডিম থাকিলে ঠোঁটে করিয়া উহা হইতে একটি তুলিয়া লয় এবং বাসার উপরে বসিয়া ডিম প্রসব করে। এই কার্য করিতে উহাদের দশ সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। তারপর চুরি করা ডিম মুখে করিয়া উড়িয়া যায় এবং দূরে কোন জায়গায় বসিয়া ডিমটি বেমালুম গিলিয়া ফেলে। প্রসব করিবার পূর্বে কয়েক ঘণ্টা অনশনের পর ইহাই উহাদের উপবাসভঙ্গ করিবার রীতি। ধাত্রীমাতার বাসা হইতে ডিম চুরি করিয়া আনিবার মুখ্য কারণ তাহাকে কোন সন্দেহের অবকাশ না দেওয়া—তদুপরি চৌর্যলব্ধ ডিমের সদ্ব্যবহার করে উদরপূর্তি করিয়া। কোকিলেরা সন্তানের জন্য নীড়নির্মাণ না করিলেও উহাকে একেবারে উদাসীন বা দয়াহীন বলা যায় না। ডিম প্রসব করিবার
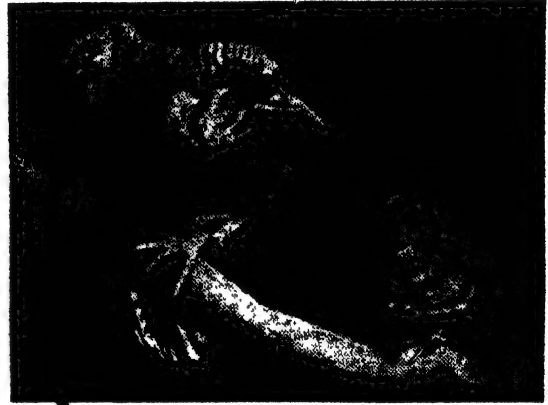
বিব্রতা মাতা

পর মাঝে মাঝে খবর করে ডিমের পরিণতির। যদি কোন কারণে কোন প্রসূত ডিম হইতে শাবক না জন্মে বা ধাত্রী-মাতার নীড় হইতে ডিম অপসারিত হয় তবে প্রসূতি কোকিল আবার নূতন করিয়া ডিম দেয়। সাধারণত কোকিল এক বৎসরে পাঁচ ছয়টি ডিম প্রসব করে, কিন্তু এবম্প্রকার অবস্থায় উহারা পনের কুড়িটি ডিমও দেয়। সবগুলি ডিম স্ত্রীকোকিল একই বাসায় প্রসব করে না। বিভিন্ন বাসায় পর পর একটি একটি করিয়া ডিম প্রসব করে ও যখন দেখে শাবকের জন্ম হইয়াছে ও উহারা ধাত্রী পাখীর যত্নে দিব্য পুষ্ট হইতেছে তখন শীতের দেশের কোকিল প্রবাস যাত্রা করে। জীবনে উহাদের চির বসন্তের আশীর্বাদ, অন্তরদেশে তথা বাহিরের পরিবেশে। শীতের স্পর্শ পাইলেই উহারা গরমের দেশে ছুটিয়া পলায়। আবার দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে সন্তান পালনের ঝঞ্ঝাটকে আনিয়া সুখের ব্যাঘাত ঘটিতে দেয় না। ইহাদের অন্তরে অনন্ত বসন্ত, বাহিরে চির-শ্যামল সমারোহ। দেশ ত্যাগ করিয়া বাহিরের বসন্তকে চিরন্তন করিয়া তোলে, সন্তান পালনের ক্লেশকে কৌশলে পরের উপরে আরোপ করিয়া মনের বসন্ত অক্ষয় করিয়া রাখে।

আমাদের দেশে কোকিলকে একমাত্র কাকের বাসাতেই প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কোকিলেরা একাধিক পাখীর বাসায় ডিম প্রসব করে। ইংলণ্ডে পিপিট, ওয়ারবলার, খঞ্জন প্রভৃতি

---

* ভারতবর্ষ (আষাঢ়, ১৩৫১)—লেখকের 'পাখীর প্রবাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পাখীরা কোকিলের ধাত্রীমাতার কার্য করে। এখানে একটি সুন্দর জৈব বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। যে কোকিল যে জাতীয় পাখীর বাসায় ডিম পাড়িতে অভ্যস্ত উহার ডিমও অনেকাংশে সেই পাখীর ডিমের মত হইয়া থাকে। দেখা যাইতেছে যে সকল কোকিলের ডিম একপ্রকার হয় না। ধাত্রীমাতাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই এই অদ্ভুত ব্যবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার প্রচেষ্টায় জীব আপনাকে পরিবেশের সঙ্গে নিয়োজিত করিয়া লয়—কোকিলের এই রীতি তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। কাকের বাসায় কোকিল শাবককে খুব বেমানান মনে না হইতে পারে[কারণ উভয়ের বর্ণ ই কালো এবং

রাজুসে ক্ষুধা
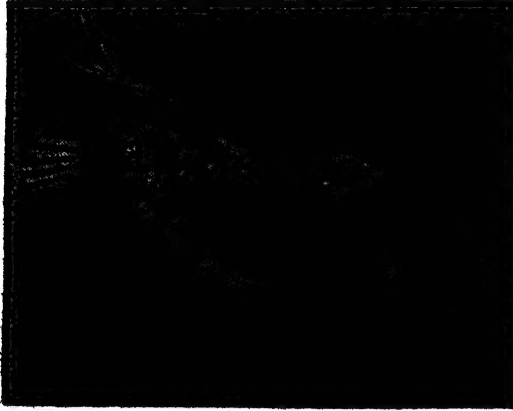
আকারে কাক কোকিলের তফাৎ সামান্য এবং মাতা সন্তানের চেয়ে ছোট নয়। কিন্তু উল্লিখিত অন্যান্য পাখীগুলির সকলেই কোকিলের চেয়ে অনেক ছোট, চেহারায় কোন সাদৃশ্য নাই, শাবক অবস্থাতেও কোকিল ধাত্রীমাতার তুলনায় অতিকায়। অথচ অদৃষ্ট বৈগুণ্যে ও বুদ্ধি দোষে এই পাখীরা অন্ধের ন্যায় নিজের সন্তানকে অবহেলা করিয়াও পরের সন্তানকে পালন করে; ক্ষুদ্রকায়া মাতার শক্তিতে যেটুকু আহার্য সংগ্রহ সম্ভব তাহার সবটুকুই বা বেশীর ভাগই 'পরের ছেলের' পেটে যায়—মূঢ় মাতা আপন বিভ্রমের কথা মোটে উপলব্ধি করে না।

ক্ষুদ্র কোকিল-শাবক চাতুরী ও স্বার্থপরতায় মাতাকেও অতিক্রম করে। প্রসূত হইবার তের দিন পর ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হয়—কালো একটা মাংসপিণ্ড মাত্র, দৃষ্টিশক্তিহীন। দুই একদিন এমনই যায়, তারপর সহসা ইহারা সচেতন উঠে। ধাত্রীমাতার সংগৃহীত আহার্য সামগ্রীতে অংশীদার ইহাদের পক্ষে অসহ্য। বাসার ভিতরে যদি ডিম বা অন্য শাবক থাকে তবে ইহারা প্রাণপণ স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদের জীবনান্ত করে। ডিম থাকিলে পিঠের উপর চাপাইয়া বাসা হইতে গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দিয়া সহজেই আপদ বিদায় করিয়া থাকে। বাসায় অন্য শাবক থাকিলেও ইহারা রেহাই দেয় না। এই প্রকার কাজে ইহাদের অপরিসীম শক্তিমত্তা ও দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র অজাতপক্ষ কোকিল শাবক তখনও চোখে দেখে না—নিজের চেয়ে আকারে বড় অন্য পাখীর ছানাকে কত না কৌশলে নীচে ফেলিয়া দিয়া নীড় মধ্যে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দুরদৃষ্ট ধাত্রীমাতারা, আপন সন্তানকে দস্যু ও রাক্ষসের হাতে বলি দিয়া সর্বপ্রযত্নে সেই রাক্ষসকে বড় করিয়া তোলে। মাতা যত আহার্য্য সংগ্রহ করে তাহা একাকী ভোগ করিতে পাইয়া কোকিল শাবক দ্রুত বাড়িতে থাকে এবং স্বল্পকাল মধ্যেই পালক ও পক্ষযুক্ত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হয়। তার পর ধাত্রীমাতার যত্নে অল্প অল্প উড়িতে শেখে। কাকের বাসায় শাবক বড় হইলে একদা কোকিলের চাতুরী ধরা পড়ে। ধাত্রীমাতা বুঝিতে পারে অপার স্নেহে ও অসীম যত্নে সে যাহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে সে তাহার নিজের সন্তান নহে তখন তাহাকে ঠোকরাইয়া তাড়াইয়া দেয়। তখন কোকিল শাবক কোন গাছের ডালে বসিয়া হয়ত করুণ আর্তনাদ করে। ক্ষুধার্ত শাবকের আর্তনাদে অন্যান্য পাখীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যে যাহা পায় তাহাই আনিয়া উহাকে খাওয়ায়, তখন ইহারা জনজনের কৃপায় পুষ্টিলাভ করে। তারপর সময় আসে আত্মশক্তিতে ভর করিবার। যতদিন অপর পাখীদের সংগৃহীত আহার্যের উপর ভরসা করিয়া বাঁচিতে হয় ততদিন ইহারা সর্বভুক, কীট-পতঙ্গাদিও আহার করে। কিন্তু নিজেদের আহার্য সংগ্রহের সময় আসিলে ইহারা তখন ফলমূলেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। তারপর ধীরে ধীরে পতঙ্গ খুঁজিয়া খাইবার কৌশল আরম্ভ করিয়া পরে আবার পতঙ্গভুক হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের কোকিলশাবকের দুই তিন মাস বয়স হইলে ইহারা সহসা একদিন অজানা পথে যাত্রা করে। কি কারণে বা কিসের অনুপ্রেরণায় ইহারা প্রবাস গমনে উদ্বুদ্ধ হয় তাহা আজও রহস্যাবৃত। কে দেয় ইহাদের পথের সন্ধান—সাত সাগরের পার হইতে কে দেয় হাতছানি।

[এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি অজিতার পাইক কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হরদাস ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অঙ্কিত]

ভাল ছাপা চাই

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এসসি

ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানীর খুব খ্যাতি। একবার সেখানে ঘড়ি সারাইতে গিয়াছিলাম। সাহেব ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "এ যে ম্যাচলেস্, কিন্তু বড় পুরাতন, গঙ্গায় ফেলিয়া দাও, আর মেরামত হইবে না।"

শুনিয়াছি সাহেবরা সাইকেল ও মোটর গাড়ী ২।৩ বৎসর ব্যবহার করিয়াই বিক্রয় করিয়া দেয়, নূতন কিনে। বস্তুত যন্ত্র মাত্রেরই একটা বয়স আছে, তখন মেরামত করিলে বা অংশমাত্র বদল করিলে আর নির্দোষ নূতন হয় না।

ছাপার যন্ত্র দিয়া উৎকৃষ্ট নির্দোষ ছাপার জন্য যেন আমরা জেদ না করি। পুরাতন যন্ত্র যদি সত্যই নির্দোষ অবস্থায় থাকে তবে ছাপা বিশেষ মন্দ হইবার কথা নহে। কিন্তু ছাপা হয় নানা বস্তুর সংযোজনে। উপযুক্ত কাগজ চাই, ছাপার কাজে দক্ষতা চাই, আর চাই উপযুক্ত কালি।

বই ছাপে ফ্ল্যাট যন্ত্রে, আর সংবাদপত্র ছাপে রোটারি যন্ত্রে। ফ্ল্যাটের চাইতে রোটারিতে ছাপা হয় অনেক দ্রুত। সেই বেগের সঙ্গে কালির বিস্তারের মিল রাখার রাখিয়া ভিন্ন কালি তৈরী করেন তাঁহারা। সুতরাং দুই কাজের কালি পৃথক পৃথক। ছাপাখানার কাজে

সংসারে ব্যবহারের জিনিষের অবধি নাই। কেহ পিয়ার্স গ্লিসেরিণ ছাড়া সাবান মাখেন না, কেহবা ভিনোলিয়া, আবার কেহবা গোল্ডেন ডাওলউড সোপ—এমনি করিয়া মোটামুটি সব পণ্যেরই একনিষ্ঠ ভক্ত কেহ না কেহ আছেনই। সেই একদেশদর্শিতা ছাড়িয়া আমরা সাধারণভাবে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ছাপান যন্ত্রের সম্মুখভাগে থাকে সিরিষঢালা রুল। সেই রুল গড়াইয়া গড়াইয়া সমানভাবে অক্ষরে কালি লেপিয়া দেয়। এই রুলের ক্রিয়া যত সুন্দর ও নির্দোষ হইবে ছাপার ফল হইবে তত ভাল। নতুবা কাগজে কালি সর্বত্র সমান ধরিবে না—অসমান ছাকড়া ছাকড়া দেখাইবে। তাহাতে বোধ হইবে যে সম্ভবত কাগজ অমসৃণ অথবা কালির অনুপানগুলি সম্যক পিষিয়া নির্মল করা হয় নাই।

এই রুল হইতে আরও নানা বিপত্তির সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছি। রুল এমন চটচটে আটাওয়ালা যে অক্ষরের সংস্পর্শে স্থানে স্থানে চিরিয়া গিয়াছে, আর পালিস নাই। সেই ক্ষয়ধরা রুলের ছোট ছোট কণা কালি সমেত অক্ষরে চালান হইয়া যাইতেছে। তাহার ফলে অক্ষরের সূক্ষ্ম ছিদ্র বুজিয়া যাইতেছে এবং ছাপা হইতেছে অপরিষ্কার।

রুল গড়াইবার সময় তাহার লাঠি লাফাইয়া চলে, অক্ষরে সমান কালি দেয় না, এমন ছাপাখানা অনেক আছে। কোন কালি আবার এত বেশী চটচটে হয় যে রুল চিরিয়া যায়, সমস্ত ছাপা ক্রমশ কদর্য হইয়া উঠে। আবার রোঁয়া ওঠা কাগজ ছাপিতে গিয়া অজান্তে রোঁয়া লাগিয়া যায়, সে রোঁয়া রুলে চালান হইয়া যাইয়া আবার ছাপায় ফিরিয়া আসে, এমনও দেখিয়াছি।

যদি পুস্তকের মলাট ছাপিতে চাই তবে খুব ঘন কালি আবশ্যক। নতুবা প্রার্থিত গাঢ় রং পাইব না। সুতরাং এজন্য দামী কালির প্রয়োজন। লিথোছাপায় জলের ব্যবহার হয়। সেই জলে যদি কালির রং দ্রব হয় তবে সে কালি পরিত্যাজ্য। যদি অক্ষর ফর্মায় সমতল সাজান না থাকে তবে কালি প্লেটে জড় হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্লেটে কালি জড় হইয়াছে দেখিলে কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ছাপিতে ছাপিতে অনেক সময় দেখা যায় কালি যেন গুড়াগুড়া হইয়া গেল। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

যদি উপযুক্ত শোষক (Drier) ব্যবহার করা না হইয়া থাকে তবে কালি অনেকক্ষণ কাগজের উপরে থাকায় কালির ভিতরকার তৈলজাতীয় বস্তু কাগজে শুষিয়া যায় উপরে থাকে শুষ্ক রং মাত্র। অথবা এমন শোষক ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাতে উপরের স্তর দ্রুত শুষ্ক হইয়াছে, ভিতরে শুকাইতে বিলম্ব হইতেছে, এবং তৎফলে স্নেহবস্তু কাগজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপরে রং রাখিয়া গিয়াছে। সুতরাং Drier এর ব্যবহারেও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

কাগজের উপরে ধুলা থাকে, তাহার ফলেও অনেক সময় ছাপা ভাল হয় না, একথা বলিলে লোকে হাসিবে। কিন্তু ঘরে যন্ত্র চলিতেছে, ঝাড়ুদার মহানন্দে ঘর ঝাট দিতেছে, এ দৃশ্য কত ছাপাখানায়ই তো আমরা দেখিয়াছি। ইহা দেখার পর ধুলা কাগজের উপর হাত বুলাইলেই বোঝা যাইবে। যে বুরুশ দিয়া কাগজ, যন্ত্র, করম ঝাড়া হয় তাহাও তত নির্মল থাকে না অনেক সময়।

রুল ঠিক আছে, অক্ষরও সাজান হইয়াছে ঠিকমত, কোন দোষই দেখা যাইতেছে না, অথচ কালি সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত হইতেছে না, এমন দেখা যায়। ইহা সংশোধন জন্য কিছু ছাপাখানায় ভার্নিস মিশাইয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে উন্নতি না হইলে ঐ কালি পরিত্যাজ্য। ঐ কালি ঐ যন্ত্রে বা কাজে উপযুক্ত নয় বুঝিতে হইবে।

বর্ষাকালে এদেশে ছাপা বিলম্বে শুকায়। এজন্য কোন কোন কাজে শোষক (Drier) ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু যে কালি বিনাশোষকে একেবারে মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যেই অল্পক্ষণে শুকায় তাহা পরিত্যাজ্য। ছাপাখানায় ভার্নিস মিশাইলে কিছু উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু নির্মল করিয়া মিলাইবার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পুরাতন হইলে কোন কোন কালির কোমলতা ও নমনীয়তা কমিয়া যায়। পাতলা ভার্নিস মিশাইয়া লইলেই ইহার সে দোষ দূর হয়। ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ। কোন কোন স্থানের তাপ ঋতু ভেদে ২৫, ৫০, ৭৫, ১০০, এমন কি ১২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তফাৎ হইয়া যায়। ইহার ফলে দারুণ শীতে মাখনের মত নরম কালি অপেক্ষাকৃত শক্ত হইয়া যায়। অল্প পাতলা ভার্নিস মিশাইলেই এই কালি আবার নরম হয়। অধিকাংশ ছাপাখানাই ইহাতে অভ্যস্ত।

লিথোছাপায় ছবির প্লেটে অনেক সময় কালি আছাপাছানে চলিয়া আসে দেখা যায়। ইহার নানাকারণ। সে আলোচনায় খুটিনাটি অনেক। কিছু গুরুতর বৈজ্ঞানিক কথাও আছে, হয় তো সে আলোচনা সহজবোধ্য হইবে না। তাই এইটুকু বলাই ভাল যে প্লেট যেন নির্দোষ হয়, জলে যেন ক্ষার না থাকে এবং কালিতে যেন কোন এসিড না থাকে। এই সব যদি যত্ন করিয়া পরিহার করা যায় তবে লিথোছাপায় অসুবিধা হইবার কথা নহে।

অনেক সময় ছাপার প্রান্তে কালি গড়াইয়া আসে ; কাগজ নোংরা হয়। এই দোষ লিথোর বেলাই হয় বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালি প্রয়োজন অপেক্ষা মোটা হওয়াই ইহার কারণ। ভার্নিস মিশাইয়া কিছু নরম করিয়া লইলে উপকার হয়। ভার্নিস মিশান লিথোছাপাকর মাত্রেরই অভ্যাস এবং খুব মোটা লিথোকালি না পাইলে ইহাদের ক্ষোভের অন্ত থাকে না। কারণ কালি মোটা ও শক্ত হইলে অনেকখানি পাওয়া গেল বলিয়া ইহাদের তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু তাহাকে কার্যক্ষেত্রে যোগ্য নরম করিতে অসমর্থ হইলেই যত বিপত্তি ঘটে।

ছাপার কালে যে সকল অসুবিধা ঘটে মোটামুটি তাহার কয়েকটির এখানে আমরা আলোচনা করিলাম। এগুলি বর্জন করা সম্ভব এবং ইহার সংশোধনের জন্য আমাদের যত্ন আবশ্যক। গৃহিণী পাচকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তাহার রন্ধন চাতুর্যের দ্বারাই দ্রব্যের গুণাগুণ প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ অনুপান যত্ন করিয়া ও মূল্য দিয়া কিনিলে ও রান্না ভাল না হইতে পারে।

সুতরাং ছাপাখানার মালিকগণ উৎকৃষ্ট যন্ত্র, দামী কাগজ, কালি ও রুল কিনিয়া দিলেই ছাপা ভাল হইবে না। জমাদারকে পরিচালন করিতে পারিলে, তাহার বা লিথো প্লেট রচয়িতার কর্মের উপর উন্নত জ্ঞানে সমাসীন হইয়া খবরদারী করিতে পারিলেই তবে তাহারা ভাল ছাপা পাইবেন।

তাই বলি ভাল ছাপা চাই। ভাল ছাপার আদর চাই। যাহারা ভাল ছাপেন তাহারা সম্মানিত হউন, তাহারা যেন ছাপার মূল্য বেশী পান। তাহাতে শ্রম ও যত্ন সার্থক হইবে। বিদেশী ছাপার সৌন্দর্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি আমাদের দুঃখ বুঝিবেন। দেশী কাগজে দেশী কালি দিয়া দেশী ছাপাখানায় অতি সুন্দর ছাপা আমরা দেখিতেছি। তাই আমাদের ভরসা হয়, যত্ন করিলে সকলেই ভাল ছাপিতে পারিবেন।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(৪)

১ দূতকর্ম্ম। ২ মন্ত্রযুদ্ধ। ৩ সেনামুখ্য-বধ। ৪ মণ্ডল-প্রোৎসাহন। ৫ শস্ত্রাগ্নি-রস-প্রণিধিবর্গ। ৬ বীবধ-আসার-প্রসার-বধ। ৭ যোগাতি-সন্ধান। ৮ দণ্ডাতি-সন্ধান। ৯ একবিজয়। ইতি 'আবলীয়স'-নামক দ্বাদশ-অধিকরণ।

সঙ্কেত :—১. দূতকর্ম্ম—দূতগণের কর্ত্তব্য এ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দূত ত্রিবিধ—নিসৃষ্টার্থ, পরিমিতার্থ ও শাসনহর। ইহাদিগের স্বরূপ-পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে (গঃ শাঃ); the duties of a messenger (SH) ২ মন্ত্রযুদ্ধ—'মন্ত্র' অর্থে মন্ত্রণা—প্রজ্ঞার উৎকর্ষ—তদ্দ্বারা যুদ্ধ; বুদ্ধির যুদ্ধ—অস্ত্র-যুদ্ধ নহে। শত্রুপক্ষীয় রাজগণের মধ্যে বুদ্ধি-কৌশলে ভেদ উৎপাদন ইত্যাদি; battle of intrigue (SH) ৩ সেনামুখ্যঃ—সেনা—চতুরঙ্গ বল, তন্মধ্যে যাঁহারা মুখ্য অর্থাৎ সেনাপতি ইত্যাদি; তাহাদিগের বধোপায় এ প্রকরণে কথিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); slaying the Commander-in-chief (SH) ৪ মণ্ডল-প্রোৎসাহন্—মণ্ডল—মিত্রাদি মণ্ডল; তাহার উৎসাহ-দান—আত্মস্বকার্য যোজন—বিজি-গীষুর কর্ত্তব্য (গঃ শাঃ), inciting circle of states (SH); ৩ ও ৪ প্রকরণ একটি অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৫ শস্ত্র—যে সকল আয়ুধ অভিমন্ত্রিত, অথবা যাহাদিগের আঘাত সাক্ষাৎ মরণ-দায়ক তাহাদিগের নাম 'শস্ত্র'; আর যে সকল প্রহরণ যন্ত্র-দ্বারা প্রযুক্ত হয় না, অথবা দূর হইতে নিক্ষিপ্ত হয় (যথা—বাণ) তাহাদিগের নাম 'অস্ত্র'। এ প্রকরণে শস্ত্র বলিতে—অস্ত্র-শস্ত্র উভয় প্রকার আয়ুধকেই বুঝাইতেছে। রস—বিষ। প্রণিধি—চর। যে সকল চর গুপ্তভাবে শস্ত্র-অগ্নি-রসের প্রয়োগ করে, তাহাদিগের ব্যাপার এ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); spies with weapons, fire and poison (SH) ৬ বীবধ—শ্যাম শাস্ত্রীর পাঠ; গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—বিবধ। দুই প্রকার বানানই শুদ্ধ। অমরকোষে আছে—"পর্য্যাহারশ্চ মার্গশ্চ বিবধৌ বীবধৌ চ তৌ" (৩।৩।৯৬)। ভানুজি দীক্ষিত ব্যাখ্যাসুধায় অর্থ করিয়াছেন—"উভয়তোবদ্ধশিক্যং স্কন্ধবাহ্যং কাষ্ঠং"—অর্থাৎ—'বাঁক'। আপ্তে মহাশয়ের অর্থ—a yoke for carrying burdens, a load, burden, storing grain; গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে—বিবধ অর্থে পর্য্যাহার অর্থাৎ বাঁক—গৌণ অর্থ—বাঁক-বাহী অর্থাৎ নিজ প্রজার নিকটে লভ্য ভার-আনয়নকারী; supply (SH); আসার—বিশ্ব-নামক অভিধানে পাওয়া যায়—"আসারঃ স্যাৎ প্রকরণে বেগ-বর্ষে সুহৃদ্বলে"। অমরকোষ কেবল 'প্রসরণ' অর্থটিই ধরিয়াছেন—প্রসরণ—সর্ব্বতোব্যাপী সৈন্য-প্রসরণ। আপ্তে—surrounding an army, attack, incursion; the army of an ally or king (whose dominions are separated by other intervening states) অর্থাৎ সুহৃদ্বল; provision, food. গণপতি শাস্ত্রী—সুহৃদ্বল; শ্যামশাস্ত্রী—stores, প্রসার—বন হইতে বল-পূর্ব্বক ইন্ধন-আহরণকারী (গঃ শাঃ); granaries (SH); spreading over the country to forage; spreading over the country for fuel and grass (আপ্তে)। Destruction of supply, stores and granaries (SH)। শ্যাম শাস্ত্রীর ইংরাজী পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ প্রকাশ করে না। ৫ ও ৬ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৭ যোগ—কপট উপায়, যথা—দেবগৃহে প্রবেশাদির অবসরে শত্রুর উপর যন্ত্র-সাহায্যে শিলা-পাতন ইত্যাদি। এই সকল কপট উপায়-দ্বারা অতিসন্ধান অর্থাৎ প্রতারণা (গঃ শাঃ); capture of the enemy by means of secret contrivances (SH); শ্যাম শাস্ত্রীর 'capture' শব্দটি মূলানুগ নহে—deception হইলে ভাল হইত। ৮ দণ্ড—বধ—ক্লেশদান—অর্থাহরণাদি; তদ্দ্বারা শত্রু জয় অর্থাৎ শত্রুকে পীড়ন, (capture of the army (SH); oppressing or subduing (the enemy) by means of punishment or war—এইরূপ ভাষান্তর করা উচিত। ৯ একবিজয়—একমাত্র অন্য-সহায়-নিরপেক্ষ বিজিগীষু-কর্ত্তৃক বিজয়—শত্রুজয় (গঃ শাঃ); complete victory (SH)। মনে হয়—শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ এস্থলে অধিকতর মূলানুগ। ৭, ৮ ও ৯ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত। আবলীয়স—অবলীয়ান্—দুর্ব্বলতর; তৎসম্বন্ধীয় কৃত্য—আবলীয়স—প্রবল যখন সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক, তখন দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য—ইহাই এই দ্বাদশ অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় (গঃ শাঃ); শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ ঠিক বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে—concerning a powerful enemy; হয়ত তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—আ (চারিদিকে) বলীয়ান্ (প্রবল শত্রু) চারিদিকে প্রবল শত্রু থাকিলে, কি কর্ত্তব্য তাহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে।

মূল :—১ উপজাপ। ২ যোগ-বামন ৩ অপসর্গ-প্রণিধি। ৪ পর্য্যুপাসন-কর্ম্ম। ৫ অবমর্দ্দ। ৬ লম্ভ-প্রশমন। ইতি 'দুর্গলম্ভোপায়' নামক ত্রয়োদশ প্রকরণ।

মূল :—১ উপজাপ—ভেদ—ফুসলান বা ভাঙাইয়া আনা sowing the seeds of dissension (SH); secret overtures or negotiations (with the enemy's friends), treachery instigating to rebellion (আপ্তে)। ২ যোগ—মুণ্ডিত-মস্তক, জটিল তপস্বী ইত্যাদি ছদ্মবেশ ধারণ-রূপ উপায়; সেই উপায়ে বামন অর্থাৎ শত্রুর দুর্গ হইতে নিষ্ক্রামণ (গঃ শাঃ); enticement of kings by secret contrivannce (SH); মূল প্রকরণের অন্তিম শ্লোকে পাঠ আছে—'যোগবাহন'—"তথৈব চাপগচ্ছেয়ুরিত্যুক্তং যোগবাহনম্"। সরল অর্থ—যোগ—উপায়; বাহন—অতিবাহন। ছদ্মবেশ-ধারণ-রূপ-উপায়-দ্বারা শত্রুকে আঘাতপূর্ব্বক উক্ত প্রকার ছদ্মবেশের সাহায্যেই পলায়ন। ৩ অপসর্প—গূঢ় পুরুষ, চর; তাহাদিগের প্রণিধি—শত্রুরাষ্ট্রে নিগূঢ়ভাবে নিবাস (গঃ শাঃ); work of spies in a seige (SH)। প্রণিধি-শব্দের 'চর' অর্থও হয়। 'অপসর্প' অর্থেও চর। অতএব, এ প্রকরণে 'প্রণিধি'-শব্দের যৌগিক অর্থ করিতে হইবে—প্রণিধান—বাস করান। অপসর্প-প্রণিধি—চর-প্রস্থাপন, শত্রুর দেশে চরগণের বাস ব্যবস্থা করণ—sending ont spies (আপ্তে)। ৪ পর্য্যুপাসনকর্ম্ম—শত্রু-দুর্গের চারিদিকে উপাসন-ক্রিয়া অর্থাৎ সৈন্য-সংস্থাপন (গঃ শাঃ); পরিতঃ উপাসনং—পর্য্যুপাসনম্। পরিতঃ—চারিদিকে; উপাসন—উপ (সমীপে) আসন (স্থিতি)—চারিদিকে ঘিরিয়া সৈন্যাবস্থাপন—অর্থাৎ দুর্গাবরোধ; operation of a seige (SH). ৫ অবমর্দ্দ—পরদুর্গ-গ্রহণ (গঃ শাঃ); storming a fort (SH)। ৪ ও ৫ প্রকরণ একই অধ্যায়ের অন্তর্গত। ৬ লম্ভ-প্রশমন—বিজিগীষুর সমুত্থান—দ্বিবিধ—অটবী প্রভৃতিতে অথবা একটি গ্রাম ইত্যাদিতে। ঐ সমুত্থানের ফল হইতেছে 'লম্ভ' বা লাভ। উক্ত লম্ভ ত্রিবিধ—নব, ভূতপূর্ব্ব অথবা পিত্র্য (পৈতৃক)। এ সকল বিবরণ—মূল প্রকরণে অনুসন্ধেয়। বিজিগীষু-কর্ত্তৃক লব্ধ শত্রুদুর্গাদির

প্রশমন—শান্তি-স্থাপন—এই প্রকরণের বিষয়। দুর্গবাসিগণ নূতন নৃপতির সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা স্বভাবতঃ করিয়া থাকে; উক্ত আশঙ্কা-সমূহের অপনোদন-পূর্ব্বক দুর্গবাসিগণের অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার প্রক্রিয়া এ প্রকরণে কথিত হইয়াছে (গঃ শাঃ); restoration of peace in a conquered country (SH); country—না বলিলেই ভাল হইত। দুর্গলম্ভোপায়—পরকীয়-দুর্গ-জয়ের উপায়; strategic means to capture a fortress (SH)।

মূল :—১ পরঘাত-প্রয়োগ। ২। প্রলম্ভন। ৩। স্ববলোপঘাত-প্রতীকার। ইতি 'ঔপনিষদিক'-নামক চতুর্দ্দশ অধিকরণ।

সঙ্কেত :—১ পর—শত্রু; ঘাত—বধাদি; শত্রু-বধাদির উদ্দেশ্যে গোপনে ঔষধাদির প্রয়োগ (গঃ শাঃ); means to injure an enemy (SH); কেবল injure বলিলে অর্থ স্পষ্ট প্রকাশ পায় না—strike down (ঘাত) বলাই ভাল। ২ প্রলম্ভন—শব্দটির অর্থ—প্রতারণা—deceiving, cheating, deception, causing delusion. ঔষধ-মন্ত্রাদির প্রয়োগ-দ্বারা দুর্বৃদ্ধা-প্রতীকার—বিরূপতা-সম্পাদন ইত্যাদি কার্য্য-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শত্রু-বঞ্চন। এই 'প্রলম্ভন' প্রকরণটি দুইটি অধ্যায়ে—বিভক্ত—(১) অদ্ভুতোৎপাদন ও (২) ভৈষজ্য-মন্ত্র-প্রয়োগ। অদ্ভুতোৎপাদন—যাহা অতি বিস্ময়কর অথবা অনৈসর্গিক (যাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না)—এরূপ ব্যাপারের বা দৃশ্যের অবতারণা, creation of wonderful devices, showing miracles; wonderful and delusive contrivances (SH); ভৈষজ্য—মার্জ্জার-উষ্ট্রাদির চক্ষুঃ হইতে উৎপাদিত চূর্ণাদি—অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি-বৃদ্ধির সহায়ক—এইরূপ নানাবিধ ঔষধের তালিকা এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্র—'বলিং বৈরোচনং বন্দে'—ইত্যাদি—ইহা দ্বারা ঘুম পাড়ান যায়; এইরূপ নানাবিধ মন্ত্র ও উহাদিগের প্রয়োগ-পদ্ধতি এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। Application of medicines and mantras (SH)। ৩ স্ববল—স্বসৈন্য; তাহার যে উপঘাত—বিষ-জলদূষণাদি-নিমিত্ত যে নাশ—তাহার প্রতিবিধান (গঃ শাঃ); remedies against the injuries of one's own army (SH)। ঔপনিষদিক—শ্যামশাস্ত্রীর ধৃত পাঠ; গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—ঔপনিষদ। উপনিষৎ+অণ্=ঔপনিষদ; ঔপনিষদ+ঠক্=ঔপনিষদিক। উপনিষৎ—ব্রহ্মবিদ্যা—বেদের জ্ঞানকাণ্ড; উহা অতি নির্জ্জনে গোপনে গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয় বলিয়া 'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ—রহস্য-বিদ্যা। যে কোন শাস্ত্রের গোপ্য রহস্য অংশের নাম উপনিষৎ; তদবলম্বনে রচিত অধ্যায়ের নাম—ঔপনিষদিক বা ঔপনিষদ প্রকরণ বা অধিকরণ। অর্থশাস্ত্রে উহার অর্থ—শত্রুজয়াদির উপায়-রহস্য; তদ্বিষয় অবলম্বনে রচিত এই অধিকরণ। Secret means (SH)।

মূল :—১ তন্ত্রযুক্তি-সমূহ। ইতি 'তন্ত্রযুক্তি'-নামক পঞ্চদশ অধিকরণ।

সঙ্কেত :—তন্ত্রযুক্তিসমূহ—"তন্ত্রং তন্ত্রাবাপাত্মকমিদমর্থশাস্ত্রং, তস্য যুক্তিঃ ব্যাখ্যানোপায়ভূতো ন্যায়ঃ"—(গঃ শাঃ); paragraphical divisions of this treatise (SH)। এই অনুবাদটি মোটেই মূলানুগ হয় নাই। 'তন্ত্র' বলিতে বুঝায় শাস্ত্র। 'তন্' ধাতুর অর্থ বিস্তার। 'তন্ত্র' বলিতে এস্থলে বুঝাইয়াছে এই অর্থশাস্ত্রকেই। সেই তন্ত্রের (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের) যুক্তি (অর্থাৎ ব্যাখ্যানের উপায়ভূত ন্যায়)—গঃ শাঃ। যুক্তি—অর্থশাস্ত্র ৩২ প্রকার যুক্তিযুক্ত—ইহা মূল প্রকরণে বলা হইয়াছে। যুক্তিগুলি কি কি? অধিকরণ, বিধান, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, অতিদেশ, প্রদেশ ইত্যাদি। অধিকরণ কি? যে বিষয় অবলম্বনে গ্রন্থের একটি অংশ উক্ত হয়, সেই বিষয়ের আলোচনাত্মক-গ্রন্থাংশের নাম—'অধিকরণ'। এইরূপে মূল প্রকরণে ৩২ প্রকার যুক্তিরই লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। অতএব, মোটামুটি 'যুক্তি' বলিলে 'পরিভাষা' বুঝাই উচিত। তন্ত্রযুক্তিসমূহ—অর্থশাস্ত্রোক্ত পরিভাষা-সমূহ—technical terms of (this) branch of learning—এইরূপ ভাষান্তর করাই সঙ্গত। শ্যামশাস্ত্রী অধিকরণটির নামের (headingএর) ইংরাজী করিয়াছেন—The plan of a treatise.

মূল :—শাস্ত্রসমুদ্দেশ।—পঞ্চদশ অধিকরণ, এক শত পঞ্চাশ অধ্যায়, এক শত আশী প্রকরণ (ও) ছয় হাজার শ্লোক।

সঙ্কেত :—শাস্ত্র-সমুদ্দেশ—সমগ্র অর্থশাস্ত্রের সূচী প্রদর্শনের পর গ্রন্থকার সংক্ষেপে গ্রন্থের পরিমাণ দেখাইতেছেন। Such are the contents of this science—শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ মূলানুগ নহে—কেবল বলিলেই হইত—Extent of (this) branch of learning. সমুদ্দেশ—প্রসার, বিস্তার, পরিমাণ extent, scope, jurisdiction; কতদূর শাস্ত্রের প্রবৃত্তি, তাহা সবিস্তরে দেখাইবার পর অধুনা সংক্ষেপে উহার অধিকরণ-অধ্যায়-প্রকরণাদির সংখ্যা নিরূপণ করা হইতেছে। শ্লোক—অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত—উহাতে থাকে ৩২ অক্ষর। গদ্যরচনাতেও ৩২টি অক্ষর লইয়া যে গ্রন্থাংশ—তাহাকে 'শ্লোক' বা 'গ্রন্থ' বলা হয়—32 syllables.. দশকুমার-চরিতের অষ্টমাধ্যায়ে দণ্ডী বলিয়াছেন—'বিষ্ণুগুপ্ত-রচিত দণ্ডনীতি ষট্-সহস্র-শ্লোকাত্মক'।

মূল :—(এই যে) শাস্ত্র কৌটিল্য-কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে—উহার গ্রহণ ও বিজ্ঞান সুখ-সাধ্য—উহার তত্ত্ব-অর্থ-পদ নিশ্চিত ও উহাতে গ্রন্থবাহুল্য পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সঙ্কেত :—সুখগ্রহণবিজ্ঞেয়ম্—সুখে (অর্থাৎ অক্লেশে) যাহার গ্রহণ ও বিজ্ঞান হয়। গ্রহণ—কণ্ঠস্থী-করণ। বিজ্ঞান—বোধ। যাহা অনায়াসে কণ্ঠস্থ করা যায় ও বুঝা যায়। গণপতি শাস্ত্রী সমাস ভাঙ্গিয়াছেন দুরাইয়া অন্যরূপে—সুখকর গ্রহণ (বুদ্ধি) যাহাদিগের—সুখগ্রহণ অর্থে সুকুমারমতি; তাহাদিগেরও দ্বারা বিজ্ঞেয়। সুকুমারমতি যাঁহারা তাঁহারাও ইহা বুঝিতে পারেন; easy to grasp and understand (SH); 'easy to memorise' বলা উচিত ছিল। তত্ত্বার্থপদনিশ্চিতম্—যাহা তত্ত্বতঃ, অর্থতঃ ও পদতঃ সুনিরূপিত। তত্ত্ব—অর্থের যাথার্থ্য। অর্থ শব্দের বাচ্য বিষয় (object import)। পদবাচক শব্দ (word)। তত্ত্ব, অর্থ ও পদ যাহাতে (যে শাস্ত্রে) নিশ্চিত—সুনিরূপিত (গঃ শাঃ); শ্যামশাস্ত্রীর অর্থ—যাহাতে পদের অর্থ তত্ত্বতঃ নিরূপিত—in words the meaning of which has been definitely settled. কিন্তু উক্ত পদটি হইতে ব্যাকরণ-সঙ্গতি রক্ষা-পূর্ব্বক এরূপ অর্থ করা যায় না। বরং তত্ত্বতঃ অর্থ ও পদ যাহাতে নিশ্চিত—এরূপ অর্থ করা চলে। বিমুক্তগ্রন্থবিস্তরম্—যাহাতে গ্রন্থবাহুল্য নাই অর্থাৎ স্বল্পাক্ষর—সূত্রাকারে রচিত; bereft of undue enlargement (SH)। Bereft of excess of words বলিলে ভাল হইত।

"ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে 'বিনয়াধিকারিক' নামক প্রথম অধিকরণে 'রাজবৃত্তি'-নামক প্রথম অধ্যায়।

[কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বিরাট সূচীপত্র এইখানে সমাপ্ত হইল। আগামী সংখ্যা হইতে মূল-গ্রন্থারম্ভ করা যাইবে।]

প্রেমিক-কবি কৃষ্ণকমল

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

বাঙ্গালাদেশে এমন লোক খুব কমই আছেন, যাঁরা প্রেমিক-কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নামের সঙ্গে পরিচিত নন্। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পর এমন মধুর্মী পদ-কর্ত্তা খুব কমই জন্মেছেন, এ কথা বল্লে বোধ হয় অসঙ্গত হ'বে না। কৃষ্ণকমলের প্রেম-পীযূষপূর্ণ অপূর্ব সংগীতে গায়ক ও শ্রোতা—উভয়েরই চোখ জলে ভরে উঠে। কোল্‌কাতা অঞ্চলে গোবিন্দ অধিকারীর অনুপ্রাস-মাধুর্য্যে যখন শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, সেই সময় গোস্বামী-প্রবর পূর্ব-বঙ্গ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণকমল বৈদ্য-বংশজাত। বাড়ী নদীয়া জেলার বর্ত্তমান মাজদিয়া রেলওয়ে-ষ্টেশন থেকে দুই মাইল দূরে ভাজনঘাট গ্রামে। এইখানে নদীয়ার সুসন্তান-রূপে ১৮১০ খৃঃ অব্দে তিনি আবির্ভূত হ'ন। তা'র পর নদীয়া ও বৃন্দাবনে বাল্য-জীবন অতিবাহিত হ'বার পর, কৃষ্ণকমল ঢাকা যেয়ে বসবাস করতে থাকেন। এইখানেই তাঁ'র কর্মজীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত হয়। গোস্বামীম'শায় আজ পরপারে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ১২ই মাঘ ৭৭ বৎসর বয়সে চুঁচ্‌ড়োর নিকট গঙ্গাতীরে তিনি দেহরক্ষা করেছেন—কিন্তু আজও তাঁ'র নামে ভক্তগণের চক্ষু সলিলার্দ্র হয়।

পঠদ্দশাতেই কাব্যলক্ষ্মী কৃষ্ণকমলের মনোমন্দিরে এসে আসন পেতেছিল। নবদ্বীপে টোলে অধ্যয়নকালেই তিনি "নিমাই সন্ন্যাস" পালা রচনা করেন এবং এইখানেই এর প্রথম অভিনয় করে তিনি দর্শকমণ্ডলীকে তাঁর অন্তর্নিহিত অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়ে দেন। এ'র পর ঢাকায় কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি অপূর্ব্বপ্রেমময় "স্বপ্নবিলাসের" গ্রন্থ-কর্ত্তারূপে পরিচিত হ'ন। এই গ্রন্থই তাঁ'র ভবিষ্য-জীবন গৌরবময় করে তুলতে রেখাঙ্কিত করেছিল। "L'Allegro" এবং "Il Penseroso" যেমন "Paradise Lost" এর সূচনা, স্বপ্নবিলাস-কাব্য তেমন প্রেমের অমৃত উৎস "রাই উন্মাদিনীর" (দিব্যোন্মাদ) সূচনা। মনোজ্ঞ-ভাবধারা "স্বপ্নবিলাসকে" আঁকড়ে-ধরে কবির হৃদয়-পটে এসে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু এই খানেই এর শেষ নয়, হৃদয়-বিমোহন ভাবধারা রচনা করেই কৃষ্ণকমল ক্ষান্ত হ'ন নি। বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক জায়গায় ভেঙ্গে-চুরে তিনি এমন ভাবে তৈরী করেছেন, যা' পূর্বে কেউ কল্পনা করতে পারে নি। উদাহরণ রূপে মাথুরের সেই সর্বজনপরিচিত গানটির কথাই ধরা যাক :—

> "প্রাণাধিকা রে সখি কাহে তোরা রোয়সি
> মরিলে হাম করবি ইহ কাজে
> নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি
> রাখবি এই ব্রজকি মাঝে" ইত্যাদি।

অনেক কবিই এই গানটাকে ভেঙ্গে গড়েছেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক নামকরা কীর্ত্তনীয়াও গানের আসরে এর উপর আখর দিয়ে, রং ফলিয়ে অপূর্ব কারুণ্য ঢেলে দেন। কৃষ্ণকমলও এর অনুকরণ লোভ সামলাতে পারেন নি। তবে তাঁ'র মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন ভাবকে ভেঙ্গে-চুরে একই ভাবধারায় দাঁড় করালে নতুন আর কি হোল ? অমনি তিনি যোজনা করলেন,—

> মৃত তনু দেখিলে নয়নে আমার প্রাণবল্লভ গো,
> পাছে সতীপতি শিবের মত হয়ে বঁধু উন্মত্ত,
> নাহিয়ে বা ফিরে বনে বনে, তাই মনে ভাবি গো,
> যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে
> সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে !—স্বপ্নবিলাস।

এই নূতন ভাবটুকু কি অপূর্ব ! বিরহে রাধার প্রাণ জর্জরিতা, কিন্তু তবু তো কৃষ্ণ-প্রেমে সে সন্দিগ্ধা নয় ! নিঃস্বার্থ ভালবাসায় কি কখনও অবিশ্বাস আসে ? ভালবাসিয়া ভালবাসার সামগ্রীকে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে গেলে তো আত্মসুখ-লালসাই প্রকটিত হ'য়ে উঠে। লালসায় ভালবাসায় সুখ কোথায় ? এ থেকেই সংসারে যত গোলমাল —হিংসা, দ্বেষ, সকলেরই জন্ম এই স্বার্থসুখান্বেষণের প্রবৃত্তি থেকে। রাধার মরণেও সুখ ; কিন্তু তবু সে অবিশ্বাসের ডালি মাথায় নিয়ে মরতে চায় না, কেননা সে তো কৃষ্ণ-প্রেমে নিরাশ হয়নি ! বরং তা'র অভাবে বঁধু পাগল হ'য়ে যাবেন, মৃতের ভারে কোমলাঙ্গে ব্যথা পাবে, মরণ সময়ে রাধা এই চিন্তাতেই পাগলিনী !

"স্বপ্নবিলাসের" পর গোস্বামীম'শায় "রাই-উন্মাদিনী," "বিচিত্র বিলাস," "ভরতমিলন," "নন্দহরণ," "সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি পালা রচনা করেন। কথাপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে "The Popular dramas of Bengal" প্রণয়ন করে "ডক্টর" উপাধী লাভ করেন।

"রাই-উন্মাদিনী" একখানা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই গ্রন্থ প্রণয়নে গোস্বামী-ম'শায়ের যে কবিত্ব শক্তি বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তা' বর্ণনাতীত। এই একখানি গ্রন্থ থেকেই তিনি জাতির স্মরণপটে চিরমুদ্রিত হ'য়ে থাকবেন। অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবন-পাগলিনী শ্রীরাধার নামে নদের পাগল শ্রীগৌরচন্দ্রের। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতের শেষ অঙ্কে যে নদীয়া-জীবন-ধনকে আঁকতে চেষ্টা করেছেন, কৃষ্ণকমলের হাতে সেই ছবিই রাই উন্মাদিনীতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। চটকপর্বত দেখে গোবর্দ্ধন ভ্রান্তি, কুসুম-বন দেখে বৃন্দাবন ভ্রান্তি, কৃষ্ণভ্রমে জলদ নেহারি নয়নে ঝরলোর'—সেই নদীয়ানাথের জীবনকথা এক দিব্য-ভ্রান্তির ছায়া। রাই-উন্মাদিনীর রাধাও তাই, তা'র করুণাত্মক গীতি-ধারায় পাষাণও দ্রব হয়।

যেমন রাধিকা, তেমন চন্দ্রা। চন্দ্রার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিন আজ শেষ হ'য়ে গেছে। এতদিন ঈর্ষায় রাধার মুখ সে দেখে নি ; কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহে সমবেত সখীগণ-মাঝে যখন শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা, তখন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে সে রূপ-মাধুরী দর্শন করতে না এসে সে পারে নি। শ্রীরাধার রূপ দেখে চন্দ্রার চমক্ ভাঙল। আজ তা'র জ্ঞান হ'ল, রাধার এই রূপ তো বাইরের রূপ নয়, যে-রূপ সন্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হ'য়ে যেয়ে চন্দ্রাবলীর পাশে থেকেও 'রাধা' 'রাধা' বলে কেঁদে উঠতেন, এ সেই রূপ :—

> তা নৈলে এমন হবে বা কেন গো—
> বঁধু থেকে আমার গো বক্ষঃস্থলে,
> অমনি কেঁদে উঠত রাধা বলে।

কৃষ্ণকমল পরম-প্রেমিক বৈষ্ণব কবি। বৈষ্ণব কবির কাছে ভগবানের রূপ যেমন ভাবে ধরা পড়েছে, এমন ভাবে আর কোথায়ও পড়েছে কিনা জানি না। বৈষ্ণব কবি পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বর-প্রেম অনুভবের চেষ্টা করেছে। যখন দেখেছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, তখন সমস্ত হৃদয়খানি ভাঁজে ভাঁজে খুলে আপন সন্তান-মাঝারে ভগবৎ-সত্তারই অনুভব করেছে। যখন দেখেছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনাপন আত্মাকে সমর্পণ করার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য্য অনুভব করেছে।

বৈষ্ণব-কবির আঁখি বুঝি নির্মল, তাই জগতের সমস্ত সবাই তা'র কাছে ভগবৎ-মূর্তিতে প্রতিভাত। একবার কৃষ্ণকমলের ভাষায় রাধা-পাদ-পদ্মের সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করুন। এখানেও সেই চন্দ্রারই কাহিনী। চন্দ্রার 'ভিতর দুয়ারের' শিকল আজ খুলে গিয়েছে। আজ রাধার সম-দুখের দুখিনী সে। কষ্টের সময় পূর্বের দুঃখসমূহ পুঞ্জীভূত হয়ে মানব-হৃদয়কে তিলে তিলে দগ্ধ করতে থাকে। চন্দ্রার দশা আজ তাই। হঠাৎ তার স্মরণ হ'ল রাধা-চরণ-কমলের কথা—

> "হায় গো, অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি,
> আলতা পরাত বঁধু কতই বাখানি।
> এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়া গো—
> বঁধুর অনুরাগে গো,
> যেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিয়ে দেই হিয়ে।"

আলতা পরাবার সময় শ্রীকৃষ্ণ রাধা-পাদ-পদ্মের কত ব্যাখ্যাই না করতেন। তাই সে 'অতুল রাতুল চরণ দুখানি' চন্দ্রার কাছে এত সুন্দর বলে প্রতিভাত হ'য়েছিল। আবার সেই চরণ-কমলে পথ হেঁটে কৃষ্ণদর্শনের জন্য পাগলিনীপ্রায় শ্রীরাধা যখন ছুটে চলতেন, তখন চন্দ্রা সেই পথে আপন হৃদয় পেতে রাখতে চান—যেন কৃষ্ণ-অনুরাগিনীর চরণ-পদ্মে কাঁটা না ফুটে।

আসুন আমরা আর একবার বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া লই। শ্রীরাধা মৃতকল্পা—শ্যামকুণ্ড-পার্শ্বে শায়িতা, অর্দ্ধাঙ্গ জলে নিমজ্জিতা, সখীগণ 'রাই বোল', রাই বোল, শব্দে ক্রন্দনরতা। রাধিকা প্রেমমাধুরী, তুলাদণ্ডে তার ওজন চলে না, আয়েসা-কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তুলনায় সে-প্রেমের পরিমাপ করতে পারা যায় না। চন্দ্রা বলছে, দাসখত দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সে মথুরা থেকে ধরে আনবে। রাধিকার আর সহ্য হ'ল না। সে ব্যথিত অন্তঃকরণে সভয়ে বলে উঠলো—

> "বেঁধ না তার কোমল করে, ভৎ'সনা কর না তারে ;
> মনে যেন নাহি পায় দুখ।
> যখন তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে,
> তাই ভেবে কাটে মোর বুক। (রাই-উন্মাদিনী)

এই যে নির্মল আত্মত্যাগের অশ্রুপূর্ণ প্রেমকাহিনী, কৃষ্ণকমল তাই গীতির ছন্দে বলে গেছেন। আজকাল অনেকে হয়তো এই অশ্রুবিন্দুর মূল্য দিতে চাইবেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, এই হচ্ছে বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীচৈতন্য এই অশ্রুকেই পুনর্জীবিত করে সমস্ত দেশ জয় করে গেছেন। জগতে যাঁরা ধর্মমত সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁরা হয় বক্তৃতা, উপদেশ অথবা গ্রন্থ-প্রণয়ন দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সফল করতে যত্নবান হয়েছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য এর কোন পথই অবলম্বন করেন নি। বুদ্ধের মত তিনি উপদেশ দেন নি, বিবেকানন্দের মত তিনি বক্তৃতা করেন নি, বাদরায়ণ বা কপিলের ন্যায় তিনি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হ'ন নি, শঙ্করাচার্য্য বা বল্লভাচার্য্যের মত বেদান্ত-সূত্র বা গীতা-ভাষ্য সংরচনেও তাঁ'র প্রবৃত্তি জন্মেনি। অথচ তাঁর একবিন্দু অশ্রুপাতে যে প্লাবন এসেছিল, তা'র ঢেউএ এখনও সমস্ত দেশ ভেসে চলেছে। অনেকে হয়তো একে Sentimentalismএর লক্ষণ বলে উপহাস করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বয়ং চৈতন্যদেবকেও বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট ভাবুক বলে ভৎ'সিত হ'তে হয়েছিল, কাশীর প্রকাশানন্দস্বামীও তাঁকে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁ'রাই আবার শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমলে লুটিয়ে পড়ে জগতে আদর্শ রেখে গেলেন।

পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণকমল তাঁর কাব্য-পটে, বিশেষ করে 'রাই-উন্মাদিনী'তে বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীরাধার নামে নদীয়া-জীবন-ধনকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকমলের রাধিকা যেন চৈতন্যদেবেরই ছায়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে লীলা এদেশে করে গেছেন, তার প্রতি কথাটাই যেন কৃষ্ণকমল-কাব্য-ধারায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য কে, কেনই বা নদীয়াতে শচী দুলালরূপে তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, তা' আমরা জানি না। শুধু এই মাত্র জানি, সন্ন্যাসীরা যাঁকে দিন-রাত পাগলের মত খুঁজে বেড়ায়, সিদ্ধ পুরুষরা যাঁকে পেতে চেয়ে কেবল কতকগুলো অলৌকিক শক্তি অর্জন করে থাকে, সেই করুণাসিন্ধুর ছায়া চৈতন্যদেবের অশ্রুসজল চোখের ভিতর দিয়ে ভারতবাসী একবার মাত্র দর্শন করেছে, আর সেই রূপ-মাধুরী এখনও অঙ্কিত আছে বৈষ্ণব-পদাবলী তথা কৃষ্ণকমল-কাব্যের স্বর্ণপটে।

পোলাণ্ড—১৯৪১ সালের পরে

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব মঃ ভিসিন্‌স্কির ১৯৪৩ সালের ৬ই মের বিবরণে দেখা যায়:—১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের চুক্তি অনুসারে সোভিয়েটে পোল্ বাহিনী গঠিত হয়। ৩০০০০ সেনা দিয়ে এই বাহিনী প্রথমে গঠিত হয় সেনাপতি হন জেনারেল এণ্ডার্স! ২৩শে অক্টোবর সৈন্যসংখ্যা বেড়ে যায়! ৪১৫৬১ জনের মধ্যে ২৬৩০ জন হলেন অফিসার বা নায়ক। শেষ পর্য্যন্ত জেনারেল শিকোর্স্কির অনুরোধে ৬ ডিভিসন (৯৬০০০) সেনাদল ও ৪০০০০ সেনাবিশিষ্ট রিজার্ভ বাহিনী গঠন করা হয়। শিক্ষা সাজ সরঞ্জাম ও রণসম্ভারের দিক থেকে এই সেনাদল ও লালফৌজ পেয়েছিল সোভিয়েট সরকারের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বহীন সাহায্য ও সহযোগিতা। পোল্ সরকারের অনুরোধে এই সেনাদলের শিক্ষার জন্য সোভিয়েটের দক্ষিণাংশে ভলগানদীর মাঝপথে, সোভিয়েট সরকার যুদ্ধকালীন নানা অসুবিধা সত্বেও সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র ও সেনাবাস তৈরী করে দিলেন। কিন্তু শিক্ষা শেষ হওয়া সত্বেও এই সেনাদলকে জেনারেল এণ্ডার্স রণাঙ্গনে যেতে দিলেন না। নানা ওজুহাত দেখিয়ে দেরী করতে লাগলেন, যদিও ১লা অক্টোবর তাদের যুদ্ধে পাঠানর কথা ছিল। জেনারেল এণ্ডার্স বল্লেন যে তাদের ১লা জুন পাঠান হবে। শেষে যুদ্ধ ক্রমেই বেড়ে চল্ল, খাদ্যাভাব দেখা দিল। সোভিয়েট সরকারের পক্ষে অনুরূপ এতগুলো বাড়তিলোককে খাওয়ানো কঠিন হয়ে পড়ল। তবুও সোভিয়েট সরকার জানালেন যে ৪৪০০০ সেনাকে তাঁরা খাদ্য জোগাবেন কিন্তু তার বেশী অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে পোল সরকার বাকি সেনাদলকে ইরাণে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। ১৯৪২এর মার্চে তারা ইরাণে চলে গেল জেনারেল এণ্ডার্সের নেতৃত্বে। তারপর জুন মাসেও পোল বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠান হোলনা। আগষ্টে আরও ৪৪০০০ সেনা ইরাণে চলে গেল। ইতিমধ্যে এই সব সেনাদের পরিবারবর্গকেও ইরাণে পাঠানর ব্যবস্থা সোভিয়েট সরকারকে করতে হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে সোভিয়েট সরকার মোট ৭৫৪৯১ জন সেনা ও তাদের ৩৭৭৫৬ জন-পরিবারের ইভ্যাকুয়েশনের বন্দোবস্ত করেন। অথচ পোল সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের লিখিত চুক্তি ছিল যে পোল-বাহিনী লাল ফৌজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়বে—যাদের কষ্ট স্বীকার করা ক কথা নয়, বিশেষ করে খাদ্যের ব্যাপারে। এই ভাবে সোভিয়েট সরকার সাহায্য করলেন ; তারা কি ভাবে প্রতিদান দিয়েছে তা দেখা যাক।

পোল বাহিনীর একজন বিখ্যাত নায়ক কর্নেল বেরলিংকে জেনারেল এণ্ডার্স বলেন, "এই দূর অঞ্চলে (ভলগাতীরে) থাকায় আমি খুব খুসি

……জার্মান আঘাতে লালফৌজ যখন খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে এবং তা ২।১ মাসের মধ্যেই হবে, আমরা কাস্পাশিয়ান সাগর দিয়ে ইরানে চলে যাব। আমরাই হব তখন একমাত্র সশস্ত্র সেনাদল; সুতরাং তখন আমরা যা খুশী তাই করতে পারব।

বর্তমানে পোল মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কর্নেল বেরলিং লিখেছেন, "যখন মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়, সোভিয়েট সুহৃদদের নাম দেওয়া হয়, "দেশদ্রোহী"……শেষে জেড্ ডব্লিউ জেড্ নামে পোল সেনাদলের সোভিয়েট বিরোধী গোয়েন্দাবিভাগ, এই দেশ-বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিত। এদের মেরে ফেলা হোত টোটনগরে।

মিঃ ভিশিনস্কি লিখেছেন, "দূতাবাসের পোল প্রতিনিধিরা সোভিয়েট সরকারের উপকারের প্রতিদানে পোল গুপ্তচরের কাজ সুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন জেনারেল ভলিকোভস্কি—পোল সামরিক মিশনের নেতা। তাছাড়া আরো অনেকগুলি বিখ্যাত কূটনৈতিক ছিলেন। এঁরা সকলেই ধরা পড়েন এবং আদালতের বিচারে তাঁদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হয়। আদালতে দেখাযায় যে তাঁরা শুধু গুপ্তচরের কাজ করেননি। মিথ্যাকুৎসা রটিয়েছেন সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে, হিটলারের গুণগাথা প্রচার করেছেন, পরাজয় মনোবৃত্তি ছড়িয়েছেন। প্রমাণের ভারে সকলেই শেষ পর্যন্ত দোষ স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জেনারেল এণ্ডার্স বলেন ;—

"জার্মানদের পরাজয়ের এখন বহু দেরী আছে। পরিকল্পনামতই হিটলার নীপারের দিকে পশ্চাদপসরণ করছেন। সুতরাং এবছর দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কোন দরকার নাই।"

গত বছর পোল প্রধান সচিব জেনারেল শিকোস্কির মৃত্যুর পর ইরাণের পোল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হন জেনারেল সস্নোভস্কি। তিনি চরমভাবে সোভিয়েট বিরোধী। তাঁর নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডে একদল দেশদ্রোহী, পোল দেশপ্রেমিক গরিলাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে নাৎসীদের উচ্ছেদ না করে। শিকোস্কি যখন ১৯৪১ সালে সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করেন, তাঁর কাজের প্রতিবাদ হিসাবে সস্নোভস্কি পদত্যাগ করেন।

লণ্ডন প্রবাসী পোল-সরকার সস্নোভস্কি এণ্ডার্স চক্রান্তের দ্বারা পরিচালিত। এঁরা হিটলারের চেয়েও স্বদেশবাসীদের বেশী ভয় করেন।

স্বদেশপ্রেমিকদের উদ্যমে যখন পোল-বাহিনীকে ইরাণে স্থানান্তরিত করা হোল পোল্যাণ্ডের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমিকেরা তাতে বাধা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কর্নেল সিভিক, বিখ্যাত লেখক ('রেণ-বো' প্রণেতা), ভাণ্ডা ভাসিলেভ্স্কা, ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। পরে এঁরা সকলে মস্কোতে পোল মুক্তি বাহিনী গঠন করেন। সংসদের মুখপত্র হয় ভলনা পোলস্কা নামে একটি পত্রিকা। মুক্তি বাহিনীর ২টি ডিভিশন (কোশিউস্কো ও ডম্‌রোভস্কি ডিভিশন) লালফৌজের সঙ্গে নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

মুক্তি সংসদের উদ্দেশ্য পাঁচটি :—

(১) পোল-সীমান্তকে পশ্চিমে বিস্তৃত করা। (২) পশ্চিম ইউক্রেন ও বাই লোরুশিয়া সোভিয়েটকে ফিরিয়া দেওয়া। (৩) সর্বদলীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা। (৪) প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষকে তাড়িয়ে জমি চাষীদের ভাগ করে দেওয়া। (৫) রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে পলাতক প্রবাসী দলগুলো ছাড়া, অন্য সমস্ত দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা।

সস্নোভস্কি এণ্ডার্স চক্রান্ত এই পাঁচটি উদ্দেশ্যের বিরোধী। তাঁরা চান মধ্যযুগসুলভ অত্যাচারী সামন্ত তন্ত্রের সাহায্যে রাজ্য শাসন করতে। তাঁরা ইউক্রেন ও বাইলোরুশিয়াকে অন্যায় ভাবে সোভিয়েটের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চান। সোভিয়েটের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের (পোল সরকার) বৈদেশনীতি সম্বন্ধে এর আগেই অনেক বলেছি। তাছাড়া বাইলোরুশিয়া ও পশ্চিম উক্রেন দাবী করা পোল সরকারের অত্যন্ত অন্যায় এবং লর্ড এসকুইথের মতে (১৯২৯ সালের ১০ই আগষ্টে কমন্স সভায় বক্তৃতা দ্রষ্টব্য),…"a purely aggressive adventure…a wanton surprise." তার পর ১৯৪১ সালে রুশ-পোল চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময়ে লণ্ডনস্থ পোল সরকারের অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন। মিজস্ পোলস্কা পত্রিকা তার ক্যাপিষ্ট, মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছিল" ইউরোপের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সোভিয়েটের প্রবেশে চিরদ্বন্দ্বই সূচিত হচ্ছে। রুশিয়া হচ্ছে ইউরেশীয় সাম্রাজ্য, ইউরোপীয় সাম্রাজ্য নয়।"

জার্মানী এ পর্যন্ত যতগুলো জয়লাভ করেছে সব জায়গাতেই তার প্রধানতম, গোপনাস্ত্র ছিল 'বলশেভিক জুজুর ভয় দেখান'। আজ পর্যন্ত সে এই গোপনাস্ত্রের আশা ত্যাগ করেনি। ১৯৪৩ সালের ১১ই এপ্রিল জার্মান ট্রান্সওশান নিউজ এজেন্সী সংবাদ দিল—

"রুশিয়াস্থিত ১০০০০ পোল সামরিক অফিসার দের স্মলেনস্ক নগরের কাছে ক্যাটিন্ অরণ্যে রুশরা ঘাড়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ২৮ ১৬ মিটার চওড়া একটি প্রকাণ্ড কবর খুঁড়ে, ১২টি স্তরে কবর দেওয়া হয়েছে। এঁদের ১৯৪০ শালের ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে গুলি করা হয়। "ওগপু" দল (রুশ রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগ) এঁদের পকেটে পরিচয় পত্র রেখে দেওয়ায় এই মৃত অফিসারদের চিনতে অসুবিধা হয়নি।"

জার্মান হোম নিউজ ১৩ই এপ্রিল ব্যাপারটি সবিস্তারে ঘোষণা করে মন্তব্য করে, "বলশেভিক ইহুদীদের ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশিত হোল। স্মলেনস্কের ব্যাপার, মানবতার এই ভয়াবহ শত্রুর বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছে।"

একই ঘটনা সম্বন্ধে ক্রমেই নানারকম খবর আসতে থাকে যেগুলোর একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল নেই। কে প্রথম এই কবরটি আবিষ্কার করে, কখন আবিষ্কার করে, এবং কবরে কতগুলো মৃতদেহ ছিল, তা নিয়ে নানা খবর বেরুল। প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল যে গুলি করে মারা হয়েছে। তারপর বেরুল তাদের হাত পা বেঁধে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। শেষে সঙ্গীন দিয়ে হত্যা করার খবরও বাদ যায়নি। প্রত্যেকটী খবরই কিন্তু জার্মান। ক্রমশঃ

বন্ধন

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

বক্ষের মাঝে কর হানি দিয়ে মৌন গভীর বেদনা,
মাগে অবকাশ রুদ্ধ নিশাস তন্দ্রার ছায় চেতনা।
বিলাপ-বিহীন অশ্রু হারানো একি জ্বালাময়ী ক্রন্দন,

তোমায় আমায় নাই ব্যবধান নিবিড় গভীর বন্ধন।
ভূলোক দ্যুলোক এক করে রাখে যে বিরহ ব্যথাভারে,
তোমার স্মরণে জীবনে মরণে ফিরি ওরই অভিসারে॥

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও শিল্পপ্রসার

যুদ্ধ অনেকটা বন্যার মত। বন্যা যেমন ঘর বাড়ী ভাসাইয়া বহু ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়, আবার জল নামিয়া গেলে জমিতে নব-জীবনের সঞ্চার দেখা যায়, যুদ্ধের ধ্বংসময় রূপের আড়ালেও সেইরূপ লুকাইয়া থাকে নূতন প্রাণস্পন্দন। যে দেশের অন্তর্ভাগে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া ওঠে, অভাবের অনুশোচনায় ও দেশপ্রেমের গৌরবে সেই দেশের সমস্ত নরনারী নূতন আশার আলোকে নিজেদের যাত্রাপথ রঙীণ করিয়া তোলে। এইভাবে জয়ে বা পরাজয়ে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া জাতি—নবজীবনের সূত্রপাত করিবার বহু সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের পক্ষেও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া জীবনকে চিনিবার সার্থক সুযোগ জুটিয়াছে। এই যুদ্ধের পরে যাহারা রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতেছে অথবা যাহারা সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্রের মারফৎ পৃথিবীকে ঘরের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহারা কিছুতেই গতানুগতিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইয়া সুখী হইতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদের জন্য নূতনভাবে জীবনযাপনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাস্তবিক আজ যাহারা বাড়তি টাকায় জীবনকে সঙ্গীতময় করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাদের পক্ষে চিরকাল এই সৌভাগ্য ভোগ করা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ থামিলেই তাহাদের অনেকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। এই সব অস্থায়ী আলোকভ্রান্ত পথচারী লক্ষ লক্ষ নরনারীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব সন্দেহ নাই, তবে এদিক হইতে দেশবাসীরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। ভারতের যুদ্ধোত্তর যে কোন পরিকল্পনায় আর্থিক সমস্যার স্থান পুরোভাগে, কারণ অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভের উপর ভারতবাসীর জীবন পর্য্যন্ত বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। চল্লিশ কোটি লোক যে দেশের অধিবাসী এবং প্রাকৃতিক সম্পদ যে দেশে যুগে যুগে সারা পৃথিবীর অসংখ্য নরনারীকে শোষণে প্রলুব্ধ করিয়াছে, সে দেশে বাস করিয়া শতকরা ৮০জন মানুষ দুবেলা দুমুঠো উদরান্নের পর্য্যন্ত সংস্থান করিতে পারে না, ইহা সত্যই নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এ দেশকে পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার খানিকটা সুযোগ করিয়া দিলেও কুটীর-শিল্পের যুগের ভারতের স্বাবলম্বী বনিয়াদ তাঁহারা চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, অথচ দূরদৃষ্টি এবং ঔদার্য্যের অভাবশতঃ লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনরক্ষায় উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দেন নাই। তাছাড়া জন কোম্পানীর আমল হইতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজশক্তির বিশ্বাস ছিল যে ভারতে শিল্পাদি প্রসারিত হইলে ভারতবাসী বিলাতী পণ্য কিনিতে চাহিবে না এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে বশে রাখা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই অন্ধ দুর্ব্বলতার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে শিক্ষার আলোক বিতরণে কার্পণ্য করিয়াছেন এবং এই বিরাট দেশকে অসহায়ভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য করিয়া একদিকে তাঁহারা যেমন আমাদের জীবন্মৃত রাখিয়া দিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ভারত-বাসীর দারিদ্র্যজনিত অক্ষমতার জন্য নিজেদের পণ্যও এদেশে বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি ব্রিটিশ ইনষ্টিটিউট অফ এক্সপোর্টস প্রভৃতি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া গভর্ণমেণ্টকে কতকটা উদার মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে। ভারতের জনগণের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিল্প প্রসারের এবং যথেষ্ট পরিমাণ সঙ্গে ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়া যাওয়ার ফলে টাকার প্রচলন গতিও বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশী ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর পণ্যই এদেশবাসী যথেষ্ট পরিমাণে কিনিতে সক্ষম হইবে। বাস্তবিক ভারতের আর্থিক সমস্যা এদেশের সকল সমস্যার মূল কারণ। সাম্প্রদায়িক যে মনোমালিন্য আজ ভারতের মেরুদণ্ড শিথিল করিয়া দিয়াছে তাহার মূলেও হিন্দু-মুসলমান সাধারণ সমাজের কঠোর অনটনের সুবিধা লওয়া জনকতক স্বার্থবাদী অর্থবান ব্যক্তির লোভ বিরাজ করিতেছে। জাতির এই সর্ব্বনাশা দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে সমস্ত দেশের লোকের কর্ম্মসংস্থান বিশেষ প্রয়োজন। এই সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান (Total employment) সম্ভব হইলে ভারতে প্রভূত শিল্পপ্রসারের প্রয়োজন, কারণ শিল্পাদিতে কৃষিক্ষেত্রের উপর বর্ত্তমানে নির্ভরশীল বাড়তি লোক দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিলে তাহারা বেশীদরে কৃষিপণ্যও কিনিতে পারিবে এবং কৃষকরাও স্বচ্ছলতার মধ্যে দিনযাপন করার সুবিধা পাইয়া শিল্পজাতদ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে। তারপর দেশবাসীর বর্দ্ধিত আয়ের সুযোগে গভর্ণমেণ্টেরও আয় বৃদ্ধি হইবে এবং তখন গভর্ণমেণ্টও কৃষি-কর্ম্মে আধুনিকতা সম্পাদনে সক্রিয় সাহায্য করিতে পারিবেন। মোটের উপর যতদিন পর্য্যন্ত শিল্প প্রসারের যথেষ্ট আয়োজন না হইতেছে ততদিন কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিসাধন দূরের কথা, ক্রমবর্দ্ধমান চাপের জন্য কৃষি-ক্ষেত্রের দিন দিন অবনতিই হইবে। বোম্বাই পরিকল্পনা এই শিল্প-প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং এই শিল্পপ্রসার কৃষির উন্নতির অনুপূরক বলিয়াছে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় খণ্ডে শিল্পপ্রসার ও কৃষির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হওয়ার সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া সমতা রক্ষার সম্বন্ধেও কার্য্যকরী কতকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া রাষ্ট্র দেশীয় শিল্পাদির ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণসূচক কিছু কিছু অধিকার হাতে রাখিবে বলিয়া শিল্পাদিতে যেমন ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা ভোগ সবচেয়ে বড় কথা হইতে পারিবে না, গভর্ণমেণ্টও তেমনি কৃষির ও শিল্পের সহযোগিতা সম্পাদনের দ্বারা দেশের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সম্পাদন প্রচেষ্টায় কতকটা সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। বোম্বাই পরিকল্পনা অবশ্য দোষত্রুটির অতীত নয় এবং সমাজতন্ত্রবাদী মনের কাছে সমাজতন্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রবাদের প্রত্যাশিত আপোষ আকাশকুসুম বলিয়া মনে হইতেও পারে; কিন্তু এই পরিকল্পনায় বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দেশের জীবন বা কৃষিকে বাঁচাইতে শিল্প সম্প্রসারণে যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, গতিময় এই শতাব্দীতে ভারতকে যাঁহারা পৃথিবীর অগ্রগামী অন্যান্য জাতির পাশে দেখিতে চান, তাঁহারা সকলেই তাহা সমর্থন করিবেন। ঔপনিবেশিক নীতি ব্যর্থ হইবার পর ব্রিটিশ সরকারের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে কতকটা ঔদার্য্যের প্রলেপ লাগিয়াছে। বোম্বাই পরিকল্পনায় প্রথম খণ্ডের অন্যতম স্বাক্ষরকারী স্যার আর্দ্দেশির দালাল ভারত সরকারের পুনর্গঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব হইয়াছেন। এ সময় আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি যে, যুদ্ধের পরে শিল্পোন্নতি দ্বারা দেশের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টির কার্য্যকরী কোন পরিকল্পনা স্যার দালালের মারফৎ রচিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনমত পরামর্শ দিবার জন্য ২৯টি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অর্থনৈতিক পরামর্শ দানের জন্য স্যার থিয়োডোর গ্রেগরী প্রভৃতিকে লইয়া ইকনমিক কনসালটেটিভ কমিটি বা অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা সমিতির অধীনে জেনারেল পারপাস কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে

জোড় চলিতেছে তাহা অভূতপূর্ব্ব সন্দেহ নাই এবং বিলম্বে হইলেও দেশের প্রয়োজনের দিক হইতে এই প্রচেষ্টা সকলেই আগ্রহের সহিত সমর্থন করিবেন। বোম্বাই পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ এই যে কৃষির উৎপাদন সামান্যভাবে বাড়াইয়া শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন চতুর্গুণ করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সমগ্র জাতির স্বার্থের প্রতিকূল, কারণ এ দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। বলা বাহুল্য এই অভিযোগ যতখানি ভাবপ্রবণতাসাপেক্ষ ততখানি যুক্তিসহ নহে। কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের একটা সীমা আছে এবং কৃষিজীবী দেশ বলিয়া এ দেশের সুবিধামত প্রায় সব জমিতেই চাষ হইয়া থাকে, তাছাড়া জমির উর্ব্বরতা শক্তিও নিয়ম নীতির জন্য ক্রমেই কমিয়া যায়। এই সব নানা কারণে বর্ত্তমান কৃষিব্যবস্থায় যাহা উৎপন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক নীতি যতই চালান হউক তাহার দ্বিগুণের বেশী ফসল তোলা বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু এদেশের প্রভূত কাঁচামাল, অসংখ্য বেকার শ্রমিক, যথেষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা, প্রকাণ্ড বাজার প্রভৃতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে শিল্প পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ চতুর্গুণ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। ভারতবর্ষে যোটের উপর শিল্প জীবনের দিক হইতে এখনও কৈশোর চলিতেছে, এমতাবস্থায় যে প্রভূত সম্ভাবনা আছে, বোম্বাই পরিকল্পনায় তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। যে বৈদেশিক শাসননীতি আমাদের সুযোগ-সম্ভাবনার কণ্ঠরোধ করিয়া উন্নতির পথে বারবার প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে সেই গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন না হইলে ভারতের শিল্পপ্রসার সম্ভব নয় —একথা বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। জাতীয় সরকার অথবা এদেশের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল সরকারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যদি শিল্পাদি প্রসারের ব্যাপক এবং কার্য্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত জনগণের অপসরণের ফলে ভার কমিয়া যাওয়ায় কৃষিক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীসমূহ কাজে লাগান হয়, তাহা হইলে ভারতের অতীত গৌরবময় দিনগুলি অবশ্যই পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

খাদ্যনীতি ও সরকারী অর্থ সাহায্য

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষ অন্য সকল দিক হইতে বহু দুঃখ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু খাদ্যের জন্য তাহাকে যে লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। ধনধান্যে-ভরা দেশ হিসাবে পৃথিবীর কাছে ভারতের যত সুনামই থাকুক, বাস্তবিকই এদেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য এদেশে উৎপন্ন হয় না এবং ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার জন্য দিন দিন ভারতবর্ষ অধিকতর পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে যুদ্ধ বাধিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। আগে সামান্য দরে খাদ্যাদি মিলিত বলিয়া সেই চাউল, আটা প্রভৃতি বাহির হইতে আসিল কি ঘরে উৎপন্ন হইল—ইহা লইয়া বিশেষ কেহ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করিত না এবং এই জন্যই ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইলেও তাহা বহু দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। যুদ্ধের প্রভাবে সমুদ্রপথ বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠায় অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা হইতে গম আমদানী প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল এবং বার্ম্মা জাপ-কবলিত হওয়ায় বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল হইতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইয়াছে। এই চরম অনাটন সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে বর্ত্তমানে যুদ্ধোপলক্ষে এদেশে সমাগত অতিথিবৃন্দের সৎকার করিতে বহু বাড়তি খরচ করিতে হয়। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী দৌরাত্ম্য কমিয়া যাওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে গম আমদানী হইতেছে, তাছাড়া ক্যানাডাও অনেক চেষ্টা ও তদ্বিরের পর এদেশে যে চাউল হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি তজ্জনিত অসুবিধা কিছু পরিমাণে লাঘব হইবে। সুখের কথা, সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই দিক হইতে আশাপ্রদ মনোভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহারা খাদ্য হিসাবে চাউল অপেক্ষা গমের ব্যবহার বাড়াইবার জন্য সরকারী সাহায্য দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম দামে জনসাধারণের নিকট গম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই হিসাবে মাদ্রাজ সরকারের বৎসরে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। চীনের যুদ্ধের প্রথম দিকে এইভাবে সরকারী মূল্যনিয়ন্ত্রণ ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া পণ্যমূল্য সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে চীনের জনসাধারণ অনেকদিন যাবৎ বহু অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছিলেন। মাদ্রাজ সরকারের এই প্রচেষ্টা হয় তো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই নীতির প্রভূত সার্থকতা আছে বলিয়া তাঁহাদের এই প্রাথমিক প্রয়াস সর্ব্বত্রই সম্বর্দ্ধিত হইবে। যুদ্ধের সময় বেশী আয়ের উপর মারাত্মক হারে কর বসাইবার বিধান আছে, কিন্তু সেই টাকা অনেক ক্ষেত্রেই এমন সব কাজে খরচ হয় যাহার সহিত সর্ব্বসাধারণের সম্পর্ক অল্প। এদেশের কোন ধনী ব্যবসায়ী আয়কর, সুপার ট্যাক্স প্রভৃতি বাবদ নিজ আয়ের একটি বড় অংশ যখন গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দেন, তখন তিনি অবশ্যই আশা করিতে পারেন যে তাঁহার টাকায় গভর্ণমেণ্টের মারফৎ তাঁহার দেশের দুঃখ মোচিত হইবে। মাদ্রাজ সরকারের মত ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া বাংলায় খাদ্য ও অনুরূপ পণ্যাদির মূল্য নামাইবার জন্য একটি সরকারী তহবিল গঠিত হওয়া উচিত। বাংলা দেশের শতকরা ৮০জন অধিবাসী বিগত দুর্ভিক্ষে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের সমগ্র দেশব্যাপী কঠোর ও নির্দোষ নিয়ন্ত্রণনীতিতে এবং তহবিল স্থাপনে যদি পণ্যমূল্য তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে নামিয়া আসে, তবু তাহাদের বাঁচিবার কিছু আশা থাকিবে; কিন্তু এই চরম দুঃসময়ে এই ধরণের কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অবলম্বিত না হইলে মুষ্টিমেয় জনকতক দেশবাসীর লক্ষপতি হইবার আড়ম্বরের অন্তরালে হাজার হাজার নরনারী তিলে তিলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাইবে এবং ইহার ফল সমাজ-জীবনের দিক হইতে দুর্ভিক্ষের সময় সহরের পাথর বাঁধানো রাজপথে সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দলে দলে আত্মহত্যার চেয়ে কম মারাত্মক হইবে না।

ভারতে রসায়নিক সার উৎপাদনের ব্যবস্থা

কৃষিপ্রধান দেশ এই ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর স্বাচ্ছল্য সম্পাদন না করিলে দেশের দারিদ্র্য দূর করা কিছুতেই সম্ভব নয়, অথচ এখানকার কৃষক এত অল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকে যে কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষবিধান সম্পর্কে তাহার পক্ষে নূতন কোন বিধি-ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া কার্য্যতঃ অসম্ভব। কৃষিক্ষেত্রের উপর সপরিবারে যে কৃষক-শ্রেণী নির্ভর করে তাহাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে শিল্পপ্রসার যে অবশ্য প্রয়োজন একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিয়া এদেশের কৃষক যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে তবেই দেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির পথে সবচেয়ে বড় বাধা দূরীভূত হয়। তাছাড়া শিল্পপ্রসার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পরিকল্পনা যত হইয়াছে—কাজ হইয়াছে তাহার চেয়ে ঢের কম এবং যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অন্ততঃ খানিকটা কাজ না হইতেছে সে পর্য্যন্ত দেশবাসীও বিজ্ঞানের প্রসাদজাত সর্ব্ববিধ সভ্যতার উপাদান যে এদেশে তৈয়ারী হইতে পারে একথা বিশ্বাস করিতে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিবে। সে হিসাবে কৃষিকর্ম্ম আমাদের এত পরিচিত এবং জীবিকা হিসাবে এদেশের এত বেশী লোক কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে যে কৃষি সম্বন্ধে কোন নূতন সংবাদে তাহাদের পক্ষে

বিষয় যে, এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ক্ষয়ক্ষতির পূরণের দিকে ভারতবাসী বিশেষ নজর দেয় নাই। জমি দিনের পর দিন খারাপ হইয়া গিয়াছে, ক্রমেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের অধিকতর লোক কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়াছে, খাদ্যাভাবে কৃষকের বা গবাদি পশুর পক্ষে আশানুরূপ পরিশ্রম করা ক্রমশঃই সম্ভব হয় নাই, তবু গতানুগতিক পরিচিত উপায়ে চাষবাস করিয়া একবেলা খাইয়া এমনকি অনাহারেও ভারতীয় কৃষক বাঁচিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট একদিকে যেমন দেখিয়াছেন এদেশকে কৃষিকেন্দ্রিক করিয়া রাখিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিবার স্বপ্ন, অন্যদিকে তেমনি অল্প আয় ও নানা অবাস্তব খরচের জন্য কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইতে পারেন নাই। সুখের কথা সম্প্রতি জনসাধারণের চেতনা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টও জনমতের চাপে এদিক হইতে কতকটা আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। কৃষির সবচেয়ে বড় যে সমস্যা, সেই সারের সমস্যা সম্বন্ধে ভারত সরকার এখন যে পরিমাণ আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহার একাংশও তাহারা এতকাল দেখান নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯২৮ সালে স্যার পদমজী গিনওয়ালা যখন ট্যারিফ বোর্ডের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন তখন রাসায়নিক সার উৎপাদনের সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশ এই বলিয়া নাকচ করিয়া দেওয়া হয় যে, নাইট্রোজেন শিল্প বা রাসায়নিক সার উৎপাদন ভারতে কাঁচা মালের অভাবের জন্যই সম্ভব নহে। সুপারফসফেট নামক রাসায়নিক সারে গন্ধক ও ফসফেট রক লাগে এবং এই দুটি কাঁচা মাল এদেশে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু এই কাঁচা মাল পাওয়া যায় না বলিয়া শিল্পটি এদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে না এ যুক্তি নিতান্ত অবান্তর। গন্ধক ছাড়াও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনটি সুপারফসফেট উৎপাদনকারী দেশ ব্রিটেন, জার্ম্মানী ও নেদারল্যাণ্ড এই শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।* মোট কথা এইভাবে আসল কথা এড়াইয়া গিয়া এবং বিরুদ্ধ মনোভাব দেখাইয়া এতকাল ভারত সরকার ভারতের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টির পথে নানারূপ বাধাসৃষ্টির মত কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য রাসায়নিক সার উৎপাদনের সংকল্পও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বর্ত্তমানেও ভারত সরকারের দিক হইতে এদেশের কৃষি-ব্যবস্থায় শ্রীসম্পাদনের যে আগ্রহ জাগিয়াছে তাহা কতখানি কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু 'কার্টিলাইজার্স মিশন' বসাইয়া, ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ প্রসারিত করিয়া এবং অন্যান্য নানাভাবে গভর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষকদিগের প্রতি দৃষ্টি দিবার মত মনোভাব দেখাইতেছেন। ত্রিবাঙ্কুরে ইতিমধ্যেই রাসায়নিক সার উৎপাদনের একটি কারখানার যন্ত্রপাতি বসান হইতেছে, সম্ভবতঃ এই বৎসরের শেষভাগেই উক্ত কারখানায় বাৎসরিক ৬০ হাজার টন হিসাবে আমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হইবে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে কোন স্থানে বৎসরে ১ লক্ষ টন আমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের মত একটি কারখানা শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা ছাড়া কার্টালাইজারস মিশনের নির্দ্দেশানুযায়ী রাসায়নিক সারের যে বৃহদাকার কারখানা ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা ধানবাদের নিকটবর্ত্তী সিন্ত্রীতে স্থাপিত হইবে এবং এই কারখানায় প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন আমোনিয়া সালফেট নামক রাসায়নিক সার উৎপন্ন হইবে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন এই কারখানাটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ধানবাদ অঞ্চলে এ্যামোনিয়াম সালফেটের কারখানা খুলিবার সংকল্প ভারত সরকারের পক্ষে লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই, কারণ কয়লা খনির অঞ্চলে থারমাল ইলেকট্রোলাইটিক প্রক্রিয়ায় এই সার উৎপাদন করিতে খরচ অনেক কম পড়িবে এবং সাধারণ কৃষক অল্পদামে এই সার কিনিতে পারিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবে। তবে এই কারখানা সরকারী মালিকানাভুক্ত হওয়ায় অসুবিধা হইতেছে এই যে, এই অত্যাবশ্যক সার প্রতিযোগিতামূলকভাবে এদেশে তৈয়ারী হইলে উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতার ফলে মূল্যহ্রাসের যে সম্ভাবনা ছিল, ব্যবসায়ীদের হাতে উৎপাদনের ভার না থাকাতে সেই সস্তাদামের সম্ভাবনা অনেকটা অবলুপ্ত হইয়াছে। তাছাড়া ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইনডাসট্রিস, তাহাদের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন আমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের অকেজো যে জার্ম্মান যন্ত্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ ম্যাঞ্চেষ্টারে পড়িয়া আছে, সেইটির দাম ভারতের ঘাড়ে চাপাইবেন বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। যাহা হউক মোটের উপর বেশী দামের যন্ত্রের জন্য প্রথম প্রথম এই সার সস্তায় বিক্রয় করিতে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট পরিমাণ সংরক্ষণ সুবিধা দিতে হইবে। তবে আশা করা যায় যে কৃষককে বাঁচাইয়া সারা দেশকে বাঁচাইবার যুক্তি গভর্ণমেণ্ট সহজেই অনুধাবন করিবেন এবং এখন বা ভবিষ্যতে যখনই হউক কৃষকদের এ্যামোনিয়াম সালফেট বেচিয়া রাজস্ববিভাগের মুনাফা বাড়াইবার দিকে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ নজর দিবেন না।

* গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে 'দুনিয়ার অর্থনীতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মিলাইল তারি সনে

শ্রীমতী সুচিন্তা গুপ্তা

সুমধুর মোর অতীতের স্মৃতি বেদনা জাগায় প্রাণে
জীবন প্রভাতে রঙীণ আকাশ ছেয়েছিল গানে গানে ;
স্নেহ মায়া প্রীতি বহু ধনজন লভিনু ধরায় আসি
কালের প্রবাহে একে একে হায় ! রাহুতে ফেলিল গ্রাসি।
ভাবিনি কখনো এমন করিয়া হারাবো সকলি হায় !
ফেলে আসা পথ হাতছানি দিয়া ডাকে—আয় ফিরে আয়।

ফিরিব কোথায় পথ নাহি পাই পাষাণে রুদ্ধ দ্বার—
ক্ষতবিক্ষত দেহ মনে মোর বহে রুধিরের ধার !
পথহারা ওগো কে দেখাবে পথ কোন পথে যাব আমি,
যে পথেতে যাই হয়ে যায় ভুল আঁধার আসে যে নামি।
ঊর্ম্মি দোলায় ভেঙে দিয়ে গেলো রচেছিনু যাহা মনে
সাধ আশা যত বুদ্বুদ সব মিলাইল তারি সনে।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

লালফৌজের অভিযান

লালফৌজের শীতকালীন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত ইহাই নাৎসী জার্মানীর প্রতি চূড়ান্ত আঘাত। বসন্তকালের মধ্যেই নাৎসী জার্মানী ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন।

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাল্টিক হইতে কার্পেথিয়ান অঞ্চল পর্য্যন্ত পাঁচশত মাইল রণক্ষেত্রে অকস্মাৎ লালফৌজের প্রচণ্ড আঘাত আরম্ভ হয়। জানুয়ারী মাসের মধ্যেই জার্মান সাইলেসিয়ার রাজধানী ব্রেস্‌লাও ও ওপলেনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মার্শাল কনিয়েভের সেনা ওডর নদী অতিক্রম করিয়াছে। আপার সাইলেসিয়ার রাজধানী ওপলেন এখন লালফৌজের অধিকারভুক্ত। বার্লিন-রক্ষী অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটী পোজনান্ পরিবেষ্টিত করিয়া মার্শাল জুকভের সৈন্যবাহিনী ব্রাণ্ডেনবুর্গ প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে; এই ব্রাণ্ডেনবুর্গেই বার্লিন অবস্থিত। মার্শাল জুকভ্ এখন বার্লিন হইতে ৯০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছেন; পথে তাঁহার একমাত্র প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক ওডর নদী। আরও উত্তরে পূর্ব্ব প্রুসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত; পূর্ব্ব প্রুসিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ এখন লালফৌজের অধিকারভুক্ত। মার্শাল রকোসভস্কির সৈন্য দক্ষিণ দিক হইতে পূর্ব্ব প্রুসিয়া পরিবেষ্টিত করিয়া ভিস্চুলা পার হইয়াছে; তাঁহার সৈন্য ড্যান্‌জিগের উপকণ্ঠেও পৌঁছিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে জেনারল চার্ণিয়াকভস্কির সেনা পূর্ব্ব প্রুসিয়ার রাজধানী কনিগ্‌সবার্গের উপকণ্ঠে উপনীত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলে জেনারল পিট্রভ্ ও এরেমেঙ্কো চেকোস্লোভাকিয়ায় আঘাত হানিতেছেন। হাঙ্গেরিতে বুডাপেষ্ট এখন পরিবেষ্টিত। বুডাপেষ্টের উত্তরে ম্যালিনভস্কি কোমারনো পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, পশ্চিমে মার্শাল তলবুখিনের সেনা এখন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়।

কঠিন তুষারের উপর দিয়া লালফৌজের শীতকালীন অভিযান চলিয়া থাকে; এবারও চলিয়াছে সেই ভাবে। পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধান প্রধান রাস্তা ও রেলপথে জার্মানদের যে শক্তিশালী রক্ষা-ব্যবস্থা ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা লালফৌজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; কারণ লালফৌজ পাশ কাটাইয়া তুষারাবৃত ভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং তুষারাবৃত নদীগুলি তাহারা অরক্ষিত স্থানে অতিক্রম করিয়াছে। ক্ষিপ্রগামী লালফৌজকে রসদ যোগাইতেছে বিমানবাহিনী; কাজেই, অগ্রসর হইবার সময় সরবরাহ-সূত্র সংক্রান্ত সমস্যাও তাহাদের নাই। তিন সপ্তাহের যুদ্ধে জার্মানীর ৪ লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে; পূর্ব্ব প্রুসিয়ার ২। লক্ষ সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া নিশ্চিত ধ্বংসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

মার্শাল ষ্ট্যালিনের রণনীতি এখন আর অস্পষ্ট নাই। মধ্যস্থলে মার্শাল জুকভের সেনাবাহিনী বার্লিন লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে মার্শাল কনিয়েভ ও উত্তরে মার্শাল রকোসভস্কি শত্রু-সেনার উপর প্রবল চাপ রাখিতেছেন; ইহার ফলে পার্শ্বদেশ হইতে জার্মানরা পাল্টা আক্রমণ চালাইতে পারিবে না। আর মধ্যস্থলে মার্শাল জুকভকে জার্মানরা যদি সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তখন পার্শ্বদেশে আক্রমণের বেগ বর্দ্ধিত করা সম্ভব হইবে। জার্মানরা ওডরের তীরে—ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলে মরিয়া হইয়া প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। ওডর নাকি এমন ভাবে জমে নাই, যাহাতে উহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে গুরুভার অস্ত্রশস্ত্র যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ওডরের পশ্চিম তীর নাকি পূর্ব্ব তীর অপেক্ষা উচ্চতর; কাজেই সেখানে প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ।

এক্ষণে জার্মানীতে বিশৃঙ্খলার কথা শোনা গিয়াছে। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে জার্মানীর আক্রমণে যেরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল, পূর্ব্ব জার্মানীতে নাকি এখন সেইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। দলে দলে বেসামরিক নরনারী রাস্তায় বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটিতেছে, চতুর্দ্দিকে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা; এমন কি বার্লিনেও দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

জার্মানীর সংগঠন-শক্তি অদ্ভুত। লালফৌজ যদি বর্ত্তমান গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে এবং সমগ্র রণাঙ্গনে সমান চাপ রাখিয়া জার্মানীর প্রতিরোধ-পরিকল্পনা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে জার্মান্ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ গুছাইয়া লইবার সময় সত্যই পাইবেন না। কিন্তু সরবরাহের অসুবিধার জন্য হউক, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য হউক—অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, লালফৌজের এই দুর্নিবার গতি যদি সাময়িক ভাবে মন্থর হয়, তাহা হইলে জার্মানী দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়িয়া তুলিবে। বস্তুতঃ, মার্শাল জুকভের সেনাবাহিনী ওডর অতিক্রম করিয়া জার্মানীর প্রতিরোধ লাইন চূর্ণ না করা পর্য্যন্ত লালফৌজের বর্ত্তমান অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। 'প্রাভদা' বলিয়াছেন—এবার বার্লিনে লালফৌজের বিজয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে—এবার লালফৌজ আর থামিবে না; বার্লিন পর্য্যন্ত সোজা আগাইয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে বরফ গলিতে আর মাত্র দেড় মাস দেরী আছে; মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে বরফ গলিয়া থাকে। বরফ গলিয়া সমগ্র অঞ্চল অগম্য হইবার পূর্ব্বেই জার্মানীর অভ্যন্তরে লালফৌজের বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়া দরকার। জার্মানীর অভ্যন্তরে তাহারা ভাল ভাল রাস্তা ও রেলপথ পাইবে; বরফ গলিবার সময়েও সেখানে যুদ্ধ চালান অসম্ভব হইবে না। কাজেই এই দেড়মাস সময় লালফৌজের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিম রণাঙ্গন

পশ্চিম রণাঙ্গনে বেলজিয়ামের আর্দেনেস্ অঞ্চলে জার্মানরা যে স্ফীতিমুখ রচনা করিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে; রুন্‌ষ্টেডের সেনাবাহিনী এখানে জার্মানীর অভ্যন্তরে অপসরণ করিয়াছে।

আল্‌সেস্ অঞ্চলে জার্মান সেনা যেখানে রাইন নদী অতিক্রম করিয়াছিল, সেখান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নাই। ষ্ট্রাসবুর্গের বিপদ এখনও কাটে নাই।

পূর্ব্ব রণাঙ্গনে লালফৌজের প্রবল অভিযান আরম্ভ হওয়ায় রুন্‌ষ্টেডের পক্ষে পশ্চিম রণাঙ্গনে চাপ বৃদ্ধি করা আর সম্ভব হইবে না। পশ্চিম অঞ্চলের কিছু সৈন্য নিশ্চয়ই ওডর লাইন রক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হইতেছে। কিন্তু রুন্‌ষ্টেডের অভীষ্ট কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বহুদিন হইতে শোনা যাইতেছিল যে, পশ্চিম ও পূর্ব্ব অঞ্চলে একই সময়ে মিত্রপক্ষের অভিযান আরম্ভ হইবে। কিন্তু বহু আয়োজন ও উদ্যোগের পর পূর্ব্ব অঞ্চলে লালফৌজের শীতকালীন অভিযান যখন আরম্ভ হইল, তখন পশ্চিম অঞ্চলে জেনারল আইসেন্‌হাওয়ার জার্মানীর পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত। দুই দিক হইতে অভিযানের সমন্বয় এই ভাবে বন্ধ করা জার্মানীর পক্ষে কম লাভ নয়।

গ্রীসে যুদ্ধ-বিরতি

মাসাধিককাল যুদ্ধ চলিবার পর গত ১১ই জানুয়ারী গ্রীসের যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধ-বিরতির শর্ত অনুযায়ী এলাস বাহিনীকে (বামপন্থীদের

সেনাদল) গ্রীসের কতকগুলি বাঙ্গলা ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। তবে, ইহার পরও গ্রাসের ৩৭টি জেলার মধ্যে ২১টিতে ই এমের (বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান) কর্তৃত্ব থাকিবে। বৃটিশ সেনাপতি জেনারল স্কোবি এলাসদের অস্ত্র ত্যাগের জন্য জিদ্ করেন নাই ; তাহারা স্বতন্ত্র বাহিনী হিসাবে অবস্থান করিবে।

বৃটিশ জনমতের চাপ, এলাসদের দৃঢ়তা এবং মিত্রপক্ষের শিবিরে মতানৈক্য মিঃ চার্চ্চিলকে গ্রাসের যুদ্ধ শীঘ্র বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। সম্প্রতি কমন্স সভায় এক বক্তৃতায় তিনি আস্ফালন কম করেন নাই ; কিন্তু কার্য্যতঃ গ্রীক্ বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্য নিযুক্ত রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। গ্রীসের রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। তবে জার্ম্মানদের গ্রীক্ সহযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে জেনারল স্কোবি ও প্লাস্টিরাস্ রাজী হইয়াছেন ; আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন তত্ত্বাবধানের জন্য মিত্রশক্তির একটি যুক্ত কমিশন নিয়োগ করা হইবে বলিয়াও স্থির হইয়াছে।

রাজা পিটারের বিভ্রান্তি

গ্রীসের অবস্থা দেখিয়া রাজা পিটার উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন ; লণ্ডনে প্রতিক্রিয়াপন্থীর দল বালক রাজাকে গোপনে উৎসাহ দিয়াছিল বলিয়াও শোনা গিয়াছে। রাজা পিটার ও তাঁহার উৎসাহদাতারা মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রীসের মত যুগোস্লেভিয়ার মার্শাল টিটোর দলকে দমন করিবার জন্য ভাড়াটে বৃটিশ সৈন্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল যুগোস্লেভিয়া সম্পর্কে পূর্ব্বের নীতি পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হন নাই। কারণ তিনি জানেন যে, যুগোস্লেভিয়া বৃটিশের একলার এলেকা নয়— সোভিয়েট বাহিনীও সেখানে প্রবেশ করিয়াছে ; টিটোর সৈন্য ও লালফৌজ এখন এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। বরং মিঃ চার্চ্চিল যুগোস্লেভিয়ার রাজা পিটারকে সমর্থন না করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গ্রীস্ সম্পর্কে তাঁহার নীতি পক্ষপাতহীন ; রাজতন্ত্রের প্রতি যে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই—প্রকৃত ফ্যাসি-বিরোধী গণ-প্রতিনিধিদিগকে যে তিনি মানিয়া লন, তাহা যুগোস্লেভিয়ায় তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকে বুঝিয়া লউক। অবশ্য, যুগোস্লেভিয়া সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের উদারতার প্রকৃত কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত রাজা পিটারের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি টিটো-সুবাসিক্ চুক্তি মানিয়া লইয়াছেন। যুগোস্লেভিয়ার স্বাধীন জনমতের দ্বারা শাসনতন্ত্র নিরূপিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে রিজেন্সী কাউন্সিল গঠনের ঘোষণাবাণীতে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ফিলিপাইনসের যুদ্ধ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ লুজনে মার্কিন সেনা অবতরণ করিয়াছে। এই দ্বীপেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা অবস্থিত। মার্কিন সেনা ম্যানিলার ৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে— ইহাই লুজন-যুদ্ধের শেষ সংবাদ।

লুজনে মার্কিন সৈন্যের অবতরণের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। লুজনের উত্তর তীর হইতে চীনের উপকূলের দূরত্ব মাত্র ৫শত মাইল। মার্কিন সৈন্য লুজনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে দক্ষিণ চীন অভিযানের আশঙ্কা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই অঞ্চলের ঘাঁটিগুলি হইতে দক্ষিণ চীন সাগরের সংযোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন করাও সহজ হইবে। বস্তুতঃ মার্কিণ সেনা যদি লুজনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে খাস জাপানের সহিত তাহার নব-লব্ধ সমগ্র সাম্রাজ্যের সংযোগ বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

জাপানীরা নিশ্চয়ই লুজনে প্রবলভাবে যুদ্ধ করিবে ; এতদূর সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘাঁটী সম্বন্ধে জাপানীদের ঔদাসীন্য কখনই সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—১৯৪৪ সাল শেষ হইতে হইতে ইউরোপের যুদ্ধ মিটিয়া যাইবে, এই অনুমানের ভিত্তিতেই লুজনে অভিযানের পরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধ না মিটিলেও লুজনে অভিযান স্থগিত রাখা যায় নাই। তাঁহাদের অভিমত—ইউরোপের যুদ্ধে এখন মিত্রপক্ষের বহু জাহাজ নিযুক্ত থাকায় লুজনে আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিতে বিলম্ব হইবে।

এই গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে, অন্যদিক হইতে বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইউরোপের যুদ্ধ মিটিবার অনুমানে লুজন অভিযানের পরিকল্পনা স্থির হইলেও মিত্রপক্ষ বিশেষ কারণে এখনই এই অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি চীনে জাপানের প্রবল আক্রমণ অত্যন্ত আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল ; এই আক্রমণে য়ুনান প্রদেশে ব্রহ্ম-চীন পথ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জাপানীদের আক্রমণ যদি প্রতিহত না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশে মিত্রপক্ষের সাম্প্রতিক সাফল্য গুরুত্বহীন হইয়া পড়িত। জাপান আবার যাহাতে কোয়েচাও ও য়ুনান প্রদেশ আক্রমণের জন্য প্রচুর সৈন্য নিয়োগ করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষ লুজনে জাপানের একটি বিশাল সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত রাখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। চীনের সমরাঙ্গনে লুজন অভিযানের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই পড়িয়াছে মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ

ব্রহ্মদেশে লেডো-চুংকিং পথ উন্মুক্ত হইয়াছে ; এই পথে একটি কনভয় ইতিমধ্যে চীনে গিয়াছে। এই লেডো-চুংকিং পথের উপর চীনের সমর-শক্তি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। জাপানীরা যদি দক্ষিণ চীন হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে আক্রমণ চালাইয়া এই পথ বিপন্ন করিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে শীঘ্রই চীনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পথ দিয়া প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টন সমরোপকরণ যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

দক্ষিণ ব্রহ্মে মিত্রপক্ষ সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। আকিয়াব মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূলের নিকটবর্ত্তী দ্বীপ রামব্রী ও চেদুবায় মিত্রপক্ষের সেনা অবতরণ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলে মিত্রপক্ষের এই তৎপরতা দক্ষিণ ব্রহ্মে তাঁহাদের অভিযানের বিস্তারিত আয়োজন। এই অঞ্চলের বিমান-ঘাঁটী ও বন্দর ঐ অভিযানের পক্ষে সহায়ক হইবে। আকিয়াবের বিমান-ঘাঁটী ছিল কলিকাতার সবচেয়ে নিকটে। কাজেই, আকিয়াব জাপানের হস্তচ্যুত হওয়ায় কলিকাতায় শত্রু বিমানের আক্রমণ-আশঙ্কা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, জাপান এখানে মিত্রপক্ষের অভিযানে যথাসম্ভব বিলম্ব ঘটাইয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। জাপান বুঝিতেছে—ইউরোপের যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে তাহাকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে। ফিলিপাইন্‌সে মার্কিণ সৈন্যের তৎপরতায় দক্ষিণ চীন সম্পর্কেও সাবধানতার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। খাস জাপানে মার্কিণ বিমানের বোমা বর্ষণের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাবল্যও উপেক্ষনীয় নয়। কাজেই, জাপান এখন প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালাইবার জন্য রণক্ষেত্র গুটাইয়া আনিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে, সিঙ্গাপুর ও মালয় রক্ষার জন্য রেঙ্গুন জাপান সহজে ছাড়িবে না। রেঙ্গুনের পতন হইলে মালয় ও সিঙ্গাপুরে বেশী দিন প্রতিষ্ঠিত থাকা জাপানের পক্ষে সম্ভব নয়। ৩১।১।৪৫
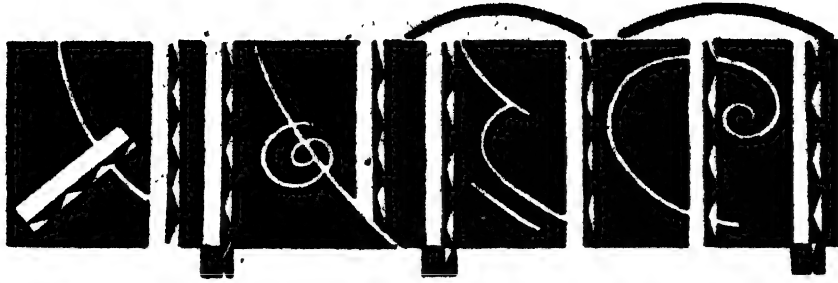
শিক্ষকের বিরাট দান—

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর সম্প্রতি তাঁহার শিক্ষা-গুরু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং আরও এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ঐ টাকায় আচার্য্য দেবের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। ডক্টর ধর ধনী নহেন, তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের অন্ততম ডিরেক্টার। তিনি সারা-জীবন তাঁহার শিক্ষা-গুরুর মত অতি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা যে ভাবে দান করিলেন তাহা সত্যই অনুকরণের যোগ্য। তিনি বাঙ্গালার কৃষকের জন্তও দরদী; তাই তিনি বিশেষ করিয়া কৃষি শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। একজন শিক্ষকের পক্ষে এই দান সত্যই সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেজন্ত সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস এই দানকে 'রাজকীয় দান' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আচার্য্য দেবের ধনী ছাত্রের অভাব নাই—ডক্টর ধর যে উদ্দেশে দান করিলেন সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আরও বহু টাকার প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, সে জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হইবে না।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি উৎসব—

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি নানা স্থানে বহু সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বালীগঞ্জ অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বাসগৃহে শরৎ সমিতির উদ্যোগে এক সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে, ঐ গৃহের নিকটস্থ রাসবিহারী এভেনিউ ও মনোহরপুকুর রোডের সংযোগ স্থলে অবস্থিত ত্রিকোণ পার্কের নাম 'শরৎ চট্টোপাধ্যায় পার্ক' রাখা হউক এবং ঐ অঞ্চলের একটি রাস্তার নামও শরৎ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট করা হউক। এ বিষয়ে কাউন্সিলার ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ কর্পোরেশনে নোটিশও দিয়াছেন। দেবানন্দপুরের (শরৎচন্দ্রের নিজ গ্রাম) সভার বিবরণে জানা গিয়াছে, তথায় স্মৃতিরক্ষার জন্ত কয়েক সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। হুগলী জেলার বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় নিজে সাহিত্যিক—তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। একটি সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—প্রস্তাবগুলি সকলের বিবেচনার যোগ্য। (১) শরৎ-সাহিত্য অনুবাদ করিয়া শরৎ-সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা (২) কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎ-সাহিত্য গবেষণার জন্ত পৃথক পৃথক বৃত্তির ব্যবস্থা (৩) শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা (৪) প্রতি বৎসর বঙ্গ ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্তাসের রচয়িতাকে শরৎচন্দ্রের নামে পুরস্কার দেওয়া (৫) দেবানন্দপুরের শরৎ সমিতিকে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি তাঁহার জন্মস্থানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত সাহায্য করা।

বিহার সরকারের নিষেধাজ্ঞা—

গত ২১শে জানুয়ারী বিহার গভর্ণমেণ্ট এক অসাধারণ আদেশ জারি করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে নিম্নলিখিত ৫ জন নেতার কোন বিবৃতি পূর্ব্বাহ্নে প্রাদেশিক প্রেস এডভাইসরকে না দেখাইয়া পাটনার কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চলিবে না—নেতাদের নাম—(১) ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (২) সার্চ্চ লাইট পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুরলীমনোহরপ্রসাদ (৩) বিহার ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী সভাপতি অধ্যাপক আবদুল বারি (৪) শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ও (৫) পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র। ৫জন নেতাই জনপ্রিয় এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন। এই ভাবে তাঁহাদের মুখ বন্ধ করার ফলে সমগ্র প্রদেশে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে,তাহা কি দেশের পক্ষে উপকারজনক হইবে ?

শিক্ষার নূতন আদর্শ—

সেবাগ্রামে গত জানুয়ারী মাসে ৪ দিন ধরিয়া যে শিক্ষা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি ভারতবাসী সকল শিক্ষা-ব্রতীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী জানাইয়াছেন—"এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলির ব্যয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে এবং গত কয় বৎসরে দেখা গিয়াছে যে, তাহা স্বপ্নের বিলাস নয়, ইহা কার্য্যতঃ সফল হইতে পারে। ৭ লক্ষ গ্রামে এই বনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিলে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের অধিবাসী স্বাবলম্বী, সমৃদ্ধিশালী ও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইবে। আত্মনির্ভর হইতে পারিলে তবেই যথার্থ শিক্ষা লাভ সম্ভব। যাহারা বনিয়াদী শিক্ষা দানের ব্রত গ্রহণ করিবেন এবং সেই উপলক্ষে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িবেন, তাঁহাদের হইতে হইবে আত্মনির্ভর। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—আমাদিগকে গ্রামের শিক্ষক হইতে হইবে। তাহার অর্থ; আমাদিগকে গ্রামবাসীদের সত্যকার সেবক হইতে হইবে। ইহার প্রতিদানে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা আত্মপ্রসাদ—তাহা অন্তর হইতেই পাইতে হইবে, বাহির হইতে নয়।

মার্কিনে শিক্ষার ব্যবস্থা—

শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটা খ্যাতনামা ব্যবসায়ী—তিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত

আমেরিকা গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রৌপ্য জুবিলী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বাণিজ্য সম্মিলনে যোগদানের জন্য যাইয়াও মার্কিণের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছেন। মাসাচুসেট্‌ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি ২০ জন ভারতীয় ছাত্রকে শিক্ষা লাভ করিতে দেখিয়াছেন। সে দেশের লোকের উদারতা কত অধিক তাহা এই ছাত্রসংখ্যা হইতে বুঝা যায়। আর এদেশে সিন্ধু গভর্ণমেন্ট স্থানীয় এঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে শতকরা ৫০ জন মুসলমান ছাত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছেন—না করিলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিবারও ভয় দেখাইয়াছেন। ইহাই পরাধীন দেশের মনোভাব!

মৃন্ময় মূর্ত্তি শিল্পী—শ্রীরমেশচন্দ্র পাল

মার্কিনে বৃটেনের প্রচার কার্য্য—

মিঃ চমনলাল খ্যাতনামা সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। তিনি এক বৎসরকাল মার্কিণে ঘুরিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি আমেরিকায় ভারতের বিরুদ্ধে বৃটেনের প্রচার কার্য্যের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। তথায় ১০ হাজার লোক ভারতকে স্বাধীনতা দানের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে ও সেজন্য তাহারা বেতন পাইয়া থাকে। সার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী সে দলের নেতা এবং তিনি বৎসরে ৫২ হাজার ডলার বেতন পান—(উহা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বেতন অপেক্ষা অধিক)। তিন হাজার বৃটিশ কর্ম্মচারী এই কাজ করে। ২ হাজার ইংরাজ ঐ দেশে বাস করিয়া বৃটেনের পক্ষে এই প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকে। ৪ হাজার মার্কিণকে ঐ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্যকেন্দ্র, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকে। মার্কিণ জনগণ ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কেন এত অজ্ঞ, কেন মার্কিণের কোন সংবাদপত্র ভারত সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করে না, তাহা এখন স্পষ্ট বুঝা গেল। মিঃ চমনলাল অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যক্তি, তাই এই ব্যাপার ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মিঃ গগনবিহারীলাল মেটাও মার্কিণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মার্কিণ সংবাদপত্রে ভারতীয় সংবাদের অভাবের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রচার কার্য্যের প্রতীকারের উপায় কোথায়?

বিলাতে রবীন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষা—

শ্রীমান্ সুব্রত রায় চৌধুরী গত নভেম্বর মাসে বিলাত যাইয়া কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র পরিষদ্ প্রতিষ্ঠায় প্রধানতম উদ্যোগী ছিলেন। বিলাতে তিনি রবীন্দ্র-স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মিঃ বার্ণার্ড শ, মিঃ টমসন প্রভৃতির সহযোগিতাও তিনি লাভ করিতেছেন। মিঃ শ বিলাতে রবীন্দ্র-দর্শন অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীমান্ সুব্রতের এই শুভ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।
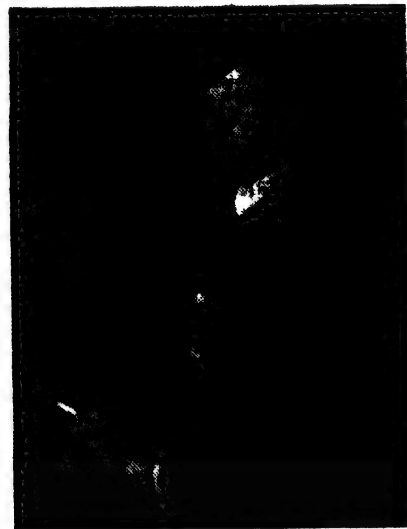
ক্র্যাপার (তৈল চিত্র) শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আইন সম্পর্কে সাহায্য দান—

বোম্বায়ের জনসাধারণ ও আইন ব্যবসায়ীরা একটি নূতন সমিতি গঠন করিয়া যে সকল দরিদ্র লোক মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য টাকা দিয়া উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়েকজন খ্যাতনামা উকীলও জনগণের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সকল প্রদেশেই এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং যাহাতে প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তিরা এ বিষয়ে সাহায্য

পাইয়া উপকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। মামলার খরচ জোগাইতে গিয়া কত দরিদ্র লোক যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার হিসাব নাই।

বিচারে বিভ্রাট—

ঢাকা জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে একটি বালিকা হরণের মামলা হয়—জুরীরা আসামীদের নির্দোষ বলায় বিচারক আসামীদের মুক্তি দেন। তাহার পর সহকারী উকীল রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মামলাটি হাইকোর্টে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। মামলার আসামীগণ সবই মুসলমান—৫ জন জুরীও মুসলমান। সাক্ষ্য প্রমাণে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, জুরীগণের সিদ্ধান্ত তাহার বিরোধী হইয়াছে। এ অবস্থায় হাইকোর্ট মামলাটি যাহাতে পুনর্বিচারের আদেশ দেন, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

পারস্য দেশে বঙ্গ মহিলার কৃতিত্ব—

কুমারী লিলি চৌধুরী (ইরাণ)

কুমারী লিলি চৌধুরী পারস্য-প্রবাসী এঞ্জিনিয়ার দেবেন্দ্রবিজয় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা। দেবেন্দ্র-বাবু ২৪ বৎসর পূর্ব্বে চাকরী লইয়া পারস্যে গিয়াছেন। কুমারী লিলি ইরাণ আবাদানে ১৮ বৎসর বয়সে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাশ করিয়া এংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীতে চাকরী পাইয়াছেন। ইতি-পূর্ব্বে কোন ভারতীয় মহিলা পারস্যে চাকরী করেন নাই।

চাউলের দর—

উত্তরবঙ্গ চাল কল সমিতির সম্পাদক মিঃ আর-কে আগারওয়াল সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট রেশন-প্রবর্ত্তিত স্থানে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিয়া লাভ করিতেছেন। তিনি ১১ টাকা মণ দরে বাঙ্গালার যে কোন স্থানে ৫ লক্ষ মণ চাউল পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন। সরকারী ব্যবস্থার ফলে কোন কোন জেলায় ১৯ টাকা পর্য্যন্ত মণ দরে লোককে চাউল ক্রয় করিতে হইতেছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী সকলেই উৎসুক হইয়া আছে।

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ—

উড়িষ্যার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালার মত উড়িষ্যারও লোক দারুণ দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করিতেছে। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বিবরণ নাকি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। কলিকাতায় তিন লক্ষ উড়িষ্যা-বাসী বাস করেন; তাঁহারা চেষ্টা করিলে যে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশ্বনাথবাবু এখন কারামুক্ত হইয়াছেন—তিনি যদি উড়িষ্যার দুর্দশা দূর করিবার জন্য অগ্রসর হন, তাহা হইলে সত্যই কিছু কাজ হইতে পারে।

পাকিস্থানের নিন্দা—

নবাব মির্জা ইয়ার জং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের রাজধানী নাগপুরে নিজাম গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টের কাজ করেন। তিনি সম্প্রতি পাকিস্থান সম্বন্ধীয় মিঃ জিন্নার প্রস্তাবের নিন্দা করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মোট অধিবাসী ১৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ মুসলমান। তথায় মুসলমান শাসকের অধীনে অধিকসংখ্যক হিন্দু অধিবাসীরা বাস করেন। হিন্দুদের তথায় সেজন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কাজেই যাহারা পাকিস্থান নীতির পক্ষে, তাহাদের এই উক্তিটি চিন্তা করিবার বিষয়।

কবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
(সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।)

রাজবন্দী পরিবারদিগকে সাহায্য—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ৩ সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকিয়া গত ২৮শে পৌষ কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময় এক বিবৃতিতে বাঙ্গালার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ ও এ বৎসরের মহামারি লইয়াই সকলের মনের উপর চাপ পড়িয়াছে। বাঙ্গালার যে কয়েক সহস্র কর্ম্মী রাজবন্দীরূপে কারাগারে বাস করিতেছেন, তাহাদের পরিজনবর্গ এই দুঃসময়ে কিরূপ কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন, সে বিষয়ে কাহারও মন দিবার সময় ছিল না। সেজন্য বাঙ্গালায় একটি সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। বহু রাজবন্দীর পরিজনবর্গ যে অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। তাহাদের সাহায্য করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমতী নাইডুর আবেদন যাহাতে বিফল না হয়, সে বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা উচিত।

পানিহাটীতে বৈষ্ণব সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার ২৪ পরগণা পানিহাটী গ্রামে অভয়া আশ্রমে সাহিত্য-বাসরের এক প্রীতি সম্মিলন হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে সদস্যগণ ৫ শত বৎসরের প্রাচীন বটবৃক্ষ ও গঙ্গার স্নানের ঘাট দর্শন করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুমন্দিরে সমবেত হইয়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়

পানিহাটীতে পণ্ডিত অমূল্যধন সম্বর্দ্ধনা

ভট্ট মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, পণ্ডিত দিগিন্দ্রনাথ জ্যোতিস্তীর্থ, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য—

পত্রিকা বিশেষে জনৈক মার্কিণ লেখক লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের প্রথম লক্ষ্য হইল যুদ্ধ জয়। দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল সাম্রাজ্যাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহাকে দৃঢ়তর করা। তৃতীয় লক্ষ্য হইল পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৃটেনের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা। কারণ বৃটেনের সুনিশ্চিত বিশ্বাস—বৃটীশ প্রভাব সাম্রাজ্যের পক্ষে যেমন গুরুতর, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পক্ষেও তেমনি শুভকর।" ইহা ত বৃটেনের উদ্দেশ্য—কিন্তু মার্কিণের উদ্দেশ্য কি তাহা কে বলিয়া দিবে?

পেট্রল বিক্রেতার দণ্ড—

লাহোরে একজন পেট্রল বিক্রেতা মিলিটারী প্রয়োজনের পেট্রল চুরি করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। বিচারে তাহার ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দণ্ড আপাতদৃষ্টিতে অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—কিন্তু বর্ত্তমানে দুর্নীতি যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাতে এইরূপ অত্যধিক দণ্ডেরই ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। যে ব্যবসায়ী চোরাবাজারে প্রশ্রয় দিবে, ধরা পড়িলেই তাহার সমস্ত টাকা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে অপরে আর ভয়ে এই পাপের পথে অগ্রসর হইবে না। নচেৎ অর্থদণ্ড দেওয়া কাহারও পক্ষেই কষ্টকর হয় না।

ব্যক্তিত্বের বেদনা অনুভব—

সার জিওফ্রে কর্টন মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের অর্থনীতিক পরামর্শদাতা। তিনি এক সভায় বলিয়াছেন, বাঙ্গালার লোক চালের পরিবর্ত্তে আটা ব্যবহার করিতে চাহে না। এখন চাল দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আবার 'ভাল চাল চাই' বলিয়া তাহারা আন্দোলন করিতেছে। সার জিওফ্রে বোধহয় কখনও ভাত খান নাই, অথবা খাইলেও কাঁকর, ধুলা, বালি প্রভৃতি মিশ্রিত চাল কখনও তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। কাজেই বাঙ্গালার লোককে যখন ৪ গুণ মূল্য দিয়া অখাদ্য চাউল কিনিতে হয়, তখন তাহাদের কোথায় ব্যথা লাগে, তাহা বুঝা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। যাহাদের বোধশক্তি এতই কম, তাহাদেরও পরমর্শদাতার পদে যাঁহারা নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়।

মাদ্রাজে বাঙ্গালী

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর বি-বি দে সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মাদ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর দে মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত—তাঁহার এই সম্মানজনক উচ্চপদ-প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।
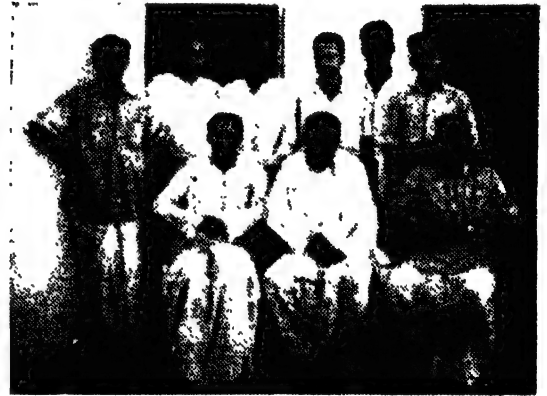
সিমলায় রসচক্রের উৎসবে কর্ম্মীবৃন্দ

সাম্প্রদায়িকতা ও মিঃ সিদ্দিকী—

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ আবদার রমেজ সিদ্দিকী ব্যবসায়ী দলের সহিত আমেরিকায় যাইয়া আমেরিকাবাসীদের নিকট ভারতের হিন্দু মুসলমান বিরোধের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, বিরোধ হয় ত আছে, কিন্তু জাতীয় মিশনের বা স্বাধীনতা লাভের পক্ষে তাহা দুরতিক্রম্য বাধা নহে। ইহা ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ও প্ররোচনা না থাকিলে ইহা সহজেই দূর হইতে পারে। ইহাও সত্য যে, তৃতীয় পক্ষের প্রভাব থাকিতে এই তথাকথিত বিরোধ দূর হইবার নহে। মিঃ সিদ্দিকীর মত লোক যে এই কথা বুঝিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাহাতে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

সিমলায় বাণী উৎসব—

দারুণ তুষার পাতের মধ্যেও সিমলা বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ গত ৫ই মাঘ সমারোহের সহিত বাণী উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। সুকবি, শিশু সাহিত্যিক ও শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন বল নিজে প্রতিমা নির্মাণ করেন। ৭ শত বালক-বালিকা ও নরনারী উৎসবে

সিমলায় সরস্বতী পূজা

যোগদান করেন—সাহিত্য শাখার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজেন মল্লিক, সম্পাদক রায় সাহেব নরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত, ফকিরদাস চৌধুরী, প্রফুল্ল মিত্র, সমর সেন, সুশীল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

কয়লার অভাব—

জালানীর জন্য কয়লার ব্যবহার ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, কারণ কোথাও আর কয়লা পাওয়া যায় না। কলিকাতার সাধারণ গৃহস্থগণকে কয়লার অভাবে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইতেছে তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ওদিকে আমেদাবাদে কয়লার এত অভাব যে মাধ্য স্থানীয় কলওয়ালা সমিতির নির্দেশে ৪ দিন সকল কল বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ফলে ৪ দিনে কাপড়ের কলগুলিতে কাপড় প্রস্তুত হয় নাই। কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের বন্দোবস্তের জন্য গভর্ণমেণ্ট বহু 'অভিজ্ঞ' ব্যক্তিকে বড় বড় চাকরী দিয়াছেন; তাহার ফলেই কি এই সুব্যবস্থা আসিয়াছে?

কলিকাতায় সঙ্গীত কংগ্রেস—

গত ২১শে পৌষ কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। সভায় গৃহীত নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপকারের জন্য সকল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্লাসিক্যাল ভারতীয় সঙ্গীতকে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে এবং সঙ্গীতে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দিতে অনুরোধ করা হইবে এবং (২) সঙ্গীতের চর্চ্চা সম্বন্ধে একটা সহযোগিতা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতচর্চ্চার প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করার ব্যবস্থা হইবে। যাঁহারা প্রকৃত সঙ্গীতানুরাগী তাঁহারা কলিকাতায় সঙ্গীত কংগ্রেসের কার্য্যাবলী দেখিয়া সঙ্গীতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হইবেন।

পূর্ব্ব-জব্বলপুরে সারস্বত উৎসব—

গত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পূর্ব্ব-জব্বলপুরে বাঙ্গালী অধিবাসীদের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে তরুণ সঙ্গীত-বীথির শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নৃত্য গীতাভিনয়

পূর্ব্ব জব্বলপুরে বাঙ্গালী নৃত্যগীত শিল্পীবৃন্দ

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বক্সী রচিত 'নীলকমল' গীতি নাটিকায় কুমারী পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা মণ্ডল ও ডলি দত্তের অভিনয় সকলেরে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার দে ও শ্রীযুক্ত গৌর গাঙ্গুলী অভিনয়াদির ব্যবস্থাপনা করিয়াছিলেন।

পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমে উৎসব—

পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পাবনা হিমায়েৎ গ্রামে কয়দিনব্যাপী সভা, যাত্রাগান ও আমোদপ্রমোদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৭ই জানুয়ারী তথায় ঐ উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সৎসঙ্গ আশ্রমের বহুপ্রকার জনহিতকর প্রচেষ্টা বহু-লোককে ঐ আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। রেল ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে নদীতীরস্থ এক গ্রামে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যে বিরাট কার্য্য চলিতেছে—তাহা দেশবাসী সকলের অনুকরণীয়।

ডেরাডুনে সরস্বতী পূজা—

ডেরাডুনের প্রবাসী বাঙালীরা অন্যান্য বৎসরের মত এবারও সমারোহের সহিত সরস্বতী পূজা করিয়াছেন। পূজার দিন নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং লেঃ কঃ চ্যাটার্জ্জি ম্যাজিক দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। শ্রীমতী বেলা দাসের যত্নে ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাঙ্গালার রাজস্ব-মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও ২৪পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায় আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারের পক্ষ হইতে তাঁহাদের শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ভাণ্ডারে একটি মাতৃ-মঙ্গল ও শিশুকল্যাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন করা হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভাণ্ডারের বহুমুখী কার্য্যধারা দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

সন্তরণে বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কুমারী রমা সেনগুপ্তা

কলিকাতা উইমেন্স কলেজের ছাত্রী ও অধ্যাপক আই-বি সেনগুপ্তের কন্যা কুমারী রমা সেনগুপ্তা সম্প্রতি বোম্বাই-এ কয়েকটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মাত্র ৭ বৎসর বয়সেই গঙ্গানদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলন—

গত ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনের সভাপতি বোম্বায়ের মিঃ সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশ অপেক্ষা ভারতে আমরা এই সত্য বেশী করিয়া উপলব্ধি করি যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জাতিতে জাতিতে শান্তির সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এবং যে সব স্বাধীনতা না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ত্র হইতে পারে না, তন্মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সর্ব্বাগ্রগণ্য। ভারতে সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিককে যে সব আইনগত বাধা পাইতে হয়, তাহা যেমন দুর্লঙ্ঘ্য তেমনই অসংখ্য। শত্রুর কাজে লাগিতে পারে এমন সংবাদ প্রকাশ নিবারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে—একথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু সেজন্য যুদ্ধের অজুহাতে স্বাভাবিক রাজনীতিক তৎপরতা দমন

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের সভাপতি—মিঃ সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী

করা উচিত নহে। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, তাঁহারা ভারত আইন অনুসারে যে ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাহা এমন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে ঠিক যুদ্ধ প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে বলা চলে না। পক্ষান্তরে তাঁহারা তাঁহাদের অপ্রিয় সংবাদ ও অভিমত দান করিয়া নিজেদের রাজনীতিক স্বার্থই সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন।" সম্মিলনে সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বহু প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে বিনা বিচারে আটক সম্পাদকগণকে মুক্তিদানের দাবী করা হইয়াছে। জেলে দিল্লীর শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত ও লাহোরের শ্রীযুত বীরেন্দ্র অসুস্থ হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, মনোরঞ্জন গুহ, অশ্বিনী গুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র সেন, কেদার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রভৃতিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বলা হইয়াছে।

২৪পরগণা জেলা কবি সম্মিলন—

গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার বিকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটী শাখার উদ্যোগে নৈহাটী পঞ্চাননতলায় এক বিরাট মণ্ডপে ২৪পরগণা জেলা কবি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের উদ্যোগে ও চেষ্টায় সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। ২৪পরগণা জেলার নানা স্থানের বহু কবি সম্মিলনে সমবেত হইয়া নিজ নিজ কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু—

অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু গত ২২শে জানুয়ারী মাদ্রাজে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্ত উক্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু

বসু কলিকাতাস্থ ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের বহু বৎসর কাল সভাপতি ছিলেন এবং সাংবাদিক জগতে সুপরিচিত। শ্রমিক কল্যাণ আন্দোলনেও তাঁহার দান কম নহে। কাজেই তাঁহার নির্বাচনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

পরলোকে রায়সাহেব পঞ্চানন গাঙ্গুলী—

রায়সাহেব ৺পঞ্চানন গাঙ্গুলী

গত ২রা জানুয়ারী রাণাঘাটের রায়সাহেব পঞ্চানন গাঙ্গুলী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৫১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি বহুদিন যাবৎ নদীয়া জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান, রাণাঘাট লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, আলীপুরের প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে নদীয়া জেলার একজন উৎসাহী জনসেবীর অভাব হইল।

পরলোকে অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গত ১৫ই জানুয়ারী কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রচিত মূর্ত্তিতত্ত্ব পুস্তক অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

পরলোকে চারুচন্দ্র রায়—

চন্দননগর নিবাসী প্রবীণ দেশকর্ম্মী, সাহিত্যিক ও জনসেবক চারুচন্দ্র রায় মহাশয় গত ২৮শে জানুয়ারী পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সারাজীবন দেশ ও দশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্যসেবা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

জামসেদপুর শিক্ষা সম্মিলন—

বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা মানভূম ও সিংভূমের বাঙ্গালা ভাষাভাষী এবং আদিম নিবাসীদের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্ত জামসেদপুরের কতিপয় কর্ম্মি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা যাহাতে সরকারের, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ও বাঙ্গালার সুধীবৃন্দের সাহায্য পায় তাহার জন্ত গত ১৩ই জানুয়ারী একটি শিক্ষা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি জামসেদপুরের এই শিক্ষা সমিতিকে সহযোগিতা করিতেছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষও এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

জামসেদপুরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

শিক্ষার প্রারম্ভেই খেলোয়াড় উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের বলের সম্মুখীন হবে না। খেলোয়াড়দের প্রাথমিক শিক্ষা হবে, উইকেটের সামনে সহজ ভাবে ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক বলের প্রতি ব্যাটখানি নির্ভুল ভাবে চালাবার অভ্যাস করা। প্রথমেই ব্যাট চালিয়ে বল মারার অভ্যাস করলে ব্যাটিংয়ে আশানুরূপ উন্নতিলাভ সম্ভব নয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাটিং ষ্ট্রোক অভ্যাস করলে খেলোয়াড় তার পা, শরীর এবং ব্যাটের নির্ভুল অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং ভুলের সংশোধন ক'রে নিতে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে খেলোয়াড়দের আর একটি নিয়ম পালন করতে হবে। উইকেটের সামনে সমস্তখানি স্থানজুড়ে ব্যাটসম্যান খেলতে পারে না। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে খেলতে হবে। উইকেটের সামনে ব্যাটসম্যান stance অবস্থান দাঁড়ালে তার পায়ের পিছন দিকের ছ' সাত ইঞ্চি দূরে ক্রিজের সঙ্গে সমকোণ ক'রে একটা খড়ির দাগ টানতে হবে। খেলোয়াড়ের পা এই দাগ অতিক্রম ক'রে পিছনে যাবে না। খেলোয়াড়ের পায়ের পিছনের দিকের এই অংশ নিষিদ্ধ অঞ্চল। এই অঞ্চলে খেলোয়াড় কখনও পা বাড়িয়ে ব্যাট চালাবে না, এতে ষ্ট্রোক মোটেই দর্শনীয় হবে না বরং এই অসুবিধাস্থল থেকে পা ফেলে ব্যাট চালিয়ে বিপদে পড়তে পারে। এবার ব্যাট দিয়ে বল মারার অভ্যাস করা যেতে পারে। ক্রিকেট খেলা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব ব্যাটস্‌ম্যান খেলায় কখনও একই ধরণের ব্যাট চালিয়ে বল খেলে না। বোলারের বিভিন্ন ধরণের বল দেওয়া লক্ষ্য ক'রে ব্যাটস্‌ম্যানকে ভিন্ন রকমের ব্যাটিং পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ব্যাটিং ষ্ট্রোকের প্রারম্ভেই আসে 'ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক'।

ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক ঃ

ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক মারতে হবে ভাল উইকেটে গুড্‌লেংথ বলে। অথবা একটু ওভার-পিচড্‌ বল হলেও ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক কার্য্যকরী হবে। আত্মরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক উভয় খেলাতেই ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক মারতে হামেশাই খেলোয়াড়দের দেখা যায়। ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক মারতে হলে বাঁ পাটি সোজা বলের পিচের দিকে এগিয়ে দিতে হবে। বাঁ পায়ের অবস্থানের উপরই ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকের সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং বাঁ পা ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকের কেন্দ্রস্থল বলা যেতে পারে। বাঁ পা এগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড় ব্যাটের পূর্ণ সম্মুখভাগ বাঁ পায়ের গা ঘেঁষে সামনে এগিয়ে দেবে। এর ফলে সমস্ত দেহভারটা বাঁ পায়ের উপরে পড়বে, ডান পাখানা সোজা হ'য়ে আঙ্গুলের টোয়ের উপর মাটি ছুঁয়ে থাকবে। বাঁ পাটি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে খেলোয়াড়ের মাথাও এগিয়ে যাবে। এতে খেলোয়াড় ব্যাটের সঙ্গে বলের মিলনের সময় পর্য্যন্ত বলের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে পারবে। বাঁ পা এবং সেই সঙ্গে মাথাটি এগিয়ে দিলেই কাজ শেষ হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটখানিকেও সামনে এগিয়ে নিতে হবে। ডান হাতের কাজ এবং বাহু এই কাজে বিশেষ সহায়তা করবে, বাঁ হাতটি হাতলের উপরিভাগ ধরে থাকবে। ব্যাটের হাতলটা ব্লেডের তুলনায় এগিয়ে যাবে। শিক্ষার প্রথম দিকে আত্মরক্ষামূলক ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক অবলম্বন ক'রে খেলাই উচিত। আত্মরক্ষামূলক ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকে রাণ উঠে না কিন্তু এই খেলায় অভ্যস্ত হ'লে পরে নির্ভুল সময়জ্ঞানে প্রয়োজনীয় ভাব প্রয়োগ ক'রে এবং কব্জির নিখুঁত কর্ম্মদক্ষতায় দ্রুত রাণ তোলা যায়। কিন্তু বোলার একই ধরণের বল দেবে না, ব্যাটস্‌ম্যানকে বিভ্রান্ত ক'রার উদ্দেশ্যে সে বিভিন্ন রকমের বল ফেলবে। সুতরাং তার ছলনায় ব্যাটস্‌ম্যানের পড়ার সম্ভাবনা আছে। যদি ব্যাটস্‌ম্যান ঠিক ভাবে ব্যাট না চালায়; যেমন ব্যাটস্‌ম্যান গুড্‌লেংথের বল অনুমান করে ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকের যাবতীয় mechanism ব্যবহার করে শেষে দেখতে পেল বল সর্ট পিচে পড়েছে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় হয় সে দ্বিধাশূন্য হয়ে সমস্ত শক্তিপ্রয়োগে বল পিটবে কিম্বা ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোক না মেরে 'হাফ-কক সর্ট মারবে। ব্যাটস্‌-ম্যান যখনই দেখবে বল ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকের উপযোগী নয় তখনই ব্যাটখানিকে বাঁ পা পর্য্যন্ত না এগিয়ে ঠিক থাড়া থামিয়ে দেবে। এই গতিরুদ্ধ ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকের নাম হ'ল 'হাফ কক ষ্ট্রোক'। বলের গতিপথের (flight) গোড়াতেই খেলোয়াড়ের বিচার ভুল হ'লে এই শ্রেণীর ষ্ট্রোক খেলোয়াড়কে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। 'হাফ কক ষ্ট্রোককে সেফটি ফাষ্ট' ষ্ট্রোক বলা হয়েছে। ফাষ্ট উইকেটে হাফ কক ষ্ট্রোক বিশেষ কাজের এবং stricky wicketএ যখন বল অনেক রকম অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করে। রাণ তোলার দিক থেকে এর সার্থকতা খুবই কম কিন্তু ব্যাটস্‌ম্যান কোণঠাসা অবস্থায় কেবল এই ষ্ট্রোক মেরে উইকেট বাঁচিয়ে রাখতে যথেষ্ট সাহায্য পায়।

'হাফ কক ষ্ট্রোকে'র টেকনিক্ হবে, ফরওয়ার্ড ষ্ট্রোকের মত ফুটওয়ার্ক এবং ব্যাক ওয়ার্ড ষ্ট্রোকের মত বাহুর কাজ (arm

work)। হাফ কক সর্ট মোটেই দর্শনীয় নয় কিন্তু আত্মরক্ষার দিক থেকে এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ক্রিকেট ঃ

উত্তর ভারত ঃ ৪৪৯ ও ২৯৮ (৭ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

দক্ষিণ পাঞ্জাব ঃ ২৯৩ ও ৯২

দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক অমরনাথ টসে জয়লাভ করেও বিপক্ষকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ দিয়ে মারাত্মক ভুল করেন।

উত্তর ভারত ৩৮২ রানে দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছে।

উত্তর ভারত: প্রথম ইনিংসে মহম্মদ ইসলামের ৯১ রান, রামপ্রকাশের ৭৭ এবং মুনিলালের ৫৯ রান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে রান: ইমতিয়াজ ১০০, মুনিলাল ৮৫।

দক্ষিণ পাঞ্জাব: প্রথম ইনিংস—মকসুদ ১৪৪, মুবার্ত ৭১।

বোম্বাই ঃ ৪৬৮ ও ৭৪ (৩ উইকেট)

বরোদা ঃ ১৫১ ও ৩৯০

বোম্বাই ৭ উইকেটে বরোদা দলকে পরাজিত করেছে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে বোম্বাই উত্তর ভারত দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বোম্বাইয়ের ৪৬৮ রানের মধ্যে আর এস মোদী নট আউট ২৪৫ রান করেন। আর এস কুপারের ৬২ এবং পালওয়ানকারের ৭৮ রান উল্লেখযোগ্য। বরোদার দ্বিতীয় ইনিংসে গুলমহম্মদ ১০০ রান করেন। নিম্বলকার করেন ৯৬ রান।

হোলকার ঃ ৫৩৮

বাঙ্গালা ঃ ৬৪ ও ১৭৬

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে হোলকার দল বাঙ্গালা প্রদেশকে এক ইনিংস ও ২৯৮ রানে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হোলকার পূর্ব্ব বৎসরে বাঙ্গালার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

হোলকার দল প্রথমে ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ৫৩৮ রান তুলে। দলের সর্ব্বোচ্চ ১৪১ রান তুলেন অধিনায়ক সি কে নাইডু। সি টি সারভাতের ১২৭, জে এন ভায়ার ৬১ এবং সি এস নাইডুর ৫০ রান উল্লেখযোগ্য। সি কে নাইডু প্রথম দিনের খেলাতে ১২০ রান তুলেন, তার মধ্যে ১৫টা বাউণ্ডারী। অধিনায়ক নাইডুর খেলা খুবই দর্শনীয় হয়েছিল। বাঙ্গালা দলের প্রথম ইনিংস মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে ৬৪ রানে শেষ হয়ে যায়। সি এস নাইডু ৬৫ বার বল দিয়ে মাত্র ৩২ রানে ৫টা উইকেট পান। সারভাতে পেলেন ২টো ১৩ রান দিয়ে। বাঙ্গালাকে 'ফলো-অন' করতে হ'ল।

তৃতীয় দিনে বাঙ্গালা দল তার দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। আরম্ভ মোটেই সুবিধার হ'ল না। মাত্র ২৪ রানে ৪টে উইকেট পড়ে গেল। পার্থসারথি এবং পি বি দত্ত জুটী হয়ে খেলার মোড় অনেকখানি ঘুরিয়ে দিলেন। বাঙ্গালার দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র উল্লেখযোগ্য যে, পার্থসারথি এবং পি বি দত্ত একত্রে জুটী হয়ে ৮২ রান তুলে দলকে অনেকখানি সাহায্য ক'রেছিলেন। পার্থসারথি ৬০ রান করেন।

মাদ্রাজ ঃ ৩৬৩

মহীশূর ঃ ৭৮ ও ১৫৯

মাদ্রাজ এক ইনিংস ও ১২৬ রানে মহীশূর দলকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠে হোলকার দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

মাদ্রাজ দলের অনন্তনারায়ণ ১২৪ রান করে নট আউট থাকেন এবং ব্রেন নেলার ৬৩ রান করেন। মহীশূর দলের প্রথম ইনিংসে রঙ্গচারী ৩৪ রানে ৭টা উইকেট পান। রামসিং পান ৩টে ৩৩ রানে।

মহীশূরের পালিয়া মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংসে ৭০ রানে ৫টা উইকেট পান এবং দলের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ ৭৪ রান করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩ রানে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে রহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি লাভ করেছে।

ফলাফল ঃ

বোম্বাই প্রথম ইনিংসে ২৭৩ (আর এস মোদী ১১০), দ্বিতীয় ইনিংস—২০০ (বেগ ৮০)

পাঞ্জাব—১৯৮ ও ১৯৬ (দলজিন্দার সিং ৭২ রান)

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "১৩৫০"—২।০
গিরীন চক্রবর্ত্তী অনুদিত "তোমাদের বন্ধু লেনিন"—২৲
নরেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ"—৪।০
শ্রীসুরেশ বিশ্বাস প্রণীত সঙ্গীত-গ্রন্থ "নদী মাতৃকা"—১৲
শ্রীমদনমোহন কুমার প্রণীত "বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

স্মৃতি

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

পট-পরিবর্তন

ফটো : শ্রীপান্না সেন
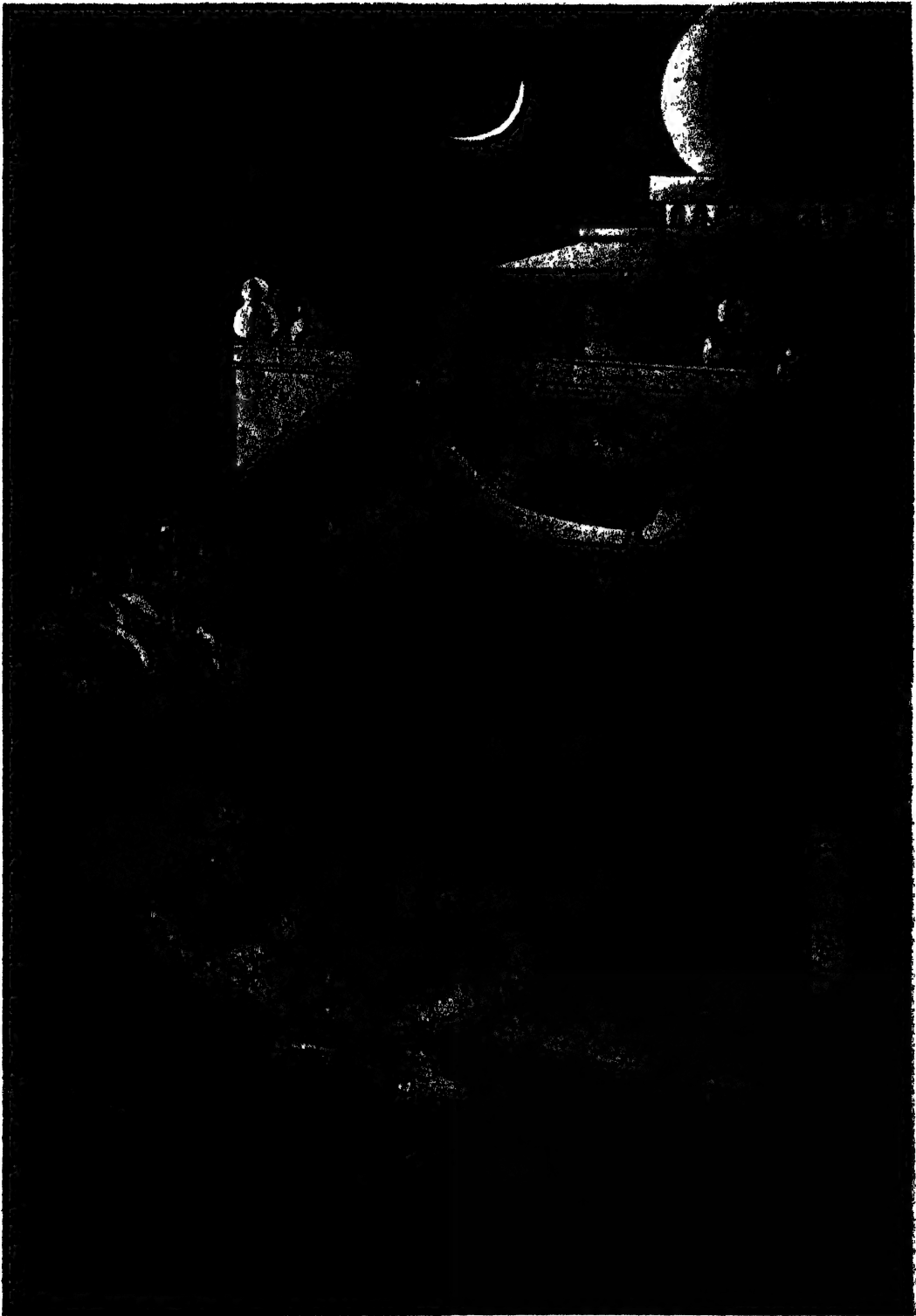
চৈত্র—১৩৫১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

মন্বন্তর ও সাহিত্য

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরাজী উনিশ শো চুয়াল্লিশ সাল পার হতে চলেছে। আমাদের দেশীয় ১৩৫১ সালের চার ভাগের তিন ভাগ চলে গেল। বিশ্বব্যাপী ধ্বংস-লীলার মহাতাণ্ডব চলছে আজ ছ বৎসর ধ'রে। যুদ্ধ বাঙ্‌লার দ্বারদেশে। ঝড়, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী অব্যাহত গতিতে বাঙ্‌লার সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়েছে। আজ বাঙ্‌লার চিত্রশিল্পীর মডেল হয়ে উঠেছে—নরকঙ্কাল, গলিত শব, তার চারিপার্শ্বে ক্ষুধার্ত্ত মাংসলুব্ধ কুকুর শেয়াল শকুন; সাহিত্যিকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরন্তন মানবতার মহাপ্রকাশ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিছক জীবন-তাড়নায় মা কোলের ছেলেকে ফেলে পালাচ্ছে, মানুষ সন্তানকে হত্যা করছে, স্ত্রীকে হত্যা করছে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করছে—স্ত্রী কন্যা ভগ্নী বিক্রি করছে মানুষ, নারী নিজেকে বিক্রি করছে। বাঙ্‌লার মহানগরীর রাজপথে রাস্তায় কঙ্কালের সারি, ছবিঘরের সামনে জনতার ভিড়, তারই মধ্য দিয়ে চলছে অতিকায় সামরিক যানবাহন, মাথার উপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন। সমস্ত কিছুকে স্তব্ধ করে দিয়ে মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে সাইরেণ। আজিকার দিনে সাহিত্যের সূক্ষ্ম এবং ললিত রসতত্ত্বের আলোচনা বোধ হয় দীর্ঘকালের জন্যই স্তব্ধ হয়ে গেল। তার পরিবর্ত্তে যে স্থূল সত্য আজ সাহিত্যিকের মনকে পীড়িত করছে সেই কথাই উপস্থাপিত করব।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ এল মহানগরীতে। কঙ্কালসার ধূলি-ধূসর দেহ, জীর্ণ শতছিন্ন ময়লা কাপড়ের টুকরো তাদের পরণে, হাতে মাটির ভাঁড়, বগলে ছেঁড়া চট, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, নারী, কুমারী-সধবা-বিধবা—তাদের গায়ের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল, দূষিত হয়ে উঠল মহানগরীর বাতাস। তারা যেন মিছিল করে এল—যেমন পর্ব্বে পার্ব্বণে গঙ্গাস্নানে আসে তীর্থযাত্রীর দল। তারা এল, বললে শুধু একটিমাত্র কথা—একটু ফ্যান—চারডি ভাত। তারপর তারা ফুটপাথে শুল, মরল। আশ্চর্য্যের কথা—তারা একবার বললে না—কেন আমরা না খেয়ে মরছি? বললে না—আমরা বাঁচতে চাই। বললে না—আমরাও মানুষ; একবার তাদের মনে প্রশ্নও উঠল না—এর জন্য দায়ী কে?

সংবাদ-পত্রে বলা হ'ল—এটা 'Man made famine'। সরকার বললেন—দায়ী হৃদয়হীন মজুতদার। সরকারী বিরোধী রাজনৈতিকদল বললেন—দায়ী সরকারের ভ্রূক্ষেপহীনতা, অযোগ্যতা।

দায়ী কে সে বিচার আমি করব না। আমি শঙ্কিত অন্তরে বিচার করতে চাই—সাহিত্যিকের দায়িত্বের কথা। মনে হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর এই চুয়াল্লিশ সাল পর্য্যন্ত বাংলায় নবযুগের কথা। বাংলার নবযুগ, জাতীয় জাগরণ—বাংলার সাহিত্য, সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক চেতনা—এই তিন ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমের ফল। তুলনা করতে হলে সাহিত্যিকের ধারাই এই ত্রি-ধারার মধ্যে গঙ্গার স্রোতধারার সঙ্গে তুলনীয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, সে সাহিত্যের মূল্য সভ্য-শিক্ষিত সমাজে দেশে দেশান্তরে অবিসম্বাদীভাবে স্বীকৃত। জগতের কবি-সভায় বাঙ্‌লা

সাহিত্যের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তার পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য সম্বন্ধে অবশ্য অভিজাত সম্প্রদায়, সমালোচকমণ্ডলী নিঃসংশয় হতে পারেন নি। নেতিবাদ বাঙালীর জীবনে আজ প্রবল। আমি কিন্তু নেতিবাদী নই এবং বর্ত্তমান যুগের স্রষ্টা সাহিত্যিকমণ্ডলীর একজন প্রতিনিধি হিসেবে মনে করি রামমোহন হতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সৃষ্ট সাহিত্যের মর্য্যাদার হানি করেন নাই এ যুগের সাহিত্যিকমণ্ডলী। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পর সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি লাভ সহজ শক্তির পরিচয় নয়। সে স্বীকৃতি তাঁরা আদায় করেছেন। পাঠকমণ্ডলী স্বীকার করেছেন, সমালোচকমণ্ডলী তাকে স্বীকৃতি না দিলেও ফেলে দিতে সক্ষম হন নি এবং সে সাহিত্যকে ভবিষ্যতে তাঁদের স্বীকার করতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলার সামাজিক আন্দোলনের অবস্থা যদিও আজ লুপ্তধারা সরস্বতীর মত, তবুও এককালে সে ধারা প্রচণ্ড বেগবতী উচ্ছ্বাসময়ী হয়ে উঠেছিল। রামমোহন বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মহা আবির্ভাব, জগৎ সভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি—'মানুষ-গড়ার' বিপুল প্রয়াস, ঋষির বেদান্তকে আচণ্ডালের মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রয়াস, সন্ন্যাস আশ্রমকে সমাজ সেবায় নিয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা তার উৎকৃষ্ট পরিচয়। পরবর্ত্তীকালে এই ধারা রাজনীতির ধারার মধ্যে প্রায় মিশে গিয়েছে। আজ সমস্ত মিশন, মুসলীম লীগ ভিন্ন—গ্রাম আন্দোলন আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি আশ্রয়ী। কিন্তু সেকালের এই প্রচণ্ড স্রোতোচ্ছ্বাসময়ী ধারা বাংলার সমাজ জীবনে বহু উর্ব্বরতায় উর্ব্বর করে তুলেছিল এ সত্য ঐতিহাসিক, একে অস্বীকার করবার উপায় নাই।

তারপর রাজনীতির ধারা। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ। স্বদেশী আন্দোলন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমারের উত্থান। বাঙালীর ললাট রাজরোষের লাঞ্ছনার তিলকে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, গুপ্ত হিংসা-শ্রয়ী বৈপ্লবিক আন্দোলনের আবির্ভাব। ফাঁসীর বেদীতে দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ বলি নিবেদিত হ'ল অম্লান সত্ত প্রস্ফুটিত বাংলার উজ্জ্বল যুবক জীবন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"Fight always, figh and fight on, though always in defeat—that's the ideal." গীতার ফল-প্রত্যাশা-মুক্ত কর্ম্মবাদের ভাষ বাঙালীর যুবক-জীবনে সার্থক হয়ে উঠল। স্বাধীনতার যজ্ঞে অগ্নিমন্ত্রের উপাসকেরা মৃত্যুভয়কে জয় করতে চাইলেন। তারপর গণ আন্দোলন, দেশবন্ধুর আবির্ভাব। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, মিছিল, সভা, জয়ধ্বনি, আন্দোলনের সময়ে মানুষের ত্যাগস্বীকার—সে এক মহান গৌরবময় ইতিহাস।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—"ছয় কোটি মুণ্ড তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠন করিব, এই ছয় কোটি কণ্ঠে তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব,—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।" সঙ্কল্প করেছিলেন—"এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব।" ডাক দিয়েছিলেন—"এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।……অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত মথিত ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি।" হিন্দু রেনেসেন্সের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র যে কল্পনা যে সংকল্প করেছিলেন তাতে হিন্দু কল্পনার ভাবাধিক্য থাকলেও তিনি ছয় কোটি মানুষের মধ্যে থেকে হিন্দু-এতর সম্প্রদায়কে বাদ দেন নি। উচ্চবর্ণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেতনা সঞ্চার করাই তাঁর সাহিত্য-ধর্ম্ম ছিল না। অস্পষ্ট হলেও এই দেশে ছয় কোটি মানুষের জীবনের অধিকারকে তিনি সমান ভাবে স্বীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন—বাঙলার সাত কোটি সন্তানকে মানুষ করতে। তিনি বলেছিলেন—"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" নিজেকে তিরস্কার করেছিলেন—পলাতক বালকের মত, মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে বাজাইলি বাঁশী। নিজেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, নিজে বলতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার গণসমাজকে বলাতে চেয়েছিলেন—অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, মুক্ত বায়ু চাই, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট চাই।

শরৎচন্দ্র গফুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আল্লার কাছে, ঈশ্বরের কাছে বিচার চেয়েছিলেন। পল্লী সমাজে মানুষদের মানুষ করে গড়ে তোলবার সংকল্প তিনিও নিয়েছিলেন। পল্লী সমাজের জ্যাঠাইমা বলেছিলেন—"জন্মভূমি তোর একারই বই কি বাবা—শুধু তোর মা। দেখতে পাসনে, মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিন কিছু দাবী করেন নি। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু তুই আসবামাত্রই শুনতে পেয়েছিলি।" রমেশ রমাকে প্রশ্ন করেছিল—"ঠিক জানো কি রমা আমার এ দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না?" রমা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল—"ঠিক জানি। যিনি সব জানেন এ সেই জ্যাঠাইমার কথা! এ কাজ তোমারই।" শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে—এই সব মানুষই হয়েছে সাহিত্যে নায়ক নায়িকা।

সমাজ সংস্কার—রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্য এবং উক্তি আলোচনা করব না বাহুল্যের ভয়ে। তাঁদের উক্তি ঐ একসুরে বাঁধা এবং আরও উত্তেজনাপূর্ণ, এ সম্বন্ধে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন নাই। পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

এই সমস্ত উক্তি, এই সংকল্প, বাংলার জীবন-প্রবাহের উচ্ছ্বাসের ইতিহাস স্মরণ করে, আলোচনা করে প্রশ্ন করলাম নিজেকেই—তবু কেন এমন হ'ল? কেন এরা বললে না, বলতে পারলেনা—আমরাও মানুষ। প্রশ্ন করলে না, কেন আমরা না খেয়ে মরছি? এর জন্য দায়ী কে? "দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে"—এই কথা আমাদের দেশের জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—১৩০০ সালের ২৩শে ফাল্গুন। ১৩৫০ সালেও দেখলাম বাঙলার মানুষের জীবনান্তের ঠিক সেই ছবি।

তবে এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল বাঙলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম-সমাজ-রাজনীতি থাক—সাহিত্যের কথাই আমার আলোচ্য—বাঙলার সাহিত্য বাঙলাদেশে কোন্ চেতনা, কোন্ শক্তি, কোন্ প্রভাব বিস্তার করেছে? এ প্রশ্ন সম্পর্কে কেউ যদি বলেন—প্রশ্নটি স্থূল এবং বাহ্য বৈষয়িক, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ধর্ম্ম আত্মিক, আধ্যাত্মিক, আমার তাঁদের সঙ্গে মত বিরোধ নেই। ঠিক কথা। কিন্তু সেই আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ তো জীবনলীলার মধ্যেই। আত্মচেতনা—আপনাকে জানা, আত্মানং বিদ্ধি, Know Thyself-ই তো আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রথম এবং শেষ কথা। "আগে কেবা প্রাণ—করিবেক দান—তার লাগি তাড়াতাড়ি"র মৃত্যু তো এ নয়। ভাষাহীন শিশু বংশগত রোগে, পিতামাতার অক্ষমতায়, খাদ্যাভাবে শুকিয়ে দুর্ব্বল কণ্ঠে কাতরায়, মরে—এ মৃত্যু তেমনি। বাংলাদেশ বাঙলা সাহিত্য থেকে ভাষা খুঁজে পায় নি।

বাইরে থেকে কারণটা খুব স্পষ্ট। আমাদের সাহিত্যের বাণী গ্রহণ করবার যোগ্যতা তাদের নেই এবং আমরা তাদের জন্য সাহিত্য রচনা করি নি। বাঙলা সাহিত্য শিক্ষিত বাঙালীর সাহিত্য। সাহিত্য কোন কালেই অশিক্ষিতের জন্য নয়। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এ অবিসম্বাদী সত্য।

বাংলাদেশে শতকরা দশ জন লোক শিক্ষিত—তার বেশী নয়; বাঙলার জন সংখ্যা ছ কোটী। সুতরাং এ সাহিত্য ছ লক্ষ লোকের

সাহিত্য। শুধু "বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" মানুষের জন্ত নয়। কিন্তু এ তো আমরা চাই নি। আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের কল্পনা ছিল নবযুগের সাহিত্যের সঞ্জীবনী স্পর্শে সমগ্র বাঙালীর জীবনে মহাশক্তি সঞ্চারিত করে তুলব, কোটী কোটী মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে বাঙ্‌লা সাহিত্যের মহাবাণী।

যাঁরা অতি আশাবাদী তাঁরা বলবেন—মানুষের সমাজ ধীর গতিতে ক্রমোন্নতির পথেই চলেছে, কালে শিক্ষার বিস্তার হবে, তারা উঠে আসবে, সেদিন এই সাহিত্য সার্ব্বজনীন সাহিত্যে পরিণত হবে। সেদিন সার্থক হবে বাঙ্‌লার এই সাহিত্য। আমিও আশাবাদী, কিন্তু তবুও আমি এই অতি আশাবাদে আস্থা স্থাপন করতে পারি না। এ সম্পর্কে আমি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনকালের মন্দিরগুলি আজও সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা কোথাও কোন স্থানে সেকালের মানুষের ঘর দাঁড়িয়ে নেই। তার ফলে সে কালের ওই মহাবিস্ময়কর স্থাপত্যের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে, স্থপতি বংশ বিলুপ্ত। সে স্থাপত্যের বিদ্যাও আজ পুরাণো পঞ্জিকার মত কোথায় ধূলিস্তূপের মধ্যে ধূলায় পরিণত হয়ে গেছে বা হতে চলেছে। তেমনি ভাবেই বাঙলার এই যুগের বিশ্বসমাদৃত সাহিত্যের গতি হয়তো রুদ্ধ হয়ে যাবে। নূতন যুগ আনবে নূতন ভাষা—যা সর্ব্বজনবোধ্য। পাথরের মন্দিরের জায়গায় কংক্রিটের ব্যারাকের বাড়ীর মত। আবার হয় তো এমনও হতে পারে—আমাদের অবস্থা কোণার্কের মন্দিরের এবং তার পারিপার্শ্বিকের মত হবে। কোণার্কের বিস্ময়কর কারুশিল্পময় মন্দির আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত, তার চারি পাশে দারিদ্র্যজীর্ণ কতকগুলি কুটীর। বাঙ্‌লা দেশে তেরশো পঞ্চাশ সালে—যে দৃশ্য দেখেছি তাতে এ সংশয় না ক'রে আমি পারি না। কঙ্কালেরা মিছিল ক'রে শহরে এসে পথের উপর পড়ে মরেছে হাজারে হাজারে, পল্লীগ্রামে যারা মরেছে তাদের সংখ্যা যোগ করলে সে হবে লাখে লাখে। কিন্তু যা লোকলোচনের অন্তরালে ঘটেছে, সেও মহা ভয়াবহ, মহা মর্ম্মন্তুদ! যারা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের প্রাণপাতের ফলে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে বাঙলায় আধুনিক সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির তিলোত্তমা—তারা এই মহা মন্বন্তরে ওই প্রাচীন স্থপতির বংশের পরিণতি অর্থাৎ প্রায়-বিলুপ্তির দিকে চলেছে। তারা চলেছে—ওই যারা পথের উপর মরছে তাদের স্থান গ্রহণ করতে। মধ্যবিত্তরা সর্ব্বস্ব হারিয়ে শ্রমিক হতে বাধ্য হবে। আজ আমরা বলি—সাহিত্য যাদের জন্ত নয়—তাদের স্থান গ্রহণ করতে চলেছে তারা। আজ আমাদের সাহিত্যের বাণী যাদের স্পর্শ করল না—তাদের স্থান। যুদ্ধের অন্তে পৃথিবীর অবস্থা আজও অনিশ্চিত। বিগত যুদ্ধোত্তর অবস্থা স্মরণ করেও—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিয়মে হিসাব করেও—ভাবী রূপকে ধরা যাচ্ছে না। কারণ এ যুদ্ধের গতি এবং প্রকৃতি ইতিহাসের বিগত সকল যুদ্ধের গতি প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করে চলে গেছে। সমস্ত সৃষ্টি একটা ভূমিকম্পের তাড়নায় যেন থর থর করে কাঁপছে। কেন এমন ঘটল—এর কারণ অনুসন্ধান করে ওই ভূমিকম্পের কারণের তুলনাই আমি দেব। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ তাপ তার সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে—সে আজ বেরিয়ে যাবেই। মানুষের সমাজে যে পরিবর্ত্তন হওয়া উচিৎ ছিল—তা বিবর্ত্তনের গতিতে সম্ভবপর হয় নি—তাই সে রূপ নিতে চাচ্ছে—বিপ্লবের ধ্বংসাত্মক গতি পথে। পৃথিবী এর মধ্যে একটা পরিণতি খুঁজে পাবে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ভাবে অনিশ্চিৎ। কারণ আমাদের জীবনের গতিবেগ—পৃথিবীর গতিবেগের সঙ্গে সমগতিতে চলছে না। তারা চলছে ছুটে, আমরা চলছি গড়িয়ে—তাদের টানে। তাই আমার আশঙ্কা হয়—আমাদের পরিণতি ওই কোণার্ক মন্দির এবং তার পারিপার্শ্বিকের মত।

এর একমাত্র পথ—আমাদের সাহিত্যের আদর্শ এবং বাণীকে বাঙালীর জীবনে সার্থক করে তোলা অর্থাৎ সমগ্র বাঙালী জাতির সঙ্গে বাঙালীর সমগ্র সংস্কৃতির পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে তোলা। বঙ্কিমের সংকল্প, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, সার্থক করে তোলা। শরৎচন্দ্রের প্রদীপ শিখাকে আকাশ-ললাট উজ্জ্বলকারী মশালের আলোতে বহ্নিমান করে তোলা। এর উত্তরে প্রশ্ন উঠছে—তা কেমন ক'রে সম্ভবপর? সে প্রশ্নের উত্তর দুটি—প্রথম সাহিত্যকে ছ লক্ষের বোধগম্যের মান থেকে নামিয়ে সর্ব্বজনবোধ্য ক'রে তোলা। অর্থাৎ সাহিত্যকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হবে নীচে। খর্ব্ব করতে হবে। দ্বিতীয়—সমগ্র জাতিকে টেনে তুলে আনতে হবে এমন স্তরে, যে ভূমিতে এসে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করতে পারবে সাহিত্যের সঞ্জীবনী। হয় অন্ধকূপে নিয়ে যেতে হবে আলো—নয় তাদের অন্ধকূপ থেকে সূর্য্যালোকিত পৃথিবীর বুকে তুলে আনতে হবে অবিলম্বে।

আমি সাহিত্যকে নীচে নামাবার পক্ষপাতী নই। আমার বক্তব্য—তাদের তুলে আনতে হবে। অবিলম্বে তুলে আনতে হবে, ধীরে ধীরে নয়। নতুবা আমাদের জাতির সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের পরিণতি ভয়াবহ বলেই মনে হয়। এ প্রায় অসম্ভব কল্পনা। এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার পথে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্নিবার বাধা বিঘ্ন রয়েছে—এ জানি। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বহু বাধা বিঘ্ন আছে। কিন্তু তবু তাই করতে হবে। এ বাধা বিঘ্ন অপসারিত করবার প্রেরণা, ইঙ্গিত শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে এই শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে। শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের এক অংশের মধ্যে এ চেতনা জাগ্রত হয়েছে বলেই আমার ধারণা। আজ যদি আমরা এ করতে না পারি—তবে এ দেশে হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান যাই হোক না কেন—সে স্থানে থেকে হিন্দু মুসলমান কেউ থাকবে না। থাকবে এক চির-গোলামের জাতি—তাদের সংস্কৃতি হবে গোলামী সংস্কৃতি। ধীর গতিতে সংস্কারপন্থার আদর্শের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত জীবনেই এমন তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত করতে হবে যার আবেগে সঙ্কটময় বর্ত্তমানকে পরিবর্ত্তন করে বিজ্ঞান-বিশ্বাসী নূতন সার্ব্বজনীন জাতীয় জীবন রূপায়িত করার গভীর ভাবনায় ভাবিত হয়ে উঠবে শিক্ষিত বাঙালী। সাহিত্যের মধ্যে সে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনেই সেই অমৃতের শক্তি সঞ্চারিত করতে হবে, যার বলে পঙ্গু বাঙালী জীবন গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হবে। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত বাঙালীর। যুগ যুগান্তর ধরে সমাজের বৃহত্তম অংশকে শিক্ষার মনোময় খাদ্যে বঞ্চিত করে ক্ষুদ্রতম অংশকে পুষ্ট করে আসা যখন হয়েছে, তখন এ দায়িত্ব সমাজের সেই ক্ষুদ্র অংশকেই বহন করতে হবে, পালন করতে হবে। মস্তিষ্কের প্রেরণায় এবং সাহসে উদ্বুদ্ধ জীবন যখন উঠে দাঁড়ায় তখন তার সমগ্র দেহই চঞ্চল হয়ে ওঠে, অন্ত দেহাংশও তখন কার্য্যকরী হয়। তেমনি শিক্ষিত বাঙালী যদি জীবনের পারিপার্শ্বিকের আমূল পরিবর্ত্তনের জন্ত অগ্রণী হয়ে মরণ জয়ের পণে উঠে দাঁড়ায়—তবে সমগ্র বাঙালী জাতিও যে তাদের অনুসরণ করবে তাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসে তার নজীর আছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি সাহিত্যকে আজ প্রচারধর্ম্মী করে তুলতে হবে? এর উত্তরে আমি বলব—এ ধারণা ভ্রান্ত বলেই আমি মনে করি। পৃথিবীতে আজও পর্য্যন্ত যে সব সাহিত্য মহৎ সাহিত্য বলে পরিগণিত হয়েছে, Great Art বলে অভিহিত হয়েছে, তার মধ্যে বড় আদর্শবোধ আছেই, বিপুল আশার আশ্বাস আছেই—যে আদর্শবোধ, যে আশ্বাস মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে, নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক-দীপ্তিতে আশ্বাসিত করে জীবন পথে চলবার বল দিয়েছে। যে সব চিরন্তনত্বের মধুসন্ধানী মধুকর সাহিত্যিক একে মনে করেন সাহিত্য-চন্দ্রমায় মন্দ রাহু গ্রহের উদ্যত গ্রাস, তাঁদের শুধু একটা কথাই বলতে চাই—জৈব জীবনের কতকগুলি প্রবৃত্তি ছাড় আদিম বা চিরন্তন বলে কিছু কি মানুষের জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না, আদিম মানুষেরও বন্ধনে, গভীবদ্ধতায় বেদনাবোধ আদিম বা চিরন্তন বোধ নয়? আজ জীবনে ও সাহিত্যে জৈব-জীবনের প্রবৃত্তিগুলির যে রূপ দেখা যায়—তা কি মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে, রূপান্তর

লাভ করে নি? এবং বহুক্ষেত্রে স্বার্থকে অতিক্রম ক'রে জৈব প্রবৃত্তি এক সুন্দরতর রূপ লাভ করে নি? বন্ধন বা গণ্ডীবদ্ধতার মধ্যে যে কষ্ট, সে কষ্টও তেমনি ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত হয়ে বিপুলত্ব লাভ করেছে। তার মধ্যেও আছে সেই চিরন্তনত্বের রূপ এবং মূল্য। তা ছাড়া ব্যক্তিগত মানুষের সুখ দুঃখের মূল কারণকে স্পর্শ না ক'রে তাকে উপেক্ষা করলে সে তো শুধু বাইরের রূপ। পারিবারিক গণ্ডীর পটভূমির উপর ব্যক্তি-জীবন জীবনের খণ্ডিত রূপ। পারিবারিক গণ্ডী থেকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই সত্য উপলব্ধি করা যায়। তখনই দেখা যায়—পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে মানুষটির যে নিরীহ ঘরকুনো রূপ ছিল সে রূপ বদলে গেছে। সে হয়েছে আর এক মানুষ। সে লড়াই করছে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে, নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় শুধু তার পেটের ভাত বা বেঁচে থাকার প্রবৃত্তিই সর্ব্বস্ব নয়—তার মধ্যে তার উন্নততর জীবনের কামনা আছে, আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে। সচেতন মন নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের পটভূমিতে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই মানুষের এই রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আদিকাল থেকে মানুষের যৌন জীবনের তীব্রতার মত এই আকাঙ্ক্ষা এই প্রবৃত্তিও মানুষের মধ্যে সমান তীব্র, সমান সত্য। বাঙলার চাষীর জীবন—শুধু কি ঘরের মধ্যে, ক্ষেতের মধ্যে আবদ্ধ? শুধু কি সে পিঠেই খায়, আর আষাঢ় শ্রাবণে উপোস করে? শুধু কি সে গানই গায়, আর কৃষাণীর সঙ্গে প্রেমই করে? চাষীর জীবনের সঙ্গে বাঙলার খাজনা আইনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, চাষের কানুনের সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙলার খাজনা আইনের বলে যখন জমিদার প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন তখন বাঙলার চাষীর চেহারা ছিল এক—আজ যখন নূতন আইনের প্রবর্ত্তনে উচ্ছেদ আইন উঠে গেল—তখন বাঙালার চাষীর চেহারা অন্য রকম হয়েছে। মহাজনী আইনে চাষীর চেহারা পাল্‌টেছে। এই চেহারা পাল্‌টানোর মূলে তার নিজের উত্তম জড়িত ছিল। এ শুধু হয় নি। আগেকার কালে তারা ধর্ম্মঘট করত। একালে তারা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সুতরাং চাষীর জীবনের সুখ দুঃখ মাত্র তার ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। জীবনে বিকাশ লাভের কামনায় একটি চিরন্তন ধাবমান মানুষের রূপ আছে। পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের মধুর রস নিয়ে কারবার করা আমাদের সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। নব উপলব্ধির ফলে যাঁরা শক্তিমান তাঁরা প্রশস্ততর দৃষ্টি নিয়ে অনায়াসেই নূতন সাহিত্য রচনা করতে পারবেন। জৈব জীবনের প্রবৃত্তির সঙ্গে তার আত্মিক উপলব্ধির সমন্বয়েই মানুষের সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। এই সংস্কৃতির কথাই সাহিত্য—এই সংস্কৃতি যাতে উন্নততর হয়, সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য বা Great Art; বাংলা দেশের চাষী তো শুধু ভাতের কথাই ভাবে না, কৃষাণীর যৌবনই ধ্যান করে না, সেও তো ভাবে বেহেস্তের কথা—বৈকুণ্ঠের কথা। সেও তো ভাবে—নূতন ক্ষেত করবার কথা—নূতন একটি মরাই বাঁধবার কথা। সেও তো করে গ্রামে মণ্ডল পদবী লাভের আশা। তখন সে কি ভাবে না জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার কথা? আজ দেড়শো বৎসর ধ'রে বাংলা দেশ যে বিবর্ত্তনের ছন্দে চলে এসেছে সে ছন্দে তার জীবনও বিবর্ত্তিত হয়েছে—সে ভাবধারার ছোঁয়াচ তাকেও স্পর্শ করেছে।

সে ভেবেছে জীবনে সে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে, অধিকতর অধিকারের অধিকারী হবে, সে শক্তিমান হবে, মহৎ হবে, সমাজে সে গণনীয় হবে, অন্যায় অবিচারের সে প্রতিকার করবে। ভেবেছে তার উত্তরাধিকারীকে সে মহত্তর করবে, দেশের মধ্যে বরণীয় করবে; সে কামনা করেছে—সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে তার ঘর, কামনা করেছে—তার গ্রাম হয়ে উঠবে সমৃদ্ধতর, গৌরবান্বিত। তারই মধ্যেই তো রয়েছে জাতির কামনার ঐক্যতানের একটি তান। আমরা হয়ে উঠব এক মহত্তর শক্তিমান জাতি, বিশ্বের চক্ষে শ্রদ্ধেয়, মুছে ফেলব ললাট থেকে দাসত্বের পঙ্কতিলক। স্বাধীন জাতির উত্তরপুরুষ আমাদের সন্ততিগণ দেশে দেশান্তরে সমগ্র বিশ্বে বরণীয় হবে। আমাদের দেশের স্মরণীয় ঐতিহ্য-গৌরব প্রচারিত হবে, সমাদৃত হবে।

জীবনের এই চিত্র কি প্রচার কার্য্যের প্রাচীর চিত্র? এই বাণীর ধ্বনি কি প্রচার বক্তৃতা? এই চিত্র এবং এই বাণীর সমন্বয়ে যে সাহিত্য সে কি চিরন্তনত্ব-বর্জ্জিত—প্রচার সাহিত্য?

মহা সঙ্কটময় কালের মধ্য দিয়ে জীবনে মহালগ্ন এগিয়ে আসছে। লঙ্কার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল রামায়ণ, কুরুক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল মহাভারত। আজও এই মহাসঙ্কটের মধ্যে বাঙালীর জীবন নিয়ে মহাকাব্য রচিত হতে পারবে। এ ক্ষণে এ কালে জীবনের প্রকাশ শান্ত মন্থর প্রকাশ নয়। শান্ত মন্থর নয় বলেই চিরন্তনত্ব বর্জ্জিত নয়। আজ তাকে অবলম্বন করে উপযুক্ত সাহিত্য রচনা করতে হবে। যা কিছু জীর্ণ, হোক সে পুরাতন তাকে ত্যাগের চেতনা আনতে হবে সাহিত্যে। নূতনকে গ্রহণ করবার আবেগের মধ্যেও বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখতে হবে। যে নূতন শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক, স্বল্পজনকেন্দ্রিক—সে যতই আত্মসুখকর হোক—তাকে বর্জ্জন করতে হবে। যে নূতন সর্ব্বজনকল্যাণকর—হোক সে ব্যক্তি-জীবনে স্বল্প সুখকর—তাকেই গ্রহণ করবার বোধকে জাগ্রত করতে হবে সাহিত্যে। পৃথিবীর সঙ্গে সমগতিতে চলার ছন্দে যখন বাধা হয়েও চলছে আমাদের জীবন—তখন জীবনে বিপ্লব আসবার লক্ষণ প্রকট হয়েছে। বিপ্লবই আনে নব জীবন। এই জীবনবিপ্লবের বাণীই আজ জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের বাণী। তার মধ্যে জাগ্রত রাখতে হবে আমাদের ভাবাবেগমুক্ত মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বুদ্ধি। তবেই সফল হবে জীবন বিপ্লব, পুরাতন জীর্ণকে পরিত্যাগ করে নবজীবনে আত্মিক প্রয়াণ সম্ভবপর হবে। তারই মধ্যে প্রকাশিত হবে চিরন্তন সত্য—শিব সুন্দর।

নব সৃষ্টির দিন

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

কাহারা আসিবে যেন বাজে গান প্রলয় সমীরে,
রক্ত-শিমূলের ডালে হেরি যেন তা'রি সম্ভাবনা—
কাহারা আসিবে যেন দ্রুতপদে কৌতূহলী চোখে,
ধ্বংসের পাংশুল বেদী ভরি' দিকে মেখল মঞ্জীরে।

সারা দুনিয়ায় বাজে কালের বিষাণ-ভেরী-রব
কবে যুদ্ধ হ'বে শেষ, কোথা' কোনো হেরি না প্রাপনা।
রাজশক্তি-অশ্বমেধ ছুটিয়াছে, কেবা তা'রে রোখে—
কোথা' সেই মৃত্যুঞ্জয় ধুতুরায় পিইছে আসব?

কাহারা আসিছে যেন অবিশ্রাম নদী কলস্বরে,
সবুজ বনানীশীর্ষে নবাঙ্কুর কোরকের সাথে,
কোন্ গূঢ় বেদনায় অবিশ্রাম অশ্রু ধারাপাতে,
আসিতেছে ভাবীদিন সাগরের ফেন শীর্ষভরে।

কা'রা যেন আলে দীপ লঘু পদধ্বনি বুঝি শোনে,
কোমল প্রলঘু পদ, যা'রা গেল আসিছে ফিরিয়া,
সৃষ্টির রহস্যসুখে আনিমীল নয়ন ভরিয়া
কা'রা যেন মৃদু তানে গুঞ্জরিয়া স্বপ্নজাল বোনে।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[তৃতীয় পর্ব]

২

ম্যালেরিয়া।

বাস্তবিক, এ দুর্গ্রহ যে কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন সে কথা। এই চর-ইসমাইল, সমাজ সভ্যতার বাহিরে এই দুর্গম দেশ—এখানে এসব বালাই তো ছিল না কোনোকালেই। বিদ্রোহী মানুষ। পালব মাত্ত, বলিষ্ঠ বর্বরতা—প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর মতো যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু নতুন পৃথিবী আর নতুন মাটি পুরানো হইয়া আসিল—নোনাধরা জমিতে ক্রমে পলিমাটির মিঠা ছোঁয়াচ লাগিয়া শস্যের ঐশ্বর্যে সব পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। বাড়ু বাড়াইতে লাগিল সভ্যতা, আর তাহারি সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে তাহার ব্যাধিগুলিও যেন এখানকার জীবনে বিষ ছড়াইতে লাগিল—ঘুণ ধরাইয়া দিল। নদী মরিয়াছে—নানা কৌশলে সরীসৃপ গতিতে চড়া এড়াইয়া আর বাঁশের সংকেত লক্ষ্য করিয়া ষ্টিমারকে পথ চলিতে হয়। আজকাল প্রায় বারো মাসই সহর হইতে নৌকা আসে—যোগাযোগ সবল এবং নির্বাধ হইয়া আসিয়াছে। আর সেই সব নৌকাগুলিতে বোঝাই দিয়া নির্বিঘ্ন শান্তি আর সর্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া আসিয়া এখানে যেন বসিয়াছে কায়েমি হইয়া।

পর্তুগীজদের বংশধর ডি-সিল্‌ভা ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। জ্বরের উপর জ্বর আসিয়াছে আবার! সরকারী ডাক্তারখানার পাঁচ ছয় শিশি ওষুধ গিলিয়াও কোনো লাভ হয় নাই—দশবারোদিন হইতে টানা জ্বর চলিতেছে সমানে।

ছেলে ডি-ক্রুজা ওরফে ক্রুজা ডাক্তারখানায় গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া ঠক করিয়া শূন্য শিশিটা রাখিল কুলুঙ্গির উপরে। কম্বলের মধ্য হইতে মুখ বাহির করিয়া কাঁপা গলায় ডি-সিল্‌ভা বলিল, ওষুধ আনলিনে?

ক্রুজা বিরক্ত গলায় বলিল, না।

—না? না কেন? জ্বরে ভুগে ভুগে মরে যাব নাকি?

—আমি কী করব?

—আমি কী করব! তার মানে? জ্বরের উপরে ক্রুদ্ধ ডি-সিল্‌ভার মাথার রক্ত চড়িয়া গেল, উঠিবার ক্ষমতা থাকিলে এখনি বেয়াদব ছেলেটাকে ঘা-কতক লাথি মারিত। কিন্তু উপায় যখন নাই, তখন কম্বলের তলা হইতেই যথাসাধ্য গর্জন করিয়া বলিল, ওষুধ আনলিনে কেন বদমাস?

—খালি খালি গাল দিয়োনা। ওষুধ নেই।

—নেই?

—না। সব শিশিধোয়া জল। কম্পাউণ্ডার বললে, যুদ্ধ লেগেছে, আর ওষুধ আসবে না। চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকো এখন। আর যদি শিশিধোয়া জলই খেতে চাও তাহলে কষ্ট করে ডাক্তারখানায় যেতে হবে কেন? আমি তিন বালতি নদীর জল এনে দিচ্ছি, বাড়ীতে যত শিশি বোতল আছে সব তার মধ্যে চুবোও আর খাও।

ছেলেটা দুর্বিনীত আর দুর্মুখ। বছর বোলো সতেরো বয়স হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে না অর্জন করিয়াছে এমন বিদ্যাই নাই। মা-মরা ছেলে, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়াই বড় করিয়া তুলিয়াছে ডি-সিল্‌ভা। ফলে যা হইবার তাহাই হইয়াছে—চূড়ান্ত ভাবে বখিয়া গিয়াছে হতভাগা। বাপ যতদিন এমনি পড়িয়া থাকিবে ততদিনই তাহার সুবিধা—সের খানেক ভালো তামাক আছে বাড়িতে—নিশ্চিন্তভাবে সেইটাই সে টানিয়া টানিয়া শেষ করিয়া দিবে।

অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডি-সিল্‌ভা বলিল, সামনে থেকে দূর হয়ে যা শূয়োরের বাচ্চা।

—নিজেকেই শূয়োর বললে তো?

—হারামজাদা, উল্লুক—গেলি এখান থেকে?

—ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে গালাগালি করলেই কি ওষুধ আসবে নাকি? এদিকে জ্বরে ভুগছে, অথচ গলার জোরে তো কিছু কমতি নেই দেখছি!

শিস্ দিয়া ক্রুজা চলিয়া গেল।

ছেলের উপর রাগ করিয়া লাভ নাই! শরীরটা একটু সারিলে হয়—ধরিয়া কিছু লাগাইয়া দিলেই সায়েস্তা হইয়া যাইবে। দোষ যা কিছু অদৃষ্টের। তিন বছর ধরিয়া কী দুর্দিনই যে আসিয়াছে। সেই বন্যা—সেই ভয়ংকর দুর্যোগ। রাশি রাশি মানুষ মরিল—ডি-সিল্‌ভার দশ দশটা মহিষ বানের জলে ভাসিয়া গেল। তার পর হইতেই এই চলিতেছে! দুই বছরে তবুও মানুষ বদিবা কিছুটা সামলাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আবার যুদ্ধ বাধিল, জিনিসপত্রের দাম চড়িল পাঁচগুণ—সর্বোপরি বিষ-ফোঁড়ার মতো দেখা দিল ম্যালেরিয়া। মানুষ দাঁড়াইবে কোন্‌খানে?

চিৎ হইয়া ডি-সিল্‌ভা উপরের চালটার দিকে চাহিল। টিনের এখানে ওখানে বড় বড় ছিদ্র দেখা দিয়াছে, তাহারি ভিতর দিয়া সূর্যালোক যেন এক একটা সোনার টুকরার মতো ঘরের মেজেয় আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। রোদের আলোকে চালের এখানে ওখানে সিল্কের মতো উজ্জ্বল হইয়া চিক্ চিক্ করিতেছে মাকড়-শার জাল। বর্ষা নামিলেই ওখানকার রন্ধ্রপথগুলি দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িবে। সারাইবার উপায় নাই। করোগেটেড্ টিন পাওয়াই যায় না, যাও বা পাওয়া যায় তাহার দাম এমনি আগুন যে ঘর সারাইতে গেলে ঘর-বাড়ি নীলামে চড়াইতে হয়। সব টিন যুদ্ধ করিতে গিয়াছে। অতএব যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত চালটা সারানোর কথা কল্পনাই করা চলে না—অবশ্য ততদিন বাঁচিয়া থাকিলে তবেই।

আচ্ছা : একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ডি-সিল্‌ভা ভাবিতে লাগিল : টিন দিয়া কী হয় যুদ্ধে ? বন্দুক, কামান না তরোয়াল ? টিনের তরোয়াল দিয়া মানুষের কি গলা কাটিয়া ফেলা যায় ? মাথার উপর দিয়া যে-সব এরোপ্লেন উড়িয়া যায় ওগুলি কিসের তৈরী ? কে জানে ?

পায়ের দিক হইতে বরফের মতোই একটা শীতলতা সমস্ত শরীরের মধ্যে শির্ শির্ করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। হৃৎপিণ্ড দুইটাতে সজোর কাঁপুনি জাগাইয়া সেই ঠাণ্ডাটা গলায় আসিয়া পৌঁছিল। দাঁতে দাঁত বাজিতেছে ঠক্ ঠক্ করিয়া। জ্বরটা একটু কমিয়াছিল—আবার বাড়িল। একটা অসহায় নিশ্বাস ফেলিয়া কম্বলের মধ্যে আত্মগোপন করিল ডি-সিল্‌ভা। সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপাইতে কাঁপাইতে ম্যালেরিয়ার তরঙ্গ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল—ডি-সিল্‌ভা মূর্চ্ছিতের মতো পড়িয়া রহিল।

চোখের সামনে এলোমেলো ছায়ার মতো কী কতগুলা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে সে। কোথায় যেন ভয়ংকর যুদ্ধ চলিতেছে একটা। কিন্তু এটা কেমন যুদ্ধ ? ভারী বিস্ময় লাগিল ডি-সিল্‌ভার। কামান, বন্দুক, এরোপ্লেন কিছু নয়—খালি খালি ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। চোখ মেলিয়া সে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল কতকগুলা করোগেটেড্ টিন। হাত পা কিছু নাই—কিন্তু কী যেন একটা মন্ত্রবলে তাহারা সবাই অদ্ভুত ভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে টিনগুলা জ্বলিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাইতে গেলে চোখে ধাঁধা লাগে। একটা টিন আর একটার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—যেটা পড়িল সেটা আবার লাফ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে—ধূলায় যেন দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দড়াম করিয়া বিকট শব্দে কী একটা ফাটিয়া গেল—বুকের মধ্যে চমক দিয়া উঠিল ডি-সিল্‌ভার। হাওয়ায় ওগুলি পাখা মেলিয়া কী উড়িতেছে ? একটা নয়, দুইটা নয়, একশো, দুশো—হাজার। কুইনাইনের পিল নাকি ? হাঁ—আশ্চর্য ব্যাপার—কুইনাইনের পিলই তো বটে।

বিকারের ঘোরে ডি সিল্‌ভা খেয়াল দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রুজাকে সে যতটা অকৃতজ্ঞ আর পিতৃভক্তিহীন ভাবিয়াছিল আসলে সে তাহা নয়। মুখে যাহাই বলুক, ক্রুজা বাপকে ভালোবাসে। পথে বাহির হইতেই বলরামের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে এবং বাপকে দেখাইবার জন্ত টানিয়া লইয়া আসিয়াছে তাঁহাকে।

বলরাম ডি-সিল্‌ভার বিছানার পাশে আসিয়া বসিলেন। নাড়ী দেখিলেন খানিকক্ষণ। ময়লা গেঞ্জীর উপরে কাঠের একটা ষ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া হৃৎস্পন্দনটা পরীক্ষা করিলেন। কবিরাজী করিলেও কিছু কিছু আধুনিকতা বলরামের আছে। তারপরে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জ্বর ছাড়ে ?

ক্রুজা খানিকটা ভাবিয়া বলিল, বোধ হয় না।

—বোধ হয় না ? বেশ ছেলে যা হোক ! বাপের জ্বর ছাড়ে কিনা, সে খবরটাও নিতে পারোনি ?

লজ্জিত হইয়া ক্রুজা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

—কী খাচ্ছে ?

—মুরগীর ঝোল।

—সর্বনাশ !—বলরাম শিহরিয়া উঠিলেন ; এত জ্বরের ওপর মুরগীর ঝোল খাচ্ছে ! মরে যাবে যে ! কেন, সাবু খাওয়াতে পারো না ?

—কোথায় পাওয়া যাবে ?

কোথায় পাওয়া যাইবে ? সে কথা ঠিক। কিছুই তো পাওয়া যায় না। আরো বিশেষ করিয়া সাবু। এ বস্তুটাও যে সময় বিশেষে সোনার দানা হইয়া উঠিতে পারে, এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল কেউ ? মহাজন আর দোকানদারেরা তো শ্রেফ হাত গুটাইয়া বসিয়াছে। চাউলের দাম বাড়িয়াছে—চিনি পাওয়া যায় না, কেরোসিন মেলে না, ডাল বাজারে নাই। জীবনধারণের সমস্ত জিনিসগুলিই যখন দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেছে, তখন সাবুদানার জন্ম দুশ্চিন্তা করিবার মতো মাথাব্যথা কাহারো নাই।

কিন্তু অত কথা ভাবিতে গেলে তো আর ডাক্তার কবিরাজের চলে না। পৃথিবীর উপরে চটিতে গিয়া বলরাম ক্রুজার উপরেই চটিয়া উঠিলেন।

—জোগাড় করো যেখান থেকে হোক। এতবড় ছেলে হয়েছ, এতটুকু করতে পারোনা বাপের জন্যে। একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্রুজা বলিল, আচ্ছা।

—আর ওষুধ। একটা পাচন দেব—তৈরী করে রাখব দুপুরবেলা। আর মুরগীর ঝোলটোল খাইয়ো না, তা হলে কিন্তু বাপের চোখ উল্টে যাবে। মনে থাকে যেন।

বিবর্ণ মুখে ক্রুজা আবার বলিল, আচ্ছা।

বলরাম উঠিয়া পড়িলেন। মস্তবড় একটা কাজ আছে হাতে—দেরী করিলে চলিবে না। কাল এখানে সস্ত্রীক আসিয়াছেন সহরের সার্কেল অফিসার। ডাক-বাংলোতে বাসা বাঁধিয়াছেন। তাঁহার শরীরটা নাকি একটু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহাকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্ত তিনি লোক পাঠাইয়া বলরামকে খবর দিয়াছেন। মনে মনে গর্বিত বোধ করিয়াছেন বলরাম। তাঁহার কদর বাড়িয়াছে এখন, সাহেব-সুবোরা এখানে আসিলেও তাঁহার ডাক পড়ে আজকাল। আর না পড়িয়াও উপায় নাই। সরকারী ডাক্তারখানা আছে বটে, কিন্তু সেখানকার নতুন গোঁফওঠা ছোক্‌রা ডাক্তারকে লোকে বড় আমল দিতে চায়না—তাঁহার প্রবীণ অভিজ্ঞতাকেই বিশ্বাস করে বেশি।

নদীর ধার দিয়া বলরাম হাঁটিয়া চলিলেন। একটু দূরেই সার্কেল অফিসারের শাদা বোটখানা বাঁধা। শান্ত আকাশে গাং চিল উড়িতেছে—মাছরাঙারা ঝপাং ঝপাং করিয়া ছোঁ মারিতেছে জলে। পর্তুগীজদের বিলুপ্ত গীর্জাটার ওখানে খাড়া বাড়ির চূর্ণ-বিচূর্ণ বুকের মধ্যে নারিকেলের শিকড় নিরবলম্ব হইয়া দুলিতেছে। ইলিশ মাছের নৌকা দূরে দূরে ভাসিতেছে মন্থর গতিতে—বেড়াজালের কালো কালো খুঁটিগুলি জলের বুকে অনেকটা জুড়িয়া কতগুলা মানুষের মাথার মতো বৃত্তাকারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিতেছে।

নদীর তীর ছাড়াইয়া আর একটু আগাতেই লাল ইটের তৈরী সরকারী ডাক-বাংলো। একটা উঁচু টিলার উপরে চমৎকার

সুন্দর বাড়িটা—বহুদূর হইতেই চোখে পড়ে। বছর দুই আগে মাত্র তৈরী হইয়াছে বাড়িটা—এখনো নতুন। দ্বিধা-কম্পিত পায়ে বলরাম আগাইতে লাগিলেন।

বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া সাহেব খবরের কাগজ পড়িতেছেন। কাগজের বিপুল ব্যাসের অন্তরালে মুখটা ঢাকা। খাকী প্যান্টের নীচের দুখানা কালো কালো পা দেখা গেল—যাক, বদমেজাজী গোরাচাঁদ নয় তাহা হইলে। খানিকটা নির্ভর এবং নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন বলরাম।

ডাকিলেন, হুজুর?

সাহেব মুখের উপর হইতে খবরের কাগজ সরাইয়া হাসিলেন। নমস্কার করিয়া কহিলেন, আসুন, আসুন, কবিরাজ মশাই। চিনতে পারলেন?

বলরাম হকচকিয়া গেলেন। উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিলেন, কই, আমি তো—

—কী আশ্চর্য, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে। হাকিম প্রাণ-খোলা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন: আপনার চেহারা তো প্রায় একই রকম আছে, আমি দেখেই চিনেছি। কিন্তু আমি কি এর মধ্যে এতই বদলে গেলাম নাকি। সেই খাসমহল কাছারীর তশীলদার মণিমোহন বাঁড়ুয্যেকে ভুলে গেলেন! আমিই মণিমোহন।

—তাই তো, তাই তো। বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বলরাম চাহিয়াই রহিলেন। ক্রমশঃ

ফুলধনু

(নাটক)

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্‌-এ

তৃতীয় দৃশ্য

এক মফঃস্বল সহরে রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্‌পেক্টার বৃন্দাবনবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি প্রায় একটি হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারী। অক্রম ভ্রাতুষ্পুত্র অক্রয় কাকাবাবুর নিকট হোমিও-প্যাথির শিক্ষানবিশ হিসেবে তাঁর কাছে সদৃশবিধান পুস্তক পাঠ করছে। চেয়ারে উপবিষ্ট বৃন্দাবন চোখ বুজে শুনে যাচ্ছেন; তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা প্রবেশ করলেন।

সুমিত্রা। ঘুমোলে নাকি?

বৃন্দাবন। (চোখ মেলে) না। তুমি আমাকে কেবল ঘুমোতেই দেখ।

সুমিত্রা। বই পড়া শুনতে আরম্ভ করলেই চোখ বোঁজ, তাইতে মনে হয়, বুঝি ঘুমিয়ে পড়লে!

বৃন্দা। ছেলেবেলায় বই দেখলেই চোখ বুঁজ্‌তুম, সেই অভ্যাসটার জের এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

সুমিত্রা। তুমি তো আর কোনও কিছু দেখবে না, যত কিছু ঝামেলা আমার মাথায়—

বৃন্দা। অক্রয়, তুমি পড়ে যাও। কাকীমার কথায় তোমার কান দেবার সময় এখন নয়—

অক্রয় মৃদুগুঞ্জনে পড়ে যেতে লাগল

কি ঝামেলা তোমার মাথায় চাপল?

সুমিত্রা। কত কি! আমার কি মাথার ঠিক রাখবার জো আছে!

বৃন্দা। শরীর কি ক্লান্ত নাকি? মাথা যদি ঝিম্‌ঝিম্ করে তো এক ডোজ নাক্সভমিকা ৩০ খেতে পার।

সুমিত্রা। তিরিশে হবে না, লাখ চাই।

বৃন্দা। অ্যাঁ, লাখ! অক্রয়!

অক্রয়। কি বলছেন?

বৃন্দা। আমাদের নাক্সভমিকা লাখ আছে?

অক্রয়। (বিস্ময়ে প্রায় হাঁ করে) লাখ!

বৃন্দা। হুঁ, লাখ।

অক্রয়। আজ্ঞে, আমাদের তো মাত্র তিনটি শিশি রয়েছে।

বৃন্দা। দেখেছ কাণ্ড! এতদিন ধরে হোমিওপ্যাথি পড়ে —দেখেছ কাণ্ড! আরে হতভাগা, লাখ শিশি নয়, লাখ শক্তি, লক্ষ পাওয়ারের নাক্সভমিকা।

অক্রয়। আজ্ঞে নেই!

বৃন্দা। কে বললে তোমাকে নেই?

অক্রয়। থাকলে তো খুব বড় শিশিতেই থাকত, তা বড় শিশিতে তো সুগার অব মিল্ক আর গ্লোবিউল আছে।

বৃন্দা। হায় হায়! কি করব তোমাকে নিয়ে। বিদ্যেতে তুমি যে পুলিশদেরও হার মানালে! হায় মহাত্মা হ্যানিম্যান, তোমাকে আমি এর জন্যে কি জবাব দেব!

সুমিত্রা। জবাব পরে দিও, এখন শোন। মেয়ের তো পরীক্ষা হল, এবার বাড়ী আসবে।

বৃন্দা। কে, চনু? তা আসবে বইকি!

সুমিত্রা। এলেই তো হল না। এবার তো তার সম্বন্ধ দেখা দরকার; না তার জন্যেও আমাকেই বেরোতে হবে?

বৃন্দা। তুমি বেরোলেই তো ভাল হয়।

সুমিত্রা। আর তুমি তোমার ওই হোমিওপ্যাথি নিয়ে থাক! কি যে জিনিস পেয়েছ!

বৃন্দা। রিটায়ার্ড লাইফ, বুঝেছ না, একটু চুপচাপ থাকতে দাও। এই সেদিন পর্যন্ত তো হৈ হৈ করে ছুটে বেড়িয়েছি। বসবার দাঁড়াবার সময়টুকুও মিলত না বলে দুঃখ করতে, মনে নেই? হায়রে, পুলিশের কাজ!

সুমিত্রা। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, তোমার মেয়ের বর জোগাড় করব কোথা থেকে ?

বৃন্দা। তা ঠিক। তাহলে তো খোঁজ নিতে হয় দেখছি, অক্ষয় !

অক্ষয়। কি বলছেন ?

বৃন্দা। তুমি পড়ে যাও। এ সব কথায় তোমার কান দেবার দরকার নেই। দেখ, উদরাময়ের পরিচ্ছেদটাই সব চেয়ে বেশী দরকারী, ওটা ভাল করে পড়। একশটা যদি কেস পাও তো দেখবে তার ভেতর নব্বইটি পেটের অসুখের—

সুমিত্রা। তোমার সেই বন্ধুর কথা মনে আছে ?

বৃন্দা। কার কথা বলতো ?

সুমিত্রা। যার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে বলেছিলে।

বৃন্দা। কে বল দেখি ? ঠিক মনে পড়ছে না ত' !

সুমিত্রা। খুব বন্ধু যাহোক। গোলোকবাবুর কথা মনে নেই ?

বৃন্দা। ও হো হো, গোলোক ! গোলোকের কথা আবার মনে নেই ? আমাদের গোলোক বৃন্দাবন—গোলোকের কথা আবার মনে থাকবে না ! তবে অনেকদিন হয়ে গেল তাই একটু—

সুমিত্রা। তাঁকে একটা চিঠি লেখ। ছেলেটি কি পাশটাশ করেছে, খবর নাও—

বৃন্দা। হাঁ, তা ত' নিতে হয়।

সুমিত্রা। নিতে হয় নয়, আজই চিঠি লেখ। খাম আছে, না আনাতে হবে ?

বৃন্দা। পোষ্টকার্ডেই না হয় দিই না ?

সুমিত্রা। না না, পোষ্টকার্ডে নয়, কার চোখে পড়বে তার ঠিক নেই !

বৃন্দা। অক্ষয় !

অক্ষয়। কি বলছেন ?

বৃন্দা। তুমি পড়ে যাও। এ সব কথা তোমার শোনবার দরকার নেই। যা বললুম, উদরাময়ের পরিচ্ছেদটা ভাল করে পড়। একশটা যদি কেস পাও তো দেখবে, নব্বইটা পেটের অসুখের। তার উপর আবার এই প্রফেসনের এমন হাঙ্গামা যে দেখবে—দু পাঁচজন বলবে, এ তো শুধু জল, এতে কি কাজ দেবে ; দু পাঁচজন বলবে, ছটা বড়িতে কি হবে, আরও গণ্ডা কতক দিন ; দু পাঁচজন বলবে—

সুমিত্রা। (বাধা দিয়ে) আচ্ছা সে বলবে পরে এখন, শোন, একখানা খাম আনাতে দাও।

বৃন্দা। হাঁ দিই। অক্ষয়, যাও বাবা চট্ করে একখানা খাম কিনে নিয়ে এস।

পয়সা দিলেন

দেরী কোরোনা যেন।

অক্ষয়। না।

প্রস্থান

সুমিত্রা। তাহলে আমি এখন যাই, অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। তুমি চিঠিখানা লিখে এখনই পাঠিয়ে দাও।

বৃন্দা। দেখ, চনু তাহলে কবে আসছে ?

সুমিত্রা। শুধু আসবে বলে লিখেছে ; কবে আসবে, লিখেনি।

বৃন্দা। দেখ, চনুর সেই যে মাঝে মাঝে মাথা ধরা, সেটা কি এখন একেবারে সেরেছে ?

সুমিত্রা। কি করে জানবো ? চিঠিতে ত' সে সব কিছু লেখে না।

বৃন্দা। এবার বাড়ীতে এলে আমিই একবার চিকিৎসা করব ভাবছি, কি বল ?

সুমিত্রা। তা ভাল।

বৃন্দা। হাঁ, সেইজন্যে আমি বিশেষ ভাবছি। একেবারে নাক্সভমিকা সিক্স থেকে আরম্ভ করব।

সুমিত্রা। তা না হয় করবে, কিন্তু তার চেয়ে একটা বেশী গুরুতর ব্যাপার বাকী রয়েছে যে—

বৃন্দা। (ব্যস্তভাবে) কি হয়েছে ? চনুর আবার কিছু হয়েছে নাকি ?

সুমিত্রা। হাঁ।

বৃন্দা। কি হল ? কই তুমি তো আমাকে এতদিন কিছু বলনি।

সুমিত্রা। বলব কোথা থেকে ! কেবল নাক্সভমিকা আর নাক্সভমিকা, অন্য কিছু ভাববার তোমার সময় কোথা !

বৃন্দা। বারে, মেয়ের অসুখ ! আর আমার ভাববার সময় নেই ! এ কি হতে পারে ? বল কি হয়েছে, হার্টট্রাবল ?

সুমিত্রা। না।

বৃন্দা। তবে কি ?

সুমিত্রা। বললুম তো একটা গুরুতর ব্যাপার !

বৃন্দা। তবে তো বড় ভাবনার বিষয় ! কিন্তু সেটা কি ?

সুমিত্রা। সেটা তার বিয়ে।

বলেই হেসে ফেললে

বৃন্দা। (খানিকক্ষণ সুমিত্রার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে) কি মুস্কিল ! এমনি ভাবিয়ে তুলেছিলে ! এখনও ছেলেমানুষি তোমার যায়নি দেখছি—

সুমিত্রা। কেন আমি কি বুড়ী হয়ে গেছি নাকি ? আগে নাতিটাতি হোক, তবে তো বুড়ী হব।

বৃন্দা। একটিমাত্র মেয়ে, এরই মধ্যে তাকে পরের বাড়ী পাঠাবে ?

সুমিত্রা। পরের বাড়ী কেন, নিজের বাড়ী। তোমার বাড়ী বুঝি আমার কাছে পরের বাড়ী ?

বৃন্দা। চমৎকার বলেছ ! সার্টিফিকেট অব মেরিট।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের অনুরূপ। প্রায় সন্ধ্যা। মায়া ও রচনা বসে আছে।

মায়া। তাই তো ভাই, এখনও আসছেন না।

রচনা। কেন এত দেরী হচ্ছে ! কাল তো বললেন, আসবেন।

মায়া। শেষকালে কি ফিরে যেতে হবে ? ফুলের মালা কার গলায় দেব তাহলে ?

রচনা। নিজের গলাতেই দেবে—

মায়া। আমার ভাই বড় ভয় হচ্ছে!

রচনা। কেন?

মায়া। মালা দিতে গিয়ে না হাত কেঁপে মালা পড়ে যায়!

রচনা। কচি খুকি আর কি!

মায়া। তার চেয়ে ভাই, তুমি আমার হয়ে তাঁকে মালাটা পরিয়ে দাও না, বেশ হবে।

রচনা। আহাহা, মরি মরি, কি কথা!

রবিকে সেইদিকে আসতে দেখা গেল

মায়া। ঐ যে আসছেন—

রচনা। আর ভয় নেই তাহলে—

রবির প্রবেশ

রবি। এসেছেন? আমার একটু দেরী হয়ে গেল—

মায়া। আমরা ভাবছিলুম, আসবেন কিনা?

রবি। বলেছি যখন, না এসে কি পারি?

মায়া। তবু ভাল! কিন্তু এবার দেখাসাক্ষাৎ শেষ হতে চল্‌ল যে!

রবি। কেন?

মায়া। রচনাদির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, বাড়ী যাবেন এবার। আর এখানে থাকার দরকার কি বলুন?

রবি। তা বটে।

মায়া। আজ আপনাকে একটা কথা বলা দরকার।

রবি। কি?

মায়া। ভয় হয় পাছে 'না' বলে বসেন।

রবি। না বলব কেন, বলুন না কি বলবেন?

মায়া। একটা মালা এনেছি আপনার জন্যে, কিন্তু সেটা আমি নিজে দিতে পারছি না। আপনি যে সম্পর্কে আমার ভাই হন, সেটা বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ পরস্পরের পরিচয় নেই, তাছাড়া রচনাদিও সেটা এখন শুনেছেন। দিদিকে এতদিন ভয় দেখাচ্ছিলুম. আপনার গলায় আমিই মালা দেব বলে। প্রথম দিনে আপনাকে দেখা থেকে দিদির অনুরাগ আমি লক্ষ্য করেছি এবং দিদির প্রতি আপনার মনোযোগও আমার চোখ এড়ায়নি। বোনের কর্ত্তব্য হিসেবে (রচনার হতভম্বভাব কাটবার আগেই তার বাঁ হাতের আঙ্গুল থেকে আংটী খুলে নিলে) দিদির একান্ত অনুরাগের এই নিদর্শনটি দিচ্ছি নিন্—

রবির হাতে দিলে

রচনা। কি করছ!

মায়া। করছি ঠিক, চুপ কর। আর দিন আপনার প্রেমের অভিজ্ঞান, দিন তাড়াতাড়ি। রচনাদির হাতে পরিয়ে দিন।

মায়া রচনার হাত ধরে রইল, রবি পরিয়ে দিলে

আজ সার্থক আমার ধারণা, সার্থক দেব ফুলধনু, সার্থক আমার নাম মায়া। রবিবাবু, হৃদয়দেবতাকে সাক্ষী করে যাকে আজ আপনি প্রিয়তমা বলে গ্রহণ করলেন, সমস্ত লোকের সামনে তাঁকে আপনার সহধর্মিণী বলে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আপনার। রচনাদি, কেমন লাগছে একটু বল। মনের মত হয়েছেন তো?

রবি। মনের মত হইনি বলে আপনার সন্দেহ আছে নাকি?

মায়া। দিদি যে কিছু বলছে না।

রবি। তাহলে তো বড় ভাবনার কথা।

মায়া। নিন, এই মালাটা নিন, নিজেই নিজের গলায় পরুন, দিদি তো এখন আপনাকে পরাতে চাইবে বলে মনে হয় না, যে লাজুক!

রবির হাতে মালা দিলে

রবি। পরা আর কেন, পকেটে রাখি না?

মায়া। বা রে! দিদি পরিয়ে দিলে না বলে অভিমান হচ্ছে বুঝি! আচ্ছা আচ্ছা, দেবে দিনকতক পরে; এখন নিজে পরে নয়নলোভন হয়ে দিদির সামনে দাঁড়ান। নিন, পরুন।

রবি মালা পরলে

মায়া। কি সুন্দর দেখিয়েছে! রচনাদি; দেখ একবার!

রচনা লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল

(ক্রমশঃ)

অন্ত-সুখ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

একদা এ ধরা যবে ভরা ছিল কবিতায়,
তার সব দেহখানি মাখা ছিল ছন্দে;
কাব্যের গেহ বাঁধা ছিল চাঁদ সবিতায়
সব দেহ ভরা ছিল রসে গীতে গন্ধে।

দিন রাত্রি বৎসর প্রহর ও পলটি,
ছিল যেন ছোট খাটো অমৃতের বিন্দু,
আকাশের মত ছিল মানুষের মনটি,
জীবনটা ছিল যেন কল্লোলিত সিন্ধু।

ধরণীটি ছিল বাঁধা স্বর্গে ও মাটিতে,
দেবতারা মানবীর প্রেমে হত বন্দী,
সোনারূপা খচিত গো সংসারে হাটিতে
মানুষেরা ছিল শিব আর সব নন্দী।

নরনারী মনচুরি ছিল খোলা খুলিতে,
নারী ছিল সুন্দরী নর ছিল সত্য;
নিখিলের প্রাণী ছিল বাঁধা কোলাকুলিতে,
কবিতার মাঝে সব ডুবে যেতো তথ্য।

কাব্য যে নেই আজ অসি তাই ঝনঝন,
ধ্বংসের কালী ওই নাচে রোষচক্ষে;
নর আজি শব তাই মাছি করে ভনভন,
প্রেতলীলা আজ তাই কবিদের বক্ষে।

কেন এল হেন এই দুর্দ্দিন ঝঞ্ঝায়,
পেটেরি ক্ষুধায় কিগো খেয়ে গেল ছন্দ?
নহে নহে, সত্যের তিরোধানে শুধু হায়
ঝরে গেছে সব সুখ রসগীত গন্ধ।

আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন চার দিন ওখানে বেশ আনন্দেই কেটেছিল। আমরা আবার 'নুতনের' সন্ধানে যাবার চেষ্টা দেখছি, এমন সময় একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা কাজ থেকে ক্যাম্পে ফিরে, সকলে একসঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা বলছি,হঠাৎ কিছু দূরে দেখ্তে পেলাম প্রায় জন পনর ঐ দেশীয় লোককে। সকলেরই আগাগোড়া খাঁকির পোষাক পরা, মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবী,পরণে চিলা পায়জামা,হাতেরাইফেল,কোমরে পিস্তল ও তরোয়াল, গলায় বাঁশী ও বাইনাকুলার, রীতিমত সৈনিকের সাজেই সজ্জিত। বেলুচিস্থানের দিক থেকে তারা যাচ্ছে নারগঞ্জের দিকে। তারা নদীর পথ ধরেই যাচ্ছিল। আমরা সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। তারা যে ঠিক্ কি হওয়া সম্ভব, অনুমান কর্ত্তে পারলাম না। দেখলাম, তারা নদীর ধারে আমাদের লোকজনের কাছে বসে বিশ্রাম করছে, আর জল খাবার জন্ত একটু চিনি চাইছে। তারা তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বল্লে যে তারা দাদুতে বিশেষ প্রয়োজনে যাচ্ছে। মজুমদার মহাশয় আরও কয়েকবার এ অঞ্চলে এসেছিলেন সেজন্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরা কারা। তিনিও বিশেষ বুঝতে না পেরে বল্লেন যে "এদেশের বড় বড় জমিদারদের এই ধরণের লোক থাকে"। তখন এর বেশী আর কিছুই বুঝবার সুবিধা হলো না—পরে শুনলাম, যে তারা ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে কাঠিয়া নামক গ্রামে এক ধনী জমিদার শেঠ ধনরাজমলের বাড়ীতে ডাকাতি কর্ত্তে গিয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু পরেই তারা সেখানে পৌঁছায় এবং গৃহস্বামীর কাছে সে রাত্রে সেখানে থাকার অনুমতি চায়। গৃহস্বামী হিন্দু, সেজন্ত তাদের বলে যে তোমরা বাড়ীর বাহিরে এক যায়গায় থাক। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক তার তরোয়াল দিয়ে ধনরাজমলকে খোঁচাতে আরম্ভ করে দিল। বলতে লাগলো—শীঘ্র কোথায় টাকাকড়ি আছে দাও। বুড়ো মানুষ ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেও দমে নি, ব'লে "আমায় মেরে ফেল্লে টাকা তোমাদের দেবে কে? তোমাদের সাধ্য নেই যে খুঁজে বার কর"। এই কথা শুনে তারা বুড়োকে ছেড়ে দেয়। বুড়ো অমনি বাড়ীর পিছনে অন্ধকারে এমন গা ঢাকা দেয় যে আর তারা বুড়োকে খুঁজে পাই নি। এদিকে এই সব গোলমাল শুনে বাড়ীর মেয়েরা আগেই ঐভাবে সরে পড়েছিল। তারপর যখন আর তাদের কোনও রকমে ধরা গেল না তখন ডাকাতেরা বুড়োর এক অতিথি শ্রীতিমলকে ও এক মুসলমান চাকরকে হত্যা করে চলে যায়। যাবার সময়, একটী ঘোড়া ছিল সেটাই কেবল নিতে পেরেছিল।

হতাশ হয়ে, তারা ওখান থেকে সারা রাত্রি হেঁটে প্রায় শেষ রাত্রে আমাদের তাঁবুর কাছেই একটা পাহাড়ের ওপর এসে আশ্রয় নেয়। আমরা তার কিছুই জানতে পারি নি। সেদিন ১১ই নভেম্বর। খুব সকালেই আমাদের ঐ ক্যাম্প ছেড়ে অন্যত্র যাবার কথা। চাকরবাকরেরা, চাপরাশীরা সকলেই খুব সকালে উঠেছে। কেউ মুখ হাত ধোবার জন্ত গরম জল করছে, কেউ বা খাবার জন্ত লুচি ইত্যাদি তৈয়ারি করছে, কেউ বা আমাদের চা খাইয়ে, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে। আমাদের জিনিষপত্র সব গুছান হয়ে গেছে। বিছানাপত্র বাঁধা হয়ে গেছে। ঘরের মাঝখানে একটী টেবিলে আমরা তিন জনে জামা কাপড় পরে বসে চা খাচ্ছি। মজুমদার ম'শায়ের চা খাওয়া আগেই হয়ে গেছে, আমাদের তাঁবুর বাহিরে ঠিক দরজার কাছে তিনি পায়চারি করছেন, আর আমাদের তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্ত তাগাদা দিচ্ছেন, কারণ রৌদ্রে বালির মধ্যে শীতের দিনেও চলা বেশ কষ্টকর হয়।

হঠাৎ দেখলাম, তিনি কথা বলতে বলতেই মাটিতে যেন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন। তার আগেও বহুদূর থেকে যেন অস্পষ্ট একটা বন্দুকের আওয়াজ মনে হয়েছিল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি। চাপরাশীরা তাদের তাঁবুর বাইরেই ছিল। তারা প্রথম আওয়াজটা হতেই দেখতে পেলে যে মজুমদার মহাশয়ের হাতে গুলি লাগলো। কিন্তু ভয়ে কেউ কোনও কথা বল্তে পারেনি, তাছাড়া তারা তখন ভাবছিল কোনও শিকারী হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মেরে থাকবে। প্রথম গুলীটা তাঁর হাতে লাগার পর তিনি "আরে ক্যা হোতা হ্যায়?" বোলে যেই তাদের দিকে ফিরেছেন অমনি একসঙ্গে আরও দুটা গুলী তাঁর পেটে ও বুকে লাগে, তখনই তিনি পড়ে যান। তখনও আমরা, তিনি কেন যে পড়ে গেলেন সঠিক অনুমান করতে পারিনি এবং আমিই তাঁর সাহায্যের জন্ত তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে এলাম। যেই বাইরে আসা, সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধার থেকে একজন লোক আমাকেও লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। গুলিটী আমার বুকেই লক্ষ্য করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা আমার বাম হাতের কনুইয়ের কিছু উপরে লেগে বুকের উপরকার খানিকটা মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেল। বুকের ভেতর যেতে পারে নি, সেজন্ত জীবন রক্ষা হয়েছিল। হাতে প্রায় দু ইঞ্চি একটা ছেঁদা হয়ে সমস্ত হাড় ও শিরাগুলি নষ্ট হয়ে গেল এবং হাতটী সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়লো। আমি আর মজুমদার ম'শায়ের কাছ পর্য্যন্ত যেতে পারি নি, তখনই নিজের তাঁবুর ভেতর পালিয়ে এলাম। মজুমদার ম'শায়ের মত যদি পড়ে যেতাম তো নিশ্চয়ই তারা আমাকেও শেষ করে দিত। যাই হোক ঘরে ঢুকেই মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বেশীক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম না, মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হচ্ছিল এবং ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম। প্রথম যখন জ্ঞান হলো দেখলাম আমার মাথাটা মিঃ কৃষ্ণদেবের কোলে রয়েছে, তিনি মাথায় জল দিচ্ছেন। একটা সরকারি ঔষধের বাক্স Campএ ছিল, আমাকে কিছু Brandy খাইয়ে দেওয়া হলো। প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় ভীষণ পিপাসা বোধ করতে লাগলাম, কিন্তু ভয়ে জল আনার কারও সাহস হচ্ছিল না। শুনলাম মজুমদার মশাই দু' একটি মাত্র কথা বল্তে পেরেছিলেন এবং জল চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে কাউকেই যেতে দেওয়া হয় নি। শুয়ে শুয়ে, দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁবুর উপর অজস্র গুলি বর্ষণ হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছিল না বলে কাহারও গায়ে লাগেনি। সেনগুপ্ত আমার বিছানা থেকে একটী কম্বল বার করে, দুই হাত দিয়ে, সেটা তাঁর মাথার উপর উঁচু করে ধরেছিলেন। তাতেও রক্ষা হলো না, লাগলো এসে তাঁর ডান হাতের তর্জ্জনীতে। মিঃ কৃষ্ণদেবেরও উরুতে এক যায়গায় সামান্ত আঁচড় লেগেছিল আর তাঁবুর বাইরে একজন চৌকিদারের পায়ে সামান্ত চোট লেগেছিল। আমাদের কারুর জীবিত থাকবার যখন আশা দেখা যাচ্ছিল না, তখন এক ব্যাপার হলো। আমাদের চাপরাশীদের মধ্যে একজন অনেকবার ঐসব অঞ্চলে আসা-যাওয়া করায় ঐ দেশীয় কথা বলতে পারত। সে মুসলমান। তখন রমজানের সময় ছিল। কুলীদের মধ্যে একজনের একটা কোরাণ ছিল, সেই কোরাণ দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে তাদের বল্লে "খাঁ সায়েব, আমরা সকলেই মুসলমান, রমজানের দিন সকলে উপোস করে রয়েছে—আমাদের ওপর আর গুলী চালিও না. তোমাদের যা দরকার এসে নিয়ে যাও"। তখন তারা বল্লে "বেশ, মুসলমান হও তো মারবো না, কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে যাওয়ার আগে তোমরা তাঁবু খুলে ফেল, আমরা দেখতে চাই ভেতরে কি আছে"। তাই করা হচ্ছে দেখে আমি ভয়ে বাধ্য হ'য়ে আমার পৈতাটা ছিঁড়ে বালির মধ্যে পুঁতে ফেলাম। রামচন্দ্র নামে

আমাদের একজন পাচক, তার মাথায় খুব মোটা টিকি ছিল সেও আমার দেখা দেখি, পাকিয়ে পাকিয়ে টিকিটা ছিঁড়ে ফেললে। এই সুযোগে আমাদের দেখর তার পাখা নিয়ে এবং রহমত খাঁ নামে একজন তাঁবুর খালাসী প্রাণ নিয়ে সরে পড়েছে। ডাকাতদের মধ্যে যে আমায় মেরেছিল, তার বয়েস ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কম। প্রথমেই সে, তাঁবু খোলার সঙ্গে সঙ্গেই, উপরে আমার কাছে এসে একটা বিকট হাসি হাসলে। যা কল্পনা করতে আজও ভয়ে সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। সে এসে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও ৬জন পাহাড় থেকে নেমে এল। আমরা মুসলমান কিনা জানবার জন্ত নাম জিজ্ঞাসা করলে, তারপর আমায় এসে বললে "কল্‌মা পড়"। সেটা পূর্ব্বে অনেকবার শুনেছি বটে, তবে কল্‌মা যে তাকেই বলে তা জানতাম না। ভাব্‌ছি কি বলবো, বিশেষ অসুস্থতার ভান করে কেবল ঠোঁট নাড়াতে লাগলাম, যাতে তারা বুঝতে পারে যে আমি কথা বলতে অক্ষম। সেই মুসলমান চাপরাশীটী যে ওদের সঙ্গে কথা বলেছিল তার নাম সদরদিন, সে তখন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কল্‌মা পড়তে লাগলো—"লা ইলাহা ইল্লা, মহম্মদ রসুলউল্লাহ্"। তাদের সর্দ্দার একজন বুড়ো মত লোক। দূরবীন্ লাগিয়ে সে পাহাড়ের উপর থেকে চারদিকে নজর রাখছিল। তারা প্রথমেই চাইলে—বন্দুক, তারপর টাকাকড়ি, তারপর দূরবীন। আমরা চাবি ফেলে দিলাম, চলে যাব বলে জিনিষপত্র তো আগে থেকেই ভাল ভাবে বাঁধা ছিল। আমাদের পাঁচটা উট এনে তাদের পিঠে সমস্ত জিনিষপত্র চাপিয়ে, তাঁবুর দড়ি দিয়ে বেশ ভাল করে বেঁধে ফেল্লে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের এই কাজ শেষ হয়ে গেল। হয়তো আমরা সত্যই মুসলমান কিনা আরও ভালভাবে তারা পরীক্ষা করে দেখ্‌তো কিন্তু পুলিশ গত কয়েকদিন থেকেই তাদের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। দূরবীন দিয়ে তারা পুলিশকে দেখতে পেয়েই আর কালবিলম্ব না করে, বেলুচিস্থানের দিকে পালালো।

আমরা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত ঐখানে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকার পর নায়গজ ডাকবাংলায় যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। সদরদিন ইতি-পূর্ব্বেই নায়গজ ডাকবাংলায় এসে জোহীর পোষ্টমাষ্টারকে ফোন করে অনুরোধ করেছিল যে যাতে শীঘ্র ডাক্তার ও মোটর পাঠান হয় এবং দিল্লীতে আমাদের ডিরেক্টর জেনারেলকে তার করা হয়।

আমাকে একটা উটের পাশে একটা Camp cot সমেত দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। মজুমদার মশাইয়ের মৃতদেহটাকেও আর একটাতে বাঁধা হলো। বাকি সবাই হেঁটেই নায়গজ ডাকবাংলায় প্রায় ১টার সময় এসে পৌঁছুলাম। খানিকবাদে ডাক্তার ও গাড়ী এলো। আমার হাতটাতে একটা বাঁধন দিয়ে একটা ইন্জেক্‌সন দিয়ে গাড়ীতে তোলা হলো। মজুমদার ম'শায়ের মৃতদেহও সঙ্গে নেওয়া হলো। রাত্রি ৮টার সময় দাদু হাসপাতালে এসে পৌঁছুলাম। দাদু হাসপাতালে, মৃতদেহ রাখার একটা ছোট ঘরে (Morg) তাঁর দেহটী রাখা হলো এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের তার করে খবর দেওয়া হলো। সকালেই উত্তর পাওয়া গেল যে তাঁরা কেউ আসতে পারবেন না। তাঁর মৃতদেহটী যেন হিন্দুমতে যথোচিতভাবে ভস্মীভূত করা হয়, তাঁর মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্ত ব্যাণ্ড ইত্যাদি বাজিয়ে, ফুলের মালায় সাজিয়ে, দাদুতেই একজন সৎব্রাহ্মণ দ্বারায় তার শেষ কাজ করান হলো। আমি তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে, এটা একটা ছোট্ট হাসপাতাল, মাত্র ৫।৬টা বেড আছে। নার্স বা কোনও কিছুরই ব্যবস্থা নেই। এমন কি সহরে ইলেক্‌ট্রিক থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে তার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানকার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছেলেদের মধ্যে জন-কয়েককে এনে, আমার সারারাত্রি দেখাশুনা করার ভার দিয়ে গেলেন। কংগ্রেসের লোকেরা যথেষ্ট সেবা করেছিল। তাদের সে সেবা যত্নের কথা জীবনে ভুলবার নয়।

সেই রাত্রেই টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল দিল্লীতে ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে, কলিকাতায় আমার মার কাছে, সেনগুপ্তের বাড়ীতে এবং আমার শ্বশুরমহাশয় তখন ব্যাণ্ডেল রেল হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন, তাঁর কাছে। খবরটা সেই রাত্রেই সকলে পেয়ে গেলেন।

দারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সেই রাতটা কেটে গেল। শুধু সেই রাতটাই নয় তার পরেও আরও ৮ দিন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কেটেছে—কিন্তু যখন আমার হাতে গুলী লাগে তখন মোটেই যন্ত্রণা অনুভব করতে পারি নি। প্রথমেই হাতটা অসাড় হয়ে গেল এবং কেমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হয়েছিল। মনে হচ্ছিল—বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কতই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হচ্ছিল, আবার মধ্যে মধ্যে যেন ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। পরদিন সকালে ওখানকার একজন প্রাইভেট নার্স, মুসলমান স্ত্রীলোক, মিসেস্ হামিদ আমায় দেখতে এলেন এবং বল্লেন যে এখানে কোনও নার্সের ব্যবস্থা নেই, আমি যদি কিছু না মনে করি তো তিনিই স্পঞ্জ করে মুখ ধুইয়ে দিয়ে যাবেন। তাই হলো, তিনি ও তাঁর স্বামী মিঃ হামিদ রোজই আসতেন, আর শুধু যে স্পঞ্জ করে বা মুখ ধুইয়ে দিয়ে যেতেন তাই নয়, বাড়ী থেকে Ovaltine করে, ফল ইত্যাদি কিনেও দিয়ে যেতেন।

সারা দাদু জেলার ভেতর একজন মাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ভক্তিব্রত রায়। তিনি ওখানকার পাওয়ার হাউসের ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমায় দেখতে আসতেন। সেনগুপ্তও একটা বেড্ পেয়েছিলেন। তাঁর আঙুলের চিকিৎসা হতে লাগলো। ওখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের কেরাণীকে বলে তাঁর বাসায় মিঃ কৃষ্ণদেব রইলেন। পরের দিন শুনলাম লাহোর অফিসের সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ শ্রীবাস্তব এসেছেন। তিনি সব অনুসন্ধান করে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। দেখতে দেখতে ওখানে ৩।৪ দিন কেটে গেল। শ্বশুরমশাই তাঁর সেজছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই রওনা হয়েছিলেন এবং বরাবরই সমস্ত দ্রুতগামী ট্রেন ধরেও ১৩ইএর পূর্ব্বে এসে পৌঁছিতে পারলেন না। কলিকাতা থেকে দাদুর দূরত্ব ২ হাজার মাইলেরও কিছু অধিক। পূর্ব্বেই তিনি আসছেন বলে যে তার করেছিলেন তাতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

যাই হোক, তিনি এসে আমাদের সকলকেই দিল্লী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। সিন্ধুর কমিশনার নানারকম ওজুহাত দিয়ে কিছুতেই আমাদের ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু শ্বশুরমশায়ের একান্ত চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত না ছেড়ে দিয়ে উপায় হলো না। জীবনের দায়িত্বের জন্ত নানারকম বণ্ড ইত্যাদি সই করিয়ে নিলেন। ভক্তিব্রত বাবু তাঁদের নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন এবং খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরের দিন বেলা ১০টা নাগাদ আমাকে একটা ষ্ট্রেচারে শুইয়ে ওখানকার স্কুলের ও কংগ্রেসের ছেলেরা ধরাধরি করে আমায় দাদু ষ্টেশনে নিয়ে এলো। একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে তাতে অতি কষ্টে আমার ষ্ট্রেচারখানি ঢোকান হলো। তারপর সেনগুপ্তের ষ্ট্রেচারখানিও আরও কষ্টে ঢোকান হলো। এই ট্রেনখানি বরাবর লাহোর যায় না, সেজন্ত পথে 'রক্' ও 'রোরীতে' আরও দুইবার গাড়ী বদল করতে হয়েছিল। এ রকম অবস্থায় বার বার গাড়ী বদলান যে কি কষ্টকর তা বলে বুঝান যায় না।

পূর্ব্বেই বড় বড় জংসনের রেল হাসপাতালে তার করা হয়েছিল, সেজন্ত ডাক্তার ও ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল আমরা ১৭ই সকালে লাহোরে এসে পৌঁছুলাম। ষ্টেশনে আমাদের জন্ত Ambulance অপেক্ষা করছিল। আমাদের ড্রেস্ করবার জন্তে ওখানকার মেডিক্যাল হাসপাতালে সেখানকার অনেক বড় বড় ডাক্তারেরা আমায় দেখে গেলেন ও হাতটাকে বাঁচান যায় কিনা সে বিষয় মতামত দিলেন

গেলেন। সারাদিন ওখানে বিশ্রাম করার পর, রাত্রি নটায় আবার আমরা দিল্লী যাত্রা করলাম। আমাদের লাহোর অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও বাবুরা ষ্টেশনে আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন। এ রাতটা খুবই শঙ্কাজনক অবস্থায় কেটেছে। বহুবার ইন্জেক্সন্ দেওয়া হয়েছিল।

১৮ই সকাল বেলায় এসে দিল্লী পৌঁছুলাম। ষ্টেশনে আমাদের জন্য Ambulanceএর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ডিরেক্টর জেনারেল রাও বাহাদুর কে, এন, দীক্ষিত এবং অফিসের অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক, আমার এক আত্মীয়, যাঁর বাসায় যাবার সথ উঠেছিলাম, সকলেই আমাদের জন্য ষ্টেশনে এসেছিলেন। আমাদের তখনই দিল্লী আরউইন্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। খুব বড় হাসপাতাল, ব্যবস্থাও এর বেশ ভাল। তাছাড়া শুনলাম, এখানকার Surgical Deptএর বড় ডাক্তার এস্, কে, সেন আমার চিকিৎসা করবেন, এ সংবাদে অনেকটা ভরসা পেয়েছিলাম।

হাসপাতালে পৌঁছিতেই আগে :আমাদের ভাল কোরে স্পঞ্জ কোরে, একটী ভাল বেড্ দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমায় Operation theatreএ নিয়ে যাওয়া হলো।

চারদিকে তাকিয়ে, তাকিয়ে, দেখতে লাগলাম, বুকের উপরেই একটা প্রকাণ্ড বাতি, (রাত্রে ব্যবহারের জন্য) আর চারদিকে বহুপ্রকার যন্ত্রপাতি। দেখে একটু ভয় হচ্ছিল, কিন্তু এত ক্লান্ত যে সেদিকে নজর দেবার মত অবস্থা আমার ছিল না। হাতটা যে একেবারে কেটে বাদ দিতে হবে সে কথা আমায় বলা হয়নি। শ্বশুর মশাইও 'এপ্রন্' পরে, আমার কাছে সাহায্যের জন্য ছিলেন, আমার অবস্থা অত খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাতে অনেকটা ভরসা পেয়েছিলাম। Clloroform করা হলো, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল কিছুই জানতে পারিনি। শুনলাম Clloroform করার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীর অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে, ডাক্তারেরা Operationএর কাজ ভালভাবে শেষ করতে পারেন নি। যখন জ্ঞান হলো তখন সন্ধ্যা প্রায় ৫টা। চোখ খুলে শ্বশুর মশাইকে সামনে দেখলাম, আমায় যেন কি বলছেন, মনে হচ্ছিল যেন বহু দূরে রয়েছেন সেজন্ত ভালভাবে দেখতেও পাচ্ছি না বা কি বলছেন শুনতেও পাচ্ছি না। তার পর আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল সাহেবকেও দেখলাম। তাঁরা সারাদিনই হাসপাতালে আমার জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ছিলেন। খাওয়া দাওয়া করতেও যান নি। সন্ধ্যার পর সকলে বাসায় গেলেন। এদিকে নর্ম্মদা ভৱ বলে আমার এক বন্ধু, আমার এই ব্যাপার কাগজে পড়ে, সেইদিন সন্ধ্যায় দিল্লী এসে পৌঁচেছিল। আমি কোন হাসপাতালে কোথায় আছি না জানায় বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেক। যাই হোক, আরুউইন্ হাসপাতালের গেটের সামনে এসে দারওয়ানকে জিজ্ঞাসা কচ্ছে—এমন সময় আমায় খবর দেওয়ার জন্তে শ্বশুরম'শায় আসছিলেন, তাঁর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তিনি তাকে ভিতরে নিয়ে এলেন। সেই রাত্রি থেকেই সে আমার দেখা শুনার জন্ত সারা রাত্রি হাসপাতালে থাকতে আরম্ভ করল। প্রথম প্রথম একটী চেয়ারে বসেই রাত কাটাত, তার পর ২।০খানা কম্বল চেয়ে নিয়ে মেঝের বিছানা করে শুয়ে থাকতো। সেনগুপ্তের ও আমার বেড্ বরাবরই পাশাপাশি ছিল। এই দুই বেডের মাঝেই সে থাকতো। রাত্রে বারে বারে খাওয়ান, মেথরদের ডেকে দেওয়া ইত্যাদির জন্ত, ও না থাকলে খুবই অসুবিধা হতো।

আমি দুধ ছাড়া হাসপাতালের অন্ত কিছু খেতাম না। দুবেলা ভাত, লুচি, মাছের ঝোল, ডিম এবং নানান রকম খাবার আমার আত্মীয়ের বাড়ী থেকে আসত।

এমনি করে একমাস কেটে গেল। অবস্থা ভালর দিকে যাচ্ছে—ঘা শুকিয়ে আসছে দেখে—ডাক্তারেরা আর একবার ওটাকে কেটে সেলাই করে দিলেন। অজ্ঞান করেই করা হয়েছিল সেজন্ত কষ্ট হয়নি। আরও ১৫ দিন লাগ্‌লো সেটা মোটামুটি সারতে।

২৪শে ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ছুটী পেলাম। তখনও আমার ঘায়ের সেলাই কাটা হয়নি। বাকি কাজটা শ্বশুর মশাই নিজেই করবেন বলে আমায় বাড়ী নিয়ে এলেন। সেই রাত্রেই দিল্লী থেকে আমরা রওনা হলাম। সেনগুপ্তও সেইদিন ছুটী পেয়ে, তাঁর এক আত্মীয়ের ওখানে থেকে গেলেন। আমাদের সঙ্গে আর ফিরলেন না। ২৬শে ডিসেম্বর সকালে ব্যাণ্ডেলে এসে নামলাম। ঘায়ের তখনও সেলাই কাটা হয়নি। আমরা পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরে আমার মা ও অন্যান্য অনেকেই এসে পৌঁছুলেন।

যাই হোক্ কোনও রকমে এ যাত্রা এঁদের একান্ত চেষ্টায় বেঁচে ফিরে আসতে পারলাম। (ক্রমশঃ)

চারণ-কবি কনকভূষণ স্মরণে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, বার-এট্-ল

নামে শুধু ছিল পরিচয়
কখনও ত' চোখে দেখি নাই,
তবু তুমি কত পরিচিত
তুমি ছিলে আমাদেরই ভাই।
তুমি ছিলে বাংলার কবি
পথপ্রান্তে ছোট যুঁই-ফুল,
আপনার সৌরভ বিলায়ে
পথিকেরে করিতে আকুল।
আমরা সামান্ত কবি যারা
সাধ্যমত সেবি মাতৃভাষা,
তোমারি মতন করে গা'বো
বুকে লয়ে অনন্ত পিপাসা।
আজীবন বাণীপদ সেবি'
কিছুই ত' চাও নি জীবনে,
জীবিকার লাগি' ঘুরি ফিরি'
অকালেতে বরিলে মরণে।
"যাযাবর" চিরশান্তি পাও,
এই শুধু একান্ত প্রার্থনা,
এক ফোঁটা নয়নের জলে
স্মৃতি-অর্ঘ্য করিনু রচনা।

[কবি কনকভূষণের শেষ প্রকাশিত রচনা : যাযাবর : ভারতবর্ষ, '৫১]

নালা-ক্লাব

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ

বাংলা দেশের আর যে কোনও অপবাদ থাক্‌, উর্ব্বরতার অভাব কোন দিন নেই। ধান কলাই পাট আগে প্রচুর পরিমাণে হতো, এখন হয় ম্যালেরিয়া। আগে জমি চাষ করতো মানুষে, এখন ম্যালেরিয়ার চাষ করছে মশা। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বাংলা ছেড়ে 'পশ্চিমে' এসে বাড়ী করে' বাস করছে। প্রাণ নিয়ে যারা পলায়ন করেছে, তাদের ভীরুতার চেয়ে, অপবাদ অগ্রাহ্য করবার মতো সৎসাহসেরও যে একটা মর্যাদা প্রাপ্য আছে এ কেউ স্বীকার করে না। সাঁওতাল পরগণার বালুকঙ্করময় প্রান্তরের মধ্যে ফুলের মতো বাড়ী তৈরী করে' বাগানে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটাচ্ছে, সে কথা কেউ মনে করে না। যাই হোক্‌, কতকগুলি বাঙালী বিষণপুরে এমনি সাজানো বাগান-বাড়ী করে' মনকে এই বলে' প্রবোধ দিয়েছেন যে মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র কীট এত দূরে নিশ্চয়ই উড়ে আসতে পারবে না।

একটি প্রশস্ত লাল কাঁকরের রাস্তা; তার দুধারে সুন্দর ছোট বড় বাড়ী। বছরের এগারো মাস কি তারও বেশি এই সব বাড়ী ঘুমিয়ে থাকে। কৃষ্ণবর্ণ সাঁওতাল যুবকেরা মালীর কাজ করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগারোমাস ধরে' তারাই মালিক। মাসে মাসে মণিঅর্ডার আসে, মালীরা নিশ্চিন্ত হয়ে তার সদ্ব্যবহার করে ও বাড়ীগুলি ভোগ দখল করে।

একবার পূজার ছুটিতে সব বাড়ীতেই মণিঅর্ডারের মালিকেরা এসে জুটেছেন; বাড়ীগুলি সরগরম হয়ে উঠেছে। তরুণ তরুণীরা কোমর বেঁধে দুবেলা হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। আজ নীহারের ঝর্ণা অর্থাৎ একটি মরা পাহাড়ী নদী ৩½ মাইল, কাল ভেলুয়া পাহাড় পোণে ছ' মাইল, পরশু 'হাটিয়া' ২ মাইল—এইসব যায়গা ঘুরে ঘুরে ক্ষিদের স্বাভাবিক তীব্রতা বাড়িয়ে তুলছেন। আর প্রবীণেরা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট পরিমিত পথ অতিক্রম করে' স্বাস্থ্যের ব্যারোমিটার ঠিক করে' রাখছেন। তাঁদের সান্ধ্যভ্রমণের সীমানা একটা ছোট 'নালা'। তার উপর একটি পুল বা কালভার্ট। দুদিকে সিমেন্ট দিয়ে বেঞ্চির মত গাঁথা সিট্‌—সেখানে বসে' শ্রান্ত পদযুগলকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না দিলে তারা আবার ঠিক মত চল্‌তে চায় না। বৃদ্ধেরা প্রতিদিন সেখানে বসে' গল্পগুজব করেন—তাই তরুণেরা তার নাম দিয়েছিল "নালা-ক্লাব।"

কার্ত্তিক মাস, ঠাণ্ডা পড়ে। প্রবীণদের পক্ষে সেটা বড় হিতকর নয়; সে জন্যে তাঁরা সন্ধ্যার তারা উঠ্‌লেই উস্‌খুস্‌ করতে আরম্ভ করেন। তার পর অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পের উপসংহারের জন্যে অপেক্ষা না করেই উঠে পড়েন। সাধারণতঃ দুর্মূল্যতা নিয়েই তাঁদের আলোচনা সুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জীর বিশ্লেষণ করে' সেদিনকার মতো বৈঠক শেষ হয়। হঠাৎ ক্লাবে নতুন কেউ এলেই তাঁর মুখে টাট্‌কা খবর শোনবার জন্যে সকলেই উৎসুক হয়ে উঠেন। নবাগতও সম্ভবমত গাম্ভীর্য চোখে মুখে ফুটিয়ে প্রমাণপঞ্জী সহ যুদ্ধরত শক্তিপুঞ্জের কোষ্ঠী বিচারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সান্ধ্যতারকার উদয়ের সঙ্গে যে ক্লাবের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে তথ্যটি অজ্ঞাত থাকায় তাঁর গবেষণা অর্দ্ধপথেই সমাধি লাভ করে।

কিন্তু নালাক্লাবের মুখ্য অধিবেশন এইভাবে সংক্ষেপে পরিসমাপ্তি লাভ করলেও গৌণ অধিবেশন অনেক রাত পর্য্যন্ত চলে। প্রৌঢ়েরা ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে সরে' পড়লে, যারা পরে এসে দখল করে, তারা তরুণ তরুণী; তাদের ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই। বরং কার্ত্তিক মাসের হিমেল হাওয়া তাদের চিত্তবিকাশে সহায়তা করে। শুক্লপক্ষের জোছনা যখন সবুজ মাঠে নীলকাচের মধ্যে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে, তখনই ভ্রমণক্লান্ত তরুণতরুণীর মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। শেষে যখন আর না উঠ্‌লে দেখায় না ভালো, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা মন্থরচরণে গৃহে গমন করে।

দুই একদিন এর ব্যতিক্রমও ঘটে; অর্থাৎ প্রৌঢ়েরা রৌদ্রের তাপ কমে গেলে যখন এক এক করে' নালাক্লাবে 'অধিষ্ঠান' হন, তখন দেখেন যে, ক্লাবে তখন আসর জমিয়েছে এক পাল ছেলে মেয়েরা। লেফটেনাণ্ট রক্ষিত এসেছেন তাঁর মেসোর বাড়ীতে। তিনি ও তাঁর মাসীর মেয়ে শেলী এসে বসেছেন নালার সিটের উপর। শেলী পরিচয় দিয়ে দিল "ইনি লেফ্‌টেনাণ্ট র‍্যাকসিট—আই এফ এর একজন বিখ্যাত বৈমানিক। সম্প্রতি নয়া সড়ক থেকে ছুটিতে এসেছেন।" ক্রমে আরও দুই চার জন সমবয়স্ক এসে উপস্থিত হলেন। এঁরা আগে থেকেই আছেন এখানে; জানেন যে বিকাল হলেই প্রবীণেরা এই নালায় আসেন হাওয়া খেতে এবং সময় হরণ করতে। কাজেই তাঁরা গল্পগুজবের মধ্যেও বার বার সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করছেন রাস্তার দিকে। লেঃ র‍্যাকসিট যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ খবর মুরুব্বির চালে খুচরা বণ্টন করছিলেন, শেলী ও তাঁর বান্ধবীরা সানন্দে সেই তাজা রস পান করছেন। রক্ষিত তাঁর সামরিক পোষাক পরে' এবং এক ফুট লম্বা পাইপ মুখে লাগিয়েই আসেন। চোখে গগোল্‌স্‌ এবং মাথায় বৈমানিক টুপী।

একটি লেডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে নিমাইবাবু এলেন। অনধিকারীর দলের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে দেখে উঠে পড়তে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শেলী চোখ টিপে ইঙ্গিতে বললে 'চেপে বোসো।'

একজন নিমাইবাবুকে দেখিয়ে বল্‌লে, 'নিমাইবাবু যে'। লেঃ র‍্যাকসিট্‌ ধমক দিয়ে বল্‌লেন. 'তার হয়েছে কি? সবার সমান অধিকার। যুদ্ধ হচ্চে কিসের জন্যে? হাজার হাজার লোক তাদের তাজা রক্ত দিচ্চে কিসের জন্যে? এই সমান অধিকারের জন্য। বয়স নয়, টাকাকড়ি নয়, আভিজাত্য নয়—সব সমান। আমরা ষ্টিম্‌ রোলার দিয়ে সব সমান করে' তবে ছাড়বো।' এই বক্তৃতায় সকলের মধ্যেই যেন নতুন সৎ সাহসের সঞ্চার হলো।

আস্তে আস্তে সর্বানন্দবাবু এসে নিমাইবাবুর সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের সাবেকি মনোভাব; প্রত্যাশা করেন যে ঢিল পড়লে মুরগীর দল যেমন চারিদিকে ছিট্‌কে পড়ে, তরুণেরাও তেমনি তাঁদের দর্শনমাত্রে যে যার সরে' পড়বে। কিন্তু সে বিষয়ে যথেষ্ট বিলম্বের সম্ভাবনা দেখে নিমাইবাবু বললেন 'চলুন, রায় বাহাদুরের বাড়ীতে আর একবার বসা যাক্‌।' পূর্ব্বে সারা মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নেও অধিকাংশ সময় সুরেশবাবুর 'তড়িৎ-

কথায় ব্রিজ্ খেলা হয়েছে। এখন ইষ্ট-গোষ্ঠীর সময়ে হঠাৎ এই রকম বাধা উপস্থিত হওয়ায় যে বিরক্তি সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, ব্রিজের পুনরাবৃত্তিতে হয়ত সেটা উপেক্ষিত হতে পারে, এই আশায়ই প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। পরে যাঁরা এলেন তাঁরাও রায়বাহাদুরের 'মাধবী কুঞ্জের' দিকে গমন করলেন। মাধবীকুঞ্জ নালার খুব কাছেই।

মাধবীকুঞ্জে অকালে এই রকম ভীড় দেখে বেরিয়ে এলেন একটি তরুণী; তিনি মাত্র দুদিন হলো বিষণপুরে এসে পৌঁছেচেন। ইনি রায় বাহাদুরের অর্থাৎ কুঞ্জের মালিকের ছোট শালী।

'জামাই বাবু, এঁরা সব যে আজ বড়ো এখানে এসে জুটেচেন?' নিমাইবাবু চোখ টিপে সর্বানন্দকে বল্লেন, 'এখানেও আর এক দফা তরুণীদের আড্ডা বসেছে নাকি? এস, সরে' পড়া যাক্।'

সর্বানন্দবাবু বল্লেন, 'না, মশায় দেখাই যাক্ না। এ হাতটা উঠে যাক্ তার পরে না হয় দুর্গা বলে যাত্রা করা যাবে।' তাঁর হাতটি ছিল ভাল। তিনি থ্রে-অব-হার্ট্স ডেকে নিয়েছেন।

রায়বাহাদুর অর্থাৎ হৃদয়বাবু একটু বিমনা হয়ে উত্তর দিলেন (তিনি Dummy)—'হাঁ—না, নালার ওপর আর একদল চড়াও হয়েচে। কাজেই ওঁরা বে-দখল হয়ে এসেছেন।

ছোট শালী জিজ্ঞাসা করলেন 'কারা আবার বেদখল করলো?'

'ঐ যে লেফটেনাণ্ট র‍্যাক্‌সিট্ না কে একটা এসেছে। সে-ই দলবল নিয়ে বসেছে।'

'তাদের পষ্ট বলে' দিতে পারলেন না—যে তারা আর যেখানে খুসী গিয়ে বস্‌তে পারে, এ-টা আপনাদেরই মামুলি বসবার যায়গা?'

হৃদয়বাবু জবাব দিলেন, 'সে ছোক্‌রা মিলিটারী। রিভলভার গুঁজে, গগোল্‌স্ পরে' ছাড়া সে কোথাও যায় না। যেন এখুনি তাকে সুরাবায়ায় বোমা ফেল্‌তে যেতে হবে।' হৃদয়বাবু পুলিশের সুপার হয়েছিলেন।

'ওঃ তাই নাকি? আচ্ছা, আমি দেখচি।' বলে' বীররসের অভিনয় ভঙ্গীতে তরুণী যাত্রা করলো। ব্রিজ্ খেলার মধ্যেও প্রবীণেরা চোখের কোণে সেটুকু আস্বাদন করতে ভুল্‌লেন না।

তরুণীর অভিযানে সঙ্গী হলেন রায়বাহাদুরের কন্যা পারুল এবং তার তেরো বছরের ভাই অপু।

মাসী গিয়েই সিটের এক সংকীর্ণ প্রান্তে বসে' পড়লো। তার চেহারা ছিল দোহারা, কাজেই বস্‌তে একটু স্থান লাগলো বই কি। আগন্তুক দেখে উপবিষ্টারা হয়ত একটু স্থান দিতেও কাতর হতো না। কিন্তু তরুণী তার অপেক্ষা না করেই প্রথমে উপবেশন ও পরে স্বকীয় শক্তির মৃদু প্রয়োগে বেশ বসবার মত স্থান করে নিল দেখে' মেয়েরা পরস্পরের গা টেপাটিপি করে নিল। একটু হাসিরও হিল্লোল বয়ে গেল—কারণ মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণও ছিল—লেঃ র‍্যাকসিট সিটের অপর প্রান্তে,—মেয়েরা ঠাসাঠাসির চোটে তাদের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করে' উঠ্‌তে পারলো না। র‍্যাকসিট্ তার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তিনীর চাপে শুধু বললো—'হুম্'। কিন্তু তার চোখ দুটি গগোল্‌স্ আবৃত হয়েও এই নতুন টারগেটের দিকে চিরস্থায়ী ভাবে নিবদ্ধ হয়ে' রইলো। কৌতূহল ভরা অনেক জোড়া চোখ আগন্তুকার মুখে স্থাপিত হলো। অবিবাহিতারা মাঝে মাঝে র‍্যাক্‌সিটের চাহনির বহরও দেখে নিচ্ছিল। এদের মধ্যে একজন, মেয়েটিকে আগের দিন দেখেছিল—সে ফিস্ ফিস্ করে' বলে দিল—'রাইকমল।'

রাইকমলের পুরো নাম কমলা রায়। কিন্তু মাধবীকুঞ্জে তাকে 'রাইকমল' বলেই ডাক্‌তো। তার নামে যেমন একটু নূতনত্ব ছিল, চেহারায় তার চেয়ে কম নয়। মুখখানি নিটোল, চোখ দুটি গভীর। চুল 'বব' করে' ছাটা। ঠোঁটে লালের বাহার, নাকটি ছুরির মত খাড়া। কপোলে একটি 'বিউটি স্পট'—টিপ, আর সমস্ত গণ্ডে এবং স্কন্ধে অপর্যাপ্ত পাউডার প্রলিপ্ত। ব্লু-রঙের জর্জেট শাড়ী স্মার্ট ফ্যাশনে পরা। হাতে দুগাছি রুলী। বাঁকা সিঁথির দুধারে চুল অ্যালবার্ট করে' ফোলানো।

রাইকমল ঝগড়া করতেই এসেছিল—কিন্তু মেয়েদের অনিমেষ দৃষ্টিপাতে সে ক্রোধ অপেক্ষা কৌতুকই অনুভব করছিল বেশী, কেউ কথা কহিবার আগে সে-ই আলাপ করলো—

'আমার স্কুলের এখন ছুটি কিনা, তাই এই বিষণপুরে দিনকতক বেড়াতে এসেছি। মাধবীকুঞ্জ আমারই দিদির বাড়ী। কিন্তু আপনাদের এখানে জিনিষপত্রের দর যে আগুন—বেশী দিন থাকা চল্‌বে না।' বলে' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো।

একজন প্রশ্ন করলো—'আপনি কোন স্কুলে পড়েন?' তার চোখে মুখে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন হাসির আমেজ ছিল।

'না, নাঃ (বেশ জোরেই রাইকমল বল্‌লো) আমি পড়াই। বিদ্যাকূট স্কুলের আমি হেড্ মিষ্ট্রেস্। সাড়ে দুশ' মেয়ে পড়ে। খাটুনির অন্ত নেই, বুঝতেই পারছেন।'

একটি মেয়ে কৌতুকের সুরে বল্‌লো, 'খাটুনি যে বেশি, তা আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যায়।'

'কেমন করে' বুঝবেন? আগে ত দেখেন নি। আপনাদের মত দুজনের চাইতেও ওজনে ভারী ছিলাম। মেয়েদের বক্সিং ও ছোরা খেলার কম্পিটিশনে আমি বাংলা দেশের চ্যাম্পিয়ান হতে পারতাম।'

অন্য মেয়েরা একেবারে হাসির ফোয়ারা্ ধরলে। রাইকমল চোখ দুটি সঙ্কুচিত করে' সকলের মুখের পানে বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌লো, তারপর পারুলের হাত ধরে' এক হেঁচ্‌কা টান মেরে উঠে পড়লো।

'বিষণপুরের সভ্যতায় বেশ একটুখানি পরিচয় পাওয়া গেল। চ—এখানে থাকতে নেই।'

পারুলের ভাইটি দাঁড়িয়েই ছিল, সে র‍্যাকসিটের মিলিটারী পোষাক অনিমেষে দেখ্‌ছিল। কিন্তু তাকেও মাসীর অনুবর্ত্তী হতে হলো।

রাইকমল চলে' যেতেই তরুণ তরুণীরা কিছু অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। কিন্তু র‍্যাকসিটের গগোল্‌স মণ্ডিত চোখে যে কৌতূহল জমে উঠেছিল, সেটা কেউ লক্ষ্য করেনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই র‍্যাকসিট তার ক্যামেরা ও সিগারেটের কৌটাটি হাতে নিয়ে উঠে পড়লো এবং কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা মাঠের মধ্যে পাড়ি ধরলো।

সন্ধ্যা তখন পার হয়ে গেছে। র‍্যাক্‌সিট মাঠ পার হয়ে

রাস্তায় উঠ্‌তেই দেখলেন কিছু দূরে রাইকমল ও তার সঙ্গীরা আসছে। একটু মৃদুমন্থরভাবে যেতেই তারা র‍্যাকসিটের সঙ্গ লাভ করলো।

প্রথমটা কেউ কোন সম্ভাষণ করলো না। পরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নীরবতা অসহ বর্ণে র‍্যাক্‌সিট্‌ কথা কইলেন :

'আজ আপনার প্রতি ওঁরা যে দুর্ব্যবহার করেছেন, আমি তার জন্যে ক্ষমা চাইতেই ছুটে আস্‌ছি। দেখুন সোজা পথে এসেছি—তবুও হাঁফিয়ে গেছি—'

রাইকমল ঈষৎ লজ্জার অভিনয় করে' বললে,

'কি আশ্চর্য্য! দেখুন ত আপনাকে কত কষ্ট দিলাম। আমি ও সব কিছু মনে করি নে'—

'সে আপনাকে আর বল্‌তে হবে না। আমি আপনাকে দেখা মাত্র বুঝ্‌তে পেরেছি যে আপনি ওসব হেঁচিপেঁচির দলে নন। আপনি উচ্চশিক্ষিতা এবং আপনার চলনে বলনে একটা আভিজাত্য আছে—কোথায় পাবে ওরা?

রাইকমলের হাসি আঁধারকেও যেন চমকে দিল। মনে হলো দূর থেকে ছোট একটি ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। 'আমি বরাবর লোরেটোতে পড়েছিলাম, ক্যাপ্টেন র‍্যাক্‌সিট্‌।'

র‍্যাকসিট্‌ সংশোধন ক'রে বল্‌লেন, 'লেফ্‌টেন্যান্ট। তবে হাঁ আমি ফিরে গিয়েই ক্যাপ্টেন হবো।'

'নিশ্চয়ই—জেনারল হ'তে কত দিন লাগ্‌বে?'

অত্যন্ত খুসী হয়ে তার সঙ্গী বল্‌লো—'দাঁড়ান, আগে যুদ্ধ কত দিন চলে দেখা যাক্‌।'

'যুদ্ধ এখনও চলবে এবং আপনিও খুব উচ্চ পদ লাভ করবেন—আপনার উন্নত কপাল দেখে সেটা বুঝতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগে নি'—

র‍্যাকসিটের কপাল যে উঁচু, এটা তার জানা ছিল না। সে সংকল্প করলো বাড়ীতে গিয়েই আয়নায় ভাল করে' দেখে নিতে হবে। তার মানসিক প্রক্রিয়ায় যে সময়টুকু অতিবাহিত হলো, তার মধ্যে রাইকমল অনেকবার র‍্যাকসিটের দিকে কুটিল চাহনি বিস্তার করতে ত্রুটি করলো না। র‍্যাক্‌সিট অন্ধকারেই শিউরে উঠ্‌লেন।

'যাও না, তোমরা একটু এগিয়ে যাও না—দেখ্‌ছো একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছি—'

পারুল তার ভাইয়ের হাত ধরে' অনেকখানি এগিয়ে গেল।

পরদিন থেকে নালা-ক্লাব তরুণদের আক্রমণ থেকে কিছু দিনের মত রেহাই পেলো। তরুণ তরুণীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে' পড়েছে। আবার অবসরপ্রাপ্ত দলের দখল কায়েম হলো।

হৃদয়বাবু বসে' পড়েই বললেন 'যত সব—'

শরৎবাবুও সংক্ষেপে উত্তর দিলেন 'আপনিও যেমন—'

জনার্দনবাবু বল্‌লেন, 'কাদের কথা বলছেন? ছোকরাদের দল?—'

প্রাণনাথবাবু একটু শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি বললেন—'ছোকরাদের মতি! হা, হা, হা। আজ একখানে, কাল আর একখানে—নিমাইবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'কারণ আছে—'

তখন সকলেই তাঁর দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে' চেয়ে রইলো। তিনি বল্‌লেন,

'ঐ যে মিলিটারী ছোঁড়াটা এসেছে ছুটিতে। আপনার বিষণপুরের মেয়েদের মাথা ঘুরে গেছে—'

প্রাণনাথবাবু উচ্চ হাস্য করে' বল্‌লেন, 'ওঃ এই কথা। আমাদের কালেও এমনি ঘটনা যে না ঘট্‌তো, তা বলা যায় না। মেয়েদের বেশি বয়স পর্যন্ত যে না দিয়ে রাখা ভাল না। আমরাই দায়ী, আমরাই দায়ী নিমাইবাবু।'

সুশীলবাবুর একটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা আছে। তিনি সহসা বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন :

'বল্‌তে পারেন, এই হতভাগাটা কবে যাবে বিষণপুর থেকে? আমি ঐ মিলিটারী ছোঁড়ার কথা বলছি—'

হৃদয়বাবু জবাব দিলেন 'তা কেমন করে' জান্‌বো বলুন? বিশেষ অসভ্য বলে' ত বোধহয় না। আমার বাড়ীতে দুই একদিন এসেছিল, বেশ ভব্যসভ্য বলেই ত বোধ হলো। কমলার সঙ্গে আগে থেকে নাকি পরিচয় ছিল—'

সুশীলবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' বল্‌লেন, 'আপনার শ্যালিকাটির কত দিন থাকা হবে?'—

অবসরপ্রাপ্তের দল এ প্রশ্নের মর্ম বুঝ্‌তে পারলেন না। সুশীলবাবু বললেন 'সব খেপিয়ে দিলে—'

কিন্তু একথায়ও প্রবীণের দলের গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ হলো না। সুশীলবাবুর বয়স হয়েছে—রিটায়ার করবার সীমা তিনিও অতিক্রম করেছেন, তবে বয়েসটা গোড়া থেকে কম লেখা ছিল বলে এখনও তিনি বিচার বিভাগে পেস্কারের কাজে মোতায়েন আছেন। সে জন্য প্রবীণেরা তাঁকে প্রায় ছোকরাদের সামীল বলে' মনে করেন এবং তাঁর কথা বড় ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করেন না।

এর পরই আরম্ভ হলো ঘরকন্নার কথা। কয়লার দর কত? কেরোসিন কি সুযোগে পাওয়া যায়? চিনি আর কত দিন অমিল থাকবে ইত্যাদি অনেক আলোচনা হলো।

সুশীলবাবু বল্‌লেন, 'আলুর বাজারে এমন আগুন লেগে গেল কেন বলুন ত?'

প্রাণনাথবাবু বললেন, 'আরও খাদ্য জন্মাও' এই নীতির ফলে। চুলোয় যাক্‌, চুলোয় যাক্‌।'

শরৎবাবু বললেন 'পাওয়া যাচ্ছে এই ঢের, মশায়। আলু না হলে আমার বাড়ীতে একদিনও চলে না।'

সন্ধ্যার পরই সভা ভঙ্গ হলো। ক্লাবের সভ্যেরা কেউ কেউ চাদরটা টেনে কান দুটো ঢেকে নিলেন।

হৃদয়বাবু মাধবী কুঞ্জে প্রবেশ করতেই বাড়ীর সামনে দেখলেন দুটি মূর্ত্তি মহুয়া গাছের নীচের অন্ধকারটায় দাঁড়িয়ে নিবিষ্টভাবে আলাপ করছে। তাঁর পায়ের শব্দে চমকে উঠে র‍্যাক্‌সিট্‌ তাড়াতাড়ি সরে' পড়লেন। রাইকমলকে দেখে হৃদয়বাবু একটু চোখ টিপে বললেন,

'অন্ধকার না হলে' বুঝি আলাপ তোমাদের জমে না? ও ছোঁড়াটা কি চায়?'

রাইকমল চোখে মুখে পুলকের পিচ্‌কারী ছুটিয়ে বললো,

'ধনুকে আর একটা ছিলা থাকা মন্দ কি?'

হৃদয়বাবু হেসে বললেন, 'বটে। সে ত আমিই আছি—'

ব্যাকসিটের আগ্রহাতিশয্যে রাইকমল বেশ একটু আনন্দ মিশ্রিত কৌতুক অনুভব করছিল। সে নানা রকম গল্প তৈরী করে' তার চরিত্রকে ব্যাকসিটের কাছে যত কুয়াসাময় করে' তুলছিল, ততই ব্যাকসিটের মন স্রোতের শেওলার মত ভেসে যাচ্ছিল।

একদিন সন্ধ্যায় নালা ক্লাবে বসে' তরুণ তরুণীরা গল্পে মত্ত রয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার যত নিবিড়তর হয়ে উঠ্‌ছে, তত তাঁদের গল্পের স্রোতে জোয়ার আসছে। হারাণবাবু হঠাৎ তাঁর সান্ধ্য হণ্টন থেকে ফেরবার সময় 'নালা' পার হতে হতে দেখলেন, প্রবীণের দল কেয়ার অর্থাৎ রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। তিনি একবার একটু কাসলেন, একবার বল্লেন 'হুঁ'। হারাণবাবুর চেহারা, দোহারা। মাথায় কাঁচা পাকা চুলের ঢাকনি আঁধারেও পুরাণো খড়ের চালের মতো দেখাচ্ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল বড়ো, পাশার ঘুঁটির মত, সে দুটি একবার ডাইনে ও একবার বাঁয়ে সঞ্চালিত হয়ে' তরুণের দলে যে কিছু ত্রাস সঞ্চার করলো না, তা বলা যায় না।

শেলী আজ আসে নি। লেঃ ব্যাকসিট্ রাইকমলকে পৌঁছে দেবার জন্যে মাধবী কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হলেন। মহুয়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার সময়ে লেঃ ব্যাকসিটের কণ্ঠস্বরে কিছু বেদনার মীড় লাগ্‌লো। রাইকমল সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করলো,

'ক্যাপ্টেন্, আপনাকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন আপনার মনে খুব সুখ নেই।' রাইকমল কিছুদিন থেকে লেঃ ব্যাকসিট্‌কে সংক্ষেপে 'ক্যাপ্টেন' বলেই ডাক্‌তো এবং তাতে তাঁর কোনও সংকোচ লক্ষিত হতো না। ভবিষ্যৎই হলো মানুষের সত্যিকার পরিচয়।

লেঃ ব্যাকসিট রাইকমলের সহানুভূতিতে বেশ উৎসাহ পেলেন। একটু দীর্ঘ নিশ্বাসের চেষ্টা করে' বললেন,

'সংসারে আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই।'

'কেন শুনেছি ত আপনার বাবা আছেন, মা আছেন?'

'হাঁ,—না—আমি তা mean করছিনে—আমার নিজস্ব সংসারে কেউই নেই।'

'ওঃ—আপনি বুঝি অবিবাহিত? কেন, এতদিন ত আপনি ইচ্ছা করলেই বিবাহ করতে পারতেন। আপনাকে যে বে করবে, তার ত ভাগ্যের সীমা নেই—আমাদের সমাজ যা হয়েছে—'

ব্যাকসিট উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আবেগের সঙ্গে বললেন, 'আমি ত আর বাবার পছন্দ হলেই ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে এক অপরিচিত যাকে তাকে নিয়ে সংসার করতে পারবো না—'

'নিশ্চয়ই নয়। তা দেখে শুনে নিজের পছন্দ মত একটি বে করে' ফেলুন না। এই বিষণপুরেই ত কত রয়েছে।'

ব্যাকসিট হাসলেন, বললেন 'আমার ভাউ হচ্ছে, শিক্ষিতা মেয়ে না হলে বে করবো না, আপনার মত বড়ো সড়ো না হলে বে করবো না এবং আগে থেকে প্রণয় না হলে বে করবো না।'

'ব্রাভো, ক্যাপ্‌টেন্ ব্যাকসিট! আমি কলেজের ছেলেদের জন্যে এক কপিবুক বের করবো—তাতে আপনার এই তিন সত্য বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে দেবো।'

'আমি জানি আপনি শুন্‌লে খুসী হবেন। আরও খুসী হবেন শুন্‌লে যে, আমি রোগা মেয়ে একেবারে পছন্দ করি নে। মেয়েছেলে হাল্‌কা পল্‌কা পালকের মত বাতাসে উড়ে যাবে, এ অতি বিশ্রী। ঠিক আপনার মত গঠন হবে—রোগা নয়, অথচ মোটা নয়, বেশ একটু ভারিক্কি। রং ও খুব উজ্জ্বল আমি পছন্দ করি নে, অথচ আবার চুলের রঙের সঙ্গে মিশে যাবে, এটাও ভালবাসি নে।'

'আমার রং আপনি উজ্জ্বল মনে করেন না?' রাইকমল অভিমানের সুরে বল্‌লো।

ব্যাকসিট উত্তর করলো, 'উজ্জ্বল মনে না করলেও তার চেয়ে ভাল মনে করি—স্নিগ্ধ। ঝাড়ের বাতির ঝকঝকে আলোর চেয়ে আমি ঈষৎ নীল ডোমের বিজলিবাতি পছন্দ করি।'

'ওঃ হোঃ হো! আপনি যে একজন রীতিমত কবি হয়ে উঠ্‌লেন।'

রাইকমল দেখ্‌লো যে আলাপের গতি উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ছে—আর একটু অগ্রসর হলেই খাদে গিয়ে পড়তে হবে। সুতরাং বিদায়ের পালা সংক্ষেপ করে সে মাধবীকুঞ্জে ঢুকে পড়লো।

কয়েকদিন কেটে গেল। রাইকমল মাথার অসুখে বেরুতে পারে নি। আজ সন্ধ্যায় ষ্টেশনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে' রাস্তায় বাহির হওয়া মাত্র লেঃ ব্যাকসিট্ অগ্রসর হয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন। সঙ্গে রাইকমলের দিদি ছিলেন, কাজেই আলাপ জমাবার পক্ষে বাধা ঘট্‌লো। ষ্টেশনে যাওয়া মাত্র সুন্দরবাবু তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন—কথাবার্ত্তার সুযোগ আরও কমে গেল বলে' ক্যাপ্টেন ব্যাকসিট সজোরে প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারী করতে আরম্ভ করলেন। তার হাত পা ছোঁড়ার বাহুল্য দেখে পরিচিতেরা পথ ছেড়ে দিল, কুলিরা পাশ কাটিয়ে চললো।

ট্রেণ এসে পড়তেই যে ভীষণ ভীড় হলো, তাতে ব্যাকসিট্ একেবারেই সঙ্গ ছাড়া হয়ে পড়লেন। একটু পরেই রিফ্রেশমেন্ট রুমের দিকে নজর পড়তে ব্যাকসিট্ দেখ্‌লেন যে রাইকমল প্রভৃতি সেখানে খাবার টেবিলে জড়ো হয়েচে। তাঁকে দেখবা-মাত্র একজন সুট্‌পরা যুবক সে মণ্ডলী থেকে উঠে ক্যাপ্‌কিনে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ব্যাকসিটের দিকে ছুটে এলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হবা মাত্র উভয়ে উভয়ের কর নিষ্পেষণ করে' বল্লেন, 'কি হে ধীরু, তুমি এখানে?' 'কি হে পশু, তুমি কোথায় হে?'

ধীরু বল্লেন 'আমি আগ্রা যাচ্ছি, ফুড্ কণ্ট্রোলার হয়ে। তুমি?'

পশু বল্লেন 'আমি ছুটিতে বিষণপুরে মাসীর বাড়ী এসেছি।'

ধীরু বল্লেন 'এস, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।'

রাইকমল মুর্গীর কাট্‌লেট্ খেতে খেতে উঠে এসে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিল। ব্যাকসিটের পুপোলস্ খুলে' পাথরের মেজেয় পড়ে চুরমার হলো।

ভারতে উৎখাত[১] কয়লা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(আশ্বিন ১৩৫১ সংখ্যার পর)

ভারতের জ্ঞান

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতের লোক কয়লা বা মৃদঙ্গারের কথা জানিত†; কিন্তু নিয়মিত ব্যবহারের ইতিহাস সেই হিসাবে অতি আধুনিক।

ইংলণ্ড কয়লার ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত, সুতরাং তাহাদের নিজেদের কাজের জন্য ভারতে ইংরেজ অধিবাসিগণ এই স্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে কয়লার অভাব অনুভব করিতে থাকেন। ইহার ফলে ১৭৭৪ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কোম্পানীর দুই জন কর্ম্মচারী (Mr. Suetonius Grant Heatly and Mr. John Sumner)কে খনির অনুসন্ধানের অনুমতি পত্র প্রদান করেন। হিট্‌লী বীরভূম অঞ্চলে কয়লা আবিষ্কার করেন। এই কয়লা ইংলণ্ডের কয়লা অপেক্ষা গুণে অনেক হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে এতৎসংক্রান্ত সমস্ত অনুসন্ধান বন্ধ হইয়া যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতীয় অসংস্কৃত (raw) দ্রব্য, শিল্প ও বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসার সম্বন্ধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন, অতএব তাঁহার আমলে কয়লা লইয়া আর কোনও অনুসন্ধান গবেষণার আশা করা যায় নাই। ১৭৭৭ সালে ফার্কুহার ও মট্ (Farquhar & Motte) দামোদর ও বরাকর নদীর মধ্যে বরিয়া জেলায় লৌহ কারখানা স্থাপন করিয়া কামান গোলা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি যাচ্ঞা করেন; ঐ স্থান নির্ব্বাচনের কারণ হিসাবে বলেন যে ঐ স্থানে লৌহ-প্রস্তরের সন্নিকট কয়লার খনি অবস্থিত। তখন পর্য্যন্ত কয়লার গুণ বিচার করিয়া নিজ প্রয়োজনে ইংলণ্ড দেশ দেশান্তরে জাহাজের খোল ভরিয়া কয়লা প্রেরণ করিত। এই সময় বাঙ্গালা দেশে কোম্পানীর প্রয়োজনে কয়লা ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে বহু ব্যয় হইয়া যাইত বলিয়া ডাইরেক্টরগণ পুনরায় ভারতে কয়লার অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবার আদেশ দেন। সামরিক বিভাগ হইতে ১৮০৯ সালে কর্ণেল হার্ডউইক্ (Col. Hardwicke) কর্ত্তৃক পরীক্ষার ফল উৎসাহজনক হইল না। কিন্তু ১৮১৪ সালে হেষ্টিংস সাহেব পুনরায় জেদ ধরেন যে ভারতীয় কয়লা ধাতব কার্য্যে চুল্লীর বা ছাপার উপযোগী কি না, তাহা একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। তিনি উপযুক্ত লোক এবং গভীর স্তর হইতে উত্তোলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে প্রেরণের জন্য সুপারিশ করেন। ইহার পূর্ব্বে অনুসন্ধানের কালে ভূপৃষ্ঠের অনতিগভীর স্তরের কয়লা লইয়া পরীক্ষা হওয়ায় ফল আশানুরূপ হয় নাই। যখন হেষ্টিংস সাহেব এই সকল ব্যবস্থা দান করিতেছিলেন, তখন কলিকাতায় এক দল ব্যবসায়ী দামোদর দিয়া কলিকাতায় কয়লা আনিয়া ব্যবহার করিতেছে বলিয়া জানা গেল। বিলাত হইতে মিঃ জোন্স (Mr. Rupert Jones) আসিয়া বহু গবেষণার পর ১৮১৫ সালে রিপোর্ট দাখিল করিলে ভারতীয় কয়লার নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল যে ইতোপূর্ব্বে ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের বিপক্ষে যে সকল মতামত সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার মূলে ভারতীয় কয়লার গুণ অপেক্ষা ভারতীয় মালমশলা দ্বারা ভারতে শিল্প সম্ভাবনা রোধ বা নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টাই দায়ী।

ক্রমে ভারতীয় কয়লা নিজগুণে, খনির মজুরদের অল্প মজুরি এবং রেল বিস্তারের ফলে রেল কোম্পানী কর্ত্তৃক অধিকতর পরিমাণ কয়লা ব্যবহার ও স্থানান্তরের সুবিধার জন্য, নিজ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ১৮২০ সালে প্রথম খনি নিয়মিত ভাবে চালু হয়।

স্তর বিভাগ

ভূতত্ত্ববিদের মতে ভারতের কয়লার স্তর দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম গণ্ডওয়ানা* এবং অপরটী টার্সিয়ারী। গণ্ডওয়ানা স্তর হইতে শতকরা ৯৮·২ অংশ কয়লা উৎখাত হইয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে ভারতের মোট ২ কোটী ৮৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৯০৬ টন উৎখাত কয়লার মধ্যে গণ্ডওয়ানার অংশ ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৫১ এবং টার্সিয়ারী ক্ষেত্রের ভাগে অবশিষ্ট মাত্র ৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৫৫ টন পড়ে।

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, ইষ্টার্ণ ষ্টেট্স্ এজেন্সী বা পূর্ব্ব ভারতের করদ রাজ্য সমষ্টি এবং হায়দরাবাদকে গণ্ডওয়ানা ক্ষেত্র এবং আসাম, বালুচিস্থান, পঞ্জাব ও রাজপুতানায় টার্সিয়ারী ক্ষেত্র অবস্থিত।

প্রদেশের অংশ

বিহার ও বাঙ্গালা দেশই প্রায় মোট উৎখাত কয়লার পাঁচ ভাগের চার ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে; ১৯৩৮ সালের অংশ ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টনের মধ্যে ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৯ হাজার টন বা শতকরা ৮১·৫ ভাগ। ইহার উপর মধ্য প্রদেশ (৫·৮%), ইষ্টার্ণ ষ্টেট্স্ এজেন্সী (৫·০%) এবং হায়দরাবাদ (৪·২%) যোগ দিলে মোট কয়লার ৯৬·৫% দাঁড়াইয়া যায়। মধ্যভারত (১·১৫%) ও আসামের (·৯৮%) কয়লাও কিছু উল্লেখযোগ্য; আর পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং বালুচিস্থানের অংশ যৎসামান্য। পরিশিষ্ট (ক) হইতে প্রতি প্রদেশের পরিমাণ ও শতকরা অংশ পাওয়া যাইবে।

খনির অংশ

খনির মধ্যে বিহারের ঝরিয়ার স্থান প্রধান (১,১৪,৪৪,৪৬২ টন) অর্থাৎ শতকরা ৩৯·৩২% ভাগ। তাহার পরই রাণীগঞ্জ খনির স্থান, শতকরা ৩০·৫২ ভাগ। ইহার সহিত বোকারো খনি (৭·০৮%); কোরিয়া (৩·৫৮%) এবং গিরিডি (২·২৪%); যোগ দিলে অর্থাৎ এই পাঁচটী খনিতে শতকরা ৮২·৭৪ অংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে প্রত্যেক খনি হইতে উৎখাত কয়লার পরিমাণ ও শতকরা অংশ পরিশিষ্ট (খ) হইতে পাওয়া যাইবে।

১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৬১৯টী খনি বা খাদে (Pit) কাহ

† "Coal has doubtless been known to the Natives from time immemorial...."—Sir George Watt—*The Commercial Products of India*, 1908, p. 353.

* ১৮৭২ সালে এচ্. বি. মেড্‌লিকট (H. B. Medlicott) এই নামকরণ করেন।

১ ইংরেজি 'raising' বা 'extraction' শব্দের উপযুক্ত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ না পাওয়ায় 'উৎখাত,' 'উৎখাতন' ব্যবহার করা হইয়াছে।

চলিয়াছে। তন্মধ্যে একা ঝরিয়ার অংশ ২৪৯ ও বাঙ্গলার (এবং বিহারের কতকাংশ) রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ২৩১ খনি উল্লেখযোগ্য। তাহার পর পঞ্জাবের ৪৬, মধ্য প্রদেশের ২৩ এবং বালুচিস্থানের ১৮টী খনি বা খাদ ভারতের প্রায় বাকী কয়লা সরবরাহ করিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ১৭৭৪ সাল হইতে নানা রকম চেষ্টা চলিলেও ১৮২০ সালে ভারতে প্রথম নিয়মিত কাজ সুরু হয়, বাঙ্গলার (বিহার) রাণীগঞ্জ খনি এই সম্মানের অধিকারী। তাহার পর ১৮৯৩ সালে ঝরিয়াতে কার্য্যারম্ভ হয়।

উৎখাত কয়লা

১৮৩৯ সালের পূর্ব্ব হইতেই কয়লা উৎখাতন আরম্ভ হইলেও, তাহার বাৎসরিক স্বতন্ত্র কোনও হিসাব পাওয়া যায় নাই। ১৮৩৯ সালের হিসাবে ৩৬,০০০ টন দেখা যায়। তখন হইতে প্রায় কুড়ি বৎসরের পর হইতে নিয়মিত হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২,২৬,১৪০ টনে পৌঁছে।* তাহার পর বৎসরই ৩,৪৭,২২৭ টন হয়। ১৮৭৮ সালে প্রথম ১০ লক্ষ টন অতিক্রম করে; ১৮৮৭ সালে ১৫ লক্ষ (১৫,৩৪,০৬৩ টন) এবং আর তিন বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ টন (২১,৬৮,৫২১ টন) অতিক্রম করিয়া যায়। ১৮৯৪ সালের ২৮ লক্ষ ২৪ হাজার টন, পর বৎসরই ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার টনে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যে সকল কাজে ভারতীয় কয়লা ব্যবহৃত হইত না, ক্রমে সেই সকল স্থানে দেশীয় কয়লা ব্যবহার চলিতে থাকায় খনির কাজ দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। এখন হইতে প্রায় প্রতি দুই বৎসরে দশ লক্ষ টন পরিমাণ কয়লা অধিক মাত্রায় উঠিতে থাকে এবং ১৯০৭ সালে ১ কোটী টন (১,১১,৪৭,৩৩৯ টন) পার হইয়া যায়। ১৯১৮ সালে প্রথম দুই কোটী টন পরিমাণের (২,০৭,২২,৪৯৩ টন) মাত্রা পৌঁছে। তাহার পর হইতে তিন কোটী টন না হইলেও ১৯৩৮ সালে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ টন পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাহার পর ১৯৩৯ সালে ২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। পরিশিষ্ট (গ) হইতে ১৮৩৯ হইতে যথাসম্ভব বাৎসরিক সমস্ত পরিমাণ পাওয়া যাইবে। কয়লার দাম হিসাবে ১৯২৪ সালের ১৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরে কয়লার পরিমাণ আরও বেশী হইলেও এত চড়া দামে আর বিক্রীত হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ কিরূপ অবস্থা তাহা বলা যায় না।

পরিমাণ হ্রাসের কারণ

এই সংক্রান্ত পরিশিষ্ট (গ) হইতে দেখা যায় ১৯১৯ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উৎখাত কয়লার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু ১৯২০ সালে পূর্ব্ব বৎসরের ২ কোটী ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার টনের স্থলে একেবারে হ্রাস পাইয়া ১ কোটী ৭৯ লক্ষ ৬২ হাজার টনে অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কয়লা কম উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল কারণই স্বতন্ত্র বা সমষ্টিগতভাবে দেখা দিয়া কয়লা উৎখাতন বা বাণিজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে বলিয়া সামান্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রধান কারণ যুদ্ধাবসানে হঠাৎ কয়লার চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বাজার দর পড়িয়া যাওয়ায় কয়লার উৎখাতন ক্ষতির ব্যবসায়ে পরিণত হইল। সঙ্গে সঙ্গে লোকের মজুরি কমাইয়া দেওয়ায় খনির কুলির সংখ্যা এবং লোক প্রতি উৎখাত কয়লার পরিমাণও পূর্ব্ব হইতে হ্রাস পায়। কয়লা বহনের জন্য মালগাড়ীর প্রয়োজন; কিন্তু যুদ্ধান্তে সংখ্যাল্পতার দরুণ খনির নিকট কয়লা জমা হইয়া পড়িয়া রহিল। ১৯২২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে বহুকালস্থায়ী শ্রমিক ধর্ম্মঘট এবং প্রচুর বারিপাতে ঝরিয়া ক্ষেত্রে বন্যা,—আরও দুইটা নূতন উপসর্গ জুটিয়া গেল। অনেক খনির স্থানে স্থানে স্বতঃসম্ভূত অগ্নি সংযোগ হইয়া কার্য্যের গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত করে এবং খনি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। এই সকলের সুবিধা লইয়া বিদেশী কয়লার আমদানী বৃদ্ধি (১৯২১-২৩) পাওয়ায় আরও ক্ষতি সাধিত হয়। এই সঙ্গে জগতের বাজারে মন্দা দেখা দিল এবং ইহার ফল বহুদিন পর্য্যন্ত যে চলিয়াছে তাহা উৎখাত কয়লার পরিমাণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৯ সালের ২ কোটী ২৬ লক্ষ টন পরিমাণ পুনরায় পৌঁছিতে দীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছে, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে আবার ২ কোটী ২৫ লক্ষ টনে উঠে। তাহার পর হইতে পরিমাণ আর খুব বেশী বাড়ে নাই, অর্থাৎ দেশের মধ্যে শিল্প প্রভৃতির আর উল্লেখযোগ্য কোনও প্রসার লক্ষিত হয় না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারত

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না। ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে; সুতরাং তাহার সহিত তুলনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য (Union of South Africa) সকলেই ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী কয়লা সরবরাহ করিত। ১৯০২ সালে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করে অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের অংশে শতকরা ২·৯৫, অষ্ট্রেলিয়ার ২·৭২ এবং কানাডার ২·৭১ ভাগ পড়ে। ১৮৯৫ সাল হইতে ভারতবর্ষ পূর্ব্বাঞ্চলের জলযান কোম্পানী (Estern Steamship Companies) সমূহকে কয়লা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে; ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে ইংলণ্ডের কয়লার খনিতে প্রবল ধর্ম্মঘট এই সুযোগ ভারতবর্ষের নিকট উপস্থাপিত করে। এখন ভারতবর্ষ কানাডাকে অতিক্রম করিলেও অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চাতে পড়িয়াছিল। ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের পরিমাণ ২ কোটী ৫৬ লক্ষ টন, অষ্ট্রেলিয়ার ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টন (১৯৩৯) এবং কানাডার ১ কোটী ২৮ লক্ষ টন দাঁড়াইয়াছে (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৫১, পৃঃ ১১০)।

পরিশিষ্ট (ক)

১৯৩৮ সালে উৎখাত কয়লার পরিমাণ হিসাবে প্রতি প্রদেশের স্বতন্ত্র পরিমাণ ও শতকরা অংশ

মোট—২,৮৩,৪২,৯০৬ টন

প্রদেশ	পরিমাণ টন	শতকরা অংশ %
বিহার	১,৫৩,৩৪,০৭৯	৫৪·২
বাঙ্গলা	৭৭,৪৫,৩৭২	২৭·৩
মধ্যপ্রদেশ	১৬,৫৮,৯২৬	৫·৮
ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সী	১৪,৬৩,৬৯৩	৫·০
হায়দরাবাদ	১২,১১,১৬৩	৪·২
মধ্যভারত	৩,৩৩,৫৯৩	১·১৫
আসাম	২,৭৮,৩২৮	·৯৮
পঞ্জাব	১,৮৪,০২৮	·৬
উড়িষ্যা	৪৪,৪২৫	·১৬
রাজপুতানা	৩৪,৭১৭	·১২
বালুচিস্থান	২১,৮৮২	·০৭

* Moral and Material Progress of India, Vol, 89 (1862)

পরিশিষ্ট (খ)

১৯৩৮

প্রতি অঞ্চল হইতে উৎখাত কয়লার পরিমাণ ও শতকরা অংশ

(গণ্ডওয়ানা ক্ষেত্র)

খনি	পরিমাণ টন	শতকরা অংশ
বিহার		
বোকারো	২০,০৭,০১৩	৭·০৮
গিরিডি	৬,৩৬,৩৭১	২·২৪
জয়ন্তী	৪২,৯০০	০·১৫
ঝরিয়া	১,১১,৪৪,৪৬২	৩৯·৩২
করণপুরা	৬,২৫,৯১৪	২·২১
ডালটনগঞ্জ	৬৯৩	—
রাজমহল পাহাড়	১,৪৭৫	০·০১
বিহার ও বাঙ্গলা		
রাণীগঞ্জ	৮৬,৫০,৯২০	৩০·৫২
উড়িষ্যা		
রামপুর (রায়গড়-হিঙ্গির)	৪৪,৪২৫	০·১৬
মধ্যভারত		
সোহাগপুর	২,৬৩,৮৯৪	০·৯৩
উমারিয়া	৭২,৬৯৯	০·২৬
মধ্যপ্রদেশ		
বল্লারপুর	২,৭৯,৩৫৩	০·৯৮
পেঞ্চ উপত্যকা	১৩,৬৯,২০৮	৪·৮৩
সাপুর (বেতুল)	৫,২৮৮	০·০২
মোৎমল	৪,৭৭৭	০·০২
ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সী		
কোরিয়া	১০,১২,৮৫৮	৩·৫৮
রায়গড়	২,৬০০	০·০১
তালচির	৪,৪৮,২৩৫	১·৫৮
হায়দরাবাদ		
কোঠগুদাম	৯৫,২৪৮	০·৩৪
সস্তী	৯০,৭৮২	০·৩২
সিঙ্গারেণী	৬,৯০,৮৫০	২·৪৩
তন্দুর	৩,৩৪,২৮৩	১·১৮
মোট	২,৭৮,২৩,৯৫১	৯৮·১৭

(টার্শিয়ারী ক্ষেত্র)

	পরিমাণ টন	শতকরা অংশ
আসাম		
খাসী এবং জয়ন্তী পর্বত	১৬,৬৬০	০·৯৮
মাকুম ও লখিমপুর	২,৩২,৯০৪	
নাগা পর্বত	২৮,৭৬৪	
বালুচিস্থান		
খোষ্ট,	৭,১৬৫	০·০৮
সোররেঞ্জ, মাচ্, কালাট	১৪,৭১৭	
পঞ্জাব		
ঝিলম	৬৩,৮০৮	০·৬৫
মিয়ানওয়ালী	১,১১,৯২৫	
শাহপুর	৫,২৯৫	
রাজপুতানা		
বিকানীর	৩৪,৭১৭	০·১২
মোট	৫,১৮,৯৫৫	১·৮৩

পরিশিষ্ট (গ)

ভারতের খনি হইতে প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণ ১৮৩৯ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত কয়েকটী বিশিষ্ট বৎসরের পরিমাণ ও মূল্য

সাল	টন	সাল	টন
১৮৩৯	৩৬,০০০	১৮৮৬	১৩,৮৮,৪৮৭
১৮৫৮	২,২৩,১৪০	১৮৮৭	১৫,৬৪,০৫৩
১৮৫৯	৩,৪৭,২২৭	১৮৮৮	১৭,০৮,৯০৩
১৮৬০	৩,৭০,২০৬	১৮৮৯	১৯,৪৬,১৭২
১৮৬৮	৪,৯৭,০০০	১৮৯০	২১,৬৮,৫২১
১৮৭৮	১০,১৫,২১০	১৮৯১	২৩,২৮,৫৭৭
১৮৭৯	৯,২৪,৫৬২	১৮৯২	২৫,৩৬,৬৯৬
১৮৮০	১০,১৯,৭৯৩	১৮৯৩	২৫,৬২,০০১
১৮৮১	৯,৯৭,৭৩০	১৮৯৪	২৮,২৩,৯০৭
১৮৮২	১১,৩০,২৪২	১৮৯৫	৩৫,৪০,০১৯
১৮৮৩	১৩,১৫,৯৭৬	১৮৯৬	৩৮,৬৩,৬৯৮
১৮৮৪	১৩,৯৭,৮১৮	১৮৯৭	৪০,৬৬,২৯৪
১৮৮৫	১২,৯৪,২২১		

সাল	টন	মূল্য—টাকা
১৮৯৮	৪৬,০৮,১৯৬	১,৪৩,৫৭,৪৩৬
১৮৯৯	৫০,৯৩,২৬০	১,৫৯,৫৭,৩০১
১৯০০	৬১,১৮,৬৯২	২,০১,৪৬,২২২
১৯০১	৬৬,৩৫,৭২৭	১,৯৮,৫০,৫৮২
১৯০২	৭৪,২৪,৪০২	২,০৫,০৩,৬৩৯
১৯০৩	৭৪,৩৮,৩৮৬	১,৯৪,৯৫,৭৪১
১৯০৪	৮২,১৬,৭০৬	২,০৯,৮২,৪০৭
১৯০৫	৮৪,১৭,৭৩৯	২,১২,১১,৬৪৯
১৯০৬	৯৭,৮৩,২৫০	২,৮৬,৮০,৬৫১
১৯০৭	১,১১,৪৭,৩৩৯	৩,৯১,৪৫,৯০০
১৯০৮	১,২৭,৬৯,৬৩৫	৫,০৩,৪৩,১৬০
১৯০৯	১,১৮,৭০,০৬৪	৪,১৬ ৯৭,৯৮৫
১৯১০	১,২০,৪৭,৪১৩	৩,৬৮,৩৩,১৬২
১৯১১	১,২৭,১৫,৫৩৪	৩,৭৫,৩৯,২৩৪
১৯১২	১,৪৭,০৬,৩৩৯	৪,৯৬,৫৫,৪৬৯
১৯১৩	১,৬২,০৮,০০৯	৫,৬৯,৭২,০৫৫
১৯১৪	১,৬৪,৬৪,২৬৩	৫,৮৬,১০,৬৯৮
১৯১৫	১,৭১,০৩,৯৩২	৫,৬৭,১৫,৯৫৫
১৯১৬	১,৭২,৫৪,৩০৯	৫,৮১,৭৮,৪৫৯
১৯১৭	১,৮২,১২,৯১৮	৬,৭৬ ৭৪,৬৮১
১৯১৮	২,০৭,২২,৪৯৩	৯,০২,৫৮,২২৪
১৯১৯	২,২৩,২৮,০৩৭	১০,১১,৯২,৫৬৪
১৯২০	১,৭৯,৬২,২১৪	৯,২৯,৭৮,৫৩২
১৯২১	১,৯৩,০২,৯৪৭	১৩,০১,০০,৬৫২
১৯২২	১,৯০,১০,৮৯৬	১৪,৬৩,৩০,১৪২
১৯২৩	১,৯৬,৫৬,৮৮৩	১৪,৬০,৫৯,৭৪৭
১৯২৪	২,১১,৭৪,২৮৪	১৪,৯৬,৫৩,৪১৯
১৯২৫	২,০৯,০৪,৩৭৭	১২,৬৪,০০ ৯০৮
১৯২৬	২,০৯,৯৯,১৬৭	১০,১৪,৯৯,৬৬৪
১৯২৭	২,২০,৮২,৩৩৬	৯,৪৮,৭০,০১৩
১৯২৮	২,২৫,৪২,৮৭২	৮,৮৪,৯৫,০২৭

সাল	টন	মূল্য—টাকা	সাল	টন	মূল্য—টাকা
১৯২৯	২,৩৪,১৮,৭৩৪	৮,৯৩,৫৯,১২৪	১৯৩৫	২,৩০,১৬,৬৯৫	৬,৫২,২০,৮৫০
১৯৩০	২,৩৮,০৩,০৪৮	৯,২৬,২৫,৩২৩	১৯৩৬	২,২৬,১০,৮২১	৬,৭৪,৯৮,৪০৪
১৯৩১	২,১৭,১৬,৪৩৫	৮,২৬,৯৮,৩৪৪	১৯৩৭	২,৫০,৩৬,৩৮৬	৭,৮১,০২,৫৩৯
১৯৩২	২,০১,৫৩,৩৮৭	৬,৮০,৯১,৮০৪	১৯৩৮	২,৮৩,৪২,৯০৬	১০,৩৪,২৩,৮৩৫
১৯৩৩	১,৯৭,৮৯,১৬৩	৬,১১,৭৭,৭৩৯	১৯৩৯	২,৪৬,৬৩,০০০	৮,৬৯,৬২,০০০
১৯৩৪	২,২০,৫৭,৪৭৭	৬,৩০,৬০,৯৫২			

(ক্রমশঃ)

শিশি

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

ছোট্ট একটা শিশি! লাল অক্ষরে বড় বড় ক'রে লেখা একটা লেবেল তার গায়ে আটকান—"বিষ"। আর তার তলায় ইংরাজীতে লেখা—"Poison".

মীনা লাফিয়ে উঠ্‌ল আনন্দে। ঠিক হয়েছে! এতক্ষণ ধ'রে সে যা চাচ্ছিল তাই পেয়েছে হাতের কাছে। এইবার সে দেখে নেবে তার মাকে! তাকে ওইভাবে তার বন্ধু সুমি'র সামনে যা নয় তাই ব'লে বকুনী দেওয়ার মজাটা ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দেবে এবার। কী এমন দোষ করেছিলো সে—যার জন্যে অতগুলো কথা তিনি তাকে শোনালেন? স্কুল থেকে ফিরতে না হয় একটু দেরীই হয়েছে একদিন! রোজ তো আর হয় না!

মীনা এগিয়ে গেল শিশিটার দিকে। হাতে নিয়ে চমকে উঠল একবার! শেষ···আজই তার জীবনের শেষ দিন। নাঃ, নাঃ, দরকার নেই। মা হয় তো কালই আবার আদর ক'রে বলবেন, "মীনা মা, চুলগুলো একটু নেড়ে দাও না। দুটো পয়সা দোব বিকেলে।" মা-টা যেন কি! একটুও বুদ্ধি হ'লো না এতদিনে। এখনও সে যেন সেই ছোট্ট মীনাই আছে! তাকে সত্যিই ভালবাসেন তার মা। সেই সেবার যখন সে মামার বাড়ী গিয়েছিলো একা, কী কান্নাই কেঁদেছিলেন তিনি। বাধ্য হয়েই চলে আসতে হয়েছিলো মীনাকে। কিন্তু তাই ব'লে সুমির সামনে ওইভাবে অপমান ক'রতে গেলেন কেন? কাল সে স্কুলে মুখ দেখাবে কী ক'রে?

ঠিক আছে! বিষই সে খাবে। পৃথিবীর সমস্ত মা'দের বুঝিয়ে দিয়ে যাবে যে মেয়েদের অপমান করবার কোন অধিকার তাঁদের নেই।

একটা প্রতিহিংসা-উল্লাসে চক্‌ চক্‌ ক'রে শিশির তরল পদার্থটাকে গলাধঃকরণ ক'রে ফেল্‌লে।

ব্যস এখন একখানা চিঠি লিখে রেখে শুয়ে পড়া। তারপর কাল সকালে এই ঘর লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যাবে। আর তার মা? বেচারী অনুশোচনায় ভেঙে পড়বেন। ঠিক হয়েছে! তার জীবনকে এর চেয়ে বেশী সার্থক সে কোনদিনই ক'রতে পারত না। মরতে তো একদিন হ'তোই! কিন্তু আজকের মত আনন্দে হয় তো কোনদিনই মরতে পেতো না। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা ওর মনে প'ড়ল, "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম-সমান।"

এই তো গলা যেন বেশ জালা ক'রছে। তাহ'লে আরম্ভ হ'য়েছে বিষের ক্রিয়া! মনে মনে খুশী হলো মীনা।

ব'সে ব'সে সুদীর্ঘ একখানা চিঠি লিখ্‌লে তার মাকে। কত কথা, অজস্র ব্যথার কোয়ারা ফিনিক্‌ দিয়ে উঠ্‌লো ওর ভাষায়। তাঁর অক্ষম মেয়েকে ক্ষমা ক'রতে ব'ল্‌লে। ব'ল্‌লে, 'ভুলে যেও আমাকে'। ভুলতে তাকে তিনি কিছুতেই পারবেন না তা সে জানে। ওই কথাটা প'ড়ে তার মা নিশ্চয়ই কেঁদে উঠবেন ডাক ছেড়ে। অবস্থাটা কল্পনা ক'রে হেসে ফেল্‌লে মীনা।

বালিশের তলায় চিঠিটা রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে প'ড়লে সে।

সকালে ঘুম ভেঙে অবাক হ'য়ে গেল মীনা! একি! এ কোথায় এলো সে! মৃত্যুর পরেও সে তার ঘরে কেন? সেই খাটে শুয়ে! সেই টেবিল, চেয়ার, বইয়ের আলমারী সবই রয়েছে! তবে সে কী মরেনি? কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? অতখানি বিষ খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না!

"হ্যাঁরে মীনা তোর রকমখানা কি? রাত্তিরে খেলি না কিছু, শুয়ে প'ড়লি। আবার বেলা দুপুর হ'য়ে গেল ঘর থেকে বের হ'চ্ছিস্‌ না, অনশন ব্রত নিলি নাকি?" মার কথায় মীনা রেগে উঠল দারুণ। জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুলে সে।

—"ওঠ মা, রাগ ক'রে না। লক্ষীটি ওঠো।"

আহা! সোহাগ কত! মীনা একটু সরে শুলো।

মা হঠাৎ তাকের উপর থেকে সেই ছোট্ট শিশিটা তুলে নিয়ে বললেন,—"হ্যাঁ মা মিনু, কাল যে এটাতে মধু ভর্ত্তি ক'রে রাখলাম কি হ'লো?"

রাগে দুঃখে মীনার চোখে জল এলো। বিষ ব'লে সে অমৃত খেয়েছে! এই বিষের শিশি ছাড়া মধু রাখার আর জায়গা ছিল না বাড়ীতে? ষড়যন্ত্র! এ সব তার মার ষড়যন্ত্র! কি ঠকানই ঠকাল তাকে ওই শিশিটা! বিশ্বাসঘাতক শিশিটাকে আছড়ে ভেঙে ফেল্‌লে মীনা।

বিশ্ব-নিন্দুক

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আশ্চর্য্য! বিশ্ব-নিন্দুক ইন্দু-ভূষণ জাহ্নবী-তীরে কাশীর পবিত্রতা নষ্ট করছে।

আর আশ্চর্য্য হলাম তার সাঙ্গোপাঙ্গ দেখে। সে দশাশ্বমেধ ঘাটের চাতালে বোসে শ্রীমদ্ভাগবদগীতা ব্যাখ্যা করছিল। তাকে ঘিরে কতকগুলি বৃদ্ধ তার বচন-সুধায় আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি করছিল। আমার সংস্কৃত জ্ঞান নিবিড় নয়। ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে শুনলাম। সত্য কথা স্বীকার করতে হবে—সে ব্যাখ্যা আমিও বুঝতে পারছিলাম। স্বভাব যা' হ'ক, লোকটা শিক্ষিত।

কিন্তু কী ভণ্ডামী! ইন্দুভূষণ মানুষ মাত্রকে ঘৃণা করতো। মাত্র ঘৃণা করতো না। প্রত্যেক লোকের এক একটা জানোয়ারের নাম দিত। সে সুখে থাকতো পশুশালায়। ভগবান তাকে হাসবার ক্ষমতা দেননি তবু কেবল সেখানে তার মুখে হাসির মতো একটা ভাব ফুটতো। আমি পাঁচ ছ'বার তাকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় দেখেছি। কলেজের ইন্দুভূষণ চিড়িয়াখানার ইন্দুভূষণ হ'তে স্বতন্ত্র জীব। তার নাকের ডগা সদাই স্ফীত আর সঙ্কুচিত হ'ত জীয়ানো কই মাছের মত।

এক দিনের ঘটনা মনে পড়লো। এক বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি বৈজ্ঞানিক আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। শান্ত মূর্ত্তি, মিষ্টভাষী, পণ্ডিত—সকল ছাত্রকে মধুর আপ্যায়নে তুষ্ট করলেন। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই অভিভূত। তাঁ'র সুখ্যাতিতে শিক্ষালয় মুখর হ'ল। তাঁর সম্মানে পরদিন কলেজ হ'ল বন্ধ।

ছুটির দিন আমরা তিন জন বন্ধুতে মিলে গেলাম চিড়িয়াখানা। কেঙ্গেরুর খাঁচার বাহিরে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-নিন্দুক ইন্দু তাদের চীনা বাদাম খাওয়াচ্ছিল। বন্ধু পরেশ বল্লে—রতনে রতন চেনে।

নরেশ বল্লে—ওকে ডাক্তার জনের কথা জিজ্ঞাসা কর না। অন্ততঃ তার নিন্দা করবে না।

আমরা বিরক্ত হ'লাম যখন সে আমাদের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বল্লে—লোকটা কাঠ-বিড়ালী।

নরেশ বল্লে—তুমি খ্যাঁক-শেয়ালী।

অবিচলিত ভাবে সে বল্লে—খ্যাঁক-শেয়ালী প্রফেসার মিত্র।

প্রফেসার মিত্র সদাশিব মানুষ। প্রত্যেক ছাত্রের তিনি বন্ধু। নরেশ হাত তুললে তাকে মারতে। ইন্দু ছুটে পালিয়ে গেল।

পরেশ চেঁচিয়ে বল্লে—কুকুর।

এমন লোক পবিত্র বারাণসীর ঘাটে ব'সে গীতা পাঠ করছে, এটা হিন্দু-ধর্ম্মের অবনতির চরম সীমা।

আরও বিস্ময়, বাসায় ফেরবার পথে সেই দিন সন্ধ্যায় গোধূলিয়ার মোড়ে সাক্ষাৎ পেলাম পরেশ সেনের।

—আরে ভোঁদড় যে?

—হালো কাঠ-ঠোকরা!

ভোঁদড় বা কাঠ-ঠোকরা আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা বা পিসিমা দত্ত আদরের নাম নয়; যদিও সাধারণতঃ এমন সব নাম আবিষ্কার করে ওঁদের স্নেহ। একজন অন্তের শত্রু সেজে গায়ে হাত বুলালে বিশ্ব-নিন্দুক শত্রুপক্ষের নামকরণ কর্ত্তা। চার বৎসর কলেজে কেহ তার মুখে হাসি দেখেনি। প্রতি বৎসর সে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করত। কিন্তু সাফল্যের সমাচার কেমন উদার উদাসীন ভাবে শুনতে হয়, স্বয়ং অর্জ্জুন সে সম্পর্কে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারত।

ভোঁদড় বল্লে—কাঠু মজার খবর শুনেছ, বিশ্ব-নিন্দুক এখানে কলেজের প্রফেসার।

আমি আবার বিস্মিত হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইন্দু জীব-তত্ত্বের অধ্যাপক কিনা। কারণ সে একটা নূতন সম্বন্ধ সূত্র আবিষ্কার করেছিল—নরে এবং ইতরে। তার নূতন-তত্ত্বকে নরেতর বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

পরেশের কথা-বার্ত্তা স্পষ্ট এবং ভাষা প্রবল।

সে বল্লে—বাবিস্! ও সব নয়। বিশু অর্থাৎ বিশ্ব-নিন্দুক দর্শনের অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায়, তর্করত্ন, ন্যায়াচার্য্য প্রভৃতির দেশে।

অবশ্য বিশ্ব-নিন্দুক ফিলজফিতে প্রথম স্থান পেয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায়।

সে গীতা-ব্যাখ্যা করবার অধিকারী, অর্থাৎ গীতার ভাষায়। যার অন্তর শুষ্ক সে গীতার মূল-শিক্ষা, মানুষের দেবত্ব বোঝাবার কোনো অধিকার দাবী করতে পারে না।

ভোঁদড় বল্লে—বিকাশ আসল কথা বলিনি। আমি সেদিন আড়াল থেকে তার গীতার ব্যাখ্যা শুনলাম। সে লোককে শেখাচ্ছিল—যে সর্ব্বত্র আমাকে দেখে আর সকলের মাঝে আমাকে দেখে, তার বিনাশ নাই।

বাক্য! বাক্য! বাক্য! দুনিয়াটা কথার বেড়াজাল! মানুষের ভাবে ও ভাষায় কোনো ঐক্য নাই।

(২)

পরদিন জাহ্নবীতে স্নান করবার সময় পরেশ বল্লে—বিকাশ, আমার নাম কেন ভোঁদড় হ'ল মনে আছে?

—খুব আছে।

সেদিন সন্তরণ প্রতিযোগিতা হ'বে কলেজ স্কোয়ারে। হ্যারিসন রোডের মোড়ে সাক্ষাৎ পেলাম ইন্দুভূষণের। তাকে আহ্বান করলাম সাঁতার দেখতে যাবার জন্য। আমাদের মধ্যে একজন প্রতিযোগী আছে, সে সংবাদ তাকে দিলাম।

সে বল্লে—কে? পরেশ সেন? ও ভোঁদড়। ও জিতবে।

—তুমি তা'হলে জান সেও সাঁতার কাটে।

—মোটেই না। মানুষ দেখলে বোঝা যায় না? ও সাঁতার কাটে, মাছ খায় দারুণ, এ কথা বোঝা কি শক্ত?

এই ছিল তার নাম-করণের বিশেষত্ব। লোকটা পিশাচ-সিদ্ধ কি ঐ রকম একটা কিছু। মানুষ দেখলেই বলে দিত তার স্বভাব।

আমরা স্নান ক'রে ফেরবার সময় প্রফেসর ইন্দু চৌধুরীর সাক্ষাৎ পেলাম বিশ্বনাথ-গলিতে।

নিরাম, নির্ব্বিকার ভাবে সে শুনলে যে আমি দিল্লীতে কাজ করি, পরেশ ওকালতি করে কৃষ্ণনগরে। বিশ্বনাথ গলির দোকান পশার লোকজন সবার আলোচনা হ'ল। দেশের কথা, হাসির কথা, তার নিজের কথকতার প্রসঙ্গ, কোনোটি তার শ্রীমুখে হাসি ফোটাতে পারলে না। অপরূপ সংযম বা পশুত্ব। যে সকল মানুষকে পশু ভাবে, মানুষের বিশিষ্ট সম্পদ, হাসবার শক্তি হ'তে সে বঞ্চিত। ব্যাপারটা পুলিসের চোর-ধরা সিপাহীর চুরি করার মত।

এই সময় গলিতে একটা উত্তেজনার সূচনা হ'ল। এক শোভাযাত্রা আসছিল বিশ্বনাথের মন্দির হ'তে। এক বাঙালী সাধু, গলায় বহু ফুলের মালা, হাস্য-মুখ। ভদ্রলোককে ঘিরে শোভাযাত্রা। দলে ছিল বহু বাঙালী ভদ্র-সন্তান এবং কতিপয় মহিলা। আমরা পথের ধারে সরে দাঁড়ালাম। সাধু আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমরা হেঁট-মুণ্ড হয়ে প্রণাম করলাম। কিন্তু প্রফেসার ইন্দুভূষণ চৌধুরীর সেই এক ভাব। তার নাকের প্রবেশ পথ বিস্ফারিত এবং সঙ্কুচিত হ'ল, চক্ষু হ'ল আবেগ-বিহীন।

ভিড় কমবার পর বিশ্ব-নিন্দুককে সাধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অপরিচিত। বারাণসী সাধুদের স্থান, কত আসে কত যায়।

পরেশ বল্লে—উনি কী জানোয়ার?

প্রশান্ত ইন্দু বল্লে—ঘোঁড়া।

আমি বিরক্তি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

—ছোলা খায়। সম্মুখে পেশানীতে হাত বুলালে অনেক কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু ভয় পেলে পিছনে চাট ছোড়ে। আর—

পরেশ বল্লে—বাস্ করো। এত শিক্ষা, এত দর্শন তোমাকে জানোয়ারের ঊর্দ্ধে তুলতে পারেনি। কাঠ-ঠোক্‌রা এসো।

সে আমাদের দু'জনের হাত ধরলে। জীবনে প্রথম দেখলাম তার ভাবান্তর। সে বল্লে—সব জানি। সব বুঝি। কিন্তু আমারও বলবার আছে। শুন্‌তে হবে।

পরেশ বল্লে—জীবনে মাত্র অবশিষ্ট ক'টা বছরের আধ ঘণ্টার নষ্ট করতে চাহি না।

সে বল্লে—দশ মিনিট।

ভোঁদড় সম্মত হ'ল।

পথে একটা ঘটনা আমাদের বিস্মিত ও ভীত করলে। সেই বাঙালী সাধু এবং তাঁর শিষ্যর দলের আবার সাক্ষাৎ পেলাম বড় রাস্তায়। একটা পথের কুকুর ছুটে পথ পার হবার সময় সাধুর পিছনে যেমন পৌঁছিল, মহাপুরুষ তাকে পিছন পায়ে এমন এক পদাঘাত করলেন যে কুকুরটা পাঁচ হাত ঠিক্‌রে পড়লো পশ্চাতে। তার কাতর কণ্ঠ মুখরিত করলে পুণ্য-ভূমির এই অংশ। কী নিষ্ঠুরতা!

পরেশ বল্লে—প্রভু বোধ হয়, নামে রুচি জীবে দয়া প্রচার করবেন।

—তা জানি না। কিন্তু ইন্দু মানুষ চেনে। আর তার সংস্পর্শে এসে তোমার নৈতিক অবনতি ঘটেছে। সাধু-নিন্দা অবৈধ। ভয়ে সকল মানুষের স্নায়ু মনের অগোচরে হাত পা নাড়ায়।

পরেশ বল্লে—অনেকে চাট না ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। অস্পৃশ্যকে পদাঘাত তার পর হাসি!

(৩)

ক্ষুদ্র তরণী। শান্ত গঙ্গা। ধীরে ধীরে পট পরিবর্ত্তন হচ্ছিল। ঘাটের পর ঘাট। সৌধের পর সৌধ। নরনারীর জনতা। হৈ চৈ বম্ বম্ শব্দ।

কিশোরের মধুর দিনগুলাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল নৌকার সঙ্গ। আমরা তিনজনে সে দিনের বহু সহরের কথা আলোচনা করলাম। ইংরাজের বিশাল জগৎ। কোনো ইংরাজের সহপাঠীদের সন্ধান করতে গেলে সারা ভূ-মণ্ডল ঘুরে বেড়াতে হয়। বাঙালীর দু-পুরুষ ছাত্র খুজে পাওয়া যায় কয়েকটা সরকারী ও বে-সরকারী দপ্তরে, হাসপাতালে, কাছারিতে আর শিক্ষায়তনে। আজকাল শ্রম-শিল্পের উন্নতির ধাপ্পাবাজীর ফলে জনকতক কারাগারে বাস করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য।

নৌকা যখন মণিকর্ণিকা ঘাটের কাছে, বোধ হয় দুটো জলন্ত চিতা ইন্দুর শ্মশান প্রাণে নূতন বৈরাগ্য আনলে। সে বল্লে—শুনবে?

পরেশ বল্লে—আমি কেন ভোঁদড়, বিকাশ কেন কাঠ-ঠোকরা?

সে বাধা দিয়ে বল্লে—না না ওসব না। আমার সাফাই। আমি কেন মানুষের নিন্দা করি—মানুষকে মানে—

—ঘৃণা করি?

—হ্যাঁ ঘৃণাই করি। সত্য ঘৃণা করি। আত্মার কথা জানি। উপনিষদ পড়ি। মনের সঙ্গে দ্বন্দ করি। কিন্তু তবুও। কেন জানো—অভিব্যক্তিবাদ সত্য। সে সত্য সৃষ্টির মূলে।

আমি বল্লাম—মানুষের সেইটাই তো গৌরবের কথা। হয়তো সে ছিল একদিন কুচো-চিংড়ি কিম্বা তাদের খাদক ভোঁদড়। আজ সে যে মানুষ—শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, প্রভু যীশুর জাতি।

সে বল্লে—কিন্তু তার মাঝে যে পশু লুকানো আছে। সে যে জগীস্ খাঁ, খুনে বনমালী, রঘু ডাকাতের জাত।

পরেশ বল্লে—তাদের মাঝেও যে দেবত্ব আছে। আমি ওকালতী করি। ফাঁসি যাবার পূর্ব্বে খুনে বনমালী তার শিশুর জন্য পবিত্র অশ্রুজল ফেলে মাচায় ওঠে। ডাকাত রত্নাকরের অন্তরাত্মার কবিতা—মা' নিষাদ—বাল্মিকীকে আদি কবি করেছে।

সে বল্লে—সব বুঝি। কিন্তু ভেষ্টিজিয়াল কাকে বলে জানো। মানুষের দেহে জানোয়ার অবস্থার চিহ্ন রয়ে গেছে এই সব বিলয়নশীল অঙ্গে। যেমন কানের তিন কোনা অংশ। এ সবে মানুষের প্রয়োজন নাই। তারা অভিব্যক্তির প্রমাণ।

আমি বল্লাম—হ'লেই বা। মানুষ হাসে। চলন্ত ট্রেণের মুখ থেকে ছেলে টেনে বার করে, ভূমিকম্পের সময় সন্তানকে আচ্ছাদন ক'রে, জননী বাড়ী চাপা পড়ে—বাঘছাগল কি তা পারে?

সে বল্লে—হয়তো সন্তানের জন্য পারে। যোবনী চিল দেখলে—যাক্ সে সব কথা। আমার কথা বলি। আমি জানোয়ার!

কলুষনাশিনী জাহ্নবী। গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে কথা বল্লে

মানুষ যখন সত্য বলে, গলায় বুকে সত্য আপনিই ক্ষরণ হয় মানুষের অন্তরাত্মা হতে।

তার পর সে প্রমাণ দিলে। আরে! কুকুরের যেমন কান নড়ে তার কান তেমনি নাড়ালে। কী কাণ্ড! এতোদিন তো এ ব্যাপার দেখিনি।

প্রফেসার রায় বল্লে—এটা ভেষ্টিজিয়াল বিলয়নশীল শক্তি। নিতান্ত পশুর উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। এতো একটা মাত্র নিরর্থক বাহিরের অঙ্গ। মানুষের মাঝে এমন বহু অঙ্গ—বিশেষ গ্রন্থি আছে যাদের সবার সন্ধান বিজ্ঞান রাখেনা। তারা কতক মাত্রায় মানুষের অজ্ঞাতে তার কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ আমাদের হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা এই সব গ্রন্থি ক্ষরণের ফল।

আমি বল্লাম—কথাটা মোটামোটি বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয় এইটাই আমাদের মনুষ্য প্রীতির বুনিয়াদ হওয়া উচিত। পশু ভাবকে নিত্য পরাজিত ক'রে যে মানবতা ফুটিয়ে তুলছে—প্রেম, দয়া, কৃতজ্ঞতা।

সে বল্লে—আমি সে দিক থেকে দেখতে পারিনা। তুমি অনুমান ক'রে মানুষের ওপর দরদ করবে। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট-তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি।

—প্রত্যক্ষ কর? অর্থাৎ পরেশের এমন চাঁদের মত মুখটাকে দেখ ভোঁদড়ের মুখ।

—দেখি না। আঘ্রাণ করি।

আমরা সমস্বরে বল্লাম—শোঁকো? আঘ্রাণ কর?

প্রফেসার আবার বোঝালে। কতকগুলা গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ ক্ষরণ হয়। গন্ধবাহী পদার্থ সেটা। প্রত্যেক জীবের বিশেষ গন্ধ এই গন্ধগ্রন্থিগুলার জন্য। বাঘের গন্ধ—

আমি বল্লাম—বাঘের গন্ধ বা মাছের গন্ধ আমরাও পাই। কিন্তু মানুষের গন্ধ তো পায় গল্পের ভূতেরা—হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ।

সে বল্লে—প্রত্যেক মানুষের মাঝে তার প্রকৃতির অনুরূপ জানোয়ারের গন্ধ আছে আমি পাই। তোমরা পাও না। সেদিন সাধু যেমনি আমার কাছে এলো, আমি ঘোড়ার গন্ধ পেলাম। একটি লোক চলে গেল তার গায়ে বাঘের গন্ধ। রাগ ক'র না। আমি কুকুর তাই গন্ধ পাই। ভাই ক্ষমা কর আমার দুর্ব্বলতা। আমার পশু সংস্কার পশু চিনে বার করে।

তাই পশু-সংস্কার আমাকে কাঠ-ঠোক্‌রা এবং পরেশকে ভোঁদড় বোলে চিনেছে! হা হরি!

লজ্জায় পরেশের মাথা হেঁট হল। আমার গর্ব্ব মলিন হল। ছিঃ! ছিঃ! কী লজ্জার কথা। ওর গায় মেছো ভোঁদড়ের গন্ধ। আমার জবা-কুসুম তেল মাখা গায়ে কাঠ-ঠোক্‌রা পাখীর চামসে গন্ধ! হাঃ বাবা বিশ্বনাথ।

লজ্জাটা স্থানচ্যুত হয়ে আমাদেরই ওপর পড়লো। সে নিজেও সরম-বিহ্বল হল। একজন সাধুর গায়ে অশ্ব গন্ধ, বৈজ্ঞানিকের অঙ্গে ধ্যাঁক-শেয়ালীর অসৌরভ, ইত্যাদি, ইত্যাদি প্রথম পরিচয়ে পেলে, মানুষ সরাসরি জীবাত্মা, ঈশ্বরের প্রতীক, মানুষ সত্য, এসব বই পড়া কথা ভাবতে পারে না। আমাদের হৃদ্য সহানুভূতি তার প্রতি জমাট ঘৃণাকে ধুয়ে দিচ্ছিল।

(৪)

ঠিক অহল্যা ঘাটের সম্মুখে তখন আমরা!

ওঃ মা!—এক ভীষণ চীৎকারে আমরা দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম।

সর্ব্বনাশ! একটা চার বছরের ছোট ছেলে চাতালের উপর হ'তে অকস্মাৎ গঙ্গায় পড়লো।

নিমেষের মধ্যে এক নারী লাফিয়ে পড়লো জলে। সে সন্তানকে ধরলে। কিন্তু মা জাহ্নবী মাতা ও শিশু উভয়কে উদরসাৎ করবার জন্য তাদের নাকানি-চোকানী খাওয়াচ্ছেন। মা বোধ হয় সন্তরণপটু নয়।

কী সর্ব্বনাশ। আমি যে সাঁতার জানি না। অথচ চোখের উপর এত বড় একটা বিপদ ঘটছে। আমার সারা প্রকৃতি আকুল হ'ল। বুকের রক্ত যেন জমাট বাঁধলো।

ঘাটের লোক সব হৈ চৈ করছে—কেহ চীৎকার করছে, কেহ বিহ্বল হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছে।

সবই নিমেষের কাজ। হটাৎ আমাদের নৌকা কেঁপে উঠলো। পরেশ সেন জলে পড়েছে। সাঁতারু পরেশ! কী সুন্দর মাংসপেশী। বাচ্‌খেলার ছিপের মত তার গতি। হাত পা সমান চলছে। মাতা আর পারে না। গণ্ডগোল বাড়লো। আমরা স্তম্ভিত। সত্যই লোকটা ভোঁদড়। আহা কী দক্ষ সাঁতারু পরেশ। এবার সে মহিলাকে ধরলে।

ওঃ মাঃ!

ছেলেটা মার হাত ফোস্‌কে গেল।

ঐ! ঐ! আঃ! হাঃ।

পরেশ ছেলেটাকে ধরলে। অন্য হাতে জননীর চুল ধরলে। নিজে চিত হল।

গণ্ডগোল খুব প্রবল হ'ল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে তিনজনে ঘাটে উঠ্‌লো।

আমরা তরী ভিড়িয়ে ঘাটে গেলাম। জনতার বুকের বোঝা নেমেছে। কিন্তু কৌতুক বেড়েছে। সবাই ছুটলো তাদের তিনজনের দিকে। একি! মানুষ তো সে! জয় বাবা বিশ্বনাথ। বিশ্ব-নিন্দুক ইন্দু জড়িয়ে ধরলে পরেশকে। চোখ বুজে বল্লে—আঃ! কী সুগন্ধ। দিব্যমাল্যাম্বরধরম্, দিব্যগন্ধানুলেপনম্, মানে বুঝলাম দিব্যগন্ধ-ভরা পৃথিবী। এতদিন কেন পাই নি? ওরে পরেশ! কি তোর গন্ধ! কি সুবাস!

যখন জননী এলো পরেশকে ধন্যবাদ দিতে—ইন্দু ব'লে—মা! মা! কী স্বর্গের সুরভি তোমার গায়ে। ছেলের জন্য প্রাণটা জলে ফেলেছিলি মা! আহা! নন্দন ফুলের কী সুবাস।

তারপর ইন্দু গদগদ কণ্ঠে বল্লে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ! নমস্তস্যৈ! নমস্তস্যৈ! নমোনমঃ।

রাত্রে ইন্দু বল্লে—ভাই কুকুরের শক্তিটা একেবারে লোপ পেয়েছে। আকস্মিক শোকে মূক বাচাল হয়। কিন্তু পরের শোকে পশুও যে মানুষ হয়। এখন মানুষের মধ্যে কেবল দেবতার গন্ধ পাচ্ছি।

আমি বল্লাম—তুমি যে বিশ্ব-নিন্দুক, ইন্দু নিন্দে ছেড়ে বাঁচবে কেমনে?

সে বল্লে—তোমাদের কুকুর বিশু মরেছে। এখন আমি বিশ্ব-ভাবক বিশ্ব-মানবের একজন।

গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন না—তাঁহার জীবন ঘটনা-বহুলও নয়। ১২১৮ বঙ্গাব্দের (১৮১২ খ্রীঃ) ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার কাঁচড়াপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হয়, ১২৬৫ সালের (১৮৫৯ খ্রীঃ) ১০ই মাঘ, শনিবার। কিন্তু, তবুও বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগ আনয়নের অগ্রদূত রূপে তিনি চিরদিনই স্মরণীয় থাকিবেন। কবিতার বিষয় নির্ব্বাচনে মৌলিকতা দেখাইয়া—নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, সামাজিক ও সাময়িক ঘটনা লইয়া সরস রচনার্ প্রবর্ত্তক হিসাবে, তিনি নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিস্থলে সেতুস্বরূপ বিরাজ করিয়া কবিতার আদর্শে আধুনিকতার প্রবাহ আনয়ন করিবার জন্য সাহিত্য-রসিকের সশ্রদ্ধ অভিবাদন লাভ করিবেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কেন লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া গেল? ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাঁহার রচনা-ভঙ্গী। তাঁহার রচনা শৈলী ব্যঙ্গ ও হাস্যরস প্রধান এবং অনেকটা অশ্লীলতা ঘেঁষা। সেইজন্য স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে তাঁহার কবিতার মূল্য বেশী নয়—কিন্তু রসপূর্ণ ছড়া রচয়িতা হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন স্মরণীয় থাকিবেন। সে যুগের অশ্লীলতা ও অত্যধিক অনুপ্রাসপ্রিয়তার জন্য, তাঁহার রচনা পরবর্ত্তীকালে শিক্ষিত সমাজ আদরের সহিত গ্রহণ করে নাই—স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনশক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও, তাঁহার অনুভূতি গভীর ছিল না—সেইজন্য তাঁহার রচনা সম-সাময়িক পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারিলেও, তাহা সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে নাই। গুপ্ত কবিকে ভুলিবার অপর কারণ—মাইকেল মধুসূদন। প্রাচীন ও নবীন যুগের প্রদোষকালে, ঈশ্বরচন্দ্র স্নিগ্ধ দীপহস্তে বিরাজ করিতেছিলেন; মধুসূদনের লোকোত্তর প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোকে তাহা অবিলম্বে লুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য মধুসূদন তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই—চতুর্দ্দশ পদাবলী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতায় তিনি গুপ্ত কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

তবুও একটা কথা ভুলিলে চলিবে না—তিনি খাঁটী বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচনায় খাঁটী বাঙ্গালী বুলি এবং বাঙ্গালা দেশের সমাজ ও চরিত্রের যে নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় তাহা নাই। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তিটি অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটী বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষ-পার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই।…সে জিনিষ একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে—জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে।…'

ঈশ্বরচন্দ্র কবি হইলেও, সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি ও কৃতিত্ব কম নয়। তাঁহার 'প্রভাকর' দেশ-প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র। বাঙ্গালা দেশে সংবাদপত্রের সেই প্রথম যুগে—একই সঙ্গে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন করা, তাঁহার বিপুল কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না—কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিভাবলে তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্রকে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশকালে তাহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া বাঙ্গালার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসাবে তিনি চিরকাল বাঙ্গালা সাংবাদিকগণের নমস্য থাকিবেন।

সংবাদ প্রভাকর ব্যতীত আরও কয়েকটী সাময়িক পত্র সম্পাদন করিলেও, সংবাদপ্রভাকরই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা ও কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রভাকর কেবল মাত্র অখ্যাত, বিত্তহীন ঈশ্বরচন্দ্রকে বিপুল গৌরবের অধিকারী করিয়া যশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে নাই—এই প্রভাকরেই পরবর্ত্তী যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শিক্ষানবিশী করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই দুইটাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার পরিচায়ক। প্রভাকরই বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল এবং ইহার আদর্শে বাঙ্গালা গদ্যের রীতি পরিচালিত হইত। কবিতার বিষয় নির্ব্বাচনে চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তিনি নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, অতি সাধারণ ও নগণ্য জিনিস, যাহা পূর্ব্বে কেহ কবিতার উপাদান রূপে কল্পনাও করিতে পারে নাই, তিনি তাহা লইয়াই সুন্দর সুন্দর সরস কবিতা রচনা করিতেন—উদাহরণ স্বরূপ 'পৌষপার্ব্বণ' ও 'পাঁটার' নাম করা যায়। পরবর্ত্তীকালে হেমচন্দ্র এই আদর্শে অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পথপ্রদর্শক—ঈশ্বরচন্দ্র।

ছাত্র ও নূতন লেখকদিগকে উৎসাহদান তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ছাত্রজীবনের অনেক লেখা প্রকাশিত হইত। বিশেষ করিয়া সংবাদ-সাধুরঞ্জনের বৈশিষ্ট্যই ছিল, ছাত্রদের রচনা প্রকাশ। এই প্রকারে উৎসাহ ও সাহায্যদান করিয়া তিনি বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যিক সাধনার পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য-সাধকদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি প্রাচীন বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনী প্রকাশ। এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, কবিওয়ালা ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ। তিনি এগারবার জনের জীবনী ও রচনা প্রকাশের বিবরণ নিজেই ১২৬১ সালের ১লা মাঘের প্রভাকরে দিয়াছেন। তাহার পরে তিনি আর চার বৎসর জীবিত ছিলেন, সে সময়েও কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন কবিদের সম্পর্কে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা না করিলে তাহাও জানিতে পারিতাম না। তাঁহার এই চেষ্টার মূলে ছিল, তাঁহার অসাধারণ স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে তিনি ভালবাসিতেন। সাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির প্রবর্ত্তকই তিনি। তাঁহার 'মাতৃভাষা' ও 'স্বদেশ' ইহার প্রমাণ। আর একটি নূতন জিনিসের প্রবর্ত্তন তিনি করেন—বাঙ্গালা নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠান। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ তিনি ইহার প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে কলিকাতা ও পল্লী অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগদান করিতেন। একবারের উৎসবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠানও কবির স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা দরকার। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে—'মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত অস্ফুট ভাবগুলিকে ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে তিনি জানিতেন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না।…তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।…তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি—তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি।…ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নাই। মূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দোষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা দরকার। তাঁহার কবিতায় মার্জ্জিত রুচির অভাব ছিল। অশ্লীলতা যেমন তাঁহার প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বর প্রিয়তাও তেমনি আর একটী উল্লেখযোগ্য দোষ। শব্দচ্ছটার ও অনুপ্রাস-যমকের ঘটায়, ভাবার্থ অনেক সময় লুপ্ত হইয়া যায়। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র এবং ইহা অনেকটা যুগ ধর্ম্মও বটে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্যতা অস্বীকার করা চলিবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের একটু নারী-বিদ্বেষ ছিল—তাঁহার কবিতায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

গুপ্ত কবির বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। এইবার মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলা আবশ্যক—কারণ তাঁহাকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে, ইহাও দরকার।

প্রভাকরের দৌলতে তিনি দেশের একজন গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিলাসী ছিলেন না—সর্ব্বদা সামান্য বেশে সাধারণ লোকের মত থাকিতেন, অর্থের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না—পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া, প্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। তাঁহার বাড়ীর দ্বার অবারিত ছিল—যে আসিত সেই আহার্য্য পাইত। বাল্যকালে উদ্ধত, অবাধ্য ও স্বাধীন প্রকৃতির থাকিলেও, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার সে সব চলিয়া যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন—মিষ্ট কথা, হাসির কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য ও ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর—তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। কপটতা, ছলনা বা চাতুরী তিনি জানিতেন না—শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে লেখাপড়া বিশেষ শিখেন নাই, পরবর্ত্তীকালে নিজের চেষ্টায় কিছু শিখিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার একটা প্রধান দুর্ব্বলতা। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিভাবলে এই দুর্ব্বলতাকে অনেকটা জয় করিয়াছিলেন। নতুবা, যদি তিনি তাঁহার সমসাময়িক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব আরও ব্যাপক হইত। তাঁহার প্রতিভা আরও শক্তিশালী হইয়া কালজয়ী হইত এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি আরও অগ্রসর হইয়া যাইত।

দর্পণ

শ্রীভবেশ দত্ত

সুসজ্জিত ঘর। চারপাশে সাজানো আলমারী—মেজেতে কার্পেট পাতা—মাঝখানে একটা বড় আয়না—তার মাথার উপরে দেওয়ালে ঝুলিতেছে একটা সাদা বাল্‌ব।

জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের নবমবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনারায়ণ সেই আয়নার সামনে একটা দামী চেয়ারে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছে। পশ্চাতে একটি শোফায় বসিয়া জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্ষু মুদিয়া কি যেন আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন।

চোখের সামনে ভাসিতেছে বায়স্কোপের মত ছবি।

লেঠেল্ সর্দ্দার এরফান্ দলবল লইয়া শঙ্খপুরে চাষী প্রজাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। গরীব চাষীরা হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিতেছে। সবাই নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শঙ্খপুরে আগুন জ্বলিতেছে। আগুনের লেলিহান শিখা উঠিতেছে—বহু উর্দ্ধে। আর তাহার মাঝখান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—গগনভেদী চীৎকার!

জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চিন্তা করিতেছেন, এখন ভালয় ভালয় লেঠেল্ সর্দ্দার ফিরিয়া আসিলেই হয়।

নরেন্দ্রনারায়ণ চুপ করিয়া কি যেন দেখিতেছে ঐ সাদা বাল্‌বের দিকে। বাল্‌বের চারপাশ ঘিরিয়া অসংখ্য ছোট ছোট পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে দেওয়ালে গিয়া বসিতেছে আর দুটো টিক্‌টিকি অবিরাম তাহাদের মনের আনন্দে গলাধঃকরণ করিতেছে!

নরেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া উঠিল—বাবা!

বীরেন্দ্রনারায়ণের চিন্তাসূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল!

বলিলেন—কি ব'লছ?

আমি রোজ দেখি ঐ টিক্‌টিকি দুটো পোকাগুলোকে খেয়ে ফেলে। আচ্ছা ঐ পোকাগুলোর কি দোষ?

জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন—নরেন্দ্র ঐ টিক্‌টিকি দুটোর গায়ে জোর বেশী তাই ঐ পোকাগুলোকে খায়।

গায়ে জোর আছে বোলে ঐ পোকাগুলোকে রোজ রোজ খাবে?

উচ্চ হাসি হাসিয়া বীরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—হ্যাঁ তাই খায়! দেখোনি—ছোট ছোট মাছগুলোকে ব্যাঙে খায়, আবার ব্যাঙকে খায় সাপ, আবার সাপকে খায় ময়ূর! ওসব এখন তুমি বুঝবে না—যখন জমিদার হ'বে তখন বুঝবে; নাও এখন পড়ো।

নরেন্দ্রনারায়ণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল—

ওকি উঠলে কেন, পড়বে না!

ঐ টিক্‌টিকি দুটোকে আমি গুলি কোরে মারবো—পোকাগুলো তাহলে বেঁচে যাবে!

নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার খেলার বন্দুক আনিয়া ঠিক টিক্‌টিকি দুটোর সোজা নলটা ধরিয়া ছুড়িতে যাইয়া হঠাৎ বন্দুক নামাইয়া ফেলিল।

—ওকি ছুড়লে না কেন?

বন্দুকের সামনে তোমাকে দেখলাম যে বাবা—

পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ।

ক্যাম্‌ব্রিজী বাংলা ও বাবু ইংলিশ

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা এম্‌-এ

গত কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষে "ক্যাম্‌ব্রিজী বাংলা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাল দেশী ভাষার অবনতি, ক্যাম্‌ব্রিজী স্কুলের প্রাধান্ত প্রমুখ বিষয়ে যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ক্যাম্‌ব্রিজী স্কুলসমূহ কি ভাবে দেশকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে লেখক সে সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে এই সকল স্কুলের প্রাধান্ত ও সর্ব্বনাশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে ইংরাজি সর্ব্বভারতীয় শিক্ষিত সমাজে সাধারণ ভাষা; দ্বিতীয়তঃ ইহা দেশের রাজভাষা; তৃতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরাজি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং ইংরাজি আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে উত্তম রূপে শিক্ষা করাই সঙ্গত। যথেষ্ট পরিমাণে সময় ও শ্রম দান করিয়া যদি শিখিবার বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারা যায় তবে উহা নিতান্ত ক্ষতির বিষয়। ক্যাম্‌ব্রিজী স্কুল সমূহে দেশী ভাষার কি দুর্গতি হয় লেখক তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহে ইংরাজি ভাষার কি দুর্গতি হয় লেখক কি তাহার অনুসন্ধান নিয়াছেন? বাঙ্গালী পরিচালিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের কয়টী ছাত্র ছাত্রী বিশুদ্ধ ইংরাজি বাক্য রচনা করিতে পারে তাহার হিসাব কেহ নিয়াছেন কি? পরীক্ষার উত্তর পত্রে ইংরাজি ভাষা নামধারী কাগজ পরীক্ষা যাঁহারা করেন ও করিয়াছেন এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, আই-এ, ও বি-এ, ক্লাশের ছাত্রদেরও ইংরাজি বিদ্যা কতদূর তাহাও প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া যে সকল ইংরাজি বাক্যবিন্যাস আজকালকার লেখনী হইতে নির্গত হয় উহাতে গৌরব বোধ করিতে পারি না। ইহা হইল লিখিত কাগজে ইংরাজির নমুনা। উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দও কতটুকু ইংরাজিতে কথোপকথন করিতে পারে? অথচ ছাত্রদিগকে এই ইংরাজি শিক্ষার জন্ম কম শ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইলেও ইংরাজির কদর কমাইয়া দিয়াছেন এমন মনে করিবার কারণ নাই। পক্ষান্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজি পেপারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনুমোদিত ও আকাঙ্ক্ষিত।

এদিকে তথাকথিত ক্যাম্‌ব্রিজী স্কুলে যাহারা শিক্ষা লাভ করে ইংরাজিতে তাহাদের ব্যুৎপত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। ইংরাজি ভাষায় দখল থাকার দরুণ ইহারা আই, সি, এস ইত্যাদি সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষায় তথাকথিত "দাঁও মারে"। কোন একটী বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ অপরাধের বিষয় নয়। মৌখিক পরীক্ষায় পাঁচশত মার্কে প্রায় পূর্ণ নম্বর লইয়া "ক্যাম্‌ব্রিজওয়ালারা" বাহির হইয়া আসে ইহাও তাহাদের অপরাধ নয়। এই সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অ-কেম্‌ব্রিজওয়ালাদের দাঁড় করাইবার কোন্ পন্থা আছে লেখক তাহার নির্দ্দেশ দেন নাই। আমাদের নিদারুণ অযোগ্যতা যে আমরা আমাদের নিতান্ত মেধাবী ছাত্রদিগকেও আমাদের পরিচালিত স্কুলসমূহে কেম্‌ব্রিজওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত করিয়া ইংরাজি শিখাইতে পারিতেছি না। "দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে" কেম্‌ব্রিজী স্কুলের প্রাধান্ত কেবা কাহারা দিতেছেন? যাহাদের পয়সা আছে ও তজ্জন্ত এই সব স্কুলে সন্তান-সন্ততিদিগকে পাঠাইয়া থাকেন তাঁহারাই—অথবা দেশের বিদ্যালয়সমূহের অযোগ্য শিক্ষাদান প্রণালী?

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেখানে যোগ্যতমের অবস্থিতি সেখানে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার জন্ত "অপমান সহিয়া" শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পয়সাওয়ালা অভিভাবকগণের পক্ষে ততটা দোষাবহ নহে, যতটা দোষাবহ জানিয়া শুনিয়া শিক্ষাপ্রণালীর কোনরূপ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করা। ইংরাজি স্কুলে দেশী ভাষায় দুর্গতি পরিতাপের বিষয়, কিন্তু বাঙ্গালা স্কুলে ইংরাজি ভাষার অবনতি বহু শ্রম ও সময়ের অপচয়কারক। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে বলিতে চাই বাঙ্গালী পরিচালিত স্কুলসমূহেও বাংলা ভাষাতেই ছাত্রদের কতটুকু ব্যুৎপত্তি লাভ হয় লেখক তাহার খোঁজ নিয়াছেন কি? বাংলা ভাষা দেশী স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যে পরিমাণে শিক্ষা করে ইংরাজি স্কুলে ইংরাজি ভাষা তাহা অপেক্ষা ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশী শিক্ষা করিয়া থাকে। ইয়োরোপীয় স্কুলসমূহে কর্ত্তৃপক্ষ দেশী ভাষা শিখাইবার সুযোগ দেন না। তাই তাহারা শিখে না। আমরা যথেষ্ট সময় দেই কিন্তু শিখাইতে পারি না।

সুতরাং কেম্‌ব্রিজওয়ালাদিগকে অযথা গালি দিয়া লাভ নাই। লেখক ডুন স্কুলে যে ব্যতিক্রম দেখিয়াছেন সেই ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে সেই সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে সেখানে ছেলেরা ইংরেজী ভাষাই শিখে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি ঘৃণা শেখে না। ইংরেজি যখন শিখিতেই হইবে তখন কি ভাবে দেশীয় পরিচালিত স্কুলে ছাত্রদিগকে ব্যুৎপন্ন করা যায় তাহাও ভাবিতে হইবে। ডুন স্কুল সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তবে স্বাভাবিক জ্ঞান হইতে বুঝিতে পারি ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা সেখানে সম্ভব হইয়াছে সেই সব শিক্ষকদের নিকট হইতে শিক্ষার সুযোগ লাভ করায়—যাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজি। লেখক বলিয়াছেন সেখানে এমন একটী স্বাভাবিক আবহাওয়া আছে যাহাতে ছেলেরা ইংরাজি ভাষাই শিখে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি ঘৃণা শিখে না। কি উপায়ে দেশের ছেলেদের ঐ ভাবে কেবল ইংরেজি ভাষাই শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং কুফল পরিহার করা যাইতে পারে তাহারও নির্দ্দেশ তিনি দেন নাই।

বাংলা দেশের সমুদয় উচ্চইংরাজি স্কুলগুলির কথা বাদই দেওয়া যাক্। কেবল কলিকাতার যতগুলি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় রহিয়াছে সজ্ঞবদ্ধ ভাবে উহাতে বাংলা ভাষার সহিত ইংরাজি ভাষারও ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা জন্মাইবার চেষ্টা কি হইতে পারে না? আমাদের মনে হয় লোয়ার ক্লাশ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণী সমূহে ও শিশুশ্রেণী সমূহে যাহাদের মাতৃ-ভাষা ইংরাজি এইরূপ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা ইংরাজি ভাষা শেখান উচিত। যে ভাষাতে যতই ব্যুৎপত্তি থাকুক না কেন, যাহা মাতৃ-ভাষা নয় তাহা শিখাইবার মত যোগ্যতা যোগ্যতম শিক্ষকেরও থাকিতে পারে না। ব্যতিক্রম থাকিতে পারে কিন্তু তাহা সহজ ও স্বাভাবিক নহে। সব বিভাগেই অভারতীয় পোষণ চলিতে পারিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার উপকারের জন্ত এই ব্যবস্থা দোষাবহ নহে। ইহাতে ডুন স্কুলের মত স্বাভাবিক আবহাওয়ার মত দেশের ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজি ভাষাই শিখিবে। দেশের প্রতি ঘৃণা শিখিবে না। সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় স্থান লইয়া দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও দেশের হাত থাকিবে। এই সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য এই যে শিশুশ্রেণীসমূহ ও নিম্নশ্রেণীতে ইংরাজের নিকট ইংরাজি শিখাইবার পর মধ্যের কয়েকটী শ্রেণীতে দেশীয় শিক্ষকদের নিকট শিখিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীগুলিতেও ঐরূপ ব্যবস্থা থাকা ভাল।

ক্যাম্‌ব্রিজি বাংলার মত বাবু ইংলিশও বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা শিখিতে হইবে, তাহাকে পরিহার করিলে চলিবে না—তাহা ভালভাবেই শেখা উচিত।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

গোপীনাথপুরের রায়েরা এককালে তিন তিনটে পরগণার মালিক ছিলেন। তার পরে হ'য়ে পড়লো অনেক সরিক। সকলেই গিয়ে কলিকাতায় নীড় বাঁধলেন—বিলাসিতার স্রোতে গা ঢেলে দিলেন—জমিদারী লাটে উঠ্‌লো, মাড়োয়ারী জমিদার হ'লো। সেই রায়বংশে একজন শুধু দেশ ছাড়েননি, নাম তাঁর জানকীবল্লভ রায়। দেশের ভিটে আঁক্‌ড়ে ধরে ছিলেন। তাঁর জমিদারীর অংশ এক আনা তিন গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হলেও তাঁর দাপটের কাছে মাড়োয়ারী হার মেনে সন্ধি করলো। বাটোয়ারা করে জানকীবল্লভ তাঁর অংশ আলাদা ক'রে নিলেন; সবাই বললে, হাঁ মানুষ বটে জানকী রায়—বাপ পিতামহের নাম রাখলে।

সারা যৌবন জানকীবল্লভ নিষ্ঠার সঙ্গে শুধুঁ মামলা মোকদ্দমাই চালিয়ে এসেছেন, সাধ্বী স্ত্রী মহামায়ার সঙ্গে প্রেমালাপ করিবার অবকাশ পান নি। যখন তিনি সুদিনের মুখদেখ্‌লেন সেই ক্ষণে সাধ্বী মহামায়া এক সোনার চাঁদ পুত্র প্রসব ক'রে স্বর্গে প্রস্থান করলেন। জানকী রায় তাতে নিরুৎসাহ না হয়ে সাগ্রহে বরণ করলেন শিশু পুত্রের পালন-ব্রত। সংসারে পরিজনের অভাব ছিল না, অভাব ছিল দরদী পরিজনের। বিধবা ভগ্নী হরমণি ভাইকে দ্বিতীয় সংসারের পরামর্শ দিয়েছিলেন; তা'তে জানকীবল্লভ উত্তর দিয়েছিলেন, "দিদি তুমি কি বলছো, একবার সংসার ক'রে তাকে জীবনে সুখী করতে পারলুম না, দ্বিতীয়বার সংসার করে রেখে যেতে বলো একটা বিধবা, আর আমার এই শিশু পুত্র যাক্ ভেসে।" তিনি কারো কথায় কর্ণপাত না ক'রে একাধারে হলেন বালকের পিতা, মাতা। তাঁর আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষায় পুত্র রতন হ'লো সত্যিই রত্নের আকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটার পর একটা পরীক্ষায় সে হলো প্রথম, আর জানকীবল্লভ হলেন গৌরবান্বিত, সার্থক হ'লো তাঁর একনিষ্ঠ শিক্ষার দান। সকলেই বললে, ছেলেকে বিলেত পাঠাও, হয়ে আসুক আই, সি, এস। জানকীবল্লভ হেসে বলেন, "কতদিনে যাবে তোমাদের এই দাস-মনোভাব?" আমি ছেলেকে করতে চাই দেশের ও দশের সেবক। একদিন বাংলার ভূস্বামিরাই দিয়েছিল বাংলার নব-রূপ, তাঁদের অর্থেই গড়ে উঠেছিল বিদ্যা-মন্দির, হাসপাতাল, আরো কত শিল্প প্রতিষ্ঠান। অতীতের সে আদর্শ ভ্রষ্ট হ'য়েই আমরা আজ হয়েছি ঘৃণ্য, রচিত হ'য়েছে আইনের নিগড় আমাদের দমন করতে। আমাদের যা কিছু দুষ্টক্ষত ধৌত ক'রে তাতে শান্তি মলম প্রলেপ করে রচনা করতে হ'বে সুসংস্কৃত—কৌলিক আভিজাত্য, সঞ্জীবিত করতে হ'বে নবযুগের পরিপন্থী দেশাত্মবোধ—জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে প্রজা পালন—প্রজাপীড়ন নহে। "কুলপুরোহিত স্মৃতিরত্ন মশায় বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে জানকীবল্লভের দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে বলেন, "বাবা জানকী, তুমি সত্যি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, তোমার সদিচ্ছা কার্যকরী হলে অভিশপ্ত জমিদারশ্রেণী পাবে আবার ভগবৎকৃপা, ভেসে উঠ্‌বে আবার ডুবো নৌকা মণিমাণিক্য সম্ভার লয়ে। জানো বাবা, তোমাদের এই ভগ্ন ঠাণ্ডা গারদ কত অসহায় নিরীহ প্রজার দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপ বুকে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে?" জানকীবল্লভ ম্লান হেসে উত্তর করলেন, "আমি চাই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নবীন জীবন সঞ্চার করতে—ছেলে আমার সিভিলিয়ান হ'লে বরং ইন্ধন যোগান হ'বে।" জানকীবল্লভ প্রতিষ্ঠা করলেন এক শিল্প প্রতিষ্ঠান।

রতন বিজ্ঞানে ও পদার্থ বিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করে ডি, এস, সি ডিগ্রীর আশায় ডক্টর ঘোষের তত্ত্বাবধানে গবেষণায় ব্রতী হ'ল। ডক্টর ঘোষের বাটীতে তা'র অবারিত দ্বার। তিনি নিজে এই মেধাবী প্রিয়দর্শন ছাত্রের গুণমুগ্ধ, আর স্ত্রী অণিমা রতনকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, রতনের সঙ্গে তাদের একমাত্র কন্যা ডলির' বিবাহ দেন। রতন বড়ই লাজুক ছেলে; কারো সঙ্গে বিশেষতঃ মেয়েদের সঙ্গে মিলামিশা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ডলি অনিন্দ্যসুন্দরী—পল্লবিনী লতের-সুকোমল স্বাস্থ্যবতী সদাহাস্যময়ী তরুণী। সে রতনের গুণমুগ্ধা। ডলি বেথুনে আই, এ পড়ে। স্ত্রীর প্ররোচনায় ডক্টর ঘোষ লিখলেন এক চিঠি জানকীবল্লভকে তা'দের মনোভাব ব্যক্ত ক'রে। তিনি উত্তরে জানালেন, "রতনের শিক্ষা এখনও শেষ হয় নি—ডক্টরেট্ ডিগ্রী পেলে তা'কে পাঠাবো কোন বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-নবীশ রূপে; তার পরে তা'কে আন্‌বো আমার এই গাঁয়ের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে ভালো ক'রে গড়ে তোলবার জন্যে। আমার ভাবী পুত্রবধূ স্বামীর সহকর্ম্মিণীরূপে সেই প্রতিষ্ঠানের সেবা করবে। আপনি লিখেছেন আপনার কন্যাটি আধুনিক শিক্ষিতা তরুণী, 'কলেজ গার্ল'। তিনি কি এই এঁদো ম্যালেরিয়াদুষ্ট থিয়েটার-বায়োস্কোপ-বর্জ্জিত পাড়া-গাঁয়ে এসে বাস করতে পারবেন? আপনার ন্যায় লোকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশকরা মেয়ে আমার ইচ্ছা ত পূর্ণ করতে পারবেন না।"

ডক্টর ঘোষের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। স্পষ্ট কথা ব্যক্ত করে জানকীবল্লভও আশ্বস্ত হলেন এবং তাঁর ইচ্ছাটিকে সার্থক করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। ফলে তাঁরই জমিদারীর এলেকায় নদীতীরে প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি, শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'ল। সমুদ্রের বক্ষে হঠাৎ কোন দ্বীপ উঠে সকলের দৃষ্টি যে ভাবে আকৃষ্ট করে, তেমনি পল্লীবাংলার এক অখ্যাত অঞ্চলে উন্নত পরিকল্পনায় আধুনিক শিল্পবাণিজ্য পীঠের অভ্যুদয় এক মহাবিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। শুধু জানকীবল্লভের জমিদারীর প্রজারাই নয়—সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীরাই শিক্ষার সঙ্গে উপার্জ্জনেরও সুযোগ পেতে লাগলো। ইতিমধ্যে ইউরোপ খণ্ডে বাধলো লড়াই। ক্রমে তার ঢেউ এসে এসিয়ার তটভূমেও চাঞ্চল্যের সাড়া তুললো, দেখতে দেখতে বিদেশের শিল্পসম্ভারের

আমদানী বন্ধ হ'য়ে গেল। জানকীবল্লভ রায়ের প্রতি মা কমলা প্রসন্না হ'লেন। তাঁ'র কারখানায় দিবারাত্রি কাজ চলতে লাগলো গভর্ণমেণ্টের চাহিদা মিটাতে। জানকীবল্লভ লক্ষ্মীর বরপুত্র হলেন। তাঁ'র খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়লো। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে 'নাইট' উপাধীতে ভূষিত করলেন। ১৩৫০ সনের মন্বন্তরে তিনি বুভুক্ষু প্রজাদের বাঁচাতে ধনভাণ্ডার খুলে দিয়ে এক আদর্শ স্থাপন করলেন। ক্রমে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে জানকীবল্লভের রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেল;—হঠাৎ একদিন সংজ্ঞা হারিয়ে তাঁকে শয্যাশায়ী হ'তে হ'ল। পুত্র রতন তখন কর্ম্মসূত্রে কলকাতায়। কর্ম্মচারী মহেন্দ্র তাঁকে তার ক'রে সব জানালেন। রতন সেখান থেকে ডাঃ নরেশ ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। সঙ্গে এলেন ডক্টর ঘোষ ও তাঁর কন্যা ডলি। ডাক্তার ভট্টাচার্য রোগীকে দেখে বল্লেন, "এঁর ভাল রকম নার্সিং চাই।" ডলি জানালো, "সানন্দে সে ভার আমিই নিলুম।" বলেই সে জানকীবল্লভের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসল।

তৃতীয় দিনে রোগীর চৈতন্যোদয় হ'তেই চোখ মেলে দেখেন শিয়রে এক সেবারতা লক্ষ্মীপ্রতিমা! জানকীবল্লভ বিস্ময়ে চোখ মুদলেন, অস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকলেন "বাবা রতন!" ডলি আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পাশের ঘর থেকে পাঠালো রতনকে রোগীর কাছে। রতন রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো, "বাবা?" পুত্রের মুখের পানে চেয়েই জানকীবল্লভ ঘরের চারদিকে একবার তাকালেন। তারপর রতনকে কাছে ডেকে তা'র হাতের উপর হাত রেখে মৃদুস্বরে জানালেন, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন। সেই মুহূর্ত্তে ডলি ঘরে ঢুকতেই জানকীবল্লভ জিজ্ঞাসুনেত্রে পুত্রের দিকে তাকালেন। তখন রতন উজ্জ্বল নেত্রে পিতার পাণ্ডুর মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "বাবা, তোমার অসুখের সংবাদ পেয়ে ডক্টর ঘোষ এসেছেন—ইনি তাঁ'র কন্যা। এই তিন দিন দিবারাত্রি ইনি তোমার শুশ্রূষা করছেন।" জানকীবল্লভ প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেই লাবণ্যময়ী কিশোরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, সেই ক্ষণে ডাঃ ঘোষ ডাক্তার ভট্টাচার্যকে নিয়ে রোগীর ঘরে প্রবেশ করে উভয়ে রোগীর পার্শ্বে বসলেন। ডাঃ ঘোষ তাঁ'র প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল নয়নে জানকীবল্লভের রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে জোড় করে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ রায়, কেমন আছেন?" জানকীবল্লভ প্রতি নমস্কার জানিয়ে উত্তর করলেন, "বেশ ভাল মনে হচ্ছে।" ডাক্তার ষ্ট্যাথিস্‌কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা ক'রে হাস্যমুখে বললেন, "রোগী এখন আউট অব ডেঞ্জার। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিন।" জানকীবল্লভ পথ্য ক'রে আরো সুস্থ বোধ করলেন। ডক্টর ঘোষ দ্বিধাযুক্ত ভাবে বললেন, "মিঃ রায় আপনার অসুখের তার পেয়ে রতন বড়ই মুষড়ে পড়েছিল দেখে আমরা সঙ্গে এসেছি। আর একটা সুসংবাদ দিচ্ছি—রতনের "বর্ত্তমান অর্থনীতি" থিসিস্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণা বিবেচনায় তাকে পি, এচ, ডি ডিগ্রী দেওয়া ঠিক হ'য়েছে।" জানকীবল্লভের রোগক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো; তিনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ডক্টর ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ ঘোষ, আপনি আমার অসময়ে যে উপকার করেছেন তা আমি ভুলবো না।" পরে ডলির দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "ভাগ্যিস, আপনি মা লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন—নয়তো সেবাযত্নের অভাবে এই শয্যাই আমার অন্তিম শয্যা হতো।" পিতার ইঙ্গিতে ডলি সলজ্জ মুখে জানকীবল্লভের পদধূলি নিল। জানকীবল্লভ সস্নেহে ডলির চিবুক স্পর্শ করে বললেন, "ডাঃ ঘোষ, আমার প্রথম চেতনা সঞ্চারে যখন আমি শিয়রে এই মায়ের মূর্ত্তি দেখলুম তখন আমি দেবী ব'লে ভ্রম করেছিলুম—আর কুমারী নাইটেঙ্গল এর প্রতিমূর্ত্তি স্মরণ হয়েছিল।" পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর ভাবে বললেন, "এতদিনে আমার একটা ভ্রম দূর হ'লো, ডাঃ ঘোষ।" ডঃ ঘোষ বললেন, "কি ভুল?" একটু থেমে গাঢ়স্বরে জানকীবল্লভ বললেন "দেখুন, মা ডলি, কলেজে পড়া আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছেন।" প্রসন্ন হাসি হেসে ডঃ ঘোষ বললেন, "মিঃ রায়, শিক্ষা অর্থাৎ এডুকেশন সকল দেশে সকল সময়েই ভাল, কেননা শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞানের উন্মেষ ও হৃদয় উচ্চ হয় না। তবে আমাদের বর্তমান শিক্ষায় কতগুলি দোষ আছে বৈদেশিক শাসকের হাতে সেটা অনিবার্য। সুতরাং বর্তমান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই অভিভাবকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিও কিছু 'রিলিজিয়াস্ এডুকেশন বা ধর্ম্মশিক্ষা।" জানকীবল্লভের নিকট ডক্টর ঘোষের কথাগুলি বেশ ভালই লাগলো।

পাঁচ দিন পর। জানকীবল্লভ চুপ করে বসে ছিলেন তাঁর প্রশস্ত সুসজ্জিত বৈঠকখানায় একখানি সোফার উপরে। প্রাতঃকাল। ডলি সহাস্যমুখে চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। তার পায়ের শব্দে জানকীবল্লভ মুখে তুলে হাস্যময়ী ডলিকে দেখে সোল্লাসে কোমলকণ্ঠে বললেন, "আরে মা লক্ষ্মী আমার; তুমি নিজে কেন এ সব ব'য়ে টেনে আনলে—চাকরগুলো সব কোথায়?" কোমল হাসিতে মুখচোখ উজ্জ্বল করে ডলি জানকীবল্লভের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় কণ্ঠে বললে, "জেঠামশাই, যে দু'দিন আছি নিজের হাতেই আমি সব করবো।" জানকী-বল্লভের বড়ই ভাল লেগেছে এই সুন্দরী সরলা তরুণীকে—এই ক'দিনে এই বৃদ্ধকে করেছে সে আপনার জন, যেন কত কালের পরিচিত আপনার জন। জানকীবল্লভ কি ভেবে যেন অন্য-মনস্ক হয়ে পড়লেন। "বাবা!"—বলে রতন ঘরে ঢুকতে জানকী-বল্লভ আশ্বস্ত হ'য়ে সহাস্যে পুত্রের দিকে তাকালেন। ডক্টর ঘোষও সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জানকী-বল্লভের পাশে সোফায় বসে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "মিঃ রায়, সত্যি আমি আশ্চর্য্য হয়েছি আপনার বিরাট পরিকল্পনা আর অসীম কর্ম্মশক্তি দেখে। এক ক্ষুদ্র অখ্যাত পাড়াগাঁকে বিশাল শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করে আপনি তাকে শহরের মর্য্যাদা দিয়েছেন। দেশে নূতন প্রেরণার সঙ্গে এমন এক নবীন আবহাওয়া এনেছেন যেগুলো সহরের দূষিত আবহাওয়া ও পরিস্থিতি বর্জিত। আমি আন্তরিক ভাবে আপনার এই অপূর্ব পরিকল্পনার প্রশংসা করছি। আপনি বনেদী জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে প্রজাদের টেনে নিয়েছেন বুকে, আর পেয়েছেন তাদের অকৃত্রিম ভক্তি ও সাহচর্য। আপনার কৃতিত্ব অভাবনীয়। দেশের জমিদাররা চেষ্টা করলে অসংখ্য অসুবিধার মধ্যেও দেশের কত উন্নতি করতে পারেন আপনিই সেটা চোখে আঙুল দিয়ে

সকলকে দেখিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকেও আপনি হার মানিয়েছেন। যদি অনুমতি করেন আমি প্রতিষ্ঠা কত্তে চাই এখানে এমন এক আদর্শ বিজ্ঞান-মন্দির—যা'র পরিকল্পনার ভার দেবো আপনারই হাতে। সেখানে হবে বিশ্ববিদ্যালয়—পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দের 'প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টার।"

জানকীবল্লভ ডক্টর ঘোষের বালকসুলভ সরলতায় ইতিপূর্বে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন, এখন তাঁর প্রস্তাবে যেন একেবারে গলে গেলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন, "মিঃ ঘোষ, আমি সর্বান্তকরণে আপনার প্রস্তাব অনুমোদন করছি। আপনার ন্যায় সুধী ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্য পেলে আমি হয়তো আরো কিছু করতে পারবো। এই বিজ্ঞান মন্দির প্রস্তুত করবার সব ভার আমি বহন করবো।" ডক্টর ঘোষ আনন্দের আতিশয্যে জানকীবল্লভকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। অদূরে দাঁড়িয়ে ডলি ও রতন বিস্ফারিত নয়নে দুই জ্ঞানীবৃদ্ধের আনন্দোচ্ছ্বাস উপভোগ করছিলো।

তার পর দিন। ভোর হতেই রায় বাড়ীতে যেন একটু হৈ চৈ পড়ে গেছে। জানকীবল্লভ ডক্টর ঘোষকে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। বা'র বাড়ীর লোকজন মিলে রায় বাড়ীর সেকেলে অতিকায় পালকীখানা নামিয়ে পরিষ্কার করছে;—চারদিকেই একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে যেন। ডলি ভোর বেলাই উঠেছে। তার মুখখানি বিজয়া দশমীর দুর্গাপ্রতিমার মুখের ন্যায় নিষ্প্রভ, বেদনাতুর। সে প্রথমে মনে করলে—হয় তো তারা আর্‌কে যাবে তার জন্যই বাড়ীতে এত ব্যস্ততা, কিন্তু পালকী গাড়ীর সাজসজ্জা দেখে তার কেমন কেমন ঠেকলো; কেননা তার জন্য তো পালকীর আবশ্যক নেই। সে গম্ভীরভাবে বারান্দার কোণে বসে রইল। অল্পক্ষণ পরে রতন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দার দিকে এগোতেই—ডলির চিন্তাবিমর্ষ মুখখানি তাকে বিশেষভাবে অভিভূত করলে। আস্তে আস্তে তার নিকটে গিয়ে ধরা গলায় ডাকল, "ডলি?" অশ্রুসিক্ত নয়নে ডলি রতনের দিকে বিদ্যুতের চমক হানল। পরে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ আপনাদের বাড়ীতে এত হৈ চৈ কেন—পালকী সাজানো হচ্ছে কার জন্যে?" ডলির নির্দেশে রতনের দৃষ্টি পড়লো বাহিরের চত্বরে পালকীর উপরে। বিস্ময়ের সুরে সে-ও বলে উঠলো, "তাই তো দেখ্‌ছি কিন্তু আমি তো কিছু জানিনা।" দেখতে দেখতে মহেন্দ্র ব্যস্তভাবে পালকী বাহকদের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। পরক্ষণে দেখলেন, তার পিতা ও ডক্টর ঘোষ প্রসন্ন মুখে হাসতে হাসতে বাড়ীর ফটকে ঢুকছেন, সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মশাই। তাঁদের দেখে রতন ডলির নিকট থেকে সরে গেল; কিন্তু তাঁদের উভয়ের দৃষ্টি এড়াতে পারলে না। ডলির নিকট ব্যাপারগুলো রহস্যময় মনে হলো।

বেলা ১০টার সময় মিলিত কণ্ঠের একটা মধুর ঝঙ্কারের মধ্যে অন্দরমহলে পালকী প্রবেশ করলো। ডলি দ্রুতপদে পাল্কীর নিকট ছুটে গিয়েই অপ্রত্যাশিত আরোহিণীকে দেখে বিস্ময়ানন্দে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। অস্ফুটভাবে দুটি শব্দ নির্গত হলো শুধু—"মা, তুমি!" পাল্কী দেখে রতনও নীচে এসেছিল, সেও বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে রইল। পাল্কী থেকে নেমেই অণিমা দেবী উভয়ের বিস্ময়াবিষ্ট মুখের পানে তাকিয়ে স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বললেন—তোমরা কেউ জাননা নাকি,দুজনেই যে হকচকিয়ে গেছ! ব্যাপার—সব ভাল তো, বাবা রতন?" রতন অপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলো "আসুন কাকীমা, ভিতরে চলুন।" সকলেই প্রকাণ্ড হল ঘরে প্রবেশ করলো। ডক্টর ঘোষ ব্যস্ত-ভাবে ঘরে ঢুকে বললেন, "এই যে, তুমি এসেছ!" অণিমা দেবী সহাস্যে বললেন, "না এসে কি করি—তোমার ও মিঃ রায়ের, দুই তার পেয়ে তো আমি অবাক, আবার এখানে বাড়ীতে ঢুকে দেখলুম, ছেলে মেয়ে দু'টি আমার দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছে, এবার ব্যাপার কি বলতো? মিঃ রায় সেরে উঠেছেন তো?" পাশের ঘর থেকে রায় মশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "ডক্টার ঘোষ ও শ্রীমতী অনিমা দেবী, আপনাদের অনুমতি না নিয়ে অনধিকার প্রবেশ কর্‌ছি"—বলেই হল ঘরে ঢুকলেন সহাস্যমুখে—সঙ্গে কুল-পুরোহিত স্মৃতিরত্ন মশাই। অণিমা দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার জানকীবল্লভের দিকে স-সম্ভ্রম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে দিতে গেলে জানকীবল্লভ সোল্লাসে বললেন, "বেয়ান ঠাকরুণ, মাথায় আর অযথা কাপড় জড়াবেন না—এবারে বর কনেকে আশীর্ব্বাদ করুন—১০-৩৫ মিনিট পর্য্যন্ত শুভ আশীর্ব্বাদের সময়।" বলেই স্মৃতিরত্ন মশাইকে লক্ষ্য করে শ্রদ্ধার সুরে বললেন, "ঠাকুর-মশাই, আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ তাতে কুল-পুরোহিত; আপনি এদের মাথায় ধান দূর্ব্বা দিয়ে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।" অণিমা দেবী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে জানকীবল্লভের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে সস্নেহে রতন ও ডলিকে দুই হস্তে বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—অদূরে দাঁড়িয়ে ডক্টর ঘোষ ও জানকীবল্লভ পরিতৃপ্ত হাসিতে উদ্ভাসিত নয়নে সেই মধুর দৃশ্যটি উপভোগ করলেন।

চৈত্র-বধূ

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম্-এ

চৈত্র-বধূ চরণ পাতে বনের ফাঁকে ফাঁকে,
চরণ-ঘায়ে রাঙিয়ে উঠে পুষ্প-শাখে শাখে।
যেমনি করে আকাশ তারা জাগে
রাত্রি-বধূ-চরণ-অনুরাগে;
যেমনি করে তড়িৎ-শিখা বেগে
চমকি উঠে আষাঢ় মাসে মেঘে;
তেমনি আজ তরুর শাখে বনের তৃণ মাঝে,
চৈত্র-বধূ-চরণ-ছোঁয়া পুষ্প হয়ে সাজে।

চৈত্র-বায়ু আকুল স্বরে শুনায়ে যায় গান
আমের বনে ধানের ক্ষেতে নাচিয়া উঠে প্রাণ।
উঠে নৃত্য জলের কলকলে,
তরল সুরে সকল প্রাণ টলে;
কি যেন কার পরশ লেগে গায়
ঘুমায় বুক শান্তির ছায়ায়।
স্বপ্ন নামে চোখের কোণে স্বর্গ-জ্যোতি ঝরা,
চৈত্র-বধূ দাঁড়ায় প্রাণে প্রেম-সুরভি-ভরা।

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

স্বাভাবিক যৌনক্ষুধাবোধ করা অবস্থাভেদে কঠিন হয়, যাঁরা অর্থ ব্যয়ের ভয়ে স্ত্রীকে কর্ম্মস্থলে লইয়া যান না তাঁরা অন্যায় করেন। কোন একটী যুবক চুরির নালিশ জানাতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি—বিয়ে করেছেন, বাসা করেন না কেন? বাসায় কেউ থাকলে কি এতবার চুরি হত? উত্তরে যুবকটী বলে—স্যার, খরচে কুলাব কি করে। "আমি তখন বছরে তার যা চুরি যায় বা যা হারায় তার একটা হিসাব করি। তা থেকে দেখিয়ে দি, তার সেই অপহৃত অর্থ দিয়ে সে দুটা বৌ রাখতে পারে। তাকে আমি আরও বলি—বাপু একদিন হয়ত তোমার পয়সা হবে, কিন্তু তখন তোমার এই মন থাকবে না। প্রতিটী মুহূর্ত্ত তোমার মূল্যবান। আজ যা হারাবে কাল তা আর ফিরবে না। যারা তোমায় অনুরূপ উপদেশ দেয়, তারা ভুল করে। আজ যদি তোমার জীবন যৌবন চলে যায়, তা কি তারা কাল ফেরাতে পারবে? পারবে না। একবেলা খেয়েও বৌটাকে কাছে রেখ। সময়ে বৌ কাছে না রাখাতেই যত অঘটন ঘটে। এর পর যুবকটী বৌ এনে বাসা করে এবং সুখেই তাদের কালাতিপাত হয়। সত্যকে অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই।

এ সম্বন্ধে অপর আর একটী নিদর্শন দি। কোন এক ভদ্রলোক তার চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্ক স্ত্রীকে কোনও এক ধর্ম্মাশ্রমে রেখে উধাও হন। প্রায় ৩০ বৎসর পরে ফিরে তিনি স্ত্রীকে নিতে যান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর আসতে চান না। শেষে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুতের পর তিনি স্ত্রী উদ্ধারে সমর্থ হন। ভদ্রলোকের বিবৃতিটুকু তুলে দিলাম।

—স্ত্রীকে আমি চিনতেই পারি না। গলায় তাঁর রুদ্রাক্ষির মালা, পরণে গেরুয়া বসন। তিনি আমায় জানিয়ে দেন তাঁর ভগবানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, আমি তার কেউ নয়। রাজকীয় সাহায্যে তাকে আমি উদ্ধার করি, তিনি কিছুতে আসতে চান না। চেঁচিয়ে উঠে বলেন—এতদিন কোথায় ছিলে, যখন আমার জীবন ছিল যৌবন ছিল। আমাকে তুমি রেহাই দাও। কাছে এগিয়ে এলেই সে বলে উঠে—ছুঁয়োনাক মোরে, তিষ্ঠ ওইখানে, আমি জগজ্জননী মা।' বুঝলাম স্ত্রী আমার Neuratic, রোগগ্রস্ত। জোর করে ব্রহ্মচর্য্য পালনে মানুষ হয় Neuratic, মেজাজও হয় তাদের খিটখিটে। অনেকে Pseudo-religionist হয়ে উঠে। কেউ বা ম্যানিয়াগ্রস্ত। কেউ নানারূপ Visvis দেখে। আইনের বলে আমি স্ত্রীর উপর অধিকার বিস্তার করি। ধীরে ধীরে আমার স্ত্রী সুস্থ হয়। তিনি বলেন—'মানুষ আমাকে ছুঁয়েছে, এ দেহ আর দেবতার কাজে লাগবে না। আমি আর ফিরে যাব না।' অচিরেই আমার স্ত্রী পতিসেবাপরায়ণ হয়ে উঠে। আমিও নিশ্চিন্ত হই।

এই উগ্র যৌনবোধ বা স্পৃহা কোনও মেয়ের মধ্যে সাময়িকভাবে আসে, কাউকে কাউকে বহুদিন পর্য্যন্ত ভোগায়। এই যৌনবোধকে Raw quinine এর এবং প্রেমকে sugar-coated quinine এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। উভয় ক্ষেত্রেই Lucid intervals দেখা যায়। উভয় রোগেরই চিকিৎসা আছে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। স্বল্প যৌনবোধও সুযোগ পেলে ক্ষতির কারণ হয়। নিম্নের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য।

"ধমক দিয়ে ছেলেটাকে বলি—লজ্জা করে না, গুরুজনের সঙ্গে অপরাধমূলক কাজ। উত্তরে কেঁদে ফেলে সে বলে—আগে শুনুন আমার কথা। ছেলেটী বলে যায়—"দাদা থাকতেন বিদেশে। দু বছর অন্তর বাড়ী আসেন তিনি। বাড়ীতে থাকি আমি বৌদি আর বুড়ী মা। হঠাৎ হয় বৌদির বাপের বাড়ীর দাদার দলের আগমন। নীরেনদা, হীরেনদা আরও কত দাদা। সকলেই বৌদির দাদা। অতিষ্ঠ ও ভীত হই। বাধা দি, কিন্তু অপমানিত হই। একবার ভাবি দাদাকে জানাই। পরে ভেবে দেখি, তা অনুচিৎ। হয় ত দাদা বিশ্বাস করবেন না। আর বিশ্বাস করলে বৌদির এ বাড়ীতে স্থান হবে না, বৌদি অধঃপাতে থেকে অধঃপাতে যাবে। তাঁকে বাঁচান যাবে না। ঘরের বৌ বেরিয়ে যাবে তাও সহ্য হয় না। বংশমর্য্যাদা ও বাহিরের সম্মানের কথা ভাবি। শেষে নাচার হয়ে ফ্রি কম্‌পিটিসনে নামি। বৌদি নিজেই দাদার দল তাড়িয়ে আমায় নিয়ে মেতে উঠেন। এর পর বিশেষ একটা ঘটনা ঘটে। বৌদির অসুখের ভানে দাদাকে টেলিগ্রাম করি। দাদা বাড়ী আসেন। বৌদি দাদাকে নিয়ে মেতে উঠেন। আমি নিশ্চিন্ত হই, অনুতপ্তও হই। পরে দাদা আসল ঘটনা জানতে পারেন। হাঙ্গাম হুজ্জুত বাধে। আমি দুটা অন্যায়ের মধ্যে কম অন্যায়টাই বেছে নিয়েছিলাম। তা না হলে কি বৌদিকে খুঁজে পেতেন। উত্তরে আমি ছেলেটাকে বলি—এ ক্ষেত্রে দুটী অন্যায়ই সমান সমান। একটার চেয়ে অপরটা কম বা বেশী নয়। অপরাধ যখন সমান সমান, তখন একটী অপরাধ দিয়ে অনুরূপ অপর এক অপরাধ ঢাকা যায় না। অতএব তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই এই যৌনবোধকে সুপ্ত রাখতে সক্ষম। সংস্কারই এ বিষয়ে প্রধান সহায়ক। ধর্ম্ম উপদেশ ও কর্ত্তব্য বোধ এই সংস্কারকে শক্তিশালী করে। এ দেশের সতীত্ব গরিমা এই যৌনবোধের পরম শত্রু। পাথরের মত এই গরিমা যৌনবোধকে চেপে রাখে, নিম্নমুখী করে। বংশানুক্রম শিক্ষা ও সংস্কৃতিই মেয়েদের ভাল রাখতে সক্ষম। এই জন্য সৎ-সাহিত্যেরও প্রয়োজন। অসৎ ছবি (Cinema) বা সাহিত্য সতীত্বের মোহ দূর করে। এ বিপদ সুরু হয়েছে, সময়ে সাবধান হওয়া উচিৎ। অসৎ ছবি ও সাহিত্য সুপ্ত যৌনবোধকে জাগ্রত করে। মানুষের মন বড় Suggestive—পুনঃ পুনঃ Suggestion দ্বারা সংস্কার ভেঙ্গে যায়, সংসার হয়ে উঠে বিষময়। কতকগুলি সাহিত্যিক আছেন। তাঁরা কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়ান। যেমন সতীত্ব একটা কুসংস্কার, ওটা একটা জুজুর ভয় মাত্র বা পাপ পুণ্য মনের বিকার, মনে করলেই দোষ, মনে না করলেই দোষ নয় ইত্যাদি। যে জাতির নারীরা একনিষ্ঠ নয়, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে। ছেলেদের একনিষ্ঠ না হলেও চলে। কিন্তু মেয়েদের বহুপতিত্ব অর্থ বন্ধ্যাত্ব ও বংশ লোপ। ইহাও প্রকৃতির নিয়ম। পুরুষের এতে হাত নেই। তবে পুরুষদেরও একনিষ্ঠ হওয়া উচিৎ। মেয়েদের সিন্দুর পরার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, একটা বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। প্রতিজ্ঞাটা হচ্ছে এইরূপ। "আমার স্বামী যদি আঘাত দিয়ে কপোলদেশ রক্তাক্তও করে তবু সে আমার স্বামী, তার প্রতি আমার ভক্তি থাকবে।" এই প্রতিজ্ঞা মেয়েদের রক্ষা করা উচিৎ।

(ক্রমশঃ)

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ,এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ-আর্‌-ই-এস্‌

(১)

ইলবার্ট বিল

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের সংস্কার পুনরালোচিত হইতেছিল তখন বিহারীলাল গুপ্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রমেশচন্দ্র দত্ত বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন দেশীয় সিভিলিয়ন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই। ইনি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে প্রশ্ন উঠিল যদি জিলার য়ুরোপীয় অধিবাসীরা জিলার শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন না হন তাহা হইলে সেই জিলায় তাঁহার পক্ষে শান্তিরক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হইবে? অধিকন্তু, দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ য়ুরোপীয় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সে ক্ষমতা থাকিবে না ইহাই বা কিরূপ সঙ্গত? রমেশচন্দ্র বিহারীলালকে এই অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের এই অক্ষমতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। বিহারীলাল বাঙ্গালার তদানীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর এশলি ইডেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহার পরামর্শে একটী সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। স্যর এশলি ইডেন উহা সমর্থিত করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। উদার-হৃদয় রিপণ দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট-দিগের এই অক্ষমতা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ব্যবস্থা-সচিব স্যর কোর্টনে ইলবার্ট সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী দেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত একটি নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। উহাই ইলবার্ট বিল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।
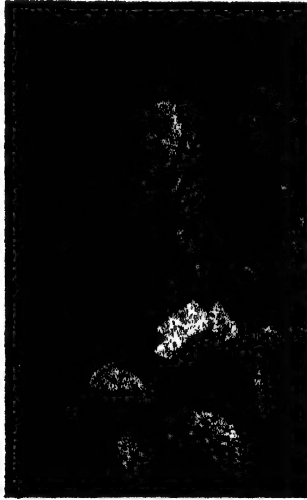
স্যর এশলি ইডেন

এই বিল উত্থাপিত হইলে অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান সমাজ ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাও আন্দোলনকারীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। স্যর এশলির পরে স্যর রিভার্স টমসন বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট গবর্ণর হন, তিনিও প্রকাশ্যে আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। স্থির হইল বিলটী সাধারণে বিস্তৃতভাবে সমালোচিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় উহার আলোচনা হইবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা টাউনহলে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয় অধিবাসীরা এই বিলের প্রতিবাদকল্পে একটি বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। উহাতে জে-জে কেজুয়িক, জে-এইচ ব্রানসন, এ-বি মিলার প্রভৃতি অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান নেতারা কটূক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় যে হলাহল উদ্গীরণ করিলেন তাহার ফলে সমগ্র ভারতময় ঘোর বিদ্বেষ দাবানল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ইংলিশম্যান এই আন্দোলনকারীদের প্রধান মুখপত্র হইল। 'ব্রিট্যানিকাস' ছদ্মনামে একজন লোক অকথ্য গালিগালাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেমচন্দ্র "নেভার-নেভার" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন:

> গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
> ডাক ছাড়ে ব্রান্‌সন্‌, কেজুয়িক, মিলার—
> "নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার।"
> "নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
> নেটিভে পাবে সন্ধান, আমাদের "জানানা?"
> বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না।

অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান রমণীরাও বিলাতে আবেদনপত্র পাঠাইলেন—

> বিলাতী বৃষের রব কামিনী খেপিল সব,
> বল্লভের কাছে গিয়া কানে দিল পাক্‌!
> পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে—
> ডাকিল বৃটিশ বৃষ গাঁক গাঁক গাঁক।

ইঁহারা সকলে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা তুলিয়া একটি Defence Association করিলেন (হেমচন্দ্রের ভাষায় "সাহেব রক্ষিণী সভা সংগঠিত হয়েছে") এবং ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। আর্মেনিয়ান ব্যারিষ্টার ব্রানসনের বক্তৃতা এরূপ অভদ্রোচিত ও কটূক্তিপূর্ণ হইয়াছিল যে তিনি পরে উহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাপি হাইকোর্টের উকীল এটর্ণীরা সভা করিয়া তাঁহাকে বয়কট করেন এবং ব্রানসনকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। উমেশচন্দ্রের পসার আরও বৃদ্ধি পায়।

বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ঢাকায় একটি বক্তৃতায় ব্রানসনের বক্তৃতার যথোচিত উত্তর দিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে এই বিলের সমর্থনে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া জন ব্রাইট প্রমুখ বাগ্মীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

স্যর হেনরি কটন লিখিয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন যেমন তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবেন এইরূপ লোক বাছিয়া নিজের পরিষদে রাখিতেন, উদার-হৃদয় রিপণ সেরূপ প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার শাসনপরিষদের অনেকেই বিরুদ্ধ মত পোষণ করিলেও তিনি তাহাদিগকে অপসারিত করেন নাই। স্যর

রিভার্স টমসন বোধ হয় তাঁহার বিপক্ষদলের অগ্রগণ্য ছিলেন। রিপণকে গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখে আন্দোলনকারীরা অপমানিত করিয়াছিল এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে পোতে আরোহণ করাইয়া ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাকে দূর করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল।

স্যর রিভার্স টমসন

এই আন্দোলন ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল যে গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রীসভা ভীত হইয়াছিলেন, রাজপ্রতিনিধির প্রতি মহারাজ্ঞীর আস্থা হ্রাস পাইয়াছিল। অবশেষে রিপণের সকল মঙ্গল চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং রাজস্বসচিব স্যর অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন্ গবর্ণমেণ্ট ও য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে concordat নামক সন্ধিস্থাপন করিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী যে আকারে বিলটী পাশ হইল তাহাতে বিলের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না।

উমেশচন্দ্র এই আন্দোলনের গতি ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরস্পরকে গালিগালাজ করিয়া কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না বলিয়া তিনি বক্তৃতামঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই, কিন্তু এই ব্যাপারে একদিকে যেমন ব্রিটিশ ন্যায়পরতার প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল, অপরদিকে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এই আন্দোলনের শিক্ষা তাঁহার দেশবাসী ভুলিবে না। সে শিক্ষা তাঁহার সুহৃদ কবি হেমচন্দ্র এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"দিলে শিক্ষাদান ভারত-নন্দনে
দিব্য চক্ষু দিয়া—কি মন্ত্র সাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সকল করিতে পায়।

শিখিবে ভারত—শিখিবে একথা
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা—
একদিকে কোটী প্রাণী কাতরতা
খেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষে তায়—

* * *

যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ ধারা,
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—"

লর্ড রিপণ দশচক্রে পড়িয়া concordat নামক সন্ধি স্থাপন করায় দেশীয় সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল—

"অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত যোঝে না বেলা।"

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তথাপি সমগ্র ভারত লর্ড রিপণের নিকট তাঁহার সদুদ্দেশ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়াছিল এবং কলিকাতা টাউনহলে ১৪ই জানুয়ারী প্রায় তিন সহস্র দেশবাসী সমবেত হইয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছিল। এই বিরাট সভায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অনুপস্থিতিতে উমেশ চন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, 'রেইজ এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তেওতার রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়চৌধুরী, মহারাজ কমলকৃষ্ণের পুত্র কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পণ্ডিত বঙ্কবিহারী বাজপেয়ী, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলুটোলার সেন পরিবারের মুরলীধর সেন, বাগ্মীপ্রবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ বিশ্বাস, বিহারের শালিগ্রাম সিং ও সুপণ্ডিত প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রস্তাবাদি উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা করেন। 'রেইজ এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক এই সভার কার্য্য বিবরণীর সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—
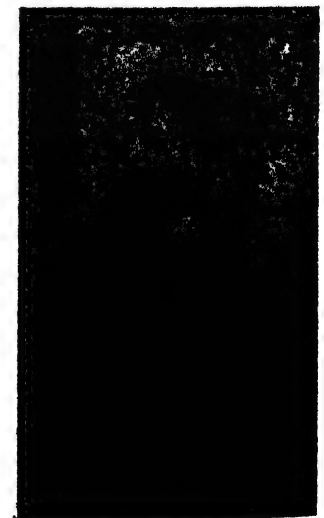
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"The chair was then given and accepted by a senior barrister of the High Court, unaccustomed to mix himself in politics, Mr. W. C. Bonnerjee, who not long ago occupied the position of Solicitor-General to the Crown in India. Mr. Bonnerjee did full justice to his talents, sagacity, and experience. Perfectly unprepared, he, on the spur of the moment, gave a most wise opening address. His mental and physical powers rose to the height of the situation, and in ringing musical tones which were distinctly heard to the farthest end of the immense hall, he vindicated the native community and explained the objects of the meeting."

'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন'

ইলবার্ট বিল আন্দোলনের ফলে এই শিক্ষালাভ হইল যে একতার সূত্রে সকলে আবদ্ধ হইলেই দেশের রাজনীতিক, শাসননীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই (স্যর) দ্বারকনাথ পালিতের চেষ্টায় 'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন' নামে সভা স্থাপিত হয়। ২রা মার্চ এলবার্ট হলে নিয়মিতভাবে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উহাতে উপস্থিত ছিলেন, যথা, বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং, মাননীয় রাও সাহেব বিশ্বনাথনারায়ণ মাণ্ডলিক, সুসঙ্গের মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর, ভেওতার রাজা শ্যামাশঙ্কর, বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, জনাইএর বাবু পূর্ণচন্দ্র, নন্দলাল ও অনুরূপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যোগেশচন্দ্র দত্ত, রঙ্গপুরের জমিদার গোবিন্দলাল রায়, বিহারের জমিদার বাবু পশুপতিনাথ বসু, বিলাতপ্রত্যাগত এঞ্জিনিয়ার ও জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, হেমচন্দ্র মল্লিক, জৈনমন্দিরের ট্রাষ্টী ও জুয়েলার চন্নুলাল এবং বহু ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। কার্য্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন—দ্বারভাঙ্গার মহারাজা (সভাপতি), ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জী, ব্যারিষ্টার, (সম্পাদক), দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র ও উদীয়মান বাঙ্গালী গ্রন্থকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র কুমার নীলকৃষ্ণ (ধনরক্ষক)। স্থির হয় যে, এই নূতন সভা কোন বর্ত্তমান সভার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে না, পরন্তু তাহাদিগের সহিত মিলিতভাবে কার্য্য করিবে এবং তাহাদিগের অসম্পূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই সভার উদ্দেশ্য দেশবাসীর রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই সভার অঙ্গহবিলে দ্বারভাঙ্গাধিপতির দশ সহস্র মুদ্রা দান ঘোষিত হয়।

ইহা হইতে প্রতীত হয় যে উমেশচন্দ্র প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক কোন সভা দ্বারা বিশেষ প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের উন্নতি অপেক্ষা সমগ্র দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে এবং একতাবলে সমগ্র ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সাধিত করিতে সমুৎসুক ছিলেন। হুজুগ ও বক্তৃতা করিয়া সাধারণের নিকট করতালিলাভ করিতে তিনি কখনও উৎসুক হন নাই।

এই সময়ে এম জুবেয়ার (M. Joubert) কলিকাতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। এই সম্মেলনে সকল ভারতবাসীই যে এক মহাজাতির অংশ ইহা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একটি জাতীয় সম্মিলনী (National Conference) আহূত হয় তাহাতে ভিন্ন প্রদেশবাসীও কেহ কেহ উপস্থিত হন। ইঁহাদের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ হইতে মিষ্টার মাণ্ডলিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক মার্কুইস অব রিপণ ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সঙ্কীর্ণচেতা কর্ম্মচারিবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া—প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া যদিও তিনি ইচ্ছামত শাসন সংস্কার সাধিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য, অকৃত্রিম সহানুভূতি ও অপূর্ব্ব ন্যায়পরতার পরিচয় পাইয়া ভারতবাসী তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়াছিল। কোনও বিদেশীয় শাসনকর্ত্তা দেশবাসীর নিকট এরূপ হৃদয়ের পূজা পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয়দিগের অপূর্ব্ব একতা দেখিয়া ভারতবাসী যে শিক্ষালাভ করিয়াছিল, রিপণের বিদায় গ্রহণকালে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে দেশবাসীগণ মিলিত হইয়া রিপণের প্রতি কৃতজ্ঞতার যে উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবাসীর ইতিহাসেও বিরল। রিপণের এই বিদায় অভিনন্দনে, বলা বাহুল্য, অধিকাংশ য়ুরেশীয় ও য়ুরোপীয় যোগদান করেন নাই। স্যর হেনরি কটন ভারতবাসীর এই রিপণ উৎসব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :

"লর্ড রিপণের বিদায়ের দিন নবভারতের জন্ম দিবস। মেরেডিথ টাউনসেণ্ড লিখিয়াছেন, সিমলা হইতে বোম্বাই যাত্রার ন্যায় সমারোহপূর্ণ বিজয়যাত্রা ভারতবর্ষ কখনও পূর্ব্বে দেখে নাই—সে জয়যাত্রায় সপ্তকোটিকণ্ঠ হইতে তাঁহার জয়গান উদ্গীরিত হইয়াছিল। রিপণকে যে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করা হইয়াছিল কোনও বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাকে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় সেরূপ শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য প্রদান করে নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমগ্র জাতিকে একাত্ম হইয়া এরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার দৃশ্য দেখা যায় নাই। কলিকাতার মহোৎসবে আমি যোগদান করিয়াছিলাম। কোনও গণ-আন্দোলনে ইহাপেক্ষা একতা বা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবের অভিব্যক্তি দেখা যাইতে পারে না। জীবনে যে জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইয়াছে তাহার চিহ্ন ইহাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে না।"

"এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বর্ণবৈষম্যসম্পাত দম্ভ যেদিন প্রাচীন সভ্যতার

গৌরবে দীপ্ত একটি মহাজাতির ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবীর উপর পদাঘাত করিয়াছিল সেইদিনই সেই মহাজাতির মধ্যে এক সুদৃঢ় সংকল্প ও অপূর্ব্ব একতা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিয়াছিল—

"কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে,
সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!

অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান সমাজ এই একতা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজস্ব সচিব স্যর অক্ল্যাণ্ড কলভিন পায়োনীয়র পত্রে এই উপলক্ষে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"If it be real what does it mean?" ইহার অর্থ সুস্পষ্ট—কলভিন কর্ত্তৃক উদ্ধৃত—বাইবেলের ভাষায় "The dry bones of the open valley had become instinct with life."

শুভলগ্ন উপস্থিত দেখিয়া, উমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ, সকল জাতি, সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে একত্র হইয়া দেশসেবার মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলেন—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নেতৃত্বে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইল।

ক্রমশঃ

আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

রায় বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

গ্রীসের হেসিওডিক আখ্যায়িকায় বর্ণিত আছে—দেবাদিদেব জেউস দেবগণকে এমন একটি রমণী সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন, যাহার বাহিরের আকৃতি অনুপম রূপসৌন্দর্য্যে ঝলমল করিবে, কিন্তু তাহার অন্তর হইবে কুৎসিত কদর্য্যতার বিষকুম্ভ, এবং সে যখন অপার্থিব রূপের ঝলকে অন্ধ মানবের সম্মুখে তাহার বিচিত্র কারুখচিত রংচঙে তোরঙ্গটি খুলিয়া ধরিবে, তখন উহার ভিতর হইতে বিশ্বের যাবতীয় অমঙ্গল, মরুতপ্ত বাতাসের মত বহিয়া ঋত-সত্য-মঙ্গলের চ্যুতমঞ্জরীগুলিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। সেদিন বিধাতাপুরুষের সেই মানসী কন্যা পৃথিবীতে অকল্যাণের ভার কতখানি বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিল, তাহা জানা নাই। আকাশ হইতে অতিকায় বিমানের অতি-বিস্ফোরক বোমাবর্ষণ তখনও সুরু হয় নাই। চালকহীন বিমান, ট্যাঙ্ক, রাশি রাশি মারণাস্ত্র,—মৃত্যু, নির্ম্মমতা, নৃসংশতার বোঝায় 'প্যাণ্ডোরার ঝুড়ি' ভর্ত্তি করিয়া বিজ্ঞান আজ কোন নির্দ্দয় জেউসের অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে?

বিজ্ঞানের রুদ্র তাণ্ডবের অভিনয় সকল প্রাণবান দরদী মানুষের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া বক্র কটাক্ষে আমাদের অন্তরে যে গভীর অশ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে কোন কারণে হোক, আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া মনে করি, তাই বিজ্ঞানকে জড়বাদের প্রতিভূরূপে খাড়া করিয়া চাবুক বসাইতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন না। তাঁহারা বলেন, দেখ জড়বিজ্ঞানের কাণ্ড—ঐ ভ্রমের, ধ্বংসের পথ ছাড়। ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াও, আধ্যাত্মিক কৌপীন পর। কিন্তু ঐ সব বিজ্ঞ সমালোচকেরা আবার সম্পূর্ণ একটা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের সেতু-বন্ধকে, রাবণের পুষ্পকরথকে সেকালের বিজ্ঞান-শিল্পের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া গর্ব্বও অনুভব করেন এবং সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের পাশুপত-অস্ত্রলাভের কথা বলিতেও ভোলেন না। তখন ইহা সহজে বোঝা যায়, বিজ্ঞানের প্রতি বিরাগের কারণ আর যাই হোক, তাহা আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ নহে এবং ধর্ম্মের শাক দিয়া বিজ্ঞানের মাছ ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যে কোথায় যেন একটা মস্ত গলদ রহিয়া গেছে।

একচক্ষু হরিণের অর্দ্ধ-অন্ধ দৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের মধ্যে বিরোধকে বুঝিতে হইলে এখানে এই পরিচয়ই বোধ করি যথেষ্ট যে, আধ্যাত্মিকতার উপর জড়ের প্রভাব যতখানি, জড়বিজ্ঞানেও আধ্যাত্মিকতা সেই অনুপাতে বড় অল্প স্থান জুড়িয়া বসে নাই। বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বলা দরকার। শুধু ধর্ম্মের জয়ঢাক কাঁধে বাঁধিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হওয়া আধ্যাত্মিকতা নহে, নিছক অদৃষ্টবাদও নহে—আর প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা, অর্চ্চনায় ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভের কামনাও নহে—ঐ সকলের মধ্যে পার্থিব আসক্তির অসহায় জড়ত্ব স্পষ্টই দেখা যায়—এক উন্নত আদর্শের পথে জীবনের অভিযানকে চালাইয়া লইয়া কল্পলোকের অনবদ্য পারিজাতের আহরণ আধ্যাত্মিক চিত্তের কাম্য এবং কেবলমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই মানুষ দধীচির আত্মোৎসর্গ দ্বারা আপনাকে অমর ও বিশ্ব-মানবকে চরিতার্থ করিতে পারে। বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে, ঐরূপ অগ্নিদানের মধ্য দিয়া। যুগ যুগান্তের কত পার্থিব দুর্গম-গিরি কান্তারে, তুহীনাবৃত বিস্তীর্ণ মেরুমণ্ডলে আত্মনির্ব্বাসনের অসহনীয় কঠোরতা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে, শুদ্ধ জ্ঞানের জন্য—মহাপ্রস্থানের পথে, লক্ষ্যভূমির দৃষ্টি সীমার মধ্যে কত ভীমার্জ্জুন অতলে সমাধিস্থ হইয়াছে। মানুষকে আধি-ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে যে উগ্র বিষের জ্বালা ফেনাইয়া উঠিয়াছে, তাহাই আত্মশরীরে সঞ্চারিত করিয়া নীলকণ্ঠের মত মৃত্যু লইয়া খেলা করিতে সে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। কথিত আছে, দুর্দ্ধর্ষ রোমান্ বাহিনীর গ্রীস আক্রমণকালে বৈজ্ঞানিক আরকিমিডিস্ গণিতের অঙ্কের জটিলতা মধ্যে এমনই নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাহাকে হত্যা

করিবার জন্ত যে সৈনিক পুরুষ তাহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাকে শিষ্টভাবে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন— মহাশয়, আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি গণনার শেষ ফল করিয়া লই। এই যে একাগ্র নির্ভীক সাধনা, আত্মোৎসর্গ, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার উর্দ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের লোকে কল্পবাস— উহা জড়জগতের নিশ্চল স্থাণু নহে, অধ্যাত্মের রশ্মিসম্পাতে সমুজ্জল এবং ঐ জ্যোতি প্রপাতেরই স্নিগ্ধধারা ধর্ম্মের উপর, তেমনই শিল্প ও বিজ্ঞানের উপর পড়িয়া মানবের সমগ্র জীবনকে সুষমায় ভরিয়া দিয়াছে।

অথর্ব্ববেদে একটি শ্লোক আছে,—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং
শ্রমো ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মচ।
ভূতং ভবিষ্যচ্ছিষ্টে
বীর্য্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত, সত্য, তপ, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অতীত ও ভবিষ্যত, বীর্য্য, লক্ষ্মী,—সবই উচ্ছিষ্ট শক্তি (surplus energy) হইতে উদ্ভূত। বিবর্ত্তনের পথে যে সকল জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, আবার কালক্রমে অনেকের বিলোপও ঘটিয়াছে, তাহাদের সমস্ত শক্তি জীবনধারণের জন্ত খাদ্যসংগ্রহ এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিঃশেষিত হইয়াছিল, উচ্ছিষ্ট বা উদ্বৃত্ত বল কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে নাই। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ, বন-মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট জীব (anchropoid) যখন জন্মিল তখন ছিল তাহারা বৃক্ষবাসী, চতুষ্পদ প্রাণীর গতি প্রণালী ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে দুই পায়ে ভর করিয়া চলিতে শিখিয়াছিল। মুক্ত দুইটি হস্তকে কিরূপে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে ফলমূল আহরণের ও আত্মরক্ষার কার্য্যে নিয়োজিত করা চলিতে পারে এবং উহার তুলনায় অপরাপর প্রাণীগুলির পক্ষে ঐ সব কার্য্য কতদূর কষ্টসাধ্য ছিল—তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানুষের উদ্বৃত্ত শক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে। মানবপ্রগতিকে সাহায্য করিয়াছিল আর একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, যাহা হইতে ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশুপক্ষী জীবজন্তু চীৎকার হুঙ্কার, আর্ত্তনাদ বা কলকাকলীর দ্বারা ক্রোধ ভয় প্রভৃতি মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা ছাড়া অন্ত ভাষা তাহাদের নাই। কথাবার্ত্তা বলিতে শিখিয়া মানুষ পরস্পরকে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিল। ইচ্ছা অভিরুচি জ্ঞাপন, বিপদ আপদে সতর্কতার সঙ্কেত—ভাষাকে বাহন করিয়া মানুষের এই আত্ম-প্রকাশ, সংঘগঠন ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার দক্ষতাও দান করিয়াছিল। ফলে, আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিতে আর তাহার সম্পূর্ণ শক্তিকে ব্যয় করিতে হইল না, বাকি অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকিয়া গেল। ইহাই অথর্ব্ববেদের আদ্য ঋষির উচ্ছিষ্ট বল, যাহার সুব্যবহার হইতে মানুষ শুধু ঋত সত্য তপ ধর্ম্ম মাত্র লাভ করে নাই; রাষ্ট্রকেও গড়িয়া তুলিয়াছে ঐ উচ্ছিষ্ট শক্তির প্রভাবে এবং উহারই বলে সে আজ শ্রমী, কর্ম্মী, বীর্য্যবান ও লক্ষ্মীমন্ত।

খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার ফাঁকে, অবসরক্ষণে, আদি মানবের উদ্বৃত্ত শক্তির ঝরণা অবিরল ধারায় বহিয়া যাইত; তখন উহার তরঙ্গ-ভঙ্গের ফেনপুঞ্জের চূড়ায় সারা বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। তাহার মনে কৌতূহল ও বিস্ময়, প্রকৃতির গুপ্তরহস্য জানিবার আগ্রহ জন্মিত। কি এই প্রকৃতি, কোথায় ও কিরূপে ইহার উদ্ভব—এই প্রশ্নের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা আসিয়া দেখা দিত, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ, মন শিশুর মত কল্পনাপ্রবণ, উপাদানের অভাব সে কল্পনা দিয়া পূরণ করিয়া লইত। এই সৃষ্টি-প্রহেলিকা সকল জাতির ধর্ম্মচেতনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে; ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির দ্বারা মানুষ এই দুরূহ প্রশ্নের জবাব দিতে চাহিয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে অদ্ভুত, অপরিণত চিত্তের পরিচায়ক এমন সব হাস্যকর সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) ধর্ম্মের মধ্যে স্থান পাইয়াছে যাহা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অনেককাল পর্য্যন্ত বাধা দিয়া আসিয়াছিল। সৃষ্টি-তত্ত্বের ঐ পরিপ্রশ্ন বৈদিক ঋষিগণের মনে কিরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, ঋগ্বেদের 'নাসদীয় সূক্তে' তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে:

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।

কোথা হইতে আসিল, কিরূপে গড়িয়া উঠিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড? পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত একমাত্র তিনিই জানেন—অথবা হয়ত তিনিও জানেন না।

এইরূপে অনেক প্রশ্ন পূর্ব-যুগে মানুষের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রতিধ্বনি এখনো মিলাইয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে—ঋগ্বেদের মত 'একমাত্র তিনিই জানেন, অথবা হয়ত তিনিও জানেন না' এত বড় সন্দেহের কথা প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। ঋগ্বেদে আরও একটি প্রশ্ন দেখা যায়, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে:

ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক স্বিৎ?

জীবন, মন ও আত্মা ভূমি হইতে কিরূপে নির্গত হইল? পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব হইল কিরূপে, ইহা আজিকার বৈজ্ঞানিকের একটা গবেষণার বিষয়। একদিন মানুষ চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণের মধ্যে ঐশী শক্তিকে মাত্র দেখিয়াছে, উহাদের দেবতারূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান তাহাতে তুষ্ট হয় নাই,—প্রেক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা কি ও কেন এই দুইটি মহাপ্রশ্নের সমাধানের জন্ত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—উভয়ের মূলেই ছিল কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা, প্রকৃতির মূল কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ উভয়ের লক্ষ্য। ধর্ম্ম অন্তর্মুখী, উপলব্ধিজাত অথবা কল্পিত সত্যকেই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নাই। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান বহির্মুখী আকারে দেখা দিয়াছে, জগত প্রকৃতির উপাদানগুলিকে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্ব-রহস্যকে উদ্ভাবিত করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মের মত অন্তর্দৃষ্টি (intuition) বা কল্পনার আশ্রয় লয় নাই, প্রমাণ ও যুক্তির বাঁধ দিয়া গবেষণামূলক সিদ্ধান্তকে সঙ্গত প্রণালীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম জগতকে আধ্যাত্মিকতা হইতে পৃথক করিয়া সম্পূর্ণ জড়রূপে দেখিয়া আসিয়াছে, ইহা মনে করা ভুল—

উপনিষদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। কৌষিতকী উপনিষদ্ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই,—আরও বলিয়াছে, অন্নং ব্রহ্ম ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্বেতকেতু উপাখ্যান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ঐ উপাখ্যানের দ্বারা উপনিষদের ঋষি জড় প্রকৃতি ও অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরটিকে কেমন সহজে ভূমিসাৎ করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। চার্ব্বাক দর্শন ছাড়িয়া দিলে, জড় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ জড়বাদ বা বস্তুতন্ত্রের পতাকা তুলিয়া ধরা এ-দেশে মোটেই দেখা যায় না,—আধ্যাত্মিক সত্তাও তেমনই বিশ্ব-জগতের বাহিরে, deus ex machina রূপে, স্বতন্ত্র কোন স্থানে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করেন নাই! বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই আমরা ঐ সত্তার বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। সূক্ষ্ম অনুভূতির সূত্র ধরিয়া মহাবৃক্ষ হইতে বীজের অন্তরালে বিশ্বের কারণ-রূপী অদৃশ্য অণিমা পর্য্যন্ত অবাধে পৌঁছিয়া উদ্দালক এই সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম, অধ্যাত্ম ও জড় ক্রমিকতার পারম্পর্য্য মধ্যে সত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে,—বিরোধের পরিখা খুঁড়িয়া উভয়ের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করা চলে না।

প্রতীচ্য জগতে জড়বাদের (materialism) পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সাফল্য অনেক মনীষীকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছিল। ড্যালটনের আনবিক তত্ত্ব (atomic theory) দৃশ্যমান সকল বস্তুরই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও গঠন প্রণালীর একটি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গেল—তারপর বিদ্যুত লইয়া ফ্যারাডের আশ্চর্য্য পরীক্ষাগুলি বিজ্ঞানের মর্য্যাদা আরও বাড়াইতে লাগিল। পরবর্ত্তীকালে দুইটি নূতন তত্ত্ব—শক্তির সংরক্ষণ (conservation of energy) ও বিবর্ত্তনবাদ (evolution) যখন আসর জুড়িয়া বসিল, তখন সুধীগণের মনে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, বিজ্ঞান এমন একটি চাবিকাঠির সন্ধান পাইয়াছে যাহা দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির যাবতীয় রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা যায়। বিজ্ঞানের এই জয়-যাত্রার যুগে বৈজ্ঞানিক সমাজে এরূপ ধারণার জন্ম স্বাভাবিক যে, প্রকৃতি একটি যন্ত্র বিশেষ, যন্ত্রের মত বস্তুর গুণধর্ম্মের বাঁধা-ধরা নিয়মে পরিচালিত; উহার রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক কারখানায় যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাণী জীবনের আবির্ভাব সেইরূপ কোন প্রক্রিয়ার ফলে; মানুষের মন দেহের ছায়া (epiphenomenon) মাত্র এবং যকৃত যেমন পিত্ত ক্ষরণ করে, চেতনাও ক্ষরিয়া পড়ে তেমনই মস্তিষ্ক হইতে—Brain secrates consciousness as liver csecrtes bile. ইহাই প্রকৃত জড়বাদ,—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, জড়-বিজ্ঞানের এই সফেন উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও, মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্ধ হয় নাই, বরং জীবনের মূলগত নৈতিক আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া ঐ যুগের কবিদের মধ্যে একটা রোমান্টিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল। তাহারা যন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন না, বিজ্ঞানের উত্তেজক মদিরা পাত্র অনাদরে পড়িয়া রহিল,—তাহাদের অনুপম সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের অন্তর্জ্জগৎ ও প্রকৃতির শোভা সম্পদকে ঘেরিয়া চিরসুন্দরের বন্দনায় লীলায়িত হইয়া উঠিল। মহাকবি গেটে তাহার সুবিখ্যাত 'ফাউস্ট্' নাটকে মানুষের জীবনে শয়তানের প্রলোভনের সহিত সৎ প্রবৃত্তির—প্রেয়ের সঙ্গে শ্রেয়ের—চিরন্তন বিরোধকে ফুটাইয়া তুলিয়া আধ্যাত্মিক নীতিধর্ম্মকেই মহনীয় করিয়াছেন। স্বভাব-কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন জীবন্ত প্রকৃতির উপাসক—শষ্প শ্যাম বনাকীর্ণ ভূমি, অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা তাহার মনে এক বিরাট সত্তার অনুভূতি জাগরিত করিত; অস্তমিত রবিরশ্মির মত তাহারই পুলক স্পন্দন তিনি জলে স্থলে নভোমণ্ডলে সঞ্চারিত দেখিতে পাইতেন। শেলীর প্রেম মৃত্যুহীন প্রাণ,—তিনি বলিলেন, I change but I can not die. আর টেনিসন তাহার In memorium আরম্ভ করিয়াছেন এইরূপে :

> Strong son of God, immortal Love
> Whom we that have not seen Thy face,
> By faith and faith alone embrace.
> Believing where we can not prove.

এই পদ্যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রভাব কবিচিত্তকে দোলায়মান করিলেও, ভক্তি বিশ্বাসই জয়ধ্বজা উড়াইয়া বাহির হইয়াছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়*

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার প্রতিভা তোমার সুযশে
ভোলেনি আমার মন,
সব চেয়ে তব বড় পরিচয়
তুমি ছিলে ব্রাহ্মণ।
হিন্দুরে তুমি জীবনে মরণে
বলেছ রাখিতে সত্য স্মরণে
শুচিতা কর্ম্মে মনে ও বাক্যে
মোদের শ্রেষ্ঠ ধন।

মোদের ক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র
এ ভারতবর্ষ,
ঋষি সন্তান মোরা—সনাতন
মোদের আদর্শ।
ভক্তি নিষ্ঠা সদা-সদাচারী
বৈশিষ্ট্যের মোরা অধিকারী,
তিন সন্ধ্যায় মোরা বুকে পাই
দেবতার স্পর্শ।

নিত্য আচারে ব্যবহারে তুমি
হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ,
বিপ্রের যাহা প্রাপ্য চেয়েছ
চাহনিকো সম্মান।
তুমি চলে গেছ শূন্য আসন
নেহারি ব্যথায় ভরে উঠে মন
তুমি আমাদের জাতীয় জীবনে
দেবের মহৎ দান।

* ইনি বর্দ্ধমানের বিখ্যাত উকীল ও স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। সনাতন হিন্দু আদর্শে ইঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম প্রকরণ

বিদ্যাসমুদ্দেশ

(৫)

মূল :—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এইগুলিই বিদ্যা।

সঙ্কেত :—আন্বীক্ষিকী—শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণে মূলপাঠ—আন্বীক্ষকী, পাদটীকায় পাঠান্তর—আন্বীক্ষিকী। হেতুসমূহ-দ্বারা অর্থতত্ত্বের পরীক্ষার নাম অন্বীক্ষা ; অন্বীক্ষা যাহাতে প্রয়োজন সেই হেতুবিদ্যাই 'আন্বীক্ষিকী'। ত্রয়ী—ঋক্-যজুঃ-সাম-বেদ ; এই তিনটি বেদ মিলিতভাবে একই ক্রতুর সাধক—এ কারণে এই তিন বেদ একত্র একই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়—এই কারণে ইহাদিগের সমষ্টিগত সংজ্ঞা—'ত্রয়ী' ; অথর্ব্ববেদে অভিচারাদি কর্ম্মের জ্ঞান ও ফল উল্লিখিত আছে বলিয়া উহা ঋক্-যজুঃ-সাম-রূপ ত্রয়ী হইতে পৃথক্-শ্রেণীভুক্ত। গণপতি শাস্ত্রীর ইহাই অভিমত। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজী—the triple Vedas আমাদের মনে হয়—'ত্রয়ী' শব্দটির তাৎপর্য্য অন্যরূপ। বৈদিক মন্ত্রগুলির তিন প্রকার ভেদ—(১) কতকগুলি মন্ত্র শ্লোকাকারে গ্রথিত—উহারা অর্থানুসারে পাদবদ্ধ শ্লোক—মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—উহাদেরই সংজ্ঞা—'ঋক্' ; (২) আর কতকগুলি মন্ত্র গীতি-রূপ ; ঐগুলির নাম—'সাম' ; (৩) অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি—শ্লোকও নহে—গীতিও নহে—গদ্যাকারে গ্রথিত : উহাদের সংজ্ঞা—'যজুঃ'। এই তিন প্রকার ব্যতীত চতুর্থ প্রকার মন্ত্রই নাই। কিন্তু বৈদিক মন্ত্র সংহিতা চারিটি—ঋক্-সংহিতা, যজুঃ-সংহিতা, সাম-সংহিতা ও অথর্ব্ব-সংহিতা। 'সংহিতা'-শব্দের অর্থ—সমষ্টি (collection)। ঋক্-সংহিতা—ঋঙ্-মন্ত্রের সমষ্টি। সাম-সংহিতা—সাম-মন্ত্রের সমষ্টি। যজুঃ-সংহিতা—যজুর্মন্ত্রের সমষ্টি—হয়ত উহার মধ্যে কয়েকটি ঋঙ্-মন্ত্রও থাকিতে পারে—তবে যজুর্মন্ত্রেরই আধিক্য। অথর্ব্ব-সংহিতা—ইহাতে ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্রদ্বয় বিদ্যমান ; মন্ত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অথর্ব্ব-সংহিতার নামকরণ হয় নাই—বিষয়ানুসারে ঋষি নামানুযায়ী উহার নাম হইয়াছে। অতএব, 'ত্রয়ী' বলিতে ত্রিবিধ মন্ত্রে গ্রথিত চতুর্ব্বিধ বেদ-সংহিতাকেই বুঝায়—অথর্ব্ব বেদ বাদ পড়ে না—ইহাই মহর্ষি জৈমিনির অভিপ্রায়—মীমাংসাদর্শনে পরিস্ফুট। ত্রয়ী—ত্রিবিধ-মন্ত্রাত্মক সমগ্র বৈদিক সাহিত্য। বার্ত্তা—কৃষিশাস্ত্র, পশুপালন-শাস্ত্র ও বাণিজ্য শাস্ত্র ; agriculture, cattle-breeding and trade. দণ্ডনীতি—রাজ-নীতি-শাস্ত্র ; science of Government.

মূল :—ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি (এই তিনটি মাত্র বিদ্যা)—ইহাই মানবগণের (মত) ; কারণ, আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বিশেষ-মাত্র।

সঙ্কেত :—মানবগণ—মনু-প্রণীত-ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্প্রদায়-ভুক্তগণ ; the school of Manu (SH) ; ইহাদিগের মতানুসারে তিনটি মাত্র বিদ্যা—আন্বীক্ষিকীকে ইঁহারা পৃথক্ বিদ্যারূপেই গণনা করেন না ; কারণ, (১) আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীর অনুগামী—ও (২) ত্রয়ীর অর্থবিচারই-আন্বীক্ষিকীর বিষয়—এই হেতু আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীরই প্রকারভেদ মাত্র—পৃথক্ বিদ্যান্তর নহে। (১) ত্রয়ীর অনুগামিনী আন্বীক্ষিকী—সাংখ্য-যোগ-তর্কশাস্ত্র। (২) ত্রয়ীর অর্থবিচারাত্মিকা আন্বীক্ষিকী—পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত-দর্শন)। কামন্দকও এই কথাই বলিয়াছেন—

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ ত্রয়ীদং সর্ব্বমুচ্যতে"।

শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দঃ-জ্যোতিষ—বেদের এই ষড়ঙ্গ, ঋক্-সংহিতা, যজুঃ-সংহিতা, সাম-সংহিতা ও অথর্ব্ব-সংহিতা—এই চারি বেদ-সংহিতা, মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থান—এই সকলই ত্রয়ীর অন্তর্গত। গণপতি শাস্ত্রীর টীকায় উহাই তাৎপর্য্য। কৌটিল্যের আশয় অন্যরূপ। তাহা যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে। ত্রয়ী-বিশেষ—a special branch of the Vedas (SH).

মূল :—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—(এই দুইটি মাত্র বিদ্যা)—ইহাই বার্হস্পত্যগণের (সিদ্ধান্ত)—যেহেতু লোকযাত্রাবিদের সংবরণ মাত্র ত্রয়ী।

সঙ্কেত :—বার্হস্পত্যগণ—বৃহস্পতি-প্রণীত অর্থশাস্ত্রের অনুগামী সম্প্রদায়ভুক্তগণ ; the school of Brihaspati. ইঁহাদিগের মতানুসারে দুইটি মাত্র বিদ্যা—ত্রয়ীকেও ইঁহারা পৃথক্ বিদ্যারূপে গণনা করিতে চাহেন না। ত্রয়ীকে বিদ্যার শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়ায় (মানব-মতানুসারে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত) আন্বীক্ষিকীও আপনা হইতেই বাদ পড়িল। অতএব, অবশিষ্ট বিদ্যা রহিল মাত্র—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। সংবরণ-মাত্র abridgment, pretext (?)—(SH). সংবরণ—covering, screening, hiding, concealment, disguise (Apte') লোকযাত্রা-বিদের—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির অনুষ্ঠানরূপ যে লোক-ব্যবহার—তাহা যিনি জানেন, তাঁহার পক্ষে। ত্রয়ী—বেদ। সংবরণ মাত্র—'অমুক নাস্তিক'—এবংবিধ লোকনিন্দার আবরক মাত্র। যদিও লোক বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির সাহায্যে লোকতন্ত্র [লৌকিক ব্যবহার) সম্যগ্‌রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তথাপি তিনি যদি ত্রয়ীকে পরিহার করিয়া চলেন,—তাহা হইলে তাঁহার 'নাস্তিক' বলিয়া লোক-সমাজে নিন্দা প্রচারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে ; অতএব কেবল উক্ত নিন্দা পরিহারের উদ্দেশ্যেই ত্রয়ী-পরিগ্রহের ব্যবস্থা। নিন্দা-দ্বার-গোপন-মাত্র ফল ত্রয়ীর। এই ফল অল্প প্রয়োজন বলিয়া বার্হস্পত্যগণ ত্রয়ীকে পৃথক্ বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই (গঃ শাঃ)।

মূল :—দণ্ডনীতি—এই এক (মাত্র) বিদ্যা—ইহাই ঔশনস-গণের (মত) ; কারণ, উহাতেই সকল বিদ্যার আরম্ভ প্রতিবদ্ধ।

সঙ্কেত :—একা (মূল)—একৈব (গঃ শাঃ)—একমাত্র ; only one (SH). ঔশনসগণ—উশনা :—শুক্রাচার্য্য ; তৎপ্রণীত নীতিশাস্ত্র-সম্প্রদায়ভুক্ত শুক্রশিষ্যবর্গ। তস্যাং হি সর্ব্ববিদ্যারম্ভাঃ প্রতিবদ্ধাঃ (মূল)—তাহাতে (দণ্ডনীতি শাস্ত্রে) সকল বিদ্যার আরম্ভ (অর্থাৎ যোগক্ষেম) প্রতিবদ্ধ (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত)—(গঃ শাঃ)। যোগক্ষেম—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও-প্রাপ্তের রক্ষণ। -'In that science all other sciences have their origin and end" (SH) ; 'and end'—এই অংশটুকু কোথা হইতে পাওয়া গেল ? Because in it the beginning (origin) of all branches of knowledge is invariably and inseparably connected—এইরূপ বলিলে কথঞ্চিৎ অর্থ-প্রকাশ হইত।

মূল :—চারিটি মাত্র বিদ্যা—ইহাই কৌটিল্যের (অভিমত)। যেহেতু উহাদিগের দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ জানা যায়, সেই হেতু বিদ্যা-সমূহের বিদ্যাত্ব।

সঙ্কেত :—চতস্রঃ এব—চারিটিই—তিনটি, দুইটি বা একটি নহে ; 'এব' পদটি দ্বারা তিন বিদ্যা, দুই বিদ্যা, এক বিদ্যা—এই তিনটি পক্ষের খণ্ডন করা হইয়াছে (গঃ শাঃ)। চারিটি বিদ্যা—'বিদ্যা' ইহাদিগের সাধারণ সংজ্ঞা ; ইহাদিগের পরস্পর অবান্তর ভেদ আছে—এ কারণে প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যা (গঃ শাঃ)। বিদ্যানাং বিদ্যাত্বম্—বিদ্যাগুলির বিদ্যাত্ব। অর্থাৎ—যেহেতু এই বিদ্যাসমূহের সাহায্যে ধর্ম্ম ও

অর্থের স্বরূপ-পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, এই কারণে ইহাদিগের নাম হইয়াছে 'বিদ্যা'। 'বিদ্যা'-শব্দের অর্থ—ধর্মার্থের বেদনের (অর্থাৎ জ্ঞানের) উপায়—means of knowing righteousness and wealth; wherefore it is from these sciences that all that concerns righteousness and wealth is learnt, therefore they are so called" (SH); "all that concerns"—এ অংশ কোথা হইতে পাওয়া গেল? মূলে অনুরূপ অংশ ত নাই। ভাষান্তর যথাযথ নহে। Since with these (branches of knowledge) (one) may know righteousness and wealth, so these sciences are called 'Vidya' (science)—এইরূপ একটা ভাষান্তর করা উচিত।

মূল:—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—ইহাই আন্বীক্ষিকী।

সঙ্কেত:—সাংখ্য—প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-শাস্ত্র। সাংখ্য-মত বহু প্রকার ছিল—মহাভারতে ও চরক-সংহিতায় এ সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান-মাত্র পাওয়া যায়। বর্তমানে কাপিল নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্রের প্রচার অধিক। কপিল-আসুরি-পঞ্চশিখ—ইঁহারা এ সম্প্রদায়ের আচার্য্য। ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ। যোগ—প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র। উহা অষ্টাঙ্গ—যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যান-সমাধি—এই অষ্ট অঙ্গ। মহাকবি ভাস 'প্রতিমা'-নাটকে বলিয়াছেন—আদি যোগশাস্ত্র মাহেশ্বর প্রোক্ত। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ যোগশাস্ত্রের আদি বক্তা। পতঞ্জলি তাঁহার মতানুসারে যোগসূত্র রচনা করেন। ব্যাসদেব উহার ভাষ্যকার। লোকায়ত—"ন্যায়শাস্ত্র তর্কশাস্ত্রোক্ত (গঃ শাঃ)। 'লোকায়ত' বলিলে নাস্তিকবাদ—চার্ব্বাক মত বা বার্হস্পত্য-মত বুঝায়। Jolly ও Schmidt বলিয়াছেন—"The logical philosophy which is here declared to include the materi listic system Lokayata, is sometimes identified with the latter, see Ramayana, II. 100. 38. One of the chief rules of that system states that gain and love are the only two objects, of man, and so the Arthasastra regards gain as the principal pursuit of man (I. 7.) Brihaspati whose heretical opinions concerning the authority of the Veda are quoted in this chapter is the supposed author of the Lokayata system. See Brihas-pati sutra, ed. by F. W. Thomas (Punjab Sanskrit Series No. 1)." কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (পাঞ্জাব সংস্কৃত সিরিজ নং ৪)

মূল:—ত্রয়ীতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। বার্ত্তায় অর্থ ও অনর্থ। দণ্ড-নীতিতে নয় ও অনয়, আর বল ও অবল। ইহাদিগের (সিদ্ধান্ত) হেতু-সমূহ-দ্বারা অন্বীক্ষমাণা (আন্বীক্ষিকী) লোকে উপকার করে,—ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে বুদ্ধিকে অবস্থাপিত করে, আর প্রজ্ঞা-বাক্য-ক্রিয়ার বৈশারদ্য (সম্পাদন) করিয়া থাকে—

সঙ্কেত:—ত্রয়ীতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রধানতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব, ত্রয়ীর কোন কোন স্থানে অর্থানর্থ, নয়ানয় ইত্যাদি আনুষঙ্গিকভাবে প্রতিপাদিত হইতে দেখিলেও পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয় না। ত্রয়ী প্রধানতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রতিপাদক, গৌণভাবে অর্থানর্থ ও নয়ানয়ও প্রতিপাদন করে। ঐরূপ বার্ত্তা মুখ্যভাবে অর্থানর্থের প্রতিপাদক (গঃ শাঃ)। ধর্ম্ম—অধ্যয়ন, যাজন ইত্যাদি। অধর্ম্ম—ব্রহ্মাংসভক্ষণ ইত্যাদি। Righteous and unrighteous acts (SH). অর্থ—যথাকালে বীজ-বপনাদিজনিত ফল। অনর্থ—অকালে বীজবপনাদি-জনিত অফল (গঃ শাঃ। Wealth and non-wealth (SH); gain and loss বলিলেই ভাল হইত। সরল অর্থ—লাভ ও লোকসান। নয়—বলবানের সহিত সন্ধি—যাহা দ্বারা যোগক্ষেম সাধিত হয়। অনয় বা অপনয়—বলীয়ানের সহিত যুদ্ধ যাহাতে যোগক্ষেম ব্যাহত হয় (গঃ শাঃ); গণপতিশাস্ত্রীর পাঠ—নয়াপনয়ৌ; শ্যামশাস্ত্রীর মূল পাঠ—নয়ানয়ৌ। Expedient and inexpedient (SH); নীতি ও অনীতি—উপায় ও অনুপায় (অসদুপায় ঠিক নহে, বরং—উপায়াভাবে বলা চলে)। বলাবল—বল ও বলাভাব; potency and impotency (SH), এতাসাং (মূল) ইহাদিগের—ত্রয়ী-বার্ত্তা-দণ্ডনীতি-শাস্ত্রত্রয়ের। হেতু-দ্বারা—ন্যায়-দ্বারা। অন্বীক্ষমাণা—শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণে কেবল 'অন্বীক্ষমাণা' পাঠ আছে; গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণে উহার পর 'আন্বীক্ষিকী' পদ সন্নিবিষ্ট আছে;—সম্প্রধারণ-কারিণী। এতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা—তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ন্যায় বা যুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় আন্বীক্ষিকী। ত্রয়ীতে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ করা হয় বার্ত্তায় অর্থানর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়, দণ্ডনীতিতে যে নয়ানয়-বলাবল নির্ণয় করা হয়, আন্বীক্ষিকী-শাস্ত্র-সম্মত হেতু (অর্থাৎ ন্যায় বা যুক্তি) দ্বারা তাহার সমর্থন হইয়া থাকে। "When seen in the light of these sciences" (SH)—কোনরূপ সঙ্গত অর্থ হয় না। Investigating (the truth) of these science by means of reasons—বলা চলে। আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের কর্ত্তব্য—হেতু দ্বারা ত্রয়ী-বার্ত্তা-দণ্ডনীতির সিদ্ধান্ত-সমর্থন। ত্রয়ীতে যাহাকে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলা হইল, তাহাকে কেন ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলা হইল—হেতু-দ্বারা তাহার বিচার আন্বীক্ষিকীর কার্য্য। অন্বীক্ষণ—অনু (পশ্চাৎ) ঈক্ষণ (বিচার-বিশ্লেষণ)। যে সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে অন্য শাস্ত্রে আগম-মুখে করা হইয়াছে, যুক্তি-দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের পুনঃ স্থাপনের নাম অন্বীক্ষা—এক কথায় research করা। আন্বীক্ষিকী কিরূপে লোকের উপকার করে, তাহাই বলা যাইতেছে—(১) ব্যসনে (বিপদে) ও অভ্যুদয়ে (উন্নতিতে) বুদ্ধিকে অবিকৃত রাখে—যাহাতে সুখে চিত্ত অযথা প্রহৃষ্ট ও দুঃখে অত্যধিক উদ্বিগ্ন না হয়—সেইরূপ ব্যবস্থা করে; keeps the mind steady and firm in weal and woe; (২) প্রজ্ঞা-বৈশারদ্য, বাক্য বৈশারদ্য ও ক্রিয়া-বৈশারদ্য সম্পাদন করে; bestows excellence of foresight, speech and action (SH); আন্বীক্ষিকী-বিচারে প্রজ্ঞার নৈর্ম্মল্য, সভাস্থলে বাক্পটুতা ও কর্ম্মে দক্ষতা জন্মিয়া থাকে।

মূল:—আন্বীক্ষিকী—সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সকল কর্ম্মের উপায় ও সকল ধর্ম্মের নিত্য আশ্রয়-রূপে অভিমত।

সঙ্কেত:—সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ—পরীক্ষার সাধনভূত। সকল কর্ম্মের উপায়—আরম্ভ হইতে ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান-বৈচিত্র্য-প্রতিভার উৎপাদক। সকল ধর্ম্মের শশ্বৎ আশ্রয়—বৈদিক ও লৌকিক সকল প্রকার ধর্ম্মই অন্বীক্ষা-দ্বারা অবধার্য্যমাণ বলিয়া আন্বীক্ষিকী সর্ব্ব ধর্ম্মের সর্ব্বদা আশ্রয়ভূতা। এই তিন কারণে আন্বীক্ষিকীকে পৃথক্ বিদ্যা বলাই সঙ্গত (গঃ শাঃ)। শ্যামশাস্ত্রী 'শশ্বৎ' পদটির অন্বয় করিয়াছেন—'মতা'—এই ক্রিয়াপদের সহিত—শশ্বৎ (বিদ্যা) আশ্রয় (গঃ শাঃ)—এরূপ অন্বয় করেন নাই; ever held to be (SH); আন্বীক্ষিকী সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সকল কর্ম্মের উপায় ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়-রূপে সর্ব্বদা অভিমত। প্রদীপ—light; উপায়—easy means; আশ্রয়—receptacle (of all kinds of virtues)—(SH); 'Easy' পদটি না দিলেই মূলানুগ হইত। Receptacle না বলিয়া—basis বলিলেই ভাল হইত।

'ইতি বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে বিদ্যা-সমুদ্দেশে আন্বীক্ষিকী-স্থাপনা-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

পোল্যাণ্ড—১৯৪১ সালের পরে

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

২

১৯৪০ সালে যদি পোলাণ্ডে হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে, জার্মানরা তার পর ২ বছর ধরে সেই অঞ্চলটিতে আধিপত্য করা সত্ত্বেও এতদিন পরে এই মূল্যবান খবরটি লোকে জানিল কি করে? তাও জানিল কোথা থেকে? জানল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে। অধিবাসীরা হঠাৎ এতদিন চেপে রেখে তার পর খবরটি দিল কেন?

মস্কো বেতার এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল :—"with the much too fresh bodies of their victims......with their carefully preserved diaries......they have overshot the mark." পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই জঘন্য মিথ্যা রটনাটির পিছনে উদ্দেশ্য কি? মিত্রজাতির মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করা এবং পোল্যাণ্ড ও রুশিয়ার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা। চক্রান্তটি যে ডাঃ গোয়েবলসের তাতে সন্দেহ নেই। প্রমাণ স্বরূপ, 'ট্রুথ' পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন, "ঘটনাটিকে জার্মানী অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। অরণ্যের কবর গুলোর কথা সে যেন অনেক আগেই জানত। কিন্তু বর্তমান ভাঙনটি ধরাবার জন্য এতদিন তার কূট-নীতিকরা চুপচাপ অপেক্ষা করে বসেছিলেন।"

১৭ই এপ্রিল তারিখে প্রবাসী পোল সরকার হত্যাকাণ্ডটি সম্বন্ধে তদন্ত করার ভার দিলেন আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের ওপর অর্থাৎ গোয়েবেলসের গল্পে তাঁরা আস্থা প্রকাশ করলেন। ঠিক ৫০ মিনিট পরে বার্লিন থেকে এই কাজটি সমর্থন করা হয় বেতারের মারফৎ অথচ কাগজে কলমে পোল্যাণ্ড চক্রশক্তির বিরুদ্ধ দলে! ঠিক একই তারিখে স্পেনের পররাষ্ট্র-সচিব জর্ডানার মারফৎ জার্মানী ইঙ্গ-আমেরিকানদের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়। জার্মানী বলে যে যুদ্ধে কেউ জয়লাভ করবে না, মিছামিছি শক্তিক্ষয় করে বলশেভিকদের সাহায্য করে লাভ কি? ২১শে এপ্রিল স্প্যানিশ নিউজ এজেন্সি স্পেনের প্রত্যেক সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষকে হত্যাকাণ্ডটি ঘটা করে প্রচার করতে উপদেশ দেয় এবং রেড ক্রশ ও পোল সরকারের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে বলে। সুতরাং প্রবাসী পোল-সরকারের সঙ্গে যে ফ্যাসিষ্টদের দহরম মহরম ছিল এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে এবং মিত্রজাতিদের মধ্যে তাঁরা যে ভাঙ্গন ধরানোর যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তাও সুস্পষ্ট।

এবার সোভিয়েট থেকে এ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছিল দেখা যাক। ১৯শে এপ্রিলের প্রাভ্দা পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছিল :—

"পোল মন্ত্রিসভার অজ্ঞাত নয় যে জনমত গঠনের জন্য হিটলারীদের এই ধরণের মিথ্যা রটনা এই প্রথম নয়......সোভিয়েট বাহিনী স্মলেনস্ক অঞ্চল ছেড়ে আসার পর জার্মানরা সেখানকার যুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য সোভিয়েট নাগরিকদের নিজেরাই খুন করেছে।......পোল মন্ত্রিসভার ক্রিয়া কলাপ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাঁরা সোজাসুজি হিটলারকে সমর্থন করেছেন......পোল জনগণ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাবে না...."

পোল সরকারের দোষারোপের প্রত্যুত্তরে মঃ মলোটাফ্ জানান :—

"পোল সরকারের এই ব্যবহার অত্যন্ত অস্বাভাবিক।......জার্মান ফ্যাশিষ্টরা নিজেরা অন্যায় করে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। সেই দোষারোপকে পোল সরকার মেনে নিয়েছেন এবং ঘটা করে প্রচার করেছেন। ফ্যাশিষ্টদের ধমক তো তাঁরা দেননি বটেই, এমন কি আমাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎটুকুও চাওয়ার দরকার মনে করেননি।... জার্মান ও পোল সংবাদপত্রে একই সময়ে এই কুৎসা রটনা থেকেই বোঝা যায় যে, মিত্রজাতির শত্রু হিটলারের সঙ্গে পোল সরকারের যোগাযোগ রয়েছে।......যে মুহূর্ত্তে সোভিয়েট হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে নিদারুণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে রুশ ও পোল জনগণের এবং অন্যান্য স্বাধীনতাকামী দেশের জন্য অবিরলধারে রক্তদান করে চলেছে, সেই সময়ে হিটলারকে তোষণের জন্য পোল সরকার সোভিয়েটকে বিশ্বাসঘাতকের মত পিছন থেকে আঘাত করেছেন।......এই কাজের উদ্দেশ্য সোভিয়েট সরকারের অবিদিত নয়......সে উদ্দেশ্য সোভিয়েট ইউক্রেনে কামড় বসান। এই অবস্থায় সোভিয়েট সরকার মনে করেন যে পোল সরকার সোভিয়েটের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং শত্রুতা করেছেন। সুতরাং সোভিয়েট আজ থেকে পোল সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করছে।......"

বৃটিশ মুখপত্র 'টাইমস্' পত্রিকা লিখেছিল—

"......পোলদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে যুদ্ধের প্রথম শীতকালে জার্মান অধিবাসীদের উপর পোলদের নৃশংসতার কথা জার্মানরা প্রমাণ ও আলোকচিত্রের সাহায্যে রটনা করেছিল।... "

'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজে লেখা হয়েছিল :—

"......এই কূটনৈতিক ভাঙ্গনের জন্য পোল সরকারই দায়ী। প্রথমতঃ জার্মান দোষারোপকে মেনে নেওয়ার অধিকার তাঁদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে তদন্তের দাবী করার অধিকারও তাঁদের ছিল না।"

পোল লেখক ভাণ্ডা ভাসিলেভ্স্কা লিখেছেন, "এই প্রবাসী সরকারটি কাদের প্রতিনিধি? পোল জনগণের? কখনই না। পোল জনগণ তাঁদের নির্বাচনও করেনি, ক্ষমতাও দেয়নি। সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ড পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সরকার পালিয়ে যান এঁরা তাঁদের স্থানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। গোড়া থেকেই আমরা এঁদের চিনেছি। পলাতক সরকারের সঙ্গে এঁদের কোন তফাৎ নেই......সীমান্ত নিয়ে দরাদরি করাই এঁদের কাজ। কিন্তু জার্মানদের কবলিত অঞ্চলের জন্য এঁরা দরাদরি করে না—দরাদরি করেন সোভিয়েটএর সঙ্গে, সোভিয়েটকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবার জন্য।......"

বিজয়ের পথে লালফৌজ যখন পোল সীমানায় এসে পড়ল তখন লণ্ডন প্রবাসী পোল সরকার ১৯৪৪ সালের ৫ই জানুয়ারী যে বিবরণ প্রকাশ করলেন তার মর্মার্থ এই রকম "লাল ফৌজের বিজয়াভিযান পোল জাতির মনে আশা (!) জাগিয়েছে। পোল্যাণ্ডই প্রথম জার্মানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করেছিল (!) আজ চার বছরের উপর, পোল্যাণ্ড বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেছে (!)। কিন্তু সেখানে একটিও মীরজাফর পাওয়া যায়নি। (!) গুপ্ত সমিতিরাও যথেষ্ট কাজ করেছে (!)। বাইরে গঠিত পোল বাহিনীরা অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করে চলেছে। (!) সেজন্য শত্রুকবলমুক্ত হওয়ামাত্রই পোলজাতি সুবিচারের দাবী করে। আইনতঃ পোল সরকারই পোলজাতির একমাত্র প্রতিনিধি (!)। পোল সরকারের বক্তব্য এই যে অতলান্তিক সনদের (অস্তিত্বহীন) মতে পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দিতে হবে। জোর করে কোন ব্যবস্থা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। পোল সরকার আশা করেন যে ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য সোভিয়েট সরকার পোল গণতন্ত্রের অধিকার ও স্বার্থগুলোকে সম্মান করবেন এবং মেনে নেবেন। এই জন্যই তাঁরা গুপ্তসমিতিগুলোকে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে (!) এবং লালফৌজের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। লালফৌজ সীমান্ত অতিক্রম করার আগে যদি এই রকম একটি রুশ-পোল চুক্তি হয়ে যায়, তাহলে গুপ্ত সমিতিগুলোর লালফৌজের সঙ্গে সহযোগিতার সুবিধা হবে। (অর্থাৎ তা না হলে তারা সহযোগিতা করবে না) ১০ই জানুয়ারীর সোভিয়েট সরকারের প্রত্যুত্তরের মর্মার্থ

এই রকম :—পোল সরকারের বিবরণে কতকগুলো ত্রুটি আছে। পশ্চিম ইউক্রেন ও বাইলো রুশিয়ার জনসাধারণের ভোটের দ্বারাই রুশ-সীমানা নির্দ্ধারিত হয়েছে। ১৯২১ সালের রিগা চুক্তিতে জোর করে এই অঞ্চলগুলো রুশিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেগুলো ফিরিয়ে নেওয়ায় রুশ পোল বন্ধুত্বে বাধা হবার কোন কারণ নেই। সোভিয়েট সরকার অনেকবারই বলেছেন যে তাঁরা পোল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব কামনা করেন এবং পোল্যাণ্ডকে স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখতে চান। রুশিয়ায় গঠিত এবং শিক্ষিত পোল মুক্তি-সংসদবাহিনী জার্ম্মাণের বিরুদ্ধে অসাধ্যসাধন করছে। পোল্যাণ্ডের মুক্তির বেশী দেরী নেই। কিন্তু ইউক্রেন ও বাইলোরুশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে পোল্যাণ্ডের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। তবে পূর্ব্বসীমানা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের চুক্তির কিছু অদলবদল করা চলতে পারে—যদি তাতে পোল্যাণ্ডের কিছু সুবিধা হয়। যে সব অঞ্চলে পোলদের সংখ্যা বেশী সেগুলো পোল্যাণ্ডেরই প্রাপ্য। সে হিসাবে ১৯১৯ সালের কল্পিত কার্জ্জন লাইনকে মেনে নেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমদিকে জার্ম্মানী যে অঞ্চল পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল অর্থাৎ পোলিশ করিডোর, উত্তর সাইলেসিয়া, ড্যান্‌জিগ ও পমিনিয়াকে (বন্দর ২টি ৭০০ বছর ধরে পোল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল) পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তা না হলে পোল্যাণ্ডের আর্থিক জীবনের মৃত্যু ঘটবে এবং বল্টিকে বাণিজ্য করার পথ রুদ্ধ হবে। তা ছাড়া এই অঞ্চলে পোলরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।"

বিবরণের উত্তরে পোল সরকার ১৫ই জানুয়ারী আলোচনা স্থগিত রেখে বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চান এবং বলেন যে এক-তরফা বিচার তাঁরা মানতে রাজী নন। সোভিয়েট সরকার ১৭ই জানুয়ারী বলেন যে, পোল সরকার সীমান্তের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা কার্জ্জন লাইনও মানতে চান না। তা ছাড়া সরকারী ভাবে আলাপ আলোচনা আর সম্ভব নয়, কারণ ক্যাটিন হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পোল সরকার হিটলারের সহযোগিতা করায় সরকারী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সোভিয়েটের বন্ধুত্ব তাঁরা কামনা করেন না। তাহলে এখন প্রবাসী পোল সরকারের স্বরূপ চিনতে আমাদের আর অসুবিধা নেই। জার্ম্মানী রুশিয়া আক্রমণ করায় এরা বলেছিলেন, "আমাদের দুটি প্রবল শত্রু যুদ্ধ করছে। আমরা এখন চুপচাপ বসে দেখব কি হয়।" এরা পোল্স বাহিনীকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে দেননি কারণ "তাতে নাকি জার্ম্মানদের অসুবিধা হবে।" (only complicate matters for the Germans) কিন্তু পোল গণ-তান্ত্রিক দলগুলো তাঁদের কথা মত বসে থাকতে পারলে না। কৃষক বাহিনী, কৃষক প্রহরীদল, গণবাহিনী (শ্রমিক) গেরিলাবাহিনী ইত্যাদি অনেকগুলি দল পোল্যাণ্ডে গঠিত হোল। সরকারের তাঁবেদার বাহিনীগুলো এদেরই পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। জনসাধারণের বাহিনীগুলো থামল না। নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপে তারা জার্ম্মানদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললে, লাল ফৌজকে সাহায্য করতে লাগল। ফলে জার্ম্মানরা ওয়ারসর নাগরিকদের ওপর শোধ নিতে লাগল বটে, কিন্তু স্বাধীনতার কামনাকে তারা কণ্ঠরোধ করতে পারলে না। গেরিলা দলগুলোর কৃতিত্ব ক্রমেই উন্নতি লাভ করতে লাগল। জনগণের ইচ্ছার কাছে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা কতদিন আর দাঁড়াতে পারে। শেষে পোল সরকার সীমাবদ্ধ যুদ্ধের অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সরবরাহ বা যাতায়াত ব্যবস্থাগুলো নষ্ট করতে বারণ করলেন কারণ তাতে সোভিয়েটকে সাহায্য করা হবে। সেদিন ওয়ারসার মধ্যে যে গুপ্ত সমিতি বিদ্রোহ করেছিল সেটাও পোল সরকারের চক্রান্ত। তাদের দিয়ে নগরটি মুক্ত করে তাঁরা বলতেন কৃতিত্বের জন্ত পোল সরকারেরই দাবী।

জনগণের দলগুলো এতদিন ধরে যুদ্ধ করে ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী সংঘবদ্ধভাবে পোল্যাণ্ডের জাতীয় মুক্তি সংসদ গঠন করেছেন। এই সংসদকেই সোভিয়েট পোল্যাণ্ডের আইনসঙ্গত কর্ত্তৃপক্ষ হিসাবে অনুমোদন করেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েক দিন আগে প্রবাসী পোল সরকারও তাঁদের কোন আশা নেই দেখে এঁদের মানতে বাধ্য হয়েছেন। এই হচ্ছে তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিণতি।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই পোল সরকারকে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সযত্নে লালন করেছেন কেন এবং মিঃ ইডেন সেদিন পর্য্যন্ত অনুমোদন করেছেন কেন? এঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে তাঁরা সহ্য করেছেন কেন, কেনই বা এঁদের অযথা মনোবৃত্তি প্রচারের জন্ত খবরের কাগজ তাঁরা যোগান দিয়েছেন? আর এঁরাও সবসময় সোভিয়েটকে উপেক্ষা করে বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতা কামনা করেছেন কেন?

এই সব ব্যাপারের একমাত্র কারণ বৃটিশ ও মার্কিন শাসকদের বলশেভিক ভীতি ও সমাজতন্ত্র বিরোধিতা। এঁরা চান যুদ্ধের পর আবার সেই আগেকার ধনতান্ত্রিক শোষণমূলক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ষ্টেট্‌সম্যানের মত কাগজও লিখেছেন, "Mr Churchill has a special love for kings"…ইংলণ্ডে আজও সোভিয়েট-বিরোধী ফ্যাশিষ্ট তোষকদের অভাব নেই এবং তাঁদের আদর কম নয়। স্যর স্যামুয়েল হোরকে ভাইকাউণ্ট উপাধি দান তারই দৃষ্টান্ত; স্যর অসওয়াল্ড মোসলের মুক্তি এই রকম আর একটি উদাহরণ। আমেরিকায় এরা দলে আরও ভারী, কারণ সেখানে প্রশ্নসংঘাত বেশী। জার্ম্মানীও সেই সুযোগ নিতে বরাবর চেষ্টা করেছে। বৃটিশ যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে রুশবন্দীদের চেয়ে ভাল ব্যবহার করা হয়েছে। 'টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যে জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বৃটিশদের জানিয়েছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানকে তাঁরা অভ্যর্থনা করছেন কারণ রুশরা বার্লিন অধিকার করার চেয়ে ইঙ্গ-মার্কিনরা অধিকার করা ভাল। পোল সরকার হচ্ছেন এই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান সোভিয়েট বিরোধী অস্ত্র। ১৯৪৩এর মে দিবসে মিঃ ষ্ট্যালিন বলেছেন :—"দেখা যাচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিনরা সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে জার্ম্মানরা প্রথম দলের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়; আবার সোভিয়েট যদি সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহলে তারা সোভিয়েটের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করতে রাজী। মজ্জাগত বিশ্বাস-ঘাতকতা নিয়ে তারা নিজেদের মাপকাঠিতেই মিত্রশক্তিকে বিচার করার স্পর্দ্ধা রাখে।" তাহলে, এতদিনকার পোল সরকারকে আমরা জার্ম্মান ফ্যাশিজমের একটি প্রধান সহযোগী বলতে পারি। ১৯৩৪ সালের পোল-জার্ম্মান চুক্তির দ্বারা এই সহযোগিতার ভিত্তি পাকা করা হয়। ইউক্রেন ও বাইলোরুশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, জার্ম্মানী যে নিজের সাম্রাজ্যকে পূর্বদিকে বাড়াতে চেয়েছিল, সেই ইচ্ছাকে তোষণ করছিলেন পোল-সরকার। পোল-সরকার বেশ ভাল ভাবেই জানতেন যে সমগ্র ইউরোপে হিটলারের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে, পোল্যাণ্ডেরও স্বাধীনতা থাকবে না। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ তাঁদের কাছে স্বদেশের স্বার্থের চেয়ে বড়। পোল-জার্ম্মান চুক্তিতে চেকোশ্লোভেকিয়া অষ্ট্রিয়া বল্টিক রাষ্ট্রগুলোর বিপদ আরও ঘনিয়ে এল। ফরাসী-পোল চুক্তিটিকে গলা টিপে মেরে, জার্ম্মানী বল্টিকের ও বলকানের ছোট রাজ্যগুলো দিয়ে একটি ফ্যাশিষ্ট-ব্লক তৈরী করার ব্যবস্থা করলে। এই সেদিন পর্য্যন্ত পোল-সরকার পূর্ব্ব ইউরোপীয় যৌথরাষ্ট্র (Federation) গঠনের প্রস্তাব করছিলেন—যার মেরুদণ্ড হোত পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী ও বুলগেরিয়া অর্থাৎ এমন তিনটি দেশ যেখানে শাসকশ্রেণী অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

১৯৪২এর অগাষ্টে 'জেমিক্ পোলস্কি' পত্রিকা মন্তব্য প্রকাশ করেছিল :—"যুদ্ধোত্তর ইউরোপে কতকগুলো যৌথরাষ্ট্র হবে যেমন পোল-চেক্ যৌথরাষ্ট্র এবং গ্রীক-যুগোস্লাভ যৌথরাষ্ট্র।"

অক্টোবরে 'ডিমোক্রেসি পোলস্কি' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :—

"নবগঠিত ইউরোপে পোলাণ্ডের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকা সম্ভব নয়। চেকোস্লোভেকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেও পোলাণ্ডের আয়তন উপযুক্ত রকম বড় হবে না। আয়তন বৃদ্ধির সময় আসছে। কতকগুলি রাষ্ট্র মিলিয়ে দশ থেকে সাড়ে বার কোটি অধিবাসী-বিশিষ্ট একটি ব্লক আমাদের চাই।" পোল পররাষ্ট্রসচিব মঃ র‍্যাক্‌জিনস্কি 'সানডে টাইমসের' প্রতিনিধিকে বলেন, "ইউরোপের শক্তিসাম্যের জন্ত একটি শক্তিকেন্দ্রের প্রয়োজন। লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড ও চেকোস্লোভেকিয়া থেকে হাঙ্গারী ও বলকান পর্য্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর কেন্দ্র হবে পোলাণ্ড এবং পোলাণ্ড তাই চায়।"

১৯৪২এর ৩১শে ডিসেম্বর পোল সরকারের একজন মন্ত্রী মঃ মারিয়ান সিদা বলেন, "বল্টিক রাষ্ট্রগুলো যৌথরাষ্ট্রকে উপহার দেবে তাদের শ্রমশীলতা ও সামাজিকতা; চেকোস্লোভেকিয়া দেবে তার চমৎকার শ্রমশিল্প ও শিল্পশ্রমিক; হাঙ্গারী, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া দেবে তাদের মহামূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। তার বদলে পোলাণ্ড দান করবে তার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, মানুষ করে তুলবে পূর্ব্ব ইউরোপকে।"

পোল সরকারের এই প্রমত্ত অশিষ্ট মনোবৃত্তিকে সমর্থন করে বৃটিশ পত্রিকা 'ফর্টনাইটলি' মত প্রকাশ করে, "বল্টিক থেকে আড্রিয়াটিক ও কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত একটি যৌথরাষ্ট্র গঠন করাই পূর্ব্ব ইউরোপীয় সমস্যা সমাধানের এক মাত্র উপায়।"

পোল সরকারের যৌথরাষ্ট্রের আশা সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। 'ওয়ার্স অভ্যুত্থানের সাহায্যে রাজনৈতিক জুয়া খেলতে গিয়ে বহু নির্দ্দোষ দেশবাসীর মৃত্যুর কারণ হয়ে তাঁরা জগতের সামনে আরো ভাল করে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের পরিকল্পিত ও প্রস্তাবিত যৌথরাষ্ট্র গঠিত হলে ফল মোটেই ভাল হবে না। ট্রান্সিলভ্যানিয়াকে নিয়ে হাঙ্গারী ও রুমানিয়ার ঝগড়া, টেস্চেন অঞ্চল নিয়ে পোলাণ্ড ও চেকোস্লোভেকিয়ার দ্বন্দ্ব, এতো চলেই আসছে। তাদের স্বার্থের মধ্যে এই ভাবে ঐক্য স্থাপন করা অসম্ভব। বলকান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগ (Entente) থাকা সত্ত্বেও, তারা হিটলারের কবল থেকে রক্ষা পায় নি এবং যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে রুমানিয়া গেল হিটলারের দলে, গ্রীস ও যুগোস্ল্যাভিয়া গেল মিত্রপক্ষের দলে। মাঝখানে তুরস্ক রইল নির্লিপ্ত। বলকান রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি কোন কাজেই এল না। সুতরাং পরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী যৌথরাষ্ট্র অচল।

পোল-সরকার পরিকল্পিত যৌথরাষ্ট্রের ভিত্তি যে সোভিয়েট বিরোধী তার প্রমাণ এই যে ডাঃ বেনেস্ বার বার অনুরোধ করেও পোল-সরকারকে রুশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় রাজী করাতে পারেন নি। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার এক সাংবাদিক (মিঃ ক্যালেন্ডার) বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী প্রতিক্রিয়াশীল পোলরা আবার রুশবিরোধী চক্রান্ত সুরু করেছে।"

কিন্তু আমরা স্পষ্টই প্রতিক্রিয়াশীল পোল-সরকার ও সস্নোভস্কি চক্রান্তের উচ্ছেদ (সস্নোভস্কি বিতাড়িত হয়েছেন) ও পোল্যাণ্ডে লোকায়ত্ত সরকারের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি।

পূর্ব্ব ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, আচার ইত্যাদি সবই বিভিন্ন রকমের। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় বহু জাতির সম্মিলিত যৌথরাষ্ট্র গঠন করে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি যে পাকা করা যায় না, ভারতবর্ষই তার প্রমাণ। তবু ভারতবর্ষকে ঠিক বহুজাতীয় রাষ্ট্র বলা কঠিন। সুতরাং প্রস্তাবিত পূর্ব্ব ইউরোপীয় যৌথ-রাষ্ট্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে। একমাত্র সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ব্ব ইউরোপে যৌথরাষ্ট্র সম্ভব হতে পারে। আর সে যৌথরাষ্ট্রের নেতৃত্ব কৃষিজীবী পোলাণ্ডের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে একমাত্র শ্রমশিল্পোন্নত চেকোস্লোভেকিয়া।

মুদ্রানীতির গোড়ার কথা—অর্থের মূল্য

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

অর্থের আবার মূল্য কি? চালের দাম, কাপড়ের দাম, সোনা—রূপোর দাম, এ সবই তো শোনা গেছে, কিন্তু টাকার দামের কথা কে আবার কোথায় শুনেছে? অন্য জিনিষের মূল্য জিজ্ঞেস করলে টাকার সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় যে এটার মূল্য এতটাকা, কিন্তু টাকার মূল্য জিজ্ঞেস করলে কার সঙ্গে তুলনা করে তার দাম বলবো? পাঁচ টাকার দাম তো আর পাঁচ টাকা বলা যায় না। শুধু কি তাই। একটাকায় বেশী জিনিষ পাওয়া গেলে বলি যে জিনিষের দাম কমে গেছে; আবার কম জিনিষ পাওয়া গেলে বলি যে জিনিষের দাম বেড়েছে। কিন্তু টাকার মূল্য বেড়েছে কি কমেছে, তা বলবো কার সঙ্গে তুলনা করে? অথচ অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা বরাবরই টাকা বা অর্থের মূল্য—Value of Money—এই সব কথা ব্যবহার করে আসছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের শেষে আমরা বলেছি যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি ও নানারূপ আর্থিক জটিলতা ভাল ভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে মুদ্রানীতির গোড়ার কথা। আর এই মুদ্রানীতির গোড়ার কথাই হলো অর্থের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা, যার উপর ভিত্তি করে সমস্ত মুদ্রা বিজ্ঞানটাই গঠিত। তাই আমরা এই অধ্যায়ে টাকার মূল্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আলোচনা করবো।

অর্থেরও মূল্য আছে। অন্যান্য জিনিষের দাম যেমন বাড়ে কমে, টাকার দাম বা মূল্যও তেমনি কমে বাড়ে। অন্যান্য জিনিষের দাম কমে যাওয়ার অর্থই হলো, একটাকায় তখন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী জিনিষ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখন বলা চলে যে টাকার কদর বা মূল্য বেড়েছে। সুতরাং এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে জিনিষের মূল্য যখন পড়ে যায়, টাকার মূল্য তখন বাড়ে। ঠিক তেমনিভাবে অন্যান্য জিনিষের মূল্য যখন বাড়ে, একটাকায় তখন পূর্ব্বাপেক্ষা কম জিনিষ পাওয়া যায়, অর্থাৎ টাকার কদর বা মূল্য তখন কমে গেছে। তা হলে এই সিদ্ধান্ত করা গেল যে দ্রব্যের মূল্য যখন বাড়ে, টাকার মূল্য তখন কমে।

এখন প্রশ্ন হবে, জিনিষের মূল্য বাড়ে বা কমে কেন? এটা সকলেরই জানা যে যে কোন দ্রব্য যত বেশী হবে, তার কদর বা মূল্যও তত কমে যাবে। যখন সবেমাত্র, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, তখন উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, কাজেই তাদের কদরও ছিল অত্যধিক, মাইনেও ছিল বেশী। কিন্তু যখন দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে সব বেরোতে আরম্ভ করলো, তখন তাদের খাতির যেমন কমলো তাদের মূল্য বা বেতনও তেমনি হলো নিম্নগামী। এম-এ পাশ এখন আর গ্রামবাসীদের নিকট কিছু তাজ্জব ব্যাপার নয়। ঠিক

এরকম ভাবে যে কোন দ্রব্য যত কম হবে তার কদর বা মূল্যও তাহলে তেমনি বাড়বে।

এতো হলো দ্রব্যের যোগান (Supply) হিসেবে তার মূল্যের তারতম্য হওয়া। আবার চাহিদা (Demand) হিসেবেও দ্রব্যের মূল্য,বা দাম কমে বাড়ে। যদি যোগান ঠিকই থাকে কিন্তু চাহিদা বেড়ে যায়, তবে লোকে গরজের খাতিরে বেশী দাম দিয়ে জিনিসটি কিনতে রাজী হবে, কাজেই জিনিষটির মূল্যও সেই গরজের পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ঠিক অনুরূপভাবে চাহিদা কমলে অথচ যোগান পূর্ব্বের মত থাকলে, জিনিষের দামও পড়ে যাবে। আর্ যদি চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের যোগানও সেই অনুপাতে বেড়ে বা কমে যায়, তবে দ্রব্যটির মূল্যর উপর তার কোন প্রভাবই পড়বে না, মূল্য যেরকম ছিল সে রকমই থাকবে।

কিন্তু এসব তো হলো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান হিসেবে মূল্য কমা বাড়ার হিসেব—এতে শুধু যে দ্রব্যের চাহিদা বা যোগান বাড়বে কমবে সেই দ্রব্য মূল্যেরই তারতম্য হবে ; অন্ত জিনিষের দামের উপর এর কোন প্রভাবই পড়ার আশা নেই। অথচ আমরা এক সময় দেখতে পাই যে সমস্ত দ্রব্যের মূল্যই যেন হঠাৎ এক সঙ্গে পড়ে গেল—যেমনটি হয়েছিল ১৯২৯ সন থেকে আরম্ভ পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্দ্দিনের সময়। আবার তেমনি কোন এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জিনিষের দামই যেন চড়তে আরম্ভ করে দেয়—যেমনটি হয়েছিল গতবারের যুদ্ধে এবং আরো বিশেষ করে হয়েছে এইবারের এই মহাযুদ্ধে। এর কারণ কি? এই মূল্যের তারতম্যের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে জড়িত। এরই দৌলতে বিনা দোষে আজকের দিনের ধনী কাল কতুর হয়ে যাচ্ছে, আবার এদিনের পথের ভিখারী কাল টাকার কুমীর হয়ে সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে চলেছে। সমাজের উপর এই যে এক অনিশ্চয়তার ছায়া মানুষকে তার জীবন যাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, একে ঠিক মত উপলব্ধি করতে হলে আমাদের উপস্থিত হতে হবে অর্থনীতির এক কূটতত্ত্বে এবং এর কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পষ্টতা ভেদ করে আমাদের উপনীত হতে হবে এর মূল তত্ত্বে। এই তত্ত্বই হলো সিকানীতির গোড়ার তত্ত্ব—ইংরেজীতে একে বলে Quantity Theory of Money. বাংলায় আমরা একে টাকার সংখ্যাতত্ত্ব বলতে পারি।

দ্রব্যের যোগান—চাহিদার মত টাকারও যোগান-চাহিদা আছে এবং এরও প্রভাব দ্রব্যমূল্যের উপরেও পড়ে এবং যেহেতু টাকা দ্বারা সমস্ত জিনিষই কেনা চলে, সুতরাং এর কমতি বা ঘাটতির প্রভাব শুধু একটি মাত্র দ্রব্য মূল্যের উপরই পর্য্যবসিত হয় না, এর প্রভাব সমস্ত দ্রব্যেই মোটামুটি সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক টাকার পরিমাণ বাড়লে বা কমলে, তার প্রভাব জিনিষের মূল্যের উপর পড়ে কেন এবং পড়ে কি ভাবে। অর্থাৎ আমাদের দেখতে হবে অর্থের পরিমাণ বাড়লে জিনিষেরও দাম বাড়ে কেন, আবার অর্থের পরিমাণ সঙ্কুচিত হলে দ্রব্য-মূল্যেরও সঙ্কোচন হয় কেন।

টাকার কাজই হলো একটা জিনিষের সঙ্গে আর একটা জিনিষের অদল বদল করানো—Medium of Exchange। ব্যাস এ হলেই টাকার কাজ শেষ হলো। রামের বাক্স বোঝাই বা ব্যাঙ্কের জমার নোট বা টাকা দিয়ে সে শুধু জিনিষই কিনতে পারে, তা ছাড়া এ আর তার কোন কাজেই আসবেনা। এ হেন রামের হঠাৎ যদি টাকা আরো বেড়ে যায়, তবে সে আরো বড় লোক হবে, সে আরো বেশী জিনিষ কিনবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে, সে অধিক সম্পদের অধিকারী হবে এবং তার শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু রামের মত সকলেরই যদি হঠাৎ অর্থ বেড়ে যায়, তবে তারা বড়লোকও হবে না বা তাদের সম্পদও বৃদ্ধি পাবে না। তারা যা ছিল তাই থেকে যাবে। কেন, তাই উদাহরণ দিয়ে বলছি।

সাধারণত টাকা কিছু বেশী বেশী হাতে এলেই মেজাজটাও একটু দিল্‌দরিয়া হয়ে যায়, টাকার কদরটাও যেন কিছু কমে আসে। যার আয় ২৫ টাকা, একটা টাকা সে যে নজরে দেখে বা একটাকার মূল্য তার কাছে যতখানি, যার আয় ৫০০ টাকা তার কাছে একটি টাকার মূল্য বা কদর অপেক্ষা অনেক কম। যার আয় কম সে কোন জিনিষের জন্ত একটি টাকা বের করতেই বার বার ইতস্তত করবে, কিনবার পূর্ব্বে বহুবার চিন্তা করবে ; কিন্তু যার আয় বেশী, দুই একটাকা যখন তখন খরচ করা তার কাছে অতি সাধারণ ও সোজা ব্যাপার। এই হলো অর্থ সম্বন্ধে মানুষের মনস্তত্ত্ব বা Psychology. এখন দেশের সকলেরই যদি অর্থ বা টাকা বেড়ে যায় তবে বাজারে জিনিষ কিনতে এসে দেখবে যে পণ্যের সংখ্যা সেই আছে, অর্থাৎ পণ্য সমষ্টির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি, তখন তারা সকলেই পূর্ব্বের পরিমাণ পণ্যের জন্তই বেশী দাম দিতে আনন্দে স্বীকৃত হবে, কারণ তাদের যে আয় বেড়েছে, সে আয়ের টাকা দিয়ে জিনিষ কেনা ছাড়া টাকার দ্বারা আর কোন কাজই হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং জিনিষের দাম বাড়বে। অতএব দেখা গেল টাকার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, আর দেশের পণ্য সমষ্টি যদি বৃদ্ধি না পেয়ে পূর্ব্ববৎ অবস্থাই থাকে, তবে দেশের সমস্ত জিনিষের দামও মোটামুটি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সোজা হিসেবে দেশের টাকার সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয়, তবে জিনিষের মূল্যও এ অবস্থায় দ্বিগুণ হবে, যদিও অর্থনীতি সমস্তার নানাবিধ ঘূর্ণাবর্ত্ত ও পঙ্কিলতার মধ্যে পড়ে টাকার সংখ্যার সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের এই সরল অনুপাত কখনও সিদ্ধ হয় না। টাকা এবং সম্পদ এদুটো জিনিষ এক নয়—টাকা যত ইচ্ছা বাড়ানো যায়, কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। দেশের পণ্য বা দ্রব্যসমষ্টিই হলো দেশের সম্পদ, টাকা শুধু সেই বিভিন্ন সম্পদের অদল বদল করার মাত্র। সুতরাং যে কোন জিনিষের টাকা দিয়ে অদল বদল করানো যায় তাই হলো দেশের সম্পদ। উৎপাদনকারী জমি, যন্ত্রপাতি কলকারখানা এবং ঐ কলকারখানাজাত মানুষের ভোগের জন্ত পণ্য সামগ্রী, এমন কি মানুষের শ্রম, বিদ্যা বুদ্ধি সবই এই সম্পদের অন্তর্গত।

এই তো গেল অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে মূল্যের সম্বন্ধের কথা। অন্তদিকে দেশের অর্থের যদি সঙ্কোচন হয় তবে ঐ মতই পণ্য দ্রব্যের মূল্যই শুধু পড়ে যাবে, দেশ তাতে একটুও গরীব হবে না। দেশের সকলের কাছেই টাকা কম, সুতরাং কম টাকা দিয়েই সব জিনিষ কেনা বেচা হবে ; এতে দ্রব্যের মূল্য কমে গেল এবং সকলেই পূর্ব্বের মত তত সংখ্যা ভোগ্যবস্তু ও সম্পদ উপভোগ করতে লাগলো। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে,

১। দেশের অর্থের যদি প্রসারলাভ হয় অর্থাৎ অর্থের মূল্য যদি কমে অথচ বিক্রয় ও হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের মোট পরিমাণ বা সংখ্যা যদি সেই থাকে তবে সেই সব দ্রব্যের মূল্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ২। দেশে অর্থের যদি প্রসার লাভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় ও হস্তান্তর-যোগ্য পণ্যের মোট সংখ্যাও যদি সেই পরিমাণে বাড়ে তবে দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ববৎই থাকবে। ৩ দেশেঅর্থের যদি সঙ্কোচন হয় অর্থাৎ অর্থের মূল্য যদি বাড়ে অথচ বিক্রয় ও হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের মোট পরি-মাণ বা সংখ্যা যদি সেই থাকে তবে জিনিষের দাম সেই পরিমাণে কমে যাবে। ৪। দেশে অর্থের যদি সঙ্কোচন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় ও হস্তান্তর যোগ্য পণ্যের মোট সংখ্যাও যদি সেই পরিমাণে কমে তবে দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ববৎ থাকবে।

এতক্ষণ আমরা শুধু টাকার কথাই বলে এসেছি, টাকার প্রচলন গতি বা তার velocity of circulation এর উল্লেখ করিনি। টাকা তখনই টাকার কাজ করবে যখন সে মানুষের হাতে বা বাজারে দ্রব্য বিনিময়ের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। মানুষের পকেটে বা সিন্দুকে যখন সে

শুধু পড়ে থাকে তখন সে অলস মানুষের মতই নির্জীব ও নিষ্কর্মা, তার ফল বা সংখ্যাশক্তি তখন দ্রব্যমূল্যের উপর কোন প্রতিক্রিয়াই করবে না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করেই বলা যাক। একটা টাকা যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঁচটা জিনিষের অদল বদলে চলে অর্থাৎ পাঁচ বার সে ঘোরা ফেরা করে, তখন সে প্রকৃত পাঁচটি টাকারই কাজ করলো। সুতরাং যদি টাকার সংখ্যা না বেড়ে কোন কারণে টাকার এই গতিশীলতা বেড়ে যায়, তাহলে সে টাকা বাড়ার সামিলই হলো এবং তাতে জিনিসের দামও সেই পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং ঠিক বিপরীতভাবে যদি টাকার এই প্রচলনগতি বা velocity of circulation কমে যায়, তবে টাকার সংখ্যা ঠিক থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যের মূল্য কমে যাবে। আর যদি টাকার সংখ্যা বাড়ে আবার প্রচলনগতিও বাড়ে, অথচ পণ্যের পরিমাণ সেই থাকে তবে জিনিষের মূল্য ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি যখন বাড়ে, টাকার প্রচলন গতিও তখন বাড়ে, আবার ব্যবসায় মন্দার সাথে সাথে এই প্রচলন গতিতেও ভাঁটা পড়ে। টাকাটা তখন বেশীর ভাগ সময়, নয় পকেটে, নয় সিন্দুকে আর নয়তো ব্যাঙ্কে জমা পড়ে থাকে। আবার আরও ফেঁকড়াও আছে। বর্ত্তমান কালে অর্থ বলতে শুধু গবর্ণমেণ্টের দেওয়া ধাতু মুদ্রা বা নোটই বোঝায় না, ব্যাঙ্কে মানুষের যে টাকা গচ্ছিত থাকে এবং চেক্ দ্বারা যে টাকা আমরা নাড়াচাড়া করি, সেটাও আমাদের এই অর্থের মধ্যে গণ্য এবং সেও অন্যান্য অর্থের মত জিনিষের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কেমন করে তাই বলছি। চেক্ দিয়ে আমরা যখন আমাদের পাওনা মেটাই তখন সে নোটের কাজই করে। আবার একটা চেক্ই যখন পাঁচ হাত ফেরে তখন নোট বা টাকার মত তার প্রচলনগতিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেশের অর্থের মোট সমষ্টি বা সংখ্যার মধ্যে আমাদের ব্যাঙ্কের অস্থায়ী আমানত বা Current deposite ধরতে হবে (কারণ শুধু অস্থায়ী আমানতের বেলাই চেক্ ব্যবহার চলে, স্থায়ী আমানত বা Fixed deposit এ চেক্ চলে না) এবং এই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ বৃদ্ধি পেলে জিনিষের দাম সাধারণ মতে বাড়বে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ব্যাঙ্কের টাকা আবার আলাদা করে ধরা হচ্ছে কেন। যে টাকা বা নোট গবর্ণমেণ্ট বের করে তারই কিছু অংশ তো ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয়, সুতরাং সেতো সেই মোট টাকারই অংশ বিশেষ। কিন্তু আসলে তা নয়। এর মধ্যে একটু যায় প্যাঁচ আছে এবং তাই বুঝবার জন্য আমাদের ব্যাঙ্কের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে দুএকটা কথা জানা দরকার।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হলো একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে আর একজনকে ধার দেওয়া। যার কাছে যেমন টাকা ধার নিল তাকে সুদ দিল—আবার যাকে ধার দিল তার কাছে থেকে সুদ বাবদ কিছু বেশী আদায় করে নিল। কিন্তু যে টাকা সে ধার করলো সেই পরিমাণে টাকাই যদি সে আবার ধার দিল তবে তার আর বিশেষ লাভ কোথায় থাকে। তাই সে যে পরিমাণ টাকা ধার নেয় তার বেশী পরিমাণ টাকা সে ধার দিয়ে থাকে। একশো টাকা ধার নিয়ে তিনশো টাকা ধার দিয়ে বসবে। এ টাকাটা ব্যাঙ্ক প্রত্যেক খাতককে হাতে হাতে গুঁজে দেবে না, কারণ তার নিজের কাছে মাত্র একশো টাকা থাকায় তার বেশী তার দেবার ক্ষমতা নেই। তাই সে খাতকদের নামে খাতায় তিনশো টাকা জমা লিখে রেখে দেবে। ব্যাঙ্ক নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে একসঙ্গে সকলে মিলে ঐ তিনশো টাকা উঠিয়ে নিতে আসবে না। বড়জোর একশো টাকা হয়তো তারা এক সঙ্গে উঠাতে আসতে পারে, আর এ টাকাটাতো তার নিজের কাছে আছেই। তাই সে নির্ভাবনায় বেশী ধার দিয়ে থাকে। খাতক সাধারণতঃ তদপেক্ষা অল্প অল্প টাকার চেক্ কেটে নিজেদের বিভিন্ন দেনা মেটায়। একেই বলে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ক্রেডিটের সৃষ্টি করা এবং এইভাবে আধুনিক ব্যাঙ্ক নিজের ইচ্ছামত ক্রেডিট হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে। ক্রেডিট্ যত বৃদ্ধি পাবে, সেটা নোট বা অর্থবৃদ্ধির সামিলই হবে এবং তাতে করে জিনিষের মূল্যও বাড়বে। ঠিক সেই মত ক্রেডিট বা ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা বিপরীত ভাবে যত কমবে, জিনিষের মূল্যও সেই পরিমাণে কমতে থাকবে। শিল্পপ্রধান দেশে বা যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য খুব বেশী চলে সেখানে এই চেকের প্রচলনও খুব বেশী হয়ে থাকে এবং কাজেই জিনিষের মূল্যের উপরে সেখানে এর প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে উচ্চ শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী মহলেও এই চেকের প্রথা অচল, সেখানে এর প্রভাব খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক। এই চেকের প্রচলনগতিও টাকার ন্যায় দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। যখন ব্যবসা বাণিজ্য খুব জোরে চলতে থাকে তখন চেকের গতিও বেড়ে যায়, আবার মন্দার সাথে সাথে এই চেকের প্রচলন গতি পড়তির মুখ ধরে। সুতরাং দেখা গেল যে দ্রব্যের মূল্য টাকার সংখ্যাতত্ত্ব বা Qantity theory of Money হিসেবে শুধু সাধারণ অর্থের উপরেই নির্ভর করে না—সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচলন গতি এবং অন্য-দিকে ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা,আবার তারও প্রচলন গতি,এই সবের উপরেই নির্ভর করে ; কারণ দেশে ব্যবসার গতি যদি বেগে বয় সাধারণ টাকাও ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকা এ দুয়েরই প্রচলন গতি সেইভাবে বেড়ে যাবে, আবার ব্যবসা বাণিজ্যের মন্থর গতির সাথে সাথে টাকার প্রচলন গতিও কমে আসে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

স্মৃতি

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

এই খেলা ঘরে তুমি আর আমি খেলেছি কত,
ঘর-কন্নার খুঁটিনাটি নিয়ে কেটেছে—দিন
আজিকে সে সব ভাসিছে নয়নে স্বপন মত
স্মৃতি-সঙ্গীতে বাজিতেছে তাই, এ মনোবীণ্ !

মনে হয় সেই খর-রৌদ্রেতে বাজারে যাওয়া,
ডাঁটা-ফুল আর লাজফুল এনে করেছি জড়ো,
গম্ভীর চালে বলিয়াছি—মাছ গেল না পাওয়া ;
এই দিয়ে আজ যাহোক একটা রান্না করো।

হাত পেতে নেছ পরম আদরে সেদিন তাহা—
ছোট সংসারে ছিল না অভাব তখন কিছু,
সব সুন্দর পরশে তোমার হইত যাহা ;
অনটনে আজ, মন ধায়—সেইদিনের পিছু।

আজি বাস্তবে খেলাঘর আর খেলার নহে—
সেদিনের মত সখের অভাব নাহিক আজ ;
স্পষ্ট হইয়া দুঃখ ও সুখ হৃদয়ে বহে—
বিগত দিনের স্মৃতি রহে শুধু বক্ষ-মাঝ !

শরৎচন্দ্রের দেবদাস

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শরৎচন্দ্রের দেবদাস অল্প বয়সের রচনা। ইহাতে শরৎচন্দ্রের রচনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ততটা স্পষ্ট হয় নাই। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর প্রভাব এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট।

দেবদাসের গোড়ার দিকে যে বাস্তবনিষ্ঠতা দেখা যায় তাহাতে শরৎচন্দ্রের নিজস্বতার ছাপ বেশ স্পষ্ট। ক্রমে শরৎচন্দ্র বাস্তবতার সমভূমি ত্যাগ করিয়া ভাবমার্গে আরোহণ করিয়াছেন। তাহার ফলে উপন্যাসখানি Idealistic হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি morbid Idealism সৃষ্টি করিয়া আমাদের মুখ প্রাচীনের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। 'দেবদাস' অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের শোকাবহ পরিণতির কাহিনী। সামাজিক সংস্কারের ব্যাধ-শরাঘাতে প্রেমের ক্রৌঞ্চের অপমৃত্যুর কাহিনী।

শরৎচন্দ্র এই কাহিনীর মধ্য দিয়া প্রেমজগতের নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। সত্যের কষ্টিপাথরে ঐ তথ্যগুলির মূল্য কতটুকু তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। মানব-চরিত্র বড়ই জটিল। প্রেমজগতের সবটুকুই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কাহার প্রেম-জীবনের পরিণতি কোন দিকে ঘটে তাহাও বলা যায় না। সমস্ত ছাড়াইয়া যেটা চিরন্তন আবেদন, রসজ্ঞ পাঠক সেইটুকুই দেখেন। তবে সমালোচক শুধু তাহাতেই তৃপ্ত হ'ন না। যে সকল তথ্যের সাহায্যে রসের আবেদন—সেগুলির সত্যতা ও স্বাভাবিকতাও যাচাই করিয়া দেখিতে চাহেন।

পার্ব্বতী ছিল দেবদাসের বাল্যসঙ্গিনী—দুর্দান্ত দেবদাসের সে ছিল যোগ্য সহচরী। সে মারও খাইত—আদরও পাইত। দেবদাসের হাতে মার খাওয়াটাও পার্ব্বতীর কাছে ভালবাসারই একটা অঙ্গ ছিল। দেবদাস পার্ব্বতীকে ভালবাসিত, কিন্তু যাহাকে সাহিত্যে প্রেম বলে—তাহার স্পর্শ সে অনুভব করে নাই। সে পার্ব্বতীকে পত্রে লিখিয়াছিল—"তোমায় আমি যে বড় ভালবাসিতাম তাহা আমার কোনদিন মনে হয় নাই। আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশবোধ করিতেছি না।"

"ছেলেবেলায় যখন সে পার্ব্বতীর উপরে দখল পাইয়াছিল তখন তাহা সে পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতায় গিয়া কর্ম্মের উৎসাহে অন্যান্য আমোদ আহ্লাদের মধ্যে পার্ব্বতীকে সে অনেকটা ছাড়িয়াই দিয়াছিল।"

দেবদাস পার্ব্বতীর প্রতি প্রেম অনুভব করিত না। কিন্তু পার্ব্বতীর পক্ষে তাহা নয়। তাহার বাল্যমৈত্রী যৌবনের সমাগমে দেবদাসের প্রতি গভীর প্রণয়ে পরিণত হইল। সে মনে মনে দেবদাসকেই পতিত্বে বরণ করিয়া বসিল। কথায় বলে, নারীর বিশেষতঃ—বালিকার বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। বাঙ্গালী নারীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্রের পার্ব্বতী প্রচলিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া প্রথমে সখী মনোরমাকে মনের কথা বলিল—তারপরে একদিন গভীর রাত্রে তের বছরের বালিকা, দেবদাসের কাছে প্রেমের কোন সাড়া বা আশ্বাস না পাইয়াও, সদর দেউড়ি পার হইয়া অন্তঃপুরে দেবদাসের ঘরে গিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—"এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা।"

দেবদাস বলিল—"পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই? বাপ মায়ের অবাধ্য হ'ব?"

পার্ব্বতী বলিল—"দোষ কি? হও।"

পল্লীগ্রামের তেরো বছরের মেয়ের মুখে এইরূপ প্রেম নিবেদন বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। অয়স্কান্তীয়ার জ্ঞানদা ও নিষ্কৃতির ললিতাও আপন আপন প্রণয়াস্পদের কৃপা-প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু এতটা প্রগল্ভতা তাহাদের ছিল না।

এই প্রেম নিবেদন ও অভিসার স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক যাহাই হউক—দেবদাসের মনে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার করিল। কিন্তু সে প্রেম তখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই। তবু সে পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। তাঁহার অসম্মতি জানিতে পারিয়া সে পার্ব্বতীকে চিঠি লিখিয়া জানাইল—"বিবাহ সম্ভব নয়—আশা ত্যাগ কর।" কিন্তু দেবদাসের মত চরিত্রে একবার প্রেমের সঞ্চার হইলে তাহা ত শূন্যে বিলীন হইবার নয়। ক্রমে তাহা এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, দেবদাস পিতার অবাধ্য হইয়াও পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিবার সংকল্প করিল। কিন্তু পার্ব্বতী তাহা জানিল না। দেবদাস চঞ্চল হইয়া উঠিল—তাহার পড়াশুনায় মন লাগিল না। সে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিল।

এ দিকে পার্ব্বতীর অন্যত্র বিবাহ স্থির হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এরূপ কাণ্ড 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের' পর বঙ্গসাহিত্যে আর ঘটে নাই। পার্ব্বতী জল আনিতে গিয়াছিল ঘাটে, সেই ঘাটের ধারে দেবদাস ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল। মিতভাষী দেবদাস খুব স্পষ্ট করিয়া তাহার সংকল্পের কথা পার্ব্বতীকে শুনাইল না। পার্ব্বতীর নারীত্ব বিদ্রোহী হইয়া ছিল—সে নিজে উপযাচিকা হইয়া দেবদাসকে তাহার প্রেম নিবেদন করিয়াছিল অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিত, লজ্জা সম্ভ্রম সঙ্কোচ সমস্ত ত্যাগ করিয়া। পিতার ভয়ে দেবদাস প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। পার্ব্বতী আশা ত ত্যাগ করিয়াই ছিল, সে দেবদাসকে কাপুরুষ ও চঞ্চলচিত্ত বলিয়াও ঠিক করিয়াছিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে কতকগুলা শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া দিল। দেবদাস চিরকালই দুর্দান্ত প্রকৃতির যুবক—সে আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া ছিপের বাড়ি খুব জোরে পার্ব্বতীকে প্রহার করিল। দেবদাসের চরিত্র ছোট হইতে শরৎচন্দ্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—তাহাতে সে সভ্যসমাজের শিক্ষা পায় নাই। কাজেই এইরূপ প্রহার করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটাকে প্রেমলীলার অঙ্গস্বরূপ সাহিত্যে গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

শরৎচন্দ্র এই ব্যাপারে খুব সাহস দেখাইয়াছেন। যৌনতত্ত্বজ্ঞেরা এইরূপ Sadismকে অনুরাগ লীলার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার ফলটা হইল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এই প্রহারের

দ্বারা পার্ব্বতী তাহার সেই চির-পরিচিত দেবদাসকে চিনিল—সে বুঝিল দেবদাস তাহার দখল ত্যাগ করে নাই—সে তাহাকে ভালবাসে—সে তাহাকে চায় এবং তাহার সংকল্পও দৃঢ়, সে হাতছাড়া হইবে বলিয়া দেবদাসের ক্ষোভদুঃখের সীমা নাই। পার্ব্বতী প্রহৃতা হইয়াও তাই বলিল—"দেবদাদা, মাপ কর আমাকে।" পরে বিবাহিত অবস্থায় দেবদাসের সহিত পার্ব্বতীর দেখা হইলে পার্ব্বতী বলিয়াছিল—"দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসিতে, তাই দয়া ক'রে আমাদের বাল্য ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েছ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।"

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ তরুণী নারীই এইরূপ মুখরা এবং অনেকটা সাহিত্যের ভাষাতেই কথা বলে। যাই হোক, দেবদাসের হাতের প্রহার লাভ করিয়া পার্ব্বতী বুঝিল, দেবদাদা তাহাকে ভুলে নাই। আর দেবদাসও যখন দেখিল—পার্ব্বতী এত বড় অপমান ও নির্য্যাতনেও রাগ করিল না,—তখন বুঝিল তাহার মুখের স্পর্দ্ধিত কথাগুলো তাহার প্রাণের কথা নয়। এখনো সে তাহারই দখলেই আছে। এইখানে সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবার কথা। মিটিয়া গেলে উপন্যাস হয় না, মিটিল না। দেবদাস রাগারাগি করিয়া বিবাহ ভাঙাইল না, পার্ব্বতীও নতমস্তকে গিয়া ছাঁদনাতলায় দাঁড়াইল। দেবদাস মৃত্যুর দিকে নির্ভীকভাবে ছুটিয়া যাইতে পারিল, কিন্তু পিতার মতের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না।

আমরা সাধারণতঃ লৌকিক জীবনে দেখি—এরূপ প্রণয় কিশোর কিশোরীর মধ্যে হয়, কিন্তু সামাজিক বা অন্য কোন বাধার জন্য বৈবাহিক মিলন হয় না। তারপর কিশোর কিশোরীর বা যুবক ও কিশোরীর অন্যত্র বিবাহ হইয়া যায়। তার পর ক্রমে ক্রমে অভিনব সংসারের এবং অভিনব প্রেমের বন্ধনে দুইজনেই বাল্য-কৈশোরের ভাল-বাসাবাসি ভুলিয়া যায়। সাহিত্যের প্রণয়ী-প্রণয়িণীরা তাহা করে না। সাহিত্যে এইরূপ প্রণয়ের ব্যাপারটাকে জীবনমরণের সমস্যা করিয়া তোলা হয়। এই প্রণয় বিরহের উত্তাপ পাইয়া বহুগুণ প্রখরতালাভ করে এবং জীবনের আর সমস্ত বৃত্তি প্রবৃত্তি আশা আকাঙ্ক্ষাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সাহিত্যে ইহাই দেখানো ছিল সেকালের দস্তুর। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর হইতেই এই পদ্ধতির সূত্রপাত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিম একপ্রকার গতিপরিণতি দেখাইয়াছেন,—দেবদাসে শরৎচন্দ্র অন্যপ্রকার গতিপরিণতি দেখাইয়াছেন।

দেবদাস পার্ব্বতীকে হারাইয়া মনের ক্ষোভ ভুলিবার জন্য মদ ধরিল, তারপর তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য পাপও সে বরণ করিল। জীবনের প্রতি নিঃস্পৃহতাই ইহার মূলে। লৌকিক জীবনে এইরূপ অধঃপতন যে অসম্ভব তাহা নয়—তবে এই ভাবে মানুষ আত্মহত্যা করে কি? একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ বর্ত্তমান যুগে বহু হতাশ প্রণয়ীর আত্মহত্যার কথা শুনিতে পাই। তবে সেগুলি সাময়িক উত্তেজনায়। দেবদাস আত্মসংযম করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছিল, সে একনিষ্ঠ প্রণয়ের মর্য্যাদাও রক্ষা করে নাই। শরৎচন্দ্র দেবদাসের চরিত্র বাল্য হইতে এমন করিয়া গড়িয়াছেন—যে তাহার পক্ষে জীবন ও ভুবন সম্বন্ধে এইরূপ ঔদাসীন্য অস্বাভাবিক হয় নাই। সে ভালবাসিতে জানিত গভীর ভাবে, কিন্তু সে প্রণয়ের প্রতিদানের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহা বিকৃত হইয়া তাহাকে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল ও আত্মবিদ্রোহী করিয়া তুলিল। দেবদাসের এই ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার নয়—দায়ী তাহার অবহিত অমার্জ্জিত অনিয়মিত চরিত্র।

বালিকাবয়সে পার্ব্বতী দেবদাসের কাছে মার খাইয়া বলিয়াছিল—পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে মারিয়াছে। ১৩ বৎসর বয়সে গুরুতর প্রহারে আহত হইয়া সে বলিয়াছিল ঘাটে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার এই গোপন করার প্রবৃত্তি একদিকে যেমন তাহার গভীর ভালবাসার লক্ষণ ও অন্যদিকে সে যে দেবদাসের যোগ্য সঙ্গিনী তাহাও সূচিত করে। যোগ্য সঙ্গিনীই যোগ্য সহধর্ম্মিণী হয়। উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী না পাইয়া দেবদাসের জীবন ব্যর্থ হইল। ইহাতে শরৎচন্দ্র যে সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামে সেই সত্যেরই চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সীতারামে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন—শ্রীর অভাব কেহই পূরণ করিতে পারে নাই। শ্রীকে লাভ না করার জন্যই সীতারামের জীবন ও ব্রত দুইই নিষ্ফল হইল। দেবদাসের উচ্চতর ব্রত কিছুই ছিল না, সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করিল।

দেবদাস সৎশিক্ষা পায় নাই—সৎসংসর্গ পায় নাই, সৎসমাজে প্রতিপালিত হয় নাই, কোন উচ্চতর ব্রতের সন্ধানও সে জানিত না। কাজেই তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পরিণতি এই ভাবেই ঘটিয়াছে। দেবদাস বাল্যাবধি উচ্ছৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী। তাই বলিয়া তাহার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব ছিল না, তাহা নয়। সে বেশ্যা-সংসর্গে আসিয়াও তাহার শোভনসুন্দর রুচি ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছে বার বার। এই মনুষ্যত্ব টুকু ছিল বলিয়াই দেবদাসের জন্য আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দেবদাস পাঠকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

শরৎচন্দ্র পরবর্ত্তী সাহিত্য-জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—মৃত্যু বরণের দ্বারা ট্র্যাজেডিই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নয়। হৃদয়-ভঙ্গে, ব্রতভঙ্গে বা আশা-ভঙ্গে সে ট্র্যাজেডি; সেই ট্র্যাজেডিই কথা-সাহিত্যের আসল ট্র্যাজেডি। Classical tragedy বা ঐতিহাসিক নাটকের Tragedy Romantic সাহিত্যে সৃষ্ট নয়। কেবল পাঠক-চিত্তে সুলভ কারুণ্যের সঞ্চারেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইতে পারে না—যাহার জীবনে ট্র্যাজেডি সে Tragic জীবন বহন করিলে তবেই রসের গভীরতা সাধিত হয়। সেজন্য লেখককে মানব মনের গহনতম প্রদেশে অবগাহন করিতে হয়। দেবদাসের ট্র্যাজেডি সে হিসাবে খুব উচ্চস্তরের শিল্পের পরিচায়ক নয়।

পার্ব্বতী যে সংসারের কর্ত্রীত্বলাভ করিয়াছিল সে সংসার তাহাকে বাল্যপ্রণয় ভুলাইয়া দিবে ইহাই প্রত্যাশা করা যায়। ইহাই লৌকিক রীতি। কিন্তু সাহিত্যের প্রণয় ধনরত্ন, দাসদাসী, সেবাব্রত, স্বামি-প্রেম ইত্যাদির দ্বারা ঢাকা পড়ে না। পার্ব্বতী তাহার প্রাণের গূঢ় ব্যথাটিকে ঢাকিবার জন্য দানধ্যান, তপজপ, ব্রতপূজা ইত্যাদির মধ্য দিয়া চূড়ান্ত প্রয়াস করিয়াছে। সকলের মা হইয়া উঠিবার জন্য তাহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। স্বামী প্রৌঢ় বয়সে তাহাকে বিবাহ করিয়া চিরদিন অপরাধী সাজিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া

থাকিত। হিন্দুসংসারের সর্ব্বাধিক সৌভাগ্য ও সুযোগসুবিধা সে লাভ করিয়াছিল—তবুও গুল্মগন্ধরাজ পুষ্পের অন্তস্তলে কীটের মত বাল্যপ্রণয় তাহার চিত্তে রহিয়া গেল। সে নিজেই দেবদাসকে বলিল—"শিমুল ফুল কি দেবসেবার লাগে ?" প্রত্যক্ষভাবে না বলিলেও শরৎচন্দ্র পরোক্ষে বলিতে চাহিয়াছেন—একমাত্র সন্তানই চিত্তের তথাকথিত কলুষ দূর করিতে পারে। তিনি পার্ব্বতীর অঙ্কে কোন সন্তানের আবির্ভাব ঘটান নাই। পার্ব্বতীর অন্তরের গূঢ় বার্ত্তাটিকে তাহার আত্মীয়জনের নিকট হইতে তিনি বরাবর গুপ্তই রাখিয়াছিলেন। সেই বার্ত্তাটির প্রকাশটিকেই শরৎচন্দ্র উপন্যাসের চরম কথা বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। দেবদাসের মৃত্যুশয্যায় পার্ব্বতীকে আনিলে যে নাটকীয়তার অভিনয় হইতে পারিত। তাহাকে একটা অতিসাধারণ প্রাকৃত-জনরঞ্জন চিত্র মনে করিয়া তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল পার্ব্বতীর সংযমের বন্ধনচ্ছেদে আত্মপ্রকাশটিকেই চরম কথা বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। ফলে, প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইল পার্ব্বতীর জীবনে।

শরৎচন্দ্রের যে কয় খানি উপন্যাসে পতিতা চরিত্র ও পতিতালয়ের চিত্র আছে—তন্মধ্যে দেবদাস একখানি। দেবদাসে পতিতালয়ের চিত্র আছে, কিন্তু তাহাতে অশ্লীলতা বা কুরুচির কিছু নাই। শরৎচন্দ্র পতিতা-চরিত্রের মধ্য দিয়া একটা অপ্রত্যাশিত সত্যের আভাস দিয়াছেন ইহাতেএকটা বিস্ময়ের চমকেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন,পতিতাদের সংসর্গে অনেক সচ্চরিত্র সরল-স্বভাব ব্যক্তির অধঃপতন ঘটে সত্য, কিন্তু সরল সহৃদয় চরিত্রের সংসর্গে পতিতা-চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন হয়। পতিতাচরিত্রে যে মহত্ত্ব ও নারীমর্য্যাদা প্রচ্ছন্ন থাকে—তাহা শুচিসুন্দর চরিত্রের স্পর্শে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। পতিতাদের নাগপাশে যাহারা বন্দী হয়, পতিতারা তাহাদের ঘৃণা করে এবং অর্থের বিনিময়ে অনুগ্রহ করে। কিন্তু যাহারা তাহাদের নাগপাশে বন্দী হইতে চায় না, এবং মনে মনে তাহাদের ঘৃণা করে—পতিতারা তাহাদেরই শ্রদ্ধা করে। তাহাদেরই প্রভাব পতিতার জীবনে শুদ্ধির আগুন জ্বালিয়া দেয়। একথা শরৎচন্দ্র একাধিক রচনায় বলিতে চাহিয়াছেন। পতিতা চন্দ্রমুখী দেবদাসকে বলিতেছে—

তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করিতে। এত ঘৃণা কেউ কখনো করেনি, বোধ হয়।……তোমার পূর্ব্বে কত লোক এখানে এসেছে গেছে…কিন্তু কারো কখনো তেজ দেখিনি। আর তুমি এসেই আমাকে আঘাত করলে, একটা অযাচিত রূঢ় ব্যবহার, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইলে, শেষে তামাসার মত কিছু দিয়ে গেলে।…তারপর পূর্ব্বের আমির সঙ্গে এমন ক'রে বদলে গেলাম—যেন সে আমি আর নয়।"

দেবদাস-চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ তাহা চন্দ্রমুখীর চোখে পড়িল। চন্দ্রমুখীর নেশা ছুটিয়া গেল। সে হইয়া উঠিল মহীয়সী। তাহার কাছে হিন্দু সংসারের পতিব্রতারাও নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এইরূপ Idealism বঙ্গসাহিত্যে নব প্রবর্ত্তন। ইহাতে যে নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে—রূপান্তরিতা পতিতার প্রত্যেক আচরণের সত্যাসত্য বিচার করিলে চলিবে না।

চন্দ্রমুখীর কাছে পার্ব্বতী নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চন্দ্রমুখীর তুলনায় পার্ব্বতীর প্রাণবত্তা (vitality) বেশি—সে অধিকতর জীবন্ত। অবশ্য আঁধারে আলোর 'বিজলির' তুলনায় চন্দ্রমুখী জীবন্ত।

চন্দ্রমুখী পার্ব্বতীর অনুকল্প। এই অনুকল্পই পার্ব্বতীকে ভুলাইয়া দিতে পারিত। তাহা স্বাভাবিক হইত বটে, কিন্তু উপন্যাসের সাহিত্যাঙ্গ ক্ষুণ্ণ হইত।

শরৎচন্দ্র পাশাপাশি দুইটি নারী-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন—একটি লৌকিক হিসাবে সতী চরিত্রের, অন্তরে অসতীত্বের জ্বালা—আর একটি লৌকিক বিচারে অসতী চরিত্রের, অন্তরে সতীত্বের মালা।

পার্ব্বতীকেও ঘৃণা করিবার উপায় নাই—চন্দ্রমুখীকেও ঘৃণা করিবার উপায় নাই। পার্ব্বতীকে আমরা যদি ক্ষমা করিতেও না পারি—চন্দ্রমুখীকে ক্ষমা না করিয়া উপায় নাই—তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেই হয়। বঙ্গসাহিত্যে এই সব তথ্যের কথা অভিনব।

শরৎচন্দ্র দেবদাস চরিত্রের যে শোচনীয় পরিণতি দেখাইয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চরিত্রের আগাগোড়া সামঞ্জস্যও তিনি রাখিয়াছেন। দেবদাস মেরুদণ্ডহীন চরিত্র—তাহার চরিত্রে উগ্রতা আছে—তেজস্বিতা আছে,কিন্তু দৃঢ়তা নাই। এই দৃঢ়তার অভাবই শোচনীয় পরিণতির কারণ। দেবদাসের ভালবাসায় গোড়ায় দিকে দৃঢ়তা ছিল না—কিন্তু যখন দৃঢ়তা আসিল—তখন পিতার অমতে বিবাহ করিবার দৃঢ়তা তাহার জন্মিল না। পার্ব্বতীর স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার দৃঢ়তা তাহার ছিল না। বিদ্যানুশীলনে তাহার দৃঢ়তা ছিল না—পিতৃসম্পত্তি রক্ষায় ও ভোগেও তাহার দৃঢ়তা ছিল না—মদ্যপান করিতে ধরিয়াছিল—মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিত, কিন্তু জীবনের আশঙ্কাতেও সে মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিল না—পতিতা-সংসর্গে জড়াইয়া পড়িল—কিন্তু সে অনাচারেও সে আকণ্ঠ মগ্ন হইতে পারিল না। —সে সংসর্গ ত্যাগ করিবার দৃঢ়তাও তাহার ছিল না। স্বাস্থ্যান্বেষণে সে দেশবিদেশ ঘুরিয়াছে—কিন্তু জীবনরক্ষায় দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার মধ্যে জন্মে নাই। এইরূপ চরিত্রের পরিণতি প্রণয়-নৈরাশ্য না ঘটিলেও ইহার চেয়ে ভালো হইবার কথা নয়।

দেবদাস উপন্যাসে অনেক ত্রুটী আছে। শরৎচন্দ্রের অপরিণত হস্তের রচনা ইহা। অনেক স্থলে আচরণের দ্বারা যাহা ফুটাইলে ভালো হইত, তাহা মুখরতার দ্বারা ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক স্থলে মৌনের দ্বারা যাহা রসঘন হইতে পারিত, বাচালতার দ্বারা তাহাকে তরল করিয়া তোলা হইয়াছে। দেবদাস-পার্ব্বতীর গ্রাম্য জীবন ও তাহার আবহাওয়া যেমন জীবন্ত হইয়াছে—ধনি-সংসারের আবহাওয়া তেমন জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। অনেক স্থলে সাহিত্যের ভাষা অশিক্ষিতা নারীর মুখে বসানো হইয়াছে। এ সকল ত্রুটী সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রতিপচ্চন্দ্র তালসোনাপুরের বাঁশ বাগানের আড়ালেই দেখা দিয়াছে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

ভারতসরকারের রেলবিভাগের বাজেট

যুদ্ধের সময় পর্ব্বতপ্রমাণ সামরিক খরচ চালাইবার জন্ত ভারত-সরকারকে যে কয়টি আয়ের পথ খুঁজিয়া লইতে হইয়াছে, রেলবিভাগ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভাড়ার হার যতই বৃদ্ধি পাক, স্থানান্তরে গমনাগমনের পক্ষে রেল ছাড়া দেশবাসীর আর উপায় নাই এবং মাল চলাচলের জন্তও রেলের সাহায্য অপরিহার্য্য। এদেশের লোকের এই অসহায়তার সুযোগ লইয়া ভারতসরকার যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে বৎসরের পর বৎসর রেলের ভাড়া বা মাশুল বাড়াইয়া চলিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রেলবিভাগের আয়ও এখন প্রতিবৎসর যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনাদি মিটাইবার প্রশ্ন বহুলাংশে অন্তর্দেশীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবার ফলে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আমলে রেলের কাজ অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ সেই অনুপাতে যথেষ্টসংখ্যক গাড়ী ইত্যাদি জোগাইবার ব্যবস্থা না থাকায় জনসাধারণের ক্লেশের আর শেষ নাই। মোটের উপর যুদ্ধকালীন রেলবিভাগকে ভারতসরকার সমরপ্রচেষ্টা সাহায্যের জন্ত মুখ্যতঃ ব্যবহার করিতে চান। এদিকে বহির্বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত কম হইবার জন্ত দেশের মধ্যে মাল চলাচল এখন যেমন অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেকর্মে লোকের একস্থান হইতে অন্তস্থানে আসা যাওয়া তেমনি বাড়িয়াছে ভয়ানকভাবে। বলা বাহুল্য এই ভাবে রেলবিভাগের প্রতিবৎসর মোটা টাকা লাভ হইতেছে এবং সেই টাকার একটি বড় অংশ সাধারণ তহবিলে জমা পড়ায় ভারতসরকার রেল হইতে সামরিক মাল চলাচল-জনিত সুবিধা ছাড়াও বাড়তি বড় রকমের আর্থিক সহায়তা পাইতেছেন। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকারের যানবাহন সচিব ১৯৪৫-৪৬ সালের রেল বাজেট পেশ করার প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে লক্ষ্য করা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর এই বিভাগ হইতে অধিক পরিমাণ মুনাফা লাভ করিতে যত উৎসুক, রেল-বিভাগের উন্নতি ও দেশবাসীর সুবিধাবিধান করিতে ততটা উৎসুক নহেন। স্তার বেন্থলের হিসাব ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট আয় হইবে প্রায় ২১৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ২৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বেশী, এবং সর্ব্ববিধ খরচ বাদ দিয়াও এ বৎসর ৬৬ কোটি ১ লক্ষ টাকা লাভ থাকিবে। এই টাকার মধ্যে রেলের সাজসরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২৪ কোটি টাকা এবং রেলওয়ের মজুত তহবিলে ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা বাদ দিয়া বাকী ৩২ কোটি টাকা ভারতসরকারের কোষাগারে প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। রেলওয়ের এই বিরাট পরিমাণ আয় যাহাদের জন্ত হয় সেই সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে—কিন্তু এই আয় হইতে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যয়বরাদ্দ করা হয় নাই। অনেকে বর্ত্তমান বৎসরে সাজসরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২৪ কোটি টাকা ধরার জন্ত ভারতসরকারের যানবাহন-সচিব স্তার এডওয়ার্ড বেন্থলকে প্রচুর সুখ্যাতি করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় এই মূল্যাপকর্ষ বাবদ টাকা ধরার সময় স্তর বেন্থল ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সুবিচার করেন নাই। মূল্যাপকর্ষ ধরার কারণ বর্ত্তমানে জিনিষপত্র চতুর্গুণ মূল্যে ক্রয় করা এবং অত্যধিক ব্যবহারের জন্ত জিনিষপত্র যে ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে তাহার ক্ষতিপূরণ করা। এখন সাজ-সরঞ্জাম যে দামে ক্রয় করা হইতেছে যুদ্ধের পরে তাহার মূল্য অনেক নামিয়া যাইবে এই জন্তই মূল্যাপকর্ষ ধরার বিধান, এবং এই বিধান সমর্থন করার জন্ত স্তার বেন্থল সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের চাপে ভারতের রেলপথগুলি নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না, মিত্রপক্ষের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ভারতের রেলপথ প্রভূত সাহায্য করিতেছে, এ সময় ব্রিটেন, আমেরিকা বা ক্যানাডা ভারতকে যে রেলওয়ে সাজসরঞ্জাম জোগাইতেছে তাহার জন্ত তাহারা ন্যায্য দাম না লইয়া বেশী দাম আদায় করে কোন যুক্তিতে? তা ছাড়া যে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় উপরোক্ত সকল জাতি সমবেত ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যাহার সাফল্যের সহিত সকলের স্বার্থ ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত, সেই যুদ্ধের কাজে বহুলাংশে ভারাক্রান্ত ভারতীয় রেল-পথের ক্ষয়ক্ষতিজনিত সকল খরচ ভারতবর্ষই বা একা কেন বহন করিবে? স্তার এডোয়ার্ড বেন্থল তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় এই বাজেটকে নিরপেক্ষ (Unorthodox) আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর দিয়া শ্বেতাঙ্গ পোষণের যে রীতি ইংরাজ রাজত্ব সুরু হইবার সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে এই বাজেটেও তাহাই বজায় রাখার নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। এইভাবে বিরাট পরিমাণ টাকা ব্রিটেন, ক্যানাডাও আমেরিকাকে মালের পিছনে বরবাদ না করিয়া ভারতসরকার রেলগাড়ীর নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক করুণা প্রদর্শন করিতে পারিতেন অথবা যে সব নূতন অন্তায় মাশুল বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহার কতকটা লাঘব করিতে পারিতেন। তাছাড়া যুদ্ধ শেষ হইবার পর অন্যান্ত নানাদিকের মত রেলওয়ের দিক হইতেও মন্দাবাজার আসার সম্ভাবনা আছে এবং তখন বিরাট আর্থিক দায়িত্ব লইয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই মহা অসুবিধায় পড়িবেন। আমাদের মনে হয় ভারতসরকারকে সাহায্যের পরিমাণ কিছু কম করিয়া এই সময় রেলওয়ের মজুত তহবিলে আরও বেশী টাকা রাখা উচিত। ১৯৪৪-৪৫ সালে রেলওয়ের মজুত তহবিলে মোট ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছে এবং আশা করা হইয়াছে যে ১৯৪৬ সালে তহবিলের পরিমাণ ২৯ কোটি টাকায় পৌঁছাইবে। দায়িত্ব অনুসারে এই সুদিনে রেলকর্ত্তৃপক্ষের উচিত—মজুত তহবিলে আরও বেশী টাকা জমাইয়া ফেলা, যাহাতে যুদ্ধোত্তর মন্দাবাজারেও অর্থাভাবে তাহাদিগকে কার্য্যাদি চালাইতে গিয়া বিপন্ন না হইতে হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের জন্ত

স্যার বেন্থল যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আশা করিয়াছেন যে এই বৎসর সরকারী রেলসমূহের ২২০ কোটি টাকা আয় হইবে এবং এবারও সাজসরঞ্জামের মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৩০ কোটি টাকা সরাইয়া রাখা হইবে। সরকারী কোষাগারে রেলওয়ে তহবিল হইতে এ বৎসরও সাহায্য করা হইবে ১৯৪৪-৪৫ সালের সমান পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ ৩২ কোটি টাকা। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতসরকারের কোষাগারে যখন ৩২ কোটি টাকা দেওয়া হইবে তখন রেলের মজুত তহবিলে মাত্র ৪ কোটি ৫১ লক্ষ জমা রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে। রেল বাজেট উপস্থিত করিবার সময় স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল যেরূপ মুক্তকণ্ঠে এই বাজেটকে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মনে হয় তাঁহার এবারের বাজেট সেই ন্যায়ের ভিত্তিতে রচিত হয় নাই এবং রেলওয়ের অবিশ্বাস্য আয়ের আমলে এই বাজেটে সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগাড়ী ও বেসামরিক মালের উপর মাশুল সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা হয় নাই দেখিয়া আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়াছি। রেলওয়ে সম্বন্ধে যাত্রীদের অভাব অভিযোগ প্রচুর, অথচ সাধারণ সময়ে রেলবিভাগের যে আয় হয় তাহা হইতে রেলগাড়ীতে অধিকতর আরামের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। সেদিক হইতে এখনকার অস্বাভাবিক বর্দ্ধিত আয়ের সুযোগে রেলগাড়ীগুলির সত্যকার উন্নতিবিধানের সংস্থান হইবে, ইহাই অনেকে আশা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে কিছু করা দূরে থাক, মজুত তহবিলে কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট টাকা রাখিতেছেন না বলিয়া ভবিষ্যতেও তেমন কোন বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া কাজে নামা রেলবিভাগের পক্ষে কঠিন হইবে। যুদ্ধোত্তরকালে রেলইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন, গাড়ীগুলির উন্নতি বিধান, রেল বিভাগের অসুবিধা অপনয়ন প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজে যদি হাত দিতে হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের হাতে প্রচুর টাকা থাকা চাই—অথচ ১৯৪৫-৪৬ সালের মত ৪৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লাভের মধ্যে যদি ভারতসরকারের সাধারণ রাজকোষ ৩২ কোটি টাকা গ্রাস করে এবং মজুত তহবিলে মাত্র ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা জমা হয় তাহা হইলে কোনদিনই স্বাভাবিক দুর্ভাগ্য এদেশের জনসাধারণের এই নিরুপায় দুঃখ মোচনের আশা থাকিতে পারে না।

ভারতের যুদ্ধোত্তর শিল্পসংগঠনের মূলধন

ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত যে সংকীর্ণ অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের শিল্পপ্রগতি সাধ্যমত সর্ব্বভাবে ব্যাহত করিয়া আসিতেছিলেন, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রবল সংঘাতে প্রয়োজনের তাগিদ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা সেই মনোভাব কতকাংশে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের পুনঃসংগঠন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে নানারূপ পরিকল্পনা গঠিত হইতেছে এবং ভারতের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগ নামক যে নূতন দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে তাহার মারফৎ ভারতে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের কথা বিবেচনা করিবার জন্য ২৯টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সকল কমিটি ভারতের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া শিল্পাদি মত অসীম প্রাকৃতিক সম্পদশালিনী দেশের পক্ষে কাঁচা মালের অভাব না থাকায় জন্য পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন শিল্পপ্রধান দেশের সমকক্ষতা লাভ করা অসম্ভব নয় এবং এই সুযোগ লাভ করিয়াও উপযুক্ত পরিচালনার অভাবেই বলিতে গেলে ভারতবর্ষের আর্থিক বনিয়াদ এতদিন সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানকালে শিল্পাদি প্রসারের যে নূতন উৎসাহ এদেশে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে জনগণের প্রচণ্ড দাবী স্বীকার করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করিবার ভরসা রাখেন না, সেই শিল্প প্রচেষ্টা যে বস্তুর উপর সাফল্যের জন্য এখন সর্ব্বাংশে নির্ভর করিতেছে, তাহা উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন। ভারতের মত বিপুলায়তন দেশে প্রয়োজনানুরূপ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন এবং বর্ত্তমানে সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের হাতে নাই। অবশ্য এই প্রয়োজনীয় অর্থের কথা উঠিলে অনেকেই ব্রিটেনের নিকট ভারতের পর্ব্বতপ্রমাণ ষ্টার্লিং পাওনার কথা বলেন এবং সেই পাওনা ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে কল্পনায় নানারূপ ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির স্বপ্নও দেখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ষ্টার্লিং পাওনা ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ হইলেও এবং এই অর্থের বিনিময়ে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি তথা দুর্ভিক্ষের তাড়নায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনান্ত ঘটিলেও মোটের উপর ষ্টার্লিং পাওনা আদায় করা ভারতের হাত নহে এবং নিতান্তই আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে একথা এখন প্রায় সর্ব্বজনবিদিত যে পাওনাদার ভারতবর্ষ এই পাওনা আদায়ের ব্যাপারে অধমর্ণ ব্রিটেনের করুণাপ্রার্থী। সম্প্রতি আমেরিকার হটস্প্রিংসে অনুষ্ঠিত প্যাসিফিক রিলেসনস্ কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে ব্রিটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভাপতি প্রায় স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষ যদি তাহার ষ্টার্লিং পাওনা অবিলম্বে আদায়ের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা রচনা করে তাহা হইলে তাহাকে নিরাশ হইতে হইবে, কারণ ব্রিটেন যতদিন পর্য্যন্ত তাহার বহির্বাণিজ্য ভালভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারিবে ততদিন তাহার পক্ষে দেনা শোধ করা সম্ভব নয় এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেন রপ্তানী বাণিজ্য হইতে যে অর্থ পাইবে তাহা তাহার দেশবাসীর অন্নবস্ত্র ও শিল্পাদির কাঁচামাল সংগ্রহে ব্যয় করা হইবে। * ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই নীতি অনুধাবন করিলে একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভারতকে শিল্প প্রসারের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে হইলে ব্রিটেনের সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়াই করিতে হইবে। ব্রিটেনের নিকট হইতে পাওনার দিক দিয়া এভাবে নিরাশ হওয়ার পর

---

* While every Penny of the starling balances would be returned, the rate at which the balances could be released would necessarily depend on how quickly the United Kingdom could build up her export trade; and this in turn would depend upon the recovery of the world trade as a whole. In the period immediately following the war, . he observed, all proceeds from British export would be needed for the purchase of food and other essentials for the British

স্বাভাবিক দরিদ্র ভারতের পক্ষে পৃথিবীর স্বচ্ছলতম দেশ আমেরিকার নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া শিল্পাদি সম্প্রসারণই প্রশস্ত পথ! বোম্বাই পরিকল্পনাতেও বাহির হইতে যে টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহার সাকুল্য ৫৫০ কোটি ডলার এবং ইহার মধ্যে ষ্টার্লিং পাওনা হইতে ৩০০ কোটি ডলার বাদ দিলে আমেরিকার মত দেশের নিকট হইতে ২৫০ কোটি ডলার ঋণ স্বরূপ লওয়া হইবে বলিয়া পরিকল্পনাকারকেরা স্থির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেছেন এবং অনেক ব্যবসায়ী ভারতের সহিত সমান লাভে এমন কি ভারত অপেক্ষা তুলনায় কম লাভে এদেশের শিল্পাদিতে টাকা খাটাইতে ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন। এই সকল ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের বিশ্বাস যে ভারতে যদি শিল্পাদি প্রসারিত হয় তাহা হইলে টাকার প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়া ভারতবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়া যাইবে এবং এইভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া আমেরিকা যদি ভারতবাসীর মনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে তাহা হইলে স্বচ্ছল ভারতবাসী নিজের দেশের জিনিষ ছাড়াও আমেরিকার প্রস্তুত দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিবে। বলা বাহুল্য যুদ্ধের পরে ফুল এম্‌প্লয়মেণ্ট বা সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান বজায় রাখিতে হইলে আমেরিকা এবং ব্রিটেন উভয়কেই তাহাদের যুদ্ধের পূর্ব্বের রপ্তানী বাণিজ্য অন্ততঃ দ্বিগুণ করিতে হইবে সুতরাং তজ্জন্য বৃহত্তর বাজার চাই। ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় বৎসরে এক টাকা বাড়িলে যেখানে বৎসরে ৪০ কোটি টাকার নূতন বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা—সেখানে এদেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির জন্য আমেরিকার এ উদ্যম অবশ্যই সুদূরপ্রসারী। ভারতের দিক হইতেও যুদ্ধের পরে শিল্পপ্রসারের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা অবাঞ্ছনীয় নয়, কারণ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যতম উপনিবেশ ক্যানাডাও মার্কিন মূলধনের সাহায্যে শিল্পাদি সুগঠিত করিয়া আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। গত প্যাসিফিক রিলেসন্স কনফারেন্সে চীন কোরিয়া, ইন্দোচীন, ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি শিল্পে অনুন্নত দেশের শিল্পপ্রসারের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য চাওয়া হইয়াছে এবং চীন ধার চাহিয়াছে ৫০০ কোটি ডলার। সম্প্রতি 'রাই'য়ে যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে আমেরিকার বৈদেশিক ব্যবসায়ী সমিতির (Foreign Trade Council) সভাপতি ভারতের সহিত ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আমেরিকার ১২ হাজারটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্বরূপ ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অফ্ ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি গঠনের ব্যাপারে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্ল্যানিং এ্যাসোসিয়েশন ভারতের শিল্প সমৃদ্ধি বাড়াইবার পক্ষে এবং আমেরিকার সহিত ভারতের আর্থিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ সময় আশা করা যায় যে ব্রিটিশ সরকারের দিক হইতে হীনোচিত কোন প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত না হইলে আমেরিকা ভারতকে আর্থিক সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। এইভাবে আমেরিকা ভারতে টাকা দাদন করিলে (অবশ্য ভারতের সঙ্গে তাহার একমাত্র সম্পর্ক হইবে ঐ পাওনা টাকা ও সেই টাকার সুদের) ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারিত হইতে পারিবে এবং ফলে আমেরিকাও ভারতে প্রস্তুত বহু পরিমাণ মাল অবশ্যই ক্রয় করিবে। ষ্টার্লিং পাওনার মত বর্ত্তমানে ভারতের বিরাট পরিমাণ ডলার পাওনা জমিয়া যাইতেছে এবং এম্পায়ার ডলার পুলের দৌলতে সেই ভারতের পাওনা ডলারের মারফৎ ব্রিটেন একদিকে যেমন আমেরিকা হইতে পণ্যাদি আনাইয়া নিজদেশে আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে—অন্যদিকে তেমনি সঞ্চিত ডলার হইতে কর্ত্তার ইচ্ছায় বঞ্চিত হইতে হইয়া ভারতের পক্ষে আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আনাইয়া শিল্প সংগঠন করা সম্ভব হইতেছে না। আমেরিকার সহিত আর্থিক সম্পর্ক স্থাপনের পাকাপাকি ব্যবস্থা হইলে আমেরিকা অবশ্যই নিজস্বার্থে ভারতের এই ডলার পাওনা সম্বন্ধেও ব্রিটেনের উপর চাপ দিবে। তবে ভারত সম্পর্কে আমেরিকার যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা যাইতেছে বা যে পরিমাণ সহানুভূতি আশা করা যাইতেছে তাহা ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে সম্প্রীতিমূলক চুক্তির দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। ব্রিটেনের প্রতি আমেরিকার স্বাভাবিক অনুরাগ বজায় রাখিয়া ভারতকে আমেরিকার সহানুভূতি লাভে অযোগ্য প্রমাণ করিবার জন্য আমেরিকায় জোর প্রচারকার্য্য চলিতেছে এবং এইসূত্রে ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার উপর খরচ করা হইয়াছে। তাহাছাড়া ভারত সম্বন্ধে কোন ভাল বই বা পত্রিকা প্রায় ক্ষেত্রেই আমেরিকায় পৌঁছাইতে দেওয়া হয় না। ব্রিটেনের এই সাম্রাজ্যরক্ষার অপচেষ্টা একেবারে যে ব্যর্থ হইয়াছে এমন কথাও অবশ্য একশ্রেণীর আমেরিকানদের মনোভাব লক্ষ্য করিবার পর বলা চলে না। এই শ্রেণীর লোকেদের প্রতিনিধিস্বরূপ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর মিঃ হুইটনি যেমন বলেন যে, ব্রিটেনকে যুদ্ধের পর বাজার বাড়াইবার সুযোগ না দিলে ব্রিটেনের বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই এবং সেক্ষেত্রে আমেরিকার উচিত ব্রিটেনকে ভারতের বাজার ছাড়িয়া দিয়া চীন প্রভৃতি শিল্পে অনুন্নত দেশের বাজার বাড়াইবার বা অধিকার করিবার চেষ্টা করা, এখনও আমেরিকার অনেক লোক এইভাবে ব্রিটিশ স্বার্থসংরক্ষণের কথা ভাবেন। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যদি স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমেরিকার শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে হাত করিতে পারে, (এবং তাহা করা একেবারে অসম্ভব নয় বলিয়াই বিভিন্ন সম্মেলনাদি দেখিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে) তাহা হইলে অবশ্য ভারতবর্ষকে নিজের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া শিল্পপ্রসারের জন্য দীর্ঘকাল বহু ত্যাগস্বীকার ও সংগ্রাম করিতে হইবে।

কোলার স্বর্ণখনি

স্বর্ণমান পৃথিবী হইতে কার্য্যতঃ উঠিয়া গেলেও এখনও বহির্বাণিজ্য চালাইবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশকেই স্বর্ণের সাহায্য লইতে হয় এবং সেদিক হইতে স্বর্ণের চাহিদা এবং গুরুত্ব আজিও বিশেষ কমে নাই। ভারতের স্বর্ণসম্পদ প্রায় সম্পূর্ণভাবে মহীশূর রাজ্যের কোলার জেলায় সীমাবদ্ধ এবং এইখানকার খনিসমূহ হইতে যে স্বর্ণ উঠে তাহার পরিমাণ এককালে সামান্য হইলেও এখন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে যখন অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ার খনিসমূহের স্বর্ণ উত্তোলন অপেক্ষাকৃত কমিয়া আসিল, তখন কোলার অঞ্চলে স্বর্ণ উত্তোলন সুরু হয় এবং ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ সালের মধ্যে কতকগুলি ইংলণ্ডে সংঘবদ্ধ কোম্পানী মহীশূর রাজকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জমি ইজারা লইয়া এই কোলার জেলায় কাজ আরম্ভ করে। ১৮৮২ সালে এই অঞ্চলে মোট ৯ আউন্স সোণা উত্তোলিত হয় যাহার আনুমানিক মূল্য ছিল প্রায় ৩৮ পাউণ্ড। ক্রমে ১৯১৭ সাল অবধি স্বর্ণ উত্তোলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১৫টিতে পৌঁছাইবার পর ব্যর্থতার অজুহাতে অনেকগুলি কোম্পানী উঠিয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত যে চারিটি কোম্পানী (বলা বাহুল্য, ইহাদের সবগুলিই বিলাতী) টিকিয়া থাকে তাহাদের নাম :—(১) উরেগাম গোল্ড কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিঃ; (২) দি চ্যাম্পিয়ান রিফ গোল্ড মাইনিং অফ ইণ্ডিয়া; (৩) দি নান্দীরুগ মাইনস্ লিঃ; এবং (৪) মাইশোর গোল্ড মাইনিং কোম্পানী লিঃ। এই চারিটি খনিতে ১৯৪৩ সালে প্রায় ২৫ কোটি ২২ লক্ষ আউন্স বিশুদ্ধ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত কোলারের স্বর্ণখনিগুলি হইতে যে পরিমাণ স্বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে তাহার আনুমানিক মূল্য ১০ কোটি পাউণ্ডের বেশী এবং ১৯৪২ সালে উপরোক্ত চারিটি প্রতিষ্ঠান ৯ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এই সকল কোম্পানী মহীশূর রাজকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রায় ১২ হাজার ৫ শত একর জমি ইজারা লইয়া স্বর্ণ উত্তোলনের কার্য্য করিতেছে।

কৃষিক্ষেত্রের মত খনির উৎপাদনও নিয়গ বলিয়া সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত খনিতে রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করিবে না এমন কাহারও অধিকার থাকিতে দেওয়া সমীচীন নহে। ভারতের আরও বহু দুর্ভাগ্যের মত এদিক হইতেও স্বর্ণের ন্যায় অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতুর খনিগুলি বিলাতী কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের সাধ্য ও সুবিধামত ধাতু উত্তোলন করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। বর্তমানে যে নীতিতে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কোলার স্বর্ণখনিগুলির অধিকার ভোগ করিতেছে তাহা ১৯৩৪ সালের মহীশূর রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে স্বীকৃত। এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সাল হইতে ৩০ বৎসরের জন্য খনির সকল স্বত্ব রাষ্ট্র উক্ত কোম্পানীগুলিকে দিলেন এবং বিনিময়ে কোম্পানীগুলি মোট বিক্রীত স্বর্ণের মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ সেলামী হিসাবে এবং লভ্যাংশ হিসাবে বিতরিত পরিমাণ অনুযায়ী নিট লাভের একাংশ লাভ হিসাবে মহীশূর রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য থাকিবে।

স্যার রেইসম্যানের শেষ কেন্দ্রীয় বাজেট

বর্তমান মহাযুদ্ধের আমলে অনেক ভারতবন্ধু আমাদের সান্ত্বনাদানের ছলে বলিয়া থাকেন যে, এযুদ্ধে বাংলা দেশের চেয়ে আয়তনে ছোট ব্রিটেন যদি প্রতিদিন ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি (প্রতি পাউণ্ড ১৩ টাকার কিছু বেশী) যুদ্ধের দরুণ খরচ করিতে পারে, মহাদেশের মত বিপুল ভারতবর্ষের সেক্ষেত্রে বৎসরে মাত্র ৪০০ কোটি টাকা যুদ্ধ—ব্যয় করিয়া ক্ষুব্ধ হইবার বিশেষ কারণ নাই। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত উপদেশ ধৈর্য্যের সহিত শুনিয়াও আমরা সত্যকার সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি না কারণ এই সহজ কথাটাই আমাদের পক্ষে ভোলা কঠিন যে ব্রিটেন ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ। শিল্পে একান্ত অনুন্নত এই দেশে বৎসরের পর বৎসর লোক বাড়িয়া যাইতেছে অথচ এদেশের কৃষিক্ষেত্রের স্বাভাবিক নিয়মে ফসলের দিক হইতে দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। এ অবস্থায় সাধারণ সময়ের ৪৫ কোটি টাকার দেশরক্ষাখাতের ব্যয় যদি যুদ্ধের চাপে ৪০০ কোটি টাকায় উঠিয়া যায়, এই দরিদ্র দেশের পক্ষে সেই বাড়তি টাকা তো ভেক্কিবাজির দ্বারা সংগৃহীত হইবে না। অগত্যা এই টাকা সংগ্রহ করিতে ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর দেশবাসীর উপর নূতন নূতন কর বসাইতে হয় এবং তাহাতেও ব্যয়ভারের যে অংশ মিটানো যায় না তাহা সংগ্রহ করিতে হয় ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া। যুদ্ধকালীন খরচের ব্যাপারে কতকটা নিত্য নূতন সামরিক চাপ আসায়, এবং কতকটা অর্থসচিবের দূরদৃষ্টির অভাবে বাজেট পেশ করিবার সময় গত কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ আয় ব্যয়ের হিসাব দেখানো হইতেছে সত্যকার হিসাব কিন্তু আয় বা ব্যয় উভয় দিক হইতেই তদপেক্ষা যথেষ্ট বেশী হইতেছে। এইভাবে ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথমদিকের আনুমানিক হিসাব অপেক্ষা ব্যয় ভার বহু পরিমাণ বেশী হওয়ায় উক্ত বৎসরের সংশোধিত বাজেটের ৯২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঘাটতির স্থলে ভারত সরকারের প্রকৃত ঘাটতি হইয়াছে ১৮৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের বিদায়ী অর্থ সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট পেশ প্রসঙ্গে ১৯৪৪-৪৫ সালের যে সংশোধিত বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে মোট আয় দেখানো হইয়াছে ৩৫৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় দেখানো হইয়াছে ৫১২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় ১৫৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ঘাটতি হইবে বলা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন অর্থসচিব ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন, তখন বলা হইয়াছিল যে, মোট ব্যয় ৩৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও মোট আয় ২৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ঘাটতি হইবে ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। বর্তমান আর্থিক বৎসর এখনও শেষ হইতে ২ মাস বাকী আছে, কাজেই এখনও সম্পূর্ণ হিসাব না জানিয়া অর্থসচিব যে ১৫৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব বৎসরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে (এবং ঘটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক) আরও বেশী হইতে পারে। ১৯৪৫-৪৬ সালের যে বাজেট—অর্থসচিব বর্তমানে পেশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য নিতান্ত কাঁচা হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া। অভিজ্ঞতা হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই বৎসরে আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৩৫৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ও ৫১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ধরিয়া ১৬৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার যে ঘাটতি হিসাব করা হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ আরও বেশী হইবে; কারণ ইউরোপের যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে ভারতবর্ষকে যে সমরায়োজন বৃদ্ধি করিতে হইতেছে তাহা যুদ্ধ-ব্যয় বাড়াইবার পক্ষে অবশ্যই সবিশেষ সাহায্য করিবে। ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত বাজেটে সামরিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল ২৬২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, এই ব্যয় আরও প্রায় ৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় সত্যকার ঘাটতি ৯২ কোটি ৫৩ লক্ষ

টাকার স্থানে প্রায় ১৯০ কোটিতে পৌঁছিয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালের যে দশ মাস হইয়াছে, ইহার মধ্যে আদি বাজেটের সামরিক ব্যয় ২৬৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার স্থলে সংশোধিত বাজেটে সামরিক ব্যয়ের রাজস্ব খাতে ৩৭৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতে ৫২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অর্থসচিব ঘোষণা করিয়াছেন। সত্যকার খরচ ইহা অপেক্ষা বেশী হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য এইভাবে ১৯৪৫-৪৬ সালের যে সামরিক খরচ আদি বাজেটে ধরা হইয়াছে ৩৯৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং যাহার ভিত্তিতে ঘাটতি প্রায় ১৬৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, সত্যকার সামরিক ব্যয় শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ ইহাপেক্ষা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া আরও বেশী ঘাটতির কারণ হইবে। এ বৎসরের বাজেটে তামাকের আমদানীর উপর, ৪০ তোলার পার্শেলের উপর, টেলিফোনের সারচার্জ্জের উপর এবং ১৫ হাজার টাকার উপরের আয়করের সারচার্জ্জের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এভাবে গভর্ণমেণ্টের এ বৎসর ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে বলিয়া অর্থসচিব আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

দরিদ্র এই দেশের উপর সামরিক ব্যয়ের যে পাহাড় চাপিতেছে এবং যাহার ফলে প্রতি বৎসর করবৃদ্ধি হইয়া জনসাধারণের বিপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঋণভার বহনের দায়িত্বে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া যাইতেছে, সেই আঘাত হইতে অর্থসচিব স্যার রেইস্‌ম্যান ভারতকে বাঁচাইবার এবং সুস্থ করিয়া তুলিবার যে আশা দিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া বলা হয় নাই। বরং আর্থিক বিপন্নতা হইতে ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার আশু কার্য্যকারিতার সম্ভাবনা এদেশকে যতটুকু বাঁচিবার আশা দিতে পারিত, পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে স্যার রেইসম্যানের হতাশাজনক অভিব্যক্তিতে সেই আশা পোষণ করাও বর্ত্তমানে দেশবাসীর পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এক কথায় স্যার রেইসম্যান এমন মনোভাব দেখাইয়াছেন যেন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে এবং এখন হইতে এ সম্পর্কে করিবার বিশেষ কিছুই নাই। অত্যন্ত নিরুৎসাহজনকভাবে তিনি বলিয়াছেন যে,—Post war development must mean and continue to mean Post-war development and by no magic or optimism can be made to mean wartime development.......The first one or two years at least after actual fighting ends will inevitably be for the centre years of heavy deficits on revenue account......The first Pre-requisite of reconstruction finance is a sound financial Position both at the Centre and in the Provinces secured by the fullest development of their respective resources."—এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের ব্যবস্থাদি প্রবর্ত্তনের আশু সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধ ধারণা থাকায় এই উপলক্ষে ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে তিনি আশানুরূপ আগ্রহ দেখান নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্যার জেরেমী রেইসম্যান পরের দেশে এরূপ সংস্কারগ্রস্ত মনোভাব দেখাইলেও তাঁহার নিজের দেশ ব্রিটেনের কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাঁহারা এই যুদ্ধের মধ্যেই সম্প্রতি দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদকে নিজ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে আমেরিকার সহিত ঋণ ও ইজারা নীতি-অনুসারে নূতন ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক ব্যাপার দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, ভারতসরকারের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব স্যার আর্দ্দেশির দালাল যদি তাঁহার নিজ বিভাগ পরিচালনা সম্পর্কে ভারত-সরকারের অর্থসচিবের উপর ইহার পরও নির্ভরশীল থাকেন তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগ ও তাঁহার পদগ্রহণ দুইই দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া তাহাদের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপের সরকারী যন্ত্রবিশেষ হইয়া থাকিবে।

ভারতসরকারের আয় বর্ত্তমানে নানাদিক হইতে বাড়িয়া গিয়াছে, আগে যেখানে বৎসরে মাত্র ১২।১৩ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর পাওয়া যাইত, সে হিসাবে এখন পাওয়া যাইতেছে ১৯০ কোটি টাকা; রেলবিভাগ এ বৎসর এবং পর বৎসর (১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ সালে) ৩২ কোটি টাকা হিসাবে ভারতসরকারকে সাহায্য করিতেছে; তাহা ছাড়া "Pay as you earn" নীতিতে এ পর্য্যন্ত ৬০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধ সুরু হইবার পর হইতে ৮৩৩ কোটি টাকার বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রীত হইয়াছে, এই পর্ব্বতপ্রমাণ অর্থাগম কিন্তু সামরিক ব্যয়ের হাতির খোরাক জোগাইতে নিশেষ হইয়া যাইতেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতসরকার যুদ্ধ লইয়া এমনি ব্যস্ত যে সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ এই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোন কল্যাণের জন্যই তাঁহারা উল্লেখযোগ্য অর্থ-ব্যয়ের উৎসাহ দেখাইতেছেন না। ভারতের নামে ব্রিটেনে ষ্টার্লিংয়ের পাহাড় জমিয়া উঠিতেছে; এই ষ্টার্লিং পাওনার উপর ভারতের যে একটি নির্দ্দিষ্ট ও ন্যায্য হারে সুদ পাওয়া উচিত এবং সে সুদ যে ভারতসরকারের বাজেটের ঘাটতি মোচনের উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিতে পারে, এসম্বন্ধে মাননীয় অর্থসচিব এবারও নির্ব্বাক থাকিয়া গেলেন। আমেরিকাকে পণ্যপ্রদানে দৌলতে ভারতের বহু ডলার পাওনা হইতেছে, সেই ডলারের বিনিময়ে আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি আনিয়া ভারতে শিল্পাদি গঠন করা চলিত, কিন্তু সেই ডলার-সুবিধা হইতে ভারতবর্ষকে ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত করা হইতেছে। ইজিপ্টের ষ্টার্লিং পাওনা ভারতবর্ষের ½ অংশ কিন্তু ১৯৪৫ সালে এই সামান্য পাওনার উপর ভিত্তি করিয়া ইজিপ্ট আমেরিকা হইতে মাল আনিবার পক্ষে যে পরিমাণ ডলার ব্যবহারের অনুমতি পাইয়াছে, ভারতবর্ষ পাইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণের, অথচ লজ্জার কথা এই যে, এই নিতান্ত সামান্য ডলার-সুবিধার উল্লেখ করিয়া বাজেট বক্তৃতায় স্যা[র] জেরেমী রেইসম্যান এমন ভাব দেখাইয়াছেন, যেন এই ব্যবস্থা[র] জন্য ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। মোটের উপ[র] বিদায় কালে বর্ত্তমান অর্থসচিব ভারতের জনসাধারণের কাছে [যে] পরিচিতি রাখিয়া গেলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ রক্ষণশীল উত্তরাধি[কারী]

কারী স্যার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ ভারতের উপর যে চাপই দিন, তজ্জন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে ততখানি নিন্দার্হ হইতে হইবে না। বিদায়ী অর্থসচিবের শেষ বাজেট সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভারতের প্রখ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' যে মন্তব্য করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরাও বলি যে, যে বাজেটে সবদিক দিয়া আমাদের অর্থনৈতিক উচ্চাশার উপর আঘাত হানা হইয়াছে, তাহাতে মোটের উপর দুইটি বিষয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, অর্থসচিব এবার মাত্র ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার নূতন কর না বসাইয়া অনায়াসেই পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিদায়ী বৎসরেও আরও বেশী টাকার করভার নিরুপায় আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া যাইতে পারিতেন। আর দ্বিতীয় অনুগ্রহ হিসাবে বলা যায় যে, এবারও ভারতের সমরব্যয়ের অংশ স্থিরীকরণে ১৯৪০ সালের অর্থনৈতিক চুক্তিই কার্য্যকরী রাখা হইয়াছে, দয়া করিয়া অর্থসচিব সেই চুক্তি বাতিলের শুভসংবাদ শুনাইয়া এবং ভারতের উপর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার চাপাইয়া এদেশের ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ ধূলিতে মিশাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন নাই।*

* In a budget which is in every respect a damper on our economic aspirations only two features stand out for favourable notice. One is that the new tax-burdens are light, amounting only to Rs 8·6 crores, whereas Sir Jeremy before quitting India could have thrown more burdens as readily as he has done before. In the second place, the Financial Settlement of 1940 would continue to remain the sheet-anchor for the purpose of determining India's share of the war expenditure.
The Easten Economist.p. 250. March 2, 1945.

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অভিযান

দুই সপ্তাহকাল লালফৌজের প্রচণ্ড অভিযান চলিবার পর এখন সাময়িকভাবে তাহাদের অগ্রগতি মন্থর হইয়াছে। তবে, ওডর নদী তাহাদের পক্ষে অনতিক্রমণীয় হয় নাই। মার্শাল কনিয়েভের সেনাবাহিনী ওডর এবং ববার নদী অতিক্রম করিয়াছে; তাহারা এখন নীসে নদীর পূর্ব্ব তীরে সন্নিবিষ্ট। সাইলেসিয়ার রাজধানী ব্রেস্‌লাও সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে; সম্প্রতি ব্রেস্‌লাওয়ে আটক জার্ম্মান সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য লালফৌজ প্রবলভাবে আঘাত হানিতেছে। শ্রমশিল্পপ্রধান সাইলেসিয়া প্রদেশ এখন একরূপ সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মানদের হস্তচ্যুত। ওডর যেখানে বার্লিনের সব চেয়ে বেশী নিকটে, সেখানে মার্শাল জুকভের সেনা ঐ নদীর পূর্ব্ব তীরে পৌঁছিয়াছে। আরও উত্তরে পোমারেনিয়া প্রদেশে তাহারা অগ্রসর হইয়া জার্ম্মানীর গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ষ্টেটিন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ওডরের পশ্চিমে মার্শাল কনিয়েভের সেনা এখন গুবেন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাহারা যদি আরও উত্তর-পূর্ব্বে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে জুকভকে প্রতিরোধকারী জার্ম্মান বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে এবং একই সময় দুই দিক হইতে লালফৌজের আক্রমণে বার্লিনের বিপদ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই সময় মার্শাল রকোসভস্কিও উত্তর-পূর্ব্ব পোমারেনিয়ায় অগ্রসর হইতেছেন।

বার্লিনের প্রতি প্রধান আক্রমণ চালাইবার দায়িত্ব এখনও মার্শাল জুকভের উপরই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; তাঁহার দক্ষিণে রকোসভস্কি ও বামে কনিয়েভ পার্শ্বদেশ সংহত করিতেছেন। রণক্ষেত্র গুছাইয়া লইবার জন্য এবং সরবরাহ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে লালফৌজের ব্যাপক অগ্রগতি সাময়িকভাবে মন্থর হওয়া স্বাভাবিক। বসন্তকালেই তাহাদের পরবর্ত্তী আক্রমণ আরম্ভ হইবে, না গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত তাহারা প্রতীক্ষা করিবে, তাহা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ফন রুণ্ডষ্টেডের পাল্টা আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া জেনারল আইসেনহাওয়ার পুনরায় অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। লুক্সেমবুর্গের ঠিক পশ্চিমে রাইণল্যাণ্ডেই মিত্রপক্ষের প্রধান আক্রমণ চলিতেছে। রাইণল্যাণ্ডের প্রধান শ্রমশিল্পকেন্দ্র কোলনে যাইবার পথে ডুরেন্ মিত্রপক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। সাইলেসিয়া জার্ম্মানীর হস্তচ্যুত হওয়ায় সে এখন পূর্ব্বাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রধান অঞ্চলে বঞ্চিত। এদিকে রাইণল্যাণ্ড হস্তচ্যুত হইলে শ্রমশিল্পের দিক হইতে জার্ম্মানী পঙ্গু হইয়া পড়িবে বলা যায়। অজস্র প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের গুরুত্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

ত্রিনেতৃ সম্মিলন

ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিমিয়ায় ত্রিনেতৃ সম্মিলন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। এই সম্মিলন সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, নাৎসী জার্ম্মানী ও তাহার মিত্ররা এই সম্মিলনের সিদ্ধান্ত শুনিয়া হতাশ হইয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া সুস্পষ্ট সামরিক বিজয় লাভের আশা জার্ম্মানী বহু পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছে। সে আশা করিয়াছিল—মিত্রপক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক মতানৈক্যের ফলে তাহার সুবিধা হইবে। বৃটেন ও অন্যান্য স্থানে মিত্রপক্ষের শিবিরের মধ্যে যে সব বর্ণচোরা নাৎসী-মিত্র আছেন, তাঁহারাও মতানৈক্যের সম্ভাবনায় আশান্বিত ছিলেন। বস্তুতঃ য়াল্টা বৈঠকের শেষের দিকে মতানৈক্যের কথা প্রচারও করা হইয়াছিল।

ক্রিমিয়ায় পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। লুব্লিন্ কমিটী পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট হইবার পর রুশিয়া ঐ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইয়াছিল, মানে নাই বৃটেন ও আমেরিকা। ক্রিমিয়ায় স্থির হইয়াছে যে, পোল্যাণ্ডে ও পোল্যাণ্ডের বাহিরে যে সব বিশিষ্ট পোল্ আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রসারিত করা হইবে এবং ঐ নূতন সম্মিলিত গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বজনস্বীকৃত হইবে। পূর্ব্ব দিকে কার্জন লাইনেই পোল্যাণ্ডের সীমান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠকরা জানেন—রুশিয়া বহু পূর্ব্বে এই কার্জন লাইন মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনের পোলিশ্ গভর্ণমেণ্ট জিদ ধরিয়াছিলেন—

পিলসুডিস্কির আমলে অন্যায়ভাবে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পোলিস ইউক্রেণ ও বীলো রুশিয়া তাঁহারা কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। এই পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের নানাবিধ কুকীর্ত্তির কথা 'ভারতবর্ষে' বহু আলোচিত হইয়াছে; তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ক্রিমিয়ার লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত সমাধি রচিত হইয়াছে। এই গভর্ণমেণ্ট এবং ইহাদের প্রতিক্রিয়াপন্থী সমর্থকরা এখন করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে; কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বের কুকীর্ত্তির কথা যাহাদের জানা আছে, এই আর্ত্তনাদ তাঁহাদের সহানুভূতি উদ্রেক করিবে না।

আমাদের দেশের কোন কোন অজ্ঞ লোক পোল্যাণ্ডের দুঃখে বিগলিত-অশ্রু হইয়া বৃটেন ও আমেরিকার চরম প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সুরে সুর মিলাইয়াছেন। পোল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস জানিবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, লণ্ডনের পোলিস্ গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইলে পোল্যাণ্ডে ফ্যাসিস্তত্ত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হইত, কার্জ্জন লাইন অস্বীকার করিলে একটা বড় অন্যায়ের প্রতিবিধান হইত না। সোভিয়েট বাহিনীর অস্ত্রবলে পোল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছে এবং পোল্যাণ্ডের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত বলিয়াই এই সঙ্গত ব্যবস্থা সহজে সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে তোষণ-নীতি অনুসরণের পাত্র মিঃ চার্চ্চিল নন; তাহার একটি সঙ্গত প্রস্তাব তিনি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

ক্রিমিয়ার জার্ম্মানী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পরাজিত জার্ম্মানীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি শক্তি কিছু কাল তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে; ইচ্ছা করিলে ফ্রান্সও একটি অঞ্চল অধিকার করিতে পারিবে। স্থির হইয়াছে—নাৎসীবাদ ও জার্ম্মান সামরিকবাদের সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ করা হইবে। জার্ম্মানীর সমর-শিল্পের চিহ্ন রাখা হইবে না। পরাজিত জার্ম্মানী ক্ষতিপূরণ দিবে পণ্যে—মুদ্রায় নয়। জার্ম্মান জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বিজয়ী শক্তিরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় না।

জার্ম্মানী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা আমাদের দেশে হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে "দ্বিতীয় ভার্সাই" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ক্রিমিয়া সিদ্ধান্তের এই ধরণের সমালোচনার সময় এখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পরাজিত শত্রুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারে পৌরুষ নাই। আর একবার শত্রুর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেই জগৎ হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা চিরদিনের জন্ত চলিয়া যায় না। যুদ্ধের জন্ত প্রত্যক্ষভাবে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত শক্তি দায়ী হইলেও পরোক্ষভাবে দায়ী প্রাগ্-যুদ্ধকালীন বিশ্ব-ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে নাৎসী-ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রগুলি নিশ্চিহ্ন হইবার পরও অশান্তির বীজ থাকিয়া যাইবে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় সে বীজ অঙ্কুরিত হইবেই।

এখন প্রশ্ন—জার্ম্মানী সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কি প্রাগ্-যুদ্ধকালীন অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে? ভার্সাইয়ের ইঙ্গিত কি সত্যই ক্রিমিয়ার সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়?

ভার্সাই সন্ধির প্রধান কথা—উহাতে জার্ম্মানীর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোটা ঠিক রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রসারের ক্ষেত্র বন্ধ করা হয়; জার্ম্মান রাজ্যের সীমা সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল; জার্ম্মানীর নিজস্ব ঔপনিবেশিক বাজার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। জার্ম্মানী শ্রমশিল্পে অত্যন্ত উন্নত; এইরূপ দেশের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসারের সুবিধা বন্ধ করিলে একটা বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই অব্যবস্থাই জার্ম্মানীতে অতি দ্রুত নাৎসীবাদ গড়িয়া উঠিবার অর্থনৈতিক কারণ। ইহা ছাড়া নিজ নিজ স্বার্থের জন্ত অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিরাও জার্ম্মানীর সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলে জার্ম্মান ধনিকরা গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইয়াছিল।

ক্রিমিয়ার জার্ম্মানী হইতে নাৎসীবাদ নিশ্চিহ্ন করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত যথাযথ কার্য্যে পরিণত হইলে প্রাগ্-যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধকালীন জার্ম্মান অর্থনীতি উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। নাৎসীবাদের সমর্থক ও পরিপোষক জার্ম্মান ধনিক শ্রেণীকে সমগ্রভাবে শ্রমশিল্পে বঞ্চিত করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রাগ্-যুদ্ধকালীন আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলের একটি প্রধান স্তম্ভ ভাঙিয়া যাইবে।

জার্ম্মান ধনিকদের হাত হইতে জার্ম্মানীর শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছিনাইয়া লইবার পর এই সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে—তাহাই প্রশ্ন। ধনতান্ত্রিক বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে শ্রমশিল্পে উন্নত জার্ম্মানী একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। কাজেই তাহারা জার্ম্মানীকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিতে পারিলে খুসী হয়। কিন্তু জার্ম্মানী যদি কৃষিপ্রধান দেশ হইয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার নূতন শত্রু সৃষ্টি হইবে। কাজেই, এইরূপ ব্যবস্থায় সে কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

অবশ্য, এই কথা প্রথমেই মানিয়া লইতে হইবে যে, জার্ম্মান ভূমিতে অবস্থিত কলকারখানা, রেলপথ প্রভৃতিতে বৈদেশিক শক্তির স্থায়ী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা মিত্রশক্তি করিতে পারে না; ইহা কার্য্যতঃ অসম্ভব। জার্ম্মানীর ঘরোয়া ব্যাপার সম্বন্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা কিছুদিন পরে জার্ম্মানদের হাতে ছাড়িয়া দিতেই হইবে। কাজেই, কি অবস্থায় যুদ্ধোত্তর জার্ম্মানীকে জার্ম্মানদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে, তাহাই প্রশ্ন—স্থায়ীভাবে জার্ম্মান জাতিকে পরাধীন রাখিলে কি হইবে, প্রশ্ন তাহা নহে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে জার্ম্মানীকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিবার এবং অন্তদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে সেখানকার অর্থনীতিতে জাতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই সম্পর্কে ক্রিমিয়ায় কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। সেখানে কেবল স্থির হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া নাৎসীবাদ ও জার্ম্মান সামরিকবাদ নিশ্চিহ্ন করা হইবে এবং জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ লইবার ব্যবস্থা হইবে। যুঙ্কার (জার্ম্মান সামরিক অভিজাত) ও নাৎসীরা নিশ্চিহ্ন হইবার পর জার্ম্মানীর অর্থনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য, নাৎসীবাদ নিশ্চিহ্ন করিবার জন্ত ক্রিমিয়ায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা যদি যথাযথ কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলেই উহা সম্ভব হইবে।

আপাততঃ ক্রিমিয়ার সিদ্ধান্তকে দ্বিতীয় ভার্সাই বলিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। জার্ম্মানীতে ধনিকসম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাহাদের বাজার কাড়িয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায় নাই; জার্ম্মানীর শ্রমশিল্প চিরদিনের জন্ত মিত্রশক্তি অধিকার করিবে বলিয়াও শোনা যায় নাই।

ক্রিমিয়ার পর

ক্রিমিয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, ১লা মার্চ্চের মধ্যে যে সব রাষ্ট্র জার্ম্মানী অথবা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, তাহারা এপ্রিল মাসে সান্ ফ্রান্সিস্কো সম্মিলনে যোগ দিতে পারিবে। ক্রিমিয়ার এই সিদ্ধান্ত শুনিবার পর তুরস্ক ও মধ্য প্রাচ্যের অন্ত কতকগুলি রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

শেষ মুহূর্ত্তে এই সব রাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণার সামরিক মূল্য খুব বেশী নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই সব রাষ্ট্রকে সান্ ফ্রান্সিস্কোর

সমবেত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে ডুমার্টন ওক্‌সে বিশ্ব-শান্তি সম্পর্কে যে সম্মিলন হয়, তাহাতে প্রস্তাবিত জাতি-সঙ্ঘে ভোট দানের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ ঘটিয়াছিল। রুশ-প্রতিনিধি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, প্রধান তিনটি শক্তিই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। বৃটিশ প্রতিনিধি জাতিসঙ্ঘের সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রকে ভোটের অধিকার দিতে চান। রুশ প্রতিনিধির প্রস্তাবে বাস্তবকে নির্বিবাদে মানিয়া লইবার প্রয়াস ছিল। তিনি সোজাসুজি স্বীকার করিতে চান যে, এই যুদ্ধের পর তিনটি রাষ্ট্র প্রবল হইয়া উঠিবে; চীন ও ফ্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র হইবে। সুতরাং ঐ তিনটি (বড় জোর পাঁচটি) শক্তি বিশ্বের ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা করিবে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী হইবে। ছোট রাষ্ট্রগুলির ভোটাধিকার থাকিলে আবার দলাদলি ও কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র চলিতে আরম্ভ করিবে। সোভিয়েট প্রতিনিধি রাজনৈতিক জটিলতা এড়াইয়া সোজাসুজি বাস্তবকে মানিয়া লইতে চান।

ক্রিমিয়ার পর ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধ ঘোষণায় প্ররোচিত করিয়া বিশ্ব-শান্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থায় তাহাদিগকে অংশ লইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু অধিক-সংখ্যক ছোট রাষ্ট্রের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশে আবার দলাদলি ও কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ না হয়। ভোটদাতার সংখ্যা বাড়িলেই স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় না। স্থায়ী শান্তির জন্য সমগ্র বিশ্বের গণ-জাগরণ চাই; প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রভাবমুক্ত হইয়া গণ-শক্তি জাগ্রত হইলেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—তাহার পূর্ব্বে নয়। জাতি-সঙ্ঘ সেই জাগরণে বিঘ্ন না ঘটায়, তাহাই কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রাচ্যের যুদ্ধ

প্রাচ্য অঞ্চলে মার্কিণ সেনা ফিলিপাইন্‌সের রাজধানী ম্যানিলায় প্রবেশ করিয়াছে; তবে, উহার উপকণ্ঠে এখনও সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে।

প্রাচ্য অঞ্চলে আইওজিমা দ্বীপে মার্কিণ সৈন্যের অবতরণই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আইওজিমা হইতে খাস জাপানের দূরত্ব মাত্র ৭৫০ মাইল। ইতিপূর্ব্বে খাস জাপান হইতে ১৫শত মাইল দূরবর্ত্তী সাইপান্ দ্বীপ হইতে সুপারফোর্ট্রেস্ শ্রেণীর বোমাবর্ষী বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই আইওজিমা হইতে খাস জাপানে বিমান আক্রমণ যে বহুগুণ বর্দ্ধিত করা সম্ভব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত জানুয়ারী মাসে ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত হইবার পর ব্রহ্মদেশে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। মিত্রপক্ষ এখনও মান্দালয় অধিকার করিতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে তাহাদের সেনা ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়াছে। ১।৩।৪৫

শোক সংবাদ

প্রসিদ্ধ নট বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—

সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী গত ১০ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে নাট্যামোদী মাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। রঙ্গ-জগৎ হইতে

বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

বিশ্বনাথবাবুর চির-বিদায় একাধারে চিত্র ও মঞ্চজগৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। কিছুদিন হইতে তিনি রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর নট-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার রূপায়িত বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন অংশগুলি তিনি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া নাট্যামোদিদের হৃদয়ে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মঞ্চের সর্ব্বশেষ অভিনয় 'বিপ্রদাস' ও চিত্রে সর্ব্বশেষ অভিনয় 'উদয়ের পথে'তে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৪৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর তৃতীয় ভ্রাতা ও শিষ্য ছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী ও অসংখ্য আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ভাগলপুর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়া আরা কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। অগ্রজ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের মত তিনিও আজীবন সাহিত্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

কবি ভুবনচন্দ্র বিজলী—

মেদিনীপুর জেলার গোকুলনগর নিবাসী পল্লী-কবি ভুবনচন্দ্র বিজলী দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া গত ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা বহু মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তিনি স্বরচিত একখানি কবিতা পুস্তকও সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৈমানিক কে-কে মজুমদার—

খ্যাতনামা বৈমানিক কে-কে মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করায় সমগ্র ভারতের লোক সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি স্বর্গত কংগ্রেস নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র—ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ও রয়াল এয়ার ফোর্সে চাকরী লইয়া তিনি তাঁহার অসাধারণ কর্মশক্তি দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক বৎসর

করণকৃষ্ণ মজুমদার ও জয়কৃষ্ণ মজুমদার

পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। একই পরিবারের উভয় ভ্রাতার এইরূপ মৃত্যু শুধু তাঁহাদের পরিবারের পক্ষে নহে, বাঙ্গালী জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। তবে তাঁহারা অপূর্ব্ব সাহস ও কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীকে বিমান-বিভাশিক্ষায় উৎসাহিত করিবে।

সার উইলিয়ম রোদেনষ্টাইন—

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সার উইলিয়ম রোদেনষ্টাইসন ১৪ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সাউথ কেনসিংটন রয়াল আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯১০ সালে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ও ১৯৩১ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ বিলাতে প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও চিত্রাঙ্কন ক্ষেত্রে তাঁহার দানের কথা বিশ্ববাসী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। ১৯২৫ সালে তিনি 'প্রাচীন ভারত' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

কবি কনকভূষণ—

বর্দ্ধমানের চারণ-কবি কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়া গত ৩রা মাঘ বর্দ্ধমান হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৩২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি বর্দ্ধমানে সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্দ্ধমান সাহিত্য-সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্দ্ধমান শাখার সভায় তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার কবিতা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করিত এবং তাঁহার ব্যবহার সকলের নিকট তাঁহাকে প্রিয় করিয়াছিল।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, সুপণ্ডিত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার বরাহনগরস্থ বাসভবনে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ফরিদপুর কোটালীপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশের পর কিছুকাল ই-আই-রেলে চাকরী করিয়াছিলেন। ২৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং নিমতলার রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত একযোগে কাজ করিয়া ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড বিপন্ন হইলে তাঁহারা উহা রক্ষায় অগ্রসর হন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, বঙ্গলক্ষ্মী সোপ, কেমিকেল ও আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্কস্, কলিকাতা ফেণ্ডস সোসাইটী, ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সম্প্রতি তাঁহারা ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনকেও বিপদ্‌মুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে তাঁহার অসামান্য উৎসাহ ছিল এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট সমাদৃত হইতেন। তিনি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শিক্ষা প্রচারে তাঁহাকে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে দেখা যাইত।

বলাইচন্দ্র সেন—

কলিকাতা জবাকুসুম হাউসের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী বলাইচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে সহসা লোকান্তরিত হইয়াছেন।

বলাইচন্দ্র সেন

তিনি স্বর্গত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের পৌত্র ও কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং শুধু নিজেদের স্থায়ী ব্যবসার উন্নতি বিধান করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, নানাবিধ নূতন ব্যবসা সৃষ্টি করিয়া একদিকে যেমন প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন, অন্যদিকে তেমনই দেশ ও দশের সেবায় তাহা নিয়োজিত করিতেন। ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামক হ্যারিকেনের কারখানা এবং পিওর ড্রাগ এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস নামে ঔষধাদির কারখানা স্থাপন করিয়া তিনি দেশের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-ভূমি কালনায় অম্বিকা হাই স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় এবং মিউনিসিপাল হাসপাতালে কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

বিরাট ধনের মালিক হইয়াও তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করিতেন এবং সকলের সহিত অমায়িক সহৃদয় ব্যবহার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। আত্মীয়স্বজন; বন্ধুবান্ধব সকলেই সেজন্য তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিত। তাঁহার বিধবা পত্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন, তিন্ পুত্র, দুই কন্যা, জামাতা প্রভৃতির এই নিদারুণ শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতের চা-কণ্ট্রোল বিভাগের অর্থনীতিক উপদেষ্টা সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৩শে জানুয়ারী ৪৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ইতিহাসে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন হুগলী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কাজ করিয়া চা-কণ্ট্রোল অফিসে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী,তিন ভ্রাতা ও বহু আত্মীয় বর্ত্তমান।

ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর মৌলবী আবদুল করিম ১লা মার্চ্চ ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার ত্রিপুরা জেলার গ্রামের বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান উকীল ছিলেন।

ব্যারিষ্টার হরিদাস বসু—

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার এইচ্-ডি বসু গত ১১শে ফাল্গুন শনিবার বিকালে তাঁহার কলিকাতা ৫৩।১।২ হাজরা রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনই তাহার সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের সময় দেশবন্ধুকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান খাঁটি হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ৭ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্ত্তমান।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই মাঘ রাত্রিতে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার নারিকেলডাঙ্গার ভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি সার গুরুদাসের প্রথম পুত্র ছিলেন। গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া তিনি রিপণ কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে ঐ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। ১৯১৪—১৯৩১ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন ও পরে কিছুদিন রিপণ ল কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপরায়ণ লোক এ যুগে অতি অল্পই দেখা যায়।

ভাঙনের তীরে—

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

সাগর-কপোত ছিলো সাগরেতে,
বালুহাঁস বালুকায়—
কার আহ্বানে কে জানে কেমনে
দেখা হ'লো দু'জনায়।

হাসে দিকে দিকে নিঠুর সাগর,
তবু অবুঝেরা বাঁধে খেলাঘর,
ভাঙনের তীরে গড়ার' পিয়াসা
দুরাশা লাগে না হায়?

কে যেন অলখে আকাশ-ভুবনে
সাধিছে কিসের সুর—
কত অজানারে বাঁধিছে যতনে,
জানারে ঠেলিছে দূর।

তীরের সারসী, তবু শোনো শোনো—
মরু-যাযাবরে ভুলো না কখনো,
বনের কপোত থাকে যদি নীড়ে,
খোড়ো পাখী উড়ে যায়।

গান

শ্রীঅপূর্ব্বসুন্দর মৈত্র বি-এ

দুঃখের দুর্দ্দিনে আজ—
সঙ্কিত প্রাণ,
এলোরে কার আহ্বান।
রুদ্ধ ঘরের বাহিরে ঝড়ার গান—
এলোরে কার আহ্বান
সে ডাকে—'আয় ওরে আয়
ঐ তোর দিন যায়
সজ্জায় লজ্জায় হায়
যায় সম্মান।'
বজ্রের গর্জ্জন গর্জ্জে
পঙ্কিল পথ,
ঐ শোন্ কয় কোন্—'ভয় কি—
ঐ জয়-রথ;
বিশ্বের সংঘাত মাঝে
মুক্তিই গান গায় রজে
ঝড়, আজ তোর মন-মাঝে
দিক্ তার দাগ'।

বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গালায় ৩ কোটি টাকা ঘাটতি অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ১১ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আয় সাড়ে ৮ কোটি টাকা কম হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। খাদ্য-শস্য ক্রয় ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে ১৯৪৩-৪৪ সালে সাড়ে ৩ কোটি টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৩ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের জন্য ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৪ কোটি ও ১৯৪৪-৪৫ সালে ২৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে—সে জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৩-৪৪ সালে ৩ কোটি ও ১৯৪৪-৪৫ সালে ৭ কোটি টাকা সাহায্য করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ হইবে ১৯ কোটি টাকা। এ অবস্থায় দেশোন্নতির সকল কার্য্য যে বন্ধ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বর্ত্তমান অবস্থাতেই দারুণ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি। এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের যে সকল ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, অর্থাভাবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার কিছুই করা সম্ভব হইবে না। কাজেই আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইব।

ভারতে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি—

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জে-ডি-টাইসন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা-বৃদ্ধির যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে সকলেই স্তম্ভিত হইবেন। ১৯৪৪ সালের প্রথম ৯ মাসে অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে মোট ৫০ লক্ষ ৭১ হাজার লোক মারা গিয়াছে। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে যথাক্রমে ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ও ৭০ লক্ষ ৭৩ হাজার লোক মারা গিয়াছিল। ১৯৪৫ সালের শেষ ৩ মাসের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার পর মাদ্রাজ ও তাহার পর যুক্তপ্রদেশ। কি ভাবে এই হিসাব গৃহীত ও প্রেরিত হয়, তাহা বাঙ্গালার অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই অবিদিত নহে—কাজেই আসল সংখ্যা ইহার কত অধিক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কে? দেশের লোক যদি বহু দিন অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে থাকিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের পক্ষে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আর কি উপায় হইতে পারে? গত ২ বৎসরেরও অধিক কাল দেশের শতকরা ৯৪ জন লোক কদাহার ও অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে—সে অবস্থায় প্রতিকার না হইলে মৃত্যুর হার আরও বাড়িয়া যাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

বাঙ্গালার বস্ত্র সমস্যা—

১৯৪৪ সালের জুলাই হইতে নভেম্বর এই ৫ মাসে বাঙ্গালার কাপড়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চমকপ্রদ। ঐ ৫ মাসে বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলিতে ৮ কোটি ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে; অন্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় মোট ২০ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৪ হাজার গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। বাঙ্গালার তাঁতে ঐ ৫ মাসে মোট ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৫ হাজার গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৪১ সালের আদম সুমারী হিসাবে বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ধরিলে প্রতি লোক ৫ মাসে ৫·৮ গজ কাপড় পাইয়াছে। সে হিসাবে ১২ মাসে তাহাদের ১৩·৯ গজ কাপড় পাওয়া উচিত। কিন্তু এই কাপড় গেল কোথায়? শুনা যায়, বাঙ্গালা হইতে আসামের পথে চীন দেশে ও কালিম্পংএর পথে তিব্বতে প্রচুর কাপড় রপ্তানী হইয়াছে। কাজেই বাঙ্গালায় আজ কাপড়ের এই অভাব। যাহাতে বাঙ্গালা হইতে কাপড় বিদেশে না যায়, সে জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। বাঙ্গালার লোক এখন কাপড় না পাইয়া আত্মহত্যা করিলেও কাপড় পাইবে না।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা—

গত ২০শে ফাল্গুন মিঃ নৌসের আলির সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক জন সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—দুর্ভিক্ষের পর অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালায় কমবেশী ৩৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐ সংবাদ অস্বীকার করিয়া জানান—দুর্ভিক্ষে মাত্র ১৮ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালায় ৩৪ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আবার এই সংখ্যা লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। কেন এত পার্থক্য হইয়াছে, সে সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভারত—

মিঃ সামনার ওয়েলস্ বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিক। তিনি সম্প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দের বিষয় মার্কিণের এই প্রবীণ রাজনীতিকের দৃষ্টিতে ভারত ও ভারতের পরাধীনতা সমস্যাই বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান অশান্তি

পটভূমিকায় বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। মিঃ ওয়েলস্ লিখিয়াছেন—'সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে শান্তির প্রতি ভারতবর্ষের যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এমন আর কোন দেশের নাই। বিশ্বজাতিসংঘ গঠনে ভারতবর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। স্বাধীন ও শক্তিমান চীনের সহিত স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনশীল ভারতবর্ষের অভ্যুদয় ঘটিলে এশিয়ায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে।' মিঃ ওয়েলস্ এখন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাই কি এই কথা এত স্পষ্ট করিয়া জানাইতে সাহসী হইলেন? মার্কিণের বর্ত্তমান শাসকগণ ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইবেন কিনা কে জানে।

বাঙ্গালায় সংস্কৃত শিক্ষা—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহার সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় গভর্ণমেন্টকে ও জনসাধারণকে বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষক—অর্থাৎ পণ্ডিতগণকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এদেশে লোকের সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ কমে নাই; প্রতি বৎসর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনাতেও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান রক্ষিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আমরা দেশবাসী সকলকে সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

আসামে হিন্দুর সংখ্যা—

মুসলেম লীগ আসামকে মুসলমান-প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহাকে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কারণ কি বুঝা যায় না। আসামে ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে দেখা গিয়াছিল তথায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ৫২ লক্ষ ৪ হাজার ও আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ১২ হাজার; আদিম অধিবাসীরা যে ধর্ম্মে, আচারে ও ব্যবহারে হিন্দু সে কথা গণনাকারীরাও স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালের গণনার ফল এইরূপ—হিন্দু ৪৫ লক্ষ ৭৪ হাজার। আদিম অধিবাসী, জৈন ও শিখদের হিন্দু ধরিলে আসামে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ লক্ষ ৮০ হাজার। ইহার পরও পাকিস্থানের কথা উঠে কেন?

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর প্রায় ৪ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি পুনর্গঠন করিয়া স্থির হইয়াছে—কবির জীবনব্যাপী সাধনার মূর্ত্ত প্রকাশ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিধানের ভার দেশবাসীকে লইতে হইবে। কলিকাতায় যে স্থানে তাঁহার জন্ম, যেখানে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনেক দিন কাটিয়াছে, সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে তাহাকেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। সে জন্য দেশবাসীর নিকট আগামী ২৫শে বৈশাখের পূর্ব্বে অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হইয়াছে। সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার জন্য আবশ্যক অর্থের অভাব হইবে না।

বিদেশে ভারতবাসীর দুরবস্থা—

সার সাফাৎ আমেদ খাঁ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী ভারতীয়গণের দুরবস্থার কথা বিবৃতি কালে বলিয়াছেন—"যদি আমরা দেশে শক্তিশালী হই, তাহা হইলে আমরা বিদেশস্থিত ভারতীয়গণকে রক্ষা করিতে পারিব।" দেশে হিন্দুমুসলমানে বিরোধ লক্ষ্য করিয়াই সার সাফাৎ এই কথা বলিয়াছেন। তিনি নিজে মুসলমান; তাঁহার কথা কি হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের বিবেচনার বিষয় হইবে?

সার বিজয়প্রসাদ ও কংগ্রেস—

সার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় পাকা মডারেট এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি। তিনি লণ্ডনে যাইয়া এক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্ত করা না হইলে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানের কথা উঠিবে না। দেশের জনগণের পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকার কংগ্রেস ছাড়া অপর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই।" বিলাতে যাইয়া তাঁহার এই উক্তির জন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা—

বাঙ্গালার জেলা স্কুল বোর্ডগুলির হাতে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ভার প্রদত্ত হওয়ায় গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতায় বোর্ডগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিদিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হইয়াছে—(১) ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা শুধু অবশ্য পাঠ্য হইবে না—উহা একটি পরীক্ষার বিষয়ও হইবে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক প্রাথমিক শ্রেণীতে—উহা যে কোন বিদ্যালয়েই হউক, একই ধরণের পাঠ্যতালিকা হইবে। দুইটি বিষয়ই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বোর্ডগুলি যদি অবিলম্বে এই ব্যবস্থায় অবহিত হন, তবে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

পল্লী-অঞ্চলে মহিলা সেবিকা—

গত ১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার পল্লী অঞ্চলে কাজ করিবার জন্য নারী-সেবিকা তৈয়ারীর জন্য কলিকাতায় এক শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে লেডী অবলা বসু এক বাণী প্রেরণ করেন; উহা সকলের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করিতে গিয়া শিক্ষয়িত্রীর অভাব বোধ হইল। তখন শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইল। জাপানে দেখিয়াছিলাম, শিক্ষার ভার দেশবাসীর উপর ন্যস্ত। আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সরকারী

সাহায্য না লইয়া দেশবাসীর অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করি। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জাপান স্বাধীন দেশ। বহু বৎসর দেশবাসীর সাহায্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি চালাইয়া দেখিলাম যে সাধারণের অস্থায়ী দানের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান চালান সম্ভব নয়। কাজেই বাধ্য হইয়া সরকারী সাহায্য লইলাম। তোমরা তখন থাকিলে হয় ত সরকারী সাহায্য লওয়ার দরকার হইত না। আমি যে সেবিকা দলের কল্পনা করিতাম, তোমরা কালে সেই কল্পনাকে মূর্ত্তি দিবে। নারী সেবাসংঘ তাহারই পূর্ব্বাভাষ।" ৩০টি মেয়ে লইয়া শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দুঃস্থা মেয়েদের সাহায্য ও তাহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে কর্ম্মীর অভাব অনুভব করিয়া এই শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই আদর্শ সাফল্য লাভ করিলে তদ্বারা দেশবাসী সকলেই উপকৃত হইবে।

বড় ঘরের বড় কথা—

ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বাণিজ্য-সদস্য সার মহম্মদ আজিজুল হক নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অধিবাসী। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ঐ মহকুমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত অধিবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সার আজিজুল ৬০ বস্তা চাউল দিয়াছিলেন। ঐ চাল মহকুমা কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়। ঐ সম্বন্ধে সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে যে মহকুমা হাকিম উহার মধ্যে মাত্র ৯ বস্তা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৩ বস্তা পচিয়া মানুষের অখাদ্য হইয়া গিয়াছে ও ২৮ বস্তা চাউল কোথায় গেল তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। সংবাদটি সত্যই অসাধারণ। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর গুণে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে, তাহাদের সকলকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ সমস্যা—

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা ঘোষ, প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও সুধীরকুমার আইচ আগষ্ট আন্দোলনে ধৃত হইয়া আটক হন। শ্রীযুক্তা ঘোষ মুক্তি লাভের পর কলেজে যোগদান করিতে গেলে সরকার তাহাতে আপত্তি করে ও কলেজের সরকারী সাহায্য বন্ধ করে। সম্প্রতি বিনাসর্ত্তে শ্রীযুক্তা ঘোষকে কলেজে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রফুল্লবাবু ও সুধীরবাবু এখনও আটক আছেন। বিনা বিচারে যাহাদের আটক করা হইয়াছে, তাহাদের চাকরী লইয়া এই সমস্যার কারণ কোথায়?

কলিকাতায় যান সমস্যা—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে যানবাহন বিভাগের সদস্য সার এডোয়ার্ড বেন্থল জানাইয়াছেন, "কলিকাতার ট্রামে ও বাসে অত্যধিক ও অসহনীয় ভিড় হইতেছে। যাত্রীরা গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে।" কিন্তু এই স্বীকারোক্তির পরও তিনি এ অবস্থার প্রতীকার সম্বন্ধে কোন আশার কথা বলিতে পারেন নাই। যে কারণে এই ভিড়, তাহার বিষয়ে ব্যবস্থা না করিলে ভিড় কমিবে কিরূপে? এখনও প্রত্যহ সহরে নূতন নূতন লোক আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা কি বন্ধ করার কোন উপায় নাই?

মৈমনসিংহে পচা ধান—

মৈমনসিংহ হইতে খবর আসিয়াছে যে ঐ জেলার কয়েক প্রধান প্রধান গঞ্জে গুদামে ধান বোঝাই করিয়া ও মাঠে হ ধান জমা হইয়া পড়িয়া পচিয়া যাইতেছে। সে সকল ধা পাঠাইবার জন্য সময় মত রেলগাড়ী পাওয়া যায় না—আব সেগুলিকে যত্ন করিয়া রাখিবার উপযুক্ত চটের থলিরও অভাব দেশের লোক যখন অত্যধিক মূল্য দিয়া চাউল কিনিতে পারিয়া অর্দ্ধাহারে মৃত্যুর পথে অগ্রসর, সেই সময়ে এইভাবে খাদ্য শস্য নষ্ট হওয়ার সংবাদ কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা কাহাকে বলার প্রয়োজন নাই। গত বৎসর যশোহরে বহু ধান অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবার মৈমনসিংহে তাহাই হইতেছে। অথ এ বিষয়ে দেখিবার জন্য এক লক্ষ বড় বড় সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মৎস্যজীবীদের দুর্দ্দশা—

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কেন এত অধিক মৎস্যের অভাব হইয়াছে তাহার বহু কারণ বর্ত্তমান। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল সংবাদপত্রে জানাইয়াছেন—সকল দরিদ্র লোক মাছ ধরিয়া জীবিকার্জ্জন করে, তাহারা জালে অভাবে মাছ ধরা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে সূতা দি তাহারা জাল বুনিত, সে সূতা এখন আর বাজারে পাওয়া যা না। গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য লোকে অভাব নাই—কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে যে কত শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে সে বিষয়ে দেখিবার কেহ নাই। সকল দিক দিয়া সাবধান অবলম্বিত হইলে আজ বাঙ্গালা দেশের এইরূপ দুর্দ্দশা অ সম্ভব হইত না। যাহারা মাছ ধরিয়া খায়, তাহাদের জমি নাই যে তাহারা চাষ করিয়া খাইবে। গ্রাম ছাড়িয়া সহ কাজের জন্য আসিয়া পথে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাহাদে গত্যন্তর নাই।

বাজিতপুরে হিন্দু সম্মিলন—

গত ১৪ই ও ১৫ই মাঘ ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যো বাজিতপুর সেবাশ্রমে হিন্দু সম্মিলন ও মহোৎসব হইয়া গিয়াছে প্রায় ৫০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলে সভায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, হিন্দু দায়াধিকার বিল, পাকিস্ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা এবং বাঙ্গালার সর্ব্বত্র হিন্দু মিল মন্দির ও রক্ষীদল গঠন আন্দোলনের সমর্থন করিয়া কয়েক প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় দিনে যজ্ঞ, অন্নকূট ভোগ, বক্তৃতা প্রভৃতি হয় ও ৪০ হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিত করা হয়।

বনগ্রামে মধুসূদন উৎসব—

গত ১২ই মাঘ বনগ্রামে (যশোহর) মাইকেল মধুসূ দত্তের ১২০তম জন্ম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কথাশি শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন দেশ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন সভায় পৌরহিত্য করে বনগ্রামে মধুসূদনের নামে একটি পার্ক, একটি হল, একটি গৃহে পাঠাগার ও মহাকবির একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করায় ১০ হা

টাকা সংগ্রহের জন্ত স্থানীয় মধু-স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সারদেশ্বরী আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরীপুরী দেবী মাতৃজাতির কল্যাণ কল্পে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর নামে ১৩০১ সালে কলিকাতায় সারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরে ও কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কলিকাতার সভায় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। আশ্রম ও বিদ্যালয় এখন সকলের নিকট আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে।

মার্কিণ সৈন্যদের অপরাধ—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের ফলে জানা গিয়াছে যে ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে মার্কিণ সৈন্তগণ কর্ত্তৃক ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের জন্ত মোট ১২৯টি মামলা উপস্থিত হইয়াছিল—তাহার মধ্যে ১০৪জন অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে ও ২৫জন বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়াছে। কত অত্যাচারের বিবরণ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই, তাহার কি কোন হিসাব রক্ষিত হয় না?

পাটের চাষ ও মূল্য নির্দ্ধারণ—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট পাটের চাষ ও মূল্য নির্দ্ধারণের জন্ত এক আদেশ জারি করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল, ১৯৪৫ সালে তাহার অর্দ্ধেক জমীতে পাট চাষ করিতে বলা হইতেছে। কলিকাতায় পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য যাহাতে মণ করা ১৫ টাকার কম না হয় ও সর্ব্বোচ্চ মূল্য যাহাতে ১৭ টাকার বেশী না হয়, সেজন্তও গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিবেন। কিন্তু ১৫ টাকা মণ ধরা হইলে এই দুর্ব্বৎসরে পাট চাষ করিয়া চাষী কি লাভবান হইবে? যে সময়ে সকল প্রকার খাদ্য শস্তের দাম ৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে, সে সময়ে পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য কাহাদের স্বার্থের জন্ত ১৫ টাকা করা হইল, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। যে মন্ত্রিসভা কৃষকদের জন্ত এত দরদ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা কি এ বিষয়ে কিছু করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই।

রেলযাত্রীর অসুবিধা—

সমগ্র ভারতে এখন রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রেল যাত্রীদের দুরবস্থার কথা আলোচিত হইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার নেতা মৌলবী এ-কে-ফজলল হক সাহেব এ বিষয়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ট্রেণগুলিকে যথোপযুক্তভাবে আলোকিত করিবার জন্ত অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ট্রেণের সংখ্যা কম হওয়ায় বর্ত্তমানে ট্রেণে যাত্রীদের খুব ভীড় হইয়া থাকে। ট্রেণের অন্ধকার কামরায় বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান সংগ্রহ করিবার জন্ত যাত্রীদিগকে প্রায়ই ঠেলাঠেলি করিতে দেখা যায়। ইহার ফলে পকেটমারেরা স্বভাবতই সুবিধা পায়। এমন দিন যায় না যে দিন কোন না কোন যাত্রীকে কিছু না কিছু হারাইতে হয়। ইহা শুধু দেশনেতা হক সাহেবের কথা নহে,

পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন সম্বর্দ্ধনা—

পল্লীকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ষিষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্ত গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ভাতাড় (বর্দ্ধমান) ষ্টেশনস্থ মাধব পাব্লিক হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মিত্র উৎসবে পৌরহিত্য করেন। চতুপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বিপুল সংখ্যায় হিন্দু-মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং কবি-প্রশস্তির সমাবেশে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র দে সকলকে অভ্যর্থনা করেন। কবির গুণ-মুগ্ধদের মধ্যে অনেকে উৎসবের সাফল্য এবং কবির সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন। অতঃপর "বাঙ্গালা সাহিত্যে কবির অবদানে"র কথা উল্লেখ করিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, "কবি ও কাব্য" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সৌরেন সরকার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত, পণ্ডিত দিবাকর বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীযুক্ত রাস-বিহারী অধিকারী প্রভৃতি কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

কবি তাঁহারপ্রতিভাষণে বলেন, দিনের শেষে জীবনের অপরাহ্নে এই রকম সুহৃদসম্মেলনের আবশ্যকতা আছে। এতে প্রিয় জিনিষ প্রিয়জনদের আর একবার ভাল ক'রে দেখবার সৌভাগ্য হয়। আমি দীন পল্লীর মেঠো গান গেয়ে অলস জীবন কাটিয়েছি। আমার জীবন ক্ষীণ কর্পূরমালা, দেবতার পূজায় লাগ্‌ল না, তাকেই তোলা রইল। আমি চেয়েছিলাম—

সন্ধ্যা—জীবন সন্ধ্যা আমার স্বর্ণ সন্ধ্যা হ'ক,
রবির কিরণ মিলবার আগে উঠুক চন্দ্রালোক।

হিন্দু আইনের সংশোধন—

হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন পরিবর্ত্তনের জন্ত যে কমিটী গঠিত হইয়াছে, ঐ কমিটী কয়দিন কলিকাতায় থাকিয়া কলিকাতার জনসাধারণের কথা শুনিয়া গিয়াছেন। সার বি-এন রাও উক্ত কমিটীর সভাপতি এবং ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত টি আর বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী ও প্রিন্সিপাল জে-আর ঘরপুরে উক্ত কমিটীর সদস্য। ভারতের হিন্দু জনগণের অধিকাংশ লোকই এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আইন হইলে হিন্দুদিগের কি ক্ষতি হইবে, তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছি। বহু পর্দ্দানশীন সম্ভ্রান্ত মহিলাও কমিটীর নিকট নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়াছেন। ইহার পরও কি তথাকথিত সংস্কারপন্থীরা আইনের খসড়া সমর্থন করিবেন?

সরকারী অর্থের অপব্যয়—

কলিকাতা থিয়েটার রোডে গভর্ণমেণ্ট দুইটি গৃহ-সংস্কারের জন্ত যথাক্রমে ৪০ হাজার টাকা ও ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। একটি গৃহে প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব

বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী দুইটি সরকারী সম্পত্তি নহে—অথচ সেগুলি সরকারী অর্থে সংস্কার করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী বা অপর সরকারী কর্মচারীদিগকে এইভাবে বাম হস্তে অর্থদানের ব্যবস্থা কোন সভ্য সমাজেই প্রশংসার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বস্ত্রের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব—

কলিকাতা ৩১নং কটন ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথের প্রতিষ্ঠানটির সহিত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় সুপরিচিত। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের প্রাক্‌কালে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বাবু বৈজনাথ সুলভে পুরী এবং মিলের দরে বস্ত্র যোগাইয়া সর্ব্বসাধারণের আস্থা ও ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। গত বৎসর এবং বর্ত্তমান বর্ষে দারুণ শীতে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কম্বল ক্রয় করিয়া বহু মধ্যবিত্ত পরিবার উপকৃত হন। এখনও ইঁহারা ছয় আনা দরে দরিদ্র সাধারণকে পুরী সরবরাহ করিতেছেন, দুর্ম্মূল্যতার

শ্রীযুক্ত বৈজনাথ তিয়ানীওয়ালা

দোহাই দিয়া এই বিভাগটির দ্বার বন্ধ করেন নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় শহরের যে দেড়শত প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র সরবরাহের অধিকার পাইয়াছেন, লক্ষ্মীচাঁদ বৈজনাথের প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির নাম তন্মধ্যে নাই। তাঁহাদিগকে বস্ত্রসরবরাহের ব্যাপারে এভাবে বঞ্চিত করা হইল কেন এবং ইহার মূলে কি রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহা জানিবার জন্য দেশবাসীর কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়াই স্বভাবিক।

বালীগঞ্জে হিন্দু সম্মিলন—

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে বালীগঞ্জে এক হিন্দু সম্মিলন হইয়া গিয়াছে সভায় লাঠি, ছোরা ও ঢাল-সড়কী খেলা দেখান হয়। সংঘ ভবন বিস্তৃতির জন্য ২০ বিঘা জমি সংগ্রহ ও গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু হিন্দু নেতা মিলন মন্দির নির্ম্মাণ, রক্ষীদল গঠন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

চাউলের দাম—

গভর্ণমেণ্ট সস্তা দামে চাউল কিনিয়া তাহা বেশী দামে সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতেছেন, একথা বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সকল সদস্য একবার করিয়া বলিয়াছেন। অথচ গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, চাউলের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের বহু টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ব্যাপারে পরিষদে শ্বেতাঙ্গ সদস্যদলের নেতা মিঃ জে আর ওয়াকার পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র চাউলের দাম কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু সরকারী রেশনিং ব্যবস্থায় চাউল এখনও ১৬ টাকা ৪ আনা মণ দরেই বিক্রীত হইতেছে। ইহার পরও লোকের গভর্ণমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিতে পারে?

শিক্ষকগণের দুরবস্থা—

বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার দিকে সকল কর্ম্মীর বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলেও ভারতের কোথাও শিক্ষকগণের উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয় নাই। সেজন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৬ হাজার শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে তাঁহারা কাজ বন্ধ করিয়াছেন ও বেতন বৃদ্ধি করা না হইলে সকলে একযোগে পদত্যাগ করিবেন। এইভাবে সমবেত হইয়া তাঁহারা যে উদাহরণ দেখাইতেছেন, তাহার ফলে অন্য সকল প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষেরও কি টনক নড়িবে না?

কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডার—

ফেব্রুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডারের সেক্রেটারীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। যদিও স্মৃতি ভাণ্ডারে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি অর্থসমস্যা ও কর্ম্মী সংগ্রহ সমস্যা জটিল বলিয়া স্থির হইয়াছে। সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ যে অঞ্চলে উহা সংগৃহীত হইয়াছে, সেই অঞ্চলেই ব্যয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী জানাইয়াছেন—(১) ধন ভাণ্ডার কেবলমাত্র চিকিৎসা ব্যাপারেই নিয়োগ করা হইবে না, বনিয়াদী শিক্ষারও উহা ব্যয়িত হইবে। (২) খাদি ও পল্লী শিল্পের মারফত পল্লী অঞ্চলে নারী ও শিশুদের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হইবে। (৩) রোগ নিরাময় হইতে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপরই জোর দেওয়া হইবে।

যতই নারী কর্ম্মী সংগ্রহ হইতে থাকিবে, ততই পুরুষ কর্ম্মীদিগকে সরাইয়া লওয়া হইবে। স্মৃতি ভাণ্ডারের পরিকল্পিত কার্য্য আরম্ভ হইলে দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন।

প্রাথমিক-শিক্ষকগণের বেতন—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক বেতন ৪০ টাকা হওয়া উচিত, এই মর্ম্মে আসাম ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যে সময়ে দেশের সাধারণ মজুর সম্প্রদায়ও

মাসে ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, সেই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক বেতন ২০৲ টাকাও হয় নাই। দেশের পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপর বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষার ভার অর্পিত আছে। ঐ কারণে গত ২ বৎসর কাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক পাওয়া যায় না এবং বিদ্যালয়গুলিও প্রায় অচল হইয়াছে। শুধু আসামে নহে, সর্ব্বত্র যাহাতে ঐ প্রস্তাব অনুসারে কাজ হয়, সেজন্য দেশবাসীর বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত।

রাজনীতিক বন্দীর সংখ্যা—

গত ১০ই ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে—১৯৪৪ সালে ৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙ্গালায় ভারত রক্ষা আইন ও ১৯৪৪ সালের অর্ডিনান্স অনুযায়ী ধৃত ১২৮৬জন রাজনীতিক বন্দী ও ২৩৬৬জন অরাজনীতিক বন্দী আটক ছিলেন। ৩ আইনে ধৃত রাজনীতিক বন্দীর সংখ্যা ছিল ১৫জন। দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ৩৬৫২জনকে আটকাইয়া রাখার অর্থ সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। ঐ আটক ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালায় কত পরিবারকে যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাহার খবর কে রাখে?

সরিষার তৈল—

বাঙ্গালা দেশ হইতে সরিষার তৈল উধাও হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কোথাও তৈল পাওয়া যায় না—সরিষার তৈল বলিয়া বাজারে যাহা বিক্রীত হইতেছে, তাহা যে কি জিনিষ তাহা কেহ অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন না। প্রকাশ পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষা আমদানী বন্ধ হওয়ায় দেশের এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ সময়েও কলিকাতায় ৬টি তেলের কল হইতে গভর্ণমেণ্ট ৫ হাজার মণ সরিষার তেল কিনিয়া লইয়া তাহা আসামে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে সময়ে বাঙ্গালার লোক অভাবগ্রস্ত, সে সময়ে গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁহাদের কতটা দরদের পরিচায়ক তাহা কে বলিবে?

চিকিৎসক ও চিকিৎসা সমস্যা—

সম্প্রতি কলিকাতার নিকট বজবজে বেঙ্গল মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট কনফারেন্সের সভাপতিরূপে ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রয়োজনের তুলনায় দেশে চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব। তাহার উপর সমস্যা—চিকিৎসকগণ পল্লী অঞ্চলে আশানুরূপ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া সহরেই থাকিতে চাহেন। এই সমস্যা কতকটা দূর হইতে পারে, যদি গভর্ণমেণ্ট উচ্চ বেতনে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। আর একটি বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্ত্তমানে স্কুল ও কলেজে ভিন্ন ব্যবস্থায় মেডিকেল শিক্ষা প্রদান করা হয়। ঐ ভাবে দুই শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া সর্ব্বত্র এক রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকদের মধ্যে বৈষম্য দূর হইয়া যাইতে পারে।

মার্কিণে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মার্কিণে যাইয়া ভারতের স্বাধীনতার কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখিকা পার্ল বাক বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের পর ভারত হইতে এইরূপ সম্ভ্রান্ত অতিথি মার্কিণে আর কেহ আসেন নাই।" নিউ ইয়র্কের মেয়র শ্রীমতী পণ্ডিতকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান লীগ এক ভোজে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন ও প্রেসিডেণ্ট পত্নী তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া কথোপকথন করিয়াছেন। তবে হোয়াইট হাউসে তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয় নাই। জাতি যতদিন স্বাধীন না হইবে ততদিন তাহার বিশিষ্ট অধিবাসীরও এইরূপ সম্মান-হানির সম্ভাবনা থাকিবে। শ্রীমতী পণ্ডিতের প্রচার প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক—প্রত্যেক ভারতবাসী তাহাই কামনা করে।

বেতন বৃদ্ধি—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নিজদিগকে কায়েম রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নাই। তাঁহারা পূর্ব্বেই ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের বেতন ও দৈনিক ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় ঐরূপ সেক্রেটারীর সংখ্যা ১৫। গভর্ণমেণ্টের চিফ হুইপ ও চিফ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১৫০ টাকা করিয়া বাড়াইয়া যথাক্রমে ১১৫০ টাকা ও ৯০০ টাকা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সেক্রেটারীদের প্রত্যেকের বেতন মাসিক ২৫০ টাকা বাড়াইয়া ৭৫০ টাকা করা হইয়াছে। গত নভেম্বর হইতে তাঁহারা এই বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইবেন। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাঙ্গালী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সম্মানিত—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্প্রতি গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ফেলো মনোনীত হইয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু বহু বৎসর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সংস্কৃত বিভাগের কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার এ অসাধারণ সম্মান প্রাপ্তিতে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

কৃষক শ্রমিকের স্বরাজ—

কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়া থাকেন—কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা চাহেন বটে, কিন্তু কাহাদের জন্য স্বাধীনতা চান, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন না। সে জন্য অধ্যাপক র… সম্প্রতি মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করিলে মহাত্মাজী তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন—শুধু জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষিক্ষেত্র, কারখানা প্রভৃতির কৃষক ও শ্রমিকরা প্রকৃত অধিকারী হইবে এমন নয়—তাহার পূর্ব্বেই কংগ্রেস গণতান্ত্রিক কৃষক-মজুর-প্রজারাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিবে। মহাত্মাজীর মত শ্রমিক-কৃষক দরদী ভারতে আর কে আছেন জানি না। কাজেই যাঁহারা এই সমস্যা উপস্থিত করেন, তাঁহাদের মূর্খতা প্রমাণিত হয়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

মাদ্রাজ ঃ ২৫৪ ও ১৫৮

হোলকার ঃ ৪০৩ ও ১১ (কোন উঃ না হারিয়ে)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে হোলকার দল ১০ উইকেটে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল।

মাদ্রাজ দল টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাটিং করবার সুযোগ লাভ করে। চায়ের কিছু পরেই মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস ২৫৪ রানে শেষ হয়ে যায়। সি পি জনষ্টোনের ৬৪ রানই দলের সর্বোচ্চ হ'ল। সি টি সারভাতে ৯০ রানে ৬টি উইকেট পেলেন।

হোলকার দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল এবং প্রথম দিনের শেষে তাদের এক উইকেটে ৪১ রান উঠল।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল হোলকার দলের ৯ উইকেটে ৩৬৩ রান উঠেছে। ডি কম্পটন দলের সর্বোচ্চ ৮১ রান করলেন। তারপর উল্লেখযোগ্য রান সারভাতের ৭৪, সি কে নাইডুর ৫২, সি এস নাইডুর ৪৪ এবং জে এন ভায়ার ৩৬ রান।

হোলকার দল প্রথম ইনিংসে ৪০৩ রান তুলে ২৪৯ রানে অগ্রগামী হ'ল। মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৮ রান উঠল। সি টি সারভাতে ৬০ রানে ৭টা উইকেট পেলেন। কোন উইকেট না হারিয়ে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ১২ রান উঠলে পর খেলা শেষ হয়ে গেল। হোলকার ১০ উইকেটে বিজয়ী হল।

মাদ্রাজ দল : সি পি জনষ্টন, রবিন্সন্, রামসিং, আর নেলার, রিচার্ডসন, অনন্তনারায়ণ, গোপালন, বি সি আলভা, এম ও শ্রীনিবাসন, প্রাণকুসুম ও ব্রহ্মচারী।

হোলকার দল : জগদল, সারভাতে, মুস্তাকআলি, ডেনি কম্পটন, সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জে এন ভায়া, গিকোয়াদ ভাণ্ডারকার, আর প্রতাপ, ও পি রাভাল।

উত্তর ভারত ঃ ৩৬৩ ও ৩১২

বোম্বাই ঃ ৬২০ ও ৫৬ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অপর একদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দল ১০ উইকেটে উত্তর ভারত দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

উত্তর ভারত টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০৯ রান উঠল। লাঞ্চের সময়ের রান উঠেছিল দু' উইকেটে ১২৬। চা পানের সময় ৫ উইকেটে ২৩৫ রান উঠেছিল।

এ হাফিজের ১৪৫ রানেই দলের সর্বোচ্চ ছিল। রামপ্রকাশের ৪৮ রান এবং ইমতিয়াজের ৪৯ রানও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিনে উত্তর ভারত দলের প্রথম ইনিংসে ৩৬৩ রান উঠল। এস ভেদে নট আউট ৬০ রান করলেন। ইমতিয়াজ করলেন ৫৫ রান।

দ্বিতীয় দিনেই বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে এবং দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২৬৫ রান উঠল। কে সি ইব্রাহিম ৬৭ রানে এবং এম মন্ত্রী ৬৮ রানে আউট হলেন। আর এস মোদী ৭৯ রান করে নট আউট রইলেন।

তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হ'ল এবং ৯ উইকেটে বোম্বাই দলের ৫৫৯ রান উঠল। আর এস মুদী ১১৩ রান ক'রে আউট হলেন, উদয় মার্চেন্ট ১৪০ রান ক'রে নট আউট রইলেন। মার্চেন্ট ২৬২ মিনিট খেলেছিলেন আর বাউণ্ডারী করেছিলেন ১৩টা। ডি জি ফাদকার ৭৩ রান করলেন।

চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হ'ল। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৬২০ রানে শেষ হ'ল। উদয় মার্চেন্ট ১৮৭ রানে আউট হলেন।

উত্তর ভারত দল ২৫৭ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। আরম্ভ খুবই ভাল হ'ল। কোন উইকেট না হারিয়ে লাঞ্চের সময় ৬৫ মিনিটে তাদের ৭২ রান উঠল। দিনের শেষে উত্তর ভারত দলের ৬ উইকেটে ২৪২ রান উঠল। পরদিন উত্তর ভারত দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১২ রানে শেষ হ'ল। কোন উইকেট না হারিয়েই বোম্বাই দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে সক্ষম হ'ল।

ফুটবল খেলা ঃ

আই এফ এ বনাম সার্ভিসেস একাদশের প্রথম দিনের খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এই দিন আই এফ এ-র রক্ষণভাগই কেবল খেলেছিল বলা যায়।

দ্বিতীয় খেলাটিতে সার্ভিসেস দল ২-১ গোলে আই এফ এ-র একাদশকে হারিয়ে দেয়। আই এ-র অনেক নামকরা খেলোয়াড় যোগ দিতে পারেন নি, অনেকে বিভিন্ন কারণে বর্তমানে

ক'লকাতায় অনুপস্থিত আছেন। ফুটবল মরসুম হ'লে খেলাটি উপভোগ্য হ'ত। সার্ভিসেস দল অধিক গোলের ব্যবধানে বিজয়ী না হলেও তাদের কোন কোন Positionএর খেলা দর্শনীয় হয়েছিল। পাশিং, ড্রিবলিং এবং হেডিংয়ে আই এফ এ দল কোন মতেই পাল্লা দিতে পারে নি। আই এফ এ-র একমাত্র রক্ষণভাগের ভাল খেলার জন্যই বিপক্ষ দল অধিক গোল দিতে পারে নি।

রুসি মোদী ঃ

এ বছরের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় রুসি মোদী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রান করার সম্মান লাভ করেছেন। দু' বছরের রান সংখ্যা ধরলে তিনি ১,০০০ রান ইতিমধ্যেই অতিক্রম করে গেছেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি বরোদা, মহারাষ্ট্র এবং ডবলউ এ এস সিএর বিরুদ্ধে 'সেঞ্চুরী' করেন। এ বছরে তিনি সিন্ধুর বিপক্ষে ১৬০, ডবলউ এ এস সি এ-র বিপক্ষে ২১০, বরোদার বিপক্ষে নট আউট ১৩১ এবং উত্তর ভারতের বিপক্ষে ১৪৩ রান করেছেন।

বেঙ্গল জিমখানা ঃ

বেঙ্গল জিমখানা ক্রিকেট লীগের শুরু ফাইনালে তালতলা ইনষ্টিটিউট হাওড়া স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। টসে জয়লাভ করে তালতলা প্রথম তিনমাস 'ইন্দুবালা ঘোষ ট্রফি' রাখার সম্মান পেয়েছে।

আমেরিকার লন্ টেনিস ঃ

আমেরিকার লন্ টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

(১) ফ্রাঙ্কি পার্কার (২) উইলিয়াম টালবার্ট (৩) ফ্রান্সিস্কো সেগুরা (৪) ডন্ ম্যাকনীল (৫) লেঃ সেমুর গ্রীনবার্গ (৬) রবার্ট ফকারবার্গ (৭) জ্যাক জোন্স (৮) চার্লস ওলিভার্ণ (৯) জ্যাক ম্যাকমেনিস (১০) গিলবার্ট হল।

ফ্রাঙ্কি পার্কার আমেরিকার ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার নামকরা খেলোয়াড়। গত বার বছর তাঁর স্থান নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকার দশ জনের মধ্যে স্থান পেয়ে এসেছে। এতদিন পরে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। ১৯৪৩ সালের শীর্ষস্থান অধিকারী জোসেফ হান্টের নাম এবার নামের তালিকায় স্থান পায় নি।

মহিলাদের নামের তালিকায় মিস পসিন বেট্জের নাম প্রথমে স্থান পেয়েছে। গত তিন বছর পর্য্যায়ক্রমে তাঁর নাম প্রথমে দেখা যাচ্ছে।

২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস ঃ

২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক স্পোর্টস অন্যান্য বছরের মত এবারও সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৩৫০ জন প্রতিযোগী এসোসিয়েশনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ১৫ পয়েন্ট পেয়ে জে চ্যাটার্জি (সি পি এম এ সি) ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন। ৪৫ পয়েন্ট পেয়ে এক্স এলুমণি-কাঁচড়াপাড়া ক্লাব-চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। জুনিয়ার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন টি ঘোষ (বয়েজ লীগ, বেলঘরিয়া) ১১ পয়েন্ট পেয়ে। ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে জুনিয়ার ক্লাব চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে বয়েজ লীগ।

অল্ ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস ঃ

অল্ ইণ্ডিয়া টেনিস টুর্ণামেণ্টের সিঙ্গলসে সুমন্ত মিশ্র (বাঙ্গলা) ১—৭, ৭—৫, ৫—৭, ৬—০ গেমে বি আর কপিনিপাথিকে হারিয়েছেন।

ভলিবল ঃ

এস এ ক্যাম্পের উদ্যোগে 'ললিতমোহন ও ভূপতিভূষণ' ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি নরসিংহ দত্ত কলেজকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে" কাহিনীর নাট্যরূপ "বিন্দুর ছেলে"—১৷০

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় প্রণীত "কাজলী"—১৲

জে, চৌধুরী প্রণীত "মেস্মেরিজম বা সম্মোহন শক্তি"—৩৲

শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "স্রোতের টানে"—১৷০

শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস সম্পাদিত "আধুনিক লেখক—সরোজকুমার রায়চৌধুরী"

সব্যসাচী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "শেষ-নিশ্বাস"—১৲

শ্রীমতী রেণু মিত্র প্রণীত "প্রাথমিক শিক্ষা"—২৷০

পরিমল মুখোপাধ্যায় অনুদিত "বেইমানো"—২৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেঘ ও রৌদ্র

শিল্পী—শ্রীপান্না সেন
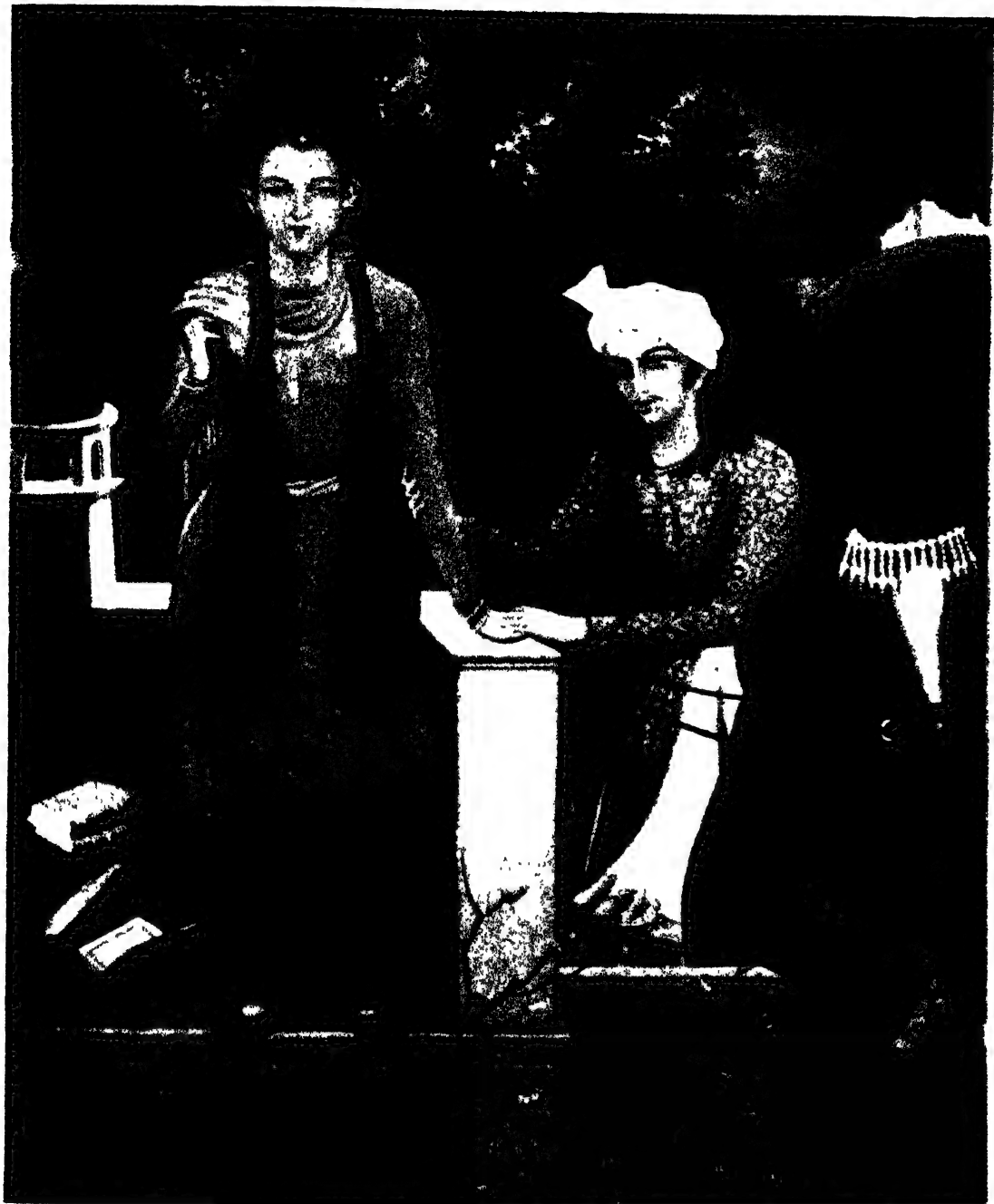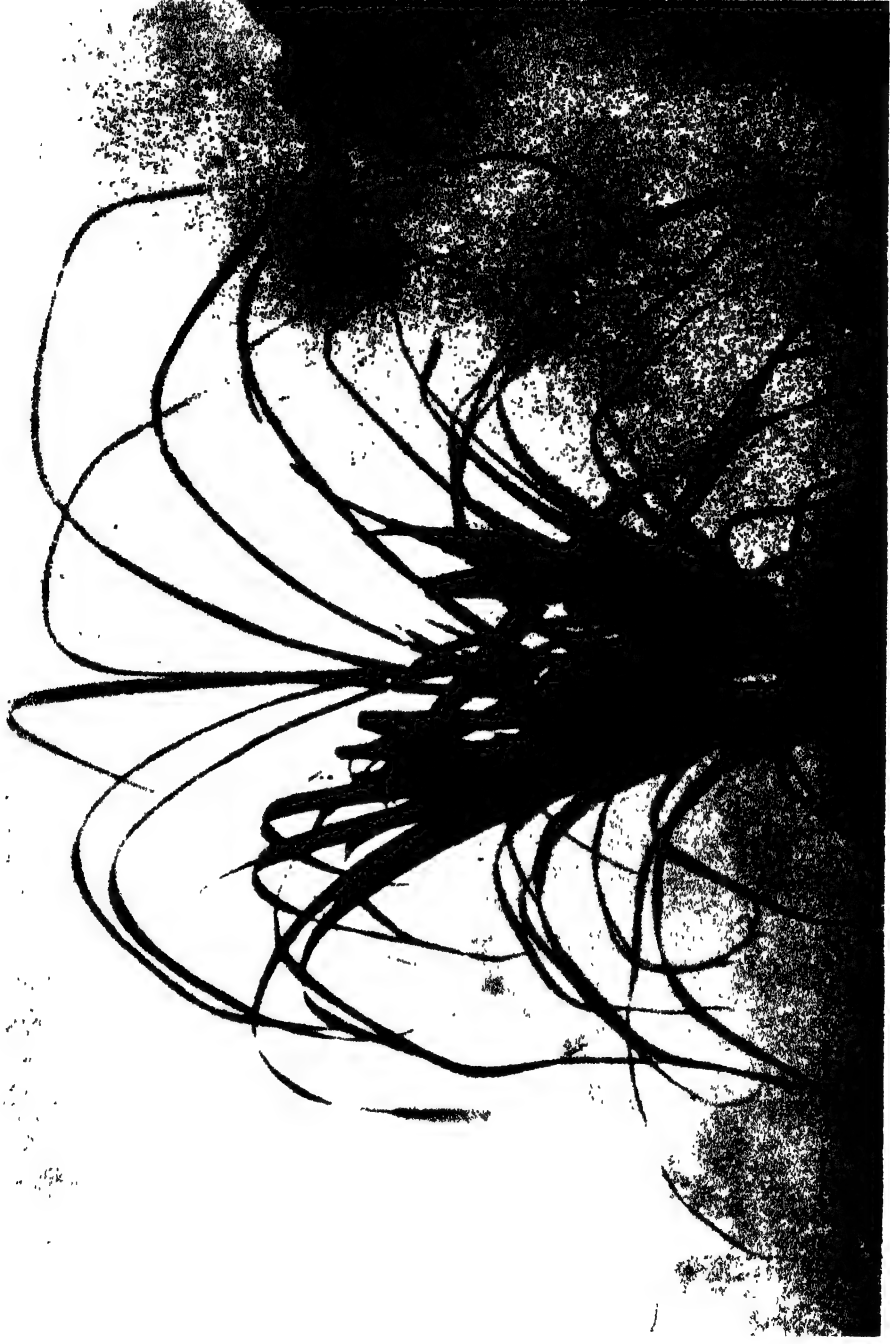
বৈশাখ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

গীতার কথা

শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় সমস্তই গীতার অবতরণিকা। দশ দিন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হওয়ার পর যখন ভীষ্ম শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন এবং কৌরব পক্ষের জয়াশা ক্ষীণ হইয়াছিল তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুরু-পাণ্ডবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াই কি করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে সঞ্জয় বলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়াই দ্রোণাচার্য্যের নিকট গিয়া উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের বল অপর্য্যাপ্ত এবং ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবগণের বল পর্য্যাপ্ত। অতএব আপনারা স্ব স্ব বিভাগে অবস্থান করিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। এই সময় ভীষ্ম পিতামহ শঙ্খনাদ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কৌরব পক্ষের রণবাদ্য সকল বাদিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবেরা এবং এই পক্ষীয়েরা দিব্যশঙ্খ সকল বাজাইলেন এবং অর্জ্জুন ধনুক তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, উভয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ রাখ, আমি দেখি কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর সেনাদিগের মধ্যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিয়া তিনি পরম কৃপাবিষ্ট ও বিষাদগ্রস্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে এই আত্মীয় স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং কাঁপিতেছে, মুখও শুকাইতেছে, হাত হইতে ধনুক খসিয়া পড়িতেছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার চিত্ত যেন অত্যন্তই বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং আমি কুলক্ষণ সকল দেখিতেছি। স্বজনগণকে বধ করিয়া আমি বিজয়, রাজ্য ও সুখ চাহি না। আত্মীয় স্বজন বধে আমাদের কি লাভ হইবে? বরং ইহাতে আমরা পাপগ্রস্ত হইব। ইহাতে কুলক্ষয়, সনাতন কুলধর্ম্মের নাশ ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে। তখন কুলকামিনীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হইবে এবং বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে। ইহাতে জাতিধর্ম্ম এবং শাশ্বত কুলধর্ম্মও নষ্ট হইবে। অতএব ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর। এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া বিষন্ন চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। এই অধ্যায়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য অধ্যায়ে যে সকল কথা উঠিয়াছে শ্রীভগবান্ গীতায় তাহারই সমাধান করিয়াছেন। গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে কেবল এই প্রথম শ্লোকটিই ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি। আর বাকী সমস্তই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে

বলিলেও—তন্মধ্যে তাঁহার নিজের উক্তি ৪০টি শ্লোকে এবং অর্জ্জুনের উক্তি ৮৪টি শ্লোকে আছে। বাকী ৫৭৫ শ্লোক শ্রীভগবানের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সমস্ত সৃষ্টি তত্ত্ব, প্রকৃতির কার্য্য ও তাহার মঙ্গলজনক অপরিবর্ত্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, মানুষের কর্ত্তব্য ও কি প্রকারে মানুষ 'মানুষ' হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহার উপায় সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া শিখিয়াছেন। অর্জ্জুনের উক্তি কেবল প্রশ্নে, প্রার্থনায় ও স্তব-স্তুতিতে পূর্ণ। সেই সমস্ত তত্ত্ব কথা শুনিয়া অবশেষে অর্জ্জুন ১৮।৭৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন যে তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ ও সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমার জ্ঞান হইয়াছে, আমি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছি এবং আমি তোমার কথামত কার্য্য করিব। শ্রীভগবানের ও অর্জ্জুনের কথোপকথন শুনিয়া সঞ্জয়ের মনে যে ভাব হইয়াছিল তাহা তিনি গীতার শেষ পাঁচটি (১৮।৭৪-৭৮) শ্লোকে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই কথোপকথন অদ্ভুত ও রোমহর্ষণকারী। এই পরম গুহ্য যোগের বিষয় আমি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্ব মুখে বলিতে শুনিয়াছি। তাহা স্মরণ করিয়া আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃষ্ট হইতেছি। শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন সেই পক্ষে বিজয়, অভ্যুদয়, রাজশ্রী ও ধর্ম্ম সুনিশ্চিত। ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের, অর্জ্জুনের ও সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে আর কোন কথা সরে নাই।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন ১।১; সঞ্জয়ের উত্তর ১।২-১৮।৭৮; দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শন ও বর্ণন এবং কৌরবগণের শঙ্খনাদ ও রণবাদ্য ১।২-১৩; পাণ্ডবগণের শঙ্খসমূহের নামোল্লেখ, ধ্বনি এবং তাহার ফল—১।১৪-১৯; অর্জ্জুনের সৈন্য দর্শন ১।২০-২৭; অর্জ্জুনের বিষাদ ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ১।২৮-৪৭

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—এই সঙ্কটকালে তোমার এই অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গহানিকর ও অকীর্ত্তিকর মোহ কোথা হইতে আসিল? তুমি ক্লীব-ভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ইহার উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন—'আমি পূজনীয় ভীষ্ম-পিতামহের ও আচার্য্যদেব দ্রোণের সহিত কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? যাহাদের বধ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা সম্মুখে রহিয়াছেন। পৃথিবীর নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং দেবতাদিগের উপর আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক শোক কি প্রকারে দূর হইতে পারে তাহা দেখিতেছি না। ইহার পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া নীরব রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনকে বলিলেন যে যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, আবার জ্ঞানের কথাও বলিতেছ। আমরা পূর্ব্বে ছিলাম না বা পরে থাকিব না—তাহা নহে। শরীরের নাশে শরীরে যিনি বাস করেন তাঁহার অর্থাৎ আত্মার নাশ কখনও হয় না। আত্মা অজ ও অমর। অতএব তোমার কাহারও জন্য শোক করার কারণ নাই। আর ধর্ম্মহানির কথা যাহা বলিতেছ, তাহাও ঠিক নহে, কারণ তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মযুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য। যুদ্ধ না করিলেই তোমার অপযশ হইবে। যদি তুমি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে না। অতএব সর্ব্বপ্রকারেই তোমার যুদ্ধ করা উচিত, যুদ্ধ না করার কোন কারণই নাই।

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—২।২-৩।
অর্জ্জুনের উত্তর ২।৪-৯।
শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর :—
জন্মান্তর বাদ ২।১১-১৩।
দেহ ও দেহী ২।১৬, ১৮-৩০
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ২।৩১-৩৭
পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় ২।৩৮।

গীতার বিষয় জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌কে জানা প্রথম আবশ্যক। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ৪।৫-৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কিরূপে হয় বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কর্ম্ম হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্ম ঠিকমত, নিয়ম মত না হইলেই অধর্ম্ম হয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কর্ম্ম করে। ইহাদের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন হাত দিয়া জনসেবাও করা যায়, আবার চুরি, ডাকাতি, খুন, ইত্যাদিও করা যায়। ঐ জন-সেবাই ধর্ম্ম আর চুরি, ডাকাতি, খুন করা অধর্ম্ম। কর্ম্ম করার জন্য হাত—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। হাত দিয়া ভাল কাজ করা বা মন্দ কাজ করা মানুষের ইচ্ছাধীন। এই নিমিত্ত মানুষ নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের সহিত অনেক প্রকারে আততায়ীতা করিয়াছিলেন, সেই কারণে রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। বংশের অত্যাচারও ভয়ানক হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায় সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুরাচারদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন।

পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের বিষয় তত্ত্বও জানেন তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় জীবের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারে। তখনও শ্রীভগবান্

জীবের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া উহা নিবারণের ব্যবস্থা করেন। এই কথাটি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মঙ্গলময় ভগবানের প্রতি ভক্তি স্বতঃই আসে। মানুষ দোষ করিলেও তাহাকে তিনি ত্যাগ করেন না, তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অবতারতত্ত্বের আরও কথা ৭।২৪-২৭ এবং ৯।১১-১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন।

৯।৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অতএব যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মে ও ভগবানে কোন ভেদ নাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি চিদাত্মস্বরূপ পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে :—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ভগবানকে কেহ সগুণ কেহ নির্গুণ, কেহ সাকার কেহ নিরাকার নানা প্রকারে কল্পনা করেন। ভগবান্ নির্গুণ হইয়া সগুণ কিরূপে হইতে পারেন তাহা ১৩।১৪ শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে গীতার শ্লোক :—২।১৭, ৮।৩, ৯।৪-৬, ১৩।১২-১৮, ১৩।৩০-৩৪, ১৪।২৭ ও ১৭।২৩-২৮ দ্রষ্টব্য।

সাংখ্য মতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই সংসারে আছেন। পঞ্চমহাভূতে গঠিত এই শরীরই ক্ষর পুরুষ এবং নির্ব্বিকার আত্মা অক্ষর পুরুষ। এই দুই পুরুষ ভিন্ন আর এক পুরুষ আছেন যিনি উত্তমপুরুষ পরমাত্মা এবং যিনি এই ত্রিলোক পালন করিতেছেন। যে হেতু ইনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম এই জন্য ইঁহাকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলা হয়। যে মোহহীন ব্যক্তি শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার ভজনা করেন। শ্রীভগবান্‌কে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিলে আর জানিবার কিছু বাকী থাকে না। সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত ইত্যাদি সংশয় আর থাকে না। তিনি জানেন যে, ভগবান্ই নির্গুণ পরব্রহ্ম, তিনিই সগুণ বিশ্বরূপ, তিনিই সর্ব্বলোক মহেশ্বর, তিনিই লীলাবতার, তিনিই হৃদয়ে পরমাত্মা। সুতরাং সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারেই ভগবানের ভজনা করেন। এই সম্বন্ধে ১৫।১৬-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়ে ৮ হইতে ১২ শ্লোকে, নবম অধ্যায়ে ১৬ হইতে ১৯ শ্লোকে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে ১২ হইতে ১৫ শ্লোকে এবং অর্জ্জুনের প্রার্থনায় সমস্ত দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ আত্ম বিভূতির কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

—আমি অজ, অনাদি ও লোক মহেশ্বর।

—আমি দেবতাদিগের ও মহর্ষিদিগের সর্ব্বপ্রকারে আদি।

—আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

—আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, বায়ুগণের মধ্যে মরীচি, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, যক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র।

—আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, জীবসকলের নিয়ন্তাদিগের মধ্যে যম, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, অশ্বদিগের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধেনুদিগের মধ্যে কামধেনু, সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, নাগগণের মধ্যে অনন্ত।

—মহর্ষিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে আমি উশনা কবি।

—সপ্তমহর্ষি, সনকাদি পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন ও চতুর্দ্দশ মনু আমার সঙ্কল্প হইতে জাত এবং আমার প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন॥

—শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি শ্রীরামচন্দ্র, বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে আমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় অর্জ্জুন।

—নরগণের মধ্যে আমি রাজা এবং নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।

—পশুদিগের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় এবং মৎস্যদিগের মধ্যে আমি মকর।

—বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ।

—আমি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ। বেদ সকলের দ্বারা আমি বেদ্য। আমিই বেদান্তকৃৎ ও বেদবিৎ। সর্ব্ব বেদে আমিই পাবন প্রণব ওঁকার।

—বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম। ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী।

—অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার। সমাস সকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্যা। তার্কিকগণের কথাসমূহের মধ্যে আমি সদ্বিচার।

—আমি বেদবিহিত কর্ম্ম, আমি স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম, আমি শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ, আমি ওষধি জাত অন্ন বা ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি হোমের ঘৃত।

—যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ।

—আমি পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, জলে রস, অগ্নিতে তেজ, আকাশে শব্দ ও পাবক বায়ু।

—আমি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের মধ্যে রশ্মিযুক্ত সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে প্রভা ও তেজ তাহাও আমি। আমি উত্তাপ দান করি, জল আকর্ষণ করি ও পুনরায় বর্ষণ করি। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভূতকে শক্তির দ্বারা ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধি সকল পুষ্ট করি। আমি জঠরাগ্নিরূপে সর্ব্বপ্রকার অন্ন পরিপাক করি। আমি সকলের হৃদয়ে বাস করি। আমা হইতেই স্মৃতি জ্ঞান এবং তাহাদের বিলোপ হয়।

—অচল পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়, পর্ব্বত সকলের মধ্যে আমি সুমেরু, জলাশয়সমূহের মধ্যে সাগর এবং নদী-সকলের মধ্যে আমি ভাগীরথী গঙ্গা।

—আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, ভূতসমূহের যাহা মূল কারণ তাহা আমি। চরাচর ভূত এমন কিছু নাই যাহা আমা ছাড়া হইতে পারে। আমি সর্ব্বভূতে জীবন, সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা। ভূতগণের মধ্যে চেতনা (জ্ঞানশক্তি) আমি। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন। আমিই ভূতগণের ধর্ম্মের অবিরোধী সন্তানোৎপাদক কাম। আমি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা।

—ভূতগণের নিম্নলিখিত ভাবগুলি আমা হইতেই উৎপন্ন হয়, যথা—(১) বুদ্ধি, (২) জ্ঞান, (৩) অসম্মোহ, (৪) ক্ষমা, (৫) সত্য, (৬) দম, (৭) শম, (৮) সুখ, (৯) দুঃখ, (১০) উৎপত্তি, (১১) বিনাশ, (১২) ভয়, (১৩) অভয়, (১৪) অহিংসা, (১৫) সমতা, (১৬) তুষ্টি, (১৭) তপ, (১৮) দান, (১৯) যশ, (২০) অযশ।

—সৃষ্ট পদার্থ সমূহের আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা, ও স্থিতির হেতু। সংখ্যাকারিগণের মধ্যে আমি কাল। আমি অক্ষয় কাল, আমি সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যু এবং ভাবিকালের প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণ। আমি সর্ব্বকর্ম্মফল বিধাতা ঈশ্বর।

—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফল দাতা, পিতামহ। আমি গতি, পোষণ কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, আশ্রয়স্থল, রক্ষক, অযাচিত উপকারক, সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অবিনাশী কারণ। আমিই জীবন ও মৃত্যুস্বরূপ, আমি নিত্য অক্ষর আত্মা ও অনিত্য ক্ষর জগৎ।

—আমি বলবানের কামরাগ বিবর্জ্জিত বল, তেজস্বী-দিগের তেজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, জ্ঞানবানের জ্ঞান ও তপস্বীর তপ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আমা হইতেই জাত। প্রবঞ্চকগণের মধ্যে আমি দ্যূত ক্রীড়ারূপ ছল। আমি জয়, আমি অধ্যবসায়, দমনকারিগণের আমি দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি এবং গোপনীয় বিষয়ে আমি মৌন।

—আমি আমার ভক্তগণকে সেই বুদ্ধিযোগ দান করি যদ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ ই আমি তাঁহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত মায়ারূপ অন্ধকার নাশ করি।

—আমার দিব্য বিভূতির শেষ নাই। সংক্ষেপে আমি ইহা বলিলাম। ঐশ্বর্য্যযুক্ত শোভাসম্পন্ন অথবা প্রভাব সম্পন্ন যে সকল পদার্থ আছে, সে সমস্তই আমার প্রভাবের অংশ হইতে জাত জানিও। সার কথা এই সমস্ত জগৎ আমিই আমার একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। শ্রীভগবানের বিভূতিসকল বারংবার পাঠ করিলে ও চিন্তা করিলে তাঁহার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে। অর্জ্জুন এই অভিপ্রায়েই তাঁহার বিভূতির কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

শুক্লারাতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মাধবী-বল্লরী বুকে জ্বলিছে জোনাকি
অরণ্যের আঁখি
নভোতলে নিভৃতে ঝিমায়।
মৃদুমন্দ বায়

হিল্লোলিত। দোলে ছায়া তরু চিত্ত করিয়া হরণ,
চাঁদ যেন স্বপ্নভঙ্গ কবিতার প্রথম চরণ
ফেলে চলে দিগন্ত প্রসারী
হেরি আলো তারি।

পল্লী পথে মৌন যাত্রী সঙ্গীহীন চলি
শষ্পগুচ্ছ দলি'।

বিমানের কেন্দ্রস্থলী কাছে
শঙ্কা ঘিরে আছে
এ সুন্দর শুভ্রালোকে অগ্নিবর্ষী বোমা পড়ে যদি
নিরবধি এই ভাবি অদৃষ্টেরে জানায়ে প্রণতি।

এ রজনী পৌর্ণমাসী চিরদিন ধরে
মানব-অন্তরে
যৌবনের বাজায়েছে বাঁশী;
আজ সর্ব্বনাশী
পিশাচী সভ্যতা এসে দিল বাধা সৌন্দর্য্য সম্ভোগে।
অনন্তের স্তবগান স্তব্ধ এবে যন্ত্র যোগাযোগে।
ত্রস্ত পল্লী-নাগরিক প্রাণ,
কে করিবে ত্রাণ।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

(উপন্যাস)

প্রথম অঙ্ক

অমল গরীবেরই ছেলে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতি এবং বিধবা মা'য়ের স্বর্ণালঙ্কারের অবশিষ্ট অংশের উপর নির্ভর করিয়াই সে বি-এ পাশ করিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাহার তবুও মিটিল না। যেমন করিয়াই হউক সে এম্-এ পড়িবে স্থির করিল। যাহারা সাহায্য করিয়াছিল তাহারা এখন সাহায্য করিবেন না, সে তাহা জানিত তবুও সে এম্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া গেল। ভাগ্য তাহার প্রসন্ন, একটা টিউসানীও জুটিয়া গেল। বাড়ীর সামান্য জমি-জমা হইতে একমাত্র বিধবা মাতার একবেলার হবিষ্যান্ন জুটিয়া যাইবে—সে নিশ্চিন্ত মনেই পড়া আরম্ভ করিল।

সে গ্রামের ছেলে, সম্ভবতঃ সেই জন্যই তাহার কৌতূহলটা বেশী হইয়া থাকিবে—যাহারা স্বাধীনভাবে ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে, এক বোঝা বই লইয়া কলেজে যাতায়াত করে তাহারা কিরূপ, তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ, তাহাদের মন কত উদার তাহা জানিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল তাহার ছিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের দারিদ্র্য ও অক্ষমতার জন্য ভয়ও ছিল; কাজেই এম্-এ ক্লাসের সহপাঠিনীগণের সহিত আলাপ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহারা সে ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সে শ্রদ্ধার চোখেই দেখিত—যাঁহারা এ সৌভাগ্য দান করিয়াছেন তাহাদিগকেও সে সমীহ করিত।

সকালের একটা ক্ষুদ্র ঘটনা সারাটাদিন কলেজে তাহাকে দুঃখ দিয়াছে, মনটা বার বার বিমর্ষ হইয়া তাহাকে সকলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই রাখিয়াছিল। এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া তাহার দারিদ্র্য, দৈন্য, অক্ষমতা আজ যেন হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা কশাঘাতের লাঞ্ছনায় তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিতেছে। ঘটনাটা সামান্যই—

সকালে পড়াইতে গেলে জনৈকা কুমারী মহিলা দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাকে আহ্বান না করিয়া, দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ছাত্রের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—খোকা পড়তে যা, মাষ্টার এয়েছে।

মাষ্টার কথাটির পরে 'মহাশয়' ও এয়েছের পরে সামান্য অপরিসর একটি 'ন' যোগ করিলে এমন কোন ক্ষতি বা শ্রম তাহার হইত না, তথাপি এই দুইটির অভাব তাহাকে সারাটা দিন অশেষ লাঞ্ছনায় বিমর্ষ করিয়া দিয়াছে। একবার সে ভাবিয়াছে সম্মানই জগতে শ্রেষ্ঠ, অর্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিক্রয় করা অপৌরুষ, অতএব ও টিউসান সে ছাড়িয়া দিবে। আবার ভাবিয়াছে—ওইটুকুই তাহার অবলম্বন, আজ সে ছাড়িয়া দিলে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, বিদ্যার্জ্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। একদিকে সম্মান, অন্যদিকে বিফলতা এই দুইএর সংঘর্ষ তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মে আজ বিমনা করিয়া তুলিয়াছে।

ছুটির পরে একটু চা খাইয়া সে লাইব্রেরীতে কয়েকখানা বই লইয়া বসিয়াছিল কিন্তু কোন শাস্ত্র কোন লেখকই আজ তাহার ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ অকারণ পাতা উল্টাইয়া ক্ষণিক সময় কাটাইয়া সে বসিয়াই রহিল। পিছনের টেবিলে মহিলাগণ নানা কেতাব পাঠে ব্যস্ত—অন্যদিন কৌতূহলী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহাদিগকে সংগোপনে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কিন্তু আজ তাহারাও তাহাকে কোনরূপেই আকর্ষণ করিতে পারিল না।

একটি শীর্ণা, তন্বী, সুন্দরী, তরুণী, কুমারী রোজই টেবিলের এককোণে বসিয়া, তাহার আয়ত চক্ষু মেলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের মাঝে কি যেন খুঁজিয়া মরে। কদাচিৎ চোখ মেলিয়া চায়, পাখার বাতাস কপালের উপর কুঞ্চিত চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ আন্দোলিত করে, কাণের দুলে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করে। সে আসে যায়, উঁচু-হিল্ জুতার শব্দে আরও অনেকের সঙ্গে অমলের চোখেও স্বপ্নাবেশ বুলাইয়া দিয়া যায়। অমল জানে না কেন, তবুও এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগে—তাহার চেহারায় যেন একটা মাদকতা আছে, চলিবার বলিবার ভঙ্গির মধ্যে একটা উদার আভিজাত্য আছে—অথচ বেমানান চঞ্চলতা বা নিজেকে প্রাধান্য দিবার ব্যগ্র সচেষ্টতার দৈন্য নাই। অমল সংগোপনে, পড়িবার ফাঁকে ফাঁকে অন্য সকলের সঙ্গে তাহাকেই ভাল করিয়া দেখে।

নামটা লোকমুখে সে শুনিয়াছে—অত্যন্ত আধুনিক নাম—ডেজি। বিলাতী ফুলের নাম—কবির কাব্যের মারফতে আমাদের কাছে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

অমল অকস্মাৎ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন কিছুই আজ তাহার ভাল লাগিল না। নির্জ্জন সিঁড়ি দিয়া অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে সে নামিতেছিল—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সিঁড়ির মাঝে একটিমাত্র আলো। কলেজে বিড়ি খাওয়া অশোভন—আশে-পাশে কেহ নাই দেখিয়া সে বিড়িই ধরাইয়া ফেলিল। কলেজের লোকসমক্ষে সে সিগারেটই খাইয়া থাকে।

আনমনে সে পুনরায় সকালের ঘটনাটাই ভাবিতেছিল—কুমারী মহিলাটি কি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাহাকে অপমান করিয়াছে, না 'মাষ্টার'কে তাহারা ঠাকুর চাকরের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এইরূপেই সম্বোধন করিয়া থাকে—নিতান্তই অভ্যাস-প্রসূত!

বিড়ি নিঃসৃত একরাশ ধোঁয়া বাতাসে বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে স্বচ্ছতা ফিরিয়া আসিল—অমল আশ্চর্য্য হইয়া দেখে—ডেজি তাহারই পাশে পাশে অত্যন্ত নিঃশব্দে নামিতেছে—

বিড়িটার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু ফেলিয়া দিয়া লাভ নাই—ডেজি নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। সে লজ্জিত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ ডেজি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—আপনার নাম অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ?

—হ্যাঁ।

—আপনি ইংলিশে ফার্ষ্টক্লাস পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ। আপনি জানলেন কেমন করে ?

ডেজি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই বলিল—'সংহতি'তে আপনার কবিতাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি কি আগেও লিখ্‌তেন ?

অমল হাসিয়া বলিল—লিখতাম, তবে তা ছাপা হয়নি—

ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল—ছাপাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন কি !

—বিশেষ না।

—আপনি ত খুব পড়েন লাইব্রেরীতে—না ?

অমল মাথা চুলকাইয়া বলিল—বই সামনে ক'রে বসে থাকাই পড়া নয়, কাজেই ব'ল্‌তে হয় লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ থাকি—এই পর্য্যন্ত—

ডেজি হাসিয়া বলিল—আপনার বিনয় যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু পড়াটা ত পাপ কার্য্য নয় যে ওকে অস্বীকার ক'রতে হবে—

অমল সংক্ষেপে বলিল—বলা বাহুল্য মাত্র—

অমলের হাতের মধ্যে জ্বলন্ত বিড়িটা নিভিয়া গিয়াছিল, সে সেটাকে ফেলিয়া দিল। ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনি বিড়ি খান ?

—অস্বীকার ক'রলে আপনি বিশ্বাস ক'রবেন না নিশ্চয়ই।

—কেন খান ?

—অভ্যাস—আপনার প্রশ্ন কি ? সিগারেট না খেয়ে বিড়ি খাই কেন ?

—হ্যাঁ।

অমল মিথ্যা কথা বলিল—খাই আমি চুরুট, কিন্তু এখানে চুরুট সেবনের সময় নেই—আর চুরুট বিনা সিগারেট বিড়ি উভয়েই সমান।

—তবে সিগারেট খেলেই ত পারেন, গন্ধটা তবুও সহ্য হয়।

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে বলিল—That's meant for ladies.

ডেজি সিঁড়ির মাঝে অকস্মাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তার মানে ?

—মানে, অত্যন্ত নরম, নেশা হয় না।

আবার দুই জনেই শ্লথ মন্থর পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিতেছিল। অমল সহসা বলিল—মিস্ ডেজি—

ডেজি বলিল—আমার নাম ডেজি তা জান্‌লেন কি ক'রে ?

—লোক পরম্পরায় অবগত হ'য়েছি—

—আপনারা আমাদের সম্বন্ধে এতও খোঁজ ক'রতে পারেন ! আমার ডাক-নাম ওই কিন্তু আসল নাম অপর্ণা রায়—কিন্তু ডাক-নামটা সংগ্রহ ক'রলেন কি ক'রে !

অমল ডেজির এই ব্যঙ্গে আহত হইয়াছিল, সে জবাব দিল, —আমার নাম আপনি ঠিক যেমন ক'রে জান্‌লেন তেমনি ক'রেই জেনেছি।

ডেজি একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিল—এরূপ জবাব সে প্রত্যাশা করে নাই। অমল প্রশ্ন করিল—আপনি অপর্ণা রায় ?

—হ্যাঁ কেন বলুন ত ?

—গেজেটে আমার নামটির ঠিক পরেই ওই নামটি ছাপা হ'য়েছিল কাজেই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, আর আজকে আপনার সঙ্গে এমনি অকস্মাৎ আলাপ হওয়াটাকে তাই একটা lucky coincidence ব'লে মনে হচ্ছে।

ডেজি একটু হাসিয়া বলিল—Lucky ?

ডেজি প্রগল্‌ভের মত ক্ষণিক হাসিয়া, ছোট্ট সুবাসিত রুমালে কপাল মুছিয়া বলিল—গেজেটে নামটা ঐ জায়গাটায় ছাপা হওয়াটাও তা হ'লে Lucky !

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল। অমল তাই প্রশ্ন করিল—আপনি ত ট্রামেই যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—চলুন। তুলে দিয়ে আসি—আজকার এই সামান্য পরিচয়ের পরে এটাকে কর্ত্তব্য বলে মনে ক'রছি।

—ধন্যবাদ।

ডেজিকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া অমল হাটিয়াই মেসে ফিরিতেছিল। সকালের বেদনাদায়ক ঘটনাটা অকস্মাৎ যেন উবিয়া গিয়াছে। ডেজির প্রসঙ্গ তাহার অন্তরকে সুখ-স্বপ্নের সৌরভে সুবাসিত করিয়া দিয়াছে। অমল আনমনেই পথ চলিতেছিল—

এখনই ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইবে—

মেসের সংকীর্ণ বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে তাহাই ভাবিতে-ছিল—পড়াইতে যাইবে কিনা! সকালের পুঞ্জীভূত অভিমান নৈরাশ্য ও অপমান যেন ডেজির অকল সঞ্চালনে অন্তর্হিত হইয়াছে। ডেজির কথা কয়েকটি বার বার তাহার অন্তর অনবদ্য সুধাবেশে সুবাসিত করিয়া দিতেছে। মনে মনে সে প্রশ্ন করে—ডেজি এমন করিয়া সংগোপনে অতি অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে আলাপ করিল কেন ? এতদিন ত কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই—তাহার মনে কি কোন দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে ? প্রেমের দেবতা অন্ধ—হয়ত তাহাই।

সে বসিয়া বসিয়া তাসের ঘর নির্ম্মাণ করে—টালিগঞ্জের ছোট্ট একটি গৃহ,তাহার মাঝে গৃহবধূ ডেজি—প্রয়োজন হইলে দুইজনেই উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র গৃহের কর্ত্রী হইবেন তাহার অনশনক্লিষ্টা, দীর্ঘবৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণা মাতা। কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি অমলকে লইয়া বিধবা হইলেন, তাহার পর দুঃখে, দৈন্যে, অনশনে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের গৃহ একদিন অকস্মাৎ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হইয়াছিল, পুত্রের গৃহের মাঝে সে গৃহকে হয়ত ফিরিয়া পাইবেন—ডেজি হয়ত ধনী কন্যা, হয়ত এ কেবল বিলাস মাত্র, হয়ত সামান্য কৌতূহল মাত্র···কিন্তু অমল তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না—

সকালের সমস্ত দুঃখকে ভুলিয়া অমল হৃষ্টচিত্তেই ছাত্রপড়াইতে রওনা হইল—

দৈনন্দিন অভ্যাস মত কড়া নাড়িতেই একজন মহিলা দরজা খুলিয়া দিলেন। কালকার সেই উদ্ধত, অহঙ্কারী কুমারী মেয়েটি। অমল অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—আসুন, খোকা মামাবাড়ী গেছে, একটু দেরী হবে বসুন—

অমলের কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে নিঃশব্দে পড়ার ঘরে ছারপোকাসঙ্কুল বেতের চেয়ারের উপর খবরের কাগজ পাতিয়া বসিয়া পড়িল। মহিলাটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলিলেন—একটু চা খাবেন কি?

অমল সংক্ষেপে বলিল—না থাক্।

—আপনিত ভারী লাজুক—চা না খেলে সময় কাটাবেন কেমন ক'রে?

অমল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কালকের সেই মহিলাটিই, আজ তাহার মুখে চোখে একটা সকৌতুক প্রচ্ছন্ন হাসি রহিয়াছে। এ ব্যবহার যদি কেবলমাত্র অভিনয়ই না হয় তবে কাল দুইটি কথার জন্ত ওই বাচনিক মিতব্যয়িতা না দেখাইলেও ক্ষতি ছিল না। অমল বলিল—প্রয়োজন নেই, তাই, নইলে এক আধ কাপ চা খেলে গুরুভোজনের কোন সম্ভাবনা নেই।

মহিলাটি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—আপনিত বেশ কথা বলেন। আপনি ত এম্-এ পড়ছেন?

—হ্যাঁ। কৌতূহল প্রকাশ করা অন্যায়, তাহ'লেও জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি খোকার দিদি?

—হ্যাঁ, খোকার দিদি। পরিচয়টা বিশেষ ক'রেই দি, নাম আমার রমলা। কি পড়ছি সেটাও জানতে চান নিশ্চয়ই? ··বি-এ পড়ি বেথুনে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি?

অমল মেয়েটির প্রগল্‌ভতায় আশ্চর্য্য হইয়াছিল, সে বলিল—এর পরে আর প্রশ্ন করা চলে না—তবে আপনি বলে গেলে শুনতে পারি—সেটা সম্ভবতঃ দোষের হবে না।

—আমার কম্বিনেশন্ ইকনমিক্স, হিষ্ট্রি, অনার্স প্রথমটায়, আমাদের সাত জনের অনার্স আছে, ক্লাসে একশ' ছাব্বিশজন মেয়ে। ডলি দত্ত দেখতে সবচেয়ে সুন্দরী···রমলা নিজেই অত্যন্ত অশোভন ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বসুন, চা নিয়ে আসি।

রমলা চলিয়া গেল—অত্যন্ত অহেতুকভাবে আঁচলটাকে দোলাইয়া নাচাইয়া কাঁধে ফেলিয়া এবং চলন ছন্দে অশোভন গতি ও ভঙ্গি দিয়া। অমল হাসিয়া ফেলিল। কাল ওঁর ব্যবহারে সে ক্ষুন্ন হইয়াছিল, আজ ওর প্রগল্‌ভতা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। অমল আপনমনে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—ও হয়ত কোন যুবককে তাহার ঐশ্বর্য্য, রূপ ও বিদ্যাদ্বারা সম্মোহিত করিতে পারে নাই, তাই অভাগ্য মাষ্টারটিকে পাইতে চায় তাহার ভগ্ন-হৃদয় একান্ত উপাসক করিয়া। জীবনে আজই সে প্রথম দুইটি মহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অমল একথা মনে মনে বিশ্বাস করিত যে, আধুনিক মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহার জন্ত শতাধিক বুভুক্ষু নর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কবিতা লিখিতেছে। অমল নিজেই হাসিয়া ফেলিল—মিস্ রমলা যে পাত্রটিকে সেই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন সে সে পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

মিস্ রমলা চাকরের মারফতে এককাপ চা ও একটি স্যাণ্ডউইচ্ আনিয়া বলিলেন—নিন্, এটুকুর সদ্ব্যবহার ক'রতে ক'রতে হয়ত খোকা এসে পড়বে—

অমল হাসিয়াই বলিল—আপনার আদেশ পালনের জন্ত আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবই।

মিস্ রমলা অকস্মাৎ অভিনেত্রীর মত কপট অভিমানে ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিলেন—এটাকে আদেশ মনে ক'রলেন, অনুরোধ কি ভদ্রতাও মনে ক'রতে পারতেন ত?

অমল স্যাণ্ডউইচে একবার কামড় বসাইয়া বলিল—আপনি ভুললেও আমার পক্ষে এটা ভুল করা সম্ভব নয়—আমি ত আপনাদের চাকরই—

মিস্ রমলা কথাটা শুনিয়া হয়ত আনন্দিতই হইয়াছিল—এ কি ব'লছেন মাষ্টারম'শায়, মানুষ মানুষই, টাকা দিয়ে কি তার বিচার হয়—

মাষ্টারম'শায় সম্বোধনটা অমলের পিঠের উপর যেন কশাঘাতের মত আসিয়া প'ড়িল। সে বলিল—মোটরগাড়ী চিরদিনই পথচারীর গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিয়ে যায়, এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আর মাষ্টার মশায়টা আমার পৈতৃক নাম নয়—বাপ-মা আমার একটা নাম দিয়েছিলেন—সেটা হচ্ছে অমল।

অমলের কথা কয়েকটির মধ্যে যে তীব্র ভর্ৎসনা ছিল তাহা না বুঝিয়াই মিস্ রমলা বিজ্ঞের মত ক্ষণিক বোকার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আপনার নাম অমল, নামটি ত বেশ!

—আজ্ঞে বাপমায় যদি ঘণ্টাকর্ণ, বিকর্ণ ধরণের একটা নামও দিতেন তবে তাও আমার কাছে ভালই হ'ত।

খুব উচ্চাঙ্গের একটা রসিকতা হইয়াছে মনে করিয়া রমলা ক্ষণিক মুখে আঁচল দিয়া হাসিয়া লইলেন—আর বলিলেন—চা'টা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল যে!

অমল এতগুলি কঠোর কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, তাই বলিল—আপনার অতিথি সেবার দিকে যা নজর দেখছি, তাতে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সেই অতিথি বলে গর্ব্বও বোধ করছি।

রমলা কি যেন ক্ষণিক ভাবিয়া বলিল—আপনি কবিতা টবিতা লেখেন না?

—আজ্ঞে ভুলক্রমেও না। আর যত অপবাদই লোকে দিক, এ অপবাদ কখনই কেউ দেবে না।

—কলেজের পত্রিকায়ও নয়?

—না।

—আপনার অনার্স ছিল কিসে?

অমলের অনার্স ছিল ইংরাজি সাহিত্যে এবং সে ফার্ষ্ট ক্লাসও পাইয়াছিল কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা বলিল—অনার্স অঙ্কে, পেয়েছি একটা কোনমতে সেকেণ্ড ক্লাস।

রমলা রসিকতা করিল—ও বাবা অঙ্ক! আপনি দেখছি একেবারেই কাপালিক—

অমল কহিল,—কাপালিক, তবে কপালকুণ্ডলাও নেই এবং নবকুমারেরও অভাব—

রমলা বিস্ফারিত আঁখি ভঙ্গিতে কৃত্রিম মাদকতার প্রলেপ

দিয়া ব্রীড়াভঙ্গিসহ বলিল—কে বলে, আপনি কবি নয়! কাপালিক প্রসঙ্গে যখন কপালকুণ্ডলার কথা মনে হয়—

—ওটা কাপালিকের কবিত্ব! সংসর্গে তা হ'তে পারে—

—জীবনে আমি কবিতা লিখিনি আপনার ভয় নেই—তবে কলেজের কাগজে, সকলে ধরলে তাই একটা কোনমতে লিখেছিলাম।

অমল আগ্রহের সহিত বলিল—কিন্তু, আপনাদের কলেজের কাগজ কোথায় পাই?

রমলা বলিল—ও আপনার ত ভারী কৌতূহল—আচ্ছা দেব একদিন প'ড়তে—

অমল মনে মনে হাসিতেছিল সন্দেহ নাই। রমলার স্বল্পবুদ্ধি-প্রসূত কথার মাঝে মাঝে তাহার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নগ্ন-প্রয়াস বেশ সুস্পষ্টভাবেই সে বুঝিতেছিল তাই বলিল—আমার মত কাপালিকের পক্ষে কবিতা বোঝা অবশ্য একটা অনৈসর্গিক ব্যাপার—তবুও আপনার লেখা ব'লেই তা পড়তে খুব কৌতূহল হ'চ্ছে। লেখক লেখিকাকে সামনে দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

রমলা এই প্রশংসাবাদে আরও অনেকের মতই খুশী হইয়াছিল। সে লাস্যময়ী সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত আঁখিভঙ্গি করিয়া বলিল—আপনার বিনয় প্রশংসনীয়। তবে আপনার কৌতূহল কবিতার প্রতিই—না কবির প্রতি—

রমলার কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা অমল ভাল করিয়াই বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া রমলার পাউডার অবলুপ্ত সুঠাম সুন্দর মুখখানাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—প্রথমটাকে ভদ্রতার রীতি অনুসারে স্বীকার করা চলে, দ্বিতীয়টি বলা চলে না—যদিও দ্বিতীয়টাই অনেক সময় প্রবলতর হ'য়ে দেখা যায়—

খোকা আসিয়া পড়িল। রমলা অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ দিয়া প্রস্থান করিল। খোকাকে বৃহৎ একটা অঙ্ক কষিতে দিয়া অমল কি যেন এলোমেলো ভাবিতেছিল—রমলা এমনি করিয়া স্বেচ্ছায় প্রগল্‌ভতার সহিত এ অকারণ হৃদ্যতা করিয়া গেল কেন? সে কি তাহার মাঝে একটি অনুগত পারিষদকেই চায়—না আরও কিছু—ডেজিও ত ঠিক এমনি করিয়াই আলাপ করিয়া গিয়াছে—কেন?

অমল ছাত্র পড়াইয়া ফিরিবার পথে নিজে নিজেই বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিল, কতকটা আত্মপ্রসাদে, কতকটা সাফল্যে। আজ যে সে সেই উদ্ধত রমলাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করিয়া তাহার 'ন'এর অ-ব্যবহারকে শতগুণে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে এই জন্য মনে মনে গর্ব্বই অনুভব করিতেছিল। সে যে কাপালিক সাজিয়া কোনরূপ কবিতা লিখিতে পারে না প্রভৃতি নানা অসত্য কথা বলিয়া আসিয়াছে সে জন্যও বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল—মিথ্যা কথা বলিয়া যে অনেক সময়ে এমন আনন্দ পাওয়া যায় সে তাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করে নাই। রমলার পদাশ্রিত হইয়া ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় করিতে সে প্রলুব্ধই হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবার কথা ছিল, কিন্তু সে কোন ক্রমেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। রমলার কথা মনে করিয়া সে হাসিল এবং ডেজির কথায় মনে মনে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ভুলিয়াই যায় যে সে একান্তই দরিদ্র—ডেজির এই আলাপ, হয়ত কেবল কৌতূহলই অথবা রমলার বাসনারই একটা ভব্য প্রকাশ। অমল মনে মনে নানা সম্ভব অসম্ভব কথা ভাবিতে ভাবিতে যেন অকারণেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ডেজির সঙ্গে কালও হয়ত দেখা হইবে, হয়ত পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবে—

অমল ভাবে দারিদ্র্য ও এই কৃচ্ছ্র সাধনের একটা পুরস্কার হয়ত' আছে। যৌবনের মন লইয়া আরও অনেকে যেমন মনে মনে মানসী মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া বাহ্য জগতে তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায় অমলও যে তেমনি কিছু করে নাই, একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আজ অকস্মাৎ ডেজির মাঝে সে তাহার মানসীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে—যাহা কেবলমাত্র কল্পনারই, যাহা পাওয়ার অতীত তাহাকে ছোট করিয়া, ডেজির শত অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করিয়া, তাহার দেহ সৌষ্ঠবের ত্রুটিকে উপেক্ষা করিয়া অমল তাহাকেই মনের মাঝে একান্ত দুর্লভ করিয়া অতি সংগোপনে আপনার করিয়া রাখিয়া দিল—

অমল জানিত, এমনি করিয়া সকল মানুষই আকাশের রঙিন্ মেঘলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যের বস্তুর মাঝে নামিয়া আসে—মানুষের মনের এই দৈন্য তাহাকে সর্ব্বসাধারণের মতে স্বাভাবিক করিয়া তুলে। (ক্রমশঃ)

মুহূর্ত বিলাস

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

এমনি অনেক রাত, অনেক স্বপন,
জীবনেরে পরিক্রমি পড়িয়াছে তারা;
মদির সোনালী নেশা না জানি কখন,
দেখায়েছে পৃথিবীরে সর্বাঙ্গসুন্দর।
তাই নিয়ে রচিয়াছি কত কাব্য-কথা,
কত ছন্দ, কত গান, ঐশ্বর্য প্রচুর;
তন্দ্রা-ঘন কুহেলীর স্বপ্ন-মাদকতা,
রাতের আঁধার ঘেরি' সুপ্তি সুমগন।
রাত্রি যায়, আসে দিন, মধ্যাহ্ন-আকাশ,
রাতের প্রহরগুলি ক্ষীণ পরমায়ু;
প্রাত্যহিক জীবনের উলঙ্গ প্রকাশ,
কঠিন সংগ্রাম শুধু মরে বেঁচে থাকা।
তবুও আঁধার ঘেরা রহস্য উল্লাস,
জীবনেরে দিয়ে যায় মুহূর্ত বিলাস।

ফুলধনু

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্-এ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবনের ভগিনীকন্যা উর্মিলার কলকাতার বাড়ী, উর্মিলা তার ... অপূর্বর সঙ্গে কথা কইছে।

অপূর্ব। ব্যাপার তাহলে জটিল বল!

উর্মিলা। এ সব ব্যাপার তো চিরকালই জটিল!

অপূর্ব। কেন, তোমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে নাকি?

উর্মিলা। আছে।

অপূর্ব। তাহলে এতদিন বলনি কেন? খাঁচায় আবদ্ধ ...কে শুধু পাখা ঝাপ্‌টে মরছ!

উর্মিলা। হাঁ গো মশাই, এখন মামাবাবু এলে এসব কথা বলবে বল?

অপূর্ব। যার বলবার সে বলবে—

উর্মিলা। অর্থাৎ?

অপূর্ব। অর্থাৎ যাঁর প্রেমের কাহিনী, তিনিই গোচর ...বেন।

উর্মিলা। কি যে বল, তার ঠিক নেই! রচনা কখন এ ... কথা মামাবাবুর কাছে বলতে পারে?

অপূর্ব। কেন পারবে না? তোমার কাছে বলতে পারলে ...র মামাবাবুর কাছে পারবে না?

উর্মিলা। রসিকতা রাখ, কি হবে বল। দেখ্‌ছ তো, ...দিক থেকে বিয়ের ব্যাপার ঘনিয়ে আসছে।

অপূর্ব। তাহলে তুমিই না হয় বল না।

উর্মিলা। আমার বাপু লজ্জা করে। এ সব কি বলা যায়! ...র চেয়ে তুমি বল।

অপূর্ব। আমি! বাপ্‌রে! যে রকম মানুষ, তাতে ...য়ার্ড পুলিশের লোক, সন্দেহের ঘোর এখনও চোখ থেকে ...টেনি, ভাববেন, আসামী বেকসুর খালাস পাবে বলে ...কারোক্তি করছে।

উর্মিলা। সত্যি তাহলে কি করা যাবে বল?

অপূর্ব। আমি বলি কি, শ্রীমানকে ডেকেই পাঠাও না। ...নি এসে নিজের দাবী উপস্থিত করুন।

উর্মিলা। (বিস্মিতভাবে) কাকে ডেকে পাঠাব?

অপূর্ব। ভগিনীর মনচোরকে, অর্থাৎ তোমার ভাবী ...গিনীপতিকে, অর্থাৎ শ্রীমান্ রবীন্দ্রকে।

উর্মিলা। রবিকে? এখানে?

অপূর্ব। এরই মধ্যে রবীন্দ্র থেকে রবি হয়ে গেছেন! তাহলে ... দুর্গের একদিক ভগ্ন হয়ে গেছে বলতে হবে।

উর্মিলা। ঠাট্টা রাখ, বল কি করা যাবে।

অপূর্ব। বললুম তো, রবিকে এখানে কাল বিকেলে আসতে ...খে দাও।

উর্মিলা। তুমিই একটু লিখে দাও না।

অপূর্ব। আমি লিখ্‌লে সে কি আস্‌বে। তার চেয়ে তুমি লেখ।

উর্মিলা। কি লিখব?

অপূর্ব। তাও বলে দিতে হবে? এই আই-এ পাশ শিক্ষিতা নাকি! নাও, কাগজ আর পেনটা নাও।

উর্মিলা। (কাগজ পেন নিয়ে এসে) ত্রুটি পেলে আর রক্ষে নেই। কি বিপদেই পড়েছি—বল।

অপূর্ব। লেখ। সবিনয় নিবেদন, আমি শ্রীমতী রচনার দিদি। কাল বিকেল চারটের সময় আমাদের বাড়ী যদি একটু বেড়িয়ে যান, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি—হয়েছে?

উর্মিলা। হয়েছে।

অপূর্ব। দেখি দাও, বানান ভুল হয়েছে কিনা।

উর্মিলা। বানান ভুল অমনি হলেই হল! আহা কি শক্ত লেখাটা!

অপূর্ব। শক্ত লেখার জন্যে নয়, রিভিশনের অভাবে চিঠি লিখে ফিরে পড়ার ধৈর্য্য তোমার বড় একটা থাকে না কিনা, তাই বলছি।

উর্মিলা। খুব হয়েছে। এখন ঠিকানাটা কি লিখব বল।

অপূর্ব। এইজন্যেই বলি, মেয়েরা প্র্যাকটিক্যাল নয়। হোষ্টেলের ঠিকানায় ছেড়ে দাও।

উর্মিলা। খুব প্র্যাকটিক্যাল মশাই, তোমাদের চেয়ে বেশী প্র্যাকটিক্যাল। হোষ্টেলের ঠিকানায় দেওয়া যায়, তা জানি; কিন্তু আমাদের লেখা দেখলেই মশায়ের বন্ধুরা সেটা যথাস্থানে পৌঁছতে দেবে কিনা, তাই ভাবছি।

অপূর্ব। ভয় নেই, নিশ্চয় পৌঁছবে। এ তো আর নব-বিবাহিতার চিঠি নয় যে ভিতরে কিছু মূল্যবান জিনিস থাকবে। রচনা কোথায়?

উর্মিলা। পাশের ঘরে।

অপূর্ব। (একটু জোর গলায়) রচনা! রচনা!

রচনার প্রবেশ

রচনা। ডাকছেন আমাকে?

অপূর্ব। হাঁ, কি মুস্কিলেই পড়েছ বলতো! কোথায় এগজামিন দিয়ে বাড়ীতে গিয়ে নিশ্চিন্তে কিছুদিন ঘুমোবে, না বিয়ে বিয়ে! আমি হলে তো বলতুম, বাড়ী ছেড়ে পালাব।

উর্মিলা। হুঁ, পালাবে! মেয়েমানুষ হয়ে দেখবে একবার?

অপূর্ব। কেন, বেশ তো ভাল জিনিস, টাকাকড়ি উপায় করতে হয় না, কোন ঝক্কি পোয়াতে হয় না, খাও দাও, ঘুমোও। কি বল রচনা?

উর্মিলা। খাও দাও, ঘুমোও! বেশ!

অপূর্ব। শুধু একটি জিনিসের দায়িত্ব নিতে চাইব না। সেটা কি রচনা?

উর্মিলা। খুব হয়েছে, চুপ কর।

অপূর্ব। তুমি আমাকে চুপ করতে দিলে কই? শুধু বিয়ে আর বিয়ে!

ঊর্মিলা। মামাবাবু এখনও এসে পৌঁছচ্ছেন না কেন?

অপূর্ব। গাড়ী লেট বোধ হয়।

রচনা। আজকাল তো গাড়ী রোজই লেট।

অপূর্ব। তা তো হবেই, আজকাল মানুষ যে রোজই ফাস্ট; পৃথিবীকে ভারসাম্য রাখতে হবে তো? এখন হোটেল ছেড়ে এসে এখানে কেমন লাগছে বল!

রচনা। ভালই তো লাগছে।

অপূর্ব। দেখ, মামাবাবু যে রকম ব্যস্তবাগীশ মানুষ, একেবারে পাত্র ধরে নিয়ে এসে হাজির করবেন না তো?

ঊর্মিলা। তার দরকার কি, একজন তো হাজিরই আছে।

অপূর্ব। এত অনুকম্পা! দেখছ রচনা? তা এক পক্ষ যাঁর আছে, তাঁকে দ্বিতীয় পক্ষ দিয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উড়তে দেবেন কেন?

ঊর্মিলা। বড় দুঃখ, না?

অপূর্ব। তুমি তার আর বুঝবে কি! জান রচনা, কাল এখানে মানভঞ্জন পালা হবে।

রচনা। কোথায়? যাত্রা নাকি?

অপূর্ব। প্রায় যাত্রাই বটে। তোমার দিদি বৃন্দে দূতী সাজছেন, অধীন আয়ান ঘোষ, আর তোমায় রাধিকা সাজতে হবে।

ঊর্মিলা। কি হচ্ছে সব তোমার!

অপূর্ব। আর শ্রীকৃষ্ণকে হোটেল থেকে নেমন্তন্ন করে আনান হচ্ছে, তৈরী থেক।

(নীচে থেকে ডাক শোনা গেল, ঊর্মিলা, অপূর্ব!)

ঊর্মিলা। (ব্যস্ত হয়ে) মামাবাবু এসে গেছেন—

রচনা। বাবা?

ঊর্মিলা রচনার সঙ্গে অপূর্ব বেরিয়ে গিয়ে আবার বৃন্দাবনকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করল

বৃন্দা। (প্রবেশ করতে করতে) ঊর্মি, তোমাকে তো একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে মা। কিছু হয়নি তো?

ঊর্মিলা। কই না তো।

বৃন্দা। রচনার শরীরও ভাল নয়। অবশ্য ওর এগজামিন গেছে, সে জন্যে হতে পারে।

চেয়ারে বসলেন

অপূর্ব। আপনার পৌঁছতে দেরী হল, গাড়ীটা কি লেট্ করলে?

বৃন্দা। (ঘড়ি দেখে) হুঁ, দেড়-ঘণ্টা লেট। তিন দেড়ে সাড়ে চার ঘণ্টা লেট হয়নি, তাই যথেষ্ট।

ঊর্মিলা। (হাসিমুখে) আপনার ডাক্তারী এখনও চলছে মামাবাবু?

বৃন্দা। চলছে মা। দেশে অসুখ কত জান? বাংলা দেশে সুস্থ লোক কটা? তা ছাড়া হোমিওপ্যাথির মত এমন সুলভ অথচ মূল্যবান চিকিৎসা আর কোথায় পাওয়া যাবে!

অপূর্ব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় দুঃখী লোকদের একটা মস্ত বড় উপকার করা হয়।

ঊর্মিলা। মামাবাবু তো কারুর কাছেই পয়সা নেন না।

বৃন্দা। সেটাই বড় ভুল করি মা। পয়সা দিলেই লোকে ওষুধে বিশ্বাস করে, না দিলে ভাবে, হয় ডাক্তার বেকার, নয় ওষুধ জল, কি জান মা, একশটি যদি রুগী দেখ, তাহলে দেখবে তার ভেতর নব্বইটি পেটের অসুখের। নাক্সভমিকা থারটির চারটে ছটা বড়ি খেয়ে যদি সারে, ভাবি, চুলোয় থাকগে দু-দশ আনা, এরা সারুক। বাংলাদেশে একদিকে যেমন পেটের জ্বালা! তেমনি অন্যদিকে পেটের অসুখের জ্বালা! পেট নিয়েই দেশটা গেল!

সকলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল

অপূর্ব, বল সত্যি কিনা?

অপূর্ব। আজ্ঞে হাঁ, তা সত্যি বৈকি।

বৃন্দা। বড় সহরে দেখ ডিসপেপ্‌সিয়া, অম্বল, ছোট সহরে দেখ আমাশা, কলেরা, গ্রামে দেখ লিভার পিলে। সর্বত্রই পেটের ব্যাপার। ষ্ট্যমাক ট্রাবলই বাংলাদেশের বড় ট্রাবল মা, পলিটিক্যাল ট্রাবলের চেয়ে এ ট্রাবল বড় কম নয়।

সবাই হাসতে লাগল

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোটেলের কক্ষ—রবি, সুকুমার ও যোগেশ কথা কইছে

রবি। বাবা কাল আসবেন লিখেছেন।

সুকুমার। কি ব্যাপার বল তো?

যোগেশ। হয় তো পরীক্ষার আগে একবার ছেলের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান, তাছাড়া অন্যকিছু কাজও সেরে যেতে চান।

সুকুমার। কিছু লেখেন নি তিনি?

রবি। না, এমনি লেখেছেন, যাচ্ছি—

চাকর প্রবেশ করে রবিকে উদ্দেশ করে বললে—বাবু, আপনার চিঠি

সুকুমার। (লাফিয়ে উঠে) রবির চিঠি? খাম? দাও আমাকে।

চাকরের হাত থেকে নিতে চাকর বেরিয়ে গেল

এ্যাঁ, ব্যাপার কি রবি? খামে চিঠি যে?

রবি। কেন খামে কি আমার চিঠি আসতে দেখনি? দাও, খুলি।

সুকুমার। আমিই খুলি না ভাই, অনুমতি দিচ্ছ তো?

যোগেশ। অনুমতি আবার কি! এ কি ওর স্ত্রীর চিঠি যে অনুমতি দেবে!

সুকুমার। তাহলে ছিঁড়ি?

যোগেশ। নিশ্চয়।

সুকুমার। (চিঠি পড়ে খাটের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে) ভগবান!

যোগেশ। রবি। (বিস্ময়ে) কি হল! কি হল! কি খবর? দেখি দেখি—

সুকুমার। (পত্রটা আড়াল করে) ভগবান!

রবি। কি মুস্কিল! বল না কি?

সুকুমার। ভাল ভাল, মিষ্টি আনাও।

যোগেশ। কি খবর ভাই?

সুকুমার। বলছি, বলছি, শর্মা একদিন বলেছিল মনে আছে, ছুটিনের ছুটীতে বাচ্ছি, এ ছুটী বৃথায় যাবে না, দেখে নিও?

যোগেশ। কবে বলেছিলে?

রবি। চিঠিখানা দেখি।

সুকুমার। কবে বলেছিলুম, মনে আছে তোমার রবি?

রবি। আছে কিন্তু চিঠিখানা দাও—

যোগেশ। তা মিষ্টির কি হল?

সুকুমার। নিশ্চয়ই তো, মিষ্টির কি হল?

রবি। হবে এখন হবে, চিঠিটা একবার দেখতে দাও।

যোগেশ। কি মিষ্টি আনাবে?

সুকুমার। রবি, কি মিষ্টি তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে?

রবি। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

সুকুমার। যে মিষ্টি তুমি এখন সব চেয়ে ভালবাস, সেই খাম-এর ভেতর লুকিয়ে আছে।

রবি। দাও, ভাই দাও।

সুকুমার। দিতে পারি শুধু মুখে ফেলে, গিলে নিতে হবে। তে পাবে না!

যোগেশ। খাবার নেমন্তন্ন নাকি হে?

সুকুমার। সব রকম।

যোগেশ। বল কি!

সুকুমার। বস নিশ্চিন্ত হয়ে, বলছি। বস। (দুজনে বসল) ড়ি শোন। (চিঠি পড়তে লাগল) সবিনয় নিবেদন, আমি শ্রীমতী রচনার দিদি। কাল বিকেল চারটের সময় আমাদের াড়ী যদি একটু বেড়িয়ে যান, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত ব। ইতি—শ্রীউর্ম্মিলা চৌধুরী। শুনলে? নাও, এবার নয়ন ার্থক কর।

রবির হাতে দিলে, যোগেশ মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। রবির ুখ আনন্দে হাসিতে যেন চিক্‌মিক্ করতে লাগল

কমন? কেমন লাগছে ভায়া ভাবী শ্যালিকার পত্র?

যোগেশ। সুন্দর, মনোহর, মধুর!

সুকুমার। কেমন হে কান্ত, কথা কইছ না যে?

রবি। দেখ, তাহলে সত্যি—

সুকুমার। সত্যি নয়তো কি মিথ্যে চিঠিটা এসেছে?

রবি। (দ্বিধাভরে) তাহলে তো যেতে হবে?

সুকুমার। অবশ্য যেতে হবে, কি বল যোগেশ?

যোগেশ। নিশ্চয়। ইটকাঠ এনে, চুনসুরকী এনে, এত মেহনৎ করে বাড়ী তুলে জিজ্ঞেস করছ, গৃহপ্রবেশ করবে কি না!

সুকুমার। গৃহপ্রবেশ করে বলছ, গৃহলক্ষ্মী আনবে কি না!

রবি। কাল যেতে লিখেছেন।

সুকুমার। তুমি বলতে চাও কি যে আজ নয় কেন? ভায়া হে, ব্যস্ত হ'য়ো না, এ সবের মানে আছে।

যোগেশ। কি রকম?

সুকুমার। ছোট ছেলেকে এক সঙ্গে লোভার্ত ও শান্ত করবার জন্তে প্রিয় বস্তুটি 'কাল পাবে' বলে বাক্সে তুলে রাখছেন।

যোগেশ। আবার বিকেল চারটের সময় যেতে লিখেছেন।

সুকুমার। তারও মানে আছে।

যোগেশ। বুঝিয়ে বল।

সুকুমার। বলছি। তার আগে—রবি, তোমার হার্টটা ট্রং আছে তো? দেখো, নার্ভাস হোয়ো না।

যোগেশ। দেখি রবি, পাল্‌স্‌টা ফিল করি—

রবি। ভয় নেই, ভয় নেই।

সুকুমার। সত্যিই ভয় নেই। আগে জল দেখে ভয় পেত, এখন জলে নামতেও শিখেছে, সাঁতার কাট্‌তেও শিখেছে, শ্যাওলায় পা পিছ্‌লে গেলে ডুবে যাবে না।

যোগেশ। সাবাস ভায়া! কি রকম শিক্ষকের হাতে পড়েছে, দেখতে হবে তো!

সুকুমার। ভাই, অস্ত্রীর দ্রোণ কিনা বলতে পারিনা, তবে ছাত্র তো আর দুঃশাসন নয়, এ যে দ্রৌপদীপ্রিয়!

যোগেশ। আর এ অধমকে কি ঠাঁই দিচ্ছ?

সুকুমার। তুমি মহামতি ভীষ্ম।

যোগেশ। তারপর চারটের ব্যাখ্যাটা ত করলে না!

সুকুমার। হুঁ, চারটের যেতে বলেছেন। অর্থাৎ সাড়ে তিনটেও নয়, সাড়ে চারটেও নয়, একেবারে চারটে। ভায়া হে, চার চক্ষুর মিলন জান? যুগল হাতে যুগল হাত ধরা জান? যুগলের উদ্যোগে যুগলের হৃদয় বিনিময় জান?

যোগেশ। বিউটিফুল!

রবি। তাহলে নির্ভয়?

যোগেশ। নির্ভয়, নির্ভয়।

সুকুমার। ন ভেতব্যম্, মাভৈঃ। (ক্রমশঃ)

মুদ্রানীতির গোড়ার কথা—অর্থের মূল্য

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

ত চৈত্র সংখ্যার অর্থ-শাস্ত্রের যে সব নিয়মকানুন ও তত্ত্বের কথা আলোচনা রা হয়েছে বাস্তবজগতের দৈনিক আদান প্রদানে তার ফলাফল পূর্ণমাত্রায় কটিত হয় না। তার কারণ অর্থনীতি বিজ্ঞান হলেও এ একটি টিল শাস্ত্র, এর কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষের প্রভাব এসে পড়ে। পুরুষের অর্থনৈতিক কার্য্যাবলী তার সামাজিক পরিস্থিতি, তার মানবিক বৃত্তি, তার নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বহুল পরিমাণে পরিচালিত হয়; কাজেই অর্থনীতি শাস্ত্রকে একটা অপূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান (Imperfect Science) বলা চলে। সেই জন্ত আমাদের আলোচিত কানুন হিসাবে সব সময় জোর করে বলা চলে না যে মুদ্রা বা টাকার সমষ্টি

বাড়লেই দ্রব্যের মূল্য সব সময়েই বৃদ্ধি পাবে। তবে অর্থ ও সম্পদ যে এক জিনিষ নয় এবং অর্থ বাড়লে যে সম্পদ বাড়বে না এ তথ্যটি পরবর্ত্তী আলোচনা থেকে আমাদের বেশ পরিষ্কার হয়েছে। অনেক সময়েই আমরা শুনে থাকি, গবর্ণমেন্টের টাকা নেই, তার টাকার এখন বড় টানাটানি। অনেকে হয়তো আশ্চর্য্য হয়ে যান, ভাবেন যে রামশ্যামের টাকার টানাটানি পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছে করলে যত খুশী নোট ছাপ্‌তে পারেন, সেখানে তার আবার অর্থাভাব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের আলোচনায় সুপরিস্ফুট হয়েছে। দুনিয়ায় যদি একটি মাত্র কেনবার মত জিনিষ থাকে, আর সব শুদ্ধ দশটি মাত্র টাকা থাকে, তখন মানুষ ঐ জিনিষটির জন্য দশ টাকা দিতেই সহাস্যে সম্মত হবে, কারণ আর দ্রব্য না থাকলে টাকা রেখে সে করবে কি? অর্থাৎ জিনিষটির মূল্য এক্ষেত্রে দাঁড়াল দশটাকা। দশের জায়গায় যদি বিশ টাকা সৃষ্টি করা যায় তবে মানুষ জিনিষটির জন্য বিশ টাকাই দেবে অর্থাৎ জিনিষটার এবার দাম হবে বিশ টাকা। এখানে অর্থ বৃদ্ধি পেল বটে কিন্তু জিনিষ বা সম্পদ বৃদ্ধি পেল না, শুধু মাত্র সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেল। তাই গবর্ণমেন্ট যত খুশী নোট ছাপালে, জিনিষের দামই শুধু বাড়বে এবং গবর্ণমেন্টকেও সেই সব জিনিষের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হবে, কাজেই অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে তার কোন ভালই হলো না বা তার টাকার অভাবও ঘুচলো না। তাই অর্থ বাড়লে রাম, শ্যাম, রহিম, করিম এইরূপ কয়েকজনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি হলো বটে, কিন্তু সমগ্র দেশের তাতে কোন উপকারই হলো না, উপরন্তু অনেক সময় এই মুদ্রাসম্প্রসারণে ঘোর অনিষ্ট এসে উপস্থিত হতে পারে। যাক্ এ বিষয়ে অন্য স্থানে আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি পেলে সম্পদ কি কিছুতেই বৃদ্ধি পেতে পারে না? আমরা আবার একটি নূতন প্রশ্নে এসে পড়লাম। নব্য মতের অর্থনীতিবিদ্‌গণ কিন্তু ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের মতে নূতন অর্থ নূতন পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে এবং যেহেতু অতিরিক্ত টাকার সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীও অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই এস্থলে জিনিষের মূল্য নাও বাড়তে পারে। অথচ এক্ষেত্রে বর্দ্ধিত আয়ের দ্বারা লোকে বেশী সম্পদ ভোগ করে থাকে। ইংরাজ অর্থনীতিবিশারদ সুপণ্ডিত জন্ মেনিয়ার্ড কেইন্‌স্ (John Manyard Keyns) (বর্ত্তমানে লর্ড) এই মতের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং এই সুঅবস্থার নাম দিয়েছেন quasi-bo m বা চিরস্থায়ী আর্থিক সুদিন। কিন্তু এ ধরণের জিনিষ সম্ভব হতে গেলে দুটি অবস্থার প্রয়োজন। প্রথমত, এই অতিরিক্ত অর্থ পণ্য ক্রেতা (consumer)দের হাতে না পড়ে প্রথমে শিল্পী, ব্যবসায়ী অর্থাৎ Pr.ducerদের হাতে পড়বে। তাহলে তারা যন্ত্রপাতি, কলকারখানা অর্থাৎ Capital goodsএর সাহায্যে সেই অর্থ দ্বারা প্রথমেই পণ্যসামগ্রী বা consumers Goods তৈরী করে ফেলতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ, পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাবে যখন দেশের কলকারখানাগুলি ও মজুরেরা সব অলসভাবে বসে আছে, সেই অবস্থায় নূতন অর্থ মিল্‌-মালিকগণ বা ব্যবসায়ীর হাতে পড়লে পণ্য বৃদ্ধির আশা আছে। কিন্তু দেশে যখন সকল কল-কারখানাই পুরোদমে চলেছে, মজুর যখন আর বসে নেই এবং নূতন কলকারখানা সৃষ্টিরও আর সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ এক কথায় দেশে যখন Full-employment বর্ত্তমান, তখন নূতন অর্থ কোন প্রকারেই আর, পণ্য বা সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই অর্থ-প্রসারণ নীতি (Policy of monetary expansion) কেবল পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং ইনফ্লেশন নামক বিভীষিকাকে ডেকে আনবে। কিন্তু অর্থ সম্প্রসারণ দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে বহুল পরিমাণে সাবধানতা ও সতর্কতার প্রয়োজন এবং সনাতনপন্থীরা তাই বলেন যে কার্য্যতঃ প্রায়ই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তাঁরা বলেন যে প্রথমতঃ পণ্যভোগীদের হাত এড়িয়ে এই নূতন টাকাটা কেবলমাত্র কলকারখানার মালিকদের হাতে দেওয়াইতে কিছু শক্ত ব্যাপার। কিছু না কিছু টাকা মজুরি বাবদও পণ্য-ক্রেতাদের হাতে গিয়ে পড়বেই। তারপর দেশের হস্তান্তর যোগ্য পণ্যের সঠিক সংখ্যা, দেশের মোট টাকার পরিমাণ, সেই টাকার আবার প্রচলন গতি বা Velocity ইত্যাদি এই সব তথ্যের খবর রাখাও শক্ত ব্যাপার। অথচ এসবের সঠিক খবর জানা না থাকলে নূতন অর্থ শুধু মাত্র পণ্যসম্ভার উৎপাদনে প্রয়োগ করা দুষ্কর। তাই সনাতন পন্থীরা নব্যতন্ত্রের এই মতবাদে সর্ব্বদাই অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে থাকেন।

ভারতবর্ষে কোনদিনই কলকারখানা পুরোদমে চলেনি বা বেকার সমস্যার অভাবও কোনদিন ঘটেনি। সুতরাং Full-employmentএর কোন প্রশ্নই আসতে পারে না এদেশে কিন্তু এখানে একটি গলদ আছে। ভারতবর্ষ তার পরাধীনতার দৌলতে প্রায় সর্ববিধ কলকারখানা বা capita। Goodsএর জন্য বিলেত বা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী। তাই যুদ্ধে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় সেই সব উৎপাদনকারী কলকারখানা ইচ্ছামত আমদানী করতে অক্ষম। কাজেই শত চেষ্টা ও সুযোগ থাকলেও তার প্রয়োজন মত ভোগ্য বস্তু বা পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা তার নেই, হাত পা থাকা সত্ত্বেও তার জগন্নাথ সেজে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? সুতরাং কার্য্যত তার অবস্থা Full-employmentএরই সামিল। এক্ষেত্রে অর্থ বৃদ্ধি বা অর্থ সম্প্রসারণ করলে পণ্য বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে শুধু পণ্য মূল্যই বৃদ্ধি পাবে।

আর্থিক জগতের ভাগ্যচক্র

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই হাসি-কান্না নিয়ে যেমন মানুষের জীবন গঠিত, আর্থিক জগতেও নাকি সুদিনের পর দুর্দ্দিন, আবার দুর্দ্দিনের পর সুদিন, এই লীলাখেলাই নিয়ত চলছে। ব্যবসা বাণিজ্য খুব পুরোদমে চলছে, সকলেই অহরহ কাজকর্ম্মে লিপ্ত, বেকার হয়ে ঘরে আর কেহ বসে নেই, বিজ্ঞানের নিত্য নূতন অভিযান ও আবিষ্কার মানুষের ভোগ লালসা নিবৃত্তি করবার জন্য অহরহ ব্যস্ত, অস্থিরমতি ক্রেতাদের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অসংখ্য প্রকার বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুতের ক্লান্তিতে কলকারখানাগুলির যখন প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে আর্থিক জগতের যন্ত্রজাহাজের কোথায় যেন এক মারাত্মক ছিদ্র হয়েছে, ভরা গাঙে তরী এবার ডুবেছে। এত বড় একটা কলরবকে হঠাৎ যেন একটা ভীতিকর নিঝুম ও নিস্তব্ধতার ছায়া গ্রাস করে ফেললো, রূপকথার সেই রাক্ষুসী যেন এসে সমস্ত লোককে আত্মসাৎ করে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে গেল। বাজার ভরা অসংখ্য মাল, কিন্তু ক্রেতার দেখা নেই, কাল যারা অযাচিতভাবে যে কোন মূল্যে নিজেদের ভোগ চরিতার্থের উপাদান আহরণ করতে ব্যস্ত ছিল, আজ যেন তারা অন্ধকারে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, সকলের মুখেই যেন একটা ভীতি ও আশঙ্কার চিহ্ন। মিলের মালিক তাদের ভুল বুঝলো। তারা বুঝলো যে সুদিনে উচ্চ মূল্য পেয়ে অতি লোভের আশায় তারা চাহিদা বা প্রয়োজনের থেকেও বেশী মাল উৎপন্ন করে ফেলেছে। তাদের বিজ্ঞানপ্রসূত যন্ত্র বা কলকারখানা খুব শক্তিশালী, সুতরাং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তারা অসংখ্য মাল প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্রেতার হালফ্যাশানের দৌরাত্ম্যে কাল যা সমাজের গৌরবের বস্তু ছিল, আজ তা বাতিল। এতদিনে উৎপাদনকারীরা একবার পেছনের দিকে দৃষ্টি দিল। নূতন মাল তৈরী থেকে পুরাতন মাল অল্প মূল্যেও বিক্রয়ের জন্য আজ তারা বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আগত দিনের এক মহাতঙ্কে বিক্রেতার মধ্যে যেন মাল বিক্রয়ের একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। জিনিসের দাম পড়তির মুখ ধরলো। ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র একবার নিম্নগামী হওয়া মাত্রই দ্রব্য বিক্রেতার দল আরো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সকলেই যে-কোন মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে টাকা নিয়ে ঘরে বোঝাই

করতে তৎপর ; ফলে দ্রব্যের মূল্য ধাঁ ধাঁ করে নেমে চল্‌লো, বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘ মানুষকে আরো দুর্ব্বল করে ফেললো। আজ মানুষ দ্রব্য চায় না, মানুষ শুধু আজ চায় টাকা। আর্থিক জগতে টান পড়লো, কলকারখানা বন্ধ হলো, কুলী মজুর বেকার হলো, মানুষের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা কমে গেল, অসংখ্য ভোজ্যের মধ্যেও মানুষ বুভুক্ষু রয়ে গেল। অভাবে স্বভাব নষ্ট, সকল দেশই নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত, চারিদিকে কেবল অবিশ্বাস ও অনাস্থার ছায়া, জাতিতে জাতিতে রেষারেষি, ছিন্ন তরীর তার কমাবার জন্ত একজন আর একজনকে ধ্বংস করতে চায়, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ ও অবাধ বাণিজ্যনীতি নির্ম্মমভাবে শেষ হয়ে গিয়ে তার জায়গায় গড়ে ওঠে উগ্র জাতীয়তাবাদ, উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের নিষেধাজ্ঞা (Tariff wall), অ-দক্ষ ব্যবসায়ীকে সরকারী সাহায্যনীতি (subsidy) এবং মুদ্রা মূল্য হ্রাস (Currency Devaluation)। এতেও যখন জাতি নিজেকে বাঁচাতে পারে না, তখন বেজে ওঠে রণডঙ্কা, আর আরম্ভ হয় বিশ্ব-সংগ্রাম।

বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায়, তখন যখন অসংখ্য ভোগের মাঝে মানুষ মানুষকে বুভুক্ষ রেখেছে। কাজেই প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। তাই নরমেধযজ্ঞের ভিতর দিয়ে মানুষের আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়ে যায়। যুদ্ধের জীবন মরণ সমস্তায় বহু অর্থ ও বহু সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন। চারিদিকে অবরোধ নীতি (blockade) চলেছে, কাজেই বিদেশ থেকে মাল আমদানির পথ বন্ধ। দেশের কলকারখানাগুলি আবার সজাগ হয়ে উঠলো, আর্থিক জগতের ভাগ্যচক্র আবার উর্দ্ধগামী হলো। চারিদিকে কেবল জিনিষের জন্ত হাহাকার। কুলি মজুরের দল আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো, আবার তারা কাজে হাত দিল। আজ আর ঘরে কেউ বসে নেই, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই নরমেধযজ্ঞের উদ্‌যাপনে আমন্ত্রিত হলো। প্রত্যহ কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন ; কাজেই ভুয়ো অর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া উপায় নেই, তাই নোট ছাপাবার মেশিনটিও ঘুরে চল্‌লো অনবরত। একদিকে জিনিষের প্রচণ্ড রূপ চাহিদা, অন্যদিকে এই অফুরন্ত মেকী মুদ্রা, এই দুইয়ের চাপে পড়ে জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলে। নিত্য মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় দ্রব্য মজুতের স্পৃহা যায় বেড়ে, অবচয়িত মুদ্রা (Depreciated ocrrency) আর কেউ চায় না, মানুষের মধ্যে মুদ্রাতঙ্ক দেখা দেয় (Fiight from the currency) এবং এইভাবে নিত্যই চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিষের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এখানেও সেই বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘ আরও বেশী অনিষ্ট করে। দেশে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম আরম্ভ হয়। ধনী ও ব্যবসায়ীরা ফেঁপে লাল হয়, গরীব ও মধ্যবিত্তদের রক্ত ধীরে ধীরে শুকোতে থাকে।

তারপর একদিন যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়। আবার যে যার ঘরে ফিরে চল্‌লো। পণ্যের অভাবনীয় চাহিদা হঠাৎ কবে শেষ হয়ে গেছে, অথচ পণ্যোৎপাদন যন্ত্রগুলি সতেজ ও সক্ষম। যুদ্ধকালীন অবরোধ প্রথার জন্ত পূর্ব্বে যে মাল বিদেশ থেকে আসতো, তা আজ দেশে তৈরী হচ্ছে। তাই যুদ্ধান্তে বিদেশ থেকেও যখন আবার মাল আসতে আরম্ভ হলো, তখন দেশে আবার পণ্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। আবার বেকার সমস্যা আরম্ভ হলো, লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেল, দেশে অর্থ-সঙ্কোচন প্রথা সুরু হলো, মূল্য আবার পড়্‌তির মুখ ধরলো। তারপর আরম্ভ হয় বিজিত দেশের উপর শ্বাসরোধকারী ঋণের বোঝার প্রতিক্রিয়া (Bep.iration)। বর্ত্তমান যুগে দেশকালের ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় এক দেশের দুর্দ্দশার প্রভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিজিত দেশের বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে জয়ী দেশের উপরেও এবং পৃথিবী ক্রমশঃ এগিয়ে চলে আবার এক বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার (Depressi;n) দিকে। এইভাবে ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র ঘুরে চলছে পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি ও অবনতির মধ্যে দিয়ে। আর্থিক জগতের এই ঘূর্ণাবর্ত্তে আজকের ধনী কাল হয় পথের ভিখারী, আবার আজ যে নিঃসম্বল ও দরিদ্র সে এই অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের অঙ্গুলি হেলনে কাল হয়ে পড়ে সমাজের গৌরবমুকুট। তবে এই নির্ম্মম ভাগ্যচক্র পৃথিবীর অধিকাংশ জনসমাজেরই ভাগ্যে আনে দুর্দ্দশা ও অশান্তি, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক অবশ্য উপভোগ করতে থাকে পৃথিবীর এই রাজকীয় উপাদান-গুলি।

এই ব্যবসা জগতের ভাগ্যচক্র (Trade o, ole) হলো ধনতান্ত্রিক যুগের নিদর্শন এবং এই উত্থান-পতনের আহুতি যোগায় আমাদের সেই মধ্যস্থ টাকা নামক দালালটি। যে দেশে টাকা নেই সেখানে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যার যা প্রয়োজন সে তাই পায়, কাজেই মূল্যের উত্থান পতনের সম্ভাবনা নেই সেখানে। তাই যুদ্ধ-পূর্ব্বের দশ বৎসর ধরে পৃথিবীর যাবতীয় দেশ যখন আর্থিক মন্দায় ঘোরতর খাবি খাচ্ছিল, রুশিয়া তার নূতন প্রবর্ত্তিত সমাজ ও অর্থনীতির ধারা অনুসরণ করে শান্তি ও তৃপ্তির সম্পদে গৌরবান্বিত ছিল। অর্থই হলো যত অনর্থের মূল। এই অর্থের দৌলতেই দ্রব্য মূল্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জিনিষের জোগান ও চাহিদার মধ্যে দূরদর্শিতা দ্বারা মানুষ যদি সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয় তবুও এই মুদ্রার হ্রাস বৃদ্ধির জন্ত মানুষের সমস্ত গণনা ও শ্রম পণ্ড হয়ে যায়, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিকরণ (St.bilisa tion of ,pilces) কিছুতেই সফল হয় না। কিন্তু এই টাকা নামক মধ্যস্থটির ভবলীলাসাঙ্গের নামে ধনী সম্প্রদায় আঁৎকিয়ে ওঠেন, কারণ এই দৌলতেই তাঁরা আজ ধনী, এরই আহরণে তাঁদের জীবনের যা কিছু আনন্দ। আর যদি এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রেখে ধনী সম্প্রদায়কে রক্ষা করতেই হয়, তবে অন্তত অর্থের এই অবাধগতি, অফুরন্ত প্রতিপত্তি, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালকে অবরোধ করতে হবে, প্রভুর বদলে অর্থকে মানুষের ভৃত্য করতে হবে। আর তা নইলে দেশে শান্তি ও কল্যাণের আশা চিরকালের জন্ত বিসর্জ্জন দিতে হবে। এই যুদ্ধে মুদ্রাস্ফীতির দৌলতে ভারতবর্ষে টাকার আর অন্ত নেই, কোটি কোটি টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে বাজারে বেরিয়ে চলেছে। অথচ দেশের সম্পদ একটুও বৃদ্ধি পায়নি। দেশটা তার পুঁজি ভেঙ্গে খেয়ে চলেছে ; টাকার গরমেতে। গোটা দেশটা না খেয়েই মলো। এই যে টাকার খেলা, এরি নাম হলো কায়া ছেড়ে ছায়া নিয়ে খেলা। কতদিন আর মানুষ চোখে ঠুলি বেঁধে জন্তুর মত ঘুরে বেড়াবে—এ অন্ধ বিশ্বাস মানুষের কি যাবে না? রামপ্রসাদের সেই দুটি লাইন মনে পড়ে গেল—

মা আমায় ঘুরাবি কত
(এই) এই চোখ বাঁধা বলদের মত !

কপট-বন্ধু

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরী

কুসুমের বুকে বসি মধুকর হাসি ভরা মুখে কয়,
তব মুখে যেন লেখা আছে শত জনমের পরিচয়।

ফুল কহে, জানি দরদী বন্ধু, মধু যেই ফুরাইবে,
শত জনমের পরিচয় রেখা নিমিষে মুছিয়া দিবে !

টেম্পেষ্ট্ ইন্ তুফান মেল

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ বি-এস্-সি

পূজার বন্ধ হবার দিন পনের আগে এক কন্ট্র্যাক্টার্-কোম্পানীর কাজে দেওঘর যেতে হ'য়েছিল। বাড়ীভাড়া পাওয়া যায় না, হোটেল-বোর্ডিংএ সীট পাওয়া যায় না—এ বদ্নাম হ'য়ে গেছে ক'লকাতায়। কিন্তু দু'শো মাইল পশ্চিমে বাঙ্গালীপ্রধান এই সহরটির অবস্থা কত জটিল, তা ভুক্তভোগী না হলে বুঝ্‌তে পারবেন না। দুন-পাঞ্জাব এক্স্‌প্রেসে বেলা বারোটায় সময় কলিকাতা থেকে রওয়ানা হ'য়ে রাত্রি সাড়ে নয়টায় সময় দেওঘর পৌঁছুলাম। টিকিট দিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে এক্কা, ঘোড়াগাড়ী ও রিক্সা সব সওয়ারী নিয়ে চলে গেল। একজন দারওয়ান শ্রেণীর লোক প্ল্যাট্‌ফর্ম্ থেকে সব শেষে বেরিয়ে এল। তার নাম পালোয়ান চৌবে। যে কোনও একটা হোটেলের সন্ধান তার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। সে ব'লল—নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় তার 'ভতিজা' দারওয়ানের কাজ করে—তার কাছে সে শুনেছে সেখানে 'জাগ্‌গা' নাই। সারা সহরে বাড়ী কোথাও খালি নেই। কোনও হোটেলের সন্ধান সে জানে না। ষ্টেশনের লোকেরাও কোনও হোটেলের সন্ধান দিতে পারলেন না। পালোয়ানের মনটা একটু নরম হ'ল আমার দুরবস্থা দেখে। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বাঙ্গালী ডাঁকু কিনা এ বিষয়ে একবার নেপথ্যে সন্দেহ প্রকাশ সে ক'রেছিল। অবশেষে একে একে সকলেই স'রে পড়ার পর পালোয়ানজি ব'ললে—হামার মালিকের বাসার নজিগে হামার এক্‌ঠো ছোটা এক কাম্‌রা ঘর আছে—সো হামি ভাড়া দিয়ে থাকে। লাগাওয়াৎ ইঁদারা আছে—টাট্টির করাগৎ জগ্‌গা আছে—ভাড়া লেকিন্ রোজ দু-রুপেয়া দিতে হোবে। আমি বিশেষ জরুরি কাজে এসেছি। কয়দিন থাকতে হবে। বাধ্য হ'য়ে রাজী হ'য়ে গেলাম। ষ্টেশনে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাউন্ ট্রেনের সওয়ারী নিয়ে তখন এল। তাতে আমার জিনিষপত্র তুলে পালোয়ানজী সহ রওনা হ'লাম। কিছুক্ষণ পরে নন্দন পাহাড়ের নীচে একটা ফাঁকা যায়গায় গাড়ী দাঁড়ালো। দারোয়ান কথিত এক কামরাওয়ালা বাড়ীতে উঠ্‌লাম। বড় বাড়ী একটা কাছে ছিল। সেখানকার মালী পালোয়ানের আদেশে কূয়া থেকে জল তুলে দিয়ে গেল এবং একটা খাটিয়া রেখে গেল। সঙ্গে খাবার যা ছিল, খেয়ে শু'য়ে প'ড়লাম। মালীকে বারান্দায় শুতে ব'লে পালোয়ান তার মালিকের বড় বাড়ীতে চ'লে গেল।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর জান্‌লাম—ভোরের ট্রেণে বড় বাড়ীর মালিক কলিকাতা থেকে এসে পৌঁছেছেন। বিকালে গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ ক'রে এলাম। তারপর একসঙ্গে দু'জনে বেড়াতে বেরোলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপের ফলে আমার কন্ট্র্যাক্টের কাজ কর্ম্মে বিশেষ সাহায্য হ'ল। বাড়ী বা হোটেলের চেষ্টায় তিনি সাহায্য ক'রেও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারলেন না। আমার অসুবিধা হ'লে পালোয়ানের কামরা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের বাড়ীতে উঠে আস্‌তে ব'ললেন। আমি দরকার মনে ক'রলাম না। মধ্যে মধ্যে চায়ের নিমন্ত্রণ ওবাড়ীতে চ'লতে লাগ্‌লো। ভদ্রলোক বিপত্নীক। তাঁর বড় মেয়ে সুনন্দা কলিকাতায় এম্-এ পড়ে। হোষ্টেলে থাকে পড়ার সুবিধার জন্য। ছোট ছেলেমেয়ে দুটিও কলিকাতায় স্কুলে পড়াশোনা করে। বৎসরের এই সময় তিনি মাসখানেকের জন্য দেওঘরে থাকেন। সুনন্দার সঙ্গে আলাপের পর আমার প্রোগ্রামের অনেক ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে গেল। বাড়ীতে (গয়ায়) জানালাম কোম্পানীর কাজে দেওঘরে দেরী হ'তে পারে। যাহোক কলিকাতা ফেরার আগে গয়া হ'য়ে নিশ্চয় যাবো। কিছুদিন পরে গয়া গেলাম। আমার সঙ্গে এল সুনন্দা। সেও ক'লকাতা ফিরে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে গয়া এসেছে—কারণ তার বুদ্ধগয়া দেখার সখ অনেকদিন থেকে, অতএব পথে বুদ্ধগয়া দেখে ফিরে যাবে। তার পিতা মাতৃহীনা আদরিণী কন্যার প্রস্তাবে অসম্মত হ'তে পারলেন না। তিনি আমাকে একদিন আড়ালে ডেকে ব'লেছিলেন, আমার জানা-শোনা ভালো পাত্র যদি থাকে তবে যেন একটু খোঁজ ক'রে তাঁকে জানাই—এবং তাঁর কলিকাতার বাসায় মধ্যে মধ্যে যাই। সুনন্দা আড়াল থেকে একথা শুনেছিল। আমাকে নিভৃতে সে ব'ললে—দেখুন বাবা আপনাকে কি সব ব'ললেন না, ওসব কিছু খোঁজ ক'রতে হবে না। যাই হোক বুদ্ধগয়া দেখেই সুনন্দা কিন্তু চ'লে গেল না। দু'দিন পরে সুনন্দাকে নওয়াদা হ'য়ে নালন্দা ও রাজগীর নিয়ে যেতে হ'ল। সে ব'লল, রাজগীর থেকে বক্তিয়ারপুর হ'য়ে—সে কলিকাতা ফিরে যাবে। কিন্তু রাজগীর থেকে আবার ফিরে এল আমার সঙ্গে—গয়ায়। ব'ললে রাত্রে একলা যেতে ভরসা হয় না—যা ভিড় গাড়ীতে। ধিঙ্গী মেয়ের, ধিঙ্গীপনা দেখে স্ত্রী অবাক হ'লেন। সুনন্দাও কেমন ট্যাক্ট্‌লেস্—যেখানে যেতে চাইবে—সঙ্গে আমার স্ত্রীকে যেতে ব'লবে না। আমি মাঝে থেকে অপ্রতিভ হই।

এর কয়েকদিন পরেই আফিসের ছুটী শেষ হ'ল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মার দেওয়া নারিকেল-চিঁড়ে মুখে দিয়ে তুফান-মেলের জন্যে রওয়ানা হ'লাম—দু'খানা সাইকেল—রিক্সায়। যাবার সময় স্ত্রী আড়ালে ব'ললেন—ধিঙ্গী মেয়েটা কাছে কাছে ছিল ব'লে, অনেক কথা ব'লব ব'লব ক'রে ব'লতে আর অবসর পেলাম না। যখন মনে হ'ল বলি, রাত্রে যখন রোজ শুতাম তখন ত' কোনও দিন সুনন্দাকে সে ঘরে ঢুকতে দেখি নি। কথা আর বাড়ালাম না। রিক্সায় ষ্টেশনে না গিয়ে ডাউন ট্রেণের হোম-সিগ্‌ন্যালের কাছে গেলাম। সুনন্দা একটু ঘাব্‌ড়ে যাওয়া যাওয়া ভাব চেপে গেল। ইন্টার ক্লাসের টিকিট কাটা ছিল। সেদিন ট্রেণের ভিড়ের কথা ভেবে আমি সিগ্‌ন্যালারকে আগে থেকে টিপ্‌স্ দিয়ে তুফান মেলকে হোম্-সিগ্‌ন্যালে লাইন্ নট্-ক্লিয়ার্ দিয়ে পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখার ব্যবস্থা

ক'রেছিলাম। গাড়ী ব্যবস্থামত সেখানে দাঁড়াতেই ডিহরী থেকে যে বোগিটা আসে সেটাতে দুজনে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে প'ড়লাম। অন্ত কোনও কাম্‌রায় জায়গা খালি দেখ্‌লাম না। মনে ক'রেছিলাম বোগিটা খালি থাক্‌বে। কিন্তু উঠে জান্‌লাম আমার চেয়েও উৎসাহী কয়েকজন এই বোগিতে জায়গা পাবার জন্ত সেদিন দুপুরে বেনারেস প্যাসেঞ্জারে গয়া ছেড়ে সন্ধ্যায় ডিহরিতে ওই বোগিতে উঠেছেন এবং এখন দিব্য বেঞ্চে বিছানা পেতে শুয়ে আস্‌ছেন। কষ্ট ক'রলে কেষ্ট মেলে। সুনন্দাকেও বলা ছিল। সে ট্রেণে উঠেই হোল্ড-অল্ খুলে ফেল্‌লে এবং জান্‌লার ধারে যাঁরা শুয়ে বা ব'সেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ বিছানা তুল্‌তে অনুরোধ ক'রতেই—সকলেই নিজের বিছানা তুলে নিয়ে সুনন্দাকে বেঞ্চে বিছানা পাততে জায়গা ছেড়ে দিলে।

গাড়ী ছাড়ার পর যাত্রীদের শয়ন, উপবেশন, বোঁচকা হস্তে দণ্ডায়মান প্রভৃতি অবস্থার নানা রকম্ এ্যাড্‌জাষ্ট্‌মেণ্ট্ হ'ল। জানানা-সওয়ারীর বিছানার ম্যাগিনট্ মাইন অক্ষত রইল। সুনন্দা একবার ব'ললে—এমন পূর্ণিমার রাত দেখে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। ওয়ার্ণ্ ক'রে দিলাম, সে উঠে ব'স্‌লেই তার বিছানার ধার গুটিয়ে দিয়ে লোকে বেঞ্চিতে ব'সতে আরম্ভ ক'রবে—এবং বিছানা গোটান আরম্ভ হ'লে, তার পরিণতি সাম্‌নের বেঞ্চির মতন হবে। সে নিদ্রার ভাণ ক'রলে—এবং একটু পরেই নিদ্রিত হ'য়ে গেল। আমি কোণের দিকে অর্দ্ধশয়ান ভাবে ঝিমুতে লাগ্‌লাম। ট্রেণ বেগে ছুটতে লাগ্‌লো। পাশের বেঞ্চে একটা আলোচনা হ'চ্ছিল।

তাদের আলোচনা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিক নেই। আসানসোল পৌঁছাবার পর সুনন্দার গলার শব্দ পেয়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ বুঁজে তার কথা শুনতে লাগ্‌লাম। জান্‌লার বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পুরুষ কণ্ঠ ব'লছে—এই বগিরই পাশের কম্পার্ট্‌মেণ্টে আমার রিজার্ভ্‌ড্ ফার্ষ্ট ক্লাস কুপে—আর কেউ নেই, চ'লে এস তুমি। সুনন্দা ব'ললে—বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে দোকা এক কুপেতে ট্র্যাভ্‌ল্ করা কি ভাল দেখাবে? উত্তর হ'ল—তোমাকে এত শেখাচ্ছি—তবু কন্‌ভেন্‌শানালিজ্‌ম্ গেল না? তার উত্তর—আমার লাগেজ-গুলো এখান থেকে তোলার ব্যবস্থা কর তাহ'লে। তার উত্তর—আমার বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর একটা আইডিয়া আছে আমার—এমন ভাবে দেখা যখন হ'য়ে গেল তোমার সঙ্গে—বর্দ্ধমানে নেবে আমরা দু'জনে ট্যাক্সি ক'রে ক'লকাতা যাবো। তার উত্তর—না, না সেটা ভাল হবেনা। উত্তর—আচ্ছা সে হবে এখন। বাই দি ওয়ে, তোমার সঙ্গে, হু ইজ্ হি? তার উত্তর—ও আমাদের দারওয়ানের ভাড়াটে। কলিকাতা যাচ্ছিলো—বাবা ওকে সঙ্গী ঠিক ক'রে দিলেন। তার উত্তর—দ্যাট্ পালোয়ান? সে তোমাদের চাকরী এখনও ক'রছে? উত্তর—হ্যাঁ কোথা আর যাবে ও? আমাকে এ্যাক্‌সিডেণ্ট্ থেকে সেভ্ করার জন্ত মা ওকে যে পুরস্কার দিয়েছিলেন—তা দিয়ে দেওঘরে আমাদের বাড়ীর কাছে একটু জমী নিয়ে—এক কাম্‌রা একটা বাড়ী ও তুলেছে এবং ভাড়া দিচ্ছে। উত্তর—আই সী। তুমি এস তাহ'লে? ওকে ডেকে তুল্‌তে হবে? তার উত্তর—কিছু দরকার নেই। তোমার বেয়ারাকে ব'লে দাও,—যা বলবার ব'লে—লাগেজ নিয়ে চলুক্। সুনন্দা গাড়ী থেকে নেমে গেল। একটা বেয়ারা এসে, 'মিসি বাবার' লাগেজ নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চিটা হুড়মুড় ক'রে লাগেজ ও যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল। আমার কাছে সবটা এক স্বপ্নের মতন বোধ হ'ল। 'দারওয়ানের ভাড়াটের' দায়িত্ব কতখানি সুনন্দার ক'লকাতা না পৌঁছান পর্য্যন্ত—তার বাবা ব'লতে পারেন কিনা—তোমার সঙ্গেই ত' ওকে পাঠিয়েছিলাম—এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার ঘুমিয়ে প'ড়লাম। ঘুম ভাঙ্গ্‌লো—একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ইন্ করার পর।

ট্রেণ থেকে নেমে পাশের ফার্ষ্ট্‌ক্লাস কুপের দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌লাম—কুপে খালি। বর্দ্ধমান থেকে ট্যাক্সিতে যাবার আইডিয়ার কথা মনে প'ড়লো। আরও মনে প'ড়লো, সুনন্দার বাবার মা-হারা কন্তাটির জন্ত সুপাত্র অন্বেষণের অনুরোধ,—তথা সুনন্দার নিষেধ বাণী। ভুলে যেতে চাইলাম, —নালন্দার উন্মুক্ত প্রস্তর বেদীর ওপর রাত্রে চাঁদের আলোর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে আমার পাহারায় সুনন্দার গভীর নিদ্রা যাওয়া, রাজগীরে গুহার ভেতর হঠাৎ সাপের অস্তিত্ব বোধ ক'রে ব্যাকুলভাবে আমার কটিলগ্ন হ'য়ে তার গুহা হ'তে নিষ্ক্রমণ এবং আমার পরিহাসে আর বিবর্ণ মুখে সাবলীল হাসির আবির্ভাব,—এমনি আরও কত কি।

গোলাপ ও মালতী

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র

দূর পারস্ত বসোরার স্মৃতি ওমরের গীতি পেয়ে,
রূপ-সৌরভে গৌরবে ভরি এলো বিদেশিনী মেয়ে।
বোস্তানী পাখী গান গায় নাকি ঘুম ভাঙাবার তরে
চাঁদনী রাতের প্রহরে প্রহরে সুরে সুরে উঠে ভ'রে।
রাঙা গাল ওর রাঙাইতে আরো ঝরায় বুকের লোহ
কাঁটা হ'য়ে ফুটে বেদনা তাহার রঙ্ হ'য়ে জাগে মোহ।
মরি মরি মোর মুগ্ধমানস হেরি বরণের মেলা
বিকচোন্মুখ যৌবন জাগে অনুরাগে করে খেলা।

সহসা সুরভি ঘননিশ্বাসে চমকি ফিরানু আঁখি,
পাতার আড়ালে মালতী-বধূর একি অভিমান নাকি?
চির-চেনা মুখ হৃদি উৎসুক ভুলিতে পারি কি তোরে?
রাণী থাকে দূরে রাণীর আসনে, প্রিয়া বাঁধে বাহু-ডোরে।

বৈভবে ঘেরা চৌদিক যার নাহি অবকাশ ঠাঁই
তুমি রিক্তের একান্ত কাছে আঁখিতে তোমারি তাই।

আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

রায় বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

(২)

বিজ্ঞান-প্রগতির ফলে নানাবিধ তথ্যের আবিষ্কার জড় যন্ত্রতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই দুর্ব্বল করিতেছিল। বিজ্ঞান বস্তুকে (mass) আসল পদার্থ ও শক্তিকে (energy) তাহার উপসর্গরূপে কল্পনা করিয়া আসিতেছিল। শক্তির সংরক্ষণ (conservation of energy) শক্তিকে একটি অক্ষয় স্থায়ী আসন দিলেও বস্তুর প্রাধান্যকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল বস্তু পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার এ পরিত্যক্ত স্থানগুলি দখল করিয়া শক্তি বিজয় গর্ব্বে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পরিশেষে, বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বস্তু একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাড়িৎ-চুম্বক (electro-magnetic) ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তখন বস্তুকে (matter) স্রেফ বাদ দিয়া শক্তি লইয়াই পরীক্ষা সুরু করিলেন। যে পরমাণুকে (atom) বৈজ্ঞানিক এতদিন অবিভাজ্য (indivisible) বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও চূর্ণ হইয়া গেল—তখন দেখা গেল যে তাহার মধ্যে কতিপয় বিদ্যুৎকণা (electron ও proton) ভিন্ন আর কিছু নাই। বৈজ্ঞানিক আরও দেখিল, প্রত্যেক পরমাণু প্রকৃতপক্ষে একটি সৌর-জগৎ, প্রোটোনকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইলেক্‌ট্রোনগুলি ধারণাতীত বেগে ঘুরিতেছে। বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা ও সংগঠন (organisation) মৌলিক পদার্থগুলির (element) মধ্যে ভিন্নরূপ; এ সংখ্যার ও সংগঠনের বিভিন্নতাই সোণাকে সোণা ও লোহাকে লোহা অর্থাৎ মৌলিক পদার্থগুলিকে বিভিন্ন গুণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন হইলেও, যে বিদ্যুৎকণা লইয়া উহারা গঠিত তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। স্বর্ণ ও পারদের পরমাণুতে বিদ্যুৎকণার সংখ্যা ও গঠনের তারতম্য শুধু একটিমাত্র ইলক্‌ট্রোণ লইয়া…ঐ বিদ্যুৎকণাটিকে উহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অপরটির কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে পারা সোণা হইয়া যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আণবিক সৌরজগতের বিশাল শূন্যগর্ভে ঐ বিদ্যুৎকণাগুলি কয়েকটি ক্ষুদ্র সরিষার মত ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত,… এবং উহাদের সংস্থান, সংগঠন ও গতির ভেল্কী বাজি শূন্যকেই বস্তুর আকার দান করিতেছে! এই শূন্য ও গতিবেগ বৈজ্ঞানিকের মনে একটা মস্ত ধাঁধা লাগাইয়া দিল। এতদিন সে মনে করিত বস্তুর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অগ্রসর, যেমন উৎক্ষিপ্ত তীরের শূন্যে উত্থান… উহার গতি একটি অবিচ্ছিন্ন (continuous) চলতি পথে ঐগুলির ছেদ নাই এবং তাহা যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন—নিউটনের গাণিতিক সূত্র-গুলি (Principle) ঐ ধারণাকেই সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই বদ্ধমূল ধারণাকেও ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়া গণিত এখন দেখাইল যে প্রাকৃতিক পদার্থের গতি ধারাবাহিক নহে, বিভিন্ন এবং উহার মধ্যে কোন সুনির্দ্দেশ নিয়ম নাই। সিনেমার পটে চিত্রকে দেখা যায় চলমান গতি-ধারা রূপে, কিন্তু ফিল্মে ঐ ছবিটিই অসংখ্য ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্রে বিভক্ত; তেমনই প্রকৃতিও গতিখণ্ডগুলিকে জোড়া দিয়া ধারাক্রমের বিভ্রমের সৃষ্টি করে। প্রকৃতি থাকিয়া থাকিয়া ঝম্পা (jerk) দিয়া চলে, উহার গতি ধারাবর্জ্জিত (discontinuous) ইহাই ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্কের কোয়ানটাম্ তত্ত্ব (Quantusm Theory) এই তত্ত্ব হইতে বিজ্ঞান কার্য্য-কারণ (cause and effect) সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। তাহা এই যে ফল কারণের পুনরাবৃত্তি, রূপান্তর বা ছদ্মবেশে আবির্ভাব মাত্র নহে …কারণগুলির সংস্থান ও সংগঠন যে ফল প্রসব ক'রে তাহা সম্পূর্ণ একটি নূতন জিনিস, এবং উহার মধ্যে এমন সব গুণ-ধর্ম্মের বিকাশ (emergence) ঘটিয়া থাকে যাহা কারণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই তত্ত্বের বিবৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন,…এখানে বোধকরি এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, উহা জীবনতত্ত্ব, বিবর্ত্তন বাদ—এমন কি দর্শনের মধ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

গণিতের আর যে তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক জগতকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা আইনষ্টাইন প্রবর্ত্তিত আপেক্ষিকতা-বাদ (Theory of Relativity)। এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে প্রকৃতির নিয়ম অতির্দ্দেশ্য, যেহেতু উহা দেশ-কালের (space-time) বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। দেশকে (space) কাল (time) হইতে পৃথক করিয়া দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতা এই তিনটি বিস্তারিত সংযোগ রূপে কল্পনা করা প্রাকৃতিক দর্শনের অভ্যাস,…ইউক্লিডের ভূমিতি ঐরূপ কাল-বর্জ্জিত দেশ লইয়াই গবেষণা করিয়াছে। কিন্তু সত্যকার জগতে দেশকে কাল হইতে বা কালকে দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না,…কেননা এমন দেশ নাই যেখানে কাল নাই এবং এমন কাল নাই যেখানে দেশ নাই। দেশের যে কোন বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে কালের পথ ধরিয়াই চলিতে হয়। পথকে অতিক্রম করি আমরা কালের মধ্য দিয়া, তাই গন্তব্যে পৌঁছিতে ঘণ্টা মিনিটের হিসাব করিয়া থাকি। আবার দেশের প্রতিটি বিন্দু এক একটি কাল-বিবর্জ্জিত দেশ-বিন্দু নহে, উহা দেশ-কাল বিন্দু (point instant)…নিজ নিজ কালের একটি রেখা ধরিয়া চলিয়াছে, উহার প্রতিটির একটি ইতিহাস আছে এবং ঐ কালের ইতিহাস দেশকে বিশিষ্ট পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। কালকে আমরা সমগ্র বিশ্বের উপল খণ্ডের উপর স্রোতের মত বহমান দেখিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুত উহা সেরূপ নহে। পুরাণে ব্রহ্মার মুহূর্ত্তের উল্লেখ আছে, তাহা মানুষের কাল-জ্ঞান হইতে পৃথক, দেশ-কালের স্বরূপও তেমনই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন। প্রকৃতির এমন কোন নিজস্ব নিরলম্ব বিশ্ব-মান নাই যাহার দণ্ড দিয়া সকল দেশ-কাল একই পরিমাপে যাচাই করা চলিবে। পৃথিবী প্রতি মুহূর্ত্তে ১৮ মাইল গতিবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু পৃথিবীকে স্থির বলিয়া ধরিয়া লইয়াই আমরা রেলগাড়ির বেগ নিরূপণ করি। আবার একই গতিবেগ বিশিষ্ট পাশাপাশি ধাবমান দুইটি গাড়ির যাত্রীগণের কাছে উভয়ই স্থির,…বেগের তারতম্য ঘটিলে একের তুলনায় অন্যকে গতিসাধন দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বিকারের কারণ দেশ-কাল ধারাক্রমের (space, time continium) সংস্থান ও সংগঠন, উহার বক্র খণ্ডিত অংশ (curvature) হইতে যাবতীয় বিভিন্নতার সৃষ্টি এবং উহাই বিদ্যুৎ কণার সন্নিবেশকে বস্তুর বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছে।

বস্তুতন্ত্র বা জড়বাদ (materialism) বিশ্বের সকল মীমাংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিল বস্তুর মৌলিক সত্তা ও জড়ত্বকে, প্রকৃতির প্রণালীবদ্ধ নিয়মকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া…কিন্তু দেখা গেল যে বস্তু নাই, জড়ত্ব নাই, প্রকৃতিও ধারাবর্জ্জিত ও অনির্দ্দেশ্য। পদার্থবিজ্ঞান জড়যন্ত্রকে দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যখন আবিষ্কার করিয়া বসিল, জগৎ বস্তু-সম্পর্ক শূন্য এক বিরাট শক্তির ইন্দ্রজাল…মায়া-মরীচিকার শোভাযাত্রা …তখন বস্তুতন্ত্রের বিরাট সৌধটি যেন কোন মায়াবীর যাদুদণ্ডের স্পর্শ নিমেষে অন্তর্দ্ধান করিল। ইহা সত্য যে, ঐ বিরাট শক্তির স্বরূপ বিজ্ঞান আজও জানিতে পারে নাই,…প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তার সহিত সাক্ষাত সম্পর্ক এখনো স্থাপিত হয় নাই। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর যেমস্ জিনস্ বলিয়াছেন, "The outstanding achievement of twentieth century physics is not the theory of Relativity, nor the theory of Quanta nor the dissection of atom; it is the general recognition that we are not yet in contact with the ultimate Reality" মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ…শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মহাবাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞান জনসমক্ষে ধরিয়াছে,

জড়বাদের স্থলে বৈদান্তিকের মায়াবাদকেই সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা অল্প শ্লাঘার কথা নহে।

বিজ্ঞানের কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক,…সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া পরীক্ষা করা উহার কার্য্য। অণু পরমাণুকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বিজ্ঞান শক্তির ইঙ্গিত পাইয়াছে, কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা সমগ্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সে কি কখনো পারিবে? দেশ-কালের অন্তর্নিহিত সত্তা…অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্…কি টেলেস্কোপ বা মাইক্রস্কোপের দৃষ্টি সীমার মধ্যে ধরা দিবে? ইন্দ্রিয় সংযোগে বাহ্য প্রকৃতির যে জ্ঞান আমরা লাভ করিয়া থাকি তাহার একটা জীবন-তত্ত্ব-মূলক তাৎপর্য্য আছে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ণ সচেতন করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বিষয়ই উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। তাই, **ultra violet, infra-raol** কিরণগুলি আমরা চোখে দেখিতে পাই না, ইথরের বিদ্যুৎ তরঙ্গের স্পন্দনও অনুভব করিতে পারি না…উহাদের তথ্য জানিতে হইলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদের মনে যে ছাপ অঙ্কিত করে তাহা ফটোগ্রাফের অনুরূপ,…ঐ ছবিতে রক্ত-মাংসের চিহ্ন মাত্র নাই। মনের ফলক হইতে প্রতিবিম্বকে পৃথক করিতে আমরা অক্ষম, তেমনই আবার বস্তু সত্তার সত্য পরিচয়ও প্রতিচ্ছবির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাহার একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কিরূপ তাহা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,…আমরা একটি অন্ধকার গুহায় আলো জ্বালিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছি। পশ্চাতে গুহামুখে অজ্ঞাত সত্তার আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটিতেছে, ঘুরিয়া দেখিবার শক্তি আমাদের নাই, শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সম্মুখে গুহাগাত্রে চলন্ত ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকেই প্রকৃত সত্তা বলিয়া মনে করিতেছি।

গুহাভ্যন্তরের ঐ ছায়াবাজি লইয়া বিজ্ঞানের খেলা, উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক শ্বেতকেতু উপাখ্যানের পুনরভিনয় করিতেছেন…এক স্থানে পৌঁছিয়া আর কিছু দেখা যায় না বস্তু নাই। তখন বিজ্ঞানের পালা সাঙ্গ হইয়া আসে, জাগে উপলব্ধি (**intuition**)…সেষা অণিমা ঐতদাত্ম্যং ইদম্ সর্ব্বং। এই উপলব্ধিজাত জ্ঞান বিতর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ঠিক যে বিজ্ঞান সত্যের বিকার, নিৰ্জ্জীব বহিরাবরণকেই বিচার বিশ্লেষণ করে,…উহা বস্তুবিচ্ছিন্ন খণ্ড দর্শন (**abstraction**) মাত্র। নদীর প্রবাহ হইতে আমরা এক গণ্ডুষ জল তুলিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি,…আমাদের ঐ কার্য্য হইয়া উঠে তখন শব ব্যবচ্ছেদ, জীবন্ত স্রোতধারা মুঠার বাহিরে তেমনই বহিয়া যায়। স্রোত-জীবনের মূল সত্যের পরিচয় পাইতে হইলে উহারই স্নিগ্ধ প্রবাহ মধ্যে অবগাহন করিতে হয়। ঘূর্ণ্যমান আবর্ত্তের, বীচিক্ষুব্ধ সলিলের শক্তিপুঞ্জ আমরা পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারি, উহার সহিত যখন আমাদের একাত্মবোধ জাগিয়া উঠে এবং তাহাই সারা মন প্রাণ ভরিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রতিধ্বনি তুলিয়া দেয়। এই উপলব্ধিজনিত অপরূপ উচ্ছ্বাস, সত্যের আনন্দময় রূপ ধর্ম্মের, দর্শনের ও শিল্পের নিজস্ব সম্পদ…বিজ্ঞানের দাবী ওখানে পৌঁছিতে পারে নাই।

বিজ্ঞান জগতকে মায়া-মরীচিকারূপে দেখাইয়াছে, সে জন্য সবই মিথ্যা, সৌন্দর্য্যের নীতির, সমাজ গঠনের কোন কিছুরই মূল্য নাই…এরূপ মনে করা ভুল। সত্য আপেক্ষিক…গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে সত্যের যে আকার প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে তাহা অন্যরূপ; আমরা শুধু তুলনা করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করি। মানুষের জীবনযাত্রার ব্যবহারিক সত্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য হইতে পৃথক…উহা বিভিন্ন স্তরের সত্য। সত্যের একটি বিশিষ্ট স্তরে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ নীতিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশ দেখা দিয়াছে…প্রকৃতির মূল কারণ, স্বয়ংসিদ্ধ সত্তার মধ্যে ঐ সব গুণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব না-ও থাকিতে পারে; সেখানে হয়ত তুমি নাই, আমি নাই, হন্তা ও হত, খাদ্য ও খাদক কিছুই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, ক্ষুধার সময় আহার্য্যকে কতগুলি ইলেকট্রোন প্রোটোন সমন্বিত মায়া বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে মূঢ়তা ও অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাইবে। আমাদের দেশে মায়াবাদ অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ অদ্ভুত আচারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গোটা সংসারকে ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, জ্ঞান-বর্জ্জিত অপরিণত মনোবৃত্তি সম্পন্ন অনেক মানুষ আপনাকে ও জগতকে প্রতারিত করিয়াছে…ইহা বোঝে নাই, মায়ার খেলায় মায়ার সংসারই সত্য এবং ঐ ক্ষেত্রেই মায়ার পুতুলের চরম সার্থকতা। আমাদের শাস্ত্রে উপলব্ধিজাত তত্ত্বজ্ঞানকে বিদ্যা বলা হইয়াছে, অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞান অবিদ্যার রূপ। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা একই চিরন্তন সত্তার অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির জ্ঞান…ধর্ম্ম অন্তরের উপলব্ধি, বিজ্ঞান বাহিরের অন্বেষণ। অবিদ্যাকে বাদ দিয়া বিদ্যার ধ্যান ও চর্চ্চা অসম্পূর্ণ এবং উহা আদৌ ফলপ্রসূ হইতে পারে না, ঈশোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাম্ উপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যে অবিদ্যার উপাসনা করে সে অন্ধ তমোগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে সেই ব্যক্তি, যে শুধু বিদ্যার উপাসনা করে। আত্ম প্রকৃতি ও নৈসর্গিক জগৎ…জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়…উভয়ের সংযোগ ও পরস্পরের পরিচয়ের মধ্যেই যথার্থ জ্ঞান ফুটিয়া উঠে…এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা, আত্মদর্শন ও বিজ্ঞান, এই দুয়ের সহযোগে মানুষ অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

প্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানকে বিজ্ঞান উপহার দিয়াছে, মানুষের জীবনের পথ সুগম করিবার জন্য…সে উহাকে অশ্বের মত রথে জুড়িয়া ঘণ্টার পথ মিনিটে অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু সারথীর দৃষ্টি অন্ধ, উন্মাদের মত শুধু গতির আনন্দে মাতিয়া, পথ বিপথ ভুলিয়া পাহাড়ের একটি সঙ্কটপূর্ণ ভৃগুস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর এক ধাপ, রথ হয়ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। তাহার এত সাধের বিজয় যাত্রা কি শেষে সমাধিস্তূপে পরিণত হইবে? হয়ত, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। জীবন প্রকৃতি আজ আত্মবিস্মৃত, কিন্তু উহার বাঁচিবার প্রবৃত্তি লোপ পায় নাই…তাই, একদিন আত্মোপলব্ধি, একাত্মবোধ, বিশ্ব-মানবের ইষ্ট ও সমগ্রের অনুভূতি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমেরিকার রাজনীতিজ্ঞ ওয়েনডেল্ উইলকি প্রাচ্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া **One World** নামে যে বইখানি লিখিয়াছেন উহাতে বিশ্বমানবের একাত্মবোধের সূচনা দেখা যায়। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই,…মানব-জাতির শৈশবে ধর্ম্মকেও দুর্ব্বল চরণে চলিতে দেখা গিয়াছে, শত্রুর উচ্ছেদ-সাধন করিতে সে মারণ উচাটন মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে, তখনো তাহার আত্মচেতনা জাগে নাই। বিজ্ঞানকেও আজ ঐ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়,…উহার অভ্যুত্থানের কাল মাত্র তিন শত বৎসর। স্যর্ অলিভর লজের কথায়,…মানুষ পৃথিবীতে নব আগন্তুক, তাহার জীবনে সবেমাত্র প্রভাত দেখা দিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যখন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতিরূপে দেখা দিয়াছিল, তখন তাহা দেখিয়া বৃক্ষ পশু ও পক্ষীর আবির্ভাবের কথা কে ভাবিতে পারিত? আর আজ মানবের বর্ত্তমান পরিণতি দেখিয়া দূর ভবিষ্যতে বিবর্ত্তনের পথে সে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, কে তাহা কল্পনা করিতে পারে?

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

বিস্ময়ের ভাবটা কিছু পরিমাণে কাটিলে আত্মস্থ হইয়া বলরাম বসিলেন। খাসমহল কাছারীর সেই তরুণ তহশীলদার মণিমোহনই বটে। এতটা আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জীবনটা ঘুরিয়া চলিয়াছে চক্রবৎ গতিতে—মণিমোহনেরও পদোন্নতি হইয়াছে। বলরামের মনটা অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। আহা, উন্নতি হোক, সব দিক দিয়াই উন্নতি হোক। বড় ভালো ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একটা অবচেতন গর্বের অনুভূতি আসিয়া তাঁহাকে দোলা দিয়া গেল। মণিমোহন—সাধারণের চোখে আজ সে হাকিম, অসংখ্য লোকের দণ্ডমুণ্ডের সে বিধাতা। কিন্তু বলরামের কাছে দশবছর আগেকার সেই ছেলেমানুষ সরকারী বাবুটি ঠিক তেমনিই রহিয়া গিয়াছে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় নাই, একবিন্দু রূপান্তর ঘটে নাই। কেশীকংসজয়ী সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও কি যশোদা এমনি করিয়াই ভাবিতেন ?

প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে বলরাম মণিমোহনের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

—কবিরাজ মশাই, একটু চা খাবেন নাকি !

বলরাম ভাবিতে লাগিলেন—হাঁ, বয়স একটু বাড়িয়াছে বইকি মণিমোহনের। গলার আওয়াজটা বেশ গভীর আর গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—জাঁদরেল একটা হাকিম হইতে গেলে যা দরকার হয়। গায়ের রঙ্ আরো একটু কালো হইয়াছে—লাবণ্য শুকাইয়া গিয়া যেন একটা রুক্ষ বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে সর্বাঙ্গে। চোখের দৃষ্টিতে আজ যেন খানিকটা দাম্ভিকতা আর আলস্যের স্তিমিত ছায়া ; অথচ সেদিন এই চোখ দুটি মধ্যে মধ্যে যেন স্বপ্নের ঘোরে পিছাইয়া পড়িত, শাণিত বুদ্ধিতে চিক চিক করিত। হাঁ, বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে মণিমোহনের। একটা দশাসই দস্তুর মতো হাকিম হইতে গেলে যা দরকার, সবই।

—কবিরাজ মশাই, একটু চা করতে বলি ?

কবিরাজ ভাবনার অতলতা হইতে ভাসিয়া উঠিলেন। গর্বে গৌরবে মনটা ভরিয়া উঠিতেছে। বড় ভালো ছেলে মণিমোহন। এতদিন পরে, এতটা বড় হইয়াও তাঁহাকে কেমন মনে রাখিয়াছে, আদর অভ্যর্থনা করিতে এতটুকু ত্রুটি নাই কোথাও। বলিলেন, চা ? না, চা তো বিশেষ—

—খান না এক পেয়ালা। চায়ের মতো কী আর জিনিষ আছে ? গ্রীষ্মকালের শীতল পানীয়, আর শীতের দিনে গরম পানীয়—বিজ্ঞাপনে পড়েননি ? আপনার মৃত-সঞ্জীবনীসুরার চাইতে অনেক বেশি ফলদায়ক, কী বলেন ?

—যা বলেছেন।

ভারী খুশি হইয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন। মাথার তৈল-মসৃণ সুডোল ইন্দ্রলুপ্তটির উপরে রোদের একটি ফালি পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল ; বলরাম যদি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী হইতেন, তাহা হইলে শিষ্য-সামন্তেরা অনায়াসেই মনে করিতে পারিত যে একটা অশরীরী জ্যোতির্ময়তা বলরামের মাথা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে বাহিরে।

—ওরে, দু পেয়ালা চা দিয়ে যাস্ এখানে—হাঁকিয়া চাকরকে বলিয়া দিল মণিমোহন। সত্যিই হুকুম করিবার মতো গলার আওয়াজটা বটে। পদ-মর্যাদায় চাপে যথোচিত ভারিক্কী আর গুরুভার যে হইয়া উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় পোষণ করিবার কারণ নাই কোনোদিক হইতে। সেদিনের তরলোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর দশ বছর আগেকার খরস্রোতা তেঁতুলিয়ার জল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কালের দিগন্তে ভাসিয়া গেছে। তা যাক, সবই তো যায়, কিছুই কাহারো জন্যে অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকে না। কত লোকই তো এমন করিয়া চলিয়া গেল। সেই ডি-সুজা—বাঘের মতো দুঃসাহসী মানুষটা ; সেই হরিদাস—যাযাবর, আপনভোলা একটা বিশৃঙ্খল মানুষ ; সেই জোহান—বর্মীরা যাহার গলা কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল ; সেই লিসি—যাহার শোকে পাগল হইয়া গিয়াছিল ডি-সুজা ; সেই মুক্তো—

নামটা মনে করিতেই বলরাম আবার চমকিয়া উঠিলেন। মুখের উপর বেদনার কতগুলি রেখা বিকীর্ণ হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাতেই। দশবছর সময়টা কি এতই দীর্ঘ দূরান্তব্যাপী ? যদি তাহাই হয়, তবে এতদিনে কেন সেই দুঃস্বপ্নটাকে তিনি ভুলিতে পারিলেন না। কেন এখনো মুক্তোর কথাটা বুকের মধ্যে আঘাত করিয়া করিয়া তাঁহাকে এমন ভাবে রক্তাক্ত করিয়া দেয় ?

—তারপরে কবিরাজ মশাই, দেশের খবর কী আপনাদের ?

কবিরাজ আপাদমস্তক শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মণিমোহন মুক্তোর কথাটা ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে নাকি ? কিন্তু মুক্তো সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু একটা সে তো জানিত বলিয়া মনে পড়ে না। তবু অপরাধী মনে আশংকাটা সময়ে উদ্যত হইয়া আছে—ব্যথার জায়গাটাতে পাছে ঘা লাগিয়া বসে, সেই জন্য সদাসর্বদা সেটাকে দুহাতে আগলাইয়া রাখিতে চান বলরাম।

—অ্যাঁ. খবর ? কী খবর জিজ্ঞেস করছিলেন ?

মণিমোহন খবরের কাগজটা উল্‌টাইতেই উল্‌টাইতে প্রশ্ন করিয়াছিল—কিছু একটা জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই। তাই বলরামের এই চমকটা তাহার চোখে পড়িল না। একটা কোণে দৃষ্টি রাখিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল, এই দেশের গাঁয়ের।

—ওঃ। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন বলরাম : দেশের খবর তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। ধান-চালের বাজার বড় খারাপ। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া এসেছে এবারে। দশবছর আগে তো লোকে এসব বালাইয়ের কথা ভাবতেই পারেনি। হালে দু চারটে করে জ্বরে ধরেছিল বটে, কিন্তু এবারে একেবারে মড়কের মতো জাঁকিয়ে বসেছে।

—লোক মরছে নাকি ?

—মরছেই তো দু দশটা। এক জেলে পাড়াতেই তিন চারটে সাবড়ে গেল কদিনের মধ্যে।

—হুঁ, কুইনাইন আসছে না। গম্ভীর মুখে কাগজটা ভাঁজ করিয়া পাশের টিপয়টার উপর নামাইয়া রাখিল মণিমোহন: ওষুধ-বিষুধের চালান সব বন্ধ। যা যুদ্ধ লেগেছে।

—যা বলেছেন, যুদ্ধ!—আগ্রহে বলরামের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে কৌতূহলী মনের খোরাকটা পুরোপুরি মিটিতে চায় না—লোভ বাড়াইয়া দেয়। সাগ্রহে বলরাম বলিলেন: এই যুদ্ধই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছে। আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপারটা কী, বলুন তো? জার্মানী এবার লড়াই জিতে নেবে, তাই নয়?

—কী বললেন, জার্মানী লড়াই জিতে নেবে?—মণিমোহন হাসিয়া বলরামের দিকে তাকাইল: খবরদার, ও সব কথা আর ভুলেও মুখ দিয়ে বের করবেন না কোনোদিন। যুদ্ধের সময়, কোন্ দিকে যে কার কান খাড়া হয়ে আছে ঠিক নেই। গভর্ণমেণ্ট এ সব কথা জানতে পারলে আপনাকে ডিফেন্স্ অফ ইণ্ডিয়া আইনে ধরে নিয়ে যাবে।

সর্বনাশ! সভয়ে বলরাম বলিলেন, না, না, ও সব কথা আমি বলতে যাব কেন। কী দরকারটা পড়েছে আমার। ওই ওরা সব আলোচনা করছিল—

—ওরা কারা?

মণিমোহন অনেকটা যেন ধমকাইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল খানিকটা। বলরাম আবার অনুভব করিলেন মণিমোহন এখন অনেকটা বদলাইয়া গেছে, আজ অনেকটা দূরত্ব রাখিয়া এবং অনেকখানি সতর্ক হইয়াই কথা বলিতে হইবে তাহার সঙ্গে। গর্ব ও আনন্দের যে তরঙ্গটা একটু আগেই মনের মধ্যে উছলাইয়া উঠিতেছিল, মুহূর্তে সেটা স্তিমিত সংকোচে শান্ত হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ময় টাকটি একটুখানি চুলকাইয়া লইয়া বলরাম কহিলেন, এই খাসমহালের যোগেশবাবু, হালদার মিঞা, গালু বিশ্বাস—

নিষেধ করে দেবেন, সবাইকে নিষেধ করে দেবেন। সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে, তাই না? শুধু জেনে রাখবেন আমরা জিতছি, আমরা জিতবই। বেশী কৌতূহল ভালো নয়, সময় বিশেষে সেটা দস্তুর মতো মারাত্মকও হয়ে উঠতে পারে—জানেন তো?

মণিমোহন আবার বলরামের দিকে চাহিয়া হাসিল। কিন্তু এবারে তাহার হাসিটা আর তেমন করিয়া বলরামের ভালো লাগিল না। কোথায় কী একটা যেন খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে, একটা আবরণ বেদনার বোঝায় সমস্ত মনটা ভারী হইয়া রহিল।

—যা বলেছেন।

বলরামের তরফ হইতে হাসিবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে সমস্ত মনটা। যে দিনগুলি যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না নতুন করিয়া। কাল বদলায়, পৃথিবী বদলায়। চড়া পড়িয়া তেঁতুলিয়ার উদ্দাম করাল স্রোত মন্থর হইয়া আসে। সেদিনের সেই তরুণ শান্ত মণিমোহন আজ রাশভারী একটা হাকিম হইয়া ফিরিয়াছে চর-ইসমাইলে।

চা আসিল।

মণিমোহন একটা পেয়ালা আগাইয়া দিয়া কহিল, খান কবিরাজ মশাই।

সোনালি ফুল-কাটা পেয়ালাটায় সোনালি রঙের চা কবিরাজ মুখের সামনে তুলিয়া লইলেন। অত্যন্ত গরম। খানিকটা চা ডিসে ঢালিয়া লইয়া বলরাম এক মনে চুমুক দিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন শুধু এই জন্যেই তিনি এখানে আসিয়াছেন—হাকিমের সঙ্গে বসিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই তাঁহার নাই। সোনালি পেয়ালায় সোনালি চাটা বেশ ভালো লাগিতেছে, ঘরের মধ্যে জমিয়া থাকা অস্বস্তির বোঝাটা যেন সরিয়া যাইতেছে একটু একটু করিয়া।

মণিমোহন বলিল: হাঁ, যে জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার স্ত্রীর ভারী সখ, এই সব নদী নালা দেশে একটু বেড়িয়ে যাবেন। তাই তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কী বিভ্রাট দেখুন, পথে আসতে আসতেই ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়েছেন। আপনি একটু দেখে যান তাঁকে। ডাক্তারখানায় খবর পাঠিয়েছিলাম, ওষুধ-বিষুধ কিছু নেই সেখানে। মহা-মুস্কিলেই পড়া গেছে। আপনার কথা শুনে তো আরো বেশী ভয় ধরে গেল। আপনি একটু দেখুনদিকি।

—বেশ তো—চায়ের ডিসে শেষ চুমুক দিয়া বলরাম বলিলেন, বেশ তো।

চাকরটা সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। মণিমোহন বলিলেন, মেম সায়েবকে তৈরী হতে বল, কবিরাজ মশাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন ভেতরে।

মেম সাহেব! আর একটা অপরিচিত শব্দ বলরামের কানে আঘাত করিল। চাকরটা চলিয়া গেল খবর দিতে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্বরটা বেশি নাকি?

—না, তেমন বেশি নয়। তবে যা দিনকাল—বোঝেন তো।

—তা তো বটেই।

চাকর আসিয়া জানাইল মেম সায়েব তৈরী হইয়াই আছেন, কবিরাজ মশাই স্বচ্ছন্দে ভেতরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতে পারেন। মণিমোহন কহিল, চলুন। সংশয়গ্রস্ত পা দুইটাকে টানিয়া বলরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে একখানা ডেক চেয়ারে গলা পর্যন্ত শাল টানিয়া দিয়া মেম সায়েব চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হইবে, শ্যামবর্ণ সুশ্রী মুখখানি দেখিলে তাঁহাকে কিছুতেই হাকিমের গৃহিণী বলিয়া কল্পনা করা চলে না, অথবা মেম-সায়েব বলিয়া ডাকিতেও ইচ্ছা হয় না। অসুস্থতার ছোঁয়াচ লাগিয়া মুখের উপর বিষণ্ণ ক্লান্তির পাণ্ডুর একটা ছায়া পড়িয়াছে। ডেক-চেয়ারের হাতলের উপরে উঠিয়া বছর চারেকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলে বসিয়া আছে; অত্যন্ত গম্ভীর মুখ—যেন মায়ের অসুখ দেখিয়া নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে এবং এ অবস্থায় কী যে করিবে স্থির করিতে না পারিয়া আমসত্ত্বর টুকরোর মতো কী একটা কালো জিনিস দুই হাতে প্রাণপণে চাটিতেছে, কনুই পর্যন্ত আঁঠা আর লালা জমিয়াছে।

—আমার স্ত্রী। আর ইনি আমার পুরোণো বন্ধু—এখানকার কবিরাজ মশাই।

মেমসায়েব দু হাত তুলিয়া কবিরাজকে নমস্কার জানাইলেন।

চেয়ারের হাতলে বসিয়া থাকা ছেলেটি কী বুঝিল সেই জানে, সেও মার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করিল। খাতের টুকরাটা হাত হইতে পড়িয়া গেল মেজের উপরে।

—ভাখো, ভাখো, কাণ্ড দেখো ছেলের। কী রকম অসভ্য একটা চাবার মতো চকোলেট খেয়েছে। রাগ করিতে গিয়া মণিমোহন হাসিয়া ফেলিল।—ওরে পিয়ারী, বাইরে নিয়ে গিয়ে হাত মুখ ভালো করে ধুইয়ে দে তো।

মেমসায়েব মৃদু সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, ওর কাণ্ডই তো এই।

চাকর আসিয়া ঝিণ্টুকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। একটা তীব্র প্রতিবাদ জানাইবার ইচ্ছা ছিল ঝিণ্টুর, কিন্তু সাম্‌নে অপরিচিত লোক দেখিয়া সে আত্মসংবরণ করিল।

—হাতটা দেখাও রাণী।

মেমসায়েব হাত বাহির করিয়া দিলেন। সুডোল আঙুলে লাল পাথরের একটি আংটি। মুখের তুলনায় হাতখানির রঙ যেন বেশি ফর্সা, যেন আংটির সোনার রঙটা দেহের রঙের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে, আর লাল পাথরটা দীপ্তি পাইতেছে এক-বিন্দু রক্তের মতো। চারগাছি চুড়ি এক সঙ্গে ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিয়া মিষ্টি খানিকটা আওয়াজ দিল।

নরম সুডোল হাতখানি মুঠোর মধ্যে টানিয়া লইলেন বলরাম। মনের মধ্যে একটা অলক্ষ্য তন্ত্রী কী যেন মীড় মূর্ছনায় থাকিয়া থাকিয়া অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে। এই রকম একখানি হাতের স্পর্শ একদিন তাঁহারও জীবনকে মধুময় সম্পূর্ণতার ইঙ্গিত জানাইয়াছিল কিন্তু—সে স্পর্শ কার? সেই বা আজ কোথায়?

নিজের ভাবনার মধ্যে তলাইয়া থাকিয়াই বলরাম কিছুক্ষণ অনুভব করিলেন নাড়ীর স্পন্দনটা। তারপরে হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই, সামান্য কফাশ্রিত জ্বর। আমি গিয়ে একটা পাচন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তাড়াতাড়ি সেরে যাবে তো? যা চারিদিকের অবস্থা, তাতে—

—না, না, কোনো ভয় নেই। কালই ছেড়ে যাবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমি বরং এখন আসি তা হ'লে—নমস্কার করিয়া কবিরাজ বাহির হইয়া পড়িলেন: বিকেলেই আবার না হয় খবর নেবো এসে।

মণিমোহনও কবিরাজের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা বাহির হইয়া আসিল।

—আচ্ছা কবিরাজ মশাই!

—বলুন!

—এখানকার পোষ্টমাষ্টারটিকে মনে নেই আপনার? সেই যে কী রকম একটা পাগল লোক—কী নাম?

—হরিদাস সাহা।

—হাঁ, হাঁ, হরিদাস সাহা। এখানে আছেন তিনি?

—নাঃ।—বলরাম একটা দৃষ্টি মেলিয়া আকাশের দিকে তাকাইলেন। উজ্জ্বল নীল আকাশে সাদা মেঘ যাযাবরের মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছে, অমনি করিয়াই একদিন দূর-বিস্তৃত পৃথিবীর উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে কোন্ শূন্য দিগন্তে মিলাইয়া গেছে? হরিদাস। বলরাম আবার বলিলেন, নাঃ, অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

—বেশ লোকটা ছিল, তাই নয়? ভারী অদ্ভুত লোক।

—হুঁ।—হরিদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যেন বলরামের ভালো লাগিতেছে না। অত্যন্ত অকারণে মনটা ব্যথাতুর আর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—ওই যোগাযোগে বড় বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে মুক্তোকে—বড় বেশি করিয়া যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিতেছে দশ বৎসরের পুরোণো ক্ষতটাকে।

বলরাম বলিলেন, তা হলে আমি যাই। অনেক কাজ আছে। চার দিকে জ্বর—ব্যারামের জন্যে ডাকের আর কামাই নেই কি না।

—আচ্ছা আসুন। বিকেলে মনে করে একবারটি খবর দেবেন কিন্তু। আর একটা কথা। নাঃ, থাক, আসুন আপনি।

টাকের উপরে রৌদ্রের আলোটা জ্বালা করিতেছে। ছাতাটা খুলিবার জন্য দাঁড়াইতেই বলরামের কানে ভাসিয়া আসিল মায়ের গলার সস্নেহ তিরস্কার: ছিঃ ঝিণ্টু, এখন কোলে উঠবার জন্যে দুষ্টুমি করতে নেই। আর ওই ভদ্রলোকের সামনে কী অভদ্র ভাবে তুমি চকোলেট খাচ্ছিলে বলো তো? উনি কী যে ভাবলেন—

পলকের জন্যে কী একটা অর্থহীন আকর্ষণে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দ্বিগুণ বেগে চলিতে সুরু করিলেন বলরাম। এ একটা স্বতন্ত্র জীবন—এ একটা প্রেম এবং আনন্দের নতুন অমৃত লোক। এখানে বলরামের অধিকার নাই, এই স্বর্গ হইতে তিনি নির্বাসিত। কিন্তু কেন? কেন এমন হইল? কেন আজ রাধানাথকে আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গ দিন তাঁহাকে কাটাইতে হয়? মরিয়া গেলে মুখে একটুখানি আগুন ছোঁয়াইবে এমন লোকও তো আশে পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এ অধিকার হইতে কে তাঁহাকে বঞ্চিত করিল? ইচ্ছা করিলে একটার জায়গাতে তিনটা বিবাহ অত্যন্ত অনায়াসেই কি তিনি করিতে পারিতেন না? আর তাহা হইলে এমনি করিয়াই তাঁহার ঘর ভরিয়া সন্তান দেখা দিত, এমনি করিয়াই সব কিছু—

—কিন্তু! কিন্তু বলরাম আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছিলেন। ঘর বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন মিথ্যার উপরে। তাহার শাস্তি তিনি পাইছেন, ভালো করিয়াই পাইয়াছেন। এই শূন্যতা, এই নিঃসঙ্গতা, এ তাঁহারই অপরিহার্য্য কর্মফল। অকস্মাৎ নিজের উপরে একটা সুতীব্র অর্থহীন বিদ্বেষে আচ্ছন্ন হইয়া গেল বল-রামের মনটা। দ্রুতবেগে তিনি চলিতে লাগিলেন—অনেকগুলি রোগী পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, এ সব অবান্তর ভাবনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সময় কাটাইলে তাঁহার চলিবে না।

আর ওদিকে মণিমোহনও তাঁহার গন্তব্য-পথের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

একটা কথা তাহার মনে পড়িতেছিল, ভাবিতেছিল একবার বলরামকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় ব্যাপারটা। কিন্তু প্রশ্ন করিতে গিয়াই খেয়াল হইল সে সব বলরামের জানিবার কথা নয়। মণিমোহন উদ্যত জিজ্ঞাসাটা মনের মধ্যে টানিয়া লইল। কিন্তু কথাটাকে ভোলা যাইতেছে না কিছুতেই।

সে কি ভুলিবার। দশ বছর আগেকার কথা—কিন্তু মনের দিকে চাহিলে মনে হয়, এই তো সেদিন। কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়িয়া যেমন জল্ জল্ করিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্মৃতি-

বিস্মৃতির পটভূমিকার উপরে সেই লেখাটা ক্ষয়হীন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

…সেই ঝড়ের রাত্রি। দুটি নীলার মতো চোখ হইতে বিষাক্ত কামনার আলো যেন ছুরির ফলার মতো বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরে গর্জন করিতেছে ঝড়। ধূলার ঘূর্ণিতে বাগানটা অন্ধকার হইয়া গেল। মড় মড় শব্দ করিয়া কী একটা ভাঙিয়া পড়িল—একখানা ডাল, অথবা আস্তো গাছই একটা। তার ঝাপ টায় জানালার পাল্লা দুইটা হতাশভাবে বারে বারে আছড়াইয়া পড়িতেছে। বড় বড় ফোঁটায় শব্দ করিয়া ডানায় বৃষ্টি উড়িয়া আসিতেছে—চড়বড় চড়বড়—যেন একদল ঘোড়সওয়ার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ছুটিয়া গেল। তারপর দুইটি কঠিন আর কোমল বাহুবন্ধন—সাপের আলিঙ্গনের মতো। চুলের গন্ধটা ক্লোরোফর্মের কাজ করিয়া তাহাকে যেন ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়াছিল। ছোঁয়া দেখাইয়া সেদিন সেই ভালোবাসা আদায় করিয়া নেওয়া। প্রেম নয়—কামনা। সুধা নয়—মদিরা।

তারপরে আর একটি রাত। সেদিনকার সেই বিজয়িনীই সেই রাত্রে আসিয়াছিল আশ্রয়ার্থিনী হইয়া। বোটের মধ্যে মারো অন্ধকার। নীচে নদীর জল যেন কল কল করিয়া কাঁদিতেছে—কোথায় চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল নিশাচর পাখী। রাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেয়েটি, তাহাকে ভালো করিয়া দেখা যায় না, চেনাও যায় না। অসংলগ্ন মন লইয়া সেদিন কত কী ভাবিয়াছিল মণিমোহন—কত কী বলিয়াছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে ওই বিচিত্ররূপা বিদেশিনীকে সে জড়াইয়া লইতে চাহিয়াছিল একান্ত করিয়া। কিন্তু মেয়েটি কর্ণপাত করে নাই সে কথায়। অন্ধকারের মধ্যে যেমন রহস্যময়ী হইয়া সে দেখা দিয়াছিল, তেমনি রহস্যময়ীর মতোই মিলাইয়া গেছে।

যদি সেদিন সে রাজী হইয়া যাইত মণিমোহনের প্রস্তাবে? যদি সেদিন সত্যিই বাস্তবীরূপে আসিয়া তাহার জীবনকে অধিকার করিয়া বসিত, তাহা হইলে? তাহা হইলে আজকের মণিমোহন সম্পূর্ণ নতুন রূপ লইয়া দেখা দিত। সংগ্রাম আসিত, সংঘাত আসিত। কর্মজীবনের ধারা উল্টা দিকে বহিত, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইত কোন্ একটা অনিশ্চয়তার কণ্টকাকীর্ণ তার—কোথায় যে সে ভাসিয়া যাইত কে জানে। তার চাইতে এই তো ভালো। উন্নতির বাঁধা পথ—জীবনের সুনিশ্চিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিসমাপ্তি।

ঘরের মধ্যে ঝিণ্টু হাসিতেছে—রাণী হাসিতেছে। সুখের জীবন, পরিতৃপ্তির জীবন। এই ভালো, এই ভালো। রাণী সুখী হইয়াছে, সে সুখী হইয়াছে, সবাই সুখী হইয়াছে।

সে সুখী হইয়াছে?

এই নদীর দেশ—প্রাগৈতিহাসিক দেশ। এখানে আসিয়া মনের সুরটা যেন অদ্ভুতভাবে বাজিয়া উঠিতে চায়। সৃষ্টিছাড়া দেশে আসিয়া সৃষ্টির নিয়মটাকেই যেন বদলাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। ভালোমন্দের সংজ্ঞাটা নতুন করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছা হয় একবার। (ক্রমশঃ)

বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তি

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি-টি

দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির লিপি বোধহয় (১) বাংলার সেন রাজগণের প্রাচীনতম লেখ। প্রশস্তি-রচয়িতা উমাপতি ধর সুকবি ছিলেন। অপূর্ব শব্দ-চয়ন নৈপুণ্য এবং ছন্দ-মাধুর্যে শ্লোকসমূহ সত্যই চিত্ত-হারী। কিন্তু ইহার ফলে উল্লিখিত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ-ধারণা করা সুকঠিন। এ কারণে উনবিংশতিতম শ্লোকের প্রকৃত অর্থ আজও নির্ণীত হয় নাই।

বিজয় সেনের বীরত্ব মহিমা কীর্তন করিতে কবি বলিয়াছেন :

> দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতি ভৃতামুর্বী মুরীকুর্বতা
> বীরাসৃগ্ লিপি লাঞ্ছিতোঽসি রমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
> নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
> তত্রাকৃষ্ট কৃপাণধারিণি গতাভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ॥

দিব্যভুবঃ' বলিতে 'স্বর্গের স্থান' বুঝাইতে পারে। শ্লোকের অর্থ হয় 'বিজয় সেন শত্রুদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া (নিধন করিয়া) তাহাদের রাজ্য গ্রহণ করিতেন।' কিন্তু অনেকে মনে করেন(২) 'দিব্যভুবঃ বলিতে দিব্যের রাজ্য (রাম চরিতের 'দিব্য-বিষয়') বুঝাইতেছে। বিজয় সেন তাঁহার শত্রুকে দিব্যের (বরেন্দ্রীর বিদ্রোহী নায়ক দিব্বোকের) রাজ্য দিয়াছিলেন। রামপাল বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি উদ্ধার করেন। সে সময় নিদ্রাবলের বিজয়রাজ নামে জনৈক সামন্ত তাঁহার সহায়ক ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এই বিজয়রাজ এবং বিজয় সেন একই ব্যক্তি(৩)। সুতরাং 'প্রতিক্ষিতিভৃৎ' বলিতে রামপালকে বুঝাইতেছে কারণ পরবর্তীকালে সেনরাজ কর্তৃক পাল বংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

রামপালের এই বিদ্রোহ দমন কাহিনী সন্ধ্যাকরণ-দী 'রাম-চরিত' কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে পালরাজ নদীতীরস্থ বহু ভূমি এবং বিপুল অর্থদানে সামন্তদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। 'সেবেন ভুবো বিপুল দ্রবিণস্য চ দানতঃ সুখাচক্রে"। বর্তমান শ্লোকে আছে "বীরাসৃগ্ লিপি লাঞ্ছিতোঽসি রমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ"। বিজয় সেন কর্তৃক 'দিব্যভুবঃ' 'প্রতিক্ষিতিভৃতাম্' দানের পূর্বে তাহার অসি কি কারণে বীরাসৃগ্ লিপি-লাঞ্ছিত হইয়াছিল? পালরাজের সহিত যুদ্ধ হয় নাই সুনিশ্চিত। কেহ কেহ মনে করেন যে বিজয় সেন প্রথম বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং তখন পালরাজের সহিত যুদ্ধ ঘটে। রামপাল দেব ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন আর সেনরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৯ বৎসর পর। তাঁহার পিতা রাজরক্ষা সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি "নিজভুজমদমত্তারাতি-

(১) বীরভূম জেলার পাইকোরে 'রাজেন শ্রীবিজয় সে' লিপিসংযুক্ত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার তারিখ নাই। (P, 4, Paul Early Hist of Bengal I P 89)

(২) Proc. 3rd Ind. Hist. congress P. 534; I. H. Q XIX pp 186-187.

(৩) R. D Banerji বাংলার ইতিহাস I p 262 H. C. Roy Choudhury-studies in Ind Antiquities P 158 Rama charita (V. R. S. Ed) P XXVII প্রথম এবং তৃতীয় পুস্তকে বিরুদ্ধ মত আছে।

মারাঙ্কবীরঃ"। এই 'নিজভুজমদমত্ত অরাতি' পালরাজ না হইয়া বিদ্রোহ নায়ক দিব্বক বা রুদক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আর বিজয়রাজ রামপাল প্রদত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু স্বীয় রাজ্য (দিব্যভুবঃ) তাঁহাকে দিবেন কেন? শ্লোকে যে রাজ্য বিনিময়ের ইঙ্গিত আছে, তাহার সমর্থন মিলে না। অপর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। এখানে পালরাজ গৌড়ের কোন উল্লেখ নাই। আছে, পরবর্তী শ্লোকে (৪) 'গৌড়েন্দ্রমদ্রবৎ'। ঐ শ্লোকের প্রথম পাদে যেন দুইটি ঘটনার মধ্যে একটু সময়ের দূরত্ব বুঝাইতেছে। এই "প্রতিক্ষিতি ভুৎ" এবং "দ্বিষাং সন্ততিঃ" সেন বংশের অপর কোন শত্রুকে ইঙ্গিত করিতেছে কি?

রামচরিতে উল্লিখিত হরি যে বিক্রমপুরাধিপতি হরিবর্মা হইতে অভিন্ন সে কথা সম্প্রতি নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।(৪ক) সুতরাং হরিবর্মা বিজয় সেনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট রাঢ় অঞ্চলে একটি সরোবর খনন এবং নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাঢ়ারামজলাহৃ জাঙ্গল পথগ্রামো কণ্ঠস্থলী
সীমাসু ভ্রমমগ্ন পান্থ পরিষৎ-প্রাণাশয়-প্রীণনঃ।
যেনকারি জলাশয়ঃ পরিসর স্নাতাভিজাতাঙ্গনা
বক্ত্রাব্জ-প্রতিবিম্বমুগ্ধমধু পীপুঞ্জাঞ্জিনী কাননঃ॥২৬॥
তেনায়ং ভগবান্ ভবার্ণব সমুত্তারায় নারায়ণঃ
শৈলে সেতুরিব প্রসাধিত ধরা পীঠঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ॥২৭॥

বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনে আছে যে সেনরাজগণের অনেকে রাঢ়ে রাজত্ব করেন। সীতাহাটীর অনতিদূরে অবস্থিত নিড়োল গ্রাম বিজয়রাজের নিদ্রাবল হইতে পারে। সেন রাজগণের শাসনোল্লিখিত বহু স্থান এই রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত। সুতরাং প্রায় একই সময়ে রাঢ়ে দুইটি রাজশক্তির প্রাধান্য দেখা যায়।

হরিবর্মের রাজ্যসীমা তাঁহার অজ্ঞাতনামা পুত্রের রাজত্বকালেও কিছুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল কারণ ভবদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এ সময়ের ঘটনা। (৫) পরবর্তী বর্মরাজ সামলবর্মার বজ্রযোগিনী শাসন ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রদত্তভূমির বর্ণনা বুঝা যায় না। তৎপুত্র ভোজবর্মার বেলাব শাসন কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় রাবদেবপুর গ্রাম। (৬) দানগৃহীতা সিদ্ধল গ্রামীয়। তবে তিনি বোধহয় স্বগ্রামবাসী ছিলেন না; কারণ প্রদত্তভূমি বহুদূরবর্তী। পরবর্তী কোন বর্ম রাজার নাম জানা যায় না। আর ভাগীরথী তীরবর্তী ভূমির তাম্রশাসন পাওয়া গেল ঢাকা জেলায় প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের তীরে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে ভোজবর্মের রাজ্য ভাগীরথীর পূর্বতট পর্যন্ত ছিল এবং পরবর্তী কালে উহাও বর্মবংশের হস্তচ্যুত হয়।

রামচরিতে উল্লিখিত আছে যে জনৈক প্রাগদেশীয় বর্মনরপতি স্বপরিত্রাণ নিমিত্ত রামপালের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করেন (৭) কেহ কেহ মনে করেন (৮) যে রামপাল বঙ্গ আক্রমণ করিলে বর্মবংশীয় রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ঘটনসমূহ বিবেচনা করিলে এরূপ অনুমানের সমর্থন মিলে না। রামপালের রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে নান্যদেব বিজয়সেন প্রভৃতি কর্ণাটকগণের অভ্যুত্থান হইতেছিল। উড়িষ্যায় চোড়গঙ্গের প্রবল প্রতাপ। এমতাবস্থায় রামপালের মত বুদ্ধিমান নরপতি চির সুহৃদ্ বর্মদের রাজ্য আক্রমণ করিবেন ইহা সম্ভব নহে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের মতে (৯) বর্মবংশে গৃহবিবাদের ফলে ঐ বংশের কেহ রামপালের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। হরিবর্মের পুত্রের পর রাজা হন হরির ভ্রাতা সামল। ইহাতে গৃহবিবাদের সম্ভাব্যতা দেখা যায়। কিন্তু রামপাল কি সুহৃদ পুত্রের বিপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন? হরির পুত্র তো পরাজিত হন। রামপাল পরাজিত পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকর নন্দী তাহা উল্লেখ করিতেন না। সামল বর্মের বজ্রযোগিনী শাসনে হরি এবং তাহার পুত্রের উল্লেখ আছে, নাই ভোজবর্মের বেলাব শাসনে। সুতরাং গৃহবিবাদ অনেক পরবর্তী ঘটনা। সে সময় রামপাল জীবিত ছিলেন না।(৯ক) এসব কথা বিবেচনা করিলে প্রশ্ন আসে বর্মনরপতি কাহার নিকট হইতে পরিত্রাণের জন্য রামপালের শরণ লইয়াছিলেন।

আমার ধারণা দেবপাড়া প্রশস্তির উনবিংশতিতম শ্লোকে বর্ম এবং সেন রাজাদের দ্বন্দ্বের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়সেন বর্মরাজ্য আক্রমণ করিলে বর্মনরপতি মিত্র রাজ রামপালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রামপাল বিজয়সেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কলিঙ্গ পর্যন্ত (১০) অগ্রসর হন। ফলে যে সন্ধি হয় তাহাতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল বিজয়সেনের অধিকারে চলিয়া যায়। কিন্তু গঙ্গাতীরে যে রাজ্যাংশ তিনি রামপালদেবকে সাহায্য করিয়া পাইয়াছিলেন (১১) তাহা হস্তচ্যুত হয়। এই যুদ্ধেই বিজয়সেনের অসি বীর শোণিতে পত্রীকৃত হয় এবং রাজ্যবিনিময় ঘটে। পরবর্তীকালে বর্মগণ নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে ঐ "প্রাগের পত্রীকৃত" অসির সাহায্যে তিনি বর্মদিগকে পরাজিত করেন এবং "ভঙ্গংগতা দ্বিষাং সন্ততিঃ"। সেনরাজাদের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের অনুল্লেখ এই অনুমান সমর্থন করে। কেহ কেহ মনে করেন (১১) বঙ্গ তখন পালরাজাদের শাসনাধীন ছিল তাই উহার পৃথক উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু পালবংশীয়গণ পুনরায় বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণাভাব। দেবপাড়া প্রশস্তির শ্লোক বিন্যাসে দেখা যায় যে উনবিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত ঘটনা বিজয়সেন কর্তৃক গৌড়পতিকে পরাজয়ের পূর্ববর্তী। বিজয়সেন ১১৪০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গোপালদেবকে নিহত করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন (১২) তাহার বিশ বৎসর পূর্বে ১১২০ খৃষ্টাব্দে রামপাল দেহত্যাগ করেন (১৩) এই সময় মধ্যে বিজয়সেন বর্মদিগকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাই আলোচ্য শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মত মস্তু ভবতাম্

(৪) ত্বং নান্য বীর বিজয়ীতিগিবঃ কবীনাং শ্রুত্বান্যথামনন রূঢ় নিগূঢ় রোষঃ। গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

(৪ক) Dr. D. C. Sircar 'ভারতবর্ষ ১৩৪৮ পৃ ৭৭৪; Dr. R. C. Majumder Ramcharita (V. R. S. Ed) P XXXIII Dr. N. K. Bhatta-ali I. H Q. XIX P. P. 126—138.

(৫) তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতি বর্মানুগা বহুল কল্পলতেব লক্ষ্মী। ভবদেবের প্রশস্তি পূর্বে ভুবনেশ্বর অনন্ত বাসুদেব প্রশস্তি নামে পরিচিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভবদেব প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভুবনেশ্বরে হইতে পারে না। উহা রাঢ়ে কোথাও ছিল। (Proc 3rd Ind Hist. Cong pp 287)

(৬) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৯ পৃ ৮-৯

(৭) স্ব পরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্ দিশীয়েন
বর বারণেন চ নিজস্যন্দন-দানেন বর্মণারাধে॥

(৮) বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ২৬৭, Early Hist of Bengal 1 p 65. (৯) I. H xix p 133. (৯ক) "রামচরিতের ৪র্থ পরিচ্ছেদ (৩৭ ও ৪০ শ্লোক) হইতে মনে হয় যে হরিবর্মা মদন পালের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।" ভারতবর্ষ ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ। (১০) জগদবতিম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান নিঘ্নন্ রামচরিত ৩।৪৫। (১১) "তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ বরেন্দ্রে' কুলশাস্ত্রের এই উক্তির সহিত রামচরিতে উল্লিখিত নদী তটে ভূমিদান কাহিনী এবং আলোচ্য শ্লোকের "দিব্য ভুবঃ" কথা বিবেচনা করিলে এ সিদ্ধান্তেই আসা যায়। (১২) I. H- XVII p 222 (১৩) I bid seka Subhodaya (Dr. Sen's edition p 9) ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় শ্লোকটির পাঠ শুদ্ধ করিয়াছেন—শাকে যুগ্মক রেণু চন্দ্রগণিতে কল্যাম্ গতে ভাস্করে। Prof. D. C. Bhattacharya I. H. III p 583

পেলে তার সন্ধান

শ্রীঊষা মিত্র

১

প্রথম হেমন্তের শিশির হাওয়ার ছোঁয়া এসে লাগ্‌ছে বঙ্গ-জননীর পাণ্ডুর ললাটে। যেন তাঁরই চোখের অশ্রুবিন্দুর মত হিমবিন্দু ঝরে প'ড়ছে প্রাসাদ-শিখর হ'তে জীর্ণতম কুটীরের পরিত্যক্ত অঙ্গনে, লতা-গুল্মে, তৃণদলে—সর্ব্বত্র। সোনার ফসলভরা ক্ষেতে উৎসাহ-ভরা মুখ চাষার দল আর চোখে পড়ে না। গ্রামের মাঠে ঘাটে কলরব-মুখর শিশুর দল আর ঘুরে বেড়ায় না। "বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ" দেখা যায় না ঘাটের পথে। হতাবশিষ্ট যারা বা ফিরে এসেছে গ্রামে, কোনমতে নিজেদের ভগ্নজীর্ণ শরীরগুলো টেনে নিয়ে কষ্টে, তারা দৈনন্দিন কাজগুলো ক'রে চলে।

২

মৃত্যুঞ্জয় বল্‌লে—নবীন। তুমি ত অল্পদিন ফিরেছো। আসবার আগে কিরণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ওকে নিয়ে এলে না কেন?

নবীন উত্তর দিলে—দেখা হয়েছিল, আসতেও ব'লেছিলাম; সে সহর ছেড়ে আসতে ত' চায় না।

মৃত্যুঞ্জয় খেদের সঙ্গে বল্‌লে—আসবেই বা কার কাছে? থাক্‌বে কোথায়? খাবে কি? দোষ তার কিছু নেই।

কিরণ মৃত্যুঞ্জয়ের দূরসম্পর্কে জ্ঞাতির মেয়ে। বিয়ের পর গ্রামে আর বেশী আসা-যাওয়া ছিল না; দেখাশোনাও আর বিশেষ হ'ত না। বিপদের বন্যায় যেদিন গ্রামগুলির প্রায় সকলেই একসঙ্গে ঘর ছেড়ে বাহির হ'তে বাধ্য হ'লো, সেই সঙ্কট সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ও কিরণ মাসকয়েক একসঙ্গে কাছাকাছি বাস ক'রেছিল নগরের প্রান্তে একটি নিতান্ত দুর্দশাপন্ন স্থানে। তারপর, প্রায় সবার আগেই, মৃত্যুঞ্জয় ফিরে এলো গ্রামে। তার উঁচু ভিতের দু-চারখানা ঘর তখনো ছিল বাস করার যোগ্য। আসবার সময় নগরীর জনস্রোতে কিরণ যে কোথায় গিয়ে প'ড়েছিল, সন্ধান পায়নি মৃত্যুঞ্জয়। শুধু এইটুকু শোনা গিয়েছিল, আত্মীয়স্বজন, স্বামী সন্তান—অনেককে সে হারিয়েছে। গ্রামবাসী কেউ ফিরে এলেই মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে কিরণের কথা; এ যেন তার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল।

৩

ধোঁয়ায়ভরা আকাশের নীচে সহরের রাজপথগুলি মনে হয় যেন অপেক্ষাকৃত জন-বিরল হ'য়ে এসেছে। সকাল হ'তে সন্ধ্যা অসংখ্য বুভুক্ষিতের হাহাকার আর তেমন ক'রে শোনা যায় না; কতক গিয়েছে জন্মের মত চ'লে, কতক প'ড়েছে নানাদিকে ছড়িয়ে। নির্ব্বিকারভাবে বিস্তৃত রাস্তাগুলি পূর্ণ ক'রে কঙ্কালসার নিরুপায়ের দল আর প'ড়ে থাকে না আগের মত। তবুও কিন্তু তারই মধ্যে সরু পথগুলির ভিতর হ'তে শোনা যায় মর্ম্মভেদ বেদনার আর্ত্তনাদ! অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা অনুপাতে কম হ'লেও, অগ্রাহ্য করবার মত নয়।

সরু একটি গলির মধ্য হ'তে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসচে কিরণ,—কোলে তার পাঁচ বৎসরের ছেলে—শঙ্কর। শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে একবার চেয়ে দেখ্‌লে ছেলের জীর্ণ শরীরটির দিকে; কম্পিত হাতে স্নেহভরে স্পর্শ ক'রলে শিশুর তপ্ত ললাট; অল্পদূরে এসেই সে ব'সে প'ড়্‌লো ফুটপাথের উপর। ক্লান্তি ও চিন্তা আজ তাকে সকল রকমে অবসন্ন ক'রেছে। প্রথমে ছিল ছেলে ও মেয়েতে মিলে তার চারটি। একটিকে গ্রাম ছাড়বার আগেই সে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে; সবার ছোটটিকে এই পথেরই ধারে আবর্জ্জনা-কুণ্ডের পাশে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছে নিজের হাতে সে। আর একটিকে নিয়ে গিয়েছে হাসপাতালের গাড়ী;—আর সে ফিরে আসেনি। অবশিষ্ট এই সন্তানটিকে কেন্দ্র ক'রে তার ভীরু হৃদয়ের উদ্বেগ ও শঙ্কা এবং সকল স্নেহ পুঞ্জিত হ'য়ে আছে। তাই তার এতটুকু পীড়া কিরণের সমস্ত মনটিকে আকুল ক'রে তোলে এমন করে। আত্মীয়স্বজন তার যারা ছিল, এখানে এত দুর্দশার মধ্যেও যাদের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পেয়েছিল, এক এক ক'রে কে কোন্ পথে চলে গিয়েছে, কেউ বা নিয়েছে চির-বিদায়! স্বামীরও সন্ধান সে পায়নি বহুদিন। তবু মৃত্যু-সংবাদ পায়নি বলেই আজও আশায় আশায় আছে।

শঙ্কর কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়্‌লো। তারই মুখের দিকে চেয়ে আবার সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো তার হারানো সন্তানগুলির কথা। এখন সে শঙ্করের জন্য পায় প্রতিদিনই একটু ক'রে দুধ, অন্নসত্র প্রভৃতি থেকে খিচুড়ী বা মণ্ড যা পায়, তাও দু'জনের উপযুক্ত; গৃহস্থ-বাড়ীতে কিছু কিছু কাজ ক'রে সামান্য উপার্জ্জন করে। এখানে আসার পর প্রথমেই যদি এটুকু সুবিধা পেতো, তাহ'লে হয়ত তার অন্য সন্তানগুলি এমন ক'রে তাকে ছেড়ে যেতো না। তবু শঙ্করকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার আগ্রহ তাকে বন্দী ক'রে রেখেছে আজও এই সহরে। গ্রামে যে আর কেউ নেই তার; সেখানে ফিরে গিয়ে ওকে কি সে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারবে?

একটা অজানা আশঙ্কায় ম্লান হ'য়ে আসে তার মুখ। কয়েক দিন ধরেই সে শুনছে অনেকের কাছে, তাদের মত লোকেরা আর থাকতে পাবে না এই সহরে। কোথায় যাবে, কেন যাবে,—কিছু সে জানে না। আশঙ্কায় শিউরে ওঠে তার সমস্ত অন্তর; কেঁপে ওঠে সারা দেহ। রাস্তায় সে মাঝে মাঝে দেখেছে একরকমের বড় খোলা গাড়ী,—তারই মত সর্ব্বহারা মানুষদের বাস্তে বোঝাই ক'রে নিয়ে যায় কোন্ অপরিচিত স্থানে। হিংস্র অতিকায় পশুকে মানুষ যতখানি ভয় করে, তারও চেয়ে বেশী ভয়ে শঙ্করকে বুকে চেপে নিয়ে যে কোনও একটা গোপন স্থানে সে লুকিয়ে থাকে, পাছে তাকেও হ'তে হয় ওদের সহযাত্রী।

৪

"রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়" দাওয়ার উপর একখানি মাদুর বিছিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্রাম ক'রছিল। রান্নাঘরের ওদিক হ'তে

একটা বিড়াল-ছানার ডাক্ শোনা যাচ্ছে ; উত্তরের অশথ গাছ হ'তে ঘুঘুর একটানা করুণ সুর ভেসে আস্ছে কানে। তন্দ্রাঘোরে মৃত্যুঞ্জয়ের মনোরাজ্যে জেগে উঠ্ছে—কতশত হারানো দিনের কাহিনী।

সহসা কার পদশব্দে স্বপ্ন যায় টুটে। নিদ্রালস মনটাকে বাস্তবতার মধ্যে সচেতন ক'রে নিয়ে উঠে বস্‌লো—মৃত্যুঞ্জয়। সামনের দিকে চেয়ে হর্ষে বিস্ময়ে, সে প্রায় চিৎকার ক'রেই ব'লে উঠ্‌লো,—"আরে, একি ? সনাতন যে ? কবে এলে ? কোথায় ছিলে এতদিন ? কিরণ কোথা ? তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো ?" —একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন ক'রে সে উৎসুক দৃষ্টিতে সনাতনের মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ল।

শান্তভাবে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে সনাতন দাওয়ার একধারে বস্‌লো ; অবসন্নভাবে শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে বল্‌তে আরম্ভ করলে তার গত কয়েক মাসের কাহিনী। উপায়ান্তরহীন ভাবে পথে পথে কিছুদিন ঘোরবার পর অবশেষে সে একটা কাজ পেয়েছিল। সরকারী যে সব রাস্তা তৈরী হ'চ্ছে, তারই জন্ম কুলী সংগ্রহ করা হ'চ্ছিল। সেই কাজ নিয়ে কুলির দলে সেও চলে যায়। খবর দিতে পারেনি—অকস্মাৎ গাড়ী বোঝাই হ'য়ে তাদের রওনা হ'তে হ'য়েছিল। কোথা যে যেতে হবে তাও তাদের জানা ছিল না। পেটভরে খেতে পেয়ে, সাফল্য ও সচ্ছলতার আশায় প্রলুব্ধ মন ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্নে অভিভূত হ'য়ে গিয়েছিল। অনেকদিন একটানা কাজ করবার পর একমাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। নিজের গ্রামে গিয়ে আত্মীয়-স্বজন কারুরই প্রায় দেখা বা সন্ধান পায় নি। অবশেষে এসেছে এখানে।

মৃত্যুঞ্জয়কে সনাতন বল্‌লে,—আপনি আছেন শুনে আমার মনে ভরসা হ'ল ; জানি,যা হোক্ কিছু খোঁজ পাব আপনার কাছে।

মৃত্যুঞ্জয় তাকে আশ্বস্ত ক'রে বল্‌লে,—নিশ্চয়, নিশ্চয় ; বুড়ো হ'য়েছি, ছুটোছুটি করতে পারিনা, তবু খবর ত' সবারই রাখি। আর আমারই বা কে আছে ? একটামাত্র ছেলে—সেও কারখানার চাকরী নিয়ে চ'লে গেছে।

সনাতন প্রশ্ন করলে,—কাকীমা ?

—সে ত' কলকাতা থেকে ফিরতে পারেনি, গঙ্গায় গেছে।

—বুড়ার চোখে জল বেরিয়ে আসে। ঠিক্ হ'লো সনাতন সেদিন এখানে বিশ্রাম ক'রে কাল সকালেই কিরণের খোঁজে রওনা হবে। লোকের মুখে খবর নিয়ে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় কিরণের ঠিকানা জেনে রেখেছিলেন একরকম।

৫

রাস্তার ধারে সমবয়সী আর কয়েকটি ছেলের সঙ্গে শঙ্কর খেলা করছে। হাসিমুখে তার কাছে বিদায় নিয়ে কিরণ দ্রুতপদে এগিয়ে চল্‌লো অদূরবর্ত্তী বাড়িখানির দিকে। কয়েকদিন হ'ল ঐখানেই সে একটি কাজ পেয়েছে। মনে মনে সে ঠিক্ করেছে মনিবকে ব'লে ঐ বাড়ীতেই সে একটু থাকবার জায়গা চেয়ে নেবে ; যদি পায়, ছেলেটা তার বেঁচে যাবে। এলোমেলো-ভাবে এমনি দু-চারটে কথা তার মনে আস্‌ছে—অন্যমনস্ক ভাবে ঐ বাড়ীটার দরজার কাছে এসে প'ড়েছে প্রায়। ক্ষিপ্র বেগে ছুটে এল একখানা খোলা গাড়ী,—যে গাড়ীকে দেখ্‌লে ভয়ে তার সমস্ত শরীর থর্ থর্ ক'রে কেঁপে ওঠে। কতবারই না কোনমতে আত্মগোপন ক'রে সে পরিত্রাণ পেয়েছে ঐ দানবের মত গাড়ীর কবল হ'তে। আজ কিন্তু পলায়নের কোন পথই সে খুঁজে পেলে না। কি যে হ'লো ভাল ক'রে বুঝ্‌তেও পার্‌লে না। শুধু আরও কয়েকজনের আপত্তি ও আর্ত্তনাদের সঙ্গে মিশে গেল তার কণ্ঠস্বর। সহসা তার অনুভব হ'লো ঐ গাড়ীটার উপরে সেও দাঁড়িয়ে আছে। মর্ম্মান্তিক চিৎকার ক'রে সে লুটিয়ে প'ড়্‌তে গেল'। যেখানে গাছের ছায়ায় শঙ্কর খেলা করছিল ছেলেদের দলে, ব্যগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লে সেই দিকে। ছেলেরা তখন আরও খানিকটা এগিয়ে, পথের বাঁক ঘুরে, একটু দূরে জটলা করছিল,—দেখতে পেলে না কিরণ তাদের। অশ্রুহীন নির্নিমেষ দৃষ্টি পথের পরেই মেলে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

গাড়ীটা মোড় ঘুরতেই হ'লো বিভ্রাট। দু-হাত মেলে আর্ত্ত চিৎকার ক'রে শঙ্কর ছুটে এল' গাড়ীখানার দিকে। সকরুণ মিনতিতে কিরণ জানালে তার নিবেদন,—তার ঐ ছেলেটিকে যেন তুলে নেওয়া হয় তাদের সঙ্গে। কেউ সেকথা বুঝলে কি না কে জানে। গাড়ী ছুটেই চল্‌লো সমান বেগে—বিভ্রান্ত কিরণ পাগলের মত লাফ দিয়ে প'ড়লো চলন্ত গাড়ী হ'তে রাস্তার উপরে! একটা ভীষণ কোলাহল ও আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্ত মধ্যে চারিদিকের 'লোক সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো! দেহটাকে ঘিরে জমে গেল' একটা বড়-রকমের জনতা, তারপর সব নিস্তব্ধ! মন্বন্তরের করাল মূর্ত্তির পেষণেও যে দেহ সম্পূর্ণ হারায়নি তার শ্যামশ্রী, এক মুহূর্ত্তেই সে পরিণত হ'ল রক্তাক্ত প্রাণহীন জড়বস্তুতে ; একদিন স্রষ্টা যাকে নিজ সৃষ্টির গরিমা-মাতৃরূপে-ধাত্রিরূপে রূপ দিয়েছিলেন, আজ তার এই পরিণতি!

পথের পাশে শঙ্কর অব্যক্ত বেদনায় চিৎকার করে অচেতন হয়ে প'ড়েছিল। গোলমালে তার দিকে আর কারো লক্ষ্য হয়নি। হ'য়েছিল একজনের ;—সে সনাতন। শঙ্করের যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলে সে তার বাবার কোলে শুয়ে আছে। ছোট ছোট দুটি হাত দিয়ে শক্ত করে বাবাকে চেপে ধ'রে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কোন কথাই বলবার সাধ্য ছিল না তার।

কিরণকে খুঁজতে এসে অবশেষে সনাতন এই ভাবে পেলে তার সন্ধান।

নববর্ষ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সবাই যাহারে নূতন বর্ষ বলে,
আমি বলি তারে, একটি নূতন পথ,
যাহা ধরি নব ছন্দ লইয়া চলে—
মানব প্রাণের পুরাতন আশা রথ ॥

বেদান্ত ও সূফীমতে সৃষ্টি

ডক্টর রমা চৌধুরী

"সূফী" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশ সূফীর মতে "সূফী" শব্দটী আরবী শব্দ "সফা" হইতে উৎপন্ন। "সফা" শব্দের অর্থ "পবিত্রতা"। অতএব যিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্র, তিনিই একমাত্র "সূফী" নামবাচ্য। যাহা হউক, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে "সূফ্" শব্দ হইতেই, প্রকৃতপক্ষে "সূফী" শব্দটার উৎপত্তি হইয়াছে। "সূফ্" শব্দের অর্থ "পশম"। এই মতানুসারে যিনি কর্কশ পশমের পরিচ্ছেদ পরিধান করেন তিনিই "সূফী"। সূফীগণ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন এবং সকলপ্রকার ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া অতি অল্প মূল্যের কর্কশ পশমবস্ত্র পরিধান করিতেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগকে "সূফী" অথবা "পশমবস্ত্রধারী" বলা হইত। ইহা সত্ত্বেও পবিত্রতাবাচক "সফা" শব্দ হইতেই "সূফী" শব্দের উৎপত্তি এইরূপ একটা যে সাধারণ ধারণা আছে, তাহার কারণ এই যে, সূফীগণ বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতা ও অকপটতাকেই সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত সূফীগুরু বাগদাদ নিবাসী জুনাইদ্ বলিয়াছেন যে, পবিত্রতাই সূফীধর্ম্মের মূলভিত্তি, যিনি সংসারক্লেদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনিই একমাত্র পবিত্রচেতা, তিনিই প্রকৃত সূফী।

অতএব, আচারানুষ্ঠানের দিক হইতে সূফী মতবাদ সন্ন্যাসব্রত বিশেষ (**Asceticism**)। মানব মনের বাসনা কামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং জাগতিক সকল সুখের প্রতি বৈরাগ্য-সৃষ্টিই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আবুল হাসান নূরী বলিয়াছেন যে, সূফীগণ কেবল নির্ধন নহেন, তাঁহারা নিষ্কামও; তাঁহারা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত বরণ করেন এবং ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহাদের অপর কোনও দ্রব্যে আসক্তি নাই। ধর্ম্মের দিক হইতে সূফী মতবাদ ঈশ্বরের সহিত পরিপূর্ণ, বাধাহীন মিলনকেই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য ও সার্থকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই মিলন বুদ্ধিপ্রসূত নহে, সম্পূর্ণরূপে আবেগসম্ভূত। প্রেমই মানব ও ঈশ্বরের মিলন সেতু, বিচার বুদ্ধি অথবা সাধারণ প্রমাণজন্য (প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি) জ্ঞান নহে। তজ্জন্য সূফীমতকে ইস্লামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিয়াবাদ (**Islamic Mysticism**) বলা হয়। বিখ্যাত সূফী আবুল হাসান নূরী জগতের প্রতি ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিকে সূফীধর্মের মূলভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জুনাইদ্ ও বলিয়াছেন, মানবের ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' বিনাশ ও ঈশ্বরেই পুনর্জীবন লাভই সূফীধর্ম্মের সারকথা।

বিভিন্ন সূফীগণ সূফীধর্ম্মের বিভিন্ন বিবরণী ও সংজ্ঞা দিয়াছেন। তন্মধ্যে মারূফ্ আল্ কারখীকৃত ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত বিবরণীর মধ্যে প্রাচীনতম। তাঁহার মতে সূফীমতবাদ "পারমার্থিক তত্ত্ববিষয়ক উপলব্ধি ও জাগতিক বস্তুবিষয়ক বৈরাগ্য" ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সূফীগণকে "তত্ত্বানুগামী" অথবা "ঈশ্বরানুগামী" (আহল্ আল্ হাক্) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। তাঁহাদের সমগ্রসত্তা ভগবদারাধনাতেই নিমগ্ন থাকে, অন্য কোনও বস্তু বা তত্ত্বে তাঁহাদের স্পৃহা ও প্রয়োজন নাই।

সূফীদের বিশ্বাস যে তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং জগতে তাঁহারাই ঈশ্বরের দূত ও প্রচারক। ইয়ুসুফ্ ইবন্ হুসেইন্ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক সমাজে একদল সাধু থাকেন যাঁহাদের স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় দূতরূপে বরণ করেন এবং যাঁহাদের সহায়তাতেই তিনি স্বীয় বাণী মানবসমাজে প্রচার করেন ইস্লাম্ সম্প্রদায়ে সূফীগণই ঈদৃশ নির্ব্বাচিত ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক। বহু সূফীর বিশ্বাস যে, মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে দুই প্রকারের বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—প্রথমটী কোরাণে এবং দ্বিতীয়টী মহম্মদের হৃদয়ে লিখিত আছে। প্রথমটাকে মহম্মদের "গ্রন্থনিহিত জ্ঞান" (ইলম্ ই সাফিনা) ও দ্বিতীয়টাকে তাঁহার 'হৃদয় নিহিত জ্ঞান' (ইলম্ ই সীনা) বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রথমটী সর্ব্বসাধারণের ও দ্বিতীয়টী নির্ব্বাচিত কয়েকজনের জন্য মাত্র। সূফীদের মতে তাঁহারাই ঈদৃশ নির্ব্বাচিত সম্প্রদায় এবং তাঁহারাই একমাত্র মহম্মদের প্রকৃত শিষ্য ও অনুগামী। সনাতনপন্থী ইস্লামধর্ম্মিগণ অবশ্য উক্ত দুই প্রকার বাণীর সত্যতা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে, মহম্মদ ভগবানের নিকট হইতে যে বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা একমাত্র কোরাণেই লিপিবদ্ধ আছে, সূফীগণ অপর কোনও বিশেষ বাণী প্রাপ্ত হন নাই। যাহা হউক, অন্যান্য ইস্লাম সম্প্রদায়ের ন্যায় সূফী সম্প্রদায়ও মহম্মদের উপদেশাবলী হইতেই উদ্ভূত বলিয়া সূফীগণের বিশ্বাস, যদিও সনাতনপন্থী ইস্লাম সম্প্রদায় সূফী মতকে ইস্লাম মতানুযায়ীরূপে গ্রহণ করেন নাই। প্রাচীন সূফীমতবাদ অপেক্ষা তৎপরবর্ত্তী মতবাদই প্রাচীনপন্থী ইস্লামের নিকট অধিকতর আপত্তিজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। বিখ্যাত সূফীগণও তাঁহাদের মতবাদ যে কোরাণের মতবাদের বিরোধী নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়:—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে একটী প্রেরণা; অর্থাৎ যে বস্তু আমাদের নাই, অথচ যাহা আমরা চাই তাহারই লাভের তীব্র ইচ্ছা। অতএব অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্যই কেবল লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত বস্তু অথবা অপূর্ণ ইচ্ছা থাকা সম্ভবপর নহে। তিনি আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত, পরিপূর্ণ আনন্দময়। অতএব তাঁহার জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্যটী কোন উদ্দেশ্যপ্রসূত?

এই সম্বন্ধে সূফীগণ সাধারণতঃ একটী সুবিদিত পরম্পরাগত জনশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা এই: "ডেভিড ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু! আপনি কেন মানবজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন?' ঈশ্বর উত্তর দিলেন:—'আমি গুপ্তনিধি এবং আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি'।" অতএব মানবের নিকট সুবিদিত হইবার বাসনায় ঈশ্বর জগৎ এবং জগতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী (**Idealist**) সূফীগণ উক্ত জনশ্রুতির এই অর্থ করেন যে, মানবের ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরের স্বাত্মজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ঈশ্বর স্বীয় সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিবার জন্যই, স্বীয় অনভিব্যক্ত স্বরূপকে পূর্ণ প্রকটিত করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই ঈশ্বর তাঁহার অপ্রকটীকৃত শুদ্ধস্বরূপাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামরূপ বিশিষ্ট বিশ্বসংসারে ক্রমবিবর্ত্তিত হন, এবং পরিশেষে মানব সৃষ্টি করেন। মানবেই ঈশ্বরের পূর্ণ পরিণতি, এবং মানবেই তিনি স্বীয় পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। অতএব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ, যে দর্পণে তিনি স্বয়ং স্বীয় স্বরূপ দর্শন করেন। কিন্তু জগৎ মলিন দর্পণতুল্য; কারণ ইহা ঈশ্বরের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাঁহার সমগ্র স্বরূপ অথবা সমগ্র গুণাবলীর প্রপঞ্চনা ইহাতে নাই। কিন্তু মানব অর্থাৎ 'পূর্ণমানব', ঈশ্বরের নির্ম্মল, পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ দর্পণস্বরূপ, কারণ পূর্ণমানব তাঁহার সমগ্রস্বরূপ ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিব্যক্তি। এইরূপে, ঈশ্বর পূর্ণমানবের দ্বারাই নিজেকে নিজে পরিপূর্ণভাবে জানিতে পারেন এবং নিজেকে নিজে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, প্রেমিক ও প্রিয়রূপ ধারণ করিয়াছেন।

সুন্দরী নারী ও তাঁহার দর্পণের উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। সুন্দরী নারী স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে ও জানিতে উৎসুক। তজ্জন্য দর্পণ তাঁহার নিকট অত্যাবশ্যক। একমাত্র দর্পণের সাহায্যেই তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য স্বয়ং দর্শন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। নতুবা, তিনি সৌন্দর্য্যবতী হইয়াও স্বীয় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকিয়া যান।

দর্পণ অবশ্য তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অথবা বৰ্দ্ধিত করে না, কিন্তু পূর্ব্বস্থিত সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত ও তদ্রূপে তাঁহার নিকট জ্ঞাত করে মাত্র। মলিন দর্পণে কিন্তু সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য নির্ম্মল দর্পণের প্রয়োজন। ঈদৃশ নির্ম্মল দর্পণেই তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। সুতরাং, সুন্দরীর দর্পণদর্শন কার্য্যটী নিরর্থক নহে এবং তাহার ফলস্বরূপ যে দর্পণস্থ প্রতিচ্ছবি তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক। সুন্দরীর স্বসৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দই দর্পণাবলোকন কার্য্য ও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের সাক্ষাৎ ফল এবং ইহাদের অভাবে তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দেরও অভাব ঘটিত। সুতরাং, তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দের সম্পূর্ণতার জন্যই, দর্পণদর্শন কার্য্য ও দর্পণস্থ প্রতিচ্ছবি অত্যাবশ্যক।

ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যটীও একই উদ্দেশ্য প্রসূত, নিরর্থক নহে। ঈশ্বরও স্বীয় সমগ্র সত্তা, স্বীয় পূর্ণস্বরূপ পরিপূর্ণভাবে জানিতে উৎসুক। তজ্জন্য তিনি স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে অনন্ত কল্যাণ গুণগ্রামে অভিব্যক্ত করেন এবং এই অভিব্যক্তিই জগৎ সৃষ্টি। অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্ত গুণগ্রাম, দর্পণ, অথবা প্রতিচ্ছবি মাত্র। জগদ্রূপ দর্পণ অথবা প্রতিচ্ছবির সাহায্যেই ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ জানিতেছেন ও জানিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। জগতে অবশ্য ঈশ্বরের গুণাবলীর অর্থাৎ স্বরূপের আংশিক বিকাশ মাত্র হইতেছে বলিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির পরে মানব সৃষ্টিও করিয়াছেন। পুনরায় তন্মধ্যে যাঁহারা মরমী ভক্ত, যাঁহারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই "পূর্ণমানব" এবং তাঁহারাই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। ঈদৃশ পূর্ণমানবেই ঈশ্বর স্বীয় সমগ্র স্বরূপ ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করিতেছেন। ঈদৃশ পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান ও তজ্জনিত পূর্ণ আনন্দানুভব এতদুভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

এস্থলে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। উক্ত মতানুসারে, সুন্দরী যেরূপ দর্পণে স্বীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন না করিলে সে সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকিয়া যান এবং আনন্দও লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ ঈশ্বরও জগতে, অর্থাৎ পূর্ণমানবে, স্বীয় স্বরূপ বা গুণাবলী প্রত্যক্ষ না করিলে স্বস্বরূপ বা গুণাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকেন এবং আনন্দলাভেও সমর্থ হন না। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অজ্ঞ ও নিরানন্দ ছিলেন ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অনভিব্যক্ত স্বরূপ, নির্গুণ পরমাত্মার জ্ঞানের ও আনন্দের অভাব ছিল; সৃষ্টির পরেই সেই অভাবদ্বয় বিদূরিত হয়। কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বগুণোপেত, জ্ঞানস্বরূপ, নিত্যতৃপ্ত, আপ্তকাম মহান্ পুরুষের পক্ষে কোনোরূপ অভাব, দোষ, ন্যূনতা বা অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ, কোনও কোনও সূফী বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও পরমাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের অভাব ছিল না—তৎকালেও তিনি স্বীয় স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবেই জানিতেন এবং তৎকালেও তাঁহার আনন্দের লেশমাত্রও অভাব ছিল না। তথাপি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, পরমাত্মা পুনরায় স্বীয় স্বরূপ দর্শনে উৎসুক হইয়া জগৎ সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং, জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্র অভাব না থাকিলেও, পূর্ণমানবের দ্বারা পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দলাভের জন্যই তিনি সৃষ্টি করেন। জামী বলিয়াছেন: "যদিও তিনি স্বীয় স্বরূপেই স্বীয় গুণগ্রাম পরিপূর্ণভাবে দর্শন ও উপলব্ধি করেন তথাপি তাঁহার স্বরূপ বা গুণাবলী যেন অপর এক দর্পণে তাঁহার নিকট পুনরায় প্রতিফলিত হয় তজ্জন্য তাঁহার অভিলাষ জন্মে।" হাল্লাজ্ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর তাঁহার স্বীয় স্বরূপ, অর্থাৎ স্বীয় আনন্দ ও প্রেমকে বহির্বিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছুক হন, যাহাতে তিনি তদ্দর্শন ও তৎ সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারেন। অতএব জগৎ ঈশ্বরস্বরূপের পরিণাম, তাঁহার প্রেম ও আনন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ।

উপরিলিখিত সূফী প্রতিবিম্ববাদের সহিত অবশ্য অদ্বৈত প্রতিবিম্ববাদের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। অদ্বৈত মতে, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মায়া বা অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বররূপ, ও অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ, ধারণ করেন (১)। প্রতিবিম্ব মিথ্যা, মায়া মাত্র সত্য বস্তু নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম ও জীবও মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কিন্তু উক্ত সূফী মতে, জগৎ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ সত্য প্রকাশ ও পরিণতি, মিথ্যা নহে। নির্গুণ পরমাত্মা সত্যই সগুণ ঈশ্বরে অভিব্যক্ত হন এবং সত্যই জগতে ও পূর্ণমানবে ক্রমবিবর্দ্ধিত হন। অতএব জগৎ পরমেশ্বর তুল্য সত্য। অবশ্য কোনও কোনও সূফী সম্প্রদায় জগতের মিথ্যাত্বও স্বীকার করিয়াছেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার জ্ঞান ও আনন্দের বিন্দুমাত্রও অভাব না থাকিলেও তিনি কোন্ উদ্দেশ্য অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় জ্ঞান ও আনন্দ লাভে উদ্‌গ্রীব হইলেন, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার আলোচনা সূফী-মতবাদে দৃষ্ট হয় না। হাল্লাজ্ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান ও আনন্দের অভাব না থাকিলেও, তিনি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন।

'ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন?' ইহা দর্শন শাস্ত্রের চিরন্তন প্রশ্ন। বেদান্তমতে, জগৎ সৃষ্টি ঈশ্বরের লীলা অথবা ক্রীড়ামাত্র। ক্রীড়া অভাবজাত নহে; উপরন্তু যাঁহার কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন নাই, তিনিই ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতে পারেন। ক্রীড়া কর্ম্মবিশেষ সন্দেহ নাই, কিন্তু অপরাপর কর্ম্মের সহিত ইহার মূলগত প্রভেদ এই যে, ইহা প্রয়োজনসম্ভূত নহে। অপরাপর কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা, অভাব পূরণের প্রচেষ্টা; সুতরাং ইহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। কিন্তু ক্রীড়া কর্ম্মবিশেষ হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বভাব। ইহা অভাব পূরণের প্রচেষ্টা নহে, উপরন্তু অভাব পূরণ হইবার পরেই ইহার উদ্ভব পূর্ব্বে নহে। প্রয়োজন সিদ্ধি হইবার পরে প্রাণে যে শান্তি ও আনন্দের উদয় হয়, ক্রীড়া তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তে এই প্রসঙ্গে মহাপরাক্রান্ত নৃপতির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিঃশেষে সম্পাদন করিয়া, সকল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়া তৎপরেই তিনি ক্রীড়া ও উৎসবে রত হন। সেই সকল ক্রীড়া ও উৎসবাদি তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নহে—কারণ বর্ত্তমানে তাঁহার অভাব কিছুই নাই, তাহারা কেবল তাঁহার আনন্দের বাহ্যিক প্রকাশ। অতএব, প্রথমে অভাবমূলক কর্ম্ম, তৎপরে উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও তজ্জনিত আনন্দ, তৎপরে আনন্দমূলক কর্ম্ম বা ক্রীড়া। এতদ্রূপে ক্রীড়া আনন্দভাবমূলক কর্ম্ম নহে, প্রাপ্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং, প্রত্যেক কর্ম্মই যে প্রয়োজনানুরোধী ইহা স্বীকার করা চলে না। অবশ্য সাধারণতঃ, কর্ম্মসমূহ যে অভাবমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রীড়ারূপ কর্ম্মকে উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত।

ঈশ্বর আপ্তকাম, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ—তাঁহার অভাব ও প্রয়োজন কিছুই নাই। অতএব তাঁহার জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্যটী সাধারণ অভাবমূলক কর্ম্ম হইতেই পারে না। সুতরাং ইহা ক্রীড়ারূপ কর্ম্মমাত্র। জগৎ সৃষ্টির দ্বারা ঈশ্বর কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করেন না। উপরন্তু, 'কোনও অভাব ও প্রয়োজন নাই বলিয়াই জগৎ সৃষ্টিরূপ ক্রীড়ায় তিনি মত্ত হন। এইরূপে সৃষ্টি ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিত্য উদ্বেলিত, অসীম, অপরিমেয় আনন্দের মূর্ত্ত বিকাশমাত্র। তজ্জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ৩—)। আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি; আনন্দেই তাহাদের স্থিতি: আনন্দেই তাহাদের লয়।

(১) বেদান্ত পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ-আর্-ই-এস্

(১০)

ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতি বা Indian National Congress প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন * তাহার মর্ম্ম এই :—

"অনেকেই জ্ঞাত নহেন যে মার্ক্ইস অব ডাফরিণ যখন ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন তখন তাঁহারই মনে কংগ্রেসগঠনের কল্পনা উদিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এ-ও-হিউমের মনে হয় যদি প্রতিবৎসর ভারতের নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া সামাজিক প্রথাদির আলোচনা করেন তাহা হইলে অনেক সুফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি সে সভায় রাজনীতিক আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তাহা হইলে কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের রাজনীতিক সভাসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যে বারে যে প্রদেশে সভার অধিবেশন হইবে সেইবার সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে সভাপতি করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, কারণ তাহাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিক সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

লর্ড ডাফ্‌রিণ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বড়লাট লর্ড ডাফরিণ (যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে রাজপ্রতিনিধির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন) সিমলায় গমন করিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করেন। লর্ড ডাফরিণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনার পর তাঁহাকে কিছুদিন পরে ডাকিয়া বলেন, উহাতে বিশেষ সুফল ফলিবে না। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে যেমন একদল মন্ত্রী শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন আর একদল প্রতিপক্ষ তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করেন, এদেশে তেমন opposition বা সরকার-বিরোধী দল নাই। এদেশের সংবাদপত্রে লোকমত প্রতিফলিত হইলেও তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। ইংরাজেরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ভারতবাসীরা কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাহা তাঁহারা জানেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বৎসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া শাসন-প্রণালীর ত্রুটি দেখাইয়া দেন ও সংস্কারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেন তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। এরূপ সভায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না; কারণ, তাঁহার সমক্ষে সকলে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারেন। মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিণের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং তিনি তাঁহার প্রস্তাব ও লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব দুইটাই কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানের প্রসিদ্ধ রাজনীতিকগণের নিকট উপস্থাপিত করেন। ইঁহারা সকলেই ডাফরিণের প্রস্তাবটির অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হন। লর্ড ডাফরিণ মিষ্টার হিউমের সহিত এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, লর্ড ডাফরিণের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যেন এই প্রস্তাবসম্পর্কে তাঁহার নাম না প্রকাশিত হয় এবং এই সর্ত্ত সাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিল, হিউম যাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত একথা আর কেহ জানিতেন না।"

কিন্তু লর্ড ডাফরিণকে আমরা "কংগ্রেসের পিতা" বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না, কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে উমেশচন্দ্র উহার উদ্দেশ্য ও নীতি প্রকাশ করিবার পরেই তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতে স্যর অকল্যাণ্ড কলভিন প্রমুখ প্রাদেশিক গবর্ণরগণ উহার পথে বহু বাধা বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া সূতিকাগারেই উহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদারহৃদয় ভারতপ্রেমিক অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম অবসর-প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান হইলেও প্রথমাবধি কংগ্রেসের সেক্রেটারীরূপে ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে কংগ্রেসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে হিউমের সঙ্গে উমেশচন্দ্র ও দাদাভাই নৌরোজী না থাকিলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না। হিউম স্বয়ং উমেশচন্দ্রকে কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গিয়াছেন।

অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম

* **Introduction to Natesan's "Indian Politics"**

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর পুণা সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবে স্থির হয়। কিন্তু তথায় বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবহেতু সে অধিবেশন বোম্বাই সহরেই গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে হইয়াছিল। মিষ্টার হিউমের প্রস্তাবে মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও মাননীয় কে-টি-তেলাং এর সমর্থনে উমেশচন্দ্র এই অধিবেশনে সভাপতির আসনে বৃত হন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল সম্পাদিত "মহাজাতি গঠন পথে (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি)" নামক গ্রন্থের
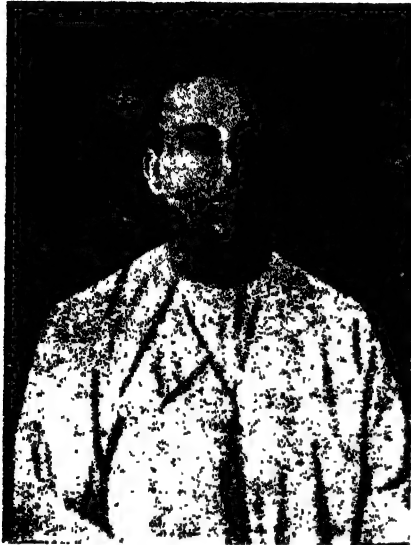
শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল

পরিশিষ্টে Nativity of the Indian National Congress নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে চৌধুরী মহাশয় উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"মিষ্টার ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী ভারতবর্ষীয় জাতীয় সমিতির প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি তৎসময়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভারতীয় ব্যবহারাজীব ছিলেন, অধিকন্ত বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বিচারপতিগণ ও ব্যবহারাজীবগণের নিকট এবং সরকার ও জনসাধারণের নিকট অসাধারণসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। একসময়ে ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, লর্ড সিংহও তাঁহার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠালাভের সময়েও সেরূপ লাভ করিতে পারেন নাই! তিনি দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি এবং বাক্যে ও ব্যবহারে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী হইলেও তিনি দেশের সাধারণ কার্য্যে কদাচিৎ যোগদান করিতেন এবং তৎকালীন রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ সংস্পর্শ ছিল না। তৎকালীন রাজনীতিক চক্রাদিতে যাহা শ্রুত হইয়াছিলাম তাহা এখানে বলিতে পারি। লর্ড রিপণের শাসনকালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্যের পদ শূন্য হইলে ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জীর নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড রিপণ এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে "তিনি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার রাজনীতিক জীবনের কোন ইতিহাস নাই" এবং তাঁহার নাম পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল।-

লর্ড রিপণের অবসর গ্রহণের ঠিক একবৎসর পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে ডব্লিউ-সি-বনার্জ্জী সভাপতি হইয়াছিলেন উহাতে তৎকালে যে জনরব শ্রুত হইয়াছিল তাহা অমূলক নহে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। সে জনরব এই যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য ছিল যে বাঙ্গালায় যে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যাহা লর্ড রিপণের শাসনকালে অপূর্ব্ব শক্তি ও গতিবেগ লাভ করিয়াছিল তাহা কোন শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন নেতার ধীর ও বিচক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত ও শমিত হয় (put under the control and guidance of a safe and sober man of light and leading.)

উইকলি নোটসের প্রতিষ্ঠাতাসম্পাদক ব্যারিষ্টার চৌধুরী মহাশয় হাইকোর্টে উমেশচন্দ্রের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা এবং সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উমেশচন্দ্র যে কোন রাজনীতিক কার্য্য করেন নাই—রাজনীতিক চক্রাদিতে শ্রুত এই কথা যে সত্য নহে তাহা পাঠকগণকে বলা নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি লণ্ডন ইণ্ডিয়া সোসাইটী ও পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে যে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠাশালী সভ্যগণের নিকট যুক্তিতর্কদ্বারা ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের ন্যায়সঙ্গত দাবীর যৌক্তিকতা যে ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ইলবাট বিলের আন্দোলনের পর টাউনহলে তিনি দেশবাসীর সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, এবং 'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন' প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমগ্র ভারতে রাজনীতিক প্রচেষ্টা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্পাদিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় ও য়ুরোপীয় উচ্চতম সমাজে সমান ভাবে মিশিতেন এবং উভয় সমাজেই তাঁহার মত সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকৃষ্ট করিত। মিষ্টার হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাঁহার প্রস্তাব ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌গণের নিকটেই উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং যদি উমেশচন্দ্র প্রসিদ্ধ রাজনীতিকগণের মধ্যে গণ্য না হইতেন তাহা হইলে হিউম তাঁহার পরামর্শ যাচ্ঞা করিতেন না বা তিনি প্রথম সভাপতিরূপে বৃত হইতেন না। প্রথম কংগ্রেসের অন্যতর প্রধান উদ্যোগী দাদাভাই নৌরোজী ও ফিরোজশাহ মেটা ইংলণ্ডেই উমেশচন্দ্রের রাজনীতিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র কেবল খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন, অধিকন্ত বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াই যে প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ যদিও প্রথম কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য—সভার নিয়মাদি প্রণয়নে—হয়ত Constitutional Law এ অভিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের সাহায্য আবশ্যক ছিল এবং রাজনীতিক মহাসভা প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ ভারতে প্রথম রাজনীতিক আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির সাহায্যলাভ করা প্রয়োজন ছিল, সে সময়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ও ব্যারিষ্টার আরও ত ছিলেন!

লর্ড রিপণের মন্তব্য সম্বন্ধে যে কাহিনী চৌধুরী মহাশয় শ্রবণ

করিয়াছিলেন তাঁহারও সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, সেকালে এমন লোককেও ব্যবস্থাপক সভায় লওয়া হইত যাঁহাদের কেবল রাজনীতিজ্ঞান ছিলনা তাহাই নহে, যে ভাষায় সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত সেই ইংরাজী ভাষাতেও সম্যক জ্ঞান ছিল না। রাজপুরুষদের ইঙ্গিতানুসারে ইঁহারা ভোট দিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। একথা উমেশচন্দ্রই ইংলণ্ডে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের কতকগুলি সুলিখিত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'কংগ্রেস', 'বাংলা ও কংগ্রেস' প্রভৃতি তথ্যবহুল গ্রন্থে বিশদভাবে কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্য্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেসে উমেশচন্দ্রের কার্য্যেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইব।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে উমেশচন্দ্র ব্যতীত কলিকাতা হইতে

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর

'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক খ্যাতনামা এটর্নী নরেন্দ্রনাথ সেন, 'নববিভাকর' সম্পাদক, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, হাইকোর্টের উকীল গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এবং এলাহাবাদ হইতে আগত 'ইণ্ডিয়ান য়ুনিয়ন' সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা ছাড়াও মিষ্টার এ-ও-হিউম, বোম্বাইয়ের দাদাভাই নৌরোজী ও ফিরোজশাহ মেটা এবং মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস চিপলঙ্কার, পি আনন্দ চার্লু—কংগ্রেসে বিশেষভাবে যোগদান করেন।

নৌরোজী সভাপতি মহাশয়কে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করিলে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত করেন :—

(১) সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কাষ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন—

(২) পরিচয়ের ফলে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার পরিপুষ্টি সাধন ;

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মত নির্দ্ধারণ ;

(৪) আগামী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণ।

প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—
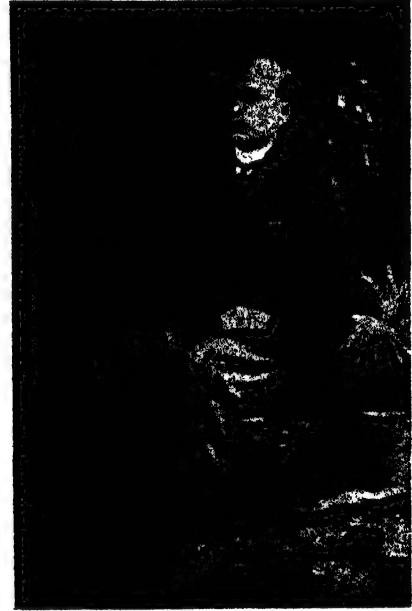
জানকীনাথ ঘোষাল

(১) এদেশে ও বিলাতে ভারতশাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটী রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হউক। উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হউক এবং কমিশন কর্ত্তৃক ভারতে ও বিলাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক।

(২) ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদ বিলুপ্ত করা হউক।

(৩) নির্ব্বাচিত সদস্যগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভাসমূহের সংস্কার করা হউক।

(৪) বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয় অনাবশ্যক এবং রাজস্বের তুলনায় অত্যধিক।

(৬) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করা না হয় তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস-শুল্ক ও লাইসেন্স-কর দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক।

(৭) কংগ্রেসের মতে উত্তরব্রহ্ম অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু যদি সরকার অধিকার করাই স্থির করেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তথায় সিংহলের মত উপনিবেশ করা সঙ্গত।

(৮) কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাদেশিক রাজনীতিক সভাসমিতির গোচরে আনা হউক।

(ঞ) আগামী কংগ্রেস ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হইবে।

সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই যে পরবর্ত্তীকালের সভাপতিদের ভাষণের ন্যায় উহা দীর্ঘ ও অনাবশ্যক অলঙ্কার ভারাক্রান্ত নহে, কিন্তু উহাতে সংযত ভাষায় সংক্ষেপে কাজের কথাগুলি বলা হইয়াছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী Chief ছদ্মনামে এই অধিবেশনের একটি মনোজ্ঞ চিত্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রেইজ এণ্ড রায়ত' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ মেটার ওজস্বিনী বক্তৃতা, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের সরস বাণী, দাদাভাই নৌরোজীর অদম্য উৎসাহ, নরেন্দ্রনাথ সেনের সরল আন্তরিকতা, জানকীনাথ ঘোষালের শান্ত ও সংযত সুর, সুব্রহ্মণ্য আয়ারের 'বাঙ্গালার পঞ্চ' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক হাস্যোদ্রেককারী বাণী, হিউমের সরল সহৃদয়তা ও বুদ্ধিদীপ্ত আননের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখক (সম্ভবতঃ গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়) সভাপতি উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—
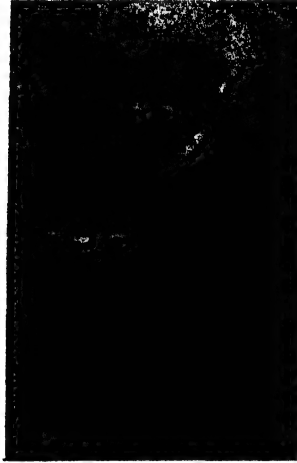
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

"উমেশচন্দ্রকে সম্মানিত করিয়া—জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাঙ্গালাকে সম্মানিত করিয়া—বোম্বাই নিজেকে সম্মানিত করিয়াছিল। উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জাত, অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী, হৃদয় ও মনের অপূর্ব্ব সদগুণে অলঙ্কৃত, ভারতবাসীর পক্ষে এদেশে যে সকল অত্যুচ্চ আসন অধিকার সম্ভব স্বকীয় প্রতিভাবলে তাহার একটিতে অধিষ্ঠিত, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি নির্বাচিত হইতে পারিতেন না। তিনি যে ভাবে সভাপতির কর্ত্তব্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন তাহা দেখিবার জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা সার্থক। কার্য্যের গতি কোথাও প্রতিহত হয় নাই, কোথাও শৃঙ্খলাবিহীন হয় নাই, যে অবস্থায় সভা হইয়াছিল তাহাতে যে সঙ্কোচ স্বভাবতঃই আশা করা যায়, সে সঙ্কোচ তাঁহার কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উপবেশন করিয়াছিলেন, শান্তভাবে সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিয়াছিলেন, যেন একার্য্যে তিনি চিরাভ্যস্ত, যেমন সহজভাবে তিনি মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। সুন্দর দীর্ঘ অবয়ব, উজ্জ্বল আনন, দীর্ঘ দোদুল্যমান শ্মশ্রুরাজি, মনোজ্ঞ নির্দোষ ভাষণ, আধুনিক যুবকগণের অনুকরণীয় শিষ্টাচার ও বিনয় এবং তৎসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমন্বিতা অনিন্দনীয়া বক্তাবস্থা বাণী—এই সমূহের দ্বারা তিনিই সভার কার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনার অর্দ্ধেক সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ইংরাজের মত, ধরণধারণ, বসিবার ও দাঁড়াইবার ভঙ্গী সমস্ত ইংরাজের মত, তাঁহার ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গী, মৃদু হাস্তসঞ্চালন হইতে মৃদু মস্তক সঞ্চালনের ভঙ্গী সমস্তই ঠিক ইংরাজের মত। তথাপি, এ সকল সত্ত্বেও হিন্দুর বিশেষত্ব তাঁহার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিতে চলনে এবং বাণীতে যে সৌন্দর্য্য ও বিনয় প্রকটিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ এদেশীয়। বস্তুতঃ তাঁহাকে তাঁহার সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর ভারতবাসী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল এবং তিনি সভাস্থলে সকলের ঈর্ষা, গর্ব্ব এবং লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন।

পুনশ্চ, এলিফ্যাণ্টা গুহায় প্রমোদ ভ্রমণ কালে তাঁহার চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশ পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। তিনি স্নেহশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শান্ত স্বভাবে এমন কিছু ছিল না যাহা আকৃষ্ট করিলেও কখনও কখনও বিরক্তি উৎপাদন করে। সকলের সহিত তিনি একইভাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে একটি স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া সকলের প্রতি একটি কোমল স্নেহময় ভাব প্রকটিত করিয়াছিল—সে কোমলতা যে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উদ্ভূত তাহা অনুভব করা কঠিন ছিল না। তরুণগণের প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত সৌজন্য সহকারে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে মুরুব্বিয়ানার দোষ আদৌ পরিলক্ষিত হয় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাঁহার আচার ব্যবহার প্রত্যেক হিন্দুর—হিন্দুর কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্ব্ব করিবার বিষয়। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে যেরূপ প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন—রাজনীতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার সম্মুখে সেইরূপ প্রতিষ্ঠার পথ প্রসারিত হইয়া আছে।"

প্রতীক্ষায়

শ্রীবীণা দে

হে প্রিয় আমি তোমারি তরে জ্বালিয়া দীপ-শিখা
জাগায়ে আঁখি রয়েছি বসি' একেলা ঘরে মোর,
জানি না তুমি কখন্ আসি আমারে দিবে দেখা।
নাহি কো তারা ডুবেছে শশী রজনী অমা ঘোর।

বাহিরে বায়ু বহিছে বেগে কাঁপিয়া উঠে শিখা।
বুকের আড়ে যতনে ঢাকি তারালে করি ত্বরা,
মনেতে ভয় কী আছে ভালে—না জানি আছে লিখা—
ফিরিয়া যাও আঁধার দেখি আঁধার করি ধরা।

আসিবে তুমি মনেতে জানি আসিবে তুমি প্রিয়
আশাতে জাগে—জীবন মোর করিবে রমণীয়।

নামের মূল্য

যাদুকর পি-সি-সরকার

একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, "What's in a name" অর্থাৎ নামে কিছুই আসে যায় না, কারণ গোলাপফুলকে যে কোন নামই দেওয়া যাক না কেন, উহার গন্ধ বিতরণে তাহাতে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হয় না। এরূপ উদাহরণ অনেকই দেওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নামেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—'নামকে যাঁহারা নাম মাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নেই।' এই কথাটা খুবই সত্য। বিশেষ করিয়া যাদুবিদ্যা দ্বারা যাঁহারা যশ অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহাদের নাম স্থির করা (nomenclature) সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিবার বিষয় আছে। শ্রুতিকঠোর নাম সর্ব্বক্ষেত্রের ন্যায় যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রেও শ্রোতার মনের উপর বিকর্ষণ আনিয়া থাকে। শ্রুতিমধুর বিবেচনা করিয়াই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের বার্ষিক উৎসব 'ত্রিপুরী'তে এবং তৎপর 'রামনগর'এ অনুষ্ঠিত করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন—ইহা সংবাদপত্রপাঠক মাত্রেই বিশেষ অবগত আছেন। সে যাহাই হউক আলোচ্য প্রবন্ধে যাদুকর জীবনে নামের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা কি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইব। প্রথমতঃ কয়েকজন পৃথিবী বিখ্যাত যাদুকরের কথা আলোচনা করিলেই এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর 'হুডিনি' (Houdini)র কথা ধরা যাইতেছে। তাঁহার আসল নাম ছিল (Erich Weiss) 'এরিক ওয়েস্' কিন্তু ইহা অনেকেই হয়ত জানেন না। তিনি 'রবার্ট হুডিন' (Robert Houdin) নামক একজন প্রসিদ্ধ যাদুকরের নাম অনুকরণ করিয়া 'হুডিনি' নাম গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—

......When it became necessary for me to take a stage name, and a fellow-player, possessing a veneer of culture, told me that if I would add the letter "i" to Houdin's name, it would mean, in the French language, "like Houdin," I adopted the suggestion with enthusiasm. I asked nothing more of life than to become in my profession "like Robert-Houdin."......

অর্থাৎ "আমার ষ্টেজ নাম লওয়ার প্রয়োজন হইলে আমারই একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত সহকর্ম্মী আমাকে বলেন যে 'হুডিন' এই নামের পশ্চাতে ইংরাজী অক্ষর 'আই' যোগ করিলে ফরাসী ভাষায় উহার অর্থ হয় 'হুডিনের ন্যায়,' আমি উহা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করি; কারণ আমি ব্যবসায়ী জীবনে 'হুডিনের ন্যায়'ই হইতে চাহিয়াছিলাম তদপেক্ষা বেশী নহে।" এই শ্রুতিমধুর 'হুডিনী' নামটি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি Harry Houdini 'হ্যারী হুডিনী' নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি যে কোন দেশের হাতকড়ি খুলিতে পারিতেন বলিয়া এবং এইটিই তাঁহার বিশেষ খেলা ছিল বলিয়া উত্তরকালে তিনি Harry Handcuff Houdini নামে পরিচয় দিতেন এবং পুস্তকাদিতেও সেই নামই প্রকাশিত হইত। বিশেষ মজা এই যে 'হুডিনি' যে ফরাসী যাদুকরের কথা নকল করিয়াছিলেন, পরে তিনি তদপেক্ষা অধিক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাদুকর হুডিনির নাম হইতেই ওদেশের অভিধানে Houdinise নামে একটি নূতন শব্দ গ্রথিত হইয়াছে, যাহার অর্থ "অদ্ভুত কিছু সম্পাদন করা।"

বিখ্যাত চাইনিজ যাদুকর 'চাং লিং সু' (Chung Ling Soo)র নাম শুনেন নাই এমন যাদুকর পৃথিবীতে বোধ হয় কেহই নাই। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে তিনি একজন প্রকৃত চাইনিজরূপেই পরিচিত ছিলেন, যদিও আসলে তিনি ছিলেন স্কচ-আমেরিকান (Scotch American). তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল 'ক্যাম্বেল' (Campbell) এবং উত্তর নিউইয়র্ক ষ্টেটে তাঁহার বাড়ী ছিল। তিনি প্রথমে তাঁহার নাম "উইলিয়াম এলস-ওয়ার্থ রবিনসন" (William Elsworth Robins n) করেন, পরে "চিং লিং ফু" (Ching Ling Foo) নামক একজন আসল চীনা যাদুকরের নাম অনুকরণ করিয়া নিজের নাম রাখেন—

......"After the advent of the chinese Conjuror, Ching Ling Foo, Robinson, disguised as a chinaman, under the nom de theatre of Chung Ling Soo toured Europe. It is reported that certain Parisian journalists actually interviewed Chung Ling Soo on the chinese imbroglio. Decked out in a yellow robe his face enamelled and painted, with the eyes m de up to perfection, the pretended chinese magician received the journalists in a room dimly illuminated with lanterns. He spoke through an interpreter, who had been carefully tutored for the act, and told all he knew, and lots that he did not, concerning the Boxer uprisings in his native land (?)"......Page 74 (Magic and its Professors.)

অর্থাৎ চিং লিং ফু নামক একজন চীনদেশীয় যাদুকর যখন সুনামের সহিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছিলেন, রবিনসন সাহেব তখন চৈনিক বেশ গ্রহণ করিয়া ও চাং লিং সু নাম গ্রহণ করিয়া ইউরোপে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। শুনা যায় প্যারিসের কয়েকজন সাংবাদিক তাঁহাকে খাঁটী চাইনিজ মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হলুদ রংএর পোষাক পরিধান করিয়া গায়ে ও চক্ষুর উপর রং মাখাইয়া খাঁটী চাইনিজ সাজিয়া লণ্ঠন আলোকিত আধ-আলো আধ-ছায়াতে একটি প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে 'বিশেষ ভাবে শিক্ষিত' দোভাষীর সাহায্যে আপন মুলুক (?) চীনদেশে 'বক্সার যুদ্ধ' প্রভৃতি সত্য মিথ্যা জানা অজানা নানা গল্প করিয়াছিলেন। নামের এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্ভবতঃ খুব কমই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যাদুকর শুধু নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের জাতি (nationality)র পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে যাদুকর যেন তাসের রং পরিবর্ত্তন করার মতই অতি সহজে নিজেদের নাম গোত্র ও জাতির পরিবর্ত্তন করেন।

হল্যাণ্ডের Bamberg familyও বর্ত্তমানে আসল চাইনিজ যাদুকর নামে সুপরিচিত। তাঁহারা আজ ছয় পুরুষ যাবৎ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ চাইনিজ যাদুকর 'ও কিটো' ও তৎপুত্র 'ফু মানচু' উভয়েই এই বংশ হইতে জাত (Okito) 'ও কিটো' সাহেবের প্রকৃত নাম থিওডোর ব্যামবার্গ (Theodore Bamberg) এবং ফু মানচু (Fu Manchu) সাহেবের প্রকৃত নাম (David Bamberg) ডেভিড ব্যামবার্গ হয়ত অনেকেই জানেন না।

যাদুবিদ্যা জগতে হফম্যান (Hoffman) সাহেবের নাম শুনেন নাই—এমন লোক বোধ হয় নাই। তিনি কতকগুলি যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত

পুস্তক লিখিয়াছেন যাহা যাদুবিদ্যা জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই হফম্যান সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়াই বহু বড় বড় যাদুকর যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি আর কেহই নহেন লণ্ডনের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার লুইস (Mr. Angelo Lewis. M. A.) সাহেবের ছদ্মনাম। তিনি নিজেই 'হফম্যান' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—আমরা সকলে হফম্যান নামকে চিনি এবং শ্রদ্ধা করি কিন্তু 'লুইস' সাহেব কে, কি করিতেন কেহই খোজ রাখি না।

'পামার' (Palmer) সাহেব নিজের নাম রবার্ট হেলার (Robert Heller) নামে জগৎ প্রসিদ্ধ হন। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। তাঁহার নানারূপ বিজ্ঞাপন ছিল—একটিতে নিম্নরূপ কবিতা ছাপান হইত—

Shakespeare wrote well
Dickens wrote weller ;
Anderson was * *
But the greatest is Heller.

পরবর্ত্তীকালে কেলার (Kellar) নামে একজন যাদুকর প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। তিনিও পৃথিবীময় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া হুলস্থূলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতে আসিয়া কলিকাতায় আসেন তখন Asian পত্রিকাতেও অনুরূপ একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'The old & the new magic' পুস্তকের 241 পৃষ্ঠায় প্রকাশ…"**During his stay at Calcutta, India, the Asian of Jan 3. 1882, printed the following effusion' a paraphrase an Robert Heller's verse about himself and Anderson :**

'For many a day,
We have heard people Say
That a wondrous magician was Heller ;
Change the H into K,
And the E into A
And you have his superior in Kellar"…

এইরূপর আরও অনেক যাদুকর আছেন যথা **William B. Caulk** সাহেব প্রফেসার বেন্‌জামিন (**Prof. Benjamin**) নামে, **William Peppercorn** সাহেব **D. Alvini** নামে, **Count Edmond de Jrisy** সাহেব নিজেকে টরিনি (**Torrini**) নামে পরিচিত করেন। যাদুকর লেফায়েতের নামও জগৎপ্রসিদ্ধ। তিনিও চৈনিক খেলাতে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাদুজগতে তিনি **The great Lafayette** নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল সিজমণ্ড নিউবার্জ্জার (**Siegmund Neuburger**) এবং জাতিতে জার্ম্মান ছিলেন। জার্ম্মান নামগুলি উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ছোটনাম গ্রহণ করেন। একজন জার্ম্মান যাদুকরের প্রকৃত নাম আমি অদ্যাবধি উচ্চারণ করিতে পারি নাই—তাঁহার নাম ইংরাজী অক্ষরে এইভাবে লিখিত হয় **Burgenbungenthalerstein** , তিনি ষ্টেইন (**Stein**) নাম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। আমেরিকার যাদুকর সম্মিলনীর মুখপত্রে প্রকাশ

……A conjuror by the name of Burgenbungenthalerstein, has made application to change his name to Stein, giving as a reason, that his name will look too crowded on the billing material. Lengthy names are very common in Germany, but the above is the longest name of any conjuror in the world, I think he ought to advertise himself as the king of long Name Magicians"…

এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে যাদুকরগণ নিজের নামে যেরূপ পরিচিত তাঁহাদের বিশেষণেও অনুরূপ পরিচিত হইয়া থাকেন। এদেশে দেশবন্ধু বলিলে যেমন চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় বলিলে যতীন্দ্রমোহন, দেশগৌরব, দেশপ্রাণ, লোকমান্য, মহাত্মা, দয়ার সাগর, বাংলার ব্যাঘ্র, ছত্রপতি প্রভৃতি বলিলেই যেমন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়; যাদুবিদ্যা জগতেও এইরূপ **Handcuff king** 'হাতকড়ির রাজা' বলিলে হুডিনি, **King of Cards** বলিলে থার্স্টন, **king of koins (coins)** বলিলে নেলসন ডাউন্‌স্ সাহেব, **Queen of coins** বলিলে ম্যাদাম টাল্‌মা (**Talma**), '**Jap of Japs**' বলিলেন **D. Alvini, Comic,Corjuror'** বলিলে **Imro Fox,' Merry wizard** বলিলে **J. J. Sargent, father of Modern Magic** বলিলে **Robert Houdin, 'Military Mystic'** বলিলে **Bert Powell** বুঝায়।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় যাদুকরদিগের মধ্যে ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা উইল গোল্ডষ্টোন (**Will Goldston**) সাহেবের নিজের 'কার্ল ডেভো' (**Carl Devo**) পরিচয় দিয়া ব্লাক আর্টের ক্রিয়া দেখাইতেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর সভাপতি 'হরেস গোল্ডিন' (**Horace Goldin**) সাহেব নিজের নাম 'ফকির করিম দাখিলা' পরিচয় দিয়া বিলাতের রঙ্গমঞ্চে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ ইংলণ্ডে 'করাচী' নামক একজন ভারতীয় যাদুকর ও তাঁহার ছেলে 'কাদের' উভয়ে মিলিয়া যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে উহারা জীবনে ভারতবর্ষেই আসেন নাই। ইহাদের প্রকৃত নিবাস ইংলণ্ডেরই অন্তর্গত 'প্লিমাউথ' সহরে এবং ইহাদের নাম 'ডার্ব্বি'। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পিতার অর্থাৎ 'করাচী'র প্রকৃত নাম 'আর্থার ক্লড ডার্ব্বি' (**Arthur Claude Derby**).

আমেরিকার একজন বিখ্যাত যাদুকরের নাম 'জন্ মুলহল্যাণ্ড' (**John Mulholland**) ; কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তিনি কখনও চিং লিং ফু আবার কখনও 'মুহাম্মদ বক্স' নামে পরিচিত। যাদুকর 'হুডিনি'র অনুকরণে বর্ত্তমানে একজন অষ্ট্রেলিয়ান যাদুকর হাতকড়ি খোলা, বাক্স হইতে বহির্গমন প্রভৃতি খেলা দেখাইতেছেন। ইনি 'মারে' (**Murrey**) নামে পরিচিত হইলেও আসলে তাঁহার নাম ওয়ালটার্‌স্ (**Walters**) —এইরূপ আরও অসংখ্য আছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে যাদুকর জীবনে ছদ্মনামের প্রয়োজন কম নয়। গোলাপকে যে কোন নাম দিলে গন্ধের তারতম্য হয় না সত্য কিন্তু যাদুকরজীবনে নামের মূল্য খুবই বেশী।

প্রকৃত নাম অপেক্ষা ছদ্মনাম অনেক সময় কার্য্যকরী হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ' হইয়াছিলেন, প্রমথনাথ 'বীরবল' এবং বলাই চাঁদ মুখার্জ্জি 'বনফুল' হইয়াছেন, সেইরূপ পরশুরাম, অপরাজিতা প্রভৃতি অনেককেই আমরা জানি। 'নাম-ঢাকা নাম' অনেক সময় আসল নাম ছাড়াইয়া উঠে। সেইজন্য বেনামের অধিকারী আসল ব্যক্তিগণ নিজেদের চারিপাশে দুর্ভেদ্য সিগক্রীড সীমা রচনা করিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে প্রকৃত নামে চিনিবার ও জানিবার সৌভাগ্য খুব অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাদুবিদ্যাজগতে একজনকে অদ্যাবধি কেহ অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেকে **L' Homme Masque** (বা মুখস পরিহিত লোক) বলিয়া অভিহিত করিতেন। মুখস পরিহিত এই যাদুকর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইওরোপে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল তাঁহার নাম **Marquis d' O** কিন্তু **O** একজনের নাম হইতে পারে না উহাও ছদ্মনাম। এই ক্যামেরাবাহুল্য ও আলোকচিত্র বিলাসের যুগে মুখোস পরিহিত যাদুকরের একটি ছবিও বাহির হইল না ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য!

যাদুকর জীবনে ছদ্মনামের প্রয়োজন এবং মূল্য কম নহে। উহা তাঁহাদিগকে প্রচারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। সেইজন্য যাদুকরগণ যুগে যুগে নানারূপ অদ্ভুত নাম গ্রহণ করেন এবং

নানারূপ অদ্ভুত শব্দ (মন্ত্র) উচ্চারণ করেন ও অদ্ভুত বেশ ধারণ করেন। কোন কোন যাদুকর নিজেদের খেলাগুলির অদ্ভুত নামকরণ করিয়া থাকেন—Comus নামক যাদুকর লণ্ডনে বিজ্ঞাপন দেন—

…"Various uncommon experiments with his Enchanted Horologium, Pyxidees Literarum, and many curious operations in Rhabdology, Steganography and Phylacteria, with many wonderful performances on the grand Dodecahedron, also Chartomantic Deceptions and kharmamatic operations"…The old and new magic পুস্তকে (১৯ পৃষ্ঠা) প্রকাশ যে—

"…These magical experiments were doubtless very simple, what puzzled the Spectators must have been the names of the tricks"…অর্থাৎ "কমাস সাহেব বর্ণিত খেলা প্রত্যেকটিই অতিশয় সহজ ছিল। দর্শকগণ খেলার নাম পাঠ করিয়াই প্রথমে অবাক হইয়া যাইতেন।" সত্যই ইংরাজী ভাষায় যাহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও ঐ ইংরাজী বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। যাদুকর খেলার নামের যাদু দ্বারা লোকদিগকে স্তম্ভিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কাজেই যাদুকরগণ পূর্ব্বকালে "Droch myroch, and senaroth betu barooh attimaroth roun see, farounsee, hey pa-se passe" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতেন। "An account of the beginnings of the art of magic"এ প্রকাশ যে…"In the old days it was thought good business to dress in weird clothes and mumble incomprehensible words to encourage the spectators' belief in the magician's satanic connection……" প্রাচীনকালে যাদুকরগণ নানারূপ অদ্ভুত পোষাক পরিধান করিয়া নানারূপ অদ্ভুত অবোধ্য শব্দ (মন্ত্ররূপে) উচ্চারণ করিতেন ইহাতে দর্শকগণের ধারণা বলবতী হইত যে যাদুকর ভূত প্রেতের সহায়তায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাজেই যাদুকরগণের নিজের নেওয়া নামের কোন অর্থ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নামে অর্থও থাকিত যেমন Houdini অর্থ ফরাসী ভাষায় 'হুডিনের ন্যায়' (like Houdini) সেইরূপ চাং লিং সু অর্থ চীনা ভাষায় ভাল সৌভাগ্য (Extra Good luck, double goodluck) ইত্যাদি।

জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের ছদ্মনামের আলোচনা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ (প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২ পৃঃ ২১৫-১৬) লিখিয়াছেন—

…"পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে……।" অন্যত্র লিখিয়াছেন …"সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি, আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাঁউরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না।"………সাহিত্যিকদের বেলায় সেই বটগাছের সচিত্র কুলজিকোষ্ঠী দিলে অনেক সময় হয়তো দর্শকদের আনন্দ বিধান চলিতে পারিবে কিন্তু যাদুকরের বেলায় উহা যত অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহারা Mystery maker নামে পরিচিত কাজেই তাঁহাদের নাম এবং পরিচয়ে Mystery থাকাই উচিত, অবশ্য না থাকিলেও দোষ নাই।*

* লেখক শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার মহাশয় স্বয়ংও নিজের নাম (SORCAR) এই বানানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সঃ ভাঃ

দান

শ্রীসলিলা মুখোপাধ্যায়

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি তার পানে। কী অপরিসীম তার দান। সারাদিন জানালার ধারে চুপচাপ বসে তার কাজ লক্ষ্য করি। পৌষের শেষে বড়দিনের বন্ধে এসেছি 'বোধনা' নামে একটা ছোট কলোনীতে। ঝাড়গ্রামের আগের ষ্টেশন। কিছুই দেখবার নেই, তবুও মামার নূতন বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি, দু চারদিনের জন্য। চারিধারে ধু ধু মেঠো লালমাটীর রাস্তা, খানকতক নূতন নূতন ছোট বাড়ী, আর অগণিত শাল মহুয়ার বন। খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি সারা ছাড়া—জানালা ছেড়ে কোথায় যেতাম না। সামনে ধু ধু করছে মাঠ, তার মধ্যে অসংখ্য শাল গাছ। পৌষমাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমস্ত গাছের পাতাগুলি দুলে দুলে বিদায় নেবার আগের খেলায় মত্ত। রোজই দুপুরে দেখি কোলেদের একটা ছেলে তার কাছে এসে দাঁড়ায় কিছু পাবার প্রত্যাশায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে দুটী হাত ভর্ত্তি করে হাসতে হাসতে লাফাতে লাফাতে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যেত। ছেলেটাকে কিছু দান করে মনে হোত সে যেন কত খুসী হয়েছে। ছেলেটার জন্য আগে থেকে সে কিছু সঞ্চয় করে রাখত, কারণ দূর থেকে ছেলেটার মুখে হাসি দেখতে তার ভারি ভাল লাগত। ছেলেটা আবার অতিরিক্ত যেদিন পেত খুসীতে কালো মুখখানির মধ্য দিয়ে সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ত—আর কৃতজ্ঞতায় সে তার দিকে একবার তাকিয়ে দুহাতে প্রাপ্ত জিনিসগুলি তুলে নিত বুকের কাছে। একটু করে যাচ্ছে আর ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছে—এই ভেবে যে অনেকদিন সে তার কাছ থেকে এই অযাচিত স্নেহের দান পেল। ক্রমশঃ দানের বহর কমে আসতে লাগল। একদিন দেখি ছেলেটা ছল-ছল চোখে শূন্য হাতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আজ তার দান করবার কিছু নেই। রিক্ত সে! ছেলেটার দিকে তাকাতে পারছিল না। নিজেকে শূন্য করে নিঃস্ব করে সর্ব্বশেষ সামর্থ্যটুকুও সে ছেলেটাকে দান করেছে। ছেলেটার চলার পথে তাকিয়ে সে ভাবছিল আর আসবে না। আজ সব শেষ! পরদিন দেখি ছেলেটা নিত্য যে গাছতলাটিতে এসে দাঁড়াত শূন্য হাত পূর্ণ করতে সেখানে আজ দাতা গ্রহীতা কেউ নেই! শুধু জনকয়েক লোক সেখানে কথাবার্ত্তা কইছে। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম, বন-বিভাগের কর্ত্তার কাঠের দরকার হওয়াতে লোকজন নিয়ে এসেছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বড় বড় কুঠার নিয়ে তারা তার উপর আক্রমণ চালালে। যতই আঘাত করছে সাদা সাদা রস গড়িয়ে পড়ছে! আমি শুধু ভাবতে লাগলাম এ তার বেদনার অশ্রু, না জয়ের হাসি!

শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ ও বৈকুণ্ঠের উইল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের একখানি ছোট উপন্যাস। এই উপন্যাসখানিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট। তাহার ফলে উপন্যাসখানি গীতিকবিতার সুরে মর্মস্পর্শী। এমন অপূর্ব্ব গীতি-মাধুর্য্য শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে আছে কিনা সন্দেহ। একটি বৃদ্ধ ও একটি শিশুকে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র এই অপূর্ব্ব গীতি-মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উপন্যাসের শেষাংশে শরৎচন্দ্র কেবল কথাসাহিত্যিক নহেন—একজন গীতিকাব্যের কবিও।

শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন—কেবল সমাজভয়ে পরিত্যক্তা পত্নীর পুনর্গ্রহণের এবং তদনুষঙ্গিক নৈতিক সাহসের কাহিনীই প্রথমশ্রেণীর একটি রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই তিনি উপসংহারে কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই চন্দ্রনাথ-সরযূর কথা ফুরাইয়া গেলেও কৈলাসখুড়োর কথা ফুরায় নাই, তাঁহার কথাতেই গল্পটির উপসংহার হইয়াছে। শেষ পরিচ্ছেদটি নৈবেদ্যের উপরে তুলসীপত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

সবচেয়ে উপন্যাসের যে চরিত্রটি আমাদের স্মৃতিতে অক্ষয়, প্রীতিতে পরম অন্তরঙ্গ হইয়া চিরদিন বিরাজ করে, তাহা ঐ কৈলাসখুড়োর চরিত্র। এই চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যের নীলাভ্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্রের লেখনীও ধন্য হইয়াছে।

মনুষ্যত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ, হৃদয়বত্তার একটি পরিপূর্ণ প্রতীক এই কৈলাস খুড়ো। এই চরিত্র সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্রকে ধনিসংসার, মঠ-আশ্রম, টোল-চতুষ্পাঠী, সমাজের উচ্চস্তর ইত্যাদিতে আদর্শ খুঁজিতে হয় নাই, কুড়িটাকা-মাত্র-পেন্সন ভোগী দরিদ্র, দাবাখেলার আসক্ত, একটি অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী কাশীবাসী বৃদ্ধের মধ্যেই পাইয়াছেন। আমাদেরই চিরপরিজ্ঞাত অথচ চির-অবজ্ঞাত জনসমাজের মধ্যেই অনেক কৈলাসখুড়ো আছেন। আমাদের দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে—আমরা কেবল শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে আদর্শ মানুষ খুঁজি। সাধারণ লোকের মধ্যে ঐরূপ মানুষের—জনতার মধ্যে দেবতার—অস্তিত্ব প্রত্যাশাও করি না। তাই মুক্তকণ্ঠে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে—কৈলাস খুড়ো শরৎচন্দ্রের একটি অদ্ভুত আবিষ্কার। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐরূপ মানুষের সঙ্গেই একদিন কোথাও না কোথাও দাবা খেলিয়াছেন—তাই তাঁহার কাছে কৈলাস বড়ই অন্তরঙ্গ জন। শরৎচন্দ্র সেই কৈলাস খুড়োর সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিলেন—প্রথম পরিচয় হইতেই—সে আমাদেরও অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহার বিগলিত হৃদয়ের বেদনায় আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। এ অশ্রু কাশীর গঙ্গা-জলের চেয়ে পবিত্র। কৈলাসনাথেরই কাশীবাস সার্থক—কারণ, আত্মভোলা কৈলাসনাথের বিল্বপত্রধুতুরার আশীর্ব্বাদ তিনিই পাইয়াছিলেন।

কাব্যের দিক ছাড়া এই উপন্যাসে আর একটা দিক আছে। সরযূর প্রতি গভীর দরদের দ্বারা শরৎচন্দ্র সামাজিক অন্ধ সংস্কারের অসারতা দেখাইয়া তাহার উর্দ্ধে পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সমাজকে গালাগালিও করেন নাই—তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযানও চালান নাই—লৌকিক সংস্কারের তীব্র সমালোচনাও করেন নাই, পতিতার কন্যার জন্য কোমর বাঁধিয়া ওকালতিও করেন নাই! তিনি অতি-সন্তর্পণে অত্যন্ত অনুদ্ধত ভঙ্গীতে পতিতার কন্যা সরযূকে সরযূতীরের মহাসতীর পদ্মাসনে বসাইয়া দিয়া আপনার প্রাণের নিভৃত সত্যকে রূপদান করিয়াছেন।

উদারতার যে অত্যুচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে সরযূর মত হতভাগিনীকে প্রসন্ন চিত্তে কুললক্ষ্মীদের মণ্ডলীতে স্বীকার করা যায় সে উদারতা দয়ালঠাকুর ও মণিশঙ্করের চরিত্রে আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে নয়। চন্দ্রনাথের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে কিন্তু তাহাও রূপযৌবনের আকর্ষণে ও সন্তানের দৌত্যে ও স্নেহানুরোধে। শরৎচন্দ্র নিজে ইহাদের ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। সত্যোজ্জ্বল সমুদারতার উচ্চস্তরে অবস্থিত শরৎচন্দ্র তাই—এই উপন্যাসে নিজে কৈলাসনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৈলাসনাথের ভূমিকার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার চিরবন্দিত সত্যকে রূপদান করিয়াছেন।

চন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ মাত্র। সে যে সরযূকে পরিত্যাগ করিয়াছিল—তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যে দেশে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াও বন্দনীয় হইয়া আছেন—সে দেশের পাঠকের বিচারে চন্দ্রনাথ নিন্দনীয় হইবেন কেন? রামচন্দ্রও লোকভয়েই প্রাণাধিকা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—সীতা সরযূর মতই তখন সসত্ত্বা ছিলেন। সীতা বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও সাম্য আছে—কৈলাস খুড়োই এ কাব্যের বাল্মীকি। কিন্তু ত্রেতাযুগের কাব্যে অন্নবস্ত্রের চিন্তার কথা বর্জ্জনীয়—বর্ত্তমান যুগের কাব্যে তাহা বাদ দেওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ সরযূকে ত্যাগ করিলেন—কিন্তু তাহার যোগক্ষেমের ব্যবস্থা হইল কিনা তাহার খোঁজও ল'ন নাই এবং 'বাল্মীকি'র আশ্রমে তাঁহার সীতা পৌঁছিল কিনা তাহারও সন্ধান লন নাই। তবে চন্দ্রনাথের পক্ষে একটা কথা বলার আছে—চন্দ্রনাথ আর সরযূর পরীক্ষার কথা তোলে নাই। না তুলিবার একটা কারণ এই চন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত বুঝিল। সরযূ নিজে ত অপরাধিনী নয়—তাহার জননী কলঙ্কিনী। তাহা ছাড়া, খুড়া মণিশঙ্কর শেষ কথা বলিয়া দিয়াছিলেন—'যাহার টাকা আছে তাহার জাত মারে কে?' যাহাই হউক, চন্দ্রনাথ চরিত্র একেবারে মেরুদণ্ডহীন নয়—তাহার চরিত্রেও কিছু উদারতা ও তেজস্বিতা ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে সমাজসংসারের সহিত গাঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এইরূপ কুটস্থ প্রকৃতির অর্দ্ধ-উদাসীন একপ্রকার যুবচরিত্রের একটা Type এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ সেই Typeএরই একজন। শরৎসাহিত্যের হিসাবে চন্দ্রনাথ Indvvidualistic নয়—Typical.

চন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটকের দুষ্মন্ত চরিত্রকেও মনে পড়ায়—বিশেষতঃ শিশুপুত্র বিশেশ্বরের কাজটা অনেকটা সর্ব্বদমন ভরতের মতই হইয়াছে।

লৌকিক সংস্কারের সহিত সত্য ও প্রেমের দ্বন্দ্ব সাহিত্যের চিরন্তন বিষয় বস্তু। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বে প্রেমকেই—সেই সঙ্গে তদাশ্রিত সত্যকেই বিজয়ী করিয়াছেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদে মণিশঙ্করের কথাগুলো উদারপন্থী শরৎচন্দ্রের নিজেরই অন্তরের কথা—"দোষলজ্জা প্রতিসংসারে আছে। মানুষের দীর্ঘজীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়। দীর্ঘপথটির কোথাও কাদা, কোথাও পিছল, কোথাও বা উঁচুনীচু আছে—তাই বাবা, লোকের পদস্খলন হয়। তারা কিন্তু সে কথা বলে না, তারা পরের কথাই বলে। পরের দোষ পরের লজ্জা চীৎকার ক'রে তারা যে ঘোষণা করে, সে শুধু আপনাদের দোষটুকু গোপনে ঢেকে ফেলবার জন্য। তারা আশা করে, পরের গোলমালে নিজের লজ্জাটুকু চাপা প'ড়ে যাবে।" *

বৈকুণ্ঠের উইল—যে সকল অকপট মুগ্ধ প্রকৃতির লোকের মুখে ও বুকে অক্ষরে অক্ষরে মিল নাই তাহাদের বাক্য ও আচরণ, অনেক সময় ভ্রান্তভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করে। সেইরূপ জটিলতার দ্বারা আখ্যানবস্তু বয়ন করিয়া শরৎচন্দ্র কয়েকটি গল্প উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। যাহারা মুখে মধুভাষী ও সাধু, কিন্তু বুকে ইতর ও নীচ এরূপ মানুষের অভাব নাই। এইরূপ চরিত্র দত্তার রাসবিহারীর। মুখেও সৎ, বুকেও সৎ এইরূপ চরিত্র শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অনেক আছে। মুখেও অসৎ বুকেও অসৎ—এইরূপ 'অকপট' চরিত্রও অনেক আছে—দত্তার বিলাস চরিত্র এই শ্রেণীর। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে—যাহারা বুকে সৎ, কিন্তু মুখে সকল সময় তাহা প্রকাশ পায় না। বরং মুখের কথায় অনেকে তাহাদের হৃদয়ের সংবাদ ধরিতেই পারে না। এই শ্রেণীর অনেকগুলি চরিত্র শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে আছে।

এই শ্রেণীর চরিত্রের দ্বারা বিশেষতঃ তাহাদের মুখের তিক্ত-মধুর বচন বৈচিত্র্যের দ্বারা শরৎচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে নূতন ধরণের রস সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ চরিত্র কথা-সাহিত্যের পক্ষে বড়ই উপযোগী। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, হৃদয় মহৎ উদার ও মধুময়—কিন্তু কোন একটি মনোবৃত্তির অতিরিক্ত প্রাবল্যের জন্য, মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষা সংস্কৃতির অভাবে অথবা কপট নীচাশয় ব্যক্তিদের প্ররোচনায় বা প্রভাবে—চরিত্র বিশেষের হৃদয়ে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্য্যন্ত তাহার সদ্‌বৃত্তিই জয়লাভ করিতেছে—তাহার মৌলিক মনুষ্যত্ব নষ্ট হইতেছে না, মাঝে মাঝে হৃদয়ের মাধুর্য্য মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় আচ্ছন্ন হইতেছে মাত্র। এই দ্বন্দ্বের দ্বারা চরিত্রের জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে—এবং ইহাতেই পুষ্টিলাভ করিয়া আখ্যান বস্তুও জটিল হইয়া পড়িতেছে। শরৎচন্দ্র এই দ্বন্দ্বজাত জটিলতাকে কতকগুলি রচনায় চমৎকার রসরূপ দিয়াছেন। এই দ্বন্দ্বের ফলে চরিত্রগুলি মুখে ও বুকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সাধারণতঃ অশিক্ষিত অমার্জ্জিত সরল নির্ব্বোধ অথচ স্নেহময় উদার নিঃস্বার্থ চরিত্রের পক্ষে এই মুখ ও বুকের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক বলিয়া শরৎচন্দ্র মনে করিয়াছেন।

অবশ্য যেখানে নরনারীর প্রণয়ের কথা, সেখানে এইরূপ চরিত্রের ততটা প্রয়োজন নাই। সেখানে দ্বিধা সংশয় সংকোচ মান অভিমান এমন কি হাবভাবের বিলাস ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। যেখানে বাৎসল্য, স্নেহ ও অন্যান্য মধুর বৃত্তির কথা সেখানেই অশিক্ষিত নির্ব্বোধ চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। দত্তার বিজয়া নরেন্দ্রের ব্যাপারটা প্রথম শ্রেণীর। রামের সুমতির নারায়ণী, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, নিষ্কৃতির বড়বৌ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র। আর বৈকুণ্ঠের উইলের মূর্খ নির্ব্বোধ গোকুল চরিত্র এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বৈকুণ্ঠের উইলে গোকুল পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃগতপ্রাণ, সরল ও সাধু-চরিত্র। কিন্তু সে নির্ব্বোধ,—এমনি নির্ব্বোধ যে বাপ উইল করিয়া গিয়াছে—সে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেই যে আপদ চুকিয়া যায় তাহাও সে বুঝে না। সে কথাও তাহার বাড়ীর দাসী হাবুর মার কাছ হইতে শুনিতে হয়। সে অশিক্ষিত, এমনি অশিক্ষিত যে 'অনার গ্র্যাজুয়েট' ভাইকে উপদেশ দেয় বাঙ্গালী হাকিমদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলিতে এবং ভাইএর মেডাল সে সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়। পিতৃবিয়োগ, বাপের উইল, বাড়ুয্যে মহাশয়ের উপদেশ, ভাইএর চরিত্রহীনতা এবং তজ্জনিত দুর্নাম, স্ত্রীর প্ররোচনা, শ্বশুরের কুপরামর্শ, বিমাতা ও ভ্রাতার মিতভাষণ—এই সমস্তের চক্রান্তে পড়িয়া সে হতবুদ্ধি। তাহার এই হতবুদ্ধিতা তাহার মুখকে করিয়া তুলিয়াছে কর্কশ ও রুক্ষ এমন কি তাহার আচরণকে করিয়া তুলিয়াছে অর্থহীন এবং এলোমেলো। পিতার ব্যবসায়টি নষ্ট না হয়—গোকুলের

* চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের সদুত্তর উপন্যাসে পাওয়া যায় না। চন্দ্রনাথ শিক্ষিত ভদ্রযুবক—সরযূকে সে খুবই ভালবাসিত—তাহার আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো, সে নিতান্ত অবিবেচক বা নিতান্ত সমাজভীরু শ্রেণীর লোকও নয়। একজন অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবা পাচিকার কন্যাকে বিবাহ করিবার সৎসাহস তাহার ছিল। তাহা ছাড়া, সে নিঃস্পৃহ উদাসী প্রকৃতির লোক। শ্রীকান্তের চরিত্রের প্রভাব শরৎচন্দ্রের একাধিক যুবক চরিত্রে আছে, চন্দ্রনাথেও কিছু আছে। এ স্ত্রী যে সধবা চন্দ্রনাথ তাহা জানিত না—তাহা না জানা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে জানিবারই কথা। সে জানিত না—কিন্তু হরিবালা জানিত। হরিবালা তা'হা চন্দ্রনাথকে জানাইয়া দিল। চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু একথা জানা সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ দুই বৎসর ধরিয়া সরযূর কোন খোঁজ লইল না। দয়ালঠাকুর বা তাহার জননীর কাছে সে আশ্রয় পাইল কিনা তাহারও সন্ধান পাইল না। এতদিন যে সরব কোন অর্থ সাহায্য পায় নাই—সে খেয়ালও তাহার নাই। মুখে সে বলিল—পাঁচশত টাকা করিয়া পাঠাইতে—কিন্তু তাহার পর দুই বৎসর ধরিয়া সে যে কোন সাহায্যই পাইল না, তাহার সন্ধান সে রাখিল না। কোথায় কাহার নামে টাকা পাঠানো হয়—কে গ্রহণ করে—কোন খোঁজই সে রাখিল না। দয়াল ঠাকুর কি চরিত্রের লোক তাহা তাহার জানিতে বাকি ছিলনা। সে আশ্রয় দিল কিনা এবং তাহার কাছে টাকা পাঠাইলে সরযূ পায় কিনা—তাহার খবরও সে লয়-নাই। এইরূপ ঔদাসীন্য চন্দ্রনাথ চরিত্রের পক্ষে সমঞ্জস ও স্বাভাবিক কিনা এ প্রশ্ন আজকালকার পাঠকের মনে জাগে। পাঁচশত টাকা মাসোহারার আদেশ চন্দ্রনাথের মুখে শোনা যায়—কিন্তু ধনিগৃহের কোন আবেষ্টনী অথবা ধনিসংসারে উপযুক্ত কোন আচরণ উপন্যাসে রূপলাভ করে নাই। রাখাল ভট্টাচার্য্যকে জেলে পাঠানোর ব্যাপারটাও খুব সতর্কতার সহিত রচিত হয় নাই।

সেদিকেও দৃষ্টি ছিল। বিনোদ অসচ্চরিত্র, সে বিষয়ের অংশ পাইলে উড়াইয়া দিবে। যত দিনে তাহার চরিত্র সংশোধন না হয় ততদিন ব্যবসারটিকে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবার মত বিদ্যা বুদ্ধিও তাহার ছিল না। মুখে সে যাহা বলুক বুক তাহার খাঁটিই ছিল, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীর মতলব মাটি করিয়া দিল।

যাহারা তাহার বুকটিকে চিনিত না—তাহারা তাহার মুখের কথায় উৎসাহিত হইয়া তাহাকে ভুল বুঝিয়া আকাশকুসুম রচনা করিতেছিল। যাহারা তাহার বুকটিকে ভাল করিয়াই চিনিত তাহারাও অর্থাৎ তাহার সেই বিমাতা ও ভ্রাতাও তাহার মুখের কথায় ও এলোমেলো আচরণে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল। এই ভুলের মালাই শরৎচন্দ্রের হাতে ফুলের মালা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের গোকুল রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা গল্পের তাঁতী ভাই বংশীকে মনে পড়ায়।

গোকুলের বাহ্য মৌখিক অভিব্যক্তিতে শরৎচন্দ্র একটু আতিশয্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। Emphasisএর মাত্রা একটু বেশি হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও মতে ইহাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযমের অভাব হইয়াছে। গোকুল একজন পাকা ব্যবসায়ী, তাহারই বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে ব্যবসায়ে এমন শ্রীবৃদ্ধি। তাহার পক্ষে শিশুর মত নির্ব্বোধ হওয়ার কথা নয়।

শরৎচন্দ্র বাচালতার দ্বারা গোকুল ও মনোরমার চরিত্র ফুটাইয়াছেন, কিন্তু মৌন ও মিতভাষণের দ্বারা ফুটাইয়াছেন ভবানী চরিত্রটিকে। এই চরিত্র সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সংযম ও সামঞ্জস্যবোধ দেখা যায়। মিতভাষণ ও মৌনের ব্যঞ্জনায় কি অপূর্ব্ব চরিত্রসৃষ্টি হইতে পারে, ভবানীচরিত্র তাহার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

নিমাই রায় ও বাড়ুয্যের চরিত্র যথাযথই হইয়াছে। ইহারা দত্তার রাসবিহারীর অমার্জ্জিত রূপ।

সত্যচরণ শাস্ত্রী

শ্রীসুবোধকুমার রায়

মানুষ সৃষ্টি করে ইতিহাস, ইতিহাস গড়ে মানুষের মত মানুষ। অতীতের ভুল, ত্রুটি, অতীতের গৌরব, কলঙ্ক বহন করে এনে ইতিহাস মানুষের প্রাণে যে আগুন জ্বালিয়ে তোলে তারই জ্বালায়, তারই আলোকে মানুষ চলবার চেষ্টা করে সত্যকারের গৌরবের পথ চিনে। ভবিষ্যতে আর যাতে কেউ কলঙ্কের পথে পা না দেয় তারই নির্দ্দেশ করে ইতিহাস।

সত্যচরণ শাস্ত্রী ছিলেন ঐতিহাসিক। সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন ঐতিহাসিক গবেষণায়। দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট পুস্তকাবলীই তার প্রমাণ। এক একটা জীবনকে উপলক্ষ্য করে লিখে গেছেন এক এক সময়ের সারা দেশের ইতিহাস। অতীতের বাংলা, অতীতের ভারতবর্ষ এক একটা বিশেষ সময় নিয়ে মূর্ত্ত হয়ে আছে তাঁর লেখার মধ্যে।

যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বংশ-গৌরবের দিক দিয়ে বাংলা দেশে তা চিরপ্রসিদ্ধ, তাই সত্যচরণ ছিলেন আবাল্য তাঁর বংশ গৌরবে গরীয়ান। একখানি পত্রে স্বনামধন্য সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে লিখেছেন, "সকল বড় বংশই কোন না কোন বিশেষত্ব গুণে বড় হয়ে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরে ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায় ম'শার বংশেও সে বিশেষত্ব ছিল। আমি ধনৈশ্বর্য্যের কথা বলছি না, সেটা ছোট বড় অবস্থার তুলনামূলক কথা। আমার কথা প্রকৃতি আকৃতি প্রভাব প্রভৃতি নিয়ে।"

"ছেলেবেলা উক্ত বাড়ীটিকে আমরা কাবলেদের বাড়ী বলেই শুনতুম ও জানতুম। বোধ হয় তাঁরা প্রায় সকলেই ছয় ফিটের ওপর এবং প্রস্থেও তদনুরূপ ছিলেন বলে। প্রভাবে ও lordly কোন কিছুর ভয় ডর রাখতেন না কথায় বা কাজে। উচ্চ শিরেই চলে যেতেন। প্রতিবাদের সাহস কেউ পেতেন না বরং ভয়ই পেতেন। এই ছিল তাদের প্রভাব ও প্রকৃতির কথা। মনে যেন থাকে এর একটা কথাও আমি মন্দ অর্থে ব্যবহার করছি না, বিশেষত্বটাই বলছি। বরং আমাদের ঘরে ঘরে সেরূপ বলিষ্ঠ শরীর ও মনের সাহসী বাঙালী পাওয়া প্রার্থনীয় (desirable) বলেই মনে করি। আজ আমার কথাটা সেই বংশের স্বনামখ্যাত ৺সত্যচরণ শাস্ত্রী সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন উক্তবংশের ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাতী শ্রেণীভুক্ত।"(১)

তাঁর বংশ পরিচয় ও জীবন কাহিনীর কথা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করবো। সেই নিরলস একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক স্বদেশ ও সাহিত্যের কল্যাণে যে অমূল্য সম্পদ দান করে' গেছেন তা স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক গবেষণায় তার প্রথম দান ছত্রপতি মহারাজা শিবাজীর জীবনচরিত (১৮৯৫ খৃঃ)। শ্রদ্ধাস্পদ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে লিখেছেন যে "শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে হানিবলের জীবনী লেখেন।" তিনি যে উক্ত বইখানি লেখার চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু আমি বহু চেষ্টায়ও ঐ পুস্তকখানি সংগ্রহ করতে পারিনি—উপরন্তু এমন কতকগুলি প্রমাণ পেয়েছি যাতে মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে শাস্ত্রী মহাশয় হানিবলের জীবনী লেখা সম্পূর্ণ করেছিলেন কিনা এবং তা ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। কেন না বম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকা শাস্ত্রী মহাশয় ও শিবাজীর জীবনচরিত পুস্তকের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন ..."He was once writing a life of Hannib.l in Be.gali when a friend of his suggested him to spend his energy on writing a life of Sivaji rather than that of Hnnibal. young Chatterjee took up the idea with great zest." আবার বরদার 'বড়দা বৎসল' পত্রিকাও লিখছেন যে "তিনি প্রথমে হানিবলের চরিত্র লেখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন এক বন্ধুর অনুরোধে এই লেখার চেষ্টা ত্যাগ করে' বাংলায় শিবাজীর চরিত্র লেখা আরম্ভ করেন।" এই পত্রিকা দুইখানির উক্ত উক্তিই আমার 'হানিবল' পুস্তক সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ।(২)

বাংলা সাহিত্যের আসরে ছত্রপতি শিবাজীকে বরণ করে' এনে তিনি

---

(১) শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাস্ত্রী মহাশয়ের একই গ্রামে জন্ম এবং উভয়ে সমসাময়িক। তাই তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবার আশায় কেদারবাবুকে এই প্রবন্ধ লেখার বাসনা জানাই। তিনি আমার পত্রের উত্তরে পূর্ণিয়া থেকে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখে পাঠিয়েছেন তাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আকৃতিপ্রকৃতি বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

(২) যদি কোন সহৃদয় পাঠক দয়া করে' এই পুস্তকখানির সন্ধান দিতে পারেন তা হলে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

যে যশ ও গৌরব অর্জন করেছিলেন তা তখনকার সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে, মহারাষ্ট্রী ভাষার রীতিমত শিক্ষা ও আলোচনা করে' সেই বীরশ্রেষ্ঠ ছত্রপতির লীলাক্ষেত্র হতে' জীবনী লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যে যে অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই পত্রিকাগুলি তা অতি সমাদরে গ্রহণ করে' তার যশোগাথা কীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই সকল পত্রিকা থেকে দুই একটী মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া আশা করি অন্যায় হবে না।

"আজ আমরা শিবাজীর একখানি প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, এরূপ নির্দ্দোষ চিত্র ইহার পূর্ব্বে আমরা আর দেখি নাই। বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী এই চিত্র সৃজন করিয়াছেন। সত্যচরণ বাবুকে আজ আমরা শত ধন্যবাদ দিতেছি। এরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা আমরা সচরাচর আজকাল বাঙ্গালীর ভিতর দেখিতে পাই না। সত্যচরণ-বাবুর শিবাজীর জীবনী দেখিয়া আমরা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে আশাশূন্য হইতে পারি না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বাংলার ভবিষ্যৎ আকাশ চির অন্ধকার থাকিবে না।" (মুর্শিদাবাদ হিতৈষিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩০২)

পিতার অনুরোধকে আদেশরূপে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তিনি যে কাজে হাত দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ করা যে তখনকার দিনে কত দুরূহ কাজ তা আজ অনুমান করাও শক্ত। শিবাজীর মত ভারতগৌরব বীর পুরুষের চরিত্রকে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম রূপ দেওয়ার-গৌরবও তাঁর। "**Indian spectator's Bengal correspondent says,…it is the first biography in any Indian…vernacular of the fonnder of the Maharatta Empire**" সকল পত্রিকার সমস্ত মতামত লিপিবদ্ধ করে' লাভ নেই। অনেক সমালোচক ও পত্রিকা বইখানিকে নির্দ্দোষ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন বল্লেও একেবারেই যে ত্রুটী শূন্য তা নয়। পুস্তকের ভাষা যে স্থানে স্থানে অযথা রূঢ়ভাব ধারণ করেছে একথা স্বীকার না করে' উপায় নেই। সে সময়েও এই ত্রুটী কোন কোন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৯০৫ সাল, ১৭ই বৈশাখ এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' পত্রিকায় কোন এক সমালোচক একখানি পত্রে শিবাজী চরিতের যথাযথ সমালোচনায় এই ত্রুটীর কথা উল্লেখ করেছেন। ভাষাগত ত্রুটী ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যানুশীলনেও যে তাঁর কিছু কিছু প্রমাদ ঘটেছে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ তা নির্দ্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় এরূপ সামান্য সামান্য ত্রুটি অবাঞ্ছনীয় হলেও অস্বাভাবিক নয়। এই সমস্ত সামান্য ত্রুটি বা ভুল দিয়ে শিবাজীর জীবন চরিতের বিচার চলে না। শিবাজীর জীবন চরিত বাঙ্গালা তথা সারা ভারতবর্ষের আদরের ও গৌরবের জিনিস।

তাঁর দ্বিতীয় অবদান "বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত।" (১৮৯৬ খৃঃ) প্রথম বাংলা গদ্যে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র লিপিবদ্ধ করার গৌরব রামরাম বসুর। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক আগে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত পুস্তকখানি রচনা করে গেছেন। সত্যচরণ বাবুর "তথ্যান্বেষী মন শুধু পুস্তক পাঠে তৃপ্ত না হয়ে যশোহর, সুন্দরবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করে' গভীর গবেষণা ও নূতন নূতন তথ্য অনুশীলন দ্বারা যে ভাবে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

"মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ইংরাজিশিক্ষিতগণের নিকট পরিচিত করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। যেদিন হইতে বাঙ্গালী বালক ভীরু ও কাপুরুষ সেইদিন হইতে সকলে অহঙ্কার করিয়া থাকে যে কাপুরুষ হইলেও আমরা তীব্র বুদ্ধিজীবী। প্রতাপাদিত্য পাঠ করিয়া এ ভ্রম ঘুচিবে। প্রতাপাদিত্য পাঠ করিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দ হয় তাহা লিখিয়া বোঝানো যায় না। শরীর কণ্টকিত হয়, হৃদয় উথলিয়া উঠে। আবেগে উত্তেজনায় আত্মহারা হইতে হয়। ইংরাজ-বুট-প্রহার-সহিষ্ণু,…সদা ম্রিয়মাণ, সেলাম তৎপর বাকপটু বাঙ্গালী কখন যুদ্ধ করিতে পারিত, মোগল সৈন্যকে সম্মুখ সমরে হঠাইত, মহাবীর মানসিংহকে বিহ্বল এবং ত্রস্ত করিত ইহা যেন স্বপ্নের কথা, গল্পের কথা, বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না, ধারণা করিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। যাহা ছিল তাহা গিয়াছে, যাহা পাইয়াছিলাম তাহা অবহেলায় হারাইয়াছি। আবার আসিবে কি? আবার পাইব কি? এমনি স্মৃতির ভগ্নস্তূপ আলোড়িত করিয়া, এমনি অতীতের মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া সুবর্ণকণা ও অমৃতের ভাণ্ড পাওয়া যায় না কি? কি বলিব, কোন ভাষায় এমন পুস্তকের সুখ্যাতি করিব জানি না।…" (বঙ্গবাসী)

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর প্রতাপাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে আর কোনরূপ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র চিত্রণে যে অনেকাংশে তাঁর কাছে ঋণী সে কথা স্বীকার করে মান্যবর সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যশোহর খুলনার ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে "আধুনিক সময়ে তিনি (সত্যচরণ শাস্ত্রী) সর্ব্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করেন; তাই তাঁর ভ্রান্ত অভ্রান্ত বহু মত এখানে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্ঠা পূরণ করিয়াছে।" বাঙ্গালা দেশ "ছত্রপতি শিবাজী"র মতই প্রতাপাদিত্যকে গ্রহণ করেছিল অতি আদরের সঙ্গে।

তাঁর তৃতীয় পুস্তক 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। নন্দকুমার সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত। একদিকে মেকলে, মালেসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ নন্দকুমারের চরিত্রে নানারূপ দোষারোপ করে' নন্দকুমারের ফাঁসী যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল তা প্রমাণ করবার চেষ্টা কিছু কম করেন নি, অন্যদিকে ওয়াল্‌স্, বেভারেজ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মহারাজার গুণগানও করেছেন যথেষ্ট। হেষ্টিংস্ যে ইম্পের সাহায্যে নন্দকুমারকে অন্যায়ভাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যেই ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে ছিলেন সে কথা তাঁরা স্পষ্টভাবে প্রমাণ ও প্রচার ক'রতে দ্বিধা করেন নি। কাজেই নন্দকুমারের জীবনচরিত লেখায় পদে পদে যে কত বাধা তা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সত্যচরণবাবু সেই সকল বাধা অতিক্রম করে বার্ক, মেকলে, মিল, বেভারিজ, ওয়াল্‌স্, ষ্টিফেন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি এবং নন্দকুমার সম্বন্ধীয় নানারূপ নথিপত্র পর্য্যালোচনা করে সুনিপুণ ভাবে মহারাজের জীবনচরিতের যথাযথ রূপ দিয়ে আপনার কৃতিত্ব, বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই পুস্তকখানি প্রকাশ হবার পর বাঙ্গালী সুধী সমাজেও এ বিষয়ে আন্দোলন সুরু হয়েছিল। ১৩১০ সাল, শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় 'নবকৃষ্ণের জীবন চরিত ও নন্দকুমার' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন,…"……শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী স্বপ্রণীত নন্দকুমার চরিত নামক গ্রন্থে মহারাজের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করায় অনেকের সে বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলে দেখিতেছি যে শ্রদ্ধাষ্পদ ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন্, এল, ঘোষ সাহেব মহোদয় স্বরচিত 'নবকৃষ্ণের জীবন' চরিত নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন।" ইত্যাদি। নিখিলবাবু স্বেচ্ছায় এই আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে ঘোষ সাহেবের নানারূপ বিরুদ্ধ মত ও যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। (১) শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৩০৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গীয় সমাজ' নামক গ্রন্থে নন্দকুমারের ফাঁসী সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে সত্যচরণবাবু প্রভৃতির মতই সমর্থিত হয়েছে।

(১) সাহিত্য—শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ১৩১০ দ্রষ্টব্য।

মহারাজ নন্দকুমারের পর তাঁর দুখানি পুস্তক 'ক্লাইব চরিত' বা 'জালিয়াৎ ক্লাইব' (১৩১৪ সাল) ও ১৩১৬ সালে 'ভারতে অলিকসন্দর' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক দুখানি রচনায় ও তাঁর ইতিহাসে গভীর জ্ঞান, রচনানৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভকে একটী ভারতীয় ভাষায় জালিয়াৎ নামে অভিহিত করে' প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা জালিয়াৎ সাব্যস্ত করা ইংরাজশাসিত ভারতীয়ের পক্ষে যে কতখানি দুঃসাহস তা ভারতবাসীমাত্রেই অনুমান করতে পারেন। সাহসী লেখক পুস্তকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন,…"জাল না করিলে বোধ হয় সিরাজের পতন হইত না,…পলাশীর যুদ্ধ হইত না,…ইংরাজের ভাগ্যোদয় হইত না।"

এই বইখানির রচনাভঙ্গী আগের বইগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। অন্যান্য বইগুলি অপেক্ষা জালিয়াৎ ক্লাইবে ভাবাতিশয্যের (**sentiment**) স্থান অতি অল্প, ভাষা ও পূর্ব্বাপেক্ষা মার্জ্জিত ও বহুল পরিমাণে আধুনিক।

'ভারতে অলিকসন্দর' পুস্তকে আলেকজাণ্ডারের বাল্যজীবন থেকে আরম্ভ করে' ভারত আক্রমণ ও পরে ভারত পরিত্যাগ অবধি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে আলোচনা ক'রে তাঁর ঐতিহাসিক খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই পুস্তকখানি রচনা ক'রতে তাঁকে বহুশ্রম ক'রতে হ'য়েছিল। আলেকজাণ্ডার ও সেই প্রাচীন কালের ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানারূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন ছাড়াও তাঁকে রচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য গান্ধার তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ ক'রতে হয়েছিল। এই পুস্তকখানিতে সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক রীতিনীতি ও বহু কৌতূহলপূর্ণ কাহিনীর সন্নিবেশ থাকায় পুস্তকখানি হয়ে উঠেছে যেমন গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ, তেমনি সুখপাঠ্য।

সত্যচরণবাবুর পুস্তকাবলী পাঠে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ। তাঁর পুস্তকাদি পাঠ ক'রলে নিরপেক্ষ পাঠকের মন একদিকে যেমন স্বতঃই জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয় অন্যদিকে তেমনি অতিরিক্ত হিন্দু-প্রীতি ও স্থানে স্থানে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিরূপতায় ব্যথিত হয়ে ওঠে। নিরপেক্ষ সমালোচকের গৌরব অর্জ্জন ক'রতে হ'লে ঐতিহাসিককে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সৃষ্টির মধ্যে সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। মনে হয় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ই এই অভাবের কারণ।

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন ধার্ম্মিক, তেজস্বী ও মুক্তিকামী পুরুষ। কিশোর বয়স থেকে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের গড়ন হয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণের মত অধ্যয়নশীল, কর্ম্মঠ ও নির্ভীক। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় সারাজীবন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে নিরলস কর্ম্ম প্রচেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। একধারে যেমন ইতিহাস ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যধারে তেমনি ভ্রমণবীর। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ও নানা দেশ ভ্রমণের ইচ্ছায় হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, বম্বাই, সীমান্ত প্রদেশ থেকে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর সেই কর্ম্মবহুল জীবনের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়…তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি তাঁর জীবনী আলোচনা করবো।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার,…চৈত্র সংক্রান্তির দিন তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চিকিৎসা ব্যবসায়ী,…কিন্তু প্রথমে তিনি চাকুরী করতেন গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে। অফিসে সাহেবের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হওয়াতে সেই চাকুরি ত্যাগ করে' চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের বাসনায় এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত চন্দনপুরের জমিদারের অনুরোধে প্রথম তিনি চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন সেই চন্দনপুর গ্রামে গিয়ে।

পিতামহ ৺নবকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একধারে যেমন নির্ভিক ও কর্ম্মঠ, অন্যধারে তেমনি রসিক ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। সত্যচরণবাবু বাল্যকালে পিতামোহের কাছে তাঁর স্বরচিত কবিতাদি ও নন্দকুমারের ফাঁসী প্রভৃতি যে সকল ঘটনা তাঁর জীবিতাবস্থায় ঘটেছিল সেই সকল পুরাতন কাহিনী শুনতেন। তিনি ১২০ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে পরলোকগমন করেন।

তিন বছর বয়সে সত্যচরণ একদিন পুকুরে আঁচাতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিলেন জলে। তাঁর মা তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় তুলে এনে অতি কষ্টে সে যাত্রা জীবনরক্ষা করেছিলেন। যদি আর কিছুক্ষণ জলে থাকতে হোতো তাহলে বোধ হয় সেই ৩ বছর বয়সেই তাঁকে ফেলতে হোতো জীবনের শেষ নিশ্বাস।

তাঁর হাতেখড়ি হয় পাঁচ বছর বয়সে এবং সাত আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে চলে যান চন্দনপুর। সেখানে ৬।৭ মাস বাস করে' পূজার সময় আবার ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হোতো। এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় বাহুল্য হ'বে না যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দুর্গোৎসবের কয়দিন তাঁদের বাড়ীতে এসে প্রতিমার সামনে বসে মায়ের নাম শোনাতেন সকলকে ; সত্যচরণবাবুও বাল্যকালে রামকৃষ্ণদেবের কণ্ঠনিঃসৃত সেই গান শুনেছেন। চন্দনপুর থেকে ফিরে ভর্ত্তি হন স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রবল ; রামায়ণ, মহাভারত পড়ার ঝোঁক ছিল অসাধারণ।

তাঁর এক খুড়া নেপালে কর্ণেল হেমন্ত বাহাদুর নামে একজন সর্দ্দারের ছেলেদের ইংরাজী পড়াতেন। তিনি ১০।১১ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করেন নেপালে। নেপাল যাবার পথে হিমালয় দেখে সত্যচরণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ; সেই শিশুমনে হিমালয় কতখানি ছাপ ফেলেছিল, কতখানি আনন্দ বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল তা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি…"যাইতে যাইতে অদূরে পৃথিবীর মানদণ্ড হিমালয় দেখিতে পাইলাম। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্বেত উষ্ণীষ পরিশোভিত যেন বিরাটকায় নীল পুরুষ সৃষ্টির আদিকাল হইতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যতই উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম হিমালয় ততই স্পষ্টতর হইয়া আমার বিস্ময়কে অধিকতর বর্দ্ধিত করিতে লাগিল।" তিনি এগার মাস ছিলেন নেপালে। এখানে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল হেমন্ত বাহাদুরের কাছে শিক্ষা ক'রেছিলেন কিছু কিছু যুদ্ধ বিদ্যা। এই সর্দ্দার তাঁর আত্মীয় স্বজন ও অনুচরবর্গের ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী গড়েছিলেন যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্য…। সত্যচরণকেও যোগ দিতে হয়েছিল সেই সৈন্যবাহিনীতে। এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালে অবস্থান ও কর্ণেল হেমন্ত বাহাদুরের সংস্পর্শে এসেই তাঁর অন্তরে প্রথম জাগরিত হয় স্বদেশানুরাগ ও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন।

নেপাল থেকে ফিরে তিনি যান বাঁকিপুর, তখন তাঁর মাতা ছিলেন সেখানে। এতদিন পরে ফিরে এলেন মায়ের কাছে, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হলেন মাতৃহারা। বাঁকিপুর অবস্থান কালে তাঁর মা মারা যান ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তাঁর অসীম। মায়ের মৃত্যুর পরদিনই ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। (আগামী বারে সমাপ্য)

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(৬)

প্রথম অধিকরণ

প্রথম প্রকরণ—বিদ্যাসমুদ্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়—ত্রয়ী-স্থাপনা

মূল :—সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ—এই তিনটি (বেদ) ত্রয়ী,—অথর্ব্ববেদ ও ইতিহাস-বেদ—বেদ-সমূহ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দোবিচিতি ও জ্যোতিষ—অঙ্গ-সমূহ।

সঙ্কেত :—সাম—গীতি-রূপ মন্ত্র। ঋক্—ছন্দোবদ্ধ পাদবদ্ধ মন্ত্র—যজুঃ—গীতি ও পদ্য ব্যতীত গদ্যাত্মক মন্ত্র। সামমন্ত্রের সমষ্টি সামবেদ বা সাম-সংহিতা বা সামবেদ-সংহিতা। ঋঙ্‌মন্ত্রের সমষ্টি—ঋগ্‌বেদ বা ঋক্-সংহিতা বা ঋগ্‌বেদ-সংহিতা। যজুর্মন্ত্রের সমষ্টি যজুর্ব্বেদ বা যজুঃ-সংহিতা বা যজুর্ব্বেদ-সংহিতা। মন্ত্র এই তিন শ্রেণীর। বেদ তিন শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত বলিয়াই 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হয়—ইহাই মহর্ষি জৈমিনির অভিপ্রায়। তাঁহার মতে—অথর্ব্ববেদের মন্ত্রাবলীও এই তিন শ্রেণীরই অন্তর্গত—নূতন কোন চতুর্থ-শ্রেণী-ভুক্ত নহে। অতএব, অথর্ব্ববেদ-সংহিতা সংহিতা-হিসাবে চতুর্থ সংহিতা হইলেও—মন্ত্রের দিক্ দিয়া (নূতন কোন চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত নহে বলিয়া) 'ত্রয়ী'রই অন্তর্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—কৌটিল্য জৈমিনির এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন নাই। জৈমিনির মতে—ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রে রচিত চারিখানি সংহিতাই (ঋক্-সংহিতা, সাম-সংহিতা, যজুঃ-সংহিতা ও অথর্ব্ব-সংহিতা) 'ত্রয়ী'-পদ-বাচ্য। পক্ষান্তরে, কৌটিল্য তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার মতে—ত্রিবিধ-মন্ত্রাত্মক সংহিতা-চতুষ্টয় 'ত্রয়ী' নহে—কিন্তু ঐ তিন প্রকার মন্ত্রের এক এক শ্রেণীভুক্ত মন্ত্রে যথাক্রমে রচিত তিনখানি মাত্র সংহিতাই (সামমন্ত্রে রচিত সাম-সংহিতা, ঋঙ্‌-মন্ত্রে গঠিত ঋক্-সংহিতা ও যজু-র্মন্ত্রে বিরচিত যজুঃ-সংহিতা) 'ত্রয়ী'-শব্দের বাচ্য ; অথর্ব্ব-সংহিতা—ত্রয়ীর অন্তর্গত নহে—তবে 'বেদের'র অন্তর্গত। 'বেদ'-শব্দে বুঝাইতেছে—ত্রয়ী (অর্থাৎ—সাম-সংহিতা, ঋক্-সংহিতা ও যজুঃ-সংহিতা) ও অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, আর ইতিহাস-বেদ। পাঞ্জাব সংস্কৃত সিরিজের অর্থশাস্ত্রের সংস্করণে বলা হইয়াছে—**"The three Vedas are called the triple science (trayi), and are superior in sanctity to the Atharvaveda and to the Itihasaveda, i. e., the epics or epic lore in general, which is elsewhere called a fifth Veda."** শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদও প্রায় অনুরূপ—**"The three Vedas...constitute the triple Vedas. These together with...are known as the Vedas."** সামবেদের নাম সর্ব্বাগ্রে থাকায় শ্যামশাস্ত্রী এই ক্রমটিকে প্রণিধান-যোগ্য বলিয়াছেন। ইতিহাস-বেদ—মহাভারতাদি (গঃ শাঃ) ; ইতিহাসের বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা—বর্ণোচ্চারণের উপদেশক শাস্ত্র—পাণিনীয়-শিক্ষাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ; **phonetics (SH)**। কল্প—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের উপদেশক শাস্ত্র—আশ্বলায়নাদি-রচিত সূত্র-গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য ; **ceremonial injunctions (SH)** ;—**injunctions** বলা উচিত হয় নাই ; কারণ, **injunction** বলিতে বুঝায় বিধি-শাস্ত্র—উহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড—ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, কল্প—বিধির বিনিয়োগ কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিবরণাত্মক পৌরুষেয় আর্ষ গ্রন্থ। ব্যাকরণ—অব্যাকৃত (অব্যক্ত) শব্দের ব্যাকরণ (ব্যক্তীকরণ) যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে—পাণিনি-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রভৃতি গ্রন্থ ; **grammar (SH)** ; শব্দানুশাসন (গঃ শাঃ) ; নাম-ধাতু-পারায়ণ (রাজশেখর)। নিরুক্ত—বৈদিক শব্দাবলীর নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থ—যথা যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত ইত্যাদি ; নির্ব্বাচন-শাস্ত্র (গঃ শাঃ) ; **glossarial explanation of obscure Vedic terms (SH) ; etymology of typical Vedic expressions**—বলাই ভাল। ছন্দোবিচিতি—ছন্দের 'চয়নিকা'—ছন্দঃ-শাস্ত্র—পিঙ্গলাদি-প্রণীত। লৌকিকযুগে মহাকবি দণ্ডী 'ছন্দোবিচিতি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন—কিন্তু বস্তুতঃ তদ্রচিত ঐরূপ গ্রন্থ অধুনা দৃষ্টিগোচর হয় না। 'কাব্যাদর্শে' উল্লিখিত 'ছন্দোবিচিতি' শব্দটি সাধারণভাবে ছন্দো-গ্রন্থের বাচকও হইতে পারে। জ্যোতিষ—জ্যোতিষ্কগণের গতি-প্রতিপাদক গণিতাঙ্গ শাস্ত্র-বিশেষ ; সূর্য্যাদি-গতি-প্রতিপাদক শাস্ত্র (গঃ শাঃ) ; **Astronomy (SH)**। ইহা গণিত-জ্যোতিষ-মাত্র। ফলিত-জ্যোতিষ—পরবর্ত্তীকালে ব্যবহারের বিষয় হইয়াছিল। অঙ্গ-সমূহ—ছয়টি 'অঙ্গ'—ইহাদিগেরই নাম 'ষট্ বেদাঙ্গ'।

মূল :—এই ত্রয়ীধর্ম্ম চারি বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের স্বধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু উপকারক।

সঙ্কেত :—ত্রয়ীধর্ম্ম—ত্রয়ী-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্ম (গঃ শাঃ) ; দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্রয়ী-কর্ত্তৃক নিরূপিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। শ্যামশাস্ত্রী 'ধর্ম্ম'—অংশটুকুর অনুবাদ করেন নাই। চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাং চ—'চতুর্ণাং' বিশেষণ—'বর্ণানাম্' ও 'আশ্রমাণাম্'—দুইটি পদেরই। চারি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—**four castes (SH)**। চারি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস—**four orders of religious life (SH)**। স্বধর্ম্ম-স্থাপনাৎ—স্ব-স্ব-ধর্ম্মে স্থাপন-হেতু—প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমকে স্ব-স্ব-ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করা হেতু (গঃ শাঃ) ; **as the triple Vedas definitely determine the respective duties (SH) ; on account of enjoining in their respective duties** বলা চলিত। ঔপকারিক :—উপকারক—উপকার-ফল-প্রদ ; **useful (SH)**।

মূল :—ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ।

সঙ্কেত :—বর্ণ-ধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে। অধ্যয়ন—বেদাদি শাস্ত্রের স্বয়ং পাঠ—**study (SH)** ; অধ্যাপন—অপরকে শাস্ত্র পড়ান—**teaching (SH)**। যজন—নিজে যাগ করা ; **performance of sacrifices (SH)**। অপরের যাগে পৌরোহিত্য করা ; **officiating in others' sacrificial performance (SH)**। দান—অপরের দুঃখনাশের ইচ্ছায় তাহাকে অর্থাদি দেওয়া,; **giving (SH)**। প্রতিগ্রহ—অপরের প্রদত্ত দান গ্রহণ ; **receiving of gifts (SH)**।

মূল :—ক্ষত্রিয়ের (স্বধর্ম্ম)—অধ্যয়ন, যজন, দান, শস্ত্র-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ ও প্রাণিরক্ষা।

সঙ্কেত :—অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিনটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিনটি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও সাধারণ ধর্ম্ম। শস্ত্রাজীব (মূল)

—শস্ত্র-দ্বারা আজীব অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকা (গঃ শাঃ); **military occupation** ভূতরক্ষণ (মূল)—ভূত—যাহার সত্তা আছে—এস্থলে 'ভূত' অর্থে প্রাণী ; প্রজাবৃন্দ, গবাদি পশু এ সকলই 'ভূত' মধ্যে গণ্য। **Protection of life** (SH) ;—ইহা মূলানুগ নহে—**protection of subjects and domestic animals (creatures)**—ইহা বলাই ভাল ছিল।

মূল :—বৈশ্যের (স্বধর্ম)—অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন ও বণিগ্‌বৃত্তি।

সঙ্কেত :—অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিনটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিনটি অধ্যয়ন, যজন ও দান—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য—ত্রৈবর্ণিকেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কৃষি—চাষ ; **agriculture** (SH)। পাশুপাল্য—পশু পালন ; **cattle-breeding** (SH)। বণিজ্যা—পাঠান্তর বাণিজ্যা বাণিজ্য ; **trade** (SH)।

মূল :—শূদ্রের (স্বধর্ম)—দ্বিজাতি-পরিচর্য্যা, বার্ত্তা, কারু-কর্ম্ম ও কুশীলব-কর্ম্ম।

সঙ্কেত :—দ্বিজাতি-শুশ্রূষা—দ্বিজাতি—যাঁহাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে একবার দেহ-জন্ম ও বেদাধ্যয়ন (উপনয়ন)-দ্বারা আর একবার বেদ-জন্ম—এই দুইবার জন্ম হয়—ত্রৈবর্ণিক—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। শুশ্রূষা—সেবা, পরিচর্য্যা, **serving of the twice born** (SH)। বার্ত্তা—কৃষি-পাশুপাল্য-বণিজ্যা। কারু-কুশীলব-কর্ম্ম—শিল্পি-কর্ম্ম ও চারণ-কর্ম্ম (গঃ শাঃ) ; কারু—স্থূল-শিল্প-বিৎ ; কুশীলব—নটনর্ত্তক ; **profession of artisan and court-bards** (SH) ; **actors and dancers** বলা উচিত ছিল। গণপতি শাস্ত্রী ও শ্যামশাস্ত্রী উভয়েই 'কুশীলব' বলিতে 'চারণ' বুঝিলেন কোন্ প্রমাণে ? কুশীলব—নট-নর্ত্তক ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত চতুর্বর্ণের স্বধর্ম্ম কথিত হইল।

মূল :—গৃহস্থের (স্বধর্ম্ম)—স্বকর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ, তুল্য (কুল-শীল) (অথচ) অসমান-ঋষি-(প্রসূত)-গণের সহিত বিবাহ, ঋতুগামিত্ব, দেব-পিতৃ-অতিথি- ভৃত্যদিগের (উদ্দেশ্যে) ত্যাগ ও শেষ-ভোজন।

সঙ্কেত :—অতঃপর আশ্রম-ধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে। স্বকর্ম্মাজীব (মূল)—স্বকর্ম্ম—নিজ বর্ণধর্ম্ম ; তদ্দ্বারা আজীব অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকা। গৃহস্থ যে বর্ণের অন্তর্গত হইবেন, সেই বর্ণের যে যে বর্ণ-ধর্ম্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে সেই সেই নিজ বর্ণধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। গৃহস্থ যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে বর্ণধর্ম্ম হিসাবে—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহারই নাম তাঁহার 'স্বকর্ম্মাজীব'। **Earning livelihood by his own profession** (SH) ; **by his own caste-duties**—বলিলে ভাল হইত। তুল্য—বর্ণে-কুলে-শীলে ও অন্যান্য গুণাবলীতে, অর্থসম্পদ্ ইত্যাদিতে সমান। অসমানর্ষিভিঃ—'ঋষি' বলিতে এস্থলে—গোত্র-প্রবর-প্রবর্ত্তক ঋষি বুঝাইতেছে। অতএব, কুটুম্ব করিতে হইবে—যিনি কুলে-শীলে-সম্পদে সমান—সমান বর্ণ (সবর্ণ)—অথচ সগোত্র বা সমান-প্রবর নহেন। বৈবাহ্য (মূল)—বিবাহ ; বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন। **Marriage among his equals of different ancestral Rishis** (SH)। কৌটিল্য সগোত্রা-বিবাহের বিরোধী—ইহাই ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়। ঋতুগামিত্ব—ধর্ম্মপত্নীর ঋতুস্নানের পর তাঁহার সহিত মিলন। ষোড়শ রাত্রি ঋতু-কাল। উহার মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি পরিত্যাজ্য। অবশিষ্ট নিশায় ধর্ম্মপত্নীর সহিত মিলিত হওয়া গৃহস্থের আশ্রম-ধর্ম্ম। **Intercourse with his wedded wife after her monthly ablution** (SH)। ত্যাগ—দেবপূজা, যাগাদি, পিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অতিথিসেবা ; ভৃত্য-পালন ; **gifts** (SH)। শেষ-ভোজন—দেবাদির উদ্দেশ্যে ত্যাগের অনন্তর অবশিষ্টাংশ গৃহস্থ স্বয়ং ভোগ করিবেন।

মূল : ব্রহ্মচারীর (স্বধর্ম)—স্বাধ্যায়, অগ্নিকার্য্য, অভিষেক, ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রতিত্ব, আচার্য্যের (নিকট) আমরণ অবস্থিতি—তাঁহার অভাবে গুরু-পুত্রের (নিকট) অথবা সহাধ্যায়ীর (নিকট) (আমরণ ব্রহ্মচারিরূপে) অবস্থান।

সঙ্কেত :—ব্রহ্মচারি :—'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ। বেদ-বিদ্যা-গ্রহণার্থ—উপনয়নান্তর দণ্ড-অজিন ইত্যাদি ধারণপূর্ব্বক ব্রতাচরণ যিনি করেন—তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্ম (বেদ)-গ্রহণার্থ ব্রত—ব্রহ্ম ; উহার চরণ (আচরণ) যিনি করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। স্বাধ্যায়—স্ব-শাখোক্ত বেদ-মন্ত্র পাঠ, বেদাধ্যয়ন ; **learning of the Vedas** (SH) ; **study of the particular branch of the Vedas to which he belongs**—ইহাই বলা উচিত। অগ্নিকার্য্য—অগ্নি-শুশ্রূষা ; গুরুর অগ্নিতে ত্রিষবন আহুতি-দান। অগ্নি-পরিচর্য্যা—যাহাতে গুরুর অগ্নি ঠিকমত প্রজ্বলিত থাকে—নিভিয়া না যায়—এইরূপভাবে অগ্নির সেবা ; **fire-worship** (SH)। অভিষেক—ত্রিষবণ স্নান-প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ং-কালে—তিনবার অগ্নিতে আহুতি দিবার পূর্ব্বে স্নান ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। ভৈক্ষব্রতত্বম্ (মূল)—ভৈক্ষ—ভিক্ষাবৃত্তি ; ব্রতত্ব—ব্রতিত্ব—গোদানান্ত কর্ম্ম (গঃ শাঃ) ; গোদানের পর ব্রতি-জীবন সমাপ্ত হয় ; গোদান—'গো' অর্থে কেশ ;—গোদান—কেশমুণ্ডন। শ্যামশাস্ত্রী 'ভৈক্ষ' ও 'ব্রতত্ব'—দুইটি পৃথক্ পদের সমষ্টিরূপে ইহাকে ধরেন নাই—**living by begging** (SH) ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অনুবাদ মূলানুগ নহে ; **begging and observance of vows (till tonsure)**. অথবা **the vow of begging**—ইহার অন্ততর ভাব প্রকাশ করা উচিত। ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—(১) উপকুর্ব্বাণ ও (২) নৈষ্ঠিক। যাঁহারা উপকুর্ব্বাণ, তাঁহারা গোদানানন্তর সমাবর্ত্তন-স্নান সারিয়া স্নাতক ও পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনই করিতেন না—আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর ও গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা করিতেন—ইহাই অতঃপর উক্ত হইয়াছে। আচার্য্যে প্রাণান্তিকী বৃত্তিঃ (মূল)—গুরুসমীপে আমরণ অবস্থান ; আচার্য্যে—আচার্য্য-সমীপে আচার্য্য-সেবা-পূর্ব্বক, আচার্য্যের অগ্নি-পরিচর্য্যা-পূর্ব্বক ; প্রাণান্তিকী—মরণ-পর্য্যন্ত বৃত্তি—স্থিতি—গুরুকুলে আমরণ অবস্থানপূর্ব্বক গুরুসেবা ও গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা ; **devotion to his teacher at the cost of his own life"** (SH) ; **at the cost of his own life**—প্রাণ-দিয়াও ; জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত, আমরণ—ঐরূপ অর্থ উহা হইতে পাওয়া যায় না।—তদভাবে—গুরুর অভাবে—গুরুর অবর্ত্তমানে—গুরুপুত্র-সমীপে ঐরূপে অবস্থান। সব্রহ্মচারিণি—যিনি একগুরুর নিকট বেদ-গ্রহণার্থ ব্রহ্মচর্য্য স্বীকার করেন—সহবেদাধ্যায়ী সহাধ্যায়ী ; অবশ্য ইনি বয়োবৃদ্ধ হইবেন—নতুবা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহার সেবা বয়োজ্যেষ্ঠ করিতে পারেন না। তাই গণপতি শাস্ত্রী বিশেষণ দিয়াছেন—"সমানশাখা-ধ্যায়িনি বা বৃদ্ধে"। শ্যামশাস্ত্রীও ঐ মতের পোষক—**to an older classmate.**

মূল :—বানপ্রস্থের (স্বধর্ম)—ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন, জটা ও অজিন ধারণ, অগ্নিহোত্র, অভিষেক, দেব-পিতৃ-অতিথি-পূজা ও বন্য আহার।

সঙ্কেত :—ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনানন্তর উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হন ; গৃহস্থ অবস্থায় অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইলে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনবাসী হওয়ার নিয়ম। সস্ত্রীক বনবাসী হওয়া চলে, কিন্তু বনবাসে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম একান্ত বিধেয়। বনে প্রকর্ষেণ তিষ্ঠতি ইতি বনপ্রস্থঃ, স্বার্থে অণ্, বানপ্রস্থঃ (গঃ শাঃ)। ব্রহ্মচর্য্য—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব (গঃ শাঃ)

chastity (SH); celibacy বলিলে ভাল হইত। ভূমৌ শয্যা (মূল)—স্থণ্ডিলে শয়ন; sleeping on the bare ground (SH)। অজিন—মৃগচর্ম্ম। অগ্নিহোত্র—সায়ম্প্রাতর্হোম। অভিষেক—ত্রিকাল-স্নান। বন্য আহার কন্দ-ফল-মূলাদি (গঃ সাঃ); living upon food-stuffs procurable in forests (SH)।

মূল :—পরিব্রাজকের (স্বধর্ম)—সংযতেন্দ্রিয়ত্ব, অনারম্ভ, নিষ্কিঞ্চনত্ব, সঙ্গত্যাগ, বহুস্থানে ভিক্ষাচরণ, অরণ্যবাস, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ।

সঙ্কেত :—পরিব্রাজক—সব পরিত্যাগ করিয়া ব্রজন (গমন) করেন যিনি—সন্ন্যাসী; an ascetic retired from the world (SH)। সংযতেন্দ্রিয়ত্ব—জিতেন্দ্রিয়তা; complete control of the organs of senses (SH)। অনারম্ভ—কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, নৈষ্কর্ম্ম্য (গঃ শাঃ); abstaining from all kinds of work (SH)। নিষ্কিঞ্চনত্ব (গঃ শাঃ); disowning money (SH); disowning everything বলিলে ভাল হইত। সঙ্গত্যাগ—অন্য প্রব্রজিতের সহিতও সংসর্গ-পরিহার (গঃ শাঃ); কিন্তু আমাদিগের মনে হয় গীতোক্ত অর্থই ভাল—আসক্তি-ত্যাগ। Keeping from society (SH); giving up all attachments বলাই উচিত। অনেকত্র ভৈক্ষম্—যদিও ভিক্ষা বহু গৃহে মাগিতে হইবে, তথাপি প্রাণযাত্রার নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই সংগ্রহণীয়। অরণ্যবাস—The Dharma shastra has an analogous rule that mendicants should not sleep two nights in the same village (See Gaut III. 21)—Jolly and Schmitz. বাহ্য শৌচ—দেহ-শৌচ—জলাদি-দ্বারা সম্পাদনীয়। অভ্যন্তর শৌচ—মানস শুচিতা—ভাবশুদ্ধি। ইহা ছাড়া বাক্-শৌচের কথা কবিরাজ রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় বলিয়াছেন—উহা সত্য ও স্বাধ্যায় হইতে জাত। Purity both internal and external (SH)। This summary of rites applicable to all stages in the life of a Brahman may also be traced to the Dharmasastra, See Vishnusmriti II. 17—Tolly and Schmidt, Punjab Sanskrit Series, No. 4.

মূল :—সকলের (স্বধর্ম)—অহিংসা, সত্য, শৌচ, অসূয়ার অভাব, আনৃশংস্য ও ক্ষমা।

সঙ্কেত :—সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে। অহিংসা—কায়মনোবাক্যে হিংসার অভাব; Harmlessness (SH)। সত্য—কায়-মনো-বাক্যে সত্য-পালন; trustfulness (SH); truth—বলিলেই চলিত। অনসূয়া—গুণে দোষাবিষ্কার—অসূয়া; তাহার বিপরীতত্ব অনসূয়া—গুণের প্রতি পক্ষপাতি (গঃ শাঃ); freedom from spite (SH)। আনৃশংস্য—অনিষ্ঠুরতা (গঃ শাঃ); abstinence from cruelty (SH)।

মূল :—স্বধর্ম্ম—স্বর্গ-ফলক ও অনন্তফলহেতু। উহার অতিক্রমে লোকের সঙ্করহেতু উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা।

সঙ্কেত :—স্বর্গীয়—স্বর্গীর হেতু। স্বর্গ—পরলোক-সুখ। আনন্ত্যায়—অনন্তফলের হেতু; অনন্তফল—যাহার বিনাশ নাই—মোক্ষ; infinite bliss (SH); eternity বলিলেই চলিত। যদিও উহা আনন্দস্বরূপ (Bliss)—তথাপি ভাষান্তরে উহা না বলাই ভাল। অতিক্রমে—উল্লঙ্ঘন দ্বারা। লোক :—জগৎ; জনগণ। সঙ্কর-হেতু—কর্ম্মসাঙ্কর্য্য ও বর্ণসাঙ্কর্য্য হেতু; অনুষ্ঠাতৃ-ব্যবস্থার অভাবে এই সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা (গঃ শাঃ) owing to confusion of castes and duties. (SH) (কামন্দক ২।৯—৩৫)।

মূল :—সেই হেতু রাজা ভূতগণের স্বধর্ম্ম ব্যভিচার করাইবেন না। যিনি স্বধর্ম সম্যগ্‌রূপে ধারণ করেন, তিনি পরলোকে ও ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হন।

সঙ্কেত :—এটি সংগ্রহ-শ্লোক। ভূতগণের—প্রাণিগণের—এক্ষেত্রে প্রজাগণের। প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, রাজা তাঁহার প্রজাগণকে স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইতে দিবেন না,—যদি কোন প্রজা স্বধর্ম্মচ্যুত হয় বা স্বধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে তাহা হইলে তিনি প্রজার সেই অধর্ম্মাচরণের অনুমোদন করিবেন না (গঃ শাঃ)। ন ব্যভিচারয়েৎ (মূল)—স্বধর্ম্ম-ব্যভিচার করাইবেন না—প্রজারা যদি স্বধর্ম্ম-ব্যভিচার করে, রাজা তাহার অনুমোদন বা উপেক্ষা করিবেন না—পক্ষান্তরে প্রজাগণকে স্বধর্ম্ম-ব্যভিচারের নিমিত্ত শাস্তি দিবেন—ইহাই তাৎপর্য্য। স্বধর্ম্মের ব্যভিচার—ইহার অর্থ স্বধর্ম্ম অতিক্রম বা স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন—transgressing the limits of ones own duties. শ্যামশাস্ত্রী—shall never allow people to swerve from their duties. সন্দধানঃ—সম্যগ্‌রূপে ধারণ করিতে থাকিলে—সম্যাগ্‌রূপে (যথাবিধি) স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে (গঃ শাঃ); whoever upholds his own duty (SH); properly performing his own duty—হইলে ভাল হইত। প্রেত্য—প্র—ই+ল্যপ্‌—বস্তুতঃ ইহা ল্যবন্ত পদের মত দেখিতে—কিন্তু আসলে নিপাত বা অব্যয়—"ল্যপ্‌প্রতিরূপো নিপাতঃ" (গঃ শাঃ)

ল্যবন্ত ক্রিয়াপদটির অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে গমন করিয়া—যেস্থানে যাইলে আর লোক ফিরে না, এমন স্থানে যাইয়া—পরলোকে যাইয়া। অব্যয় পদটির অর্থ—পরলোকে।

মূল :—যাঁহার আর্য্য-মর্য্যাদা ব্যবস্থিত ও যিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে স্থিতি করিতেছেন, ত্রয়ী-দ্বারা রক্ষিত সেই লোক প্রসন্ন হইয়া থাকেন—অবসন্ন হন না।

সঙ্কেত :—ব্যবস্থিতার্য্যমর্য্যাদঃ (মূলঃ)—অবস্থিত (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-দ্বারা প্রতিবদ্ধ বা নিয়মিত) হইয়াছে আর্য্যমর্য্যাদা (অর্থাৎ সদাচার-নিয়ম) যাঁহার (অর্থাৎ যে লোকের) (গঃ শাঃ); গণপতিশাস্ত্রীর মতে—যে লোকের সদাচার-নিয়ম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় এরূপ অর্থ না করাই ভাল; কারণ, পরের বিশেষণটিতে বর্ণাশ্রম-স্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত মত সরল অর্থ করা চলে—আর্য্যোচিত মর্য্যাদা যে লোকের ব্যবস্থিত অর্থাৎ আর্য্যোচিত মর্য্যাদা যে লোক উল্লঙ্ঘন করেন না। মর্য্যাদা—সদাচার-সীমা limits of good conduct, decency, decorum সমগ্র অংশের ইংরাজি—in whose case the limits of Aryan decorum are (rigidly) fixed, শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ—adhering to the customs of the Aryas—ঠিক মূলানুগ নহে। কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ—(১) বর্ণাশ্রমে স্থিতি যাঁহার দ্বারা কৃত হইয়াছে অর্থাৎ যে লোক বর্ণাশ্রমের মধ্যে অবস্থিত; অথবা—(২) কৃত (পালিত) বর্ণাশ্রমস্থিতি (বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা) যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ যে লোক বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না। শ্যামশাস্ত্রীর ইংরাজি—following the rules of caste and divisions of religions of life; rules না বলিয়া limits—বলিলেই ভাল হইত। সমগ্র অংশের তাৎপর্য্য—(১) যে লোকের আর্য্যোচিত মর্য্যাদা (সদাচার-সীমা) নিয়ন্ত্রিত ও যে লোক বর্ণাশ্রমের মধ্যে অবস্থিত, অথবা (২) যে লোক সদাচার-সীমা (আর্য্যমর্য্যাদা) ও বর্ণাশ্রম-সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না। শ্যামশাস্ত্রী প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অন্বয় করিয়াছেন। উহার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। ত্রয়ী-দ্বারা রক্ষিত—ত্রয়ী-নির্দ্দিষ্ট

বিধি-দ্বারা পরিচালিত—maintained In accordance with injunctions of the triple Vedas (SH) প্রসীদতি—মোদতে—আনন্দিত হয় (গঃ শাঃ); will progress (S H)। প্রসন্ন হয়—স্থিরতা প্রাপ্ত হয়—becomes steady (stable) বলা ভাল। ন সীদতি—অবসন্ন হয় না ; স নশ্যতি (গঃ শাঃ); will never perish (S H); does not weaken (decline) বলিলে ভাল হইত। লোক বলিতে (১) ভুবন ও (২) জন দুইই বুঝায় ; world (S H)।

ইতি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিকে প্রথমাধিকরণে তৃতীয় অধ্যায়—বিদ্যাসমুদ্দেশ-প্রকরণে ত্রয়ী-স্থাপনা ॥

খনিজ তৈল ও অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদ *

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস্, এ-আই-বি (লণ্ডন)

বর্ত্তমান সভ্যজগতের বেশী দরকার হইতেছে যথেষ্ট পরিমাণে 'শক্তি' সরবরাহ। আর 'শক্তি' সংগ্রহ হয় দাহ্য দ্রব্য হইতে। বিজ্ঞান এই শক্তিকে ক্রমে ক্রমে আয়ত্তে আনিয়া ও কাজে লাগাইয়া সভ্যতাকে আগাইয়া দিতেছে। কিন্তু ঐ 'শক্তি' রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়। এতদিন কয়লাই ছিল একমাত্র শক্তির উৎস, এখনও একটা প্রধান উৎস সন্দেহ নাই। ডিজেল ও অটো এঞ্জিন আবিষ্কারের পর হইতে খনিজ তৈল আমাদের নূতন শক্তি সঞ্চয়ের উপায় হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারও শেষ নাই। সভ্যতার 'তৈল যুগ' চলিয়াছে বলা চলে। এককালে বৈজ্ঞানিকেরা বলিত সাল্‌ফিউরিক এসিড বা গন্ধক দ্রাবকের ব্যবহার দ্বারাই সভ্যতার গতি নিরূপিত হয়। এখন বলা চলে খনিজ তৈলের ক্রমবর্দ্ধমান নিয়োগই সভ্যতার অগ্রগতি প্রমাণ করে। আজ আমেরিকার এত বড় উন্নতির পিছনে রহিয়াছে মার্কিন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদ্‌গণের তৈলকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা। আজকের যুদ্ধের অংশীদার বৃটেন ও আমেরিকা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত খনিজ তৈলের মালিক। ওলন্দাজ ভারতীয় দ্বীপগুলি বাদ দিয়াও ইংলণ্ড ও মার্কিন উভয়ে আজ পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগ খনিজ তেলের মালিক। বর্ত্তমান শতাব্দীর সকল অন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের মূলে এই খনিজ তৈলের দখলীসত্ত্ব রহিয়াছে সন্দেহ নাই।

খনিজ তৈলের উৎপাদক ও খাদক হিসাবে ভারতবর্ষ

খনিজ তৈলের সম্পদে ভারতবর্ষ নিতান্তই দরিদ্র। পাঞ্জাবে রাউলপিণ্ডীর নিকট পটওয়ার উপত্যকায়, খাউর ও ধুলিয়ানে ছোট ছোট তৈলের খনি আছে। আবার আসামেও তৈলের খনি আছে। যখন ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সামিল ছিল (১৯৩৭ সনের পূর্ব্বে) তখন এ দেশ উৎপাদক হিসাবে আরও উন্নত ছিল। ১৯৩৫ সনে মোট তৈলের উৎপাদন হইয়াছিল ৩২ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন, অথচ ব্রহ্মদেশ আলাদা হইবার পরে উৎপাদন খর্ব্ব হইয়া ৮ কোটী ৪০ লক্ষ গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে ভারতবর্ষ নানা রকমের মোট ৪৬ কোটী ৩০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইরাক ও আমেরিকা হইতে ১৭ কোটী টাকার বিনিময়ে আমদানী করিয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই ভারতের সমুদ্রপথের আমদানীর পরিমাণ বোঝা যাইবে :—

১৯৩৭-৩৮—	সকলপ্রকার তৈলের মোট আমদানী	৫৭,৪৯,৬৬,০০০ গ্যালন
১৯৩৮-৩৯—	... ...	৪৩,৮৭,১১,০০০ গ্যালন
১৯৩৯-৪০—	... ...	৪৬,২৯,৫০,০০০ গ্যালন

যুদ্ধের দরুণ ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তৈল আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধোত্তরকালে শিল্পের প্রসার হইলে খনিজ তৈলের ব্যবহার যে ভয়ানকভাবে বাড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্ট ও বিদেশী কোম্পানীর অনুসন্ধান হইতে জানা গিয়াছে যে উত্তর ভারতের নানা অংশে যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ তৈল সঞ্চিত আছে, তবে কবে এই তৈল পাওয়া যাইবে তাহা আজও অজ্ঞাত।

এই বিষয়ে একটী ভয়ের কারণ দাঁড়াইয়াছে বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে তৈল অনুসন্ধান সম্পর্কে অনুমতি প্রদান। ইংরেজ কোম্পানী ত বটেই, মার্কিন কোম্পানীকে উত্তর ভারতের পর্ব্বতপাদদেশের অধিত্যকা প্রদেশগুলিতে নানা বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা তৈলের অনুসন্ধান করিতে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। অথচ ভূনিম্ন অনুসন্ধানের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেণ্ট রহিয়াছে এবং এই বিভাগের কার্য্যের সুখ্যাতিও শোনা যায়। এই বিভাগের এক অংশ খনিজ দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিবার জন্য নূতন ভাবে গঠন করিলেই সহজে কাজ চলিত। অষ্ট্রেলিয়া কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ একটী বিভাগ খুলিয়া গত ১৫ বৎসরে অনেক সুফল পাইয়াছে। ককেসীয় তৈলের খনি পূর্ব্বে বিদেশীগণের হাতে ছিল কিন্তু ১৯১৯ সনে রুশিয়েরা ভূনিম্ন অনুসন্ধান বিভাগ (Geophysical Section) খুলিয়া যে উন্নতি দেখাইয়াছেন ও যে পরিমাণ লাভবান হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। বিদেশীর হাতে দেশের সম্পদের রক্ষণ ও পরিচালনের ভার দেওয়ার অর্থ অনেক সময়ই দাঁড়ায়—বিদেশী স্বার্থ কায়েম করা ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণকে ডাকিয়া আনা।

১৯৪০ সনে স্মিথসোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউসনের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে মিষ্টার ডি, এম, লী "তৈলের সন্ধান" নামক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে পৃথিবীতে তৈলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মার্কিন দেশে আরও ভয়ানকভাবে বাড়িবে। এইরূপ বাড়িলে এবং তৈল উত্তোলন এই ভাবে চলিলে প্রায় বারো বৎসরেই আমেরিকার তৈল শেষ হইয়া যাইবে। প্রবন্ধটী অবশ্য সরল ভাবেই লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ইঙ্গিত হইতেই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন মন তাহার চোখ এসিয়ার দিকে ফিরাইয়াছে। ইহাতে আমরা ভারতবাসী শঙ্কিত না হইয়া পারি না।

মার্কিনের স্বার্থ

লী লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের বহুপূর্ব্ব হইতেই মার্কিনজাতি তাহার তৈল নিঃশেষের চিন্তায় সজাগ হইয়া আছে এবং এই জন্যই এসিয়া মহাদেশে তৈলের সন্ধান চালাইতেছে। এসিয়া পৃথিবীর মাত্র ৯·৮ ভাগ তৈল সরবরাহ করে, সুতরাং ইহার স্থান নিতান্তই নগণ্য। মার্কিন দেশে ও ইউরোপে সন্ধানীরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ঐ সকল দেশের নিতান্ত অজ্ঞাত স্থানেও কোথায় তৈল আছে জানিয়া ফেলিয়াছে, আর সেখানে নূতনের সন্ধান বৃথা। এবারে এসিয়ার পালা। এজন্য ইরাক, ইরাণ, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সোভিয়েট রুশিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান তৈল সম্পদ আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। একমাত্র সোভিয়েট, রুশিয়া ও

* অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও এস এন সেন লিখিত (১৯৪২-৪৩ সনের "Oil and Invisible Imperialism" শীর্ষক প্রবন্ধের সার-সংকলন Science and Culture পত্রিকায় প্রকাশিত)।

জাপানের হুদ্দার বাহিরের সকল দেশেই ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীগুলি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই তৈল নিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছে। ভূমধ্যসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। মশুল তৈলক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর মালিকানা। ইরাক্ তৈল ক্ষেত্র ইংরেজ—ওলন্দাজ—ফরাসী ও মার্কিন ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতেছে। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেরও এই দশা।

মার্কিনেরা পৃথিবীর এই তৈল লুণ্ঠনে পরে নামিয়াছে। মার্কিনের নিজেদের তৈল-ঐশ্বর্য্য যথেষ্টই ছিল, তাহা ছাড়া মেক্সিকোর তৈল গত ২৫ বৎসর ধরিয়া মার্কিন ধনকুবেরগণের ঘাড়ে চাপিয়া ছিল। নিজেদের আরও বেশী তৈল দরকার হওয়ায় এবং দেশের উৎপাদন ক্রমে ক্ষীয়মাণ হওয়ায় আজ মার্কিনের দৃষ্টি এসিয়ার উপর পড়িয়াছে। লী সত্যই বলিয়াছেন যে আমেরিকাকে আজ অন্যত্র বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা ও এসিয়ায় তৈলের সন্ধান করিতে হইবে। যদিও এসিয়ার মোট উৎপাদন একশত ভাগের ৯·৮ মাত্র, তবুও ইংরেজ ও ওলন্দাজের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই এসিয়া খণ্ডে মূল্যবান তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আরও ভাল ফল আশা করা যায়।

লীর কয়ছত্র লেখা হইতেই মার্কিন জাতির উদ্দেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

তৈল-সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মেক্সিকো

মেক্সিকো দেশে মার্কিন তৈল-মালিকের যে সাম্রাজ্যবাদের জাল ফেলিয়াছিল তাহা হইতে ভারতের শিক্ষণীয় অনেক আছে। ১৮২০ সনে মেক্সিকো স্পেনের অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মেক্সিকোর প্রথম ডিক্টেটর পরফিরিও ডায়াজ (১৮৭৭-১৯১১) তৈলের খনির মালিকানা বিদেশীগণের নিকট বিক্রয় করেন। রেড ইণ্ডিয়ানগণের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া ডায়াজ তাহা বিদেশীর নিকট ইজারা দিয়াছিলেন। ১৮৮২-১৯০৯ সনের আইন দ্বারা খনিজ সম্পত্তির অধিকার বিদেশীয়গণকে দেওয়া হয়—যদিও মেক্সিকোর ইতিহাসে রাষ্ট্রই ছিল এইরূপ সম্পত্তির একমাত্র মালিক। ডায়াজ বুঝিয়াছিলেন যে দারিদ্র্যই দেশের একমাত্র সমস্যা এবং তাহা দূর করিবার জন্য বিদেশী মূলধনের সাহায্যে দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহার এ স্বপ্ন সফল হয় নাই। "তৈলের নল বহিয়া মেক্সিকোর ধনসম্পদ দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল এবং মার্কিন ধনকুবেরগণকে আরও ধনবান করিয়াছিল। দরিদ্র মেক্সিকোবাসী দরিদ্রই রহিয়া গেল।" দেশের আর্থিক জীবন তৈল মালিকের ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হইত এবং মেক্সিকো রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক হইয়া পড়িল মার্কিন ধুরন্ধরগণ। খাস মেক্সিকোর লোকেরা তৈলের কারখানায় বড় জোর পিওনের কাজ পাইত এবং তাহাও না জুটিলে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। ডায়াজ পদচ্যুত হইলে, দরিদ্র মেক্সিকো দেশ বিপ্লবের গ্রাসে পড়িল। বিড়ালের পিঠা ভাগের মত বিভিন্ন দলের মধ্যে গোপনে অনুগ্রহ বণ্টন করিয়া তৈল মালিকগণ বানরের অভিনয় চালাইতে লাগিল। যখন এই গণ্ডগোলের মধ্যে জেনারেল ভিক্টরিয়ানো হুয়েডা মেক্সিকো নগর দখল করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলেন তখন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ তাহার গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিলেন না ও তাহার দলীয় লোকের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করিতে রাজী হইলেন না— অথচ তাহার বিরুদ্ধ দলীয়ের নিকট হাতিয়ার বেচিতে তাহার বিবেকে বাঁধিল না। এক সময় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট এক অছিলায় এড্‌মিরাল ফ্লেচারকে এক নৌবাহিনী দিয়া পাঠাইয়া ভেরাক্রুজ বন্দরে গোলা বর্ষণ ও শুল্ক গৃহ দখল করাইলেন। ক্রমে ক্রমে মেক্সিকো বাসীর জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হইল, তাহারা দেখিতে পাইল যে তাহাদের তৈলের খনিতে ইংরেজ ও মার্কিনের ৯৬ কোটী ডলার মূলধন খাটিতেছে, অর্থাৎ কিনা শতকরা ৯৫ অংশই ইংরেজ মার্কিনের করায়ত্ত, শতকরা ৪ অংশ খুঁদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজের হাতে, বাদবাকী শতকরা ১ অংশ মেক্সিকোবাসীর দখলে। ইহা ১৯২২ সনের কথা। মেক্সিকোবাসীরা বুঝিল যে যে পর্য্যন্ত দেশ বিদেশীর শোষণে থাকিবে ততদিন কোন বিপ্লব দ্বারাই দেশে স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এইরূপ ধারণা হইতেই ১৯১৭ সনে প্রেসিডেণ্ট কারাঞ্জা নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে দেশের জমির মালিক হইবে দেশের রাষ্ট্র এবং বিদেশীরা খাস মেক্সিকোবাসীর অপেক্ষা কোন বেশী স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু কারাঞ্জার ক্ষুদ্র ক্ষমতা এই বিধান কায়েম করিতে পারে নাই, কারণ মার্কিন তৈল-মালিকগণ তাহাকে বাধা দিয়াছিল।

১৯২০ সনে জবরদস্ত জেনারেল ওব্‌রিগণ প্রেসিডেণ্ট হইলে যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাহাকে মেক্সিকোর সভাপতি বলিয়া স্বীকার করিল না। পর বৎসর ওয়াসিংটন হইতে বাণী আসিল যে মার্কিন রাষ্ট্র ওব্‌রিগণকে সভাপতি বলিয়া স্বীকার করিবে যদি তিনি মেক্সিকো দেশে মার্কিন নাগরিকগণের সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করেন। ওব্‌রিগণ ইহার যে উত্তর পাঠাইলেন তাহাতে তাঁহার মনের দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইল। কারণ তাঁহাকে স্বীকার বা অস্বীকার করার দিকে তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না, দেশের স্বাধীনতা ও সম্মানই ছিল তাঁহার কাম্য। শীঘ্রই ১৯১৭ সনের নিষ্ফল আইনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পরিণত করা হইল এবং ভূমির উপর বিদেশীর অধিকারকে চিরদিনের মত তুলিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য মার্কিনেরও এ বিষয় বলিবার কিছু ছিল না কারণ আরিজোনা ষ্টেটে অনুরূপ একটা আইন ছিল। আমেরিকায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল, খবরের কাগজগুলি গবর্ণমেণ্টকে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বলিলেন, তৈল-মালিকগণ বলিলেন মেক্সিকানরা ডাকাত, ব্যাঙ্ক মালিকেরা বলিল মেক্সিকানরা এনার্কিষ্ট। কিন্তু মেক্সিকোবাসী তাহাদের কর্ত্তব্যে দৃঢ় রহিল।

১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে ড্‌োয়াইট্ মরো ভূমি-আইন সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্য মার্কিন দূত হইয়া মেক্সিকোতে গেলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় মার্কিন গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন যে মেক্সিকো দেশে মার্কিন প্রজাকে রক্ষার দায়িত্ব মেক্সিকো সরকারের। ইহাও স্বীকৃত হইল যে মেক্সিকো দেশে মার্কিন প্রজার ভূমিতে স্বত্ব সম্বন্ধে মেক্সিকোর সুপ্রিম কোর্টই চরম বিচার করিবে। সুপ্রিমকোর্ট মার্কিন প্রজার তথা তৈল-কোম্পানীর অধিকার স্বীকার করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিল।

কিন্তু এই মীমাংসাই চরম নহে। যে পর্য্যন্ত মেক্সিকো হইতে বিদেশীর অধিকারের উচ্ছেদ না হয় সে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসাই চরম হইতে পারে না। কিছুকাল ঠাণ্ডা থাকিয়া আবার তৈল-নিষ্কাশনের প্রশ্ন জ্বলিয়া উঠিল। ১৭টী ইংরেজ, মার্কিন ও ওলন্দাজ কোম্পানীকে এক সালিশী বোর্ড খাস করিবার মঞ্জুরী দিলেন। তৈল-কোম্পানীগুলি আপিল করিলে ১৯৩৮ সনে ১লা মার্চ্চ সুপ্রিম কোর্টে তাহা অগ্রাহ্য করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট কার্ডিনাস্ এই সকল বিদেশী কোম্পানীর সম্পত্তি খাস্ করিলেন। ষ্টেটের শাসনকর্ত্তাগণ সকলেই বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইলেন। মেক্সিকো দেশে জাতীয় আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িতে প্রস্তুত এরূপ প্রেসিডেণ্ট আর হয় নাই। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পরিচালনের ভার জাতীয় পেট্রোলিয়াম প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া হইল। এইরূপ কার্য্য দ্বারা মেক্সিকোর সহিত বিদেশী শক্তিবর্গের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া গেল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সরাসরি ক্ষতিপূরণ চাহিলে মেক্সিকোর গবর্ণমেণ্ট উহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিল। মার্কিন ও ডাচ্ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক বিষাক্ত হইয়া উঠিল। ফলে মেক্সিকোর বিদেশী বাণিজ্যও লোপ পাইল এবং বাজারে ভয়ানক মন্দা দেখা দিল। তৈলের উৎপাদনও ভয়ানক ভাবে কমিয়া গেল যদিও জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান ও সুইডেনের সহিত কিছু কিছু নূতন রপ্তানী বাণিজ্যের পত্তন হইল।

১৯৩৯ সনের ২রা ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন যে ১৯৩৮ সনের বাজেয়াপ্তকরণ সম্পূর্ণ আইনতঃ হইয়াছে কিন্তু বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে যে মূলধন ন্যায়তঃ লগ্নি করিয়াছে তাহার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় খেসারৎ পাইতে অধিকারী। এতদিনের বিতণ্ডা মোটামোটিভাবে এইরূপে শেষ হইল। বিদেশী শক্তির হুম্‌কিতে ভয় পাইলে অবশ্য এরূপ মীমাংসা হইতে পারিত না।

সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত

আমরা সোভিয়েটের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। জার-শাসিত রুশ দেশ ঠিক্ মেক্সিকোর মতই বিদেশীর সাহায্যে দেশের শিল্পোন্নতি করিতে চাহিয়াছিল। এক্ষেত্রে ইংরেজ ও ফরাসী শোষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই বিদেশী শোষণই ১৯১৭ সনের রুশবিপ্লবের অন্যতম কারণ। বিপ্লব আরম্ভ হইলে রুশিয়া বিদেশী ঋণগুলি অস্বীকার করিয়া বসে। ইহার পরে আরম্ভ হয় সোভিয়েটের নিজের শিল্প পরিকল্পনা (১৯২৬)। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে উহাতে দেশের হাওয়া ফিরিয়া যায়। উহার পর আরও দুইটা পরিকল্পনা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হয়। এই পরিকল্পনার জন্যই রুশ দেশে শিল্পোন্নতি অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। আমরা কেবল মাত্র খনিজ তৈলের দিক্ হইতে দেখিতে পাই—১৯২১ সনের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর পরেই ছিল রুশিয়ার স্থান। ১৯৩১ সনের মধ্যেই রুশিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। লীগ্ অব্ নেশনের প্রকাশিত হিসাব (১৯৩৩-৩৪) হইতে জানা যায় যে রুশিয়া ১৯২৭-২৮ সনে পেট্রোলিয়াম্ প্রস্তুত হয় ১১·৬ মিলিয়ন্ টন্ কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে ১৯৩২ সনে উহা বাড়িয়া ২২·২ মিলিয়ন টনে দাঁড়ায়। ১৯৩৮ সনের পরিকল্পনা অনুযায়ী রুশিয়া এখন ৩০ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম প্রস্তুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে রুশিয়ায় ভূনিম্নে ৭০০ মিলিয়ন টন তৈল মজুত আছে এবং সম্ভবতঃ আরও ৬,৩৭৬ মিলিয়ন টন পাওয়া যাইবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি মাত্র ২০০০ মিলিয়ন টন। এই যুদ্ধে রুশিয়া জয়ী হইলে তাহার খনিজ তৈলের সম্পদ বাড়িবে বৈ কমিবে না।

গত পঁচিশ বৎসরে নিজের চেষ্টায় রুশিয়ার মত একটা কৃষিপ্রধান দেশ শিল্পে যে উন্নতি করিতে পারিয়াছে তাহাতে মনে হয় রুশিয়ার পন্থাই এদেশের পক্ষে কার্য্যকরী হইবে। পশ্চাৎপদ দেশকে উন্নত দেশের আর্থিক সাহায্যে চাঙ্গা হইতে হইবে এইরূপ সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ যে ভুল তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

মেক্সিকোর ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষের ইহাই শিক্ষা করা উচিত যে সাম্রাজ্যবাদীর কবলে পড়িলে মুক্তির আশা খুব কম—বিশেষতঃ এ দেশের মত পরাধীন দেশের পক্ষে। বিদেশীয়গণকে সুযোগ সুবিধা দিলে এবং তাহারা একবার গাড়িয়া বসিলে তাহাদিগকে হটান শক্ত এবং ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমেরিকা এদেশের উন্নতিতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ইহা খোলাখুলি ভাবেই বলা হয়। এদিকে দেশে যাহাতে ভারী শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্ট মোটেই সজাগ নহে বরং অরাজী। আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ কমিটির আমদানী, ভারতীয় শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য দানের অনিচ্ছা, জাহাজ নির্ম্মাণ, মোটর তৈরি, কলকব্জা প্রস্তুত প্রভৃতি ভারি শিল্পগুলির পত্তনে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার অভাব আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পের খুব নির্ম্মেঘ ভবিষ্যতের সূচনা করে না। আমেরিকান প্রতিষ্ঠানকে দেশের ভূনিম্ন তৈল শিল্পকে পরিচালন করিবার ক্ষমতা দিলে ভারতবর্ষ তাহা নিষ্কাম ভাবে গ্রহণ দেখিতে পারে না, কারণ অতীতের বিদেশী শোষণ তাহার আর্থিক দেহ পঙ্গু করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের আর্থিক বিপর্য্যয় তাহার জীবন-মরণের সমস্যা হইবে।

প্রার্থীর ব্যথা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ, কাব্যরঞ্জন

কামনার রাগে রঞ্জিত বলি'
মোর প্রার্থনাগুলি—
প্রভু, তুমি কভু শুনিবে না হায়,
বারেক বদন তুলি' ?

অভ্রংলিহ নহে মোর আশা,
সিন্ধু শুষিব—নহে সে পিয়াসা—
বিন্দু পেলেই এ কাঙাল আর—
চাহিবে না কিছু ভুলি' !

ক্ষুদ্র বাসনা—হ'য়েছে ব্যর্থ—
তারি লাগি' কাঁদে হিয়া,
যদি পাই সুখ সেই মোর সুখ
তোমারেই নিবেদিয়া,—

যাচক বলিয়া তুমিও কি নাথ,
ঘৃণাভরে নাহি করি' দৃক্‌পাত—
তব দ্বার হ'তে রিক্ত আমায়
দিবে আজ ফিরাইয়া ?

গীতার মন্ত্র পারি না বুঝিতে—
বাসনার ফাঁদে মরি,
আমারি মত কত অভাজন
আছে এ ভুবন ভরি' ।

কোটির মাঝারে ভক্তের লাগি',
করুণা লইয়া আছ কিহে জাগি ?
আর আছে যারা তরিতে তাহারা
পাবেনা চরণ-তরী ?

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কথা চিত্র)

১

ইভাকুইদের ক্যাম্প ভরাট। নিত্যই যোগান চলেছে, কমতে চায় না। আজ লাল পল্টন, কাল কালা পল্টন। সন্ধ্যা না হতেই 'বেঁটে পল্টন' পশুপতিনাথ কি জয় ঘোষণা করতে করতে হাজির। গা ঢাকা হতেই লম্বাদের প্রবেশ। এরা আবার কারা? "ওরা শুরুকি কত্তে" শুনে থাতে আসতে হয়। আওয়াজ কিন্তু সবারই চাপা। সবার কথাবার্ত্তার সমবায়ে ভাষাতত্ত্বের একাকার। যেন দেবভাষার সৃষ্টি চলেছে—

ট্রেণ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে—নিশ্বাসে নিজের অস্তিত্বের আশ্বাস দিচ্ছে—"আমি আছি!"

হুকুম হলেই সব চাঙ্গা—সুড় সুড় করে' রথে গিয়ে ওঠে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! জেনে দরকারই বা কি?

তখন রেল কর্ম্মচারীরা ধর্ম্ম রক্ষা করে' বিশুদ্ধ সাধু ভাষা প্রয়োগ করতে করতে সিগারেট ধরায়। বলে—"একটু চা পেলে যে বাঁচি।" হারাধন বলে—"এই এলো বলে।" ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম চলে।

শৈলেন বলে—"থাম্ বাবা, বাড়িতে একটু নুন নেই যে কচু পুড়িয়ে খাই, তার সেরও বার আনা।"

নীরেন বলে—"গুরুজনেরা সে খেদ রেখে যাননি—কথায় কথায় কলাপোড়া কচুপোড়ার আশীর্ব্বাদ প্রচুর ঝেড়ে লালন-পালন করেছিলেন। পাড়াপড়শীদের দাতব্যও কম ছিল না। তাঁদের দয়াতেই গয়ার পিণ্ডীর মত এই রেলের চাকরী মিলেছে। কচুপোড়া মিলবে, ভাবনা বটে ত নুনের জন্যে। সাগরের নুন নাকি হাঙরের গর্ভে গেছে।" ইত্যাদি সুখ দুঃখের কথা চলে।

পাশের "রিফ্রেসমেন্টরুমে" কাঁটা চামচের সুমধুর টুং টাং আর এগু, মাংস, হুইস্কি ও হাসি।

বীরেন বলে—"করে নাও বাবা, এদিন থাকবে না—য্যায়সা দিন নেহি রহেগা, ভগবান আছেন।"

বিজয়বাবু বয়সে কিছু ভেঙেছেন; বলেন "কি করে' জানলে বীরেন! কস্ করে যা-তা বোলো না। আমার এতটা বয়েস হোলো, আমি জানলুম না, আর তুমি জেনে ফেললে—"

"আলবৎ! দেখলেন না Robertson বেটা for nothing আমাকে গালাগাল দিলে, আমি ভগবানকে জানালুম। বিকেলে শুনি, বেটা ট্রলি থেকে পড়ে পা ভেঙে হাঁসপাতালে রয়েছে। ডাক্তার বলেছেন ও গো-হাড় আর জোড়া লাগবে না।"

"ওরে সে শুয়ে থাকলেও পেনসন্ টানবে, ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে কোম্পানীর খরচে পড়বে, খাবে-পরবে, টেনিস খেলবে। ভগবান আছেন বইকি। আমি তাঁকে না দেখলেও 'অস্বীকার করি না—' ইত্যাদি—

প্ল্যাটফরম পরিষ্কার—কুলিদের নাক ডাকে।

২

ওদিকে Head quarterএ হুলস্থুল। জরুরী 'তার' পৌঁছে গেছে—ইভ্যাকুই ক্যাম্প ঘেঁসে, আশে পাশে কলেরা দেখা দিয়েছে—best Certificate holder expert ডাক্তার with medicine ও বার্লি early morningএই হাজির চাই। কড়া হুকুম।

Sub-assistant Surgeon বিনোদ বেচারা মাস কয়েক আগে, একটি সপ্তদশী বিবাহ করে' এনে বেশ খুশিতে ছিল, প্রেমালাপের মধ্যে প্রমাদ গণ্‌লে।—"ও তো আমার ঘাড়েই চাপবে দেখছি। বড় বড়দের কাজের ভার চিরদিনই ছোটোদের বহনের সৌভাগ্য মেলে! ও তো জানা কথা!"

রাত তখন এগারটা।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে প্যায়দার পেয়ারের ডাক—"বড়া জরুরী তলব ডাক্টার বাবু। আমি সাহেবের পায়ে মালিস করছিলুম, উঠিয়ে দিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে দুসরা তার আয়া হুজুর।"

"আমার মাথা খায়া—তা বুঝেছি। চলো যাচ্ছি।"—

—"দু'টাকায় হাট্ পাওয়া যায়—পদস্থ হলেই সব সাহেব—Colour bar নেই। হাফ্ প্যান্ট পরলেই হাকিম। এইবার সাধ মিটিয়ে হুকুম ছাড়বেন। যতো সব…"

দুর্গানাম জপ করতে করতে বিনোদ গিয়ে হাজির।

"সব বুঝেছ তো বিনোদ, তোমার জন্যে অনেকদিন থেকেই ভাবছি এই একটা মওকা মেলেছে, দেখি কি করতে পারি। এখন দুর্গা বলে…"

"আমি তাঁকেই ডাকতে ডাকতে এসেছি Sir, তার পর আপনি আছেন।"

"সে আমি ঠিক করে রেখেছি, সুনাম নিয়ে ফিরলেই, বুঝলে… বেশীদিন নেবেনা, বড় জোর কয়েক মাস—say 2, 3, 4,—তার পর যা করবার করবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—"

বিনোদের জানাই ছিল কোনো কথাই কাজ দেবে না, মিছে কেবল Sir, Sir করা। বললে—"তবে আর কি, এ আর ক'দিন!"

"হাঁ—এই তো চাই, তাই না তোমাকে ডেকেছি—"

"তা আমি জানি Sir, আপনি দয়া না রাখলে বিদেশে আমার আপনার বলতে আর কে আছে—"

"First train-এই বেরিয়ে পড়, বুঝলে? বাড়ির জন্যে ভেব না, আমি আছি—"

"ভরসা তো আমার তাই হুজুর, আচ্ছা তবে.."

"হাঁ, গুছিয়ে নাও গে। মাণিক ভাল Compounder, তাকেই দিচ্ছি—যা যা দরকার সব তাকে বলে দিয়েছি—"

"এই বাতের যন্ত্রণার মধ্যে কি করে এতো চিন্তা—ধন্ত আপনাদের মাথা। তবে অনুমতি—"

"হ্যাঁ,আর দাঁড়িও না—emergency—বুঝলে? হ্যাঁ Camp এখান থেকে ছুটো ষ্টেসন বইত নয়—এই ভেবে এখানে যেন কোনো দিন এসে পড় না, আমি না ডাকলে আসবে না—বুঝলে?—এখানকার জন্যে ভেব না—আমি আছি।"

"আপনি যখন আছেন তখন আর ভাবনা কি?" ইত্যাদি বলতে বলতে বিনোদ বাসায় রওনা হ'ল—

তার মাথা ঠিক ছিল না—"৭ মিনিটের মধ্যে সতের বার বললেন—"বুঝলে"? যেন "Great ওহাবি কেসের" রায় লিখতে হবে। আবার ২৩ বার "ভেবনা আমি আছি।" তাতো বটেই তবে আর ভাবনা কি? এত আত্মীয়তা জানলে—যাক এখন too late—"

বাসায় পৌঁছে—"দোরটা খোলো—শুনচো—আমি গো।"

"বড় ভয় করছিল—"

"ভয় আবার কি, স্বয়ং সাহেব রয়েছেন অভয়ের মালিক।" বেগটা সামলে—হাসি মুখে বললে—"বাঘ এলে কেউ ডাকে, প্যায়দার ডাক শুনেই বুঝেছিলুম—আমি ছাড়া কলেরার মওড়া নেবার expert ডাক্তার এ District এ নেই। Certificate এ কলেরা-মাষ্টার বলে underline করা রয়েছে যে,—আমাকে ছাড়চে কে?"

রাণী ভীত হাস্তে বললে—"কেউ না ছাড়ুক—কলেরায় ছাড়লে যে বাঁচি।"

"সে ছাড়বে না! সেই আমাকে medal দিইয়েছে?" তার পর অনেক কথা।—ডাক্তারখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কটা দিন সাবধানে থেকো। সাহেব স্বয়ং এসে খবর নেবেন বোধ হয়, তুমি ঘর থেকে কথা ক'য়ো, বেরিও না, আত্মসম্মান রেখে চোলো।" ইত্যাদি সব বুঝিয়ে সুজিয়ে, সাহস দিয়ে, কম্বল আর ছেঁড়া ওভারকোট সম্বলে সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল। First train বেলা আটটায়।

"তিনজন বড়কর্ত্তার সঙ্গেই দেখা করে সেলাম জানিয়ে যাওয়াই উচিত—ওটা তুষ্টির মুষ্টিযোগ। নচেৎ তাঁরা বিনা মেঘে শিলা বৃষ্টি করেন। Self-Government এর পরিচয় দেন।"

বিনোদ বিনয় বচন শুনিয়ে এল, শেষ বড় কর্ত্তার সঙ্গে পুনশ্চটা সারলে। তিনি অভয় দিলেন—"কোনো চিন্তা রেখ না, কলেরা বইতো নয়। ভয় খেয়োনা, আমি মাঝে মাঝে যাব।"

"না, ভয় আবার কি—কলেরা বইত নয়।"

"আমার পাটা একটু সারলেই—বুঝেছ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ডাক্তারখানেক বেরুবেন না, rest দরকার। ও রোগে বালিস আর মালিস, আপনাকে আর কি বলবো—"

"জলটা গরম করে খেয়ো, আর বাজারের কিছু—ওই ছাই ভস্মগুলো—তুমি তো সব জানো…"

বিনোদ মনে মনে বললে—"হ্যাঁ জল গরম করে দেবে আমার ৭টা দাসী আর মাসি, আর কচুরি জিলিপি ঠোঙা ভরে আসবে, সেরটা ছ' টাকা বই তো নয়!"

"তবে একখানা গাড়ি বলে আসি সময়ও কম"…

"তা'নাতো আমারও চিন্তা ছিল না, ওতো এখন ঘরের কথা হুজুর…"

"বাসার জন্যে কোনো চিন্তা রেখনা। দেখা শোনা নিত্যই করব—বুঝলে?"

"ও পা নিয়ে এখন কষ্ট পাবেন না। ঝি চাকরকে দিয়ে খবরটা নিলেই হবে, তাদের সঙ্গে সব কথা সে কইতেও পারবে—"

"আরে আমার তো নাতনী হে, আমাকে আর লজ্জা কিসের?"

বিনোদ নমস্কার করে বেরিয়ে পড়লো—"যা করেছেন বেশ করেছেন, আবার এত দয়া কেন!"

৩

মাঝে মাঝে এই সব কথা ফুট্ কাটে, বেচারা বিনোদ বেজায় দুশ্চিন্তা নিয়ে চললো। সে মধ্যবিত্ত সদ্বংশের ছেলে বলিয়ে কইয়ে আমুদে। তাকে সকলেই চায়—ভালোবাসে। এই সন্দেহ বাইটি বা বাতিকটি সম্প্রতি জুটেছে বোধহয়। সর্ব্বদা হাসি খুশিতে থাকাই তার অভ্যাস। রবিবাবুর পরম ভক্ত, চয়নিকা নিয়েই থাকে। ভাবছে—"ফাগুন মাসে বিয়েটা করলেই ভাল ছিল, তিনটে শুভহিবুক যোগও ছিল—এখনো তার কয়-মাস বাকি রয়েছে; কি ভুলই করা হ'য়েছে! এটা তো শ্বশুর মশায়ের মাতৃদায় ছিলনা,তাঁর মেয়েও গৌরীটি ছিলেন না—Long nine years in default অরক্ষণীয়া! বয়সটা ২।৩ বছর ফাঁকি দিয়েই বলে থাকবেন—I can swear moreover ফৌজদারী আদালতের সমনও কেউ দেয়নি—ধপাস্ করে সেই মেঘ-মেদুর নিবিড় আষাঢ়ে যখন "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"

এখন এ কাজ না করলেই কি তাঁর তালুক বিকিয়ে যাচ্ছিল? nonsense—

আমিও কি বের জন্যে পাগল হ'য়েছিলুম? অবশ্য আমার যেন আপত্তি ছিল না, সেটা কোন্ Sensible young man এরই বা থাকে, except এ few unfortunates তারা বোধ হয় অতবড় বিজ্ঞান-বিশারদ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়, অকুতোভয়ে যা লিখে গেছেন—যৌবনকাল অতি বিষম কাল, এই কালে—ইত্যাদি, দেখেনি; সুতরাং আমি কোনো অন্যায় অসামাজিক কাজ করিনি, তা বলে বাট পেরিয়ে শ্বশুর মশায়ের তো "সেকাল" ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। নির্লজ্জের মত…চুলোয় যাক্—

Compounder মাণিকলাল কখন এসে দাঁড়িয়েছে, হুঁস ছিলনা। "এই যে মাণিকলাল, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। বড় বিপদ, বড় ইভ্যাকুই-ট্রেণ কি এই District-এই ভ্যাকুয়ম-ব্রেক কসবে? সাহেবের আবার বেজায় emergency চেপেছে—

মাণিক বললে—"আজ্ঞে আমি যে শুনলুম "বাত।"

"শুনেছ ঠিক, সেটা হিন্দি-"বাত" ছাড়া আর কিছুই নয়, বড়রা সত্য কথা কন কিনা পরে বুঝবে।"

বিনোদ কথা কবার লোক পেলে ভাল থাকে।

ভিন্ন লোকের ভিন্ন চিন্তা। মাণিকলালের সঙ্গে ওষুধ ভরা প্যাকিং কেস্। যে বললে, "আজ্ঞে সে সব পরে বুঝিয়ে দেবেন।

"তোমারো নাকি ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আসল জিনিষেরই অভাব সোডিয়ম ক্লোরাইড বড় কম দিয়েছে, অথচ যে কাজে আসা, ওইটাই যে কলেরা কেস মাত্রেই দরকার।"

বিনোদ বিরক্ত ভাবে বললে—"কে বললে ? সরকারের বিপদটা বুঝি রোগের মধ্যে নয়,—সেটা ভাববার দরকার নেই ? সেইটাই প্রধান বলে মনে রেখ। আর মনে রেখ—কেষ্টা, বেষ্টা, ভুতো, ভুলো, ধুলো পেলেই সারবে না হয় সরবে। মালিকের বিপদের সময়ে, কার্পণ্যই বৈধ পন্থা। যেটা কম দিয়েছে সেটা কম দিলেই হবে—recent circular গুলো দেখনা বুঝি।"

"তাতে লোক বাঁচবে কি sir। আপনার যে বদনাম হবে—"

"কতদিন কাজে ঢুকেছ ? ওসব কি সত্যি সত্যি ঐ গরীব হতভাগাদের জন্যে নাকি ? ও সব করতে হয়। দেখনি যার ঘরে আগুন লাগে, তার ঘর বাঁচাবার আশা থাকলেও পুড়তে দিতে হয়, না হয় আগে ভেঙে ফেলে দিতে হয়, আসে পাশে না আঁচ পৌঁছায়। নিয়ম ঠিক আছে, কোথাও গলদ নেই। আমাদের কাজ বটে বাঁচানো, তার মানে হাদের, দুঃখ দৈন্য কষ্ট থেকে বাঁচানো —তারা মলেই বাঁচে—বুঝেছ ? হিঁদুর ছেলে শাস্ত্র মানতো, তিনি বলেছেন—যদ জীবতি তন্মরণম্। ওদের মারতে পারলেই পুণ্য আছে, সেটা অলিখিত কথা, বুঝে নিতে হয়। আর বদনামের কথা বলছ ! সেটা তো আমাদের হাত নয়, বদনাম বাঁচাবার উপায় আছে কি ? আমরা ছাই ফেলবার broken soup—ভাঙা কুলো হে ! বড়দের গলদের বলদ আমরা, তাঁদের খোসনাম নেবার উপায়।—বাঁচালেই তাঁরা বাঁচান, মলেই—আমরা মেরেছি। তাঁদের চিরদিনই open door—পথ খোলসা—

মাণিকলাল বললে—"তাহলে যে মশাই—"

"হ্যাঁ—তাই। যাও, এখন শুওর থাকবার মত একটা বেশ দুয়োর জানলা ভাঙা বাসা খুঁজে বার করো গিয়ে। চার মাস তো আর এই ঠাণ্ডায় এই প্ল্যাটফর্ম্মে চলবে না। বড় বড়দের কর্ম্মের বালাই নেই, বাড়িতে লেপের মধ্যে গরম থাকবেন। যাও এখন বাজারটা তো করা চাই, পেট্‌টাতো সঙ্গেই এসেছে, ঐ হারামজাদার জন্যে কোথাও আরাম নেই। যাও আর দাঁড়িও না, তোমার অনেক কাজ—যাও।"

ঠিকানায় পৌঁছে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে এই সব কথা। মাণিকলাল অবাক। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।—বলছেন অনেককাজ, কিন্তু কাজের কথা তা একটাও শুনলুম না। যাই বাজারেই যাই ; বাসা ঠিক করাও হবে। কিন্তু বাসার যা বর্ণনা দিলেন,—দেখাই যাক্—"

Medicine boxটা গুদোম বাবুর জিম্মায় রেখে মাণিক বেরিয়ে পড়লো। যে বাসার ফরমাজ হয়েছে সে তো আর এদেশে খুঁজতে হয় না। সহজেই মিলে গেল। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়ে দিলে তিনিও বললেন—"ওঃ খুব হবে, খুব হবে। অর্থাৎ সে দিকে তাঁর মনই ছিলনা মন অন্যত্র ঘুরছে। কেবল অভ্যাসমত একটু হাসি টেনে বললেন—"ভুল করে দিল্লী এসে গেলুম নাকি। বেগমদের toilet house নয়তো, বড় বড় mouse বেড়াচ্ছে যে ?"

মাণিকলাল একটু ক্ষিপ্ত হয়ে বললে—"আপনি যেমন বললেন Sir, বলেন তো—"

"না না, ওইতেই বেশ হবে। এখন বাজারটা—"

"আজ্ঞে এই চললুম।"

মাণিকলাল চলে গেল।

"কার জন্যেই বা বাসা, কিসেরি বা বাসা, আর কেনই বা বাসা"—বিনোদ অন্যমনস্ক। "ও-সব ভুলে যাচ্ছি—Telegram করতে হবে যে। বিনোদ ষ্টেশনে ছুটল। পিসির Presence urgently required, অবস্থা very serious, must avail first train.

"পিসি এলে আর ভয় করি না। তাঁর দাপটে পাড়ায় শেয়াল কুকুর ডাকে না। তিন তিনবার যম এসে ফিরে গেছেন।"

নিশ্চিন্ত হয়ে একবার গ্রাম ঘুরে এলেন।—"গরীবরা জন্মায় কেনো, জন্মায় তো মরে না কেনো ? এদের বাঁচাবার মহাপাপ নেবে কে ? এ কষ্ট দেখার চেয়ে সব সাফ করেই ফেলা ভাল। না ঘরের চাল চুলো, না পেটে একমুঠো দেবার চাল। ভাল ডাক্তারের উচিত এদের শেষ করে দেওয়া। এ দেশে ডাক্তারদের ওই একটি করবার মত পুণ্য কর্ম্ম আছে। দেখা যাক কতটা পারি।" সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসি খেলে গেল। বিনোদ ক্রমশ ধাতে আসছে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে "কি শুভানুধ্যায়ী—শুনিয়ে দিলেন—দেখা শোনা তো আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে হে ! তাতো বটেই, —পিসি এলে একবার দেখো !"

বিনোদের বেগড়ানো মাথাটা নিজের কাঁধে ফিরছে।

* * *

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের একটি বড় থলচে করে বাজার নিয়ে ফিরলো।

"একি, তরকারি আর মাছ এক গোয়ালেই পুরেছ বুঝি ? জাত জন্ম আর—"

"আজ্ঞে ওতে সব নিরামিষই আছে—"

"ওঃ আমি বলি—আজকাল সব—যাক্"

"আপনাকে বলতে হবে। স্থানটিও তা মেনে চ'লে—বৃন্দাবনের বাবা, বষ্টোম বানিয়ে ছাড়বে।"

"কেন, মাছ পেলেনা বুঝি ?"

"আজ্ঞে তাই বটে। যা আছে তা কেনবারও নয়, খাবারও নয়। তবে দেখবার জিনিষ বটে—ইয়া ইয়া কই, থই থই করছে। আধ হাতের কম একটাও দেখলুম না।"

"তবে ! ওর চেয়ে কি মাছ আছে—ছেড়ে এলে যে বড় ? —তোমাদের বাড়ী কোথা ?"

"আজ্ঞে হুগলি জেলায়।"

"ও—তাই ! ওর মর্ম্ম বুঝবে কি করে। গুগ্‌লিই চেন। আমরা যশোর-ঘেঁষা লোক—কই যেখানে মসুর। যাও ছুটে যাও, ছুটে যাও, অন্তত গোটা চারেক নিয়ে এসো গে—চট্।"

"চারটেতে এক সের হবে, এক টাকা করে সের, আপনি বাজার করতে মোট সাড়ে চার আনা দিয়েছিলেন।"

বিড়িটার আঁচ আঙুলে পৌঁছেছিল। সবেগে ছুঁড়ে ফেলে, হতাশ ভাবে—"কি গ্রহেই পড়েছি, আড়াই টাকা টেলিগ্রামে গেল ! দূর হোক্, কি আনলে দেখি।"

"যা পেয়েছি সবই এনেছি—কচু কাঁচকলা, ঘেতোশাক আর

ডাক্তারের নাম' করায়—একটা মূলোও মিলেছে। দরদস্তর নেই—এক কথা—সব সত্যবাদী, যা বলবে তাই…"

"ও, বাজার নয়—এজলাস, হাকিমরা বসেছেন! তা বুঝলুম, কিন্তু বুঝতে যে পারছি না ও চতুর্বর্গ মিলিয়ে, ওটার মাথা ছাড়া আর কোন মেওয়া দাঁড়ায়! পেটে কিন্তু Great Hunger, কিছু না খেলে নয়। সাহেব বলেছেন "জলটা গরম করে খেও।" শেষ সেই ঋষিবাক্যই ভাগ্যে ফলবে দেখছি!—"

"যাও দু'পয়সার মুড়িই নিয়ে এস; চুলো জেলে আর কাজ নেই। ঐ মূলোটি সখলে দু'গাল মুড়ি মেরে কবল মুড়ি দেওয়া।"

মাণিক বললে—"তাই যদি ব্যবস্থা হয় তো আর এক আনা দিন! মুড়ির সের দশ আনার কম নয়!"

"Emergency,"—নাও, এক আনাই নাও। কতুর হ'তে আসাই গেছে, 'কেয়ার্‌' না হতে হয়,—যাও!"

মাণিকলাল ব্রাউন পেপারের খলচে খালি করে নিচ্ছিল—

"ওটা কি?"

"আজ্ঞে খলচেটা নিচ্ছি—মুড়ি আনতে হবে।"

"দেখচি কোনো খবরই রাখ না। কেবল ম্যাগ্‌সাল্‌কই মুখস্ত করেছ। আজকাল ওটা খলচে নয়—'কলচে'। কাগজের মন্বন্তর। তালপাতার তাল সামলাবার দিন এসেছে। লুকিয়ে ফেল—লুকিয়ে ফেল। অনেক শ্রীমান মুকিয়ে আছে, দৃষ্টি পড়লেই শ্রীঘর! বুঝলে? Very strict order."

"তবে মুড়ি আসবে কিসে Sir?"

"কেন—কাপড়ে"

"আজ্ঞে half-pantএর তো কোঁচা নেই!"

"তাই তো, ভাবালে যে। আমার হ্যাট টাই নিয়ে যাও, ওতে তেলও পাবে, সে খরচটা বেঁচে যাবে।"

মাণিকলাল হ্যাটটি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"লোকটা দেখছি নীরস নয়, কাটবে ভাল। কিন্তু পিসি না আসা পর্য্যন্ত মগজটা খিতুচ্ছে না, স্থির হয়ে কিছু ভাবতে পারছি না। ও কই মাছ খেতেই হবে…"

বিনোদ বিড়ি ধরালে।

মাণিকলাল এসে গেল।

"আঃ বাঁচলুম, পেট বাপান্ত করছে!"

"কিন্তু যা পেয়েছি মশাই, তা হ্যাটের গহ্বরে ডুব মেরে যেন কবরে শুয়ে আছে।"

"সে জন্যে ভেবনা মাণিকলাল, ওর কারণ আছে, খেতে খেতে বলব। এখন মুড়ি নিয়ে এস।"

মাণিকলাল খবরের কাগজ পেতে মুড়িগুলো ঢেলে ফেললে। নাঃ নিতান্ত কম নয়, আমি ভয় পাচ্ছিলুম।

ডাক্তার হাসি মুখে বললে—"বলেছিত ওর secret আছে, খেতে খেতে হবে। কই মূলো কই?"

"আজ্ঞে এই যে—"

উভয়ে মূলো সংযোগে মুড়ি চর্ব্বণে মন দিলেন। ডাক্তার আরম্ভ করলেন—"সব অদৃষ্ট হে—অদৃষ্ট মাণিকলাল। হ্যাটের হাড়োল দেখে বুঝছনা,' মাথাটি মিলেছিল রাজা রামমোহনের মত —কিন্তু ভাগ্যটি মিলেছে খাজা ড্যামমোহনের মত… বুঝলে। তাই মুড়ি ভাগ্যই প্রবল—"

মুখটা বিকৃত করে—"ইস্‌ তাইতো—দু'দিন যে সে কাজ হয় নি—"

"কি কাজ মশাই বলুন না—আমার দ্বারা—"

বিনোদ সহাস্যে—"সে স্বয়ং ছাড়া ভগবানের দ্বারাও হয় না। ঐখানেই তিনি অসম্পূর্ণ—সর্ব্বশক্তিমানের কলঙ্ক হে। ইস্‌ পেটটা যে,—দু'দিন খাওয়া নেই, ওটা থাকে কি করে!"

"আজ্ঞে তা থাকে, যেমন ঘরে চাল না থাকলে খিদে থাকে, বরং বাড়ে—"

"ঠিক বলেছ মাণিকলাল, সত্যিই বাড়ে—কিন্তু কোথায় যাই বল দেখি—"

আজ্ঞে আপনি যাদের মত বাসা দেখতে বলেছিলেন, তারা তো ও বালাই রাখে না। ভাববেন না—sidingএ সেদিনকার ঘা-খাওয়া গাড়িখানা এনে রেখেছে, তার 2nd classএ ঢুকে পড়ুন তো, তোফা বন্দোবস্ত আছে—"

"আঃ বাঁচালে মাণিক—many thanks."

* * *

"তাই তো—এখনো যে ডাক্তারবাবু ফেরেন না। কোনো বিপদ ঘট্‌ল না তো। এটা আবার বড় জংসন, চারদিকে লাইন, তার তার মাথা একদণ্ড চিন্তাশূন্য নয়। এগিয়ে দেখব নাকি!"

এই সময় ডাক্তার—"মাণিক মার দিয়া" বলতে বলতে হাসি-মুখে হাজির।

"আমাকেও 'মার' দিয়েছিলেন মশাই। দেরি দেখে এই বেরুচ্ছিলুম, ভাগ্যিস্‌ এসে পড়লেন—বাঁচলুম! যে রকম রেল পাতা, দেখলে মাথার ঠিক থাকে না, কোন্‌টা দিয়ে কখন বেরো করে',—যাক্‌—মা রক্ষা করেছেন।"

"সত্যিই করেছেন! জলের কথাটা বলে' দিতে হয়। ভগীরথ শাঁখ বাজিয়ে পানি এনেছিলেন, আমি মাথা খুঁড়েও পাইনা। গামছা রাখবার একটা সুবিধে খুঁজতে গিয়ে শেষ পাহাড়ী ঝরণা খল খল করে' হেসে, নাইয়ে দিলে—বাঁচলুম! সাধে কি ব্রাহ্মণে গামছা কাঁধে না করে বেরুতেন না।"

"আশ্চর্য্য, ট্রেণে দেশে বিদেশে ঘুরছেন, কলের কায়দা জানতেন না।"

"ভেবেছ বুঝি ভারতে মহাত্মা ঐ একটি। বরাবর 3rd classএই যাতায়াত যে। কলই ওদের বল—কিন্তু আমাদের দিশী ঋষিরা বুঝেছিলেন—সর্ব্বম্‌ আত্মবশম্‌ সুখম। নাও এখন সতরঞ্চিখানা পেতে ফেল, একটু গড়িয়ে নাও। মূলোর দৌলতে আজ তো আর চুলোর ব্যবস্থা নেই।"

"আপনি শুয়ে পড়ুন, আমার এখন অনেক কাজ, রাতে শোবার ব্যবস্থা করাও তো আছে। আমি লম্বা মানুষ এ ঘরে আমার আধখানার বেশী কুলয় না। তার উপায়ও ভাবতে হবে।"

"আমি আর ভাবতে পারি না, সকালে আমার বহুৎ কাজ। তার ওপরই সব নির্ভর করছে।"

"সেতো বটেই, যে কাজে আসা, তার চিন্তা আগে, সে সম্বন্ধে এখনো—"

"থাক মাণিকলাল—তার জন্যে তো"…

"যে আজ্ঞে,—কাল কিন্তু…

"হাঁ,সেই ভালো,মাথাটা আগে ঠাণ্ডা হতে দাও।" (ক্রমশঃ)

আমাদের সিন্ধু পর্য্যটন

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারপর চার মাস বিশ্রামের পর ২৪শে এপ্রিল নিজের কাজে যোগদান করলাম। এদিকে পুলিশ ডাকাতদের খোঁজ পেয়ে (বেলুচিস্থানের) কালাত রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে ওদের বৃটিশ পুলিশের হাতে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন কালাতের পুলিশ ভারি এক মজা করে তাদের ধরে। প্রথমে ঐ দেশীয় কতকগুলি লোককে চুপিচুপি তাদের বাসস্থানের খোঁজ নিতে বলা হয়। পরে তাদের শিখিয়ে দেওয়া হলো, তারা গিয়ে বলবে, যে তারাও একদল ডাকাত। কালাতের নবাব তাদের নিশ্চিন্তে বাস করতে দিচ্ছে না, তাই তাকে শিক্ষা দেবার জন্য তারা ওদের দলে মিশে দল ভারি করতে চায়। আর তারা বন্দুক ব্যবহার করতে জানে না, ঐটা শেখাই তাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাতে ওরা রাজি হয়ে গেল।

বেলুচিস্থান অঞ্চলে বন্দুক রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে না। তারা ইচ্ছামত কার্টিজ বন্দুক তৈয়ারি করতে পারে, রাখতেও পারে। পরের দিন সকালে তারা ওদের কাছেই থাকবে বলে চলে এলো। এদের একজনের কাছে মাত্র একটা বাঁশী (whistle) লুকান ছিল। ডাকাতদের কাছে যতগুলি কার্টিজ তৈয়ারি ছিল, তারা তাদের শেখাবার জন্য খরচ করে ফেলতে দ্বিধা করে নি, কারণ তারা জানতো যে খানিকবাদেই আবার তৈয়ারি করে নিতে পারে। তারা যখন ওখানে আসে, তখন সঙ্গে তাদের অনেক বন্দুকধারী সৈন্য পাহাড়ের আশে পাশে লুকিয়ে ছিল। যখন তারা বুঝতে পারল যে আর একটা কার্টিজও তাদের হাতে নাই, তখনই বাঁশী বাজিয়ে ঐ সৈন্যদের ইসারা করলে আসবার জন্য। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো। এদের মধ্যে একজনের কাছে একটা মাত্র কার্টিজ ছিল, সে কিছুতেই ধরা দেবে না, তাই তাকে গুলী করে মারা হলো। বাকি সকলেই নিরুপায় হয়ে ধরা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসাতেও যে কয়জন ছিল তাদেরও ধরে ফেলা হলো। আর সেখানে লুঠকরা জিনিষের মধ্যে যা সামান্য কিছু পড়েছিল তাও নিয়ে আসা হলো। তার মধ্যে একটা উটও পাওয়া গিয়েছিল। উটের মালিকেরা কিন্তু তাদের উটগুলি যখন এরা নিয়ে পালাচ্ছিল তখনই কোরাণের শপথ দিয়ে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করতে করতে অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়েছিলো। তাতে ডাকাতেরা বলে যে জামালখান গ্রামে তারা আছে, ওরা পরে ওখান থেকে গিয়ে যেন নিয়ে আসে। কিন্তু ভয়ে তারা আর কেউ যায় নি। পুলিশ তাদের নিয়ে গিয়ে কালাত জেলে আপাততঃ আটকে রাখলে।

এবার তাদের সনাক্ত ও বিচারের পালা। তারা ব্রিটিশ প্রজা নয় বলে কিন্তু বৃটিশ কোর্টে বিচারের জন্য পাঠাতে তাদের ভয়ানক আপত্তি হতে লাগলো। তার প্রধান কারণ ছিল যে তাদের তাহলে হত্যাপরাধে বৃটিশ কোর্টে প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। প্রাণদণ্ডের বালাই ওদের দেশে একেবারেই নেই। যারা নরহত্যা করে, তাদেরও সাত বছরের বেশী জেল হয় না।'

ভারত সরকারের একজন গেজেটেড্ অফিসারের হত্যার জন্যই কাউন্সিলে নানান রকম প্রশ্ন করা হতে লাগলো। কাজেই বাধ্য হয়ে একটা মাঝামাঝি রকমের ব্যবস্থা করা হলো। সেইরূপ বিচারকে ওরা বলে "জীর্গা"। তাতে কালাত রাজ্যের তিনজন বড় বড় কর্ম্মচারি এবং বৃটিশ কোর্টের তিনজন বড় বড় কর্ম্মচারির সামনে বিচার হলো। অন্যের বেলায় কালাত রাজ্যেই এটা হওয়া নিয়ম, কিন্তু আমাদের জন্য এটা হলো দাদুতেই। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমরা সেখানে সকলেই আবার সাক্ষী দেবার জন্য গেলাম। ভক্তিব্রতবাবুর বাসাতেই উঠ্‌লাম। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করেছিলেন। আমরা প্রধান সাক্ষী বলে, পাছে আমাদের কেউ ডাকাতদের পক্ষ থেকে হঠাৎ কোনও ক্ষতি করে, তাই আমরা যে কয়দিন ওখানে ছিলাম, সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা থাকতো।

বিচারের দিন ১১টার সময় কোর্টে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে ১৩জন ডাকাতকে হাতে ও পায়ে লোহার শিকল দিয়ে, পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তাদের বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাসি তামাসা করছে। আর তাদের ২০।২৫জন সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তাদের পরণে তখন বেশ পরিষ্কার লংক্লথের ঢিলা পায়জামা, পাঞ্জাবী ও পাগড়ী ছিল। বিচারকেরা সামনের চেয়ারে বোসেছিলেন। আর ২জন "দোভাষী", সাক্ষীরা যা বলছিল টুকে নিচ্ছিলেন। বিচারকদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরাজি না জানায় সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী উর্দ্দুতে নেওয়া হলো। আগে ধনরাজমলদের সাক্ষ্য নেওয়া হলো এবং পরের দিন আমাদের নেওয়া হলো। আমি ইতিপূর্ব্বেই একটা কৃত্রিম হাত তৈয়ারি করিয়েছিলাম এবং সেটা পরেই ছিলাম। যখন আমার সাক্ষীর পালা এলো, আমায় দেখে তো ওরা অবাক হয়ে গেল! প্রথমতঃ আমি বাঁচলাম কি করে, তারপর আমার সেই হাতখানিই বা কি করে ঠিক আছে তাই দেখে। আমাকে সমস্ত ঘটনা বলতে বলা হলো। তারপর ওদের মধ্যে কাউকে চিনতে পাচ্ছি কিনা জিজ্ঞাসা করা হলো। আমি সেই ছোকরা—যে আমায় মেরেছিল, তাকে বেশ চিনতে পারলাম এবং আরও দুইজনকে চিনতে পারলাম। কিন্তু ছোকরার বয়স কম ছিল বোলেই বোধ হয়, ডাকাতরা সকলেই বলতে লাগলো যে "ও ছিল না, তবে আমরা সবাই ছিলাম"। একজন বললে, আমিই তো তোমায় গুলী করেছিলাম। আর একজন বললে যে সে মজুমদার মশাইকে হত্যা করেছে। তারপর একজন হঠাৎ বলে উঠলো "আরে তা না, মুসলমান বোলে"? আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোর্ট থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করে দিলে। একে একে সকলেরই সাক্ষী নেওয়া হয়ে গেল। তাদের বেশ হাসি মুখেই কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের দেশের অনেক লোক কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তারা যাবার সময় সকলের সঙ্গেই হাসি মুখে কথা বলে, তাদের আশ্বাস দিয়ে গেল।

আমরা সেইদিনই কলকাতা রওনা হয়ে এলাম। সশস্ত্র প্রহরী আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল।

অনেক দিন পরে একদিন কাগজে দেখলাম যে তাদের প্রত্যেককেই দোষী সাব্যস্ত করে বিচারকরা ৭ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। সেটার পরিসমাপ্তি বোধ হয় ১৯৪৬ সালের গোড়াতেই ঘটবে।

ডাকাতদের কাছ থেকে কেড়ে আনা জিনিষের মধ্যে সামান্য ২।৪টা জিনিষ, যা আমাদের বলে সনাক্ত করেছিলাম, তা আমাদের কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অবশ্য সেগুলির কোনটাই ব্যবহার-যোগ্য ছিল না।

সরকারি কাজ করবার সময় আমাদের এরূপ হওয়ায় আমরা কতকটা অক্ষম হয়ে পড়া সত্বেও আমাদের চাকুরী বজায় রইল। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাদের দয়া করে সরকার কিছু দিলেন।

বাংলায় হিন্দু আন্দোলন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

বর্ত্তমানে বাংলার হিন্দুসমাজ নানাভাবে উৎপীড়িত। তাহার স্বাধিকার আজ উপেক্ষিত, তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি আজ বিশেষভাবে আক্রান্ত। তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা উপদ্রুত, রাজনৈতিক অধিকার অপহৃত, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিপর্য্যস্ত, শোভাযাত্রার অধিকার সঙ্কুচিত। তাঁহার সংস্কৃতি ও সত্তা ক্ষুণ্ণ। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ আজ বাংলায় সংক্রামক হইয়া আছে। বিগত কয়েকবৎসর ধরিয়া বাংলার হিন্দুগণের উপর হিন্দু-নিপীড়নের যে ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে তাহার কাহিনী মর্ম্মন্তুদ।

কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানের বিধান এই যে, ক্রন্দনশীল জাতির অস্তিত্ব প্রকৃতি সহ্য করে না, যে পুরুষকার আশ্রয় করে—সেই বাঁচে; শুধু বাঁচে না, সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এখন যে সঙ্কট চলিতেছে, তাহাতে হিন্দুকে বামহস্তে তরবারি-মুষ্টি ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে বন্ধুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে হইবে। কেননা বন্ধুর মুখোস ধারণ করিয়া অনেক গুপ্ত শত্রু হিন্দুর বক্ষবিদারণ করিতে উদ্যত। এক্ষণে বাঙ্গালী হিন্দুর এই পৌরুষের পথ ছাড়া আর বাঁচিবার পথ নাই। বিগত বজবজ, জলপাই-গুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হিন্দুসম্মেলনের উদ্দীপনাময় কার্য্যে প্রমাণিত হয় যে বাংলার হিন্দুরা এই পৌরুষের পথ গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ নহে।

বজবজ হিন্দুমহাসভার উদ্যোগে বিগত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বজবজে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এক বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে ২৪ পরগণা জেলা হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও জেলায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি এবং অন্যূন দশ সহস্র হিন্দু নরনারী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, হিন্দু-রাষ্ট্রপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, মেজর পি, বর্দ্ধন, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ প্রভৃতিকে এক শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন তোরণের ভিতর দিয়া সভামণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর মেজর পি, বর্দ্ধন এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা হিন্দুর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ২৪ পরগণা জেলা হিন্দু মহাসভার সম্পাদক কর্তৃক দেশবাসী ও মহাসভার পক্ষ হইতে সম্মেলনের উদ্বোধক অখিল ভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাঁহার তেজোগর্ভ উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, "হিন্দুকে মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মনে যে একটা পরাভবের মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে হিন্দুমহাসভার নেতৃত্বে তাহা দূরীভূত হইবে। ভারতের ত্রিশকোটি হিন্দু যদি সংঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে সে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। আর এই ত্রিশকোটি হিন্দুর সমন্বয়ের দ্বারা শুধু ভারতের কল্যাণ নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হইতে পারে।" পাকিস্থান প্রস্তাবটি যে কিরূপ অনিষ্টকর সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি মন্তব্য করেন যে এই অখণ্ড ভারত পাকিস্থানী পরিকল্পনায় দ্বিধা বিভক্ত হইলে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে এবং ফলে ব্রিটিশ শাসন আরও শক্তিশালী হইবে। তিনি তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় দ্বারা আরও বুঝাইয়া দেন যে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে এবং উহা হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন কামনা করেন।

অতঃপর জেলামহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন "আমার যুবক বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, মহাসভা কংগ্রেসের ন্যায় কি অহিংস অসহযোগ বা আইনঅমান্য প্রভৃতি কোন আন্দোলন করিয়াছে? তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে ঐরূপ আন্দোলনে মহাসভার কোন আস্থা নাই। মহাসভা মনে করে যে ঐরূপ আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নহে। প্রয়োজনীয় সংগঠন কার্য্যের পূর্ব্বে সমস্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা যাইতে পারে না। তবে হায়দারাবাদে হিন্দুর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বা ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইলে মহাসভা এই সকলের প্রতিবাদে সংগ্রাম করিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ, বি, এস, মুঞ্জে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পাকিস্থান, মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলে ও হিন্দুকোডের প্রতিবাদ এবং শ্রমিকদের দাবীর অনুকূলে গৃহীত প্রস্তাবাদির উত্থাপনে ও সমর্থনে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ঔপন্যাসিক-নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর হরলাল হালদার, ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মেলনে যোগদান করেন।

ইহার পর গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়িতে ৭৫ বৎসর বয়স্ক ধর্ম্মবীর ডাঃ বি, এস, মুঞ্জের পৌরহিত্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার একাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে, হিন্দুরাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রায় ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ বিশিষ্ট হিন্দুনেতা বাবা-সাহেব খাপার্দে, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জলপাই-গুড়িতে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ঐদিন বেলা দশটার সময়ে ডাঃ মুঞ্জে ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীযুক্ত বি, জি, খাপার্দে হিন্দু মহাসভা পতাকা উত্তোলন করিয়া বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় আর্য্যনাট্য সমাজহলের পার্শ্বস্থিত ময়দানে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলন আরম্ভ হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত ও মঙ্গলাচরণের পর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বলেন 'আজ এই সম্মেলন বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমাদের গত অধিবেশনের পর প্রদেশের উপর দিয়া এক শোচনীয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। স্বৈরশাসনই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। দুর্ভিক্ষের পর অখাদ্য ভক্ষণের দরুণ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়াছে। বস্ত্র ও ঔষধ অভাবে লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই। বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা অন্যান্য বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সঙ্কটের সময়ে যথাসাধ্য সেবাকার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশকে এরূপ দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাই বর্ত্তমান অবস্থার প্রধান কারণ। কাজেই জনসাধারণের অপরিহার্য্য প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালিত না হইলে এই সমস্যার যথার্থ সমাধান হইতে পারে না।

হিন্দুমহাসভা এই কয় বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুমহাসভা এই প্রদেশে অন্যান্য সম্প্রদায় ও মুসলমানদের এক বিরাট অংশের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছে। মহাসভা সকল সম্প্রদায়কেই বন্ধুভাবে মিলিত দেখিতে চায়। মহাসভা এই মত পোষণ করেন সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মমত অক্ষুন্ন রাখিয়া একযোগে, দেশমাতৃকার সেবা করুন। তিনি আরও বলেন, যে পাকিস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান ঘটিবে না। গান্ধীজির সমর্থন লাভ করিলেও শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারীর প্রস্তাব বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। বাংলার কংগ্রেস-সেবীদের এক বিরাট অংশ ইহার প্রতিবাদে দণ্ডায়মান হন। হিন্দুগণ ও মুসলমান সমাজের একটি অংশ ইহার বিরোধিতায় একত্র সম্মিলিত হন।

সম্মিলিত শক্তিবর্গের স্মৃতি হইতে আজ ভার্সাই সন্ধির মধ্যে বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত জগতে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। ভারত রাজকীয় দানস্বরূপে স্বাধীনতা লাভ করিবে না, সে তাহার প্রভুর নিকট হইতে আপনার অধিকার অর্জ্জন করিয়া লইবে। সস্তা ভাবালুতা ও কতকগুলি বুলির উপর নির্ভর করিয়া যেন কেহ ঐক্যের প্রত্যাশা না করেন। যাহাদের লক্ষ্য এক, কেবল তেমন ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ঐক্য হওয়া সম্ভব।

রাষ্ট্রপতি ডক্টর মুখোপাধ্যায় অতুলনীয় বাগ্মীতাপূর্ণ উদ্বোধন-বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ঘোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন

ডাঃ মুঞ্জে

যে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা দ্বারা হিন্দুদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। হিন্দু সংগঠনের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন এই জাতিভেদ প্রথা। এই প্রথাকে যথাশক্তি প্রতিরোধ করিয়া জাতিভেদের বৈষম্য পরিহার করিতেই হইবে।

অতঃপর নির্ব্বাচিত সভাপতি ধর্ম্মবীর ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাত্ত কণ্ঠে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। ভারতে আমরা যে রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাই তাহা হইবে গণভোটের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজ। এই রাজ্য কেবলমাত্র হিন্দুরাজ বা মুসলমানরাজ কিংবা খৃষ্টানরাজ হইবে না। ইহা হইবে ভারতীয় গণরাজ—যে রাজ্যে ভারতের প্রত্যেক জাতি স্বাধীন এবং বাধামুক্ত নাগরিক হইবে। এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব অথবা এক ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের অথবা

এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের কোন বিদ্বেষভাব থাকিবে না। বরং সকলেই বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে ও যোগত্যানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু উপভোগ করিতে পারিবে। তিনি প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলেন যে স্বাধীনতা ভিক্ষা দ্বারা পাওয়া যায় না; ইহা অর্জ্জন করিতে হয় ও গুরুতর মূল্য দিতে হয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে তাঁহার গঠনমূলক কর্ম্মপন্থার মধ্য দিয়া স্বাধীনতা আসিবে এবং পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে তাঁহার আস্থা নাই। কিন্তু হিন্দু মহাসভা পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হিংসাবাদের উপরেই হিন্দু মহাসভার রাজনীতিক মতবাদের মূল ভিত্তি।

সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, আসামে লাইন প্রথা, পাকিস্থান, হিন্দুকোড, সত্যার্থ প্রকাশের অনুচ্ছেদ প্রভৃতির প্রতিবাদ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী গ্রহণ প্রভৃতি নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাবাসাহেব খাপার্দ্দে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. সি. ধীমান, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "আমাদের রাজনীতি বুর্জ্জোয়া রাজনীতি নহে। আমরা চাই প্রকৃত স্বরাজ—দরিদ্র, অত্যাচারিত ও পদদলিত জনগণের স্বরাজ।" ডক্টর মুখোপাধ্যায় শেষ দিনের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "হিন্দুজাতি নীচ নহে। হিন্দুধর্ম্ম জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। হিন্দুস্থান হইতে সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হয়।"

এই সকল সম্মেলন ভবিষ্যতের শুভ সূচনা বলিয়া অনুমিত হয়। তাই ইহার গুরুত্বের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

পশ্চিম রণাঙ্গন

পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিম দিকে রাইন নদী ছিল জার্ম্মানীর প্রাকৃতিক প্রহরী। ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা এই রাইন অতিক্রম করিয়াছে। জার্ম্মানীর প্রাণকেন্দ্র রুঢ় এখন প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন। মার্শাল মণ্টগোমারীর সেনা রুঢ়ের উত্তরে রাইন অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব দিকে ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার সমতল ভূমিতে অগ্রসর হইতেছে। জেনারল হজের ১ম মার্কিণ আর্ম্মী রুঢ়ের দক্ষিণে রাইন অতিক্রম করিয়া প্যাডারবার্ণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মণ্টগোমারীর সেনা এবং এই মার্কিণ বাহিনীর মধ্যে এখন ব্যবধান মাত্র ৫০ মাইল। ইহার অর্থ—মিত্রপক্ষ জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান শ্রমশিল্পকেন্দ্র রুঢ়কে পরিবেষ্টিত করিতেছেন।

এক সময়ে রুঢ়ল্যাণ্ডে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের সমাবেশ ছিল; ৬৫০ বর্গমাইল স্থানে ৩৫ লক্ষ শ্রমিক অস্ত্রের কারখানায় ও সহকারী শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করিত। কয়লা হইতে তৈল উৎপাদনের ও জল হইতে শক্তি সঞ্চার করিবার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল রুঢ়ল্যাণ্ড; এখানকার গেসেন্-কার্টেন্ হইতেছে কৃত্রিম পেট্রল উৎপন্ন হইবার প্রধান কেন্দ্র। অবশ্য রুঢ়ল্যাণ্ডের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান জার্ম্মানরা সরাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ক্রুপ্‌সের (এসেনে) বিশাল ঢালাইয়ের কারখানা, খনি, রেলপথ ও খাল সরাইয়া ফেলা সম্ভব নয়। তবে মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণে এই অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

আরও দক্ষিণে জেনারল প্যাটনের নেতৃত্বাধীন ৩য় মার্কিণ আর্ম্মী রাইন অতিক্রম করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে মেন নদীর তীরবর্ত্তী ফ্রাঙ্কফুর্ট অধিকার করিয়াছিল; এখন তাহারা আরও পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা জেনারল হজের সেনাবাহিনীর সহিত যোগ রাখিয়াই আগাইতেছে। সর্ব্বশেষ সংবাদ—১ম ফরাসী আর্ম্মীও ১০ মাইল জায়গায় রাইন নদী অতিক্রম করিয়াছে।

রাইন নদীর পশ্চিম তীরে প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালাইয়া শত্রুকে আটকানোই ছিল জার্ম্মানীর রণনীতি। এই নীতি ব্যর্থ হইবার পর ফন্ রেশষ্টেড্ তাঁহার প্রায় সব সৈন্য লইয়া হটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর রাইনের পূর্ব্বতীরে প্রতিরোধ-ব্যূহ রচনা করা আর সম্ভব হয় নাই। শেষ মুহূর্ত্তে কেসারলিংকে ইতালীর রণাঙ্গন হইতে সরাইয়া আনিয়া তাঁহাকে এই অসাধ্য সাধনের ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই অসম্ভব দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চলে জার্ম্মান সেনার প্রতিরোধ এখন খুবই দুর্ব্বল। এল্‌ব্ নদীর পশ্চিমে জার্ম্মান সেনা আর প্রবল প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না; এল্‌বের তীরেই হয়ত বার্লিন রক্ষার জন্য জার্ম্মান সেনাবাহিনী শেষবার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে সচেষ্ট হইবে।

পূর্ব্ব রণাঙ্গন

সোজা বার্লিন অভিমুখী অভিযান এখনও লালফৌজ আরম্ভ করে নাই; কুয়েষ্ট্রিনের কাছে মার্শাল জুকভের সৈন্যের ওডর অতিক্রম করিবার কথা এখনও সমর্থিত হয় নাই। এই সময়ে বাল্টিকের তীরে লালফৌজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ওডরের মোহনা হইতে পূর্ব্ব দিকে কোল্‌বার্গ, ষ্টল্‌প্, ডিনিয়া ও ড্যান্‌জিগ্ এখন লালফৌজের অধিকারভুক্ত। পূর্ব্ব প্রুসিয়ার রাজধানী কনিস্‌বার্গে জার্ম্মানদের প্রতিরোধ চূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই।

এখন লালফৌজের প্রচণ্ড অভিযান চলিতেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। মার্শাল্ তল্‌বুখিন্ ও মার্শাল ম্যালিনোভস্কির সেনা এখন দানিয়ুবের উত্তর হইতে বালাতান্ হ্রদের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল রণক্ষেত্র প্রচণ্ড বেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। লালফৌজ অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভিয়ানা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়ার উত্তরে মার্শাল কনিয়েভ ও পিট্রভের আক্রমণ চলিতেছে। বল্‌কান্ ও ইতালীর সহিত জার্ম্মানীর প্রধান সংযোগসূত্রগুলিই হইতেছে লালফৌজের আশু লক্ষ্য। তাহাদের দূরবর্ত্তী লক্ষ্য হইতেছে, শ্রমশিল্পপ্রধান উত্তর-পূর্ব্ব চেকোস্লোভাকিয়া।

নাৎসী নেতারা দক্ষিণ জার্ম্মানীতে শেষ প্রতিরোধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উক্ত অঞ্চল বাঁচানো যে আর সম্ভব নয়, ইহা

তাঁহারা বুঝিয়াছেন। জার্মানীর বহু কারখানা পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের নিকটেই চেকোস্লোভাকিয়ার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ। এই দুইটি প্রদেশেই কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে সমৃদ্ধ। বোহেমিয়া প্রদেশই বিখ্যাত স্কোডা কারখানা অবস্থিত। বস্তুতঃ সাইলেসিয়া ও রুঢ় হস্তচ্যুত হইবার পরও বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ হাতে থাকিলে জার্ম্মানী শক্তিহীন হইবে না। এই জন্যই চেকোস্লোভাকিয়া লক্ষ্য করিয়া লালফৌজের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মানীর সমগ্র সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই লালফৌজের রণনীতি রচিত। সেই রণনীতি অনুসারে লালফৌজ দক্ষিণ জার্ম্মানী ও চেকোস্লোভাকিয়া বিধ্বস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই অঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইলে জার্ম্মানী সত্যই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। বার্লিনের উপকণ্ঠে পৌঁছানো—এমন কি বার্লিনে বিজয় কেতন উড়ানো অপেক্ষাও জার্ম্মানীকে এই ভাবে শক্তিহীন করিবার সামরিক মূল্য অনেক বেশী। যুদ্ধ অবসানের দিন ইহাতেই বেশী নিকটবর্ত্তী হইবে।

সোভিয়েট-তুর্কি সম্বন্ধ

সোভিয়েট রুশিয়া তুরস্কের সহিত তাহার ১৯২৫ সালের চুক্তি বাতিল করিবার নোটিশ দিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সহিত ঐ চুক্তির সামঞ্জস্য নাই। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের মুখপত্র ইজভেস্তিয়া মন্তব্য করিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত তুরস্কের সম্বন্ধটা ঠিক আশানুরূপ ছিল না।

১৯২৫ সালের চুক্তির মর্ম্ম এই যে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের কেহ অন্যের বিরুদ্ধে সামরিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। এই চুক্তি বাতিল করিবার প্রকৃত কারণ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কৈফিয়তে খুব স্পষ্ট হয় নাই। তবে, 'ইজভেস্তিয়া' ঠিকই বলিয়াছেন—যুদ্ধের সময় তুর্কি-সোভিয়েট সম্বন্ধটা ঠিক আশানুরূপ ছিল না।

কামাল আতাতুর্ক যখন নবীন তুরস্ককে গঠন করেন, তখন সোভিয়েট রুশিয়াই ছিল যে তুরস্কের একমাত্র মিত্র ও সহায়ক। তাই, কামালের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সৌহার্দ্য। তিনি জানিতেন—সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থন ও সাহায্য না পাইলে সাম্রাজ্যবাদীদের কুচক্র ব্যর্থ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্কের এই একমাত্র মিত্রকে কামাল কখনও ভোলেন নাই।

১৯৩৮ সালে কামালের মৃত্যুর পরই তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ রুশিয়ার সহিত পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করিয়া তুরস্ক যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিতে চায় নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধে শক্তিমানের পক্ষে থাকিয়া তুরস্ক নিজের সুবিধা করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। এই সুবিধাবাদী নীতির জন্যই সে ১৯৩৯ সালে অক্টোবর মাসে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু জার্ম্মানী কর্ত্তৃক উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপ বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া সে ঐ চুক্তি পালন করিতে সাহসী হয় নাই। পরে, সে জার্ম্মানীকে লৌহ পরিষ্কারের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রোম্ সরবরাহ করিয়া তাহাকে খুসী করিয়াছে। সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের প্রথম দিকে তুরস্কে সোভিয়েট-বিরোধী আন্দোলন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তুর্কি অধ্যুষিত সোভিয়েট অঞ্চল তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৃহত্তর তুরস্ক গড়িবার জন্য প্রকাশ্যে সভা ও শোভাযাত্রা হইয়াছিল। এই সময় জার্ম্মান বিমান তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার করিয়াছে এবং তুরস্কের এলেকাভুক্ত সমুদ্রে জার্ম্মানীর সাবমেরিণ আশ্রয় পাইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ইনোনুর নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কয়েকখানি জার্ম্মান জাহাজকে দার্দানেলিজ অতিক্রম করিতে দেওয়ায় পররাষ্ট্র-সচিব মেনেমেনজ্ঞলু পদচ্যুত হয়।

লালফৌজের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ১৯৪৪ সালে জার্ম্মানীর দৌর্ব্বল্য যখন বিশেষভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তুরস্ক জার্ম্মানীকে ক্রোম্ সরবরাহ বন্ধ করে। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে সে জার্ম্মানীর সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। য়াল্টা সম্মেলনের পর শান্তি বৈঠকে বসিবার আশায় জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণাও করিয়াছে।

তুরস্ক সোভিয়েট-রুশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। অধুনা আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের সাহায্যে তুরস্ক হইতে সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি করা যায়। ইহা ছাড়া তুরস্ক হইতেছে দার্দানেলিজ প্রণালীর রক্ষক। এই তুরস্ক সম্বন্ধে সোভিয়েট-রুশিয়া উদাসীন থাকিতে পারে না। ইহার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে তাহার নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন। ইহার দ্বারা যে সোভিয়েটের নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবার পূর্ব্বে ১৯২৫ সালে কামালের তুরস্ককে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বোঝা সে বহিয়া চলিতে পারে না।

ফ্রাঙ্কোর নূতন চাল

সম্প্রতি জেনারল ফ্রাঙ্কো এক নূতন চাল চালিয়াছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা অত্যাচার করিয়াছে—এই অজুহাতে তিনি জাপানের সহিত বিরোধের ভাণ করিতেছেন। তাঁহার গভর্ণমেণ্ট জাপানকে জানাইয়াছে যে, জাপানের সহিত যুদ্ধরত দেশগুলিতে জাপানের স্বার্থ-রক্ষার দায়িত্ব স্পেন আর বহন করিতে পারিবে না। জনরব—স্পেন হয়ত শীঘ্রই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করিবে।

এক সময় স্পেনীয়রা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও বর্ত্তমান ফিলিপিনোদের সহিত তাহাদের জাতিগত বা সংস্কৃতিগত কোন যোগ নাই। কাজেই, হঠাৎ ফিলিপিনোদের জন্য জেনারল ফ্রাঙ্কোর দরদ উথলিয়া ওঠা স্বাভাবিক নয়। এই ফ্রাঙ্কোর পক্ষ হইতেই কিছু দিন আগে ফিলিপাইনে জাপানের তাঁবেদার শাসককে অভিনন্দন জানানো হইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই—জেনারল ফ্রাঙ্কো এখন আমেরিকার নিকট "ভাল মানুষ" সাজিতে চাহিতেছেন। আটলাণ্টিকের অপর পার হইতে তাঁহার প্রতি সহানুভূতির বিন্দুমাত্র আভাস পাইলে তিনি স্বদেশেও প্রচার করিতে পারেন যে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ নন। বস্তুতঃ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান নিঃসঙ্গতার ফলে নিজ দেশেও ফ্রাঙ্কোর আসন টলিয়া উঠিয়াছে।

এই সময় স্পেনের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। স্পেনের সিংহাসনের দাবীদার প্রিন্স জুয়ান এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে স্পেনে রাজতন্ত্রের অবসান হয় নাই—উহা স্থগিত আছে মাত্র; তাহার পর, গৃহবিবাদে স্পেনের রাজবংশের সকলেই নাকি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। সম্প্রতি স্পেনের নির্ব্বাসিত রিপাব্লিক্যানরা এক বিবৃতি প্রচার করিয়া প্রিন্স জুয়ানের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

১৯৩১ সালের নির্ব্বাচনে যখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, স্পেনের জনমত রাজতন্ত্রের বিরোধী তখনই রাজা আল্‌ফোন্সো রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। জনমতের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশে স্পেনে রাজতন্ত্রের অবসানই হইয়াছে—আল্‌ফোন্সো বংশের সৌজন্যে উহা "কোল্ড ষ্টোরেজে" জিয়ানো নাই। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় রাজতন্ত্রানুরাগীরা যে ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করিয়াছিলেন, সে কথা চাপা দিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তাঁহাদের তখন আশা ছিল যে, ফ্রাঙ্কো হয়ত স্পেনে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই চাহিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লণ্ডনের 'টাইমস্', 'অবজার্ভার' প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা প্রিন্স জুয়ানের এই বিবৃতিকে "সময়োপযোগী" বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কা হয়—স্পেনের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কোর আসন টলিয়া ওঠায় হতভাগ্য স্পেনীয়দের স্কন্ধে হয়ত রাজতন্ত্র চাপাইবার একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্র স্পেনে বামপন্থী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হওয়া স্বাভাবিক নয়। অথচ, হিট্‌লার ও মুসোলিনির হাতধরা ফ্রাঙ্কো লোকটা যুদ্ধের সময় যে সব কাজ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে স্পেনের গদিতে বসাইয়া রাখা লোকে আর সহ্য করিতেছে না। এই জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হয়ত স্পেনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সুদূর প্রাচী

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের সব চেয়ে বড় কথা—খাস জাপান লক্ষ্য করিয়া মার্কিণ সেনাবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিণ সেনা খাস জাপান হইতে ৭৫০ মাইল দূরবর্ত্তী আইওজিমায় অবতরণ করিয়াছিল। সম্প্রতি মার্কিণ সেনা ফরমোজা হইতে খাস জাপান পর্য্যন্ত প্রসারিত রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের অবতরণ ক্ষেত্র হইতেছে এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী বৃহত্তম দ্বীপ ওকিনাওয়া। এখান হইতে খাস জাপানের দূরত্ব মাত্র ৩৫০ মাইল।

জাপানের সমর প্রচেষ্টার প্রধান দৌর্ব্বল্য এই যে, তাহার সমরশিল্প প্রধানতঃ খাস জাপানে অবস্থিত। মাঞ্চুরিয়াতেও তাহার কিছু সমরোপকরণের কারখানা আছে। সমগ্র জাপানী সাম্রাজ্যে সমর-প্রচেষ্টার জন্য খাস জাপানের ও মাঞ্চুরিয়ার সমরোপকরণের উপর জাপানকে নির্ভর করিতে হয়। বলা বাহুল্য—রিউকিউ হইতে মার্কিণ সেনাবাহিনী প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইবে—একদিকে খাস জাপানে এবং অন্যদিকে ফরমোজায়। ইহার পরই তাহারা প্রথমে ফরমোজায় অবতরণ করিবে এবং পরে খাস জাপানে অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। ফরমোজা হইতে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে মাঞ্চুরিয়ার সহিত ইন্দো-চীন, শ্যাম, মালয় প্রভৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। এদিকে খাস জাপানের ঘাঁটী হস্তগত হইলে মাঞ্চুরিয়ার সমরশিল্পকেন্দ্র অতি সত্বর বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে।

মার্কিণ রণনীতির লক্ষ্য এখন চীন ও খাস জাপান। একই সময় দক্ষিণ চীনে ও খাস জাপানে মার্কিণ সেনা অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। জাপান হয়ত মনে করে—খাস জাপানের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে চীনে সে প্রতিরোধ চালাইতে পারিবে; মাঞ্চুরিয়ার সমরশিল্প চীনের জাপানী সেনাবাহিনীকে সমরোপকরণ যোগাইবে। কিন্তু খাস জাপানের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার পর চীনে জাপানের প্রতিরোধ তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। খাস জাপানের ঘাঁটী হইতে মাঞ্চুরিয়ার সমরশিল্প পঙ্গু করা সহজ।

ব্রহ্মদেশে ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। মান্দালয় তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই সময় আর একটি সেনাবাহিনী পূর্ব্ব দিক হইতে ঘুরিয়া যাইয়া মিক্‌টিলা অধিকার করে। এই মিক্‌টিলায় ৮টি ভাল বিমান ঘাঁটী মিত্রপক্ষের হাতে আসিয়াছে। ওদিকে চীনা সৈন্য কর্ত্তৃক লাশিও পূর্ব্বেই অধিকৃত হইয়াছিল। এখন মান্দালয় ও লাশিওর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মিত্রপক্ষ একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঙ্গ-ভারতীয় সেনা মান্দালয় অধিকারের পর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া কীয়াউক্‌সে অধিকার করিয়াছে। মিক্‌টিলার সহযোদ্ধৃগণের সহিত তাহাদের মিলিত হইতে আর দেরী নাই।

মিত্রপক্ষ এখন উত্তর ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। এখন তাঁহাদের অভিযান চলিবে দক্ষিণ ব্রহ্মে। তবে, দক্ষিণ ব্রহ্মে কেবল স্থলপথেই অভিযান চলিবে না—সমুদ্রপথেও মিত্রপক্ষের সেনা দক্ষিণ ব্রহ্মে অবতরণ করিতে সচেষ্ট হইবে। এই অঞ্চলের সমুদ্রে যে শক্তিশালী বৃটিশ নৌবহর আসিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ব্রহ্মে অভিযানের জন্য উহা ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা। (১।৪।৪৫)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ

ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন অর্থনীতি

একে ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, তাহার উপর পরাধীনতার অভিশাপে তাহাকে বাধ্য হইয়া শ্বেতহস্তী পোষণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে হয় বলিয়া এদেশের সরকারী তহবিলে প্রায়ই ঘাটতী হইয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে যে ভারত সরকারের দায়িত্ব আছে, এদেশের অর্থসদস্যের বাজেটে তাহার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয়ই কোনদিন পাওয়া যায় না। সাধারণ সময়ে তবুও জোড়াতালি দিয়া সরকারী অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষিত হইত, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রবল ঘূর্ণীপাকে সেই স্বার্থপর শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থাটুকুও ভাসিয়া গিয়াছে। এখন যুদ্ধের বিপুল ব্যয় মিটাইতে বাজেটে বৎসরের পর বৎসর যে পর্ব্বতপ্রমাণ ঘাটতী দেখা যাইতেছে তাহার বিপরীতদিকে বেসরকারী অপব্যয়ের চূড়ান্ত নিদর্শনসমূহ অতিসাধারণ এবং অনবধানী ব্যক্তির দৃষ্টিতেও ধরা না পড়িয়া পারে না। বেসামরিক খাতে সরকারী ব্যয়ের যত বাহুল্যই হউক, সেই ব্যয় যদি সদুদ্দেশ্যে হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে ভদ্রতায় বাধে। কিন্তু যখনই এই ব্যয়বাহুল্য অপব্যয়খাতে যাইয়া পড়ে, তখনই অধিকার থাকিলে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষেই তাহার প্রতিবাদ করা স্বাভাবিক। কয়েকদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় দলের পক্ষ হইতে মিষ্টার জিওফ্রে টাইসন কেন্দ্রী-ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত সরকারের বেসামরিক বিভাগসমূহের ব্যয়নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কিত যে ছাঁটাই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, সরকারী বিধিব্যবস্থার নিন্দাসূচক হইলেও সেই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থ-সদস্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তিপ্রদর্শন করিতে যাইয়া কার্য্যতঃ যুদ্ধোত্তর স্বাচ্ছল্য-সম্ভাবনার কথাই বলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরে অনিশ্চিত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার এই আশাবাদী মনোভাব অধিকাংশ সদস্যই সমর্থন করিতে পারেন নাই। তদ্ভিন্ন বেসামরিক বিভাগে সরকারী অর্থ অপব্যয়িত হইবার অভিযোগ আসিয়াছে বলিয়াই যে বাজেটে সামরিক বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় সর্ব্বদা যুক্তিযুক্ত পথ গ্রহণ করা হইতেছে এমন কথাও ধরিয়া লওয়া যায় না। আমাদিগের মনে হয়, যুদ্ধের মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনের নামে অর্থ-সদস্য যে ভাবে এই কয় বৎসর ভারত সরকারের রাজকোষ ব্যবহার

করিয়াছেন, তাহা অতি অল্পক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য। গত বৎসর মার্চ মাসে ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হইবার অজুহাতে অর্থসদস্য ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের চূড়ান্ত বাজেটে দু'মাসের হিসাবে উক্ত বৎসরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা ৯৬ কোটি টাকা অধিক ব্যয় দেখাইয়াছেন, অথচ বর্ত্তমানে ভারত সীমান্ত হইতে যুদ্ধ বহুদূরে সরিয়া যাইলেও ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের বাজেটে সামরিক ব্যয় ৪শত কোটি টাকা ধরিতে তাঁহার সঙ্কোচ হয় নাই। ভারত-সীমান্ত বিপন্ন হইবার সময় ভারতের যে দায়িত্বই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে জাপানীদিগের কবল হইতে ব্রহ্ম, মালয়, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি উদ্ধার করিবার জন্য ভারতকে ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করা অত্যন্ত অযৌক্তিক বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের উপর যে কোন আর্থিক ভার চাপাইবার পূর্ব্বে এদেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথাও বিবেচনা করা উচিত এবং সেদিক হইতে বেসামরিক বিভাগের অপব্যয় যেমন ভোটের জোরে বন্ধ করা হইতেছে, সামরিক বিভাগের অপব্যয় সেইরূপ অর্থসদস্য নিজের বিবেচনায় বন্ধ করিবেন, ইহাই আমরা তাঁহার নিকট আশা করিয়া থাকি। বাজেটের ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতী বহুলাংশে ঋণসংগ্রহ করিয়া পূরণ করা হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় ফাঁপা বাজারে যে ঋণ সংগৃহীত হইল, তাহা যুদ্ধের পরে নরম বাজারে যে পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাও অর্থ-সদস্যের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক বাজেট উপস্থিত করিবার সময় অর্থসদস্য সার জেরেমী রেইসম্যান বাজেটের ঘাটতি পূরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ভারত সরকার ঋণ-সংগ্রহই ব্যয়নির্ব্বাহের প্রধান পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং জনসাধারণের সকল শ্রেণীই যাহাতে সরকারের এই ঋণসংগ্রহনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তজ্জন্য সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, অভাবের সময় নিরুপায় হইয়া ভারতসরকার যে ঋণসংগ্রহে বাধ্য হইতেছেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া লাভ নাই; কিন্তু বাজেট অধিবেশনে সরকারী অর্থনীতি সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সত্যই এমন কোন ধারণা জন্মায় না যে, ভারত সরকারের সমস্ত সংগৃহীত ঋণ ন্যায্য ভাবে ব্যয়িত হইতেছে বা জাতীয় স্বার্থে ন্যস্ত করা হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভারতে এই ঋণ সংগ্রহ করিতে ভারত সরকারকে যে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে, ঋণ সংগ্রহ করিবার প্রশ্ন না থাকিলে অথবা অল্পতর পরিমাণ ঋণ সংগৃহীত হইলে সেই সুদ হিসাবে কত টাকা বাঁচিয়া যাইত তাহাও ভারতসরকারের বিবেচনার বিষয়, সন্দেহ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে ভারত সরকারের সাধারণ ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে, ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে সংগৃহীত সরকারী ঋণের পরিমাণ ১২ শত ৫ কোটি টাকা ছিল, ১৯৪৫-৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২ হাজার ২ শত কোটি টাকার ঊর্দ্ধে পৌঁছাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই বৰ্দ্ধিত ঋণের উপর ভারত সরকারকে অন্ততঃ শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে এবং সেদিক হইতে তাঁহাদিগের দায়িত্বও নিতান্ত অল্প নহে। ভারতের বিলাতী দেনার যে অংশ এই যুদ্ধের সময় শোধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের অন্তর্দ্দেশীয় ঋণভার সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও সে সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু লণ্ডনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অফিসে বর্ত্তমানে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পাহাড় জমিতেছে তাহার জন্য ভারতের অন্তর্দ্দেশীয় ঋণবৃদ্ধির যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের পরিমাণ এখনই ১৪ শত কোটি টাকার উর্দ্ধে পৌঁছিয়াছে। যত দিন যাইবে এই পাওনার পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং তজ্জন্য ভারতেও জাতীয় ঋণের পরিমাণ স্ফীত হইয়া উঠিবে। এই ষ্টার্লিং পাওনা কবে আদায় হইবে সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই; বৃটেনের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা যেরূপ হতাশাজনক, তাহাতে তাহার পক্ষে যুদ্ধের মধ্যে বা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন এপর্য্যন্ত বহু বৃটিশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিলম্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই পাওনা ফিরিয়া পাইবার সঙ্গে ভারত সরকারের ভারতে সংগৃহীত ঋণপরিশোধের কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিলেও এদিক হইতে ভারত সরকার যে বৃটিশ সরকারকে বিশেষ তাগিদ দিতেছেন, এমন কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। বিলাতে ষ্টার্লিং পাওনা যতই জমিয়া যাউক, তাহার সুদ হিসাবে ভারত সরকার এমন কিছুই পাইবেন না যে তাহাতে ভারতে সংগৃহীত ঋণের সুদ প্রদান করা চলে। অবস্থা এখনই যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির পরিপূরক হিসাবে ভারতের ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টার ফলে ভারত সরকারকে কেবলমাত্র সুদের হিসাবে বৎসরের অন্ততঃ দেড় কোটি পাউণ্ড বা ২০ কোটি টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। তদ্ব্যতীত ষ্টার্লিং পাওনার উপর নির্ভর করিয়া যে বিধানে ভারতীয় মুদ্রানীতি পরিচালিত হইতেছে, তাহাও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ যাহাই হউক না কেন, স্বর্ণের জামিনে নোট ছাপাইবার নীতি কাগজের জামিনে নোট ছাপাইবার নীতি অপেক্ষা অবশ্যই অনেক স্বাস্থ্যকর ও সমর্থনীয়। যুদ্ধের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এ সম্বন্ধে জন-সাধারণ সচেতন হইতেছে না সত্য, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে কাগজী মুদ্রার সম্ভ্রমহীনতার জন্য ভারতের সাধারণ অর্থব্যবস্থার যদি ভারসাম্য রক্ষিত না হয় এবং ভারতের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারে ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে ভারত সরকার সেই সকল সমস্যা কি ভাবে সমাধান করিবেন? ভারত সরকারের অর্থ-বিভাগ বর্ত্তমান সঙ্কট লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদিগের সতকবাণী তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইবে কি?

বাঙ্গালার বস্ত্রসঙ্কট

প্রাচ্যযুদ্ধের পট-ভূমিকারূপে কার্য্যতঃ বাঙ্গালাদেশ ব্যবহৃত হইতেছে এবং রণাঙ্গনের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিভাগ হিসাবে তাহার দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। যুদ্ধজনিত নানাবিধ অসুবিধা যখন নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমেই বাঙ্গালার অধিবাসিগণ সহ্য করিতেছে, তখন ইহা আশা করা অন্যায় নহে যে, এদেশের শাসকসম্প্রদায় দেশবাসীর সুখসুবিধা বিধানের জন্য তাঁহাদিগের সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগকে যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহারা মনে রাখেন না যে দেশবাসীকে পালন করাও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এবং এই দায়িত্ববোধের লজ্জাকর অভাববশতঃই যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার সুযোগে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার ফলেই বাঙ্গালায় ৩০।৩৫ লক্ষ লোকক্ষয়কারী তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছিল এবং সেই দুর্ভিক্ষের পেষণে কেবল যে দলে দলে নিরন্ন প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বহু-শত বৎসরের পুরাতন সামাজিক জীবনেও তুমুল আলোড়ন উঠিয়াছে। এই অন্ন-দুর্ভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই মাত্র এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে পুনরায়—বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে এবং অবস্থা বর্ত্তমানে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, প্রচলিত সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতি জনসাধারণের বিবেচনায় প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাপড়ের অভাব গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত তীব্র; মানুষ সেখানে কবর খুঁড়িয়া পর্য্যন্ত কাপড় সংগ্রহ করিতেছে এবং ভদ্রমহিলার লজ্জা-নিবারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা—সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আপনাকে নিরাপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না এবং মানুষের চরম দুঃখ দুর্দ্দশার দিনে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের পরস্পরের প্রতি দোষারোপের এইরূপ হাস্যকর প্রয়াস আমাদিগকে সত্যই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। গত ৮ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে

বাণিজ্যসদস্য সার আজিজুল হক বাঙ্গালার বস্ত্রাভাব সম্পর্কে বাঙ্গালা সরকারকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, বরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রদেশগুলিতে বস্ত্র পাঠাইয়াই ভারতসরকারের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে এবং বাঙ্গালায় বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থা সম্পাদনের বা বাঙ্গালা হইতে বস্ত্র-রপ্তানী বন্ধ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাঙ্গালা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা-সরকারের দিক হইতেও এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য সর্ব্ববিধ প্রয়াস দেখা গিয়াছে এবং বাঙ্গালার জন্য বরাদ্দ বস্ত্রের স্বল্পতায় গুরুত্ব আরোপ করিয়াই বাঙ্গালার সচিবরা এই শোচনীয় অবস্থার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি মীমাংসা কমিটির বৈঠক সম্পর্কে কলিকাতায় আসিয়া সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও সার জগদীশপ্রসাদের ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পর্য্যন্ত দেশের এই ভীষণ বিপদের দিনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিবার আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা এই নিদারুণ সঙ্কট হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বড়লাটকে বাঙ্গালায় বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহারা যথার্থই বলিয়াছেন, দোষ যাঁহারই হউক, সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের কর্ত্তব্যকর্ম্মে শৈথিল্যের জন্যই যে দেশের এই দুরবস্থা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারী বস্ত্রের অভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছে না কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যাঁহারা দোষী প্রমাণিত হউন না তাহাতে তাহাদিগের দুঃখ ঘুচিবে কি? এইভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া সমস্যা সমাধানে ঔদাসীন্য প্রদর্শন এক্ষেত্রে কেবল অন্যায় নহে অপরাধ এবং বড়লাট যদি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়া বস্ত্র বণ্টন নীতিতে শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেই এ অবস্থায় দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘ বণ্টননীতি পরিচালনায় কিরূপ অক্ষম ও অযোগ্য তাহা গত দুর্ভিক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে, এই দুঃসময়ে পুনরায় তাঁহাদিগের উপর বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার একরূপ ইচ্ছা করিয়াই এই বস্ত্রসঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা প্রয়োজনের তুলনায় বাঙ্গালার জন্য মাথাপিছু ১০ গজ হিসাবে যে বস্ত্র বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অল্প এবং এই ১০ গজের মধ্যে বাঙ্গালার তাঁতে যে তিনগজ বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব ধরিয়াছেন, বাঙ্গালার তাঁতে তাহা স্বাভাবিক সময়েই উৎপন্ন হয় কিনা সন্দেহ এবং বর্ত্তমানে সূতার অভাবে তাঁতের উৎপাদন একেবারে কমিয়া যাওয়ায় সেই ৩ গজ হিসাবে বস্ত্র উৎপাদন সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ব্যতীত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী বাঙ্গালায় যে ৬ কোটি ১০ লক্ষ লোক ধরা হইয়াছে তাঁহা এই প্রদেশের প্রকৃত লোকসংখ্যা অপেক্ষা প্রায় ৭০ লক্ষ কম। এইভাবে কেন্দ্রী-সরকার মাথাপিছু বস্ত্র বরাদ্দের ব্যাপারেই বাঙ্গালার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন এবং এই অবিচারের পরেও তাঁহারা পুনরায় বাঙ্গালার কুখ্যাত সচিবসঙ্ঘের হস্তে সেই বরাদ্দ সামান্য পরিমাণ বস্ত্র বণ্টন করিবার ভার দিয়াছিলেন বলিয়াই দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত মূল্যে বস্ত্র সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘের স্বজনপ্রীতি সর্ব্বজনবিদিত, যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার বিবেচনা অপেক্ষা তাঁহাদিগের নিকট গদি বজায় রাখিবার মোহ অনেক বড়, সুতরাং এই অবস্থায় তাঁহাদিগের প্রীতিভাজনগণের পক্ষে বস্ত্র বণ্টনের ভারপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চোরাবাজারের যে জুলুম আজ বাঙ্গালায় মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বণ্টনভার লাভের সময় কর্ত্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কি না বিবেচ্য? যতদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এই স্বার্থজনিত সম্পর্ক বজায় থাকিবে, ততদিন ব্যবসায়িগণের মুনাফাবৃত্তি বন্ধ হইতে পারে না। চাহিদার তুলনায় জোগান কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিলে স্বচ্ছলতর জনসাধারণের মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য বাজার হইতে বহুপরিমাণ পণ্য অদৃশ্য হইয়া যায়। গত দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার পরেও বাঙ্গালায় কর্ত্তৃপক্ষ যে এই বিষয়ে অবহিত হন নাই ইহাও কি তাঁহাদিগের অযোগ্যতার প্রমাণ নহে? বাঙ্গালায় বস্ত্রবরাদ্দ যখনই কম হইয়াছে, তখন হইতেই আসন্ন দুর্দ্দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া সেই বরাদ্দ বস্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা করা কি তাঁহাদিগের উচিত ছিল না? খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে বরাদ্দনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা সাফল্য দাবী করিয়া থাকেন, অথচ খাদ্যাদি সংগ্রহের সূত্রসমূহ এত জটিল যে খাদ্য বণ্টনে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন অপেক্ষা বস্ত্র বণ্টনের ব্যাপারে বরাদ্দ নীতি-প্রবর্ত্তন তাঁহাদিগের পক্ষে অনেক সহজসাধ্য ছিল। বাঙ্গালা দেশে মাত্র ৩৪টি কাপড়ের কলে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাঁতের কাপড় সূতা সরবরাহ ব্যবস্থা অনুযায়ী সংগ্রহ করাও কিছুই কঠিন নহে, বাহির হইতে আমদানী বস্ত্রও তাঁহাদিগের নিকটেই জমা হইয়া থাকে, সুতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গালা সরকার সমস্ত কাপড় সংগ্রহ করিয়া বরাদ্দ ব্যবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণকে কাপড় প্রদানের ব্যবস্থা করিলে এই বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। বস্ত্র বিক্রয়ে চোরাবাজারের মুনাফা-সুবিধা আছে বলিয়া সম্প্রতি অনেকেই কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স পাইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহাদিগকে এই লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের সকলেরই যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা বা সাধুতার প্রমাণ আছে এমন কথা কেহই বলিবেন না। বাঙ্গালা দেশে ৮০ হাজার দোকানের মারফৎ বাঙ্গালা সরকার বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যান্য নানা পণ্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রণনীতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই যে বাজার হইতে বিক্রয়জাত বস্ত্র অদৃশ্য হইয়া গেল ইহারই বা প্রকৃত কারণ কি? ব্যাঙের ছাতার মত চতুর্দ্দিকে এই সব লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের অনেকগুলির অস্তিত্বই যে বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইবে তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু যাহারা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাদিগের অনেকেই যে বস্ত্রব্যবসায়ের চোরাবাজারী মুনাফাভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া এই পথে আসিয়াছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সে দিন টেক্সটাইল ডিরেক্টরের অফিসে টেক্সটাইল কণ্ট্রোল এডভাইসারী কমিটির যে সভা হয় তাহাতে সভাপতি মিঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় স্বীকার করেন, তাঁহার বিশ্বাস, পূর্ব্বে এদেশে এত অধিকসংখ্যক বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিল না এবং বর্ত্তমানে বস্ত্র ব্যবসায়ের অত্যধিক মুনাফায় আকৃষ্ট হইয়াই এত অধিক লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘের মুখপাত্র ছিলেন না বলিয়াই হয় তো তাঁহার পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছে যে বাঙ্গালায় বস্ত্র-বণ্টননীতিতে বরাদ্দপ্রথার প্রচলন করিয়া রেশন কার্ডের অনুপাতে বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক এবং ইহাতে অবাঞ্ছিত মুনাফাভোগীদের কোন স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই।

মোট কথা, আমরা সার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঙ্গালায় বস্ত্র বণ্টনের দায়িত্ব-গ্রহণের দাবী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি বাঙ্গালার জন্য বস্ত্র বরাদ্দ করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে সেই বস্ত্র মুনাফাভোগীদিগের তহবিল বৃদ্ধি করিতেছে, কি প্রকৃত অভাবগ্রস্তদিগের চাহিদা মিটাইতেছে, তাহা দেখাও তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। বড়লাট হস্তক্ষেপ করুন বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে বাঙ্গালা সরকার বণ্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতিসমূহ দূরীকরণে সচেষ্ট হউন, তাহাতে আমাদিগের কিছু আসে যায় না; বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে দেশবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজনানুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ আমরা দাবী করি এবং যে কোন উপায়ে আমাদিগের সেই দাবী পূরণ করা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। ১।৪।৪৫

শোক সংবাদ

পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা অধ্যাপক পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী গত ৪ঠা চৈত্র ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা অপূর্ব মিত্র রোডস্থ বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন—বহুদিন কুচবিহার রাজ-কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান যুগে ক্রমে বিরল হইতেছে।

কবি গিরিজাকুমার বসু—

খ্যাতনামা কবি গিরিজাকুমার বসু মহাশয় গত ২৮শে মার্চ্চ ৬৩ বৎসর বয়সে হাওড়া বাজেশিবপুরে নিউমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সরকারের দৌহিত্র ছিলেন। প্রথম জীবন হইতে কবিতা লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তাহার পত্নী শ্রীমতী তমাললতা বসুও সুকবি। ভারতবর্ষে গিরিজাকুমারের বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—

বঙ্গবাসী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে গত ৩০শে মার্চ্চ বসন্ত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে চট্টগ্রাম কলেজ, বেথুন কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতা এবং সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল।

লালা দুনীচাঁদ—

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও ব্যারিষ্টার লালা দুনীচাঁদ গত ২৬শে মার্চ্চ লাহোরে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৯ সালে সামরিক আইন প্রয়োগের সময় তিনি প্রথমে নির্ব্বাসিত ও পরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন ও ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। তিনি বেশ সবল ও সুস্থ অবস্থায় প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন।

সার এ-এফ রহমন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার এ-এফ রহমন গত ২৪শে মার্চ্চ জলপাইগুড়ীতে মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পুরাতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং সারাজীবন অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন ও বর্ত্তমানে জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের প্রাদেশিক নেতা হইয়াছিলেন।

রজনীকান্ত মৈত্র—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, শান্তিপুরনিবাসী পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম-এ, বি-এল, কাব্যসাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পিতা রজনীকান্ত মৈত্র গত ২৭শে ফাল্গুন ৮৮ বৎসর ৫ মাস বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অল্প বয়সে মাতৃপিতৃহীন হইয়া রজনীবাবু অতি দরিদ্র অবস্থায় জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি পাটের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন ও তাহার সদ্ব্যয় করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দেবোত্তর করিয়া ট্রাষ্ট ডিড্ রেজিষ্টারী করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া পিতামহীর নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীর নামে গঙ্গাতীরে শিবপ্রতিষ্ঠা, গঙ্গাবাসীর জন্য আশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, টোল, পাঠশালা, নৃত্য-কালীর পূজার দালান, ইঁদারা প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই 'পল্লীবন্ধু' ছিলেন।

লয়াড জর্জ্জ—

গত ২৬শে মার্চ্চ বিখ্যাত বৃটীশ রাজনীতিক আর্ল লয়াড জর্জ্জ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ৫০ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া দেশসেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে মিঃ চার্চ্চিল যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন ১৯১৫ সালের যুদ্ধে মিঃ লয়াড জর্জ্জের তাহাই ছিল। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কেহই চিরদিন নেতা থাকেন নাই—১৯২২ সাল হইতে লয়াড জর্জ্জের নেতৃত্বেরও অবসান হইয়াছিল। তাঁহার মত বক্তা ও কূটনীতিক ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ—

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স লিমিটেডের অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৯ই মার্চ্চ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্রের অসাধারণ সংগঠন শক্তি ছিল। বঙ্গশ্রী কটন মিল প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁহার পরিকল্পনা ও কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল। তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পল্লীতে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

নির্ম্মলকুমার সুর—

২৪ পরগণা নৈহাটী নিবাসী খ্যাতনামা কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ নির্ম্মলকুমার সুর সম্প্রতি মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং স্থানীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতির স্মৃতি রক্ষায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

বাঙ্গালার মন্ত্রী-সমস্যা—
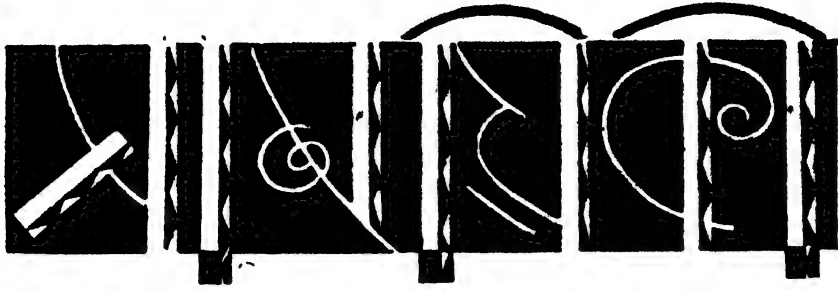
গত ২৮শে মার্চ্চ বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সহসা এক অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। কৃষি মন্ত্রী বাজেটে বরাদ্দ এক ব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে ঐ প্রস্তাব ভোটে দিতে বলা হয় ও ভোটের ফলে সরকার পক্ষ ৯৭-১০৬ ভোটে হারিয়া যায়। মন্ত্রীর প্রস্তাবের পক্ষে ৯৭জন সদস্য ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ১০৬জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। মোট ১৮জন শ্বেতাঙ্গ সদস্য একযোগে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। ঐ দিনই সহসা ২১জন মুসলমান ও তপশীলী সদস্য মন্ত্রীপক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু অসুস্থ শরীর লইয়া সেদিন ষ্ট্রেচারে করিয়া পরিষদ কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মন্ত্রীদল ত্যাগ করিয়া যাঁহারা সেদিন বিরুদ্ধ দলে যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঢাকার নবাব বাহাদুর, আবদুল হামিদ খাঁ, বরাত আলি, সৈয়দ আহমদ খাঁ, মুস্তাক আলি, রাজিবুদ্দীন তরফদার, দেওয়ান মোস্তাফা আলি, এ-এম-এ-জামান, মসুহ আলি খাঁ পানি, আজহর আলি, খাঁ সাহেব হাসেম আলি খাঁ, গোলাম রব্বানি আহমদ, আমীর আলি মিয়া, গিয়াসুদ্দীন আমেদ চৌধুরী, জিলুর রহমন সা চৌধুরী, ধনঞ্জয় রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস ও কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল ছিলেন। পরদিন ৩০শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে স্পীকার নৌসের আলি ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালার আইন পরিষদে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার কোন অস্তিত্ব নাই। যতদিন না নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়, ততদিন পরিষদের কার্য্য চলিতে পারে না। বাজেটের একটি প্রধান দাবীর ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার অর্থই হইতেছে, মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ ও তাহা অনাস্থা প্রস্তাবেরই নামান্তর। কাজেই সেদিন স্পীকার পরিষদের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করিয়া দেন। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি-কেসি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে প্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বর্ত্তমান অবস্থায় শাসন কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাব সত্ত্বেও তিনি যথাযথভাবে কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। ৩১শে জানুয়ারী গভর্ণর কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটের সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর ২রা এপ্রিল সোমবার গভর্ণর সরকারী দপ্তরখানায় যাইয়া (বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট) ২ ঘণ্টাকাল সকল ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও বহু কাগজপত্র নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন। ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার তিনি বিরুদ্ধ দলের নেতা মিঃ এ-কে-ফজলল হকের সহিত ৪৫ মিনিটকাল ও কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত এক ঘণ্টাকাল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা পরিষদে সার নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতনের সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্য দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মন্ত্রিসভা দরিদ্র জনগণের দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। চাউলের দর কিছুতেই ১৬ টাকা ৪ আনার কম করা হয় নাই—বরং ভাল চাল পৃথক করিয়া তাহা ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় মধ্যবিত্ত লোকদিগকে ১৬।০ মণ দরে অতঃপর মোটা চাউলই খাইতে হইবে। বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে মন্ত্রিসভা প্রথম হইতে কোন ব্যবস্থা করেন নাই—দেশে চোরাবাজার দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে—কেহই তাহাতে বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। মন্ত্রিদল তাঁহাদের দল রক্ষার জন্য বহু অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বহু নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন পদে লোক নিযুক্ত করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গভর্ণর স্বহস্তে শাসন ভার লইয়া যদি পরিশ্রম করিয়া সকল বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে তদন্ত ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে বহু বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হইবে এবং তদ্দারা শুধু ব্যয় হ্রাস হইবে না, শাসন কার্য্যের গুণও বৃদ্ধি পাইবে। ৯৩ ধারা অধিক দিন বহাল রাখার পক্ষপাতী আমরা নহি, কাজেই সত্বর যাহাতে উহার অবসান ঘটে, সেজন্য গভর্ণরেরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য যদি ব্যবস্থা পরিষদের নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনও প্রয়োজন হয়, তাহাতে বাধা না দিয়া গভর্ণরের পক্ষে বরং তাহা করাই সঙ্গত ও সমীচীন হইবে।

বস্ত্রাভাব—

১৯৪৩ সালের মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশে যেমন চাউলের অভাব হইয়াছিল, আজ ঠিক তেমনই ভাবে কাপড়ের অভাব দেখা দিয়াছে। সে সময়ে যেমন পয়সা দিয়াও চাউল পাওয়া যাইত না, ৮০ টাকা ১০০ টাকা মণ দিয়া লোক চাউল কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল, যাহারা তত অর্থব্যয় করিতে পারে নাই, তাহারা দুই বেলা দিনের পর দিন রুটী খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, আজ কাপড়ের বেলাও তাহাই হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের মত ধনী ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিও শান্তিপুরে সম্প্রতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার সময় টাকা দিয়া কাপড় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—সে

কথা তিনি সেদিন পরিষদের মধ্যে দাঁড়াইয়াই প্রচার করিয়াছেন। মফঃস্বলে লোক মাতাপিতার মৃত্যুর পর কাছা পরিবার কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে না—কাপড়ের অভাবে বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইতেছে—ইহা আজ নিত্যকার ঘটনায় দাঁড়াইয়াছে। দরিদ্র ব্যক্তিরা আর ছেঁড়া কাপড়ও সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, মধ্যবিত্তগণের দুর্দশার শেষ নাই। ৪ টাকা মূল্যের সাড়ী ১৬ টাকা মূল্য দিয়া আমাদের সম্মুখেই লোককে সংগ্রহ করিতে দেখিতেছি। কিন্তু কয়জনের সেভাবে কাপড় সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত অর্থবল আছে? কাজেই লোক যে আপন স্ত্রীকন্যার জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের শাসকগণ এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। বস্ত্রের এই অভাব একদিনে উপস্থিত হয় নাই—বহু দিন হইতে আমরা এই অভাব বোধ করিয়াছিলাম ও বহুদিন হইতে কাপড়ের বাজারে চোরাবাজার চলিতেছিল। কাজেই প্রথম অবস্থা হইতে গভর্ণমেণ্ট যদি এই ব্যবস্থার প্রতীকারে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এই দুরবস্থা উপস্থিত হইত না। বিতাড়িত মন্ত্রীর দল সেদিনও আশ্বাস দিয়াছিলেন যে শীঘ্রই তাঁহারা কাপড়ের রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া সকলকে সমানভাবে বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের কার্য্যকালের আয়ু ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন গভর্ণর ও তাঁহার পরামর্শদাতারা এ বিষয়ে কি করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। গভর্ণর চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন না, এমন কথা আমরা বিশ্বাস করিব না। যুদ্ধের প্রয়োজনে যাঁহারা সর্ব্বদা অসাধ্যসাধন করিতেছেন, দেশের লোকের প্রয়োজনে তাঁহারা কি তাহার কিছুটাও করিবেন না? এখন দেশে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে—কাজেই দেশ শাসন ব্যাপারে গভর্ণর সর্ব্বশক্তিমান—কাজেই আমাদের বিশ্বাস, গভর্ণর এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া সত্বর দেশবাসীকে এই দারুণ বস্ত্র-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বৃটেনে খাদ্য সমস্যা—

যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে বর্ত্তমানে বৃটেনে দারুণ খাদ্যসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটেনে চাউল যাইত এবং আমেরিকা হইতে দুধ ও মাংস আসিত। গত কয় বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে আর চাউল যায় নাই—কাজেই সকলকে আটার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহাও এখন আর পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না। আমেরিকা হইতে দুধ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে—মাংস আমেরিকাতেই ক্রমে দুর্লভ হইতেছে, এ অবস্থায় তাহারা বৃটেনে পাঠাইবে কি করিয়া। কাজেই বৃটেন কি করিয়া এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিবে, তাহার চিন্তায় বিব্রত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের বাজেট—

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব গত ২৪শে মার্চ্চ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যবস্থার জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করার পরও তাহাদের লক্ষাধিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। মজার কথা, যে সকল প্রদেশে গভর্ণর কর্তৃক শাসন-কার্য্য পরিচালিত হয়, সেই সকল প্রদেশে আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়। আর যেখানে মন্ত্রীরা আছেন, সেখানেই অর্থের অভাব। কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও ইহা সত্য কথা।

চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ—

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ২৬টি জেলায় শস্য-হানির ফলে ঐ অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে ও সেজন্য প্রায় ২ কোটি লোক বিপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৩ সালেও ঐ অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং বহু লোক ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ বেশী দিন চলিলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে ও জগতের লোক-সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।

বোম্বায়ে মহাত্মা গান্ধী—

গত ৩১শে মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী সেবাগ্রাম হইতে বোম্বায়ে যাইয়া বিড়লা গৃহে বাস করিতেছেন। গরমের সময় সেবাগ্রামে ১১০ ডিগ্রী উত্তাপ হয়—সেজন্য চিকিৎসকগণ গান্ধীজিকে গ্রীষ্মের সময় সেবাগ্রামে না থাকিয়া শীতপ্রধান কোন স্থানে বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। গান্ধীজি বোম্বাই হইতে "জাতীয় সপ্তাহে দেশবাসীর কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। ১৯১৯ সালে প্রথম জাতীয় সপ্তাহ পালন আরম্ভ করা হয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খদ্দরপ্রচার ও স্বরাজ লাভ চেষ্টা—এই তিনটি কর্ত্তব্যে গান্ধীজি সকলকে অবিচলিত থাকিতে বলিয়াছেন। ভারতের সকল লোক যদি কোনদিন সমবেতভাবে এ জন্য চেষ্টা করে, সেদিন আমাদের পক্ষে ঈপ্সিত ফল লাভ করা আদৌ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

পাঞ্জাবে পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ—

পাঞ্জাব ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতে ব্যাপক জল সেচন, বন্যা প্রতিরোধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থায় ৫টি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে—পৃথিবীর কোথাও এত দীর্ঘ বাঁধ নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারতের যে কয়টি বড় বড় নদীর জলের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, এই ৫টি বাঁধ নির্ম্মিত হইলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি আয়ত্তাধীনে আনা যাইবে। এই বাঁধের ফলে যে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা দ্বারা এত বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে যে—সমগ্র ভারতের শিল্পগত রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণনগরে শিক্ষক সম্মিলন—

গত ৩১শে মার্চ্চ নদীয়া কৃষ্ণনগরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষকগণ সাধারণত কম বেতন পাইতেন, কাজেই বর্ত্তমানে সেই বেতনে আর শিক্ষক পাওয়া যায় না—ফলে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি অচল হইয়াছে। শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির জন্য সম্মিলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি ও সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা—

২৯শে মার্চ্চ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে—১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে ম্যালেরিয়ায় ভারতবর্ষে ৯০ লক্ষ ৭১ হাজার লোক মারা গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে গড়ে ২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইত, এখন ৫ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন-জাতীয় ঔষধ ব্যবহার হয়। ১৯৪৪ সালে কত লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে আরও স্তম্ভিত হইতে হইবে। হয়ত ৫ বৎসরের সংখ্যা একত্র করিলে তাহার সমান হইবে।

বিলাত হইতে লোক আনয়ন—

ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব সার ফ্রান্সিস মুডী সহসা বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, এদেশের শাসন কার্য্য চালাইবার জন্য বিলাত হইতে লোক আনয়ন করা প্রয়োজন—এখন বিলাতে প্রতিযোগী পরীক্ষা করিয়া লোক আনা সম্ভব নহে। সেজন্য কি ভাবে তথায় চাকরিয়া সংগ্রহ করা যায় সার ফ্রান্সিস তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন। শুনা যায়, যুদ্ধের জন্য বিলাতেও শাসন কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত লোকের অভাবে তথায় মহিলাদের দ্বারা কাজ চালান হইতেছে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, মেডিকেল সার্ভিস, পুলিস সার্ভিস প্রভৃতির জন্যও শেষে বিলাত হইতে মহিলা আমদানী করা হইবে?

পেশোয়ারে কালীবাড়ী সংস্কার—

পেশোয়ারবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার ও প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা কলিকাতায় আসিয়া একটি বিষয়ে বাঙ্গালীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরের কালীবাড়ীগুলি বাঙ্গালীর সংস্কৃতি রক্ষার স্থান। সে সকল স্থানে শুধু কালী-মাতার পূজার ব্যবস্থা নাই, বাঙ্গালী অতিথি যাইলে তাহার আহার ও বাসস্থান দানের ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া সেগুলি প্রবাসী বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র এবং প্রত্যেক স্থানেই বাঙ্গালা পুস্তকের লাইব্রেরী আছে। বাঙ্গালীদের চেষ্টা ও যত্নে এক সময়ে এই কালীবাড়ীগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সার বি-এন মিত্রের চেষ্টায় সিমলার কালীবাড়ী সম্প্রতি নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালীদের চেষ্টার অভাবে জলন্ধর, মমতাজ ও ফিরোজপুরের কালীবাড়ীগুলি এখন অবাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। পেশোয়ারের কালীবাড়ীটি রক্ষার জন্য এখন অর্থের প্রয়োজন, অথচ তথায় স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা এখন খুবই কম। এ অবস্থায় বাহিরের লোক অর্থ সাহায্য না করিলে পেশোয়ারের কালীবাড়ীটি সংস্কার করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। ডাক্তার ঘোষ সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি। বাঙ্গালী সমাজ এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য না করিলে আর কে করিবে? বর্ত্তমানে বহু বাঙ্গালীকে নানা কাজে ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে; তাঁহারা এ বিষয়ে একটু তৎপর হইলে আর পেশোয়ারের কালী বাড়ী রক্ষার অসুবিধা থাকিবে না।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান—

মাতৃভাষায় যাহাতে এদেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়, সেজন্য মহাত্মা গান্ধী বহু দিন হইতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। এ বিষয়ে ওয়ার্দ্ধা কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ শ্রীনারায়ণ আগারওয়াল সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শিশুর দেহের পুষ্টির জন্য যেমন মাতৃ-স্তন্যের প্রয়োজন, তেমনই মনের পুষ্টির জন্যও মাতৃভাষার প্রয়োজন। শিশুর মনকে গড়িয়া তোলার জন্য মাতৃভাষাকে বাহন না করিয়া অন্য ভাষা তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া আমি পাপ বলিয়াই মনে করি।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্গত সুধী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় মাতৃভাষা সকল অন্য ভাষার সহিত সমান সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন বলিয়া গৃহীত হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর নিতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক হইলে দেশ তদ্বারা উপকৃত হইবে।

নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠে দান—

ঝাড়গ্রামের জমীদার রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব সম্প্রতি নবদ্বীপ বিশ্ববিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিতে যাইলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গবিবুধজননী সভা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। পণ্ডিত গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বিশ্ববিদ্যাপীঠের প্রয়োজনের কথা বিবৃত করায় রাজা বাহাদুর তজ্জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ সময়ে জমীদার শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরীও বিদ্যাপীঠে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বাঙ্গালার হিন্দুদের একটি নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—উহা যাহাতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র নবদ্বীপে স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সকলের সাহায্য করা উচিত।

সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান—

বোম্বায়ে গত ৩১শে মার্চ্চ নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের স্থায়ী কমিটীর যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতায় পরিচালিত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অভাব এদেশে সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া থাকে। জাতীয় সংবাদ প্রচারের সেজন্য অসুবিধা অত্যন্ত অধিক। সভায় ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে। সরকারী আবহাওয়ার বাহিরে যাহাতে সত্বর এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, সেজন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত।

ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি—

সার ফিরোজ খাঁ নুন ও সার রামস্বামী মুদেলিয়ার ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া সানফ্রান্সিসকো সম্মিলনে যাইতেছেন। ঐ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া গত ১লা এপ্রিল বিলাতের কেম্ব্রিজ সহরে প্রবাসী ভারতীয়গণের এক সভা হইয়া গিয়াছে ও সভায় উপরোক্ত দুই জনের স্থলে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ভারতের প্রতিনিধি করিয়া সানফ্রান্সিসকোতে পাঠাইতে বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দিলীপ সেন বিলাতে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুব্রত রায় চৌধুরী ভারতের দাবী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

মেডিকেল শিক্ষা সমস্যা—

গত ৩১শে মার্চ কলিকাতা সহরে ডাঃ মনোহরলাল কাপুরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় নিজে ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুই প্রকার (স্কুল ও কলেজ) মেডিকেল শিক্ষার প্রথা তুলিয়া দিয়া একপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে এদেশে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাস, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আসামে নূতন মন্ত্রিসভা—

আসামে মন্ত্রিমণ্ডল লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী সার মহম্মদ সাদুল্লা বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বারদলৈ ও শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরীর সহিত আপোষ করিয়া ১০ জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। নিম্নে ১০ জনের নাম প্রদত্ত হইল—(১) সার মহম্মদ সাদুল্লা প্রধান মন্ত্রী (২) খাঁ বাহাদুর সৈয়দুর রহমন (৩) মিঃ মুনওর আলি (৪) মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী (৫) খাঁ সাহেব মুদাবীর হোসেন চৌধুরী (৬) শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার চৌধুরী (৭) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (৮) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস (৯) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বড়গোয়াইন (১০) শ্রীযুক্ত রূপনাথ ব্রহ্ম; সকল দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা আসামে এই প্রথম গঠিত হইল। তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া লোক তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচার করিবে।

বিহার বাজেটে টাকা উদ্বৃত্ত—

বিহার গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে দেখা যায় ব্যয় অপেক্ষা আয় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। অথচ তথায় কোন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হয় নাই। যুদ্ধের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি সত্বেও তথায় এই বাড়তি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

বস্ত্র বরাদ্দের অনুরোধ—

গত ৯ই চৈত্র শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাঙ্গালার দরুণ মাথা পিছু ১৮ গজ বস্ত্র বরাদ্দ করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিবার জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরকে অনুরোধ করা হউক। বাঙ্গালার এই বস্ত্র সমস্যার দিনে কেহই ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন নাই। ইহাই একমাত্র সুখের কথা। ১৮ গজ কাপড়ও যে একজন মানুষের ১ বৎসরের ব্যবহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহাও সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহর্ষির তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা—

গত ১৩ই চৈত্র মঙ্গলবার কলিকাতা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমীদার সভা গৃহে উক্ত এসোসিয়েসনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কলিকাতা আর্ট সোসাইটীর পক্ষ হইতে উক্ত চিত্র উপহার দেওয়া হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব সভায় পৌরহিত্য করেন। যে সময়ে মহর্ষি উক্ত এসোসিয়েসনের সম্পাদক, তখন তথায় রাজনীতি চর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। সে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের কথা। মহর্ষির আত্মজীবনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অসাধারণ জীবনকথা অবগত আছেন। তাঁহার কথা এদেশে এখন বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

ডাঃ বি-এন-দে—

ডাঃ বি-এন-দে খ্যাতনামা এঞ্জিনিয়ার, তিনি বিলাতে মিউনিসিপাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিয়া তথায় বহুদিন কাজ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ এঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে ১৯৪৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর কর্পোরেশনে তাঁহাকে স্পেশাল অফিসার ও এঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। গভর্ণমেণ্ট এই নিয়োগ সমর্থন না করা সত্বেও কর্পোরেশন ডাঃ দে'কে কাজ করিতে দিয়াছিলেন। সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মামলার ফলে ডাঃ দে'কে কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া হাইকোর্ট এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, কাজেই ডাঃ দে'র মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর কর্পোরেশনে কাজ করিতে পারিবেন না। এ ব্যাপারে শুধু আমাদের অসহায় অবস্থার কথাই মনে হয়।

গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন—

গত ১৭ই মার্চ্চ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কতকগুলি বিভাগের সুপরিচালনার জন্য তাহাদের কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাহার পর কর্পোরেশনের প্রতিনিধিদের সহিত গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিদের আলোচনার ফলে গত ৯ই চৈত্র কর্পোরেশনের সভায় এক আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে সরকারী ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু সরকারী নির্দ্দেশ প্রতিপালনের জন্য কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও চিফ এঞ্জিনিয়ারের উপর ভার দেওয়া হয়। এই আপোষের ফলে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কর্পোরেশনকে তাঁহাদের দেয় সমস্ত অর্থদান করেন, সেজন্যও গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় এইভাবে আপোষ না করা হইলে কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িত। নূতন ব্যবস্থায় কর্পোরেশনের কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইলেই সহরবাসী তাহাতে আনন্দলাভ করিবে। গভর্ণমেণ্ট যে জরুরী অবস্থার সুযোগ লইয়া এইভাবে কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন, তাহা সহ্য করা কোন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্মানজনক নহে।

শিশির কুমার ইনিষ্টিটিউট—

গত ১২ই চৈত্র সোমবার হইতে কয় দিন ধরিয়া বাগবাজার শিশির কুমার ইনিষ্টিটিউটের রজত জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের সভায় কলিকাতার লর্ড বিশপ সভাপতিত্ব করেন এবং মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কয়দিনের সভাতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সেবায় ও সাহিত্যে শিশির কুমারের দানের কথা আলোচিত হইয়াছে। ইনিষ্টিটিউটের উৎসব উপলক্ষে দেশবাসী একজন প্রকৃত দেশসেবকের কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

জলধর স্মৃতিসংঘ—

রায় বাহাদুর স্বর্গত জলধর সেন মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ কলিকাতা ৩২বি ঘোষ লেনে 'জলধর স্মৃতি সংঘ' নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। জলধর সাহিত্যের আলোচনা করাই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সংঘের বর্ত্তমান বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীভবানী সেনগুপ্ত—সভাপতি, শ্রীকানাইলাল চন্দ্র—প্রধান সম্পাদক, শ্রীসত্যকিঙ্কর সেন—সহকারী সম্পাদক ও শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন—কোষাধ্যক্ষ। সংঘের কয়েকটি সভায় জলধর সাহিত্য আলোচিত হইয়াছে।

বিদেশে ভারতীয় সৈন্য—

নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে বিদেশে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাদের সমগ্র ব্যয় বৃটীশ গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন।

কাহারা দায়ী—

মিঃ বেভারলী নিকোলাস 'ভারতবর্ষ' সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়া আমেরিকায় তাহা বিতরণ করিতেছেন। উহাতে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অস্বীকার করিয়া ভারতে বৃটীশ শাসনব্যবস্থা স্থায়ী করার চেষ্টা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে মিঃ নিকোলাস দিল্লীতে আসিয়া ভারতসরকারের প্রচার বিভাগের এক নামজাদা কর্ম্মচারীর গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তক লিখিবার জন্য ভারত সরকারের দপ্তর হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বোম্বায়ে তিনি তাঁহার পুস্তক ছাপিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রচুর কাগজও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সময়ে এদেশে কাগজের অভাবে স্কুল পাঠ্য পুস্তক ছাপাও কঠিন হইয়াছে, সেই যুগে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য মিঃ নিকোলাসকে কে কাগজ সরবরাহ করিয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। এই ভাবের কাজ যতদিন চলিবে, ততদিন কি করিয়া বৃটীশ জাতি বা গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর সহানুভূতি লাভ করিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র—

স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের এডভোকেট জেনারেলের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে কলিকাতার এডভোকেট জেনারেল ও বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য ছিলেন। তাঁহার মত বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বাঙ্গালীর বাঙ্গালার বাহিরে এই সম্মানজনক পদলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

কলিকাতায় পুলিসের হানা—

গত ১১ই ও ১২ চৈত্র রবিবার ও সোমবার কলিকাতা পুলিশ সহরে বহু স্থানে হানা দিয়া বহু স্থান হইতে অন্যায় ভাবে রক্ষিত কাপড়ের গাঁট বাহির করিয়াছে। একটি নূতন বাড়ীর ভূগর্ভস্থ ঘর হইতে ৫ লক্ষটাকা মূল্যের সূতা পাওয়া গিয়াছে। যে সকল স্থানে বেআইনি কাপড় পাওয়া গিয়াছে সে সকল গৃহ শীল করিয়া গভর্ণমেণ্ট কাপড়গুলি নিজেদের জিম্মায় রাখিয়াছেন। এখন যদি ঐ সকল বস্ত্র সাধারণের মধ্যে বণ্টনের উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তবে তাহাতে দেশবাসী উপকৃত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত ভূপেশমোহন সেন—

শ্রীযুক্ত ভূপেশমোহন সেন সম্প্রতি বিলাতের টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে কেবল তুলা, পশম, রেশম প্রভৃতির বয়ন, রঞ্জন ইত্যাদির বিশেষজ্ঞদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এখন তিনি ভলকার্ট ব্রাদার্সের বোম্বাই অফিসে রঞ্জন বিভাগের লেবরেটারী-অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছেন।

সংস্কৃত নাটকাভিনয়—

ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী ও ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর চেষ্টায় কলিকাতা ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে যে প্রাচ্য বাণী মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগে দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি মন্দিরের সদস্যগণ দুই দিন মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক সংস্কৃতে অভিনয় করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। দর্শকদের পক্ষ হইতে ৭ জন অভিনেতাকে পদক প্রদান করা হইয়াছে। দেশে সংস্কৃত নাটকাভিনয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রাচ্য বাণী মন্দির তাহার নূতন ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা—

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী জলপাইগুড়ীতে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—সভাপতি—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস, সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অতুলাচরণ দে পুরাণরত্ন। আমাদের বিশ্বাস, নূতন কর্ম্মকর্ত্তারা বাঙ্গালায় হিন্দু জাগরণ আন্দোলন অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিবেন।

বড়লাটের বিলাত যাত্রা—

গত ২১শে মার্চ্চ ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল হঠাৎ বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে বিলাত যাইতে হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বোম্বায়ের গভর্ণর সার জন কলভিলি বড়লাটের কাজ করিবেন। লর্ড ওয়াভেলের এই সহসা যাওয়ার কারণ এখনও জানা যায় না। তবে তিনি বিলাতে পৌঁছিয়াই ভারত সচিব মিঃ আমেরীর অফিসে বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফল কি হয়, তাহাই জানিবার বিষয়।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বোম্বাই ঃ ৪৬২ ও ৭৬৪

হোলকার ঃ ৩৬০ ও ৪৯২

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল ৩৭৪ রানে হোলকার দলকে হারিয়ে এবছরের রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে তাদের চতুর্থ বিজয়।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ৪ঠা মার্চ্চ থেকে ফাইনাল খেলা আরম্ভ হয়। বোম্বাই দল টসে জয় লাভ করে প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে। বোম্বাইয়ের ওপনিং খেলোয়াড়দ্বয় ইব্রাহিম এবং মন্ত্রী খেলতে নামলেন। সূচনা বেশ ভাল হ'ল কিন্তু দলের ১৭ রানে মন্ত্রী ১০ রান ক'রে আউট হলেন। এর পর আর এস মোদী এসে ইব্রাহিমের সঙ্গে যোগ দিয়ে খেলার গতি ভালর দিকে আনলেন। ইব্রাহিম নিজস্ব ৪৪ রান ক'রে দলের ১৪১ রানে আউট হলেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে দলের ৭ উইকেটে ৩৩৮ রান উঠল। আর এস মোদী ৯৮ রান করে মাত্র আর দু' রানের জন্তে সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। আর এস কুপার করলেন ৫২ রান। উদয় মার্চ্চেন্ট ৭৪ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনের নট আউট উদয় মার্চ্চেন্ট এবং পলায়ানকার ব্যাটিং আরম্ভ করলেন। মার্চ্চেন্ট ৭৯ রানে আউট হলেন। লাঞ্চের ঠিক আগে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস্ ৪৫৯ মিনিট খেলার পর ৪৬২ রানে শেষ হল। পলায়ানকরের ৭৫ রানই এই দিন উল্লেখযোগ্য। সি এস নাইডু ১৫৩ রানে ৬টা এবং নিম্বলকার ৮৮ রানে ৩টে উইকেট পেলেন। লাঞ্চের পর হোলকার দলের ভাণ্ডারকার এবং সারভাতে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন। চা পানের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে হোলকার দলের ৯১ রান উঠল। চা পানের পর খেলার ভাঙ্গন ধরল। আধঘণ্টার মধ্যে ভাণ্ডারকার এবং সারভাতে যথাক্রমে ৩৭ এবং ৬৭ রান করে আউট হলেন। দু' উইকেট হারিয়ে হোলকারের ১১৩ রান উঠল। মুস্তাক আলির জুটী হয়ে ডি কম্পটন খেলতে লাগলেন, কম্পটনের উইকেট তাঁর ২০ রানে পড়ে গেল। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে হোলকার দলের ৪ উইকেটে ১৯৭ রান উঠল।

তৃতীয় দিনের খেলায় হোলকার দলের পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটস্‌ম্যান্ মুস্তাক আলি এবং নিম্বলকার খেলা আরম্ভ করলেন। হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ৩৫৮ মিনিট খেলার পর ৩৬০ রানে শেষ হ'ল। মুস্তাক আলি ১০৯, সি এস নাইডু ৫৪ রান এবং জগদল ৪৩ রান করলেন। কাদকার ৭৫ রানে ৫টী এবং তারাপুরা ৯৪ রানে ৩টে উইকেট পেলেন।

বোম্বাই দল ১০২ রানে অগ্রগামী থেকে ২-৫৮ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা পূর্ব্ববর্ত্তী ওপনিং খেলোয়াড় দিয়েই আরম্ভ করলে। এবার পূর্ব্বের থেকে আরম্ভ খুব ভালই হ'ল। চা পানের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ৬০ রান উঠল। দলের ৮০ রানে, ইব্রাহিম ২৬ রান করে আউট হলেন। মন্ত্রী চারবার আউট হতে বেঁচে গিয়ে ৬৩ রানে আউট হলেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল বোম্বাই দলের ২ উইকেটে ১৬৫ রান উঠেছে। আর এস মোদী এবং ভি এম মার্চ্চেণ্ট যথাক্রমে ৫৯ ও ৯ রান ক'রে নট আউট রইলেন। হোলকার দলের নিকৃষ্ট ফিল্ডিংয়ের দরুণ বোম্বাই দলের মন্ত্রী একাধিকবার এবং মোদী একবার আউটের হাত থেকে বেঁচে যান।

চতুর্থ দিনের খেলায় তৃতীয় দিনের নট আউট খেলোয়াড় আর এস মোদী এবং ভি এম মার্চ্চেণ্ট খেলা পুনরায় আরম্ভ করলেন। মোট ২০৩ মিনিট খেলার পর দলের ২০০ রান উঠল। মোদীর রান তখন ৮০ এবং মার্চ্চেণ্টের ১৯ রান। ২৩৭ মিনিট খেলার পর মোদী ১০১ রান করলেন, তার মধ্যে ১১টা বাউণ্ডারী। দলের তখন ২৩১ রান। দলের অধিনায়কের তখন মাত্র ২৫ রান উঠেছে। ৯৫ মিনিট খেলার পর উভয়ের জুটীতে ১০০ রান উঠল। ১৫০ রান উঠল মোট ১৩৮ মিনিটে। বার বার বোলার পরিবর্ত্তন করেও হোলকারের অধিনায়ক কর্ণেল নাইডু কিছুই করতে পারছেন না। এরপর লাঞ্চের জন্তে খেলা বন্ধ রইল। ২ উইকেটে বোম্বাইয়ের তখন ২৮৬ রান। মোদীর এবং মার্চ্চেণ্ট যথাক্রমে ১৩০ এবং ৪৬ রান তুলে তখনও ব্যাট করছেন। লাঞ্চের পর বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে খেলা পুনরায় আরম্ভ হ'ল। মোট ২৯৬ মিনিট খেলার ফলে হোলকার দলের ৩০১ রান উঠল। মোদী এবং মার্চ্চেণ্টের রান তখন যথাক্রমে ১৩৯ এবং ৫৩। কিছুক্ষণ খেলার পরই আর এস মোদী এ বছরের রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় তাঁর নিজস্ব ১০০০ রান পূর্ণ করলেন। ১৮৫ মিনিট খেলার পর পাটনারসিপ খেলায় তাঁদের ২০০ রান পূর্ণ হ'ল। এ সময় তাঁর রান ১৪৬ এবং মার্চ্চেণ্টের ৬১।

২২৫ মিনিট উইকেটে খেলে তিনি নিজস্ব ১৫০ রান

পূর্ণ করলেন। এই রান সংখ্যায় তাঁর ১৪টি বাউণ্ডারী ছিল। এর পরই সি এস নাইডুর বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে মোদী ১৫১ রানে আউট হলেন। মোট ২০০ মিনিট পাটনায়েের সঙ্গে খেলে তিনি ২২৬ রান দলকে দিয়ে ছিলেন। বিজয় মার্চ্চেণ্টের তখন ৮২ রান উঠেছে, আর এস কুপার তাঁর জুটী হলেন। উভয়ের জুটীতে দ্রুত রান উঠতে লাগল। দলের ৩৩০ মিনিট খেলার পর ৩৫৩ রান উঠল। বিজয় মার্চ্চেণ্ট সি এস নাইডুর বলে লেট-কাট মেরে বাউণ্ডারী করে শত রান ২২৩ মিনিট খেলার পর পূর্ণ করলেন। মার্চ্চেণ্ট উইকেটের চারপাশে বল মেরে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রান তুলতে লাগলেন। চা পানের সময় দেখা গেল বোম্বাই দলের ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৫৮ রান উঠেছে। মার্চ্চেণ্টের তখন ১৫৩ এবং কুপারের ৩৮। চা পানের পর বোম্বাই দলের খেলোয়াড়দ্বয় অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে রান তুলতে লাগলেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট অতি সহজেই তাঁর দু'শত রান পূর্ণ করলেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে বোম্বাই দলের ৩ উইকেট হারিয়ে ৫৪৫ রান উঠল। অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট এবং আর এস কুপার যথাক্রমে ২০৪ এবং ৭৭ রান ক'রে নট আউট থাকলেন।

পঞ্চম দিনের খেলায় বোম্বাই দলের নট আউট খেলোয়াড় বিজয় মার্চ্চেণ্ট এবং কুপার ব্যাটিং আরম্ভ করলেন। কুপার নিজস্ব ১০৪ রান করে আউট হলেন। এর পর কারদার এসে মার্চ্চেণ্টের জুটী হলেন এবং ৭ রানে আউট হলেন। এদিকে দলের পাঁচটা পড়ে গিয়ে রান দাঁড়াল ৬১৮। বিজয় মার্চ্চেণ্টের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা উদয় মার্চ্চেণ্ট খেলার জুটী হলেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২৫০ মিনিট খেলে ২৫০ রান তুললেন, তার মধ্যে ১৩টা বাউণ্ডারী করলেন। দলের রান তখন ৬৪৪। স্কোর বোর্ডে রান বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠতে লাগল এবং ৫৯০ মিনিট খেলাতে ৬৫০ রান উঠল। সি এস নাইডুর লাঞ্চের আগের শেষ ওভার বলে স্কোয়ার কাট মারতে গিয়ে বিজয় মার্চ্চেণ্ট একটা ক্যাচ তুললে পর জগদল তাঁকে ধরে ফেললেন। বিজয় মার্চ্চেণ্ট ৬৮৫ মিনিট উইকেটে খেলে ২৭৮ রান তুললেন এবং খেলার এই দীর্ঘ সময়ে এই একবারই মাত্র আউট হবার সুযোগ দেন। খোট উদয় মার্চ্চেণ্টের সঙ্গে জুটী হয়ে খেলতে লাগলেন। ৬-১০ মিনিটের সময় বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৭৬৪ রানে শেষ হল। উদয় মার্চ্চেণ্ট ৭৩ রান করলেন। বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৬৭০ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল।

হোলকার দল ৮৬৬ রান পিছনে পড়ে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে এবং মাত্র ১১ রানে ভাণ্ডারকার এবং সারভাতে আউট হলেন। পঞ্চম দিনের খেলার শেষে হোলকার দলের দু' উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান উঠল। মুস্তাক আলি এবং কম্পটন যথাক্রমে ১০৬ এবং ৬৫ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

প্রতিযোগিতার ৬ষ্ঠ দিনে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৪৯২ রানে শেষ হ'ল। মুস্তাক আলির ১০৯ এবং কম্পটনের নট আউট ২৪৯ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই দলের বিপুল রান সংখ্যার উত্তরে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা খুবই প্রশংসনীয়। ৩৭৪ রানে বোম্বাই বিজয়ী হ'ল। ইতিপূর্ব্বে তারা ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬, এবং ১৯৪১-৪২ সালে রঞ্জি ক্রিকেট ট্রফি বিজয়ী হয়েছিল।

বোম্বাই দল: কে সি ইব্রাহিম, এম কে মন্ত্রী, আর এস মোদী, ভি এম মার্চ্চেণ্ট, আর এস কুপার, ডি জি কারদার, উদয় মার্চ্চেণ্ট, জে বি খোট, ওয়াই বি পালওয়ানকার, এস এম রাঙ্গনেকর, কে কে তারাপুর।

হোলকার দল: কে ভি ভাণ্ডারকার, সি টি সারভাতে, মুস্তাক আলি, ডি কম্পটন, বি নিম্বলকার, সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, জে এন ভায়া, এম জগদাল, এইচ গিকোয়াদ, ও রাউল।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল: ১৯৩৪-৩৫ বোম্বাই; ১৯৩৫-৩৬ বোম্বাই; ১৯৩৬-৩৭ নওনগর; ১৯৩৭-৩৮ হায়দ্রাবাদ; ১৯৩৮-৩৯ বাঙ্গলা; ১৯৩৯-৪০ মহারাষ্ট্র; ১৯৪০-৪১ মহারাষ্ট্র; ১৯৪১-৪২ বোম্বাই; ১৯৪২-৪৩ বরোদা; ১৯৪৩-৪৪ পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য।

হকি লীগ ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ২১ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শহর থেকে দূরে"—৩৲
শ্রীপাদ শিবরাজ মহেন্দ্রজী প্রণীত "শ্রীশ্রীব্রজোদ্ধব দশা-মাধুরী"—১৲
ডক্টর রমা চৌধুরী প্রণীত "বেদান্ত ও সূফী দর্শন"—২৲
শৈলজানন্দ-প্রবোধকুমার প্রণীত উপন্যাস "নন্দিতা"—২।০
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত গল্পগ্রন্থ "গল্পের মতো"—১।০
আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রাতের অতিথি"—১৲
শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত "শ্রীমা"—২।০
শ্রীসতীকুমার নাগ প্রণীত "হাজার বছর পরে আমাদের কবি"—৷/০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "নাট্য-ভারতী" ৫ম পর্ব্ব—২৲
পূরবী পাবলিশার্স প্রকাশিত "New Life in New China"—২।০
বাণী রায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "পুনরাবৃত্তি"—২৲
স্বামী আত্মানন্দ প্রণীত "জীবন-সাধনার পথে"—।০
স্বামী বিশ্বপ্রণবাশ্রম মহারাজ প্রণীত "সুন্দরী ব্রজবাসিনী"—১৲
শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "নরদী বন্ধু"—১৲
নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবহার কাঠামো"—১।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সুবর্ণরেখার বাঁক

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

তুষারাচ্ছন্ন সিমলা

: ৫নং চিত্র-- ফটো : শ্রীঅরিণ গাঙ্গুলী

১নং চিত্র-- ফটো : শ্রী বারেন বল

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

কয়লার ব্যবহার

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইতিহাস

পাথুরে কয়লার ব্যবহার ভারতবর্ষে খুব পুরাতন নয়। তবে ভারতবর্ষের বাহিরে বিশেষতঃ ইউরোপে ইহার পরিচয় খৃষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভের অন্ততঃ তিন শতকের পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত ব্যবহার ইহার অনেক পরে সুরু হইয়াছে।

আরিষ্টটলের শিষ্য থিয়োফ্রাসটস্ কর্ত্তৃক লিখিত "The Book of Stones" পুস্তকে লিগুলিয়া বা বর্ত্তমান জেনোয়ার এবং অলিম্পিয়ার পথে এলিস্ (Elis) নামক স্থানে দৃষ্ট একপ্রকার কাল পাথরের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ 'প্রস্তর' অগ্নিসংযোগে জ্বলে এবং কামার-শালায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উহাই যে বর্ত্তমানের (পাথুরে) কয়লা, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে জ্বালানী হিসাবে কয়লার নিয়মিত ব্যবহারের সুনিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায়। নিউ-ক্যাস্‌ল্-অন্-টাইনের (New Castle on Tyne) লোকদের প্রয়োজনে কয়লা ব্যবহারের জন্য ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অষ্টম হেন্‌রী এক সনদ প্রদান করেন।

ইহার পর আবার ১৫০৩ সালে সম্রাট প্রথম এডোয়ার্ড লণ্ডন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহকে গন্ধক ও দাহ্যমান কয়লার দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কয়লা দগ্ধ করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেন এবং তৎস্থানের অধিবাসীদিগকে কাঠ-কয়লা জ্বালাইয়া অগ্নি উৎপাদনের আদেশ দেন। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্ম্মাণীতে সাক্সনী প্রদেশে জুইক (Zwickau) অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম পাথুরে কয়লার ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার পর ১২৯১ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে ডান্‌ফারলিন গির্জ্জার পাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কয়লার ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্রমে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে কাচ প্রস্তুত করিবার জন্য ইংলণ্ডে কয়লার বহুল ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া যায়।

ব্যবহার—তাপ ও শক্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব ভাগে কেবল উত্তাপ সৃষ্টি করিবার জন্য কয়লা ব্যবহৃত হইত। বৈজ্ঞানিকরা ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। এই তাপকে কি ভাবে শক্তিরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা লইয়া নানা জল্পনাকল্পনা চলিয়াছে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Solomon de Caus তাঁহার পুস্তকে[১] এবং মার্কুইস্ অব্ উর্‌ষ্টার

কর্ত্তৃক (Marquis of Worcester) ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত পুস্তকে২ পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ত্তনের সূচনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন টমাস স্যাভারি (Capt. Thomas Savery) এই অঙ্গারজাত শক্তিকে ব্যবহারিক জগতে স্থান দান করেন। তিনি (পাম্প) দমকলের মধ্যে বায়ুশূন্যতা (vacuum) অবস্থার সৃষ্টি করিয়া সেই সঙ্গে উত্তপ্ত বাষ্পের ব্যবহারের প্রবর্ত্তন করেন। কর্ণওয়াল (Cornwall) প্রদেশের ব্রিজ্ (Breage) পরগণা (Parish)র খনি হইতে জল উত্তোলনের জন্য যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া তিনি জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বাষ্পীয় শক্তির নিয়ম অনুসরণ করিয়া ১৭০৫ সালে নিউকোমেন (Newcomen) তাঁহার ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন এবং ১৭৬৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া জেম্স্ ওয়াট্ (James Watt) ইঞ্জিনের বহুতর উন্নতি সাধনের জন্য গবেষণা চালাইতে থাকেন। বর্ত্তমান জগতে বৈদ্যুতিক শক্তির মূলে কয়লা নিহিত রহিয়াছে; তাহা ছাড়া অবশ্য জলস্রোতের সাহায্য লওয়া হইতেছে।

নিউকোমেনের পূর্ব্বে এবং ক্যাপ্টেন স্যাভারির আবিষ্কারের পরে, আন্দাজ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাডলি (ডুড্ ডাড্লি) কয়লার অপর এক ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। লৌহ গলাইবার কার্য্যে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইবার পর কারবার নষ্ট হইয়া যাওয়ায় লর্ড ডাড্লির প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। পরে ১৭৩৫ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আব্রাহাম ডার্ব্বি (পিতা ও পুত্র) ঐ বিদ্যা কাজে লাগাইতে সক্ষম হন এবং লৌহশিল্পের প্রসারের সুযোগ উপস্থিত হয়।

ব্যবহার—আলোক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়লার আরও এক নূতন ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৯২ সালে মার্ডক্ (Murdock) বলেন যে কয়লা হইতে প্রাপ্ত গ্যাস (বাষ্প) জ্বালাইয়া যে আলো পাওয়া যাইবে, তাহা নল সাহায্যে লোকের বাড়ীতে পৌঁছাইতে পারিলে তৈল-প্রজ্বলিত (ল্যাম্প) প্রদীপ বা আলোকাধার ও বাতির প্রয়োজন দূর করিবে। ক্রমে তাহা সকল সভ্যদেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভারতে অপব্যবহার

এই সকল ব্যবহারের পরিচয় থাকিলেই খনিজর্জ্জিদিগের মধ্যে কয়লার প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে। কাঁচা কয়লা হইতে কোক (semi-coke) বা খনিজ গালাইবার উপযোগী কয়লা (metallurgical coal) করিবার সময় একটু ব্যবস্থা করিলে কয়লার কতকাংশ আলকাতরারূপে পাওয়া যায়। ইহার প্রক্রিয়া খুবই সহজ এবং সকল সভ্য দেশেই কোক কয়লা করিতেও বায়ুরুদ্ধ স্থান বা পাত্রের আশ্রয় লয়। ভারতবর্ষে কয়েকটী লৌহ ঢালাই কারখানা এবং গ্যাস কোম্পানীর কারখানা ছাড়া সমস্ত কয়লাই উন্মুক্ত স্থানে দগ্ধ করায় আলকাতরা ও অপরাপর বস্তু দগ্ধ হইয়া যায়। অবশিষ্ট জ্বলন্ত কয়লাতে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইলে কোক পড়িয়া থাকে।

কয়লা ও কোক

এইরূপ কাজে যে কেবল বহুমূল্য বস্তু নষ্ট হয় তাহা নহে, ধূম্ররূপে কতকাংশ বর্ত্তমান থাকিয়া বায়ুতে মিশে এবং লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সেইজন্য বিশেষ চুল্লীতে কয়লা "দগ্ধ" (প্রকৃতপক্ষে ইহা সেঁকা) করিবার ব্যবস্থা আছে; ইংরেজিতে ইহাকে 'Carbonisation of coal' বলে।

সাধারণতঃ ইহা বায়ুরুদ্ধ চুলি বা নালার মধ্যে "দগ্ধ" করা হয়। এই নালীগুলি উনান (oven) নামে পরিচিত; মোটা এইগুলি ৪০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট গভীর এবং মাত্র দেড় ফুট চওড়া। ইহার দেওয়াল বা প্রাচীর উৎকৃষ্ট সিলিকা (silica) নির্ম্মিত ইট দ্বারা গঠিত। চুল্লীর উপর ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা,মধ্যে মধ্যে কয়লা ঢালিয়া দিবার পথ আছে এবং যাহাতে কয়লা "দগ্ধ" হইবার সময় ধোঁয়া বাহির হইতে পারে, এইরূপ এক নল বা চিমনি আছে। সমস্ত চুল্লী কয়লা ভরা হইলে উহা ঢাকিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বাহির হইতে (দেওয়ালের) ইটগুলি উত্তপ্ত করা হয়। চুল্লীর পাত্রের তাপে কয়লা উত্তপ্ত হয় এবং তাহা হইতে সমস্ত গ্যাস নির্গত হইয়া নলপথে চলিয়া গেলে উহা কোকে পরিণত হয়; চুল্লীগুলি সরাসরিভাবে (একটী অপরটীর পাশে) অবস্থিত; মধ্যে কেবল তাপ সরবরাহ করিবার জন্য কামরা (heating chamber) ব্যবধান। টাটার কারখানায় অন্যূন ১৫০টী এইরূপ চুল্লী আছে। ১৬ হইতে ১৮ ঘন্টা তাপ ভোগ করিবার পর উত্তপ্ত কয়লা চুল্লী হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং জল দিয়া তাপ দূর করা হয়। তখন ইহা লৌহগালাই চুল্লীতে ব্যবহারের উপযুক্ত কোকরূপে পরিণত হয়।

গ্যাসের ব্যবহার

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে কাঁচা কয়লাকে কোকে পরিণত করার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোক-লাভ করার পার্থক্য কি? পূর্ব্বে ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যে গ্যাস উন্মুক্ত স্থানে দগ্ধ হইয়া এবং বায়ুতে মিশিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহা এই প্রক্রিয়ায় একটুও অপচয় হইতে দেওয়া হয় না। চুল্লীসংযুক্ত নলের সাহায্যে কয়লার বাষ্পকে স্থানান্তরে লইয়া তাহা হইতে দূষিত অর্থাৎ লৌহ চুল্লীর ক্ষতিকারক সমস্ত অংশ দূর করিয়া লৌহগলন কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, আলো-তাপ পাইবার জন্য যে গ্যাস (coal gas) ব্যবহৃত হয়, ইহা সেইরূপ ভাবে জ্বলে; সুতরাং তাপউৎপাদন করে। সেই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্লাষ্ট ফার্ণেস (blast furnace) বা লৌহ গালাই চুল্লীতে কয়লার সহিত ব্যবহৃত হয়।

কয়লার উপোৎপাদ্য বস্তু

উপরিউক্ত গ্যাস অন্যভাবেও কাজে নিয়োজিত হইতেছে। ইহা কোক-চুল্লী (coke-oven) হইতে লইয়া ভিন্ন স্থানে নীত হয় এবং

---

১ "Les Raisons des Forces Mouvantes"

২ "Century of Inventions"

উহাকে ক্রমে শীতল হইতে দেওয়া হয়। দ্রুত প্রয়োজনে শীতল বস্তুর সংস্পর্শে বাষ্পাকার হইতে রূপান্তর গ্রহণের সহায়তা করিবার ব্যবস্থা আছে। এখন হইতে প্রকৃতপক্ষে কয়লার উপোৎপাদ্য বস্তু লাভ করিবার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। উত্তপ্ত বাষ্প শীতল হইলে কতকাংশ আলকাতরা-রূপ ধারণ করে। তাহার পর যে গ্যাস থাকে তাহাতে এ্যামোনিয়া (**ammonia**), বেনজল (**benzol**), ন্যাপথ্যালিন (**naphthalene**) ও জলীয় বাষ্প থাকে। এ্যামোনিয়াকে সলফিউরিক এ্যাসিডের সাহায্যে এ্যামোনিয়ম সলফেট (**ammonium sulphate**) রূপে উদ্ধার করিবার পর ন্যাপথ্যালিন ও তৎপরে বেনজল উদ্ধার করা হয়।*

ইহা ছাড়াও এই গ্যাস হইতে গন্ধক এবং তাহা হইতে সলফিউরিক এ্যাসিড, সায়েনোজেন (**cyanogen**) পাওয়া যায়।

আলকাতরা হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়ার পূর্ব্বে অন্যান্য যে কয়টী বস্তু **carbonisation of coal** প্রক্রিয়ায় পাওয়া যাইতেছে, তাহার বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

এ্যামোনিয়া

এ্যামোনিয়া হইতে এ্যামোনিয়ম সলফেট উদ্ধার হয়, তাহা বলা হইয়াছে। ইহা একটী উৎকৃষ্ট সার এবং প্রতি বৎসর ইহার প্রচুর প্রয়োজন। জলে দ্রব এ্যামোনিয়া (**Liq. ammonia**) গবেষণাগারে এ্যামোনিয়ায় দ্রবণীয় বস্তু দ্রব করিবার উদ্দেশ্যে, মেঝে প্রভৃতি সাফ করিবার জন্য এবং বিশোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। স্বল্প ব্যয়ে তাপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে এ্যামোনিয়া গ্যাস প্রয়োজন। চিকিৎসা বিদ্যায়, লৌহ-চাদরে দস্তা জমাইতে (**in galvanising**), ধাতব পদার্থে জোড়াই কাযে, ক্যালিকো ছাপাই ও নানা রকম রঙ এবং কাচে দাগ করিবার জন্য যে এ্যামোনিয়ম ফ্লুরাইড (**amm. flouride**) প্রস্তুত করিতে এ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড (**amm. chloride**) প্রয়োজন। বস্ত্রাদি রঞ্জন কাযে এবং ছাপাই করিতে এ্যামোনিয়ম থিয়োসায়েনাইট (amm. thiocyanite) এবং স্মেলিং সল্ট (smelling salt), রুটী বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে 'বেকিং পাউডার' (**baking powder**), ঔষধ প্রস্তুত করিতে পশম রঞ্জন করিতে এবং সাধারণ রঞ্জন কাযে এ্যামোনিয়ম নাইট্রেট্ (amm. nitrate) ব্যবহৃত হয়। এ্যামোনিয়া হইতে এই সকল লবণ বা সল্ট (**salt**) প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং এ্যামোনিয়া এবং তাহারও পূর্ব্বে কয়লার গ্যাস ইহাদের এক হিসাবে মূল।

বেনজল

এ্যামোনিয়া ব্যতিরেকে বেনজল (**benzol**) পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। বেনজল হইতে বিশুদ্ধ বেনজিন্ (**benzene**), টলুইন (**toluene**) মোটরের উপযোগী বেন্‌জিন (motor benzene) সলভেণ্ট ন্যাপ্‌থা (solvent **naphtha**) ও জাইলল (**Xylol**) পাওয়া যায়।

---

* **William A. Bore and Godfrey W. Himus**—***Coal Constitution and Uses*****, pp 375-380.**

আলকাতরা

যে আলকাতরা লোকে স্পর্শ করিতে ভীষণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে, হঠাৎ দেহে কোথাও লাগিয়া গেলে তাহা দূর করিবার জন্য সত্বর চেষ্টা করিবে, তাহা যে কত প্রকার অতীব প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ বস্তু প্রসব করিতে সমর্থ, তাহা এই সামান্য প্রবন্ধের পরিসরের মধ্যে লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে।

প্রথমেই মনে হইবে কাষ্ঠের দ্রব্যাদিতে লাগাইতে কালো রঙ আর রাস্তা তৈয়ারী করিতে পিচ্ (**pitch**) বা ঐ জাতীয় বস্তুর কথা। আলকাতরা না থাকিলে আর ঘরের মেঝের মত ম্যাকাডাম করা রাস্তায় মনের আনন্দে এবং সামান্য ক্লেশে যান চড়িয়া বেড়াইবার সুযোগ ঘটিত না। পিচ্ হইতে **pitch-coke briquettes,** ছাদের জমানো 'টাইল' (**roofing felts**), ইলেকট্রোড্ (**electrode**) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আলকতরা-জাত তৈল

আলকাতরা 'ভাঙ্গিয়া' (**fractional distillation**) নানাপ্রকার তৈল, (**Oil**) যথা হাল্কা (**light**), মাঝারি (**middle**), ভারি (**heavy**), এ্যানথ্রাসিন (**anthracene**), এ্যানথ্যাসিন-ফ্রী (**anthracene-free**) প্রভৃতি তৈল পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেকটী হইতে যে আবার কত রকম বস্তু তৈয়ারী হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

"হাল্কা" তৈল

লাইট অয়েল (**light oil**) হইতে বেনজিন (**benzene**), এ্যানিলিন (**aniline-indigo**) ও ফুকসিন্ (**fuchsine**) পাওয়া যায়। ফুকসিন্ হইতে রঙ, ঔষধাদি প্রস্তুতের রসায়ন, সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। লাইট অয়েল হইতেই মোটরে ব্যবহারযোগ্য স্পিরিট ও বস্ত্রাদির দাগ উঠাইবার জন্য এক প্রকার তরল পদার্থ হয়। টলুইন (**toluene**) লাইট অয়েলের একটী অতি প্রয়োজনীয় উপোৎপাদ্য বস্তু এবং উহাই বিস্ফোরক (**T. N. T.** বা **trinitrotoluol**) ও ভেষজ প্রস্তুতের উপাদান, রঞ্জন পদার্থ ও স্যাকারিণ প্রভৃতি বস্তুর মূল। জাইলিন (**Xylene**), দ্রাবক ন্যাপথা, কুমারোন রেসিন (**cumarone resin**) প্রভৃতি দ্রব্যাদি লাইট অয়েলের অন্তর্ভুক্ত বস্তু।

রঞ্জন পদার্থ, সুগন্ধি এবং দ্রাবক মিলে xylene হইতে; আর রবার, রঙ, বার্নিস, দ্রব করিতে এবং অবিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিন্ পরিষ্কার করিতে দ্রাবক ন্যাপ্‌থা (**solvent** naphtha) ই মূল বস্তু।

"মধ্য" তৈল

মিড্‌ল্ অয়েল (**middle oil**) বা কার্ব্বলিক অয়েল (**carbolic oil**) হইতে ন্যাপথ্যালিন (**naphthalene**), থ্যালিক এ্যাসিড (**phthalic acid**) আর নীল পাওয়া যায়। রঙ, বিশোধক ও কীটাণু-নাশক এবং বিস্ফোরকের জন্য নাইট্রোজেন যুক্ত ন্যাপথ্যালিন এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত "মৃৎ" পাত্রাদি (**porous stonewares**) প্রভৃতিতে ন্যাপথ্যালিন কোনও না কোনও রকমে সহায়তা করে। কার্ব্বলিক এ্যাসিড অয়েল (**carbolic acid oil**) মিড্‌ল্ অয়েলের অপর এক উপোৎপাদ্য

বস্তু। তাহা হইতে ফেনল (phenol), ক্রেসল (cresol) এবং জাইলেনল (xylenol) পাওয়া যায়। ফেনল হইতে পিক্‌রিক এ্যাসিড ও স্যালিসিলিক এ্যাসিড (salicylic acid) হয়। বিস্ফোরক ও রঞ্জন পদার্থ করিতে পিক্‌রিক এ্যাসিড লাগে এবং স্যালিসিলিক্ এ্যাসিড হইতে এ্যাস্‌পিরিন (aspirin) উদ্ধার করা যায়।

রঞ্জন পদার্থ, ঔষধ, যৌগিক আঠা (resins), 'বেকে লাইট' (bakelite), বিস্ফোরক, বিশোধক, ক্রেয়োলিন (creoline) প্রভৃতি জাইলেনলের উপোৎপান্ন বস্তু। তাহা ছাড়া পিরিডিন (pyridine) ও ঘর্ষণরোধক তৈল (lubricating oil) জাইলেনলের অংশসম্ভূত। পিরিডিন হইতে ঔষধাদি সংক্রান্ত বস্তুও রঙ পাওয়া যায় এবং স্পিরিটের গুণান্তর ঘটাইতে (for denaturing of spirits) পিরিডিনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

"ভারি" তৈল

ভারি তেল বা হেভী অয়েল (heavy oil)এর অপর নাম ক্রিয়োসোট অয়েল (creosote oil)। ইহা হইতে অবিশুদ্ধ ন্যাপথ্যা- (crude naphthalene), যৌগিক রঙ ও ঔষধাদি প্রস্তুতের উপযোগী কুইনোলিন (quinolene), কাষ্ঠাদি সংরক্ষণের উপযোগী ক্রিয়োসোট অয়েল (creosote oil), গ্যাস হইতে বেনজল (benzol) উদ্ধারের উপযোগী 'ওয়াসিং অয়েল' (washing oil for washing out benzol from gas) এবং মোটর চালাইবার উপযোগী ডিসেল্ অয়েল (Diesel oil) পাওয়া যায়।

"এ্যানথ্রাসিন্ অয়েল"

এ্যানথ্রাসিন্ অয়েল (anthracene oil) হইতে অবিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিন্ (crude anthracene), কারবাজল (carbazol), ফেনান্‌থ্রিন্ ও এ্যাক্রিডিন (acridine) আবিষ্কৃত হইয়াছে। অবিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিন্ বিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিনের আকর, আবার তাহা হইতে কার্পাস বস্ত্রাদি রঞ্জনের পাকা রঙ, ফটো সংক্রান্ত এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের নানা- প্রকার রাসায়নিক পদার্থ লাভ করা যায়। তাহা ছাড়াও, ইহা "টার্কি রেড ডাই" (Turkey red dye) প্রস্তুতের নিমিত্ত এ্যালিজেরিন (alizarine) ও বিশুদ্ধ এ্যানথ্রাসিনের অঙ্গ।

এ্যানথ্রাসিন-মুক্ত তৈল (anthracene-free oil) হইতে ডিসেল অয়েল (Diesel oil), দ্রব্যাদি সংরক্ষণের উপযোগী তৈল (Impregnating oil), ঘর্ষণরোধক তৈল (lubricating oil) ও বিশোধক কার্বোলাইনিয়ম (carbolineum) পাওয়া যাইতেছে।

রঞ্জন পদার্থ

এই তালিকা নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আলকাতরা হইতে যতপ্রকার রঙের বাহার হইয়াছে, তাহা আর কোথাও নাই। আজ পর্য্যন্ত অন্যূন দুই সহস্র বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে। এখন বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, মানুষের রুচি অনুযায়ী সকল প্রকার বর্ণ এক আলকাতরা হইতেই উদ্ধার করা চলিতে পারে।

"যানশক্তি"

এইখানেই কয়লার ব্যবহারের "গল্প" শেষ করা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা হইবার নহে। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে আলকাতরা "ভাঙ্গিয়া" (fractional distillation) নানাপ্রকার "তৈল" পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা যন্ত্র চালনার সহায়ক। এই প্রথায় বহু সময় লাগিয়া যায়, সুতরাং তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। যাহাতে অতি শীঘ্র কয়লা হইতে মোটর চালাইবার তৈল অথবা পেট্রল পাওয়া যায়, তাহার জন্য অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ইংরেজিতে ইহার চলিত নাম 'hydrogenation.' মূলতঃ, কয়লার মধ্যে নানা জৈব (organic) পদার্থের সমাবেশের মধ্যে সাধারণত শতকরা ৭০ হইতে ৯০ ভাগ কার্ব্বণ,৩ হইতে ৬ ভাগ হাইড্রোজেন,২ হইতে ২০ ভাগ অক্সিজেন, ১ হইতে ২ ভাগ নাইট্রোজেন ও সামান্য পরিমাণ গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ আছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ইহার উপাদানে "তৈল" জাতীয় ("bezenoid") বস্তুর প্রাধান্য রহিয়াছে এবং ইহার কার্ব্বণ সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোজেন পরিপূরিত (Saturated) বা পূর্ণসিক্ত নয়, অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্ব্বণে আরও অধিক পরিমাণ হাইড্রোজেন যোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে (৩০০ হইতে ৪৫০° সেন্টিগ্রেড তাপ এবং ২০০ হইতে ৩০০ বায়ু চাপ বা atmospheres) কয়লার জৈব পদার্থের বিয়োজন (decomposition) এবং হাইড্রোজেন যোগ (hydrogenation) ঘটে এবং বাষ্পরূপে অক্সিজেন, এ্যামোনিয়া রূপে নাইট্রোজেন, সলফিউরেটেড হাইড্রোজেন (sulphurated hydrogen) রূপে সলফর (গন্ধক) বিদূরিত হয় এবং পেট্রলে দৃষ্ট অপরাপর নানারূপ হাইড্রোকার্ব্বণ অণু (molecule) দৃষ্ট হয়।

এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া,রাসায়নিক উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে মিহি চূর্ণ কয়লার সহিত উহার ওজনের প্রায় ৪০ ভাগ তৈল (middle oil) মিশাইয়া পেষ্ট বা প্রলেপের মত করিয়া লন। (বৈজ্ঞানিক এই তৈল পেট্রল নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় একাংশরূপ উদ্ধার করে)। ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ দ্রুতক (catalyst) যোগ করিয়া উপযুক্ত তাপ ও চাপ প্রয়োগ করেন এবং সরাসরি ভাবে হাইড্রোজেন যোগ করিতে থাকেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এই যন্ত্র হইতে পেট্রল, ডিজেল অয়েল (Diesel oil) প্রভৃতি লাভ করা যায়। জার্ম্মাণী এইভাবে তাহার পেট্রলের অভাব বহুলাংশে মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইংলণ্ডেও পেট্রল নাই অথচ যুদ্ধকালে বাহির হইতে উহা আমদানী করিতে না পারিলে চলে না। সেই কারণে জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডও কয়লা হইতে পেট্রল ও অন্যান্য "তৈল" উদ্ধার করিতেছে।

কুইনিন

ডাঃ উডওয়ার্ড (Dr. Robert Burns Woodward) এবং ডাঃ ডোরিং (Dr. William von Eggars Doering) হারভার্ড বিশ্ব- বিদ্যালয়ের দুই রাসায়নিক এখন জোর গলায় বলিতেছেন যে কুইনিনের

জন্য আর সিনকোনা গাছের ত্বকের উপর নির্ভর করিতে হইবে না ; (কয়লার) আলকাতরা হইতে তাঁহারা "খাঁটী" কুইনিন আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে উহা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, যাহাতে পরিমিত ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে কুইনিন পাওয়া যাইতে পারে।

বহুমূল্য হীরক কয়লারই রূপান্তর ; তাহা প্রকৃতির এক লীলা। মানুষ ইহাতে সন্তুষ্ট নয় ; বহু বৎসর পরীক্ষা চলিতেছে, মানুষ চায় তাহার ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত সে কারখানায় হীরক প্রস্তুত করিবে। ফল সম্পূর্ণরূপে নিরাশাব্যঞ্জক নহে। কয়লা শেষ পর্য্যন্ত কতরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা এখন বলা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

ভারতবর্ষের অবস্থা

ভারতবর্ষের আলকাতরা হইতে উপোৎপাদ্য বস্তু লাভ করিবার জন্য তিনটী কারখানা আছে ; তাহার মধ্যে বিহারে (কুস্তুণ্ডা) অবস্থিত কারখানা প্রধান। রঙ মোটেই প্রস্তুত হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে আন্দাজ দশটি দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহা অন্য দেশের তুলনায় কিছুই নহে। তন্মধ্যে বেনজল, এ্যামোনিয়া, ন্যাপথালিন, কার্ব্বলিক এ্যাসিড, ক্রিয়োজেট অয়েল প্রভৃতি প্রধান। বর্ত্তমান যুদ্ধের চাপে, যুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। এতকাল পরে এখন জমির সার হিসাবে প্রচুর এ্যামোনিয়ম সলফেট প্রস্তুত করিবার জন্য বড় কারখানা করিবার তোড়জোড় চলিতেছে। কিছু পরিমাণ এ্যামোনিয়ম সলফেট হয়, তাহার অন্যত্র উল্লেখ আছে। ১৯৩৮ ৬৪,০০০ টন আলকাতরা ও পিচ্ পাওয়া গিয়াছে।

একাকার

যত দিন যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মনে হইতেছে এক দিন বিজ্ঞান স্থির নিশ্চিৎভাবেই বলিবে যে সমগ্র জগৎ মাত্র এক বস্তু দ্বারা গঠিত। আজই সেই বাণী উঠিয়াছে, বিজ্ঞান হিন্দুদর্শনের বাহন হইয়া সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন বাণী "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ" সাধারণ লোকের চক্ষুর সমক্ষে সপ্রমাণিত করিতে চলিয়াছে। একদিন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির যাহা নিজস্ব ছিল, বহু বিচার বহু সাধনা-তপস্যার ফলে মানস চক্ষে যাহা দেখিয়া ফুকারিয়া উঠিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা রূপ ধরিয়া জগতের সকল প্রাণীর নিকট প্রতিভাত হইতে চলিয়াছে। কয়লা হয়ত এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বানর-যূথ

জসীম উদ্‌দীন

গহন বনের মাঝে
বুড়ো বটগাছ শিকড়ে-বাকলে জড়ায়েছে নানা সাজে।
জীর্ণশীর্ণ বুকের পাঁজর গিয়াছে হইয়া ফাঁক,
তাহার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে কোকিল শালিখ কাক।
সাপের খোলস ঝুলে আছে কোথা, কোথাও শুকনো ডাল
মহাযোগী বট ধ্যানে নিমগ্ন কত যুগ কত কাল।

সেদিন প্রভাতে বেড়াতে ঘেড়াতে হেরিলাম তার তলে
বানরের দল ঘুমায়ে রয়েছে ধরিয়া এ ওর গলে।
কোন বা জননী, সন্তান মুখে চুমু দিয়ে দিয়ে আর
সাধ মেটেনাক, নানা ভাবে তারে আদরিছে বারবার।
কোন বা জননী ঘুমায়ে নিঝুম, সন্তানগুলি উঠে
স্বেচ্ছায় দুধ করিতেছে পান মার স্তন হ'তে লুটে।
কোন বা দুষ্ট সন্তান তার চোখে ঘুমন্তমা'র
আঙুল বুলায়ে ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে জাগাবার।
ঘুমন্ত মাতা হয়ত এখনো স্বপ্ন জড়িত চোখে
ছেলেদের তরে কোন সুখ নীড় আঁকিছে বা আশা লোকে।
কোন কোন মাতা ছোটছেলেটিরে জাগায়ে দিতেছে মাই—
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদে হিংসায় পাশে তার বড় ভাই।
মাঘের প্রভাত, কনকনে হাওয়া বহিতেছে শীত করি
শুয়ে আছে ওরা আদরে সোহাগে কাছাকাছি জড়াজড়ি।

স্নেহ-মমতার এমন দৃশ্য নির্জ্জনে আঁকি আর—
শত ফুল আঁখি মেলিয়া ইহারে দেখিতেছে বার বার।
প্রভাতের রবি আসিতে আসিতে থেমে যায় পথ ধারে
কুয়াসা চাদরে রশ্মিরে ঢাকি রাখে যত'খন পারে।
বন তার শাখা-বাহু বাড়াইয়া দিনেরে আড়াল করে
হয়ত বাসনা ঘুমাক উহারা আরো কিছু'খন ধ'রে

শিশুর জননী এখানে আসিয়া দাঁড়াক গাছের তলে
বৃন্দাবনের যশোদা আসুক গোপাল লইয়া কোলে
ফাতিমা জননী আসুক বুকেতে ইমাম হোসেন টানি
দেখে যাক্ এই নির্জ্জন বনে মমতার ছবিখানি।

ধীরে ধীরে ধীরে কুয়াসা আঁধার মুছিল রবির গায়
বিহগকুসুম সহস্রস্বরে কুটিল বনের ছায়।
গাছের পাতার ফাঁকা পথ দিয়ে রবির আলোর ঢেলা
ঘুমন্ত এই স্নেহপুরী মাঝে জুড়িল নিঠুর খেলা।
ধীরে ধীরে তারা জাগিয়া উঠিল, ছেলেরে স্কন্ধে করি'
আহারের খোঁজে চলিল জননী শাখাপথগুলি ধরি।
চলে দম্পতী ডাল হ'তে ডালে হাতে ধরি পাকা ফল
এ ওরে খাওয়ায় গান করে আর নেচে ফেরে চঞ্চল।
বৃদ্ধ এ বট, শূন্য বুকেতে কত কি যে কথা ভ'রে,
উতল বাতাসে কারে কি কহিছে বুঝি ফিস ফিস ক'রে।

বাঙ্গালা নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ

অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম্-এ

পাশ্চাত্য নাটক সাধারণতঃ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত, এই পাঁচ অঙ্কের নাম যথাক্রমে—১। সূচন (**Exposition**) ২। বিবর্ধন (**Growth or development**) ৩। সর্বোন্নয়ন (**Climax**) ৪। পতন (**Fall**) এবং সমাপন (**Catastrophe or denonement**)। অবশ্য আধুনিক যুগের যুগান্তকারী নাট্যকার ইবসেনের পর হইতে বর্তমান নাটকে এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ রক্ষিত হইতেছে না বটে, তবে সেক্‌সপীয়ারের কাল হইতে প্রাক-ইবসেনীয় যুগ পর্যন্ত নাটকের এই পঞ্চধা বিভাগ নাট্যকারবৃন্দ মোটামুটি মানিয়া চলিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে নাট্যকার ঘটনার (**action**) বীজ বপন করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ গতির আভাস দর্শককে জানাইয়া দেন, দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া দ্রুত অগ্রসর হয়, তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকলার চরমোৎকর্ষ উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবল সংঘাতে দর্শকের মন আবেগ কম্পমান হইয়া উঠে। চতুর্থ অঙ্কে ঘটনার দ্রুততা কমিয়া আসিয়া সুনিশ্চিত পরিণতির দিকে শ্লথগতিতে অগ্রসর হয় এবং শেষ অঙ্কে প্রত্যাশিত মিলন অথবা মরণ ঘটিয়া থাকে। নাটকের এই পঞ্চাঙ্ক ছাড়া ঘটনা বহির্ভূত আর একটী অঙ্গও কোনো কোনো নাটকের থাকে। ইহাকে প্রস্তাবনা (**Prologue**) বলা হয়, নাটকের গোড়ায় সংস্থিত হইয়া ইহা দর্শককে নাটকীয় বিষয়বস্তুর পূর্বাভাস জানাইয়া দেয়, পাশ্চাত্য নাটকের পঞ্চবিভাগের ন্যায় সংস্কৃতনাটকের মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পঞ্চসন্ধি আছে। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে কেবল পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসারেই আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা এবং গভীর বিশ্লেষণের পর ইহা আমাদের মনে হইয়াছে যে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসকে যদি একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের সহিত তুলনা করা যায়, তবে তাহা অভিনব হইলেও অসঙ্গত হইবে না। নাট্য-সাহিত্যের ধারা নাটকের ঘটনা (**action**) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং ঐ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত এক একটী যুগকে এক একটী অঙ্ক রূপে মনে করিতে পারি। বাঙ্গালা নাটকের ঐতিহাসিক ধারা যে নাটকীয় ঘটনার মতই অগ্রসর হইয়াছে আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইব।

প্রস্তাবনা

নাটক বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না। সেই যাত্রা ও পাঁচালী মধ্যযুগের বাঙ্গালীদের নাট্য-রসপিপাসা মিটাইয়া আসিতেছিল, আধুনিক নাটকের উদ্ভব সেই সব হইতে হয় নাই। ইংরাজ আগমনের পর উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু নাটকের পূর্ণ এবং পরিণত রূপ আসিয়াছিল—অনেক পরে মাইকেল মধুসূদনের সময় হইতে। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল, সেইগুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের আভাস বলাই সঙ্গত। সেই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে রাম-নারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং হরচন্দ্র ঘোষের নাম করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাদের নাটক কোনো অভিনব মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে না। সংস্কৃত সৃতিকাগৃহের চিহ্ন ইহাদের অঙ্গে সুপরিস্ফুট। ইহারা ভোরের আকাশের ক্ষণস্থায়ী রক্তিমচ্ছটা মাত্র। সূর্যোদয়ের পর হইতেই ইহাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য নাট্যধারার প্রস্তাবনায় ইহাদের একমাত্র স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম অঙ্ক

সূচন (Exposition)

প্রথম গর্ভাঙ্ক (মাইকেল দীনবন্ধু যুগ)

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা নাটক যথার্থ আরম্ভ হইয়াছে মধুসূদনের সময় হইতে। মধুসূদন এবং তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকারের দ্বারা বাঙ্গালা নাটকের বিভিন্ন দিক আগ্রহশীল জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছিল। ইঁহাদের মধ্যে মাইকেল এবং দীনবন্ধু আদিমত নাট্যরচয়িতা এবং উভয়ের মধ্যে সাধর্ম খুব বেশি, সেজন্য আমরা উহাদিগকে একত্রে প্রথম গর্ভাঙ্কে সন্নিবেশিত করিলাম।

মধুসূদন বাঙ্গালা নাট্যভারতীর দুর্দশা দেখিয়া সখেদে বলিয়াছিলেন—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়

এই দুর্দশা দূর করিবার জন্য তিনি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং রঙ্গালয়ের অভিনয়ের উপযোগী পাশ্চাত্য রীতিসম্মত নাটক লিখিয়া নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ পথ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়া যান, মাইকেলের পরে অনেক নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের পুরোবর্তী পথিকৃৎরূপে মাইকেলের অশেষ দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কেবল নাটক নয়, প্রহসনের ক্ষেত্রেও মধুসূদন আদি প্রবর্তনের অকুণ্ঠিত সম্মানের অধিকারী। একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এই দুই প্রহসনের মধ্যে যে সত্যনিষ্ঠ বাস্তব

বিশ্লেষণ এবং সুনিপুণ হাস্যরস সৃজন করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে সুলভ নহে।

দীনবন্ধুর নাটকের অনেক স্থলেই মাইকেলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু যেমন ইংরাজী সাহিত্যে সেকসপীয়ার তাঁহার পূর্বতন নাট্যকার ক্রিষ্টোফার মার্লোর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তেমনি দীনবন্ধু ও মাইকেলের ঋণ গ্রহণ করিয়াও শ্রেষ্ঠতর নাট্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধু বাস্তব নাট্য-সাহিত্যের অগ্রদূত, বোধ হয় তিনিই বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। আধুনিক বস্তুপ্রিয় সমস্যা সন্ধিৎসু নাট্যকারদের কাছে 'নীলদর্পণও' এখনও আদর্শরূপে বিদ্যমান, প্রহসন-রচয়িতারূপে দীনবন্ধুর প্রভাব পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে মাইকেলকে আদর্শ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদনের নাটকের দোষত্রুটী দীনবন্ধুর নাটকেও সংক্রামিত হইয়াছে, সংলাপে দীর্ঘ এবং দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, সংস্কৃত উপমা অলংকারের বহুল এবং অসময়োচিত ব্যবহার, অহেতুক কবিতার সংযোজন ইত্যাদি দোষ উভয়ের নাটকেই লক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অপেরা ও গীতাভিনয় (মনোমোহন বসু)

বাঙ্গালীর প্রাণ স্বভাবতই কোমল এবং ভাবপ্রবণ, সেইজন্য তরল, উচ্ছ্বাসময় ভক্তিধারা বাঙ্গালীর অন্তরে যেমন সহজে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, এমন আর কিছুই পারে নাই। নাটকের আবির্ভাবের পূর্বে দেবলীলাবিষয়ক ভক্তিমূলক যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদি দেখিয়া বাঙ্গালী ভক্তিভাবকে পরিতৃপ্ত রাখিত। রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরে পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাতমূলক দৃশ্যকাব্য দেখিতে পাইল বটে কিন্তু তাঁহাদের ভাবতন্ময়তা এবং ভক্তিবিহ্বলতার পরিপূরক বিষয়াদি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিত। সেইজন্য ধর্মমূলক, ভাবতরল যাত্রা ইত্যাদি কোনো কালেই বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া যায় নাই। বাস্তব ঘটনা ও দ্বন্দ্ববিষয়ক নাটকের প্রচলনের পরে দর্শকদের যাত্রারস তৃপ্ত করিবার জন্য একরকম নূতন ধরণের নাটক উদ্ভূত হইল। এই নাটকগুলি নাটকের রীতি অনুসরণ করিয়া লিখিত হইলেও গীতের প্রাধান্যে এবং অলৌকিক ভাবের প্রাবল্যে যাত্রার সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটককে সাধারণতঃ অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইয়া থাকে। মনোমোহন বসুই প্রথম সতী, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি নাটক রচনা করিয়া গীতাভিনয় রূপ বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের এক বিশাল শাখার সূত্রপাত করিয়া যান, তাঁহার পরে বহুতর অপেরা ও গীতাভিনয় রচিত হইয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ এই নাটকগুলিকে পরম সমাদর করিয়া আসিয়াছে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ঐতিহাসিক নাটক (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটকের আদি প্রবর্তক নহেন বটে কারণ তাঁহার পূর্বেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে ঐতিহাসিক নাটকের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় কৃতিত্ব হইল এই যে তিনিই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটকের মধ্য দিয়া স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি যাঁহারা পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জাতীয় ভাব উদ্বোধন প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পথ নির্দেশকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিবর্ধন (Development)

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অপেরা ও গীতাভিনয়ের প্রসার (রাজকৃষ্ণ রায়)

মনোমোহন বসু দ্বারা অপেরা ও গীতাভিনয় জাতীয় নাটক সূচিত হইয়াছিল ইহা প্রথম অঙ্কে আলোচিত হইয়াছে। মনোমোহনের পরে যাঁহারা এই সব নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, এই সব নাট্যকারদের অসংখ্য নাটকে বাঙ্গালা সাহিত্য প্লাবিত হইয়াছিল এবং জনগণের মধ্যে ইহাদের এত বেশি প্রসার ছিল যে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত এই নাট্যধারাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।

যাত্রা-লক্ষণাক্রান্ত নাটক লিখিয়া সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়। মনোমোহন বসুতে যাহার আরম্ভ রাজকৃষ্ণ রায়ে তাহার পূর্ণ পরিণতি, রাজকৃষ্ণ রায়ের অনেক নাটক এককালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল ; অপেরা, গীতাভিনয় প্রভৃতিকে একটু কঠোর ভাবে বিচার করিলে নাটক বলা চলে না এইজন্য, যে নাটকের মধ্যে পাত্র পাত্রীর ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীয় রস পরিস্ফুরিত হয়, নাটকের ঘটনা-বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, কিন্তু গীতিনাট্য প্রভৃতিতে অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার জন্য নাটকের চরিত্র বিকশিত হইতে পারে না, এবং ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি চরিত্রের অভ্যন্তর হইতে গড়িয়া উঠে না। কোন বিশেষ দেবমাহাত্ম্য কিংবা অলৌকিক লীলারহস্য ব্যক্ত করিবার জন্যই এই সব নাটক লেখা হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সব নাটকে ঘটনা সংস্থাপন এবং চরিত্র বিকাশনে কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ নাই। অথচ ঐ দুইটী বৈশিষ্ট্যই নাটকের সর্বাপেক্ষা বেশি লক্ষিতব্য গুণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গিরিশ যুগ

অনেক প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সুতরাং তাঁহাদের কথা মানিতে গেলে বলিতে হয় যে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পরাকাষ্ঠা (climax) তাঁহার সময়েই আসিয়া

গিয়াছে। এই বিষয়টী একটু ধীর এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করা দরকার। অবশ্য একথা ঠিক যে গিরিশচন্দ্রের সময়েই বাঙ্গালা দেশের নাটকীয় আন্দোলন (**Dramatic movement**) চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয় শিল্পের শিক্ষা দানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমকক্ষ লোক বাঙ্গালায় কেহ জন্মায় নাই। নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের ইতিহাসের স্বর্ণময়যুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের এই পরিচালক, প্রযোজক, ব্যবস্থাপক এবং শিক্ষক গিরিশচন্দ্র আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহার নাট্যবিচারে আমাদের অপক্ষপাতী বিশ্লেষক দৃষ্টি সজাগ করিয়া রাখিতে পারি না। গিরিশচন্দ্র প্রায় আশীখানা নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব সৃষ্টির বহুলতায়, শিল্পের অনন্যসাধারণত্বে নয়। কারণ গিরিশচন্দ্র একমাত্র গৈরিশছন্দ ব্যতীত কোনো অভিনব নাট্যকলার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। সামাজিক নাটকে তিনি দীনবন্ধুর প্রতিভাশিষ্য, ঐতিহাসিক নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবপুষ্ট, এবং ধর্মমূলক পৌরাণিক নাটকে মনোমোহনও রাজকৃষ্ণের আদর্শপ্রাপ্ত, সুতরাং বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসের প্রথম অঙ্কে যে নাট্যশালাগুলির সূচনা হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র সেইগুলিকে পূর্ণতার দিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক শিষ্যবর্গ অনেকেই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। হাস্যরস সৃজনে অমৃতলাল দীনবন্ধু প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী। অমরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক
ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণতা (দ্বিজেন্দ্রলাল—ক্ষীরোদপ্রসাদ)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে জাতীয়ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ও ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম প্রভৃতি ২।৩ খানা নাটক ;ব্যতীত, অধিকাংশ নাটকই প্রচ্ছন্ন ধর্মভাবে আচ্ছন্ন। দ্বিজেন্দ্রলালই ঐতিহাসিক নাটকের বীররস ও স্বদেশী ভাবোদ্দীপনার দ্বারা বঙ্গরঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; নাটকের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতে যদি কেহ সর্বাপেক্ষা বেশি সক্ষম হইয়া থাকেন, তবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রকৃত বীররস সৃজনে এবং নাটকীয় দ্বন্দ্ব সমাবেশে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি কয়েকখানা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকের উপরেই নির্ভর করিয়াছে। তাঁহার আলমগীর, প্রতাপাদিত্য, পদ্মিনী, চাঁদবিবি প্রভৃতি রঙ্গালয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ওজস্বিনীভাষা এবং বীররস সৃজনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, ঘটনার বাহুল্য অনেক সময়েই তাঁহার নাটকীয় সংহতি ও ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক
সর্বোন্নয়ন (climax)
রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা বাঙ্গালা নাট্যধারার **climax** লক্ষ্য করিয়াছি ইহা বলিলে হয়ত আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু সেই আপত্তি কখনো নিরপেক্ষ আলোচনাপ্রসূত নহে। গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি যে কারণে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। রঙ্গালয়ের তাড়নায় শুধু প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখেন নাই, নাটকের মধ্যে তাঁহার শিল্পী মানসের স্বাভাবিক বিকাশই হইয়াছে। একথা সত্য যে তাঁহার নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোনোদিন তেমন জনপ্রিয় হয় নাই এবং দেশের মধ্যে তেমন কোনো আন্দোলনও সৃষ্টি করে নাই, কিন্তু সেই কারণে ইহার মূল্য একটুও কমিয়া যায় নাই। কারণ অতি বাজে নাটকও যে দেশের মধ্যে অদ্ভুত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে তাহা আমরা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকও প্রায় লক্ষাধিক দর্শককে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু নাট্যশিল্পের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার নাটকে সেই শিল্পের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে, নাটকের প্রাণ হইল ইহার সংলাপ, সংলাপের মধ্য দিয়া নাট্যকারকে দ্বন্দ্ব ও নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে হয়। ভাষা রাজ্যের শাহান সা বাদশা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীর কথার মধ্য দিয়া আবেগবান ও গতিমান ভাবের সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ, মারামারি ইত্যাদি বাহ্য স্থূল ক্রিয়ার অভাব, কিন্তু কথোপকথনের চমৎকারিত্বে আভ্যন্তরীণ ঘাতপ্রতিঘাত সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা ও শেষরক্ষার মধ্যে তিনি যেমন পরিশুদ্ধ, সুনির্মল, সুমার্জিত হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অন্য কাহারো নাটকে দেখা যায় নাই। তাঁহার রূপক নাটকগুলি সম্বন্ধে নানা রকম মতামত আছে। প্রচলিত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী হয়তো এই ধরণের নাটককে স্বীকার করা যায় না, কিন্তু ভবিষ্যতে দর্শকের দৃষ্টি অধিকতর সূক্ষ্ম ও কল্পনাপ্রবণ হইলে হয়তো রূপক নাটকের যথাযোগ্য সমাদর হইবে। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যগুলিতে রূপকতত্ত্ব থাকিলেও বাহ্য ক্রিয়ার অভাব নাই, সুতরাং তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলেও নাটকীয় রস সম্ভোগে ব্যাঘাত হয় না।

চতুর্থ অঙ্ক
পতন (Fall)
রবীন্দ্রোত্তর নাট্যধারা

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহার নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার পরেই নাট্য-সাহিত্যের দুর্গতি সুরু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনো প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার বিকাশ আমাদের দেশে হয় নাই। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় নাট্যকার বর্তমানে নাটক রচনা করিতেছেন, তাঁহারা কোনো অভিনব এবং যুগান্তকারী নাট্যাদর্শ দেখাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,বিধায়ক ভট্টাচার্য,প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায় প্রভৃতি যে সব পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে তাঁহারা পৌরাণিক নাটকের চিরচলিত ধর্ম ভক্তিভাব এবং অলৌকিক ঘটনা বর্জন করিয়াছেন। .আধুনিক নাট্যকারদের দ্বারা পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি দ্বন্দ্ব ও ঘটনাবহুল মানবীয় চরিত্রের মত হইয়াছে। শচীন সেনগুপ্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে এবং বিধায়ক সামাজিক নাটকে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আধুনিক সামাজিক নাটকে সমাজের নানা যৌন ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আধুনিক নাট্যকারবৃন্দ সমধিক তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বর্তমানে নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রমথনাথ বিশী স্বীয় গুরু বার্ণাড শ'এর আদর্শে ব্যঙ্গাত্মক নাটক লিখিতেছেন।

বাঙ্গালা নাটকের এই চতুর্থ অঙ্কই চলিতেছে. ইহার পঞ্চম অঙ্ক কবে আসিবে বলা যায় না, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ অঙ্ক সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায় বটে। রবীন্দ্রনাথের পর হইতে বাঙ্গালা নাট্যধারা বিশীর্ণ, শ্লথগতিতে অগ্রসর হইয়াছে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালার রঙ্গালয়-গুলির শোচনীয় দুর্গতি ইহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নব নব নাট্যপ্রতিভার বিকাশ হইতে পারে; সেই প্রয়োজন যখন ফুরাইয়া আসে, তখন নাট্যকারবৃন্দ আর নেহাত কলাচর্চার আনন্দে নাটক লেখার অনুপ্রেরণা বোধ করেন না। রঙ্গমঞ্চগুলির পরিচালনা এবং ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে অদূর ভবিষ্যতে যে ইহাদের অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে তাহা মনে হয় না। বর্তমান রঙ্গালয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কলা কৌশলময়ী সিনেমা। আধুনিক দর্শকবৃন্দ সিনেমাতে পরিমিত সময়ের মধ্যে সর্বপ্রকার আমোদ ও রস উপভোগ করিয়া আর মধ্যযুগীয় ইন্দুর চামচিকা অধ্যুষিত থিয়েটারে যাইবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না, সেইজন্য নাট্যশিল্প এবং অভিনয়কলার আর উন্নতিও হইতেছে না। এই ভাবে চলিতে থাকিলে কিছুকালের মধ্যেই যে চার পাঁচটী থিয়েটার পুরাতন নাট্যলীলার সাক্ষ্য-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, সেইগুলিও নিভিয়া যাইবে। যে রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সহিত কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অদ্বিতীয় নটলীলার স্মৃতিবিজড়িত সেই রঙ্গালয় হয়ত দেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং তখন অভিনেয় নাটকেরও প্রয়োজন থাকিবে না। হয়তো সিনেমা টেকনিকে নাটক লিখিত হইবে, তাহার সূচনা এখন হইতেই দেখা গিয়াছে. কিন্তু সেই সিনারিও ধরণের নাটককে নাটক বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং আমরা বিষণ্ণনেত্রে ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি যে বাঙ্গালা নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি (catastophe) আসন্ন। যদি সৌভাগ্যক্রমে এমন কোনো কারণ উপস্থিত হয় যাহাতে নাট্যশিল্পের পুনরায় প্রসার এবং উন্নতি হইতে পারে, তবে নাট্যামোদী ব্যক্তিমাত্রই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

অনাদি কালের প্রবাহ চলেছে—কবে তার উন্মেষ
জানেনাকো কেউ, জানে না কখন হবে তার অবশেষ।

সুদূর অতীতে চেয়ে দেখি যবে আনন্দে উচ্ছলি
ভোরের আকাশ মাটিতে নামিয়া প্রথম পড়েছে ঢলি.

চারিদিক যেন চমকি চাহিল পাখীদের কলগানে!
আলোকে সবুজে গলাগলি করি কী যেন কহিছে কানে।

আমারো তখন নয়নে ভাসিছে অনন্ত বিস্ময়!
কী যেন পেয়েছি, আরো কত কিবে বুঝিবা আড়ালে রয়।

অতুল পুলকে দুলিতে দুলিতে ভেবেছিল কচি মন—
এমনি বুঝিবা আসিবে নিত্য আলোর নিমন্ত্রণ।

* * *

বাজালো বিষাণ বৈশাখী ঝড় দিনের প্রান্তে আসি,
আকাশে উড়িয়া ভাসিয়া চলিল ছিন্ন মেঘের রাশি:
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ বাজিল রুদ্রতাল,
সৃজনধ্বংসলীলায় মেতেছে ভৈরব মহাকাল!
প্রলয়ঙ্কর মেঘডম্বরু, আকাশের বুক চিরে
কে যেন ধরার মুণ্ড ছিঁড়িতে অট্টহাস্যে ফিরে।
ছোট গৃহকোণে ভয়-বিহ্বল খুঁজেছিনু আশ্রয়,
দেখিতে দেখিতে সোনালি আলোক কোথা পেয়ে গেল লয়!

* * * *

আজো সংশয় ফিরে ফিরে আসে, আসে মোর ভীরু মনে—
ভাঙা আর গড়া—এটা কার খেলা কেন কোন্ প্রয়োজনে!
চলেছে প্রবাহ অনাদি কালের—কোথা সুরু কোথা যতি?
আমি মাঝখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজি তারি সঙ্গতি।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪

ভোর হতেই ঘুম ভেঙে ডাক্তার বিনোদ—"একি মাণিকলাল কোথা! সতরঞ্চি খালি যে! মাণিকলাল—মাণিকলাল?"

"এই যে হুজুর" ব'লে মাণিক হাজির।

"একটু চায়ের কি হবে বল দেখি! বদ অভ্যাস যে অনেক, স্টেশনে সরাব্‌জি⋯"

"আপনি মুখটা ধুয়ে ফেলুন দিকি, চা তয়ের।"

"বলো কি, এত সকালে তো সরাবজি শয্যায় থাকেন, ঘরের 'জীও' সাড়া দেন না—পাবে কোথা?"

"আপনি উঠুন তো।"

সঙ্গে সঙ্গে কেট্‌লি ভরা চা, কাপ ও দুখানা রুটি আর গুড় হাজির।

বিনোদ অবাক—"কখন কি করলে? মেয়েদের হার মানালে যে!"

"সেটা কেউ পারেনি, পারবেও না হুজুর!"

"সেটি থাকতে আর দিচ্ছে কই—শুভানুধ্যায়ী শত্রুর অভাব নেই হে⋯"

"তা বটে, আমাদের পাড়াগাঁয়ে কিন্তু এখনো⋯"

"বেশ আছ, বেশ আছ।—আঃ বাঁচালে। বানিয়েছও সুন্দর—দু'কাপ মিলবে তো?"

"কেট্‌লি ভরা আছে, যতটা ইচ্ছে খান না, আহারের তো ঠিকানা নেই, তাই দু'খানা রুটিও করলুম।"

"সত্যি মাণিক, কি সুন্দরই লাগছে। তুমিও খেয়ে নাও, আমাকে আবার স্টেশনে যেতে হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কাজ আরম্ভ ক'রে দিন, যার জন্যে আসা⋯"

"সে তো বটেই and to receive পিসি। তিনি এসে গেলেই নিশ্চিন্ত হই। কই মাছের উপায় চিন্তা করি—"

"সে কি মশাই—কলেরার কথা যে কননা—"

"আছা সে তো আছেই। পিসিকে দেখলে যম পালায়, কলেরা তো যমের একটা চীনে-পট্‌কা—খুদিরাম-সেপাই। পিসি বিলিতি বোডেসিয়ার ভগ্নী।"

উৎকর্ণভাবে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়—"হুইসিলে্‌র আওয়াজ না! Train in হ'চ্ছে যে।" তখনো আধখানা রুটি হাতে। নাঃ এ জিনিস ফেলা যায় না। মুখে পুরে, "তুমি বসে বসে চালাও। আমার রাজবেশ আঁটাই আছে। জয় মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী" বলতে বলতে চঞ্চলভাবে স্টেশনে ছুটলেন।

মাণিকলাল অবাক!—"ব্যাপার কি? এসে পর্য্যন্ত একদণ্ড মাথার ঠিক পেলুম না। এই তো কয়দিন নামে মাত্র আসা। দুদিন তো না কাজ, না স্নানাহার, না রুগীর খোঁজ খবর। দিল্লীও নয়, লাহোরও নয়, তিনটে স্টেশনের মাথায় কর্ম্মস্থান, এত চিন্তাই বা কিসের। এসেই পিসির জন্যে জরুরি টেলিগ্রাম। মা ঠাকরুণ অসুস্থ নাকি? আমরা কিনে দিয়ে এলুম তবে কার জন্যে! ওঃ, অরুচি নয়তো? না, তা কি ক'রে হবে! এই তো গত আষাঢ়ে বিবাহ করেছেন। যাক্‌—এখন কাজের দিকে ঝুঁকলে যে বাঁচি, কখন কে হঠাৎ inspection-এ এসে পড়বে তার তো ঠিক নেই। তাদের বাজার করতে আসা, আর Travelling Draw প্রধান হলেও আমাদের কাছে তো সেটা inspection—এ সব কথা তো ভাবছেন না, শেষে এই গরীবও যে—

মাণিকলাল সব গুছিয়ে তুলে রাখলে, কেট্‌লিতে এক কাপের মত চাও রাখলে, "কি জানি কি অবস্থায় আসবেন! বাসা থেকে চারটি চাল ডাল আর মশলা সঙ্গে ক'রে বেরিয়েছি, পিসি এলে কাজে লাগবে। কিন্তু হুজুরের অবস্থাটা না জানলে যে আমারও স্বস্তি নেই। শ্রীহরি ওঁর মঙ্গল করুন, আমি বাঁচি। এ যেন মিছে কাজে ঘুরছি আর বিড়ি ধ্বংস করছি। মায়া করে আর কি করবো, একটা ধরানই যাক।"

বিড়িও শেষ, বিনোদেরও প্রবেশ। হাসিমুখে উৎফুল্ল-চিত্তে—"কোথায় হে মাণিকলাল—"

"আজ্ঞে এই যে—"

"বুঝলে !—ভগবানের ভুল ধরে ফিরেছি।"

"সেকি মশাই, পিসিমার খবর পেলেন ?"

"Of course—খবর আবার কি—in body length and breadth পেয়েছি।"

"বাঁচলুম মশাই, আমি শ্রীহরির স্মরণ করছিলুম।"

"করবে বইকি—Thank you—হ্যাঁ এসে গেছেন with এক নাগরি খেজুরে গুড়। বড় ভুল হ'য়ে গেল, খানিকটা রাখলে—মুড়ির সঙ্গে মন্দ হত না। তাঁকে সংসারের কথা খুঁটিয়ে বোঝাতে গিয়ে সব ভুল হয়ে গেল হে। বড় চিন্তায় ছিলুম কিনা—"

"মা ঠাকরুণের অসুখ টসুখ নাকি—তাতো বলেন নি—"

"অসুখ তো বটেই, তবে তাঁর নয়—আমার, I mean সে রোগের ভোগটা আমাকেই ভুগতে হয়।"

"তা তো হয়েই থাকে মশাই, আপনি ছাড়া আর কে ভুগবে! অত ভাববেন না—সেখানে খোদ বড়কর্ত্তা রয়েছেন..."

"তোমাদের সকলেরি ঐ এক কথা! আরে বড় কর্ত্তারাই তো ছোট কর্ত্তাদের মনে প্রাণে বদ হাওয়া সৃষ্টির সদ্দার—"

"সেটা বোধহব সাবধান করবার জন্যে।"

"তাই তো পিসিকে আনালুম হে।"

"বেশ করেছেন। কই তিনি কোথায় ?"

"সে ভারী সুবিধে হয়ে গেছে, তাই তো বলছিলুম—ভগবানের ভুল ধরে ফিরেছি, Quite unexpected—ফস্ ক'রে দয়া ক'রে ফেলেছেন। এমনটাতো করেন না। পিসি প্ল্যাটফরমে পা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তোত্‌লা নন্দ হে, দেখি পোঁটলা নিয়ে ঘুরছে! বললুম, 'কোথা হে ?'...বললে, 'কু-কু-কুটকুটে ও-ও-ওল্ ছেঁচকি আ-আর খেতে পারছি না—সেই কে-কে-কেষ্টা শালার বাড়ী পা-পা-পালাচ্ছি মু-মু-মুখটা বদলাতে, তাই কাঁ-কাঁ-কাঁকড়া কটা কি-নিয়ে যাচ্ছি। রো-রো-রোরবার নি-নিরামিষ খাই কিনা...' কাঁ-কাঁকড়া তো মা-মা-মাছ নয়।"

"বললুম, আমার যদি একটি উপকার কর ভাই, পিসি এই ট্রেণে দেশ থেকে এলেন, নবান্নর একটু গুড় নিয়ে, ওঁকে আমার বাসায় পৌঁছে যদি দাও।"

"gla-gla-gladly sir—আ-আ-আসুন পিসিমা। গা-গা-গাড়ি দাঁ-দাঁড়িয়ে।"

"তাঁদের তুলে দিয়ে আসছি। ভগবানের এতো দয়া কোনদিন পাইনি মাণিকলাল। বাস্ এখন নিশ্চিন্ত—দেখাশোনার দুর্ভাবনা ঘুঁচলো, Time change.—এইবার—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই কথাই সর্ব্বক্ষণ ভাবছি—"

"আমিও কি ভাবছি না মাণিক, সে 'কই মাছ' খেতেই হ'য়েছে। 2nd classটা একবার হয়ে আসি—তারপর—"

মাণিক হতভম্বের মত বললে, "আজ্ঞে কলেরার কথা যে রয়েছে হুজুর।"

"আহা সে জন্যে ভেবনা—সে তো আছেই এবং থাকবে, —ও হাত লাগিয়েছি কি সাফ্। সেও তার কাজ করতে এসেছে, একটু করুক্ না। কাকেও বাধা দিতে নেই হে।"

"আজ্ঞে হাতটা লাগান তো। কি জানি কখন কে বাজার করতে এসে পড়বে, তারপর একটা খুঁত ধরে খোশনাম নেবে..."

একটু চিন্তিতভাবে—"কদিন অপার চিন্তায় কেটেছে মাণিক, আজকের দিনটে সামলে নিতে দাও, একবার চিন্তা মন্দিরটে ঘুরে plan ঠিক ক'রে আসি। এখন আর চা—"

"এই যে নিন না।" কেট্‌লি আর কাপ হাজির ক'রে দিলে।

বিনোদ অবাক! "তোমাকে পেয়ে—"

"আগে হয়ে আসুন"—মাণিক আর দাঁড়াল না।

বিনোদ চিন্তা-মন্দিরে পা বাড়ালো। মাণিকের যাতে ভালো হয় তা করতেই হবে। মা ক'রে দেবেন। অমন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বিরল।"

মাণিকলাল উদাসভাবে—"শ্রীহরি দয়া করুন, ডাক্তারবাবু বড় সরল প্রাণের লোক, সব বোঝেন, কিন্তু কথা পেলে সময়জ্ঞান থাকে না—একেবারে মহাভারত সৃষ্টি করেন—মহাপ্রস্থানে না নিয়ে গিয়ে ফেলেন। বড়দের কখন কে পরের মুণ্ডে কমলালেবু নিতে আসবেন সে চিন্তা থাকে না। আমাদের এ ইমামবাড়ার পাশ দিয়ে গেলেও কেউ বুঝতে পারবেনা যে ডাক্তারবাবু এইখানে থাকেন। সিনেমার

দুখানা প্ল্যাকার্ড জুটিয়েছি, ওঁর নামটা লিখে বাইরে টাঙিয়ে রাখি।"

লিখতে বসলো :

Dr. Benodebehari Chakravarty
Medical Officer In charge
Cholera Camp.

একখানা ইংরিজি, একখানা হিন্দী।

"তাই তো, হিন্দীর 'হ'টা যে ভুলে যাচ্ছি। থাক—হরপের ভিড়ের মধ্যে অত কেউ দেখবে না। অনেকেই আমার মতো পণ্ডিত।"

"মনেরি বাসনা শ্যামা"—"কি হে মাণিক, কি পড়ছ, সমন নাকি!"

"আজ্ঞে না, ও একটা আপ্তসার ক'রে রাখছি, কখন কোন্ সুলতানের আবির্ভাব হবে, ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে পাবে না, তাই।"

"তুমি 'কিন্তু' হচ্ছ কেনো। সে অপরাধ তো আমার। তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিলো? বৈরাগ্য পেয়েছিলো। ভাগ্যে পিসি এসে গেছেন। এখন অট্টালিকা কে আটকায়! এ বাসায় তিনটি ছাড়া চারটি কাজ চলে না মাণিক। No one—পাগল হওয়া যায়, No two গলায় দড়ি চলে, No three সর্পাঘাত—finish দেখ না মাথা-মুড়্ খুঁড়ে "কই" মেলবার plan brain-এ আসছিলো না। যেই স্নান সেরে 2nd classএর গদাধরদের গদ্দিতে বসা, অমনি পিল্ পিল্ ক'রে plan মায় এণ্ডাবাচ্ছা মাথায় ঢুকে পড়লো, ওই সব গদ্দিতে বসে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরা লোকের শুভ চিন্তায় ধ্যানস্থ থাকেন কিনা! আমার চারদিকে "কই" যেন লাফাতে লাগলো। এইবার নাওনা কত কই চাই।"

মাণিক স্তম্ভিত। "আর কলেরা! আপনি যে একবারও সে কথা…"

"আরে তিনি তো আছেনই, তাঁর দৌলতেই সব মিলবে। সাধনা একমুখী, ওইটে নিয়েই ছিলুম কিনা—"

"চাকরি থাকলে তো! কিছু বুঝতে পারছি না মশাই!"

"পারবে পারবে—অচিরেই পারবে। মিথ্যা থাকতে চাকরির মার নেই। দেখচ না দুনিয়া চলেছে কার জোরে। এখন একটা কাজ করো দেখি।—এতো কই supply করছে কে? কেমন লোক? একখানা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি officer commandingএর নামে। লোকটাকে I mean, contractor টাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস—mind—ফিরিয়ে নিয়ে আসা চাই। দ্বিতীয় কেউ না দেখে শোনে—বুঝলে? তারপর, কলেরা, সে তো হাত লাগালেই সাফ্, বুঝেছ? বেটারা আমাকে Expert ধরেছে, সেটা দেখাতে হবে তো!"

"হুজুরের কাছে মিথ্যে কথা কইবনা, বুঝতে কিছুই পারছি না। তবে আপনি যা বলবেন তাই করবো। বাড়িতে খুড়ো-মশাই আছেন—উদিকে সব গেলো, তিনিই দেখা শোনা করছেন। আমার শুভানুধ্যায়ী কিনা, পুকুরটা গেছে, এইবার কুঁড়েখানা। ভেবেছিলুম, ফিরে যা হয় করবো। তা আর—"

অবাক হয়ে—"অ্যাঁ, তোমারো শুভানুধ্যায়ী জুটেছে? দেশটা ছেয়ে গেল যে! কিছু ভেবনা মাণিক, মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিও।"

"ব্রহ্ম বাক্যে আমার বিশ্বাস আছে মশাই, কিন্তু চিঠি পেলুম—সাত বছরের ছেলেটা নিজের পুকুরে আঁচাতে গিয়ে তাঁর চড় খেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী ঢুকেছে। কে আর দেখবে, খুড়ো দেশে থাকেন, ভিটে আগলান, সকলেই তাঁরি মুখ চেয়ে কথা কয়, ··কইবেই তো—"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ভেবনা দুটো মাস অপেক্ষা কর—এখন যা বললুম···মা আছেন—"

"আর আপনি আমার আছেন।—দিন কি দেবেন।"

"একখানা কাগজ দাও দিকি। বেশ করে একটা জবর report draft করে ফেলি।"

"Report কিসের মশাই?"

"আরে—কই মাছ কি আপনি পুকুর থেকে লাফিয়ে এসে ঝোলে পড়বে নাকি? কাগজ দাও—"

"কাগজ কোথায় পাব মশাই! আপনি যে বললেন—তারা প্রমোসন্ পেয়ে টাকা হতে যাচ্ছে—"

"আরে সেই কলচেটা আছে তো।"

"ওঃ, সেই কলচেটা? আপনি যে বলছিলেন, ওতে একটা ছাপ মারলেই লাখ টাকাও হয়।"

"সে কি তুমি মারলে হবে, না আমি মারলে হবে! হবে না কেনো···শ্রীধর হবে।"

"আমার কাজ নেই মশাই লাক্ টাকায়।" কলচেটা এনে দিলে। ডাক্তার লেখায় মন দিলেন:

Commanding Officer of Resting Regiment:

Honourable revered Sir, The Demon of a fish contractor is playing havoc and spreading cholera daily in hundreds. The fish by name Koi is a dangerous creature. They live on filth and dirt in dirty ponds. Busty men and women wash the rags of infected patients in these infernal ponds and poison the water. Koi flourish fast by devouring the dirt and fetch high prices from market. Unless and until it is checked no Solomon can check the spread of cholera here. The whole locality will be cholera-ridden in no time. I am in wits end, particularly for safety of your Regiment and solicit your kind order and help to stop the sale of those hellish koi fish.

Your most obedient servant
Benode Chakravarty
The responsible Doctor in
charge of cholera calamity.

মাণিককে শোনালেন। সে বললে, "শুনেছি কাবুলী শম্ভু মুখুয্যে মশাই নাকি এই styleএ লিখতেন। আপনি Editor হননি কেন?"

"সে অনেক কথা, অন্য সময় বলব।"

মাণিক বললে, "মাপ করবেন হুজুর, এতে "কইয়ের" কিন্তু গয়া হয়ে যাবে যে, সে ফল্গুতে ডুব মারবে।"

"সেই কথাই ভাবছি—কলম ধরলে যে জ্ঞান থাকে না।"

"কিন্তু একবার হাত কেটে ফেললে যে আর জোড়বার রাস্তা রইবে না হুজুর। আমাদের accacio কাজ দেবে কি?"

বিনোদ সহাস্তে—"Thank you মাণিক—পর হস্তে নিয়ে পড়া হবে—"পরবশম্ দুঃখম্"। ওটা এখন থাক। ও একটা ব্রহ্মাস্ত্র বানিয়ে রাখলুম হে আপৎকালের জন্যে। এখন ছাড়ব না।"

"তাই বলুন।"

"এখন একটা নোটিস (Notice) লিখে দিচ্ছি—(সে ক্ষমতা আমার আছে) তুমি তাকে অর্থাৎ সপ্লায়ারকে পড়ে শোনাবে। কলেরা ক্ষেত্রে 'কই' সেলের বিক্রির মানে যে জেল, সেটা বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য গোপনে, শুভানুধ্যায়ীর মতো। আর বলতে হবে?"

"আজ্ঞে না, মেয়ের বিয়ে তো নয়, অতো গাইগোত্র দরকার হবে না।"

"কিন্তু আসল কথাটা জেনে আসতে হবে, বুঝ্‌লে?"

"আজ্ঞে সেটা কি আর বলে দিতে হয়, ইঁদুর বললে তার ল্যাজটা ভুলতে পারি কি?"

"All right" বলে Notice লিখে দস্তখত ডাললেন—"V. Chakar—"

"V লিখলেন যে?"

"Vএ Victory কাগজ পড়না ওই তো দোষ। V এখন গাছে ঝোলে, Lightএ জ্বলে, মাটি মাড়ায় না। ওর মর্য্যাদা কতো! যাও, এখন তোমার 'হরি' বলে' বেরিয়ে পড়। কাল আর মুড়ি চিবুতে হবে না। মাড়ি রেহাই পাবে।"

মাণিক বেরিয়ে পড়ল।

"তাই তো এখন কি করি। মাণিক না থাকলে আমার একদণ্ড চলে না। বিড়ি খেতে মাণিক বারণ করে। বলে, ওটা আপনার positionএর opposition। আরে সাধে কি খাই! pocket যে vacate—করে ফেলেছি, ধোঁযার ঘূর্ণগতি দেখাই ভাল। শেষ সকলেরি ভাগ্য ধোঁা ছাড়ে। তখন নিজেরটা তো দেখতে পাব না।"

(ক্রমশঃ)

গীতার কথা

শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায়

(২)

৭। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ

দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিভূতি সকলের কথা এবং শ্রীভগবান্‌ যে তাঁহার একটী অংশেই এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই কথাটিও শুনিয়া অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি শ্রীভগবান্‌কে ঐ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীভগবান্‌ তাঁহার প্রার্থনা স্বীকার করিলেন এবং বিশ্বরূপ দেখার সামর্থ্য লাভের জন্য তাঁহাকে দিব্য চক্ষুও দিলেন। একাদশ অধ্যায় সমস্তই বিশ্বরূপের বর্ণনায় পূর্ণ। এই বর্ণনার কিয়দংশ শ্রীভগবান্‌ নিজেই করিয়াছেন, কিয়দংশ সঞ্জয় করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট অর্জ্জুন স্তুতিপূর্ণ বাক্য দ্বারা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ তাঁহার বিশ্বরূপের মধ্যে দেবলোকের দেবতাগণকে এবং মনুষ্যলোকের চরাচর সমস্ত জগৎ একত্রস্থিত দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনকে যুদ্ধের ফল দেখাইবার জন্য সংহার মূর্ত্তিও ধারণ করিয়াছিলেন। ফলে সেই বিশ্বরূপের মধ্যে সৌম্যমূর্ত্তি ও উগ্রমূর্ত্তি উভয়ই ছিল। শ্রীভগবান্‌ যখন এই বিশ্বটা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তখন এই বিশ্বটাই তাঁহার আংশিক রূপ। আমরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা বিশ্বটা দেখিলে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি এবং কতকটা কল্পনা করিতে পারি শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ কি? শ্রীভগবান্‌ ছাড়া যখন কিছুই নাই তখন সমস্তই তাঁহার রূপ। এই রূপ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায়, ততই তাঁহার বিষয় উপলব্ধি হইতে থাকে। এই রূপের মধ্যে সৌম্যমূর্ত্তিও আছে, রুদ্রমূর্ত্তিও আছে। প্রকৃতির নানাবিধ কার্য্যে যথা ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে, অগ্নিদাহে, সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে, আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি নির্গমনে, প্রবল বায়ু প্রবাহে, মেঘ-গর্জ্জনে ইত্যাদি বিষয়ে এবং যুদ্ধ বিগ্রহেও শ্রীভগবানের সংহার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে রাখা আবশ্যক যে এ সকল ভগবানের নির্দ্দয়তার পরিচায়ক নহে। তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার অমঙ্গল হইতেই পারে না। এ সমস্তই আমাদেরই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কর্ম্মের ফল। তাহাতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা রহিয়াছে, কারণ শ্রীভগবানের দ্বেষ্য কেহ নাই। অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখা ঘটে নাই। শ্রীভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের অনন্য ভক্তি ইহার কারণ শ্রীভগবান্‌ নিজেই বলিয়াছেন। সে ভক্তি কিরূপ? অর্জ্জুন নাক টিপিয়া বসিয়া সমস্ত দিবারাত্র তাঁহার চিন্তা করিতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল ছিল। তিনি ভিতরে বাহিরে সমান ছিলেন। কর্ত্তব্য পালনের জন্য তিনি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহার সমস্ত আত্মীয় স্বজনের নাশের ও ধর্ম্ম লোপের কারণ। অতএব তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়াই তিনি ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কোন প্রকার লোভ বা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় আদৌ ছিল না। ইহাই প্রকৃত ভক্তি। তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই প্রথমে শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছিল এবং শ্রীভগবান তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলে তিনি শ্রীভগবানের উপদেশানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

৮। শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত নামাবলী ও গুণ।

সৃষ্টির বিষয় জানিতে হইলে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌কে জানা প্রথম আবশ্যক। কিন্তু তিনি অনন্ত, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব। তথাপি যতদূর সম্ভব তাঁহাকে জানার চেষ্টা করা উচিত। শ্রীভগবানের নামাবলী মনোনিবেশ করিয়া বারংবার চিন্তা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়।

১। অচ্যুত—ভগবান্‌ স্বরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার অর্থাৎ কোন কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদি বিকারযুক্ত করিতে পারে না।

২। অরিসূদন—শত্রুবিমর্দ্দন।

৩। কৃষ্ণ—কৃষ = উৎপত্তি বা সত্তা + ন = নিবৃত্তি বা আনন্দ। যিনি জন্মজন্মান্তর নিবারণ কর্ত্তা অথবা যিনি নিত্য সত্তায় চির বিদ্যমান্‌ অথবা যিনি জীবের সমস্ত পাপ দুঃখ হরণ করেন সেই ভক্তদুঃখ বিনাশ-কারীই কৃষ্ণ।

৪। কেশব—ক = ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ = সংহর্ত্তা, এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহপাত্র বোধে যিনি জগতের রক্ষক—স্থিতিকারকরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই কেশব। ক্ষয়োদয়রূপ বিকারের অস্থিরতার শান্তিকারক। অথবা ক = ব্রহ্মা, অ = বিষ্ণু, ঈশ = শিব—এই তিন যাঁহার ব = বপু অর্থাৎ স্বরূপ, তিনিই কেশব, পুরুষোত্তম বা ব্রহ্ম।

৫। কেশিনিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় কেশী নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন এইজন্য তাঁহার এই নাম।

৬। গোবিন্দ—ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। অথবা গরু বা পৃথিবীর পালক।

৭। জনার্দ্দন—নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে তাঁহার নাম জনার্দ্দন। অথবা জন্মজন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন, তিনি জনার্দ্দন।

৮। মধুসূদন—মধু নামক দৈত্যহন্তা।

৯। মাধব—মা = লক্ষ্মী, ধব = পতি—লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ।

১০। ভগবান্‌—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ছয়টীকে 'ভগ' বলে। যিনি এই ষড়্‌গুণসম্পন্ন তিনিই ভগবান্‌।

১১। যাদব—যদুবংশসম্ভূত।

১২। বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশসম্ভূত।

১৩। বাসুদেব—যিনি সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন এবং যিনি সর্ব্বভূতে বাস করেন, তিনিই বাসুদেব, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম। ইনিই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ইনিই লীলাবশে ব্যক্ত স্বরূপে বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

১৪। বিষ্ণু—সত্ত্বগুণময় সর্ব্বব্যাপী ভগবান্।

১৫। হরি—দুঃখনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ।

১৬। হৃষীকেশ—হৃষীক=ইন্দ্রিয়, ঈশ=নিবারণকর্ত্তা—সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ।

গীতায় শ্রীভগবানের গুণবাচক শব্দাবলী

অজ, অক্ষর, পরম অক্ষর, পরম পবিত্র, পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত পুরুষ, সনাতন পুরুষ, পুরুষোত্তম, আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম, সর্ব্বগত ব্রহ্ম, বেত্তা, বেদ্য।

কিরীটী, গদী, চক্রহস্ত, কমলপত্রাক্ষ, চতুর্ভুজ, মহাবাহু, সহস্রবাহু, অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম, অপ্রতিম প্রভাব, বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বতোমুখ, অনন্ত, অনন্তরূপ, সর্ব্ব, স্বপ্রকাশ, অপ্রমেয়।

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, ব্রহ্মার ও আদিকর্ত্তা, প্রপিতামহ, দেব, দেবদেব, আদিদেব, দেববর, দেবেশ, যোগী, যোগেশ্বর, মহাযোগেশ্বর, জগৎগুরু, গরীয়ান্ গুরু, ঈড্য, পূজ্য, প্রভু, বিভু, ভূতভাবন, মহাত্মন্, চরাচর লোকপিতা, জগৎপতি, জগন্নিবাস, ঈশ, ভূতেশ, ঈশ্বর, মহেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর, পরম ধাম, বিশ্বের পরম নিধান, শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা।

৯। অর্জ্জুনের গীতোক্ত নামাবলী ও গুণ

—অর্জ্জুন, পাণ্ডব, পার্থ, কৌন্তেয়।

—কুরুনন্দন, কুরুসত্তম, কুরুশ্রেষ্ঠ, কুরুপ্রবীর

—ভারত, ভরতসত্তম, ভরতশ্রেষ্ঠ, ভরতর্ষভ

—পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষর্ষভ, দেহভৃতাম্বর।

—মহাবাহু, ধনুর্দ্ধর, সব্যসাচী, কপিধ্বজ, পরন্তপ

—গুড়াকেশ, ধনঞ্জয়, অনসূয়, অনঘ।

—প্রিয়, প্রিয়মান, দৃঢ়ইষ্ট, তাত।

অর্জ্জুনের নামাবলী ও সম্বোধন পদ হইতে কিঞ্চিৎ জানা যায় তাঁহার কতগুণ ছিল। তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল যে তাঁহার অসূয়া (দোষ দৃষ্টি) আদৌ ছিল না। এই জন্যই শ্রীভগবান তাঁহাকে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য ভক্তি তত্ত্বের কথা বলিয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহার গুণরাশি ব্যক্ত করা হয় যে তিনি 'অনঘ' (নিষ্পাপ) ছিলেন। ইহার অর্থ ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি যে ২।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে যাহাদিগকে বধ করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা সম্মুখে রহিয়াছেন। এইরূপ উদার কথা কি কেহ আর কখন বলিয়াছে? এরূপ ক্ষমার উদাহরণ আর কি কোথায়ও দেখা যায়? ইহাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। এই জন্যই শ্রীভগবান্ কেবল তাঁহাকেই বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন।

১০। অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও প্রার্থনা

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও প্রার্থনার আলোচনা সম্যক্‌রূপে করিলে গীতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রার্থনার উত্তরই সমস্ত গীতা। এই প্রার্থনার ফলেই সমগ্র মানব অশেষ কল্যাণকর এই গীতাশাস্ত্র লাভ করিয়াছে।

(১) যুদ্ধ করা বা না করা আমার পক্ষে কোন্‌টা মঙ্গলকর তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য। আমাকে শিক্ষা দাও। ২।৭ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য একথা ভগবান্ পূর্ব্বে বলিলেও অর্জ্জুনের পুনরায় এ প্রশ্ন করার অর্থ এই যে, সেকথা তাঁহার মনে লাগিতেছিল না। তাই তিনি শরণাগত শিষ্য ও শিক্ষার্থী হইয়া নিশ্চয় করিয়া বলার কথা বলিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সমত্ব বুদ্ধির সহিত নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করিলে ইহার ফলাফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে না, ইহা হইতেই বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। ইহাই অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

(২) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? ২।৫৪

বুদ্ধি বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত না হইলে কোন কর্ম্মই ঠিক হয় না। সেই বুদ্ধি কিরূপে বিশুদ্ধ হয় তাহা এই প্রশ্নের উত্তরে ১৮টী শ্লোকে বলা হইয়াছে। ২।৫৫-৭২

অর্জ্জুন কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন।

(৩) কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি যদি ভাল হয় তাহা হইলে আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্ম করিতে কেন বলিতেছ? ৩।১-২

ইহাও বুঝাইয়া দিলে অর্জ্জুন তাঁহার চতুর্থ প্রশ্নে পাপ প্রবৃত্তির হেতু কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

(৪) কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোকে পাপ করে, অর্থাৎ পাপের উৎপত্তি কিরূপে হয়? ৩।৩৬

ভগবান বিশদরূপে দেখাইয়া দিলেন যে, কমই (বিষয় বাসনাই) পাপ প্রবৃত্তির একমাত্র হেতু। এই পরম শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় আত্মনিষ্ঠ বা শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহাতে যুক্ত হওয়া। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই তাহা সম্ভব। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথাই ভগবান বিবস্বানকে বলিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়াই অর্জ্জুনের পঞ্চম প্রশ্ন।

(৫) তোমার জন্ম সেদিন আর বিবস্বানের জন্ম বহু পূর্ব্বে। কি করিয়া জানিব যে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিয়াছিলে? ৪।৪

ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মনে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা দোষের কথা, সরলভাবে সন্দেহ দূর করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে আবার অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ষষ্ঠ প্রশ্ন করিলেন।

(৬) একবার কর্ম্মত্যাগের কথা আবার কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছ। ইহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ৫।১

ইহার উত্তরে ভগবান্ বুঝাইয়া দিলেন যে, ফলে দুই এক, কেবল নামেই পার্থক্য। মন স্থির করিতে না পারিলে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায় না। অতএব মন স্থির কিরূপে হইতে পারে তাহাই অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্ন।

(৭) সমতারূপ যোগের যে কথা বলিলে, মনের চঞ্চলতার জন্য ইহার স্থিরতা দেখিতেছি না। মন স্থির কি করিয়া হয়? ৬৷৩৩

ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, ইহা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই হইতে পারে। বিষয়ের প্রতি অনুরাগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া চঞ্চল মনকে কেবল ভগবানেই নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধ্যানযোগ। ইহা হইতেই অর্জ্জুনের অষ্টম প্রশ্ন হইল।

(৮) শ্রদ্ধাযুক্ত যদি যোগভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার কিগতি হয়? ৬৷৩৭৷৩৯

এ কথার উত্তর দিয়া সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন ভগবান্‌কে কিরূপে জানা যায় তাহা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্পূর্ণরূপে সপ্তম অধ্যায়ে বলিলেন। ভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ এই সকল তত্ত্ব জানিতে হয়। এ গুলি কি তাহাই অর্জ্জুনের নবম প্রশ্ন।

(৯) ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি? অধিযজ্ঞই বা কি ও কে এবং এ এই দেহে কি প্রকারে অবস্থিত? মৃত্যুকালে তোমাকে কিরূপে মনে করা যায়? ৮৷১—২

এই তত্ত্বগুলি কি তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বুঝাইয়া দিয়া সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, যাহারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভগবান্‌কে লাভ করার তিনটি উপায় ৮৷৯-১০, ৮৷১১-১৩, ও ৮৷১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ভক্তির দ্বারা কি প্রকারে ভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করা যায় তাহা নবম অধ্যায়ে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। এই ভক্তিপথের কথা শুনিয়া ভগবানের বিভূতির কথা অর্জ্জুনের জানার ইচ্ছা হইল এবং তিনি এই প্রার্থনা দশম সংখ্যায় ভগবান্‌কে জানাইলেন।

(১০) তোমার আত্মবিভূতির কথা শেষ না রাখিয়া আমাকে বল। ১০৷১৬-১৮

দশম অধ্যায়ে ভগবান্ আত্ম-বিভূতির কথা বলিয়াছেন। ভগবানের আত্মবিভূতির কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হইল এবং সেই প্রার্থনা একাদশ সংখ্যায় জানাইলেন এবং ভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

(১১) আমি যদি তোমার বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য হই তাহা হইলে তোমার বিশ্বরূপ আমাকে দেখাও।১১৷৩—৪। বিশ্বরূপে সৌম্যমূর্ত্তি ও উগ্রমূর্ত্তি দুই ছিল। ঐ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের দ্বাদশ প্রশ্ন।

(১২) উগ্ররূপধারী তুমি কে আমাকে বল। হে দেববর, তোমার পায়ে পড়ি, প্রসন্ন হও। আমি তোমার প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিতেছি না। ১১৷৩১

নির্ম্মল চরিত্রের জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার সকল প্রার্থনাই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবানের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন যে, সখা মনে করিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা ভাল হয় নাই। আবার ভগবানের দেবমূর্ত্তি দেখার ইচ্ছা ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশ করিলেন।

(১৩) তোমাকে সখা মনে করিয়া আমি সবিনয়ে তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমার এ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আবার তোমার সেই দেবরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ১১৷৪১—৪৬

সে প্রার্থনাও ভগবান্ স্বীকার করিলেন এবং স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই তিনি এই প্রকারে জ্ঞাত হইতে, দৃষ্ট হইতে ও প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ১১৷৫৪। অনন্য ভক্তি কিরূপে করিতে হয় তাহা ভগবান্ ১১৷৫৫ শ্লোকে বলিয়াছিলেন। ইহার পরেই ভক্তিযোগের কথা লইয়া অর্জ্জুনের চতুর্দ্দশ প্রশ্ন।

(১৪) সততযুক্ত হইয়া যে ভক্তেরা তোমার উপাসনা না করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্তের চিন্তা করে অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তা করে—ইহাদের মধ্যে যোগবিত্তম কে? ১২৷১

সৃষ্টি তত্ত্বের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি আসিতে পারে না। এইজন্য পঞ্চদশ প্রশ্ন।

(১৫) প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সকলের তত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। ১৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ প্রকৃতির গুণ কিরূপে কার্য্য করে এবং জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা বুঝাইয়া ছিলেন। ইহা হইতেই অর্জ্জুনের ষোড়শ প্রশ্ন।

(১৬) ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি এবং ত্রিগুণাতীত কি প্রকারে হওয়া যায়? ১৪৷২১

ইহার উত্তর ভগবান্ চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে দিলেন। অবশেষে বলিলেন যে, কেবল নিজের বিচারের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। শাস্ত্রবিধিও দেখা আবশ্যক। ইহার পরই শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সপ্তদশ প্রশ্ন।

(১৭) যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করে তাহার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক? ১৭৷১

ইহার উত্তর সপ্তদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস ও ত্যাগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের অষ্টাদশ প্রশ্ন।

(১৮) সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য কি? ১৮৷১

এই প্রশ্নের উত্তর ও গীতার সারকথা অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ত্যাগই গীতার সার কথা। পরমহংসদেব বলিতেন, 'গীতা' কথাটা বার বার বলিলে উহা 'ত্যাগী' হইয়া পড়ে। এই ত্যাগই গীতার সার কথা।

প্রথম প্রার্থনার উত্তরেই সমস্ত গীতা। অর্জ্জুনকে প্রথম কর্ম্মযোগের কথা বলা হইয়াছে। তাহা হইতেই জ্ঞানের কথা আসিয়াছে। বুদ্ধি স্থির না হইলে জ্ঞান হয় না, আবার মন স্থির না হইলে বুদ্ধি স্থির হয় না। ভগবৎ চিন্তাই এই মন স্থির করার প্রধান উপায়। ভগবৎ চিন্তার দ্বারা মন স্থির হইলেই ভক্তি আসে। জ্ঞান বিজ্ঞান যোগে ও অক্ষর-ব্রহ্ম যোগে

ভগবানের সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেরই বর্ণনা শুনিয়া এবং নবম অধ্যায়ে ভক্তিযোগের কথা শুনিয়া ভগবানের বিভূতিসকল অর্জ্জুনের জানার ইচ্ছা হইয়াছিল। বিভূতির কথা শুনিয়া বিশ্বরূপ দেখার ইচ্ছা হইয়াছিল। বিশ্বরূপ দেখার পর ভক্তের লক্ষণ এবং তাহার পর সৃষ্টি তত্ত্বের কথা—এই সকল জানার পর কর্ম্ম দ্বারাই যে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায় তাহা বলা হইয়াছে। সেই কর্ম্ম কি, তাহা কিরূপে করা হয়, কিরূপ সাধনার দ্বারা 'মানুষ' হইতে পারে এই সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া ভগবান গীতার উপসংহার করিয়াছেন। অর্জ্জুনের এই সকল প্রশ্নের ফলে আমাদের গীতাশাস্ত্র লাভ। একটা কথা আছে 'চাকের মধু মিষ্টি কি হইত, মৌমাছিতে পোঁচা যদি না দিত।' সেইরূপ গীতা সম্বন্ধেও বলা আছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন। পার্থোবৎস সুধী-র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" অর্জ্জুন প্রশ্ন দ্বারা এই অমৃত বাহির করিয়াছেন। এ অমৃত শেষ হইবার নহে। লোকে এতকাল পান করিয়াছে, এখনও করিতেছে এবং চিরকাল করিবে।

ফুলধনু

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম্‌-এ

তৃতীয় দৃশ্য

ঊর্মিলার বাড়ীর বৈঠকখানা। বৃন্দাবন একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছেন, রবি প্রবেশ করল।

বৃন্দা। কাকে চান?

রবি। আমি শ্রীমতী রচনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বৃন্দা। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

রবি। আমি ক্যালকাটা কলেজ হোষ্টেল থেকে আসছি।

বৃন্দা। ও, আমাদের রচনার কলেজ?

রবি। হাঁ।

বৃন্দা। দেখুন, এ সব আমি ভালবাসি না, মোটেই ভালবাসি না। ছেলেমেয়েদের এতটা ফ্রি মিক্সিং আমি পছন্দ করি না। আপনি কি পড়েন?

রবি। আমি এবার বি-এস সি দেব।

বৃন্দা। তা ওতো এবার আই-এস সি দিয়েছে, তাছাড়া ওদের ক্লাস হয় আলাদা, আপনাদের আলাপ হল কি করে? এ সব বড়ই দুঃখের কথা, অত্যন্ত নিন্দনীয় কথা। জানেন, এর থেকে ব্যাপার কতদূর গড়াতে পারে, জানেন আপনি?

রবি। আপনি কি বল্‌ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

বৃন্দা। শুধু আপনাকে লক্ষ্য করেই আমি বলছি না, বলছি যে এই সব ছেলেমেয়েদের হল কি! এর সূত্রপাত অতি সামান্য ভাবে হয় বটে, কিন্তু এর শেষ পুলিস পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা জানেন? কথাটা ফাঁকা নয়, আজ পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় এ কথা বলছি জানবেন পুলিসের কাজ বুঝেছেন, লোক দেখে দেখে চোখ খারাপ হয়ে গেল।

রবি। আমি বলছিলুম—

বৃন্দা। আপনি আর বলবেন কি, বলবার এতে কিছু নেই। কিছু বলে এর গুরুত্ব কমাতে পারবেন না। এ বিশেষ চিন্তার কথা, অর্থাৎ এ বিষয়ে বহু চিন্তা করা হয়েছে, তারপর বলা হচ্ছে। তারপর শুধু আমি একাই চিন্তা করিনি, ধরুন, বহু বিদ্বান ও বিবেচক লোক এ সম্বন্ধে চিন্তা করে যা বলেছেন, তা তো আর মিথ্যা হতে পারে না।

রবি। তাহলে আসি আমি।

বৃন্দা। হাঁ আসুন। তার আগে একবার না হয় চন্দুর—হাঁ রচনার সঙ্গে দেখা করেই যান। ওর শীগ্‌গির বিয়ে হচ্ছে। যথাসময়ে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যে অতি প্রয়োজনীয় কাজ, তা আমি জানি; তাহলেও পড়াশোনা করতে চাইলে এবং পড়াশোনাতে ও বরাবর ভালই ছিল, সেইজন্যে এতটা দেরী হল এবং তারই জন্যে বোধ করি, আপনাদের মত দু'একজনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়েছে।

বাহিরে থেকে কে ডাকলে, অপূর্ব, অপূর্ব!

রবি। (অতি বিস্ময়ে) কে?

বৃন্দা। কে? (শশব্যস্তে উঠে গিয়ে দরজার বাইরে গোলোককে দেখে) তুমি! গোলোক! এস এস ভাই এস। কখন পৌঁছলে?

গোলোকের প্রবেশ

গোলোক। (হঠাৎ রবির দিকে নজর পড়াতে) অ্যাঁ, তুই এখানে যে রে!

রবি প্রণাম করলে

এঁকে প্রণাম করেছিস্? (রবির বৃন্দাবনকে প্রণাম) বৃন্দাবন, এটি আমার ছেলে—তুমি চিন্‌লে কি কোরে আশ্চর্য্য!

বৃন্দা। (প্রায় স্তম্ভিত) অ্যাঁ, বল কি! আমি তো বিন্দুবিসর্গ জানিনা। কি আনন্দের কথা, কি আনন্দের কথা! (জোর গলায়) অপূর্ব, অপূর্ব! উর্মিলা! দাঁড়াও ভাই, খবরটা দিয়ে আসি।

প্রস্থান

গোলোক। আমার বন্ধু বৃন্দাবনবাবু, একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। তুই চিনলি কি করে? বড় ভালমানুষ, ওঁর মেয়েটির সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চান।

রবি। (আকাশ থেকে পড়ে গিয়ে) আমার!

গেলোক। হাঁ।

রবি। তার সম্বন্ধ হয়ে গেছে না?

গোলোক। কে বল্‌লে? আমাকে দেখবার জন্যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, আর সম্বন্ধ হয়ে গেছে! এঁদের সঙ্গে তোর চেনাশোনা আছে নাকি?

রবি। না।

বৃন্দা। (কথা কইতে কইতে প্রবেশ) এস এস, দেখ।

অপূর্ব ও উর্মিলার প্রবেশ

ভায়া আমার একেবারে ছেলেকে নিয়ে—কি নামটি বল্‌লে গোলোক?

গোলোক। রবি।

বৃন্দা। হাঁ হাঁ রবি। কি আনন্দের কথা বলতো, কি আনন্দের কথা!

অপূর্ব। আপনি কবে বাড়ী থেকে এলেন?

গোলোক। স্টেশন থেকে সটান এখানে আসছি।

উর্মিলা। তাহলে তো খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি?

বৃন্দা। মায়ের আমার ঠিক নজর পড়েছে। তা তো বটে, তা তো বটে। খাবার টাবার দাও। বিশ্রাম কর ভাই আগে, তারপর সব।

গোলোক। খেয়ে দেয়েই তো বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, তার জন্যে চিন্তা নেই।

বৃন্দা। তাহলেও একটু খাবার—

গোলোক। খাবার টাবার থাক এখন, একটু চা হলেই হবে।

অপূর্ব। (রবির প্রতি হাসিমুখে) আপনাকেও একটু চা দিব?

উর্মিলা। চা খান তো?

রবি সলজ্জভাবে হাসল

বৃন্দা। নিশ্চয় নিশ্চয়, দাও।

উর্মিলার প্রস্থান

গোলোক। বৃন্দাবন, তুমি কবে পৌছলে?

বৃন্দা। কাল এসেছি ভাই। বাড়ী থেকে বেরোবার কি জো আছে, যে পেসেণ্টের ভিড়!

গোলোক। সে কি! বাড়ীতে কি অসুখ বিসুখ নাকি?

বৃন্দা। (হেসে ফেলে) না না, তা নয় ভায়া, তা নয়, সামান্য সামান্য ডাক্তারী করছি।

গোলোক। ডাক্তারী করছ? কিসের ডাক্তারী?

বৃন্দা। হোমিওপ্যাথি বড় ভাল জিনিস বুঝেছ, তবে আগে থেকে করলেই হত, এতটা বয়েসে আর ভাল করে মনঃসংযোগ করতে পারি না, পাঁচ দিকে পাঁচটা ক্যাচাং। তুমি কি করছ?

গোলোক। আমি 'রোপক' বলে একটা ওষুধের প্রচার করছি, মাদুলিতে ধারণ করতে হয়। যত বড় এবং যত ছোট এবং যে কোন রকমেরই পেটের অসুখ হোক না কেন, রোপক একেবারে অব্যর্থ।

বৃন্দা। হুঁ, আমাদের নাক্সভমিকা থারটি যা আর কি। মহামূল্য জিনিস বুঝেছ। সারা মেডিক্যাল ওয়ার্লড্ ঘুরলেও এমন দ্বিতীয়টি পাবে না।

অপূর্ব এসে রবিকে আস্তে আস্তে কি বলতে রবি উঠে দাঁড়াল

কোথা যাচ্ছ?

অপূর্ব। এই পাশের ঘরে একটু গল্প করি।

গোলোক। আমরা বুঝি গল্পে বাধা দিচ্ছি? নিজেদের কথাতেই মত্ত, তোমাদের ফাঁক দিচ্ছি না, কি বল?

হাসতে লাগলেন

বৃন্দা। দেখ অপূর্ব, মা যেন আমাকেও একটু চা দেন, বলে দাও।

অপূর্ব। আচ্ছা, বলে দিচ্ছি।

বৃন্দা। মার আমার কোন কিছুতে কার্পণ্য নেই; উপরন্তু এটা খান, ওটা খান করে অস্থির, শুধু চা দিতে হলেই কিন্তু—কিন্তু।

গোলোক। সে চা-টা অধিকন্তু নিশ্চয়।

বৃন্দা। হাঁ, তা ঠিক।

গোলোক। তাহলে ভালই করেন, অভ্যেসটা কমান উচিত ভাই।

বৃন্দা। হু, রচনার বিয়েটা হয়ে গেলে দু কাপে দাঁড় করাব ভাবছি।

গোলোক। ভালই ভেবেছ। তামাকের সম্বন্ধেও আমি ওই কথাই ভাবছি, রবির বিয়ে হয়ে গেলে কমিয়ে দেব।

বৃন্দা। তুমি আবার তামাক ধরেছ নাকি? তাহলে শুধু আমি একাই নই। গিন্নীকে গিয়ে বলতে হবে।

গোলোক। আমার নিন্দে করবে বুঝি?

বৃন্দা। নিন্দে! এ তো প্রশংসা। গোলোক—বৃন্দাবনের নিন্দে করে কে? মনে পড়ে?

গোলোক। পড়ে না আবার? গোলোক বৃন্দাবন!

দু'জনে হাসতে লাগল

চতুর্থ দৃশ্য

গোলোকের বাড়ীতে রবির বিয়ের পর ফুলশয্যার রাত্রি। নহবতের সুর বাজছে, মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এক কক্ষে মায়া, নীলকণ্ঠ ও যোগেশ অপেক্ষা করছে।

যোগেশ। এখনও এল না যে?

নীল। ফুলশয্যার ব্যাপার, চট্ করে আসতে পারে?

যোগেশ। রবি নিয়ে আসতে পারবে তো?

মায়া। তা আর পারবেন না?

নীলকণ্ঠ। এখনও কি সেই লাজুক রবি আছে নাকি?

যোগেশ। পাশাপাশি কি সুন্দর দেখাবে দু'জনকে!

নীল। দু'জনেই সুন্দর, তা তো দেখাবেই।

বর ও বধূবেশে রবি ও রচনা প্রবেশ করল

মায়া। চিনতে পারছ দিদি?

রচনা। মায়া! (নীলকণ্ঠের প্রতি) আপনি কখন এলেন?

নীল। ঘণ্টা কতক আগে।

রবি। (যোগেশকে দেখিয়ে) ইনি আমার রুমমেট যোগেশ।

পরস্পরের নমস্কার

যোগেশ। প্রজাপতির চেষ্টা মিছে যায়নি দেখছি।

নীল। হাঁ, প্রজাপতি মায়ারূপ ধারণ করেছিলেন।

মায়া। একটা কথা বলা দরকার দিদি।

রচনা। কি?

নীল। একটা রহস্য, যেটা এই বিয়ের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে।

রচনা। (বিস্ময়ে) সে আবার কি!

মায়া। আগে বল, ক্ষমা করবে।

রচনা। কি বল শুনি।

মায়া। আগে বল করবে।

রবি। বল না, করব।

যোগেশ। হুঁ, বলতে বাধা কি।

রচনা। তা না হয় হবে, কিন্তু কি সেটা?

মায়া। (রবির প্রতি) আপনিই রহস্যের সমাধানটা করে দিন।

রবি। আমি?

বলে নীলকণ্ঠের দাড়ি ধরে টান দিতেই দাড়ি গোঁফ খুলে এল। বেরিয়ে পড়ল সুকুমার

রচনা। (দাড়ি টানতে দেখে) আহাহা!

সুকুমার। ভয় নেই, লাগেনি বৌদি।

রচনা। (অসম্ভব বিস্ময়ে) এ সব—!

সুকুমার। আগেই বলেছেন, ক্ষমা করবেন, মনে আছে তো? তবে শুনুন ব্যাপারটা। রবি, আমি এবং এই যোগেশ—আমার নাম সুকুমার—আমার সহপাঠী এবং হোস্টেলের এক কক্ষসাথী। এক সোস্যালে আপনাকে দেখে রবি ভাইটির বড় ভাবনা আসে; তাতে আমি বলি ভয় নেই, সাত রাজার ধন নিশ্চয় তোমায় এনে দেব। রচনারাণী রবীন্দ্র ছাড়া কি অন্যের হাতে শোভমানা হতে পারেন, আপনিই বলুন। তারপর, তারপর কি রবি?

রবি। তুমিই বল, তোমার চেয়ে আর কে ভাল করে বলতে পারবে।

সুকুমার। তারপর স্বয়ং নীলকণ্ঠ সেজে আর এঁকে —ইনি আমার প্রিয়তমা শ্যালিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা, রবির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত—মায়া সাজিয়ে আপনাদের হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হই। তারপরের ব্যাপার সব আপনার জানা।

রবি। তারপরের ব্যাপারে তুমি যে শুধু সুকুমারই নও, তুমি সুচরিত, সুহাস ও সুভাষ, তাই প্রমাণিত হয়েছে।

সুকুমার। কথা শুনছ যোগেশ? শুনছ পুনু?

পূর্ণিমা। (হাসিমুখে) শুনছি।

যোগেশ। বিস্ময়ের বিরাম নেই।

সুকুমার। আপনার জন্যে কি না করা হয়েছে বলুন তো!

যোগেশ। কত ফন্দিই না তোমার মাথায় ছিল!

সুকুমার। ফন্দি মাথায় ছিল বটে, কাজে লাগত না প্রতিভাময়ী পুনুরাণী না থাকলে।

যোগেশ। তা সত্যি।

রবি। তা অতি সত্যি। সময় সময় ভয় হচ্ছিল, পুনুর ফাঁদেই না পড়ে যাই; ভাগ্যে বর্ণের তফাৎটা ছিল।

সুকুমার। বৌদি, কেমন রত্নলাভ হয়েছে বলুন তো।

যোগেশ। কেন, বৌদিই কি আমাদের সামান্য জিনিস নাকি?

সুকুমার। শুনছেন বৌদি, স্তুতি সুরু করেছে, পেটুক মানুষ কিনা, নেমন্তন্ন আশা করছে। কিন্তু কথা কইছেন না যে বড়, লজ্জা করছেন নাকি?

রবি। কইবেন, কইবেন; ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে নিচ্ছেন। তোমরা অনেক জট্ পাকিয়েছ, খুলতে সময় লাগবে।

সুকুমার। শোনো, শোনো যোগেশ, কথা শোনো রবির। এটা কি তাহলে ময়দান নয় পুনু?

পূর্ণিমা। তাই তো দেখছি।

সুকুমার। না, আর কথা নয়, রাত্রি হল, এবার যেতে হবে।

যোগেশ। হাঁ চল। আসি বৌদি।

সুকুমার। আসি বৌদি, এক্ষুণি আবার আপনার ডাক পড়বে।

রচনা। কে ডাকবে?

সুকুমার। আজকে কে ডাকবে বলছেন! আজ আপনি সর্বজনের মাঝে অধীশ্বরী, আপনাকে কেন্দ্র করেই তো আজ সব।

রবি। আর আমি বুঝি কিছু নয়?

সুকুমার। তুমি মহারাণীর স্বামী।

রবি। মহারাণীর স্বামী, মহারাজা নই?

সুকুমার। শোনো আব্দার যোগেশ।

যোগেশ। রাত্রি কত হল, খেয়াল আছে সুকুমার?

সুকুমার। ও, তাও তো বটে। চল চল। আসি বৌদি—

রচনা। আজ কিছুই কথা হল না,আর একদিন এস।

পূর্ণিমা। আসব।

সুকুমার। আমাদের আসতে বলছেন না বৌদি?

রচনা। (হাসিমুখে) আসবেন।

রবি। আসবে, নিশ্চয় আসবে, এই সাতদিনের ভেতরই আর একদিন সকলে এস।

যোগেশ। নেমন্তন্ন করছ?

রবি। করছি।

সুকুমার। বৌদির হাতের রান্না চাই কিন্তু, চপ্ কাটলেট্। মনে পড়ে বৌদি?

পূর্ণিমা। আর কিছু নয়?

সুকুমার। আর যত রকম মিষ্টি আছে সংসারে।

যোগেশ। তার ফর্দটা দাও।

সুকুমার। আহ্বানে মিষ্টি, বাক্যে মিষ্টি, ব্যবহারে মিষ্টি, মনোযোগে মিষ্টি, পরিবেশনে মিষ্টি, হৃদয়ে মিষ্টি।

যোগেশ। সাবাস্ ভাই! এবার বিদায়ে মিষ্টি কর।

সুকুমার। আসি রবি, আসি বৌদি—

সকলের নমস্কার

রবি। এস, চিরকাল এস, বারে বারে এস।

যবনিকা

বেদান্ত ও সূফীমতে সৃষ্টি

ডক্টর রমা চৌধুরী

গতমাসে বেদান্তসম্মত লীলাবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। স্বয়ং স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও হাল্লাজের মতবাদে বেদান্ত-প্রপঞ্চিত ঈশ্বরলীলাবাদের আভাস পাওয়া যায়। হাল্লাজের মতে, পরমাত্মার তিনটী অবস্থা ক্রম।

(১) প্রথম অবস্থা সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার নির্গুণ ও নির্বিশেষ শুদ্ধস্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় শুদ্ধসত্ত পরমেশ্বর নিজেই নিজের সহিত কথোপকথনে রত থাকেন, নিজেই নিজের স্বরূপ শোভা নিরীক্ষণ করেন এবং বিমুগ্ধ হন। এরূপ স্বরূপ বিমুগ্ধতার নামই 'প্রেম' অর্থাৎ, তৎকালে পরমাত্মা নিজেই নিজের নির্গুণ শুদ্ধস্বরূপের প্রতি প্রেমমুগ্ধ হন। অতএব আত্মপ্রেমই পরমাত্মার স্বরূপের স্বরূপ। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ। উক্ত প্রথম অবস্থা পরমাত্মার অনভিব্যক্ত অবস্থা এবং এই অবস্থায় তিনি নির্গুণ, স্বাত্মজ্ঞ, স্বাত্মপ্রেমিক, স্বাত্মানন্দী স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

(২) দ্বিতীয় অবস্থায়, পরমাত্মা তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও আনন্দস্বরূপকে বিভিন্ন গুণ ও নামরূপে অভিব্যক্ত করেন। ইহাই তাঁহার আন্তর ও ও প্রথম বিকাশ।

(৩) তৃতীয় অবস্থায়, ঈশ্বর তাঁহার সেই নিরালা, নিঃসঙ্গ প্রেম ও আনন্দকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন। অর্থাৎ, তিনি স্বীয় প্রেমানন্দঘনস্বরূপকে মূর্ত্ত প্রকাশ করিতে অভিলাষী হন, যাহাতে তিনি তাঁহার নিজেরই স্বরূপের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহার সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। এই অভিলাষবশবর্ত্তী হইয়া, তিনি স্বীয় গুণ ও নাম সম্বলিত প্রতিমূর্ত্তি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। ইহারই নাম 'মানব'। ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি ও প্রতিচ্ছবি বলিয়া 'মানব' ঈশ্বর পদবাচ্য।

অতএব হাল্লাজের মতেও বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দের অভিব্যক্তি। আনন্দ হইতেই বিশ্বসৃষ্টি, অভাব হইতে নহে। হাল্লাজ বলিয়াছেন যে, পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের অভাব না থাকিলেও, তিনি প্রতিচ্ছবি ও সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন। তিনি স্বাত্মজ্ঞানমাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া অপর এক দর্পণে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; স্বাত্মপ্রেমের একাকিত্বে তৃপ্ত না হইয়া অপর এক প্রেমিকের প্রেম কামী হইয়াছিলেন; নিঃসঙ্গ স্বাত্মানন্দে পরিতৃপ্ত না হইয়া আনন্দের অপর এক অংশীদার অন্বেষণে উদ্গ্রীব ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি স্বীয় প্রতিচ্ছবিরূপে, স্বীয় প্রেম ও আনন্দের অংশীরূপে 'পূর্ণমানব' সৃষ্টি করেন। কিন্তু যদি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও আপ্তকাম হন, যদি তিনি প্রথম হইতেই আত্মজ্ঞ, প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হন, তাহা হইলে তাঁহার অভাব থাকিবে কিরূপে? সুতরাং ঈদৃশ সাথী সৃষ্টি অভাবমূলক নহে, ক্রীড়ামূলক। জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের দিক হইতে কোনোরূপ অভাব না থাকিলেও, ঈশ্বর লীলাভরে মানব সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহাতে স্বীয় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার প্রেমে তৃপ্ত হন, তাহাকে স্বীয় আনন্দের অংশী করেন। অতএব জগৎসৃষ্টি পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে উদ্ভূত প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়াবিশেষ মাত্র। ইহা স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের অসম্পূর্ণতা অনিবার্য্য। অতএব, সম্ভবতঃ হাল্লাজের মতেও, প্রেম ও আনন্দের সাথীরূপে অভিব্যক্তি অথবা মানবসৃষ্টি প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়া মাত্র।

হাল্লাজের উক্ত মতবাদ আমাদিগকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বল্লভের মতেও ঈশ্বর লীলাস্বরূপ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি একাকী বিরাজ করিতেছিলেন, কিন্তু একাকী ক্রীড়া অসম্ভব বলিয়া তিনি ক্রীড়ার সাথীরূপে মানব সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ মানবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজের সহিতই নিজে ক্রীড়ায় মত্ত হন।

বেদান্তের মতে ব্রহ্ম নিত্য-সত্য, অনাদি ও অনন্ত, নিত্য-পরিপূর্ণ। তিনি নিত্য সত্তা (Being) এবং নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় (Static)। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত ঈশ্বর-লীলাবাদই জগৎসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিত্যপূর্ণ ও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, অথচ সৃষ্টিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যটী অভাবমূলক কার্য্য নহে, আনন্দোচ্ছ্বাসমূলক, ক্রীড়ামাত্র। দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্ট জগতেও তিনি পরিবর্ত্তিত হন না। শঙ্করের মতে অবশ্য জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম নহে, মিথ্যা 'বিবর্ত্ত' (১) মাত্র। কিন্তু অন্যান্য পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বশক্তি বিক্ষেপ মাত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবজগৎ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ শক্তিদ্বয় রূপে ব্রহ্মেই লীন থাকে; সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চিত হইয়া বিশ্বচরাচররূপ ধারণ করে। সৃষ্টির অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্ম স্বীয় অংশবিশেষকে জগদাকারে পরিণত করেন এবং অন্যান্য অংশে অপরিণতই থাকিয়া যান। ব্রহ্ম নিরংশ, অখণ্ডনীয়, অবিভাজ্য সমগ্র সত্তা, তাঁহার অংশ বিভাগ নাই। তজ্জন্য শ্রুতিতে (মুণ্ডকোপনিষৎ ১-১-৭) ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যকে ঊর্ণনাভের তন্তুবয়নরূপ কার্য্যের সমতুল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঊর্ণনাভ

---

(১) কারণ হইতে সত্য কার্য্যোৎপত্তি 'পরিণাম'; যথা দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি। কারণে মিথ্যা কার্য্য প্রতীতি 'বিবর্ত্ত', যথা রজ্জুতে সর্প প্রত্যক্ষ।

স্বশক্তি দ্বারা তন্তুবয়ন করে, কিন্তু স্বয়ং তন্তুরূপে পরিণত হয় না। তদ্রূপ, ঈশ্বরও স্বয়ং অপরিণত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াই স্বশক্তি বিক্ষেপ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।

স্থিতিবাদ গ্রহণ করিলে প্রথমতঃ বেদান্তসম্মত লীলাবাদই সৃষ্টিরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, হয় শঙ্করের মতানুসারে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণতি অস্বীকার করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; নয় পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের মতানুযায়ী জগতকে অপরিণত ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। হাল্লাজে অবশ্য 'বিবর্ত্তবাদ' অথবা 'শক্তিবিক্ষেপবাদের' প্রপঞ্চনা নাই। তাঁহার মতবাদকে 'পরিণামবাদ'ও বলা চলে না, কারণ তাঁহার মতে জগৎ শূন্য হইতে সৃষ্ট। অথচ, জগৎ ঈশ্বর স্বরূপের দর্পণ ও প্রতিচ্ছবিও বটে। ইহা অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।

অবশ্য বেদান্ত-প্রপঞ্চিত লীলাবাদ ও শক্তিবিক্ষেপবাদও সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত নহে। লীলাবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের দিক্ হইতে জগৎ লীলামাত্র হইলেও, সৃষ্ট জীবের দিক্ হইতে ইহা পরম দুঃখের কারণ। ঈশ্বর যদি স্বপ্রয়োজনানুরোধেও নহে, কেবলমাত্র সামান্য ক্রীড়ার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য জীবগণকে এরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরমকরুণাময় বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি ঈশ্বরের দিক্ হইতে প্রয়োজনশূন্য হইলেও জীবের দিক্ হইতে তাহা নহে। সৃষ্টি জীবের কর্ম্মানুসারী। কর্ম্মফলের অমোঘবিধান এই যে, ফলভোগেচ্ছু হইয়া 'সকামকর্ম্মে' রত হইলে তাঁহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, বর্ত্তমান জীবনেই, অথবা পরবর্ত্তী জীবনে। কর্ম্মফলের ভোগ পরিসমাপ্ত না হইলে বারংবার জন্ম অনিবার্য্য, মুক্তিও নাই। তজ্জন্য কর্ম্মফলোপভোগের জন্যই ভোগাগার সংসার অত্যাবশ্যক। অতএব ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করেন। এস্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী সৃষ্টি অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী অভুক্ত কর্ম্মোপভোগের জন্যই প্রয়োজন, কিন্তু সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির কারণ কি? ইহার পূর্ব্বে ত কোনও সংসার সৃষ্ট হয় নাই এবং জীবগণও সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা হইলে, জীবগণের কর্ম্মক্ষয়ের কোনও প্রশ্নই তৎকালে ছিল না। তৎসত্ত্বে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদান্তিকগণ "বীজাঙ্কুর ন্যায়ের" অবতারণা করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পুনরায় বীজ জন্মে। কিন্তু বীজই অঙ্কুরের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা অঙ্কুরই বীজের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, এবং সর্ব্বপ্রথম বীজের কারণ কি, তাহা বলা অসম্ভব। তজ্জন্য বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধকে অনাদি সম্বন্ধ বলা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে সংসার, সংসার হইতে পুনরায় কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। কিন্তু, কর্ম্মই সংসারের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, অথবা সংসারই কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, এবং সর্ব্বপ্রথম সংসার সৃষ্টির কারণ কি, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কর্ম্ম ও সংসারের অনাদি সম্বন্ধ। অবশ্য, ইহা প্রশ্নের সমাধান নহে, অজ্ঞতা স্বীকার মাত্র। যাহা হউক, লীলাবাদেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। শক্তিপ্রপঞ্চবাদে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণে শক্তিমানের সত্তার বিকার বা পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কিনা?

যাহা হউক, যদি স্থিতিবাদ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে লীলাবাদই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্ব্বোত্তম সমাধান বলিয়া মনে হয়। স্থিতিবাদ গ্রহণ করিলে জগৎ সৃষ্টির সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা একেবারেই সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। এই গূঢ় প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার স্থান ইহা নহে।

স্থিতিবাদ(১) ব্যতীত পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় অপর একটী মতবাদ দৃষ্ট হয়। ইহার নাম গতিবাদ(২)। পাশ্চাত্য দর্শনে বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল ইহার প্রপঞ্চনা করেন। গতিবাদ মতে, পরম সত্তা (**The Absolute**) নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য-পরিপূর্ণ সত্তা নহেন; উপরন্তু নিত্য গতিশীল, পরিবর্ত্তনভাগী ও পরিণামশীল। ঈদৃশ নিত্য ঘটন-শীলতাই পরমসত্তার স্বরূপ। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় সৎও (**Being**) নহেন; শূন্যগর্ভ অসৎও (**Non-Being**) নহেন, কিন্তু সৎ ও অসতের সমন্বয় স্বরূপ, অর্থাৎ, ঘটনশীল (**Becoming**)। ঘটনশীলতায় সত্তা ও অসত্তার পরস্পর বিরোধের সমন্বয় ঘটে, কারণ ঘটনশীল বস্তু কেবল সৎও নহে, কেবল অসৎও নহে, উভয়ের সমাহার। যথা, বীজ ঘটনশীল, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়। এস্থলে বীজ বীজরূপে সৎ, অঙ্কুর-রূপে অসৎ। কিন্তু বীজ শুধু বীজই নহে, অঙ্কুরেও অচিরে পরিণত হইবে। অতএব ইহা কেবল বর্ত্তমান বীজ নহে, ভবিষ্য অঙ্কুরও; কেবল সৎ নহে, অসৎও। বর্ত্তমানের ভবিষ্যতে পরিণতিই ঘটনশীলতার মূল কথা। সুতরাং, ঘটনশীলতা বর্ত্তমান সত্তা ও অবশ্যম্ভাবী অসত্তার সমাহার। এইরূপে, পরমসত্তা নিত্য ঘটনশীল, নিত্য গতিমান্, নিত্য-পরিণামী। ঈদৃশ গতিবাদ স্বীকার করিলে সৃষ্টি কার্য্যটী অনায়াসেই যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। অনভিব্যক্ত পরম সত্তা স্বভাবতঃই ক্রমান্বয়ে জগতে অভিব্যক্ত হন। ঈদৃশ অভিব্যক্তিই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া, ইহা তাঁহার অসম্পূর্ণতাদ্যোতক নহে। বীজ অন্তর্নিহিত শক্তি বলেই অঙ্কুরে স্বভাবতঃই পরিণত হয়। সুতরাং বীজের অঙ্কুরে অভিব্যক্তি বীজসত্তার অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক নহে, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বীজ বীজই নহে শুধু, ভবিষ্য অঙ্কুরও। অতএব বীজস্বরূপ বর্ত্তমান বীজও ভবিষ্য অঙ্কুর এই উভয়ের সমাহার বলিয়া বীজ হইতে অঙ্কুর সৃষ্টি স্বভাবজ কার্য্য মাত্র। এইরূপে, অব্যক্ত সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্বভাববশেই স্থূল জগতে ক্রমান্বয়ে প্রপঞ্চিত হইতেছেন বলিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধ কোনো প্রশ্নই উঠে না। জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যারূপে, স্থিতিবাদ অপেক্ষা গতিবাদই শ্রেয়ঃ।

বিখ্যাত সূফী জীলী প্রপঞ্চিত মতবাদেও উক্ত গতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। জীলীর মতেও সূক্ষ্ম অব্যক্ত পরমাত্মা স্বভাবতঃই

---

(১) **Static Conceftion of God as Being.**

(২) **Dynamic Conceftion of God as Becoming.**

ক্রমান্বয়ে স্থূল বিশ্বচরাচরে অভিব্যক্ত হন। অতএব, পরমাত্মার স্বভাবই সৃষ্টির কারণ, অভাব নহে। ইহা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ হইতে, জীলী ঈশ্বরের করুণাকেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। করুণা অভাব অথবা প্রয়োজন নহে, কিন্তু ক্রীড়ার ন্যায় পূর্ণতারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র।

অতএব, সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সূফীগণ ভিন্নমত। সাধারণতঃ, পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যের উল্লেখ বিভিন্ন সূফী মতবাদে পাওয়া যায়। যথা :— (১) মানবস্বরূপদর্পণে স্বীয় প্রতিচ্ছবি দর্শন দ্বারা আত্মজ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দ লাভেচ্ছা। (২) আত্মজ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দের অভাব না থাকিলেও, মানবস্বরূপ সাধীর দ্বারা পুনরায় ঈদৃশ জ্ঞান ও আনন্দ লাভেচ্ছা। (৩) পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বসিত ক্রীড়া। (৪) স্বভাবজ অভিব্যক্তি। (৫) করুণা।

চীনা ঐতিহ্য ও হ্‌সুন্‌ৎজু

শ্রীশিবকুমার মিত্র

চীন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বর্তমান যুদ্ধের দৌলতে অনেকখানি বেড়ে গেছে। জাপান চীনকে আক্রমণ না করলেও তাড়াতাড়ি তা সম্ভব হোতো না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীনের দান অমূল্য এবং সে বিষয়ে আমাদের এতদিনকার পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা লজ্জাকর। জাপানী বর্বরতা আমাদের সে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে চীনা ইতিহাস আমাদের কাছে আর অজানা নেই, কিন্তু তার কৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা আগের মতোই রয়ে গেছে। অথচ এই প্রাচীন দেশ একদিন সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে ও ললিতকলায় সমগ্র পৃথিবীর অগ্রগণ্য ছিল। কন্‌ফিউসিয়াসের নাম অনেকেই শুনেছে, অনেকে হয় তো তাঁর দুএকটা বুলিও আওড়াতে পারে, কিন্তু তাঁর যে বিশিষ্ট চিন্তাধারা আজও চীনকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার খবর খুব কম লোকই রাখে। কত ভিন্নধর্মী জাতি চীনে এসেছে গেছে কিন্তু কন্‌ফিউসিয়াসের চীনকে মারতে পারে নি। অথচ চীন চিরকাল এক ছিল না। চীনের বর্তমান ঐক্য জাপানী বর্বরতার অন্যতম দান। যিশুখৃষ্টের দু-তিনশো বছর আগে চীনে এমন এক সময় এসেছিল যখন চীন ছোট ছোট কয়েকটি কলহপরায়ণ রাজ্যে বিভক্ত। সমস্ত দেশের শান্তি তখন বিলুপ্ত। সমাজ জীবনেও গোলমাল। চীনারা তাদের আদর্শকে ভুলতে বসেছিল, ভেঙে যাচ্ছিল তাদের কনফিউসীয় সংস্কৃতির বুনিয়াদ ; দুর্নীতির প্রলোভনে চীন তার বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছিল। মোত্তি, ইয়াংচু, হুইশিহ., কুংসানলুং, চুয়াংৎজি এবং আরো অনেকে কনফিউসীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। চীনের গোধূলিম্লান আকাশে এই সময় উদয় হোলো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের। ভারতবর্ষে মনুর আবির্ভাবের মতো চীনেও এমন একজনের আগমন প্রয়োজনীয় ছিল এবং তিনি এলেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর নিয়ে। সেই মনীষী হ্‌সুন্‌ৎজুর কথাই আজ বলছি।

কন্‌ফিউসিয়াস, মেন্‌সিয়ুস প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেছিলেন যে মানুষের প্রকৃতি স্বভাবতই ভালো। নিজের নিজের সামাজিক সম্বন্ধ অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তব্যপালনই নৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ। মানুষ স্বভাবতই জ্ঞান, বদান্যতা ও সাহসের অধিকারী। শিক্ষা দিয়ে আমরা তার ঐ প্রকৃতিকে শালীন করে তুলি। মানুষ যেন জলন্ত প্রদীপ শিক্ষার তৈলে সে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চরিত্র স্বর্গের দান। বৈদিক ঋষির মতো তাঁরা বললেন, যে ঋত বিশ্বের নিয়ন্তা, তারই মূর্ত প্রকাশ মানুষে। মানুষ তাই স্বভাবতই ভালো।

হ্‌সুন্‌ৎজু এসে বললেন, না, মানুষ স্বভাবত ভালো নয়, বরং উল্টো, সে মন্দ। শুনে সবাই চম্‌কে উঠলো। কন্‌ফিউসীয় সংস্কৃতির বিরোধীরা আনন্দিত হোলো শুনে, তারা ভাবলে তাদের দল পুষ্ট হোলো বুঝি এই নবাগতের দ্বারা। পরে তারা ভুল বুঝতে পারলে। সামাজিক ভাঙনের সময় হ্‌সুন্‌ৎজুর আবির্ভাব, মানুষের চারিত্রিক অবনতিই তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। আর তাই তাঁর নৈরাশ্যবাদ। কিন্তু যুক্তিদ্বারা তিনি এগিয়ে চললেন অপরূপ সিদ্ধান্তে। কী সে সিদ্ধান্ত তা বলবার আগে মানুষ স্বভাবত কেন খারাপ তার যুক্তি শুনুন।

মানুষ যদি ভালোই হয় তো ভালোর পেছনে ছুটবে কেন, সেটা তো তার কাছেই আছে। অতএব মানুষ ভালোর পেছনে ছোটে বলেই সে প্রমাণ করে যে সে ভালো নয় অর্থাৎ সে খারাপ।

মানুষ যদি পারত্রিক চরিত্রের অধিকারী হয় তো কিসের প্রয়োজন রাজর্ষিদের এবং নৈতিক নিয়মের? কিন্তু আমরা

দেখি ইতিহাসে এ দুটি নিশ্চিত বর্তমান। অতএব মানুষ নিশ্চয় খারাপ।

মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি পেয়েছিলেন তদানীন্তন চীনে; তাই গভীর ক্ষেদের সংগে বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের স্বভাবজ নয়, তাকে ধার্মিক হতে হয়।

কিন্তু ধর্ম কী, নৈতিক উত্তম-অধম বিচারের মানদণ্ড কী? এইখানে তিনি কনফিউসীয় সংস্কৃতির মধ্যে আবার ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, নৈতিক কর্তব্য দেশের শান্তি রক্ষায় চিরাচরিত প্রথা পালনে অর্থাৎ কনফিউসীয় নীতি পালনে। কিন্তু মানুষ যখন স্বভাবত ধার্মিক নয়, তখন তাকে ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। কনফিউসিয়াস বলেছিলেন শিক্ষা আত্মার বিকাশ; মানুষ ধার্মিক, শিক্ষা দ্বারা তা আরো বিকশিত হয়। হ্‌সুন্‌ৎজুর মতে মানুষ তা নয়, অতএব শিক্ষা যদি আত্মার বিকাশ হয় তো মানুষ কোনোদিন ধার্মিক হতে পারবে না, কারণ ধর্ম মানুষের আত্মিক নয়। কাজেই শিক্ষা হয়ে ওঠে আত্মার ওপর অনাত্মীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন চীনের লি-নীতিতে হ্‌সুন্‌ৎজু খুঁজে পেলেন ধর্মকে; বললেন, এই লি-নীতি পালন করার অভ্যাসই হবে শিক্ষা, তবেই গড়ে উঠবে চরিত্র। মানুষের প্রবৃত্তি স্বর্গের দান হতে পারে কিন্তু চরিত্র নয়। রাজর্ষিদের আদর্শ রেখে আমাদের শিখতে হবে লি-নীতি। কিন্তু শিক্ষা যখন আত্মিক বিকাশ নয়, তখন এটা জোর করে দিতে হবে। তাই লি-র সংগে যুক্ত হোলো রি: শিক্ষার জন্য চাই রাষ্ট্র, চাই শাসন। এমনি করে নীতি পথে থাকতে থাকতে এমন এক সময় আসবে যখন রি-র প্রয়োজন হবে না। ধর্মটাই মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। রাজর্ষি হবে প্রত্যেকের আদর্শে। খারাপ হলেও শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেকেই হতে পারবে রাজর্ষির মতো। তখন আর দরকার হবে না বিদ্রোহের, কিংবা দেশের শান্তিভঙ্গের।

হ্‌সুন্‌ৎজুর মতবাদ কিন্তু একের সর্বৈব প্রভুত্বের রাস্তা খুলে দিলে। লি-ধর্মের অবশ্যপালনীয়তা রাষ্ট্রশক্তিপ্রসূত এবং রাষ্ট্র বলতে তখন অধিপতিকেই বোঝাতো। শিক্ষা যদি বাইরে থেকে জোর করে দেওয়া হয় তাহলে যে শেখাবে তার প্রভুত্ব অনস্বীকার্য। তাছাড়া শিক্ষা মানেই এক্ষেত্রে মানুষের চারিত্রিক দোষকে চেপে গুণের লালন এবং এই চাপার কাজটি হ্‌সুন্‌ৎজুর মতে, মানুষ নিজে করতে পারে না; তাকে চাপতে হয়। এখানেও তাই প্রভুত্বের ছিদ্র রয়েছে।

পরবর্তীকালে এই একচ্ছত্র প্রভুত্ব চীনে বাস্তবিকই দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম দেখা যায় ৎসিনবংশের প্রথম সম্রাটের রাজত্বকালে। হানফেই অবশ্য তার আগেই উপলব্ধি করেছিলেন যে লি-নীতির শক্তি নেই নিজের, রাষ্ট্রীয় আইনই সর্বশক্তিমান। আইনের ওপর শিক্ষা নির্ভর করলে তা হয়ে ওঠে পরগাছার মতো। আর হোলোও তাই। ৎসিন বংশের প্রথম সম্রাটের পর থেকে চীনের সাংস্কৃতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেল এক হাজার বছরের জন্যে। বৌদ্ধধর্মের প্রাণবান আকর্ষণে চীনের জনগণ ভেসে গেল। সুঙ্‌বংশের সময় চীনের নবজন্ম হয়। সে নবজন্ম কিন্তু কনফিউসীয় কৃষ্টির দ্বারা পুষ্ট। আর তা সম্ভব হয়েছিল হ্‌সুন্‌ৎজুর মতবাদপ্রসূত সংকীর্ণতার জন্য। নয় তো বৌদ্ধ, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মের ধাক্কায় চীন তার জাতীয় ঐতিহ্য সামলে রাখতে পারতো না। হান্‌বংশের সম্রাট উতি শিক্ষার এই মতবাদে এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে হ্‌সুন্‌ৎজুর কথামতো কনফিউসীয় মতবাদ ছাড়া অন্য সব মতবাদের প্রচার আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সমস্ত চীন আজ তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

চিন্তার ক্ষেত্রে হ্‌সুন্‌ৎজুর দান হয় তো তেমন ধাঁধা-লাগানো নয়, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য চীন আজ বুঝেছে। কনফিউসীয় মন্ত্রের শেষ বিশিষ্ট উদ্‌গাতা তিনিই। তাঁর চিন্তাধারার ওপর তাঁর পারিপার্শ্বিকের ছাপ অতি সুস্পষ্ট। তাঁর সমস্ত মতবাদটাই তখনকার সামাজিক দুর্নীতির প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত। অনাচারের পরিবর্তে তিনি হয়তো অজ্ঞাতে স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেমন করেছিলেন মনু; তাতে কিন্তু সুফলই হয়েছে। মনুর জন্য হিন্দুরা বেঁচে আছে আজও, আর চীন বেঁচেছে হ্‌সুন্‌ৎজুর জন্য। কনফিউসিয়াস, মেনসিয়ুস এবং হ্‌সুন্‌ৎজু, মহাচীনের ঐতিহ্যের উদ্‌গাতা এবং হোতা এঁরাই।

ভূমা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কাঞ্চনের শুদ্ধি লাগি অগ্নিদাহ দেয় স্বর্ণকার,
একাদশী বারব্রত ত্যাগ তীর্থ মানুষের তরে,

মানুষ কাহার তরে তুষাগ্নির তপস্যা সে করে?
সঙ্কীর্ণ স্বত্বেরে ত্যজি—আরাধনা করে সে ভূমার।

আপেক্ষিক

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম্‌-এ

গল্প লিখব। একটা প্লট চাই। অনেক চেষ্টা করলাম। সব বৃথা।

উঠানে কাদা। বাইরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ। আম গাছগুলো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা বৃষ্টি-ভেজা কাকের অবস্থা শোচনীয়। কয়েক দিন আগে একটা ক্রুদ্ধ কাকের হিংস্র ঠোঁটের আঘাতে একটা নিরীহ শালিক রক্তাক্ত দেহে মারা পড়েছিল। এটা কি সেই কাকটা? কে জানে। পৃথিবী বহুরূপীর চিড়িয়াখানা। কাল যে ছিল দুর্দান্ত, আজ সে বেচারী। কাল মনে হয়েছিল কাকটা ভাগ্যবান, কত শক্তির অধিকারী; আর বেচারী শক্তিহীন দুর্বল শালিক। আবার এখন মনে হচ্ছে: নির্মিতনীড়ক্রোড়ে কী সুখী ওই শালিকমিথুন; আর বেচারী আশ্রয়হারা কাক! এমনি হয়। কে যে ভাগ্যবান, আর কে যে দুঃখী, তার বিচার-মীমাংসা অসম্ভব। হয় তো বা সবাই দুঃখী। সর্বম্ দুঃখম্ দুঃখম্।

সশব্দে একটা মিলিটারী ট্রাক চলে গেল বাইরের পথ দিয়ে। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

ছোট মফঃস্বল সহরটায়ও লেগেছে যুদ্ধের নিশ্বাস। মিলিটারী লরীর অবিরাম ধ্বনি। স্পেশ্যাল মিলিটারী ট্রেনের যখন-তখন যাতায়াত। ঘন ঘন সৈন্যদের আনা-গোনা। পথে পথে বুট-মার্চ।

জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে হু-হু করে। চার টাকা মণ দরের চাউল ন'টাকায় উঠেছে। তেল-নুনের অবস্থা ততোধিক। কাপড়ের বাজার আগুন।

মনে পড়ল: আজই বাড়ীর চিঠি পেয়েছি। বাবার চিঠি। যে-টাকা এতদিন মাসে মাসে পাঠিয়ে এসেছি, তাতে আর সংসার খরচ চলে না। অতএব—

কিন্তু আমি তো যে স্কুল-মাস্টার সেই। প্রয়োজন বেড়েছে বলে আমার মাইনের অংক তো বাড়ে নি। কি যে হবে।

নিজের কথাটা মনে আসছে। ভাদ্রের ঘন-বর্ষণের কৃপায় আজ রেনি-ডে। স্কুল ছুটি। ছেলেরা সব যার-যার মত আড্ডায় জমেছে। বোর্ডিং নির্জন। উঠানে কাদা। বাইরে বৃষ্টি। আকাশে মেঘ।

জীবনের ত্রিশটা বছর কী করলাম। উচ্চ আদর্শের দিকে ঝোঁক ছিল না। ছোট, সুস্থ, সুন্দর জীবনের প্রতি ছিল উদগ্র আকর্ষণ। কিন্তু কি পেলাম? মফঃস্বলের স্কুল-মাস্টার। পয়তাল্লিশ টাকা উপার্জন। বোর্ডিং-সম্বল। কু-গৃহে বাস। কদন্ন ভোজন। জীবনের চরম নিগ্রহ।

জানালায় কার ছায়া পড়ল। চোখ ফেরালাম। নারাইনা। কুলি বস্তীর ছেলেটা। বছর বারো বয়েস। মিশমিশে কালো রং। মাথায় একডালি চুল। একটা চোখ নাই। জন্ম-অপরাধী।

আমার বালক-ভৃত্যের অসুখের সময় কয়েকটা দিন আমার ছোটখাট কাজগুলো করে দিয়েছিল। কয়েকটা পয়সা দিয়েছিলাম। সেই থেকে মাঝে মাঝে আসে। পথে দেখা হলে অসংকোচে চেঁচিয়ে ওঠে: বাবু—

আহা বেচারী! বাবা নেই। মা অন্য কাকে বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেছে। বিপুল ধরণীতে ও একা। কাকা আছে অনেকগুলি ছেলেপিলে নিয়ে। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। কিন্তু ওখানে ওর ঠাঁই নেই। মাতৃ-পরিত্যক্ত বিশ্ব-পরিত্যক্ত।

বললাম: কি রে? এখানে কেন?

কথা বলল না। মাথা নীচু করল।

শুধালাম: কাজ পেয়েছিস্ কোথাও?

ঘাড় নাড়ল।

: কাকার কাছে যাস্‌'না কেন?

নিরুত্তর।

: কাকার কাছে না গেলে না খেয়ে বাঁচবি কেমন করে?

অতি কষ্টে জবাব দিল। কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ: গিয়েছিলম। কাকা খাইতেও বলল না, কিছু-ও না। তাই চইলে এলাম।

: চইলে তো এলম। কিন্তু এরকম করে কদ্দিন তুই বাঁচবি ?

নীরব। আম গাছের ডালে ভিজে কাকটা আবার ককিয়ে উঠল। বেচারী আশ্রয়হীন।

জানালার শিক ধরে নারাইনা দাঁড়িয়েই আছে। নির্বাক আনত মুখ। মাঝে মাঝে শুধু আমার দিকে চাইছে কাতর চোখে।

অনেকক্ষণ পরে বলল: সারাদিন কিছু খাইলম না বাবু—

কোন জবাব মুখে এল না। শিওরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

কয়েকটি ছোট ছোট পায়ের শব্দ এসে ঘরে ঢুকল। বোর্ডিং-এর ঝি-র ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। দুপুরের বাসন মাজতে এসেছে। আমার ঘরে অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ছিল। তাই নিয়ে মহানন্দে কলরব করতে করতে ওরা বেরিয়ে গেল।

আহা বেচারীরা। দিন সাতেক আগে ওদের রুগ্ন বাবা মারা গিয়েছে। ঝি-গিরি করে মা ওদের পালন করে। কিন্তু পারে কি ? যে দুর্দিন পড়েছে। চাউলের মণ ন'টাকা। তেল-নুন ততোধিক। কাপড়ের বাজার আগুন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস এসে কপালে লাগল। চমকে উঠলাম। নারাইনা আহত মুখে দাঁড়িয়ে। ওরি দীর্ঘনিশ্বাস। ও যে আমার অর্ধভুক্ত ভাতের থালার জন্যে এতক্ষণ নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করছিল, তাতো বুঝতে পারি নি।

কল-তলা হতে ঝি-র ছেলেমেয়েগুলোর আনন্দ কলরব ভেসে এল। বালিশের নীচ থেকে নারাইনাকে একটা পয়সা বের করে দিলাম। বললাম: এক পয়সার মুড়ি কিনে খাগে।

নারাইনা চলে গেল। বেচারী।

মনটা ভারী হয়ে গেল। ফাউণ্টেন-পেনটা বন্ধ করে বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

গল্প লেখা হল না।

সত্যচরণ শাস্ত্রী

শ্রীসুবোধ কুমার রায়

(২)

কিশোর বয়স থেকেই অন্তরে প্রবলভাবে দেখা দেয় সংস্কৃতচর্চ্চার অনুরাগ। দিনে দিনে সেই অনুরাগ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে একদিন বাড়ীতে না জানিয়েই গোপনে চলে যান কাশীতে ; তখন বয়স তাঁর মাত্র ১৫ বছর, (১) বরাহনগর হিন্দুস্কুলের ছাত্র। পাছে দূরদেশে যেতে কেউ বাধা দেয় সেই ভয়ে নিজের মনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। কাশীতে পৌঁছে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে কেদারবাবু লিখেছেন,—"যে সময়ের কথা বলছি সেটা বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ১৮৮০র প্রারম্ভ—১৮৮১।৮২ ও হতে পারে। ঐ সময়ে গ্রামের কয়েকটা বয়:জ্যেষ্ঠ যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বচঞ্চল উন্নতিকামী উৎসাহীদের আগ্রহ ও চেষ্টায় গ্রামে একটা লাইব্রেরী বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য বৈকালে সেখানে আমাদের গতিবিধি থাকত। সত্যচরণ তখন 'ভুলি' নামেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিল এবং বয়সেও বোধ করি আমার কিছু ছোটই ছিল। লাইব্রেরীতে তাকে নিয়মিত পাঠকরূপেই পেতাম। সে দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'কল্পদ্রুম' ও মনুসংহিতা পাঠেই নিবিষ্ট থাকত। হঠাৎ তার যাতায়াত বন্ধ হওয়ায় খোঁজ নিয়ে শুনতে পাই—'কাশীতে সংস্কৃত পড়তে গিয়েছে'। আশ্চর্য্য হবার কারণ ছিল না, কখন কার মনে কি সঙ্কল্প ওঠে ও কাজ করায় তার কোন কৈফিয়ৎ নেই. বিশেষ ও বংশের অনেকেই ছিলেন adventurous (সাহসিক কার্য্যকরী)। প্রায়ই দেশ বিদেশ ঘুরতেন। তখনকার কাশী যাওয়া এখনকার মত এত সহজ ছিল না, বিশেষ ১৬।১৭ বছরের তরুণের পক্ষে। তাই কথাটা বললুম।' (২)

শাস্ত্রী মহাশয় নিজেও লিখেছেন—"কাশী পৌঁছিবার পর দিবস আমি কাশীর, কাশীর কেন ভারতের শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য স্বামীজীর কাছে গমন করি। সেই সুপক্ক-কেশ পুরুষসিংহ যাঁহার কাছে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী,

(১) সত্যচরণবাবু যে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কাশী যান তার প্রমাণ পেয়েই ১৫ বছর লিখেছি।

(২) কেদারনাথের পত্র।

নির্ধন, রাজা, মহারাজ সমানভাবে দর্শিত হইত, তাহাদিগকে উপদেশ দিবার সময় যিনি যথার্থ বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না সেই লোকপূজ্য মহাত্মার কাছে আমি স্নেহের সহিত গৃহীত হই।" তিনি আরও লিখেছেন, "স্বামীজী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আমার সকল প্রকার কুশলের জন্য তিনি সময় সময় একটু বেশী চিন্তা করিতেন। তাঁহার কাছে থাকিবার জন্য হিন্দুস্থানের অনেক রাজা মহারাজা ও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় হয়।" স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সাহচর্য্যে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, আলোচনায় ও স্বামীজীর কাছে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু উপদেশ পেয়ে নিজের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করেন। এই সময় দ্বারভাঙ্গা মহারাজার পাঠশালা ও কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ থেকে কিছু কিছু বৃত্তি লাভ করে' দূর করেন তাঁর আর্থিক অভাব। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও হ'য়ে ওঠেন সুপণ্ডিত। তিনি ভারতের বহুস্থান ভ্রমণ করেছেন স্বামীজীর সঙ্গে। একবার গিয়েছিলেন হরিদ্বার কুম্ভমেলা ও কাশ্মীর। স্বামীজীর সঙ্গে অনেকগুলি লোক গিয়েছিলেন হরিদ্বার যাবার সময়, কয়েকটী পাচক ভৃত্যও সঙ্গে ছিল। কাশী থেকে যাত্রা করে' প্রথমে সূর্য্যকুণ্ড ও পরে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী—মুরাদাবাদ হ'য়ে উপস্থিত হন হরিদ্বার কনখলে।

কাশীতে অধ্যয়ন কালেই তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন ২৪ পরগণার বারাসত গ্রাম নিবাসী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে। ৮।১০ বৎসর পরে তাঁর প্রথমা পত্নীর অকাল মৃত্যু ঘটে। তাই বছর দুই পরে আবার বিবাহ করেন রিষড়া নিবাসী ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের কন্যাকে। প্রথমা পত্নীর সন্তানাদি ছিল না, দ্বিতীয়া পত্নীর চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা হয়।

কয়েক বছর পরে আপন অভীষ্ট লাভ করে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে শাস্ত্রী উপাধি গ্রহণ করে তিনি যখন আবার ফিরলেন দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তখন লোকের মন থেকে সেকথা মুছে গেছে যে এই যুবকই একদিন কিশোর বয়সে প্রাণভরা আবেগ ও বুকভরা জ্ঞান-পিপাসা নিয়ে সবার অলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে দুর্জ্জয় মনের বল ও অসীম সাহসে নির্ভর করে' বেরিয়ে পড়েছিল আপন অভীষ্টসিদ্ধির আশায়। কেদারবাবু লিখেছেন—"যাক্—আলোচনার কিছুই ছিল না, ওকথা ভুলেই গিয়েছিলাম। 'ভুলি'কে যেমন একদিন হঠাৎ হারানো হয়েছিল, কয়েক বৎসর পরে তেমনি হঠাৎ একদিন আমাদের 'ভুলি'কে সত্যচরণ শাস্ত্রীরূপে পাই। মানুষের প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই অভিষ্টলাভে চিরদিন সহায়। শুনিলাম কাশীর স্বনামধন্য সিদ্ধ সাধকদের অন্যতম বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বিদ্যার্থীরূপে শিষ্যত্ব স্বীকার করে' সত্যচরণ ভায়া কয়েক বৎসর পরে অভিষ্ট লাভান্তে ফিরেছেন। তাঁকে আর পূর্ব্বের মত দেখতে পাই না।"

"যাদের কোন উদ্দেশ্য থাকে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির যত্ন থাকে তারা নীরবেই কাজ করে। কিছুদিন পরে শুনতে পাই সত্যচরণ নিত্য কলিকাতায় যান ও ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে সারাদিন পুস্তকাদি পাঠে মগ্ন থাকেন। ইতিহাসের প্রতিই তাঁর বিশেষ আগ্রহ। সেটা বিদ্যানুরাগী লর্ড কার্জ্জন সাহেবের যুগ—তিনিই ছিলেন আমাদের বিখ্যাত বড়লাট। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে তাঁর যাতায়াতও ছিল প্রায়ই। সত্যচরণ ভায়াকে মগ্ন পাঠকরূপে পাওয়ায় ভায়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে, কথাবার্তাও হয়। বংশের বিশেষত্ব পূর্ব্বেই বলেছি—সকলেই প্রকৃতিগত **forward type**এর, কুণ্ঠা সঙ্কোচের ভাব তাঁদের ছিল না, তাতে লাটসাহেব প্রীত হ'য়ে একখানি সার্টিফিকেট বা প্রীতিপত্র লিখে দেন। এসব আমার শোনা কথা হলেও সন্দেহের কথা নয়। বোধ করি তারপর বা সেই সময়ে সত্যচরণ ভায়ার "নন্দকুমার" বলে বইখানি প্রকাশিত হয়।" (১)

শ্রীরামপুরে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত মেনওয়ারিং সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও শিক্ষা করবার সুযোগ পান এবং তাঁর কাছে শাস্ত্রী মহাশয় রুষ ভাষা শিক্ষা করেন এবং সাহেবকে সংস্কৃত ও কিছু কিছু বাংলা ভাষা শিক্ষা দেন। তারপর পিতার অনুরোধে শিবাজীর জীবনচরিত রচনা করার মানসে যাত্রা করেন বম্বাই অভিমুখে। বম্বাই যাওয়ার পথে কেদারনাথের সঙ্গে দেখা করেন সে কথাও কেদারবাবু পত্রে জানিয়েছেন। "আমি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জব্বলপুরে চলে যাই। বোধ হয় ১৮৯৬।৯৭এর এক প্রত্যূষে (২) 'কেদারবাবু হায়' বলে হিন্দিতে এক সুউচ্চ হাঁক পেয়ে জামাটা গায়ে দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে দেখি—পাগড়ি ও অল্প দাড়িসহ মেরজাই আঁটা এক বলিষ্ঠ মূর্ত্তি। খপ্ করে হাত ধরে বাংলায় কথা কইলেন,—'এসো এসো, সময় কম, কথা কইতে কইতে যাই, এক ঘণ্টাও সময় নেই, ট্রেন ছেড়ে যাবে।' বুঝলুম সত্যচরণ ভায়া। 'ব্যাপার কি, কবে এলে, এত তাড়া কিসের, কোথায় যাবে?' বল্লেন 'পুণায় চলেছি, শিবাজী সম্বন্ধে একখানা বই লেখার ইচ্ছে, সরে জমিনে তত্ব না নিয়ে সেটা করতে চাই না,—ইত্যাদি।' জানি একদিন থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করা বৃথা, কোন ফল হবে না। বিশেষ ওরূপ উদ্দেশ্য যাঁর, তাঁকে বাধা দেওয়াও উচিৎ হবে না। আমার বাসা থেকে ষ্টেশন একমাইল বা কিছু ওপর হবে। ভায়া টেনে নিয়ে চল্লেন। তাঁর সঙ্গে মার্চ্চ করেই চলতে হ'ল। ওঁদের সবই বীরের ছন্দ। ভায়া বক্তা আমি শ্রোতা। সব কথা প্রবীণ-ভাবেরও উপদেশ সঙ্কুল। সবই ভাল কথা। আমি হুঁ হাঁ দিয়ে চল্লুম। যৌবনের নবোৎসাহে ভায়া ভরপুর। বললেন, এখানে রয়েছে—দেখাটা করে যাব না,—এই তো হয়ে গেল।" বললুম, তোমার তাড়া দেখেও উদ্দেশ্য শুনে একদিন থেকে যেতে বলতে পারলুম না।' বল্লেন 'থাকা থাকি কি একটা মহৎ কাজ নাকি;—আচ্ছা এখন ফিরতে পার। লিখতে যখন পার কিছু লিখছ না কেন? লিখো' ইত্যাদি। আমি

---

(১) কেদারনাথের পত্র।

(২) কেদারবাবু খৃষ্টাব্দগুলি স্মৃতিশক্তির সাহায্যে লিখেছেন কাজেই ঠিক ঠিক হয় নি, কেননা যে শিবাজীর জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেই জীবন-চরিত লেখার বিষয় বস্তু সংগ্রহ ক'রতে নিশ্চয়ই তারও পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় যাত্রা করেছিলেন।

ফিরলুম, তারা মহৎ কাজে চলে গেলেন। ভাবলুম এরূপ উৎসাহ, উত্তেজনা ও সাহস না থাকলে মানুষ কিছুই ক'রতে পারে না।"

"সেখানে পৌঁছে ভায়া নিজ বাক্‌শক্তি ও বক্তৃতাগুণে মহারাষ্ট্র সুধীজনের কাছে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং আশাতীত অভিনন্দন ও সম্মানাদি আদায় করে ফিরেছিলেন। তখনকার সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী ও মাসিক পত্রিকাদিতে ফটোসহ সে সংবাদ অনেকেই পেয়ে থাকবেন। মহারাষ্ট্র স্বজন ও পণ্ডিতেরা তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির বহু উপকরণ নাকি সানন্দে সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমিও পত্রিকাদিতে বাঙালীর সে' গৌরবের কথা উপভোগ করেছিলাম।"

কেদারনাথের পত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের একটা দিক বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু কতকগুলি সংবাদ সমর্থনের জন্যই যে পত্রখানি এই প্রবন্ধে যুক্ত করেছি তা নয়; চরিত্রের যে দিকটা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না—সেই দিকটিকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তা উদ্ধৃত করেছি এবং সেই উদ্দেশ্যেই পত্রের শেষ অংশটুকুও পৃথকভাবে পাদটিকায় প্রকাশ করছি।(১)

(১) "তার পর কয়েক বৎসর কেটে গেছে। ভায়া ইতিমধ্যে 'ছত্রপতি শিবাজী,' 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি কয়েকখানি ঐতিহাসিক গবেষণাসহ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। প্রতাপাদিত্যে উল্লেখ আছে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় নামে প্রতাপাদিত্যের যিনি প্রধান সৈনাধ্যক্ষ বা কমাণ্ডার ইন চিফ্ ছিলেন তিনি লেখক সত্যচরণ ভায়াদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সে' সম্পর্কে প্রতিবাদের স্পর্শও দেখা দিয়েছিল, তার পরের কথা বা মীমাংসার কথা আমার জানা নেই, সম্ভবতঃ আমি তখন চীন রাজ্যে।"

"শাস্ত্রী মহাশয়দের বংশের সহিত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ও তৎপূর্ব্বে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বা আছে শঙ্কর সম্বন্ধে কথাটা তাঁদের বিশ্বাস করতে বিশেষ ইতস্ততঃ ভাব না আসাই সম্ভব। কারণ যাঁদের আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শঙ্কর যদি সেই অসমসাহসী, দীর্ঘছন্দ, বীরপ্রকৃতি ও **adventurous** বলিষ্ঠ বংশের পূর্ব্বপুরুষ হন সে ক্ষেত্রে যশোহরাধীপের তাঁকে **commander-in-chief** নির্ব্বাচন করাটা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ করতে মন চায় না। তবে প্রমাণসহ কি না সে সব অতীত গবেষকদের অধিকারের কথা।"

[প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী যে শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। 'শঙ্করের অধস্তন দশম পুরুষে পরম শ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী।'

(যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড)

মাননীয় সুবলচন্দ্র মিত্রের 'অভিধান,' শ্রদ্ধেয় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রভৃতি গ্রন্থেও একথা সমর্থিত হয়েছে।

বারাসত 'শঙ্কর স্মৃতি' প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাগণ শঙ্কর সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই [illegible] ও সাহায্য দিয়েছেন।]

বম্বাইএ একবার ডিটেকটিভ্ পুলিশ তাঁকে বন্দী করে রুষ চর বলে সন্দেহ করে'। জাষ্টিস্ রাণাডে, লোকমান্য তিলক প্রভৃতির চেষ্টায় অব্যাহতি পান।

হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে লেখার জন্য বিষয়বস্তু সংগ্রহের আশায় তিনি শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। **'Bataviaasch Nieuwsblad'** নামক ডাচ্ সংবাদপত্রে তাঁর সেই যবদ্বীপ যাত্রার সংবাদ বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয়েছিল। পরে সাহিত্য পত্রিকায় 'প্রাচী ভ্রমণ' নাম দিয়ে তিনি সেই ভ্রমণ কাহিনীটি প্রকাশিত করেছিলেন ধারাবাহিক ভাবে। ('সাহিত্য' ১৩১৯, আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই ভ্রমণ উপলক্ষ করে 'যবদ্বীপে হিন্দু' নামে একখানি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই এখানে সে' বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি।

"যাক্, শাস্ত্রীভায়ার সহিত জব্বলপুরে সাক্ষাতের পর দীর্ঘ কয়েক বৎসর আর দেখাশোনা হয় নাই। আমি যখন কানপুরে, খৃষ্টাব্দটা ১৯০৮ই হ'বে আবার সেই চিন্দি ডাক—'কেদারবাবু ঘরমে হায়।' 'হায়' বলে নেবে এসে দেখি সেই পাগড়ি দাড়ি ও মেরজাই, সত্যচরণ ভায়া উপস্থিত। 'আরে এসো এসো বসবে এসো ভাই।' তার ভাবটা ছিল সদাই ভ্রাম্যমান। বললেন 'বসবার সময় নেই, কান্যকুব্জ চলেছি, দেখাটা না করে কি যেতে পারি? এইত হয়ে গেল।' হর্ষবর্দ্ধন না শ্রীহর্ষ কি একটা বল্লেন, 'তাঁর সম্বন্ধে লিখছি। একটা রিসার্চে চলেছি, রামচন্দ্রের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহের আশা আছে,—' ইত্যাদি। তুমি আমার * * * ক্লাইব বলে বইখানা দেখেছ?' বললুম 'না।' একখানা তাঁর হাতে ছিল, দিলেন 'পোড়ো।' বললুম 'নিশ্চয়ই।' কিন্তু বইখানার কভার বা টাইটেল পেজখানা দেখেই চমকে গেলুম—'করেছ কি?' একমুখ হেসে বল্লেন 'যার প্রমাণ আছে তা লিখতে ভয়টা কি? ও কথাটা ঐ টাইটেল পেজে আর ভূমিকায় পাবে, ভেতরে সকল পৃষ্ঠাতেই 'ক্লাইব' পাবে। মিছে গোলমাল করে তো কভারটা বদলে দিলেই হবে।' ভায়া অকুতোভয়।

না বসা না জলখাওয়া—তারা কান্যকুব্জ যাত্রা করলেন। একেবারে ডবল মার্চ। পরে আমি ১৯০৯।১০এ, সময় না হতেই কার্য্যস্থল হতে অবসর লয়ে (retire করে) কাশী গিয়ে থাকি। সাল স্মরণ নেই, কাশী অবস্থানকালে শাস্ত্রী ভায়া দুইবার দেখা দেন। সেই ব্যস্ত ভাব। কথার মধ্যে 'গুড়ুক খাওয়াটা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। এখন তো সময় আছে দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধেই কিছু লেখো' ইত্যাদি। বলেছিলুম 'প্রাণের কথাই বলেছ ভাই। কতবারই ভেবেছি—তোমাকে ঐ কথাটি বলব। তুমি ঐতিহাসিক গবেষণার পথ জেনেছ,তার 'টেকনিক্ ও ফরমুলা' তোমার সড়গড়। আমি অন্ধ। বহুদিন হতে শুনে আসছি বাণরাজের সময় হ'তে দক্ষিণেশ্বরের 'দেউল পোতা' ও দীঘির বুকে বহু রহস্য গোপন রয়েছে। তার উদ্ঘাটন তুমি চেষ্টা পেলে কিছু ক'রতে পার, আশা করি —একদিন তুমি সে চেষ্টা পাবে। এখনও প্রাচীন লোক কেহ কেহ

বাল্যকাল থেকে যে দেশভ্রমণ স্পৃহা মনে অঙ্কুরিত হ'য়েছিল পরিণত বয়সে তা দিন দিন এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে জীবনের কোন দিনই স্থির ভাবে এক জায়গায় কাটাতে পারেন নি। ছেলে বয়সে যে হিমালয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে আবার সাড়া দিলেন সেই হিমালয়ের ডাকে। বাধা, বিপদ, প্রৌঢ়ত্বের দুর্ব্বলতা সমস্ত অতিক্রম করে' যাত্রা করলেন কৈলাসের পথে। এই ভ্রমণ কাহিনীটিও প্রথমে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে। 'কৈলাস ভ্রমণ' ভ্রমণকাহিনী হিসাবে বাংলা সাহিত্য-পাঠকের কাছে চির-আদরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতবর্ষ সম্পাদক মহাশয় তাঁর পুস্তকাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে "সত্যচরণ ইতিহাসে যেমন, ভ্রমণ বৃত্তান্তেও তেমনি নাটকোচিত ঘটনা সংস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেইজন্য ইতিহাসে ও ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে সজীবতার সঞ্চার করিতেন, তাহা ঐ সব রচনায় সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্যজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচিত হয় না।' (১) তাঁর এই মন্তব্যটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তিরই পরিচায়ক।

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন—"ব্রাহ্মণবীর ব্রাহ্মণোচিত তেজস্বিতা আচারনিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত অনুসন্ধিৎসা লইয়া ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও শ্যাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশসমূহ পরিদর্শন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে ঐতিহাসিকের জন্য এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন।" (২)

থাকতে পারেন, কিছু সাহায্য হতে' পারে। ক্রমেই দীঘি মজে এলো, দেউলপোতার ইটে তারি বুকে লোকের ভিটে বাড়ছে' ইত্যাদি। ভায়া মোদককেই বারবার 'খোদকের' কাজ ক'রতে বলে গেলেন—'তুমি চেষ্টা করলেই পারবে, আমি অনেক কাজে ব্যস্ত।' ব্যস্ত তিনি সত্যই।

শাস্ত্রীভায়া যেমন অধ্যবসায়ী তেমনি পরিশ্রমী ও ভ্রাম্যমাণ ছিলেন। ক্লান্ত জীবন অকালেই শেষ করে' চলে গিয়েছেন। ঐ প্রয়োজনীয় কাজটি আর হয় নাই, আমার আশা অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। তাঁর মত উদ্যমী পুরুষ বিরল, অল্পই দেখে থাকব। তাঁর সেই জোর কণ্ঠস্বর ও হিন্দি বুলি 'কেদারবাবু হায়?' আজিও ভুলি নাই। কেদারবাবু তো 'হায়'—কিন্তু বৃথা হায়।"

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ণিয়া, ১লা চৈত্র, ১৩৪৯

(১) ভারতবর্ষ—আষাঢ় ১৩৪২

(২) যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় খণ্ড।

১৯২৪ সালে হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে লেখার বাসনায় তিনি আর একবার শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করেন, পাশপোর্ট পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয় কিন্তু নানা কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

কৈলাস ভ্রমণের পরই শরীর তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৪২ সাল ৭০ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার অন্তর্গতঃ রিষড়া গ্রামে পরলোক গমন করেন।

নির্ম্মলচরিত্র শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন বহুগুণের আধার। জীবনের বহু সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণ কামনায়। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি ছিলেন হিন্দুমহাসভার একজন অন্ধ ভক্ত ও সভ্য। জীবনে বহু সভাসমিতিও পরিচালনা করেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি মালব্যজীর 'শুদ্ধি' আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন। উড়িষ্যার জলপ্লাবনে অক্লান্তকর্ম্মী যুবকের মত সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করে' সুচারুরূপে সেবাকার্য্য সম্পন্ন করেন। হিন্দুমহাসভার প্রচার কার্য্যের জন্য শেষ বয়সে ভ্রমণ করেন সমস্ত দক্ষিণ ভারত।

১৩৩৫ সালে বরিশাল হিন্দু-সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করে' তেজস্বিনী ভাষায় তিনি যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন তার প্রতিটি ছত্র স্বাধীনতাস্পৃহা ও স্বদেশানুরাগে পূর্ণ। তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন,—"স্বরাজ বা মুক্তি প্রত্যেক হিন্দুর ঈপ্সিত বিষয়। এজন্য চরিত্রবান হইতে হইবে। নিজের মহিমায় বিরাজিত হইতে হইবে। তবে আমরা স্বরাজের অধিকারী হইব। ভ্রষ্ট চরিত্র ইহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। স্বরাজ আমাদের ধ্যান ধারণার বিষয় হউক। স্বরাজ আমাদের জাগরণে চিন্তার বিষয় হউক, স্বরাজই আমাদের সকল অভিষ্ট পূরণের সহায়ক হইবে। ইহার প্রাপ্তিতে নানা বিঘ্ন আছে। দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে।...তবে আমরা স্বরাজলাভে সমর্থ হইব।"

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নানা মত ও আদর্শগত বিরোধ বর্ত্তমান থাকলেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে সারা ভারতবর্ষের মত এক ও অভিন্ন। সে যাই হোক, রাজনৈতিক মতবাদ বা আদর্শগত বিরোধের প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্র এ নয়; সেই অক্লান্তকর্ম্মী, ঐতিহাসিক ও স্বদেশানুরাগী শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার যথাযোগ্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করে' তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই এই প্রবন্ধ লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিদায়

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

বিদায় বেলায় মায়া-ডোরে বেঁধে
বৃথা কর ক্রন্দন।

জীবনে মরণ নিত্য সত্য
ছিঁড়ে ফেল বন্ধন।

সাদা পাথরের দেশে

শ্রীঅমিয়া দাস

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুললে দেখা যায় বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের আরাকান পর্ব্বতমালার গা ঘেঁসেই আরম্ভ হয়েছে ব্রহ্মদেশের তথা আরাকান বিভাগের বিস্তৃত সবুজ সমতলভূমি।

এই আরাকান বিভাগটী (**Arakan Division**) আকিয়াব (**Akyab**) স্যাণ্ডোয়ে (**Sandoway**) এবং কক্‌পিউ (**Kyaukpyu**) এই তিনটী জেলা (**district**) নিয়ে গঠিত এবং উক্ত তিনটী জেলার প্রধান শাসনকর্ত্তারা আকিয়াব, স্যাণ্ডোয়ে ও চক্‌পিউ নামে এই তিনটী সহরে বাস করেন। সহর তিনটীর অবস্থা বাঙ্গালাদেশের কোন কোন মফঃস্বল সহরের মতই, কিংবা আভিজাত্য গৌরবে তার চাইতেও ছোট।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে আমরা একবার আকিয়াব থেকে চক্‌পিউ যাবো ঠিক হলো। আকিয়াব থেকে চক্‌পিউ যাবার দু'টো রাস্তা—একটা হচ্ছে সমুদ্রপথে রেঙ্গুনগামী বড় জাহাজে ১২ ঘণ্টার পথ এবং অন্যটা নদী পথে লঞ্চএ ২৪ ঘণ্টার পথ। সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল বলে নদীপথই ধরবো ঠিক করা হল।

যাবার দিনে ভোর বেলায় আমরা লঞ্চঘাটে গিয়ে হাজির হলাম এবং বেশ একটুখানি ভীড় ঠেলেই আমাদের ডাঙ্গা আর লঞ্চের মাঝখানকার সেতু স্বরূপ সরু একফালি তক্তা পারাপার কর্ত্তে হোলো। পূর্ব্বাকাশের কুয়াসার আবরণ ভাল করে না মিলাতেই আমাদের লঞ্চ ডক ছেড়ে তার বিদায়-বার্ত্তা ঘোষণা করলে। সময়টা ছিল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।—আমরা যে জায়গা থেকে লঞ্চ-এ উঠ্‌লাম সেটা হচ্ছে সমুদ্র থেকে কেটে নেওয়া একটা খাল মাত্র। বর্ষার কয়েকটা মাস এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেড়ে যায় নৌ-ব্যবসায়ীদের কাছে। কারণ নদী-মুখের স্থায়ী ঘাটে তখন জল এত বেড়ে যায় যে ওখানে লঞ্চ, নৌকা কিংবা সি-প্লেন ইত্যাদি বেঁধে-রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

...লঞ্চ ঘাট ছেড়ে কিছুদুর আস্‌তেই তার গতি বাড়িয়ে দেওয়া হল। ততক্ষণে সূয্যের-তাপও বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। খালের দু'তীরে সারি সারি ধানের কলের চিম্‌নী আর কাঠ চেরাই করার কারখানা—এইভাবে কিছুক্ষণ চল্‌বার পর আমরা এসে পড়লাম মোহনায় অর্থাৎ যেখানে মায়ু নদী (mayu river) এসে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে—সেই জায়গাটীতে। খালের ঘোলাটে জল এবারে নীল হয়ে গেছে। শীতের দিনের সমুদ্র পুকুরের মতই স্থির, শান্ত। লঞ্চখানা হেল্‌তে দুল্‌তে নদীর সীমার মধ্যে ঢুকে পড়লো। পাহাড়ী নদী বলে এ নদীটী বেশ চওড়া এবং বারমাসই প্রচুর জল থাকে। নদীর এক তীরে সবুজ রঙের পাহাড় শ্রেণী, অন্যতীরে সোনালী রংএর ধানক্ষেত...মাইলের পর মাইল এ ভাবে যে কতদুর চলে গেছে তার ঠিক নেই। এসব জমির বেশীর ভাগ মালিকই হচ্ছেন ভারতীয় তথা পূর্ব্ববঙ্গীয় বাঙ্গালী এবং বোম্বে, গুজরাটী না-খোদা মুসলমান জমিদারগণ ...দূরে দিক্‌চক্রবালের প্রান্তে গাঢ় সবুজের রেখা শীতের কুয়াসা ভাঙা রোদ লেগে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে।...আরো কিছুদুর এগোবার পর দেখা গেল দু'তীরে সবুজে ঢাকা পাহাড় শ্রেণী আর জলের ধারে তাল গাছের মত অথচ তাল গাছের মত উঁচু নয় বরং তারই বামন আকারের এক রকম গাছের ঝোপ।...এদেশে অর্থাৎ আরাকানে এ গাছের পাতার ব্যবসায় বেশ লাভ-জনক। এই পাতাগুলিকে কেটে শুকিয়ে নিয়ে সরু একটা লম্বা কাঠিতে সাজিয়ে তা দিয়ে ছাউনীর কাজ চালান হয়। বাঙ্গালাদেশের খড়ের মতই এদেশের এ পাতা অপেক্ষাকৃত কম খরচে ঘরের চাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।...ঘরের ছাউনি হিসেবে পাতাগুলির যে আকারের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম—এখন সত্যিকারের পাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌তে গিয়ে বেশ একটু মজাই লাগ্‌ল।

...বেলা চারটে নাগাদ একটা অপেক্ষাকৃত বড় ষ্টেশনে লঞ্চ নোঙর ফেল্‌ল। এখানে যে সব যাত্রীরা ওঠানামা করলে—তাদের প্রায় সকলেই গ্রাম্য আরাকানীজ। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক এখানে লঞ্চটা অপেক্ষা করল এবং এই সময়টুকু লঞ্চের অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে শটীপাতা মোড়া বেতের ঝুড়ি ভর্ত্তি কয়েক মন 'নাপ্পি' বোঝাই হল—রপ্তানী হিসেবে।...তীর থেকে লঞ্চের মোটা মোটা দড়িগুলি খুলে দেওয়া হল—আবার লঞ্চ এগিয়ে চল্‌ল। ...লোকালয়ের সীমা ছাড়াতেই আবার আরম্ভ হলো সেই সবুজ কার্পেটে ঢাকা পাহাড়ের সারি, আর নাম না জানা (তালগাছের বামন-আকার) গাছের ঝোপ।...সবুজ পাহাড়ের রং ঘন নীল এবং তারপর হাল্‌কা নীল হয়ে ক্রমে আকাশের রংএর সঙ্গে মিশে গেছে যেন।—কখনো কখনো দেখ্‌লাম সরু নালার আকারে স্বচ্ছ একটা জলধারা কে জানে কোত্থেকে এসে বড় নদীতে পড়ছে।

...পশ্চিমাকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য মিলিয়ে যেতে না যেতেই দূরের পাহাড়ের পেছন থেকে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ হাসিমুখে বেরিয়ে এল। আমাদের লঞ্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদও ছুটে চল্‌ছিল যেন, কিন্তু মাঝে মাঝে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে পড়ে বেচারী চাঁদ বড্ড কাবু হয়ে পড়ছিল। ...কখনো কখনো মনে হলো এক একটা নক্ষত্র যেন খড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে আস্‌তেই সে ভুল ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মনে হলো দূরে পাহাড়ের চূড়ায় কোথায় যেন প্রদীপ জ্বলছে। জ্যোৎস্না রাতের রহস্যভরা আধো-আলো আধো-ছায়ায় সে আর এক—অদ্ভুত অনুভূতি। এযাবৎ যতটুকু পথ আমরা অতিক্রম করেছি তার সবটাই অদ্ভুত রকম নির্জ্জনতায় ভরাট। ...মাঝে মাঝে দু এক জায়গায় কলা গাছের বন দেখে মনে হয়েছে ওখানে নিশ্চয় মানুষ বাস করে—কিন্তু সঙ্গীরা বল্লেন—"দূর পাগল—এ পাহাড়ের ভেতরে কে আবার মানুষ থাক্‌তে যাবে?" কিন্তু পরে দেখেছি সত্যিই ছোট ছোট কয়েকটা আরাকানীজ বালক নদীর তীরে বসে বসে আমাদেরই

লঞ্চটীর দিকে জল ছুঁড়ে কৌতুক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ছে। অদূরেই তাদের ছোট্ট জীর্ণ মাচার মত ২।১ খানা কুটীর, আর ঘাটে বাঁধা জীর্ণ শীর্ণ ২।১ খানা নৌকা।

...শুন্‌লাম রাতে কয়েক ঘণ্টার জন্তে লঞ্চ চল্‌বে না—কারণ সম্মুখে বঙ্গোপসাগরের কিছুটা অংশ অতিক্রম কর্ত্তে হবে এবং তাতে রাতের আঁধারে যে দিক্‌ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে—তা থেকে বাঁচ্‌বার জন্তেই লঞ্চ কোম্পানীর এই ব্যবস্থা।

...গভীর রাতে এক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল।...দেখ্‌লাম আমাদের লঞ্চটা স্থির হয়ে নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই গায়ে ছোট ছোট ঢেউগুলি আছাড় খেয়ে পড়ছে। সামনে অদূরেই বঙ্গোপসাগরের গাঢ় সবুজ জলকে মনে হচ্ছে যেন একটী বিরাট হ্রদ।...ভোর বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্‌লো তখন দেখ্‌লাম লঞ্চের বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেওয়ার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।...আবার আর একটী নদীর মুখে আমাদের লঞ্চটা ঢুকে পড়লো এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চক্‌পিউর (kyaukpyo) ঘাটে এসে নোঙর ফেল্‌ল।...দূর থেকে এক সারি নারকেল গাছ চোখে পড়ছিল—এখন কাছে আস্‌তেই দেখ্‌তে পেলাম—নারকেল গাছগুলি যেন নেহাৎ অযত্নে এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া ভাবেই বেড়ে উঠেছে। কোন দিনই কেউ তাদের প্রতি যত্ন নেয় নি, আর তারাও তার দাবী না করে নিজের প্রাণ শক্তির প্রাচুর্য্যে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।...জেটী থেকে নেমে রাস্তায় পা দিতেই দেখি অন্যান্য সহরের রাস্তার মত এখানকার রাস্তায় পীচ্‌ তো দূরের কথা সুরকী পর্য্যন্ত নেই—তার বদলে দেখা গেল—অসংখ্য সাদা রংএর ছোট, বড়, মাঝারি—প্রভৃতি নানা আকৃতির পাথর।

নারকেল গাছের সারিটা যেখানে শেষ হয়ে গেছে—সেখান থেকে রাস্তাটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তার একটা শাখা সোজা চলে গেছে বাজারের দিকে এবং তারই অন্যান্য গুটিকয়েক ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা গেছে জন-বসতিপূর্ণ পাড়াগুলির দিকে এবং অন্য বড় রাস্তা গেছে স্থানীয় আপিস কোয়াটার্সের দিকে অর্থাৎ থানা, হাসপাতাল, কোর্ট, পোষ্ট আপিস ইত্যাদি ছাড়িয়ে একেবারে শেষ হয়েছে সমুদ্রের তীরে।

চক্‌পিউ এসে আমরা যাঁদের বাড়ীতে উঠ্‌লাম—তাঁদের বাড়ীর ছোট্ট উঠোনে পা দিয়েই মনে হলো সমস্ত উঠোনটাতেই যেন মাছের আঁশ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা নোংরা মনে হলেও চুপ করে থাকাটা ভদ্রতা হবে ভেবে চেপে গেলাম—তখনকার মত।...কিন্তু বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আমার ভুল ভেঙে গেল। পথে বেরিয়ে দেখি সমস্তটা রাস্তা ভর্ত্তি ইঁট, পাথর ভাঙা, ইত্যাদির বদলে সাদা রংএর এবং মসৃণ নানা আকারের অজস্র পাথর। এসব রাস্তায় তাড়াতাড়ি হাঁটতে যাওয়াটাই দেখ্‌লাম বোকামী, কারণ মসৃণ পাথরের ওপর খসখসে রবার সোলের জুতো না হলেই পা পিছ্‌লাবার ভয় থাকে যথেষ্ট।...সুন্দর সুন্দর কয়েকটী পাথর চোখে পড়ায় কুড়াতে সুরু করেছিলাম—এমন সময় সঙ্গের ছেলেটী বল্‌লে—"পিসিমা—ও আপনি কুড়িয়ে শেষ করতে পারবেন না। সমস্ত দেশটাই সাদা পাথরে তৈরী—তাই তো দেশটার নাম হচ্ছে 'চক্‌পিউ' অর্থাৎ "সাদা পাথরের দেশ।"...তিনদিন ছিলাম ওখানে—তখন প্রমাণ পেলাম সত্যি সত্যিই সাদা পাথরের দেশই বটে। মসৃণ পাথর, করকরে বালি আর সবুজ ঘাস এবং অন্যান্য গাছপালার অত্যাশ্চর্য্য সমাবেশ দেখে প্রথমটায় একটু বিস্মিত হতে হয়।

এখানে এসে অভিজ্ঞতা হলো গরুর গাড়ী চড়ার। ছোট্ট একটী দ্বীপের মত জায়গায় সহরটী অবস্থিত। এর প্রায় তিন দিকেই বঙ্গোপসাগরের উত্তালতরঙ্গমালা অহোরাত্রি সতর্ক প্রহরীর মত মোতায়েন রয়েছে। নগণ্য আয়তনের দরুণ কোন রকম দ্রুতগামী যান বাহনের প্রয়োজনীয়তা সহরবাসীরা বোধ হয় অনুভবই করে না। বাইসাইকেল কারো কারো আছে তা দেখেছি বটে, তবে তাও নিতান্ত বড়লোকী সখ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কাজে আসে বলে মনে হোলো না।

শুনেছিলাম সহর থেকে মাইল খানেক দূরে একখানা মাত্র পাথরে. বুদ্ধদেবের নানা রকম মূর্ত্তি খোদাই করা কয়েকটী মন্দির আছে। চক্‌পিউ যাবার দ্বিতীয় দিন গরুর গাড়ীতে করে আমরা সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। ভেবেছিলাম মাইলখানেক পথ হেঁটেই চলে যাবো, কিন্তু সকলেই বললেন পথের দূরত্ব বেশী না হলেও বালি আর পাথরে মেশান রাস্তায় কষ্ট হবে এবং তাতে সময়ও লাগ্‌বে অনেক। কাজেই অগত্যা বাধ্য হয়েই চড়ে বস্‌লাম গরুর গাড়ীতেই। সূর্য্যাস্তের প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে গিয়ে আমাদের গাড়ী মন্দির সীমার মধ্যে পৌঁছুল।...কে যে কোন যুগে এ মন্দিরাবলীর এমন রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন—সে ইতিহাস আমরা জানতে পারিনি সুযোগের অভাবে। কিন্তু মনে মনে সেই অজানা ভক্তটীকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারলাম না। ভাব্‌লে বিস্মিত হতে হয় চারিদিকের ঐরকম অজস্র সবুজের বুকে কি করে একটীমাত্র রুক্ষ কাল পাথরের পাহাড় গড়ে উঠ্‌ল? এ যেন সুন্দর একটী মুখের ওপর ছোট্ট কাল একটী তিল—এমনই অপূর্ব্ব তার সৌন্দর্য্য।...পাথরটীর উচ্চতা একটী দোতালা বাড়ীর মতই হবে। দেখলাম মন্দিরের শেওলাপড়া দেওয়ালের গায়ে আমাদেরই মত কত কৌতূহলী কিংবা ভক্ত দর্শকের নাম আর ঠিকানা লেখা রয়েছে। মন্দিরের ভেতরে বুদ্ধদেবের ধ্যানরত মূর্ত্তির সম্মুখে পাথরের বেদীমূলে রয়েছে ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদিত জ্বালিয়ে দেওয়া মোমবাতির গলিত অংশ।

মন্দিরাবলীর শিল্পগৌরব বিশেষ না থাক্‌লেও প্রাচীনতার আভিজাত্যের দাবী তারা অনায়াসে কর্ত্তে পারে। পাথর কেটেই মন্দির এবং মূর্ত্তিগুলি গড়া বলেই বোধ হয়; প্রত্যেকটী বুদ্ধমূর্ত্তিরই মাথা কিংবা পীঠের দিকটা মন্দিরের ছাদ এবং দেওয়ালের সঙ্গে জোড়া লাগান।

মন্দির থেকে যখন বেরুলাম তখন দেখি সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন। শুনলাম ঐ মন্দিরের পেছনেই রয়েছে সীমাহীন সমুদ্র। অনেককেই দেখলাম পাথরটীর ঢালু গা বেয়ে একেবারে মন্দিরগুলির উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্ত দেখতে লাগলেন। আমার বেশ একটু খারাপ লাগল এই ভেবে যে—যে মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মাথা নীচু করে সমস্ত প্রাণের চাঞ্চল্যকে সমাহিত করবার শক্তি সঞ্চয় করলাম সেই পাথরের দেব-মূর্ত্তির মাথার উপর (যদিও পাথরের ছাদের আড়াল ছিল) দাঁড়াবো

কি করে? তবুও শেষ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রেরণার কাছে সাময়িক সংস্কারের আবেদন টিক্‌লো না। উঠে দেখি—সত্যিই অপূর্ব্বই বটে! সমুদ্রের সূর্য্যাস্ত দেখার সুযোগ আমাদের জীবনে এই প্রথম নয়, কিন্তু সমতল ছেড়ে একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর সূর্য্যাস্ত আর আগে কোন দিন দেখিনি। দেখলাম মন্দিরগুলোর ঠিক পেছন থেকেই আরম্ভ হয়েছে ধূ ধূ করা বালির চর। তখন ছিল ভাঁটার টান—তাই সমুদ্র ছিল একটু দূরে—পড়ন্ত রোদের আভায় সমস্ত চরটা চিক্ চিক্ করছে···সে এক দৃশ্য বটে! মনে হচ্ছিল—না জানি বর্ষার দিনে এ জায়গাটার রূপ আরো কত সুন্দর হয়েই না ওঠে!

এবার বাড়ী ফেরার পালা।···তার আগে জায়গাটার চারপাশে একটু বেরিয়ে দেখবো বলে ডাইনে ফিরতেই চোখে পড়ল একটা কাঠের দোতালা মঠ-বাড়ী। এমনি এক একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ গড়ে ওঠে—এ আমাদের জানা ছিল। এই মঠ বাড়ীগুলি সাধারণতঃ কাঠ, টীন দিয়ে তৈরী হলেও এ বাড়ীগুলির চূড়ায় বিশেষত্বপূর্ণ গড়নই তাদের পরিচয় দিয়ে দেয় সহজেই। কাছে গিয়ে গলা বাড়াতেই চোখে পড়ল দু'টী এগার বারো বছর বয়সের মুণ্ডিত-মস্তক আরাকানীজ ছেলে পড়া নিয়ে ব্যস্ত।···মনটা একটু নাড়া দিল এই ভেবে—কি পায়, কি শিখ্‌তে পারে ওরা এ বয়েসে এ রকম কঠোর সংযম পালন করে? যদিও সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আরাকানীজ গৃহস্থদের এটা একটা অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যার আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের তীর ধরে আমাদের গাড়ী চল্‌তে সুরু করল। পথে কোন কোন জায়গায় গাড়ী সমুদ্রতীর ছেড়ে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে ছুটছিল। এ সময় একটা দৃশ্য আমাদের বড় আরাম দিয়েছিল।···এখানকার গ্রামবাসীরা সত্যিই বড় গরীব অথচ সরল এবং সেই সঙ্গে বলা চলে নোংরা; কিন্তু তাদের ঘরে এমন একটা শিশু দেখিনি যাকে সুস্থ এবং হৃষ্টপুষ্ট শিশু না বলে অন্য কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায়।···এক জায়গায় দেখলাম একটা পাঁচ ছয় বছর বয়সের মেয়ে তার বছর দেড়েকের ভাইটাকে কোলে নিয়ে একপাশে কাৎ হয়ে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দলটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে।···আরো একটা জিনিষ মনকে নাড়া দিয়েছিল—তা হচ্ছে এদেশের লোকের ফুল-প্রীতি। এমন একটা কুঁড়ে দেখিনি যার আঙ্গিনায় দু'একটা নিতান্তই যেমন তেমন গোছের ফুলের চারা নেই।

···সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যা হতেই সমুদ্রের গর্ভ থেকে হাসিমুখে চাঁদ বেরিয়ে এল। এবার যে রাস্তা আরম্ভ হল তার একদিকে ধানক্ষেত অন্যদিকে সমুদ্র। চাঁদের আলোতে প্রায় কেটে আনা শূন্য ধানের ক্ষেত আর ধূ ধূ বালুময় চর ও নীলবারিধি যেন একাকার হয়ে গেছে। যদিও পূর্ণিমার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলও ফুলে ফুলে ক্রমেই তীরের দিকে এগিয়ে আসছিল তবুও ইচ্ছা হচ্ছিল গাড়ী ছেড়ে চরে নেমে হাঁটতে সুরু করি। কিন্তু বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হবে ভেবে সঙ্গীরা প্রায় সবাই আপত্তি জানালেন।

···পরদিন আমার চক্‌পিউ থেকে ফিরবার কথা। আগে ঠিক ছিল আমরা সমুদ্রগামী বড় জাহাজেই যাবো কিন্তু কি কারণে ঐ দিন বড় জাহাজ আসবে না খবর পাওয়ায় আমাদের লঞ্চেই অর্থাৎ নদীপথেই যাওয়ার ঠিক হল। পথে নূতনত্ব কিছু থাক্‌বে না ভেবে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল—কিন্তু বড় জাহাজের জন্য অপেক্ষা করারও আমাদের উপায় ছিল না।

খুব ভোরবেলা চক্‌পিউর ঘাট থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওখানকার ঘাটের জনতা, তীরের নারকেল গাছের সারি ···আর তারই মাঝখানে মাঝখানে খাপছাড়াভাবে মাথা তুলে দাঁড়ান কয়েকটা কুঁড়ে ঘর···সবই ধীরে ধীরে একটা কালো রেখায় একাকার হয়ে গেল।···এবার লঞ্চে ভীড় অনেকটা কম ছিল···তাই রেলিং ধরে কায়েমীভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের ক্রমবিলীয়মান সবুজ সীমা রেখার দিকে তাকাবার সুযোগ করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।···চক্‌পিউর সমুদ্রতীর থেকে দেখেছিলাম—তীর থেকে কয়েক গজ মাত্র দূরে ছোট্ট দ্বীপের মত একটুখানি সবুজ ভূখণ্ড—তার মধ্যে তেমনি ছোট্ট একটা খেল্‌নার পাহাড় যেন এবং সেই সঙ্গে খানিকটা সবুজ ঝোপ জঙ্গল।··· শুনেছিলাম ছুটীর দিনে সখ করে কেউ কেউ নৌকো করে ওখানে গিয়ে পাখী শিকারের আনন্দ উপভোগ করতে যায়। এ ছাড়া শুধুমাত্র বনভোজন উপলক্ষে ও অনেকে যায়!···এবার লঞ্চ থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখ্‌লাম—ছোট্ট একটা কাল বিন্দু ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না ঐ দ্বীপটাকে।

পথে এবার অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রামের ঘাটে আমাদের লঞ্চ থেকে দু'একজন করে যাত্রী ওঠা নামা করল। বেশীরভাগ ঘাটেই দেখলাম লঞ্চ তীরে ভিড়াবার কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই। তাই তীর থেকে গ্রামবাসীরাই কয়েকজনে মিলে একটা চেরাই তক্তা লঞ্চএর পাটাতনের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল এবং তারই সাহায্যে দু'একজন গ্রাম্য যাত্রী তাদের যৎসামান্য বাক্স বিছানা নিয়ে ওঠা নামা করলো। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের দুগ্ধপোষ্য ভাইবোনদের কোলে নিয়ে লঞ্চ-যাত্রীদের দেখছিল। সরল তাদের জীবন, উজ্জ্বল তাদের চাহনি। হয়তো তাদের জানতে ইচ্ছে জাগে—"রোজই এত লোক কোথায় যাওয়া আসা করে?" বড় হলে তাদের জীবনেও আসতে পারে এমনি চাঞ্চল্যময় দিন···কিন্তু সেদিন যে এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গর্ভে।

···মাইলের পর মাইল কেটে গেল একটানা সবুজ পাহাড়ের সারি দেখে দেখে—কেবল কদাচিৎ কোন পাহাড় চূড়ায় একটা সাদা বিন্দু অর্থাৎ কোন ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর কীর্ত্তি সমুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা।···একটা পাখী পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না···শুধু আমাদের লঞ্চটাই জল কেটে কেটে এগিয়ে চলার একঘেয়ে একটা শব্দ।

সন্ধ্যেবেলায় আমাদের লঞ্চ 'মেইবোন' (Myebon) নামে একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের ঘাটে নোঙর ফেল্‌ল। এখানে যাত্রীরা প্রায় সকলেই নেমে গেলেন কারণ এই রাতটা লঞ্চ এখানেই থাক্‌বে এবং পরের দিন ভোরের আগে ছাড়বে না।···পূর্ব্বপরিচিত এক ভদ্রলোক আমাদের নিতে আসায়

আমরাও জিনিষপত্র সব কেবিনেই তালাচাবী লাগিয়ে নেমে গেলাম। এ গ্রামটাতেও গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। পথগুলি খুবই সরু—এমন কি দু'খানা গরুর গাড়ীও পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারে না। তবে সুবিধা এই যে ঘাটের কাছাকাছি ঘিঞ্জিপাড়ার ভেতরে আর গাড়ীর দরকার বড় একটা হয় না।

আমাদের পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী স্থানীয় একজন নামকরা ব্যবসায়ী। বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে পথ চল্‌বার সময় চোখে পড়ল ওদের সৌন্দর্য্যবোধের একটা দৃষ্টান্ত। আসল গ্রাম্য আরাকানীজদের কাছে গিয়ে দেখা—এই আমাদের প্রথম।…সদর অন্দর বলে গরীব গৃহস্থ-ঘরে কোন বালাই-ই নেই। বাঁশের মাচার ওপর তিন দিকে বাঁশের বেড়া এবং সামনের দিকটায় বাঁশের ঝাঁপির ব্যবস্থা করা। দিনের বেলায় ঐ ঝাঁপি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে তুলে রাখা হয়।… সামনেই হয় তো মুদী দোকানের উপযুক্ত কতকগুলি মালমসলা—আর একটা মেয়ে বসে আছে জিনিষপত্র বিক্রয় করার জন্য ; সে এক হাতে পাশেই ঝুলান একটা বেতের অথবা কাপড়ের দোলনায় শোয়ান শিশুটাকে দোল দিতে দিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রেতার সঙ্গে জিনিষের দরদস্তুর করছে। এ সব বাড়ীর আঙ্গিনা বল্‌তে সদর রাস্তাকেই বোঝায়। পথে যেতে দেখা গেল, কতকগুলি বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তায় কালো মাটীতে সাদা রংএর পাথর রকমারি করে সাজান। যাঁদের বাড়ীতে আমরা যাচ্ছিলাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—চকপিউর মত ওঁদের এ দেশটাও সাদা পাথরের কিনা— তখন তিনি বল্লেন যে—ওগুলো পাথর নয় সামুদ্রিক ঝিনুক।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা লঞ্চেই ফিরে এলাম। রাত প্রায় দশটায় ঘাটে এসে দেখি ভাঁটার জন্যে আমাদের লঞ্চটাকে মাঝ নদীতে নিয়ে নোঙর করে রাখা হয়েছে। অতএব নৌকার সাহায্যে আমাদের ওখানে যেতে হবে। শীতের রাতের কুয়াসা-ঢাকা জ্যোৎস্নায় সম্মুখের নদী, লঞ্চ এবং অসংখ্য জেলে ডিঙ্গি—সবই এক হয়ে গেছে যেন। কেবল কদাচিৎ দু' একটী ক্ষীণ-শিখা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো অধ্যবসায়ী মৎস্যব্যবসায়ীদের কর্ম্মপটুতার নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করছে।

শুনলাম এখানে খুব মাছ পাওয়া যায় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বেশীর ভাগই মাছের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে থাকে সারাটী বছর। এই গ্রামটাতে মাছ বেশী বলে নাপ্পির (ব্রহ্মদেশের একটী প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত) ব্যবসায়টাও ভালই চলে।

পরদিন খুব ভোরেই ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চ পথ চল্‌তে সুরু করলে। আবার আরম্ভ হলো অবিচ্ছিন্ন সবুজ পাহাড়ের সারি—তার কোথাও নেই এতটুকু ছেদ, এতটুকু বৈচিত্র্য, এতটুকুও বিশৃঙ্খলা।…আর এই যে নদীটী—একে যেন মনে হচ্ছে বিশ্রামরত বিরাট এক অজগর।…পাহাড়ী নদীর নিয়মই বোধ হয় এই—তাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এরা খেয়ালী মেয়ের মত পথ বদলায়—প্রাণের অদম্য আবেগকে যেন আর বেঁধে রাখতে পারছে না—তাই এখানে ওখানে কেবলই বাঁকের সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। লঞ্চ যখন চলতে থাকে তখন কেবলই মনে হতে থাকে— আর একটু এগুলেই বুঝি এক্ষুণি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে যাবে— কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় আরও খানিকটা পথ রয়েছে চল্‌বার মত।

একস্রোতা নদী বলেই বোধহয় ঢেউ নেই মোটেই।—জোয়ার ভাঁটারও বিশেষ বালাই নেই। বারমাসই জল থাকে প্রচুর—কেবল গ্রীষ্ম, বর্ষায় জল বাড়ে কমে এই যা। জলের ধারের ঝোপগুলি লক্ষ্য করলে জানা যায় বর্ষায় নদী কতখানি ফেঁপে উঠেছিল কারণ গাছের গুঁড়িতে সীমা নির্দ্দেশের প্রাকৃতিক চিহ্নস্বরূপ একটী শুক্‌নো কাদার দাগ রয়ে গেছে।

সমস্ত পথের বেশীর ভাগটাই বড় নির্জ্জন আর এক ঘেঁয়ে মনে হয় এক এক সময়। কারণ পাহাড়ের সীমা ছাড়িয়ে দৃষ্টি আর বেশী দূর যেতে পারে না বলে শীগ্‌গিরই দেখার আনন্দে ক্লান্তি এসে পড়ে।

এই দিন বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ আকিয়াবের অতিপরিচিত ঘাটে এসে লঞ্চ নোঙর ফেল্‌ল।……

……চক্‌পিউ ছেড়ে এসেছি অনেক দিন, কিন্তু আজো পুরোণো স্মৃতিকে স্মরণ করে আনন্দ ব্যথায় মনটা থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে ওখানকার অগুন্তি রকমারী আকারের সাদা সাদা চকচকে পাথর কুড়ানোর কথা—ভাবি, যদি পছন্দসই সব পাথরগুলোই নিয়ে আস্‌তে পারা যেত তাহ'লে কি মজাটাই না হোতো। সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে চকপিউ যাওয়ার পথের অফুরন্ত সবুজে ঢাকা নির্জ্জন পাহাড়, চূড়ার বৌদ্ধ-মঠবাসী সংসারত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসব্রতধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কথা। জগতের কোন খবরই তাঁরা রাখেন বা পান বলে মনে হয় না। কত সহজ অনাড়ম্বর তাঁদের চাল চলন—অথচ কঠোর তাঁদের সাধনা।

অচ্ছেদ্য ভীড়ের মধ্যে আমরা বাস করি, আমাদের কল্পনা করতেও কষ্ট হয়—কি করে এত নির্জ্জন জীবন যাপন করেন এঁরা ?

কবি গিরিজাকুমার স্মরণে

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

কবি তুমি নাই, মাজিনাক মোয়া শূন্য আলয় দ্বারে
হানি করাঘাত মাধবী প্রভাত ফিরে যাবে বারে বারে,
পিক্ পাপিয়ার বারতা বোঝাতে বকুল চাঁপার বনে
যে আলোক জ্বলে অলস বেলায় গোধূলীর লগনে ;

যে বাণী জানায় রজনীগন্ধা রাত্রির ছায়াতলে
ছন্দে গাঁথিয়া অর্ঘ তাহার তুমি কি দিবে না বলে ?
আছ তুমি জাগি আমাদেরি লাগি অপলক দুই আঁখি
অচিন পুরীর পান্থ চিনায়ে বেলাশেষে নিও ডাকি।

বাসুদেব ঘোষের "গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস" পদাবলী

অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় এম্‌-এ

প্রেমাবতার মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের পূত-জীবন এক অপূর্ব মহাকাব্য বিশেষ। দীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া তাহা কত কবি ও ভক্তের কল্পনা এবং আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার উপাদান যোগাইয়া আসিতেছে। দেবচরিত্রব্যাখ্যানে অনন্তচিত্ত কবিগণ এই প্রথম মনুষ্যচরিত্রে দেবত্বের ছায়াপাত লক্ষ্য করিলেন ;—মনুষ্য জীবনী রচনার সূচনা হইল তাঁহারই মহিমান্বিত চরিত্রকে আদর্শ করিয়া। চৈতন্তদেবের সমসাময়িককালে তাঁহার জীবনলীলা বর্ণনা করিয়া যে কয়টি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তন্মধ্যে "শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চার" উল্লেখ এবং কতিপয় উধৃতিমাত্র "চৈতন্তচরিতামৃতে" দৃষ্ট হয়। কবিকর্ণপুরের "চৈতন্ত চন্দ্রোদয়" মুখ্যত চৈতন্তদেবের জীবনের নাট্যরূপ। সুতরাং চৈতন্ত চরিতাবলীর মধ্যে মুরারিগুপ্তের কড়চাই আদিগ্রন্থ। চৈতন্তের বাল্যজীবন ইহার অবলম্বিত বিষয়। এই তিনখানিই সংস্কৃতে রচিত। মুরারি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও চৈতন্তের সহপাঠী এবং প্রতিবেশী ছিলেন। এই কারণে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে মুরারির কড়চার স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু কল্পিত অলৌকিক কাহিনীর দ্বারা চৈতন্ত চরিত্রকে তিনি এমনই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন যে ঐতিহাসিকের তাহাতে নির্ভর করা চলে না। গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন কিনা এবং তদ্‌রচিত "কড়চা" সত্যই প্রমাণিত কিনা এই দুই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকেও হিসাবে আনা যায় না। সুতরাং চৈতন্ত সমসাময়িক যুগের নির্ভর যোগ্য তথ্যবিরলতার মধ্যে তদীয় লীলাসহচর ভক্তবৃন্দের বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বর্ণনাদি যথার্থই চৈতন্ত জীবনের উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়া থাকে। একাধিক কবি এই সময়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক বাঙ্গালা পদ রচনা করেন। তন্মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ—এই তিন ভ্রাতাই পদকর্তা এবং গৌরাঙ্গগঠিত সঙ্কীর্তনদলের মূল গায়করূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনজনেই প্রত্যক্ষীভূত মহাপ্রভুর জীবন লীলাকে কাব্যরূপ দিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে বাসুদেবের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পদ অতুলনীয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ৺সতীশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, বাসুদেব "গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিতেন ; তাই গৌরলীলার বর্ণনা করিতে যাইয়াও প্রায় সর্বত্রই তিনি পূর্বযুগের কৃষ্ণলীলার সহিত তাঁহার বর্ণিত গৌর-লীলার বিষয়গত ও ভাব-গত সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপলীলায় যে ব্রজগোপীদের অভাব ছিল, নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার অনুকরণে বাসুদেব নিজেকেও অন্যান্য গৌরভক্তগণকে সেই "নদীয়া-নাগরী" কল্পনা করিয়া "নাগরী" ভাবের পদ নামক এক স্বতন্ত্রশ্রেণীর পদেরও সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ব্যাপারের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের অন্তর মথিত এমন এক বেদনা-করুণ ভাব জড়িত হইয়া আছে যে আজও সেই কাহিনী শ্রবণে কীর্তনে বাঙ্গালীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। বাসুদেব ঘোষ সেই নবীন সন্ন্যাসীর অভিনিষ্ক্রমণ আনুপূর্বিক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, দরবিগলিত ধারায় প্লাবিত বক্ষে সেই বিয়োগবেদনা সহিয়াছেন, আবার বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনাও পাইয়াছেন। সারল্য ও গভীর আর্তিতে পরিপূর্ণ সেই সন্ন্যাসের পদাবলী কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল চৈতন্ত-চরিত্রকে অপূর্ব মহিমা দান করিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—

> বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
> কাষ্ঠ পাষাণ দ্রব হয় যাহার শ্রবণে ॥—(চৈ-চ-আদি। ১১শ)

একটি কথা এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে। বাসুদেব আজিকার দিনের সংবাদপত্র প্রতিনিধির মত অবিচলিতভাবে বেদনাদায়ক ঘটনারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতে বসেন নাই। ব্যথিত চিত্তের উচ্ছ্বাস এক একটি অশ্রুবিন্দুর মত কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সরল কবিত্বের পটভূমিকায় ফুটিয়াছে সন্ন্যাসের করুণ চিত্র, নাই বা হইল তথ্যের প্রতিলিপি! তবু বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য কে অস্বীকার করিবে ?

পিতৃভক্ত সন্তান গৌরাঙ্গ পিতৃপিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়ায় গেলেন। কিন্তু তথায় ঈশ্বরপুরীর ভগবদ্‌ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পাণ্ডিত্যাভিমানী যুবক গভীর ভগবদ্‌ প্রেরণায় অন্তরে অন্তরে বৈরাগ্য বরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। সংসার সেই জীবন্মুক্ত পুরুষকে আর বাঁধিতে পারিল না। বাসুদেব সেই কৃষ্ণপ্রেমতন্ময়তার বর্ণনা দিতেছেন :—

> আজু কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান। কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ান॥
> সে মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। কত সুরধুনী ধারা আঁখিযুগে ঝরে।
> হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাষ॥

আবার অন্যত্র—

> রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণ-নাম-মধু। অমিয়া বরিখে যেন নিরমল বিধু॥
> তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি॥ ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি।

তাঁহার—"শতকুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি"—অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণদেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব-সম্পদের বিচিত্রপ্রকাশ দেখিয়া নদীয়ার লোকের চিত্ত কি স্থির থাকিতে পারে ? বিরলে বসিয়া হরিনাম জপিতে জপিতে তাঁহার—

> সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। ধূলা বিনু আন নাহি তায়॥
> ছাড়ি পহুঁ লখিমী বিলাস। এবে ভেল তরুতলে বাস॥

এই 'লখিমী' নিশ্চয়ই গৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী নহেন ; কেননা, চৈতন্যের গয়াযাত্রার পূর্বেই তিনি সর্পদংশনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি দ্বিতীয়া পত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই হইবেন। বৃন্দাবনদাসও লিখিয়াছেন ; শচীমাতা—

লক্ষ্মীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥ (চৈঃ ভাঃ—আদি)

চৈতন্যের এই দিব্যোন্মাদে কি কৃষ্ণ-পাগলিনী রাধিকার ভাব-বিহ্বলতা প্রতিফলিত হয় নাই ?

সিংহদ্বার তেজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায় ॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। দীঘল শরীর গোরা পড়ি মুরছায় ॥
উত্তান-শয়নে মুখে ফেনা বাহিরায়। বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায় ॥

ভাবী ঘটনার ছায়াপাত নানা লক্ষণের দ্বারা হইয়া থাকে, শংকিত মন তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বাভাসও যেন বিষ্ণুপ্রিয়া পাইতেছে। ঘাট হইতে আর্দ্র বস্ত্রে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে শচীমাতাকে বলে—

—কি কর জননী। চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণ ॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর। ভাঙিবে কপাল মাথে পড়িবে বজর ॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে বাম আঁখি। দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন রহি রহি দেখি ॥

সরলা বধূতো জানেন—তার সুখের কপাল ভাঙ্গিতে আর দেরী নাই। নিয়তির সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবও যেন কাঁদিয়া বলে—"ওগো সতী, আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি।"

তারপর সেই বিচ্ছেদের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিল। গৌরাঙ্গ নিভৃতে গৃহত্যাগ করিলেন। স্নেহময়ী মাতা, তন্বী বধূ পিছনে পড়িয়া রহিল। সন্ন্যাসের পূর্বরাত্র গৌরাঙ্গদেব বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, ইহাই ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু বাসুদেব বর্ণনা করিতেছেন ; শেষরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া—

শুধা ঘাটে দিল হাত বজ্র পড়িল মথাত
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।

এই আশঙ্কা করিয়া শচীমাতার কক্ষদ্বারে বিষণ্ণ বদনে আসিয়া বলিতেছেন—

শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশিভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।

সন্ন্যাসের রাত্রে নিজ পত্নীর সহিত এক কক্ষে বাস করা কি এতই অসম্ভব যে তাহা কল্পনা বা বর্ণনা করিতে বিচলিত হইতে হইবে? বৃন্দাবন দাস সে ঘটনা হয়ত বা এড়াইয়া গিয়াছেন। লোচনদাস তাঁহার অপূর্ব কল্পনাভঙ্গিতে সন্ন্যাস-রাত্রে দম্পতির শেষ দীর্ঘ-প্রিয়সম্ভাষণের যে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাহুল্যপূর্ণ ও অসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু বাসুদেবের বর্ণনা যে হুবহু সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৈরাগ্যপ্রবণ গৌরাঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠায় একে পূর্ব হইতেই শচীমাতার চোখের ঘুম উবিয়া গিয়াছিল, তার উপর—

আউদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।

অবিলম্বে বাতি জ্বালাইয়া সর্বত্র খুঁজিলেন, "নিমাই নিমাই" বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সহ আকুল ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিয়া পথ চলিলেন। নদীয়ার লোক জাগিয়া শুনিল—নদের চাঁদ নাই। নবদ্বীপে শোকের বাণ ডাকিল, পথ দিয়া একটি পথিক যাইতে পারে না, গভীর উৎকণ্ঠায় একসঙ্গে দশজন তাহাকে গৌরাঙ্গের কথা শুধায়, কে একজন বলিল—কাঞ্চননগরের পথে সঙ্গীহীন গৌরাঙ্গকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ প্রভাতে ও স্নানান্তে শুচি হইয়া ভক্তেরা গৌরাঙ্গ দর্শনে আসিয়াছে, কিন্তু—

গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি— বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে।

শচী বিলাপ করিয়া নিতাইকে এই বেদনার কথা বুঝাইতেছেন ; শোক-বজ্রাহত বধূ নিস্পন্দ পড়িয়া আছে, আর বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান শিরে করাঘাত করিয়া শুধুমাত্র ইঙ্গিতে সকলকে জানাইতেছে—"গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।" এ শোকদৃশ্য সত্য ছবি আঁকিয়া লইবার যোগ্য।

এদিকে কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষশাখায় গিয়া গৌরাঙ্গদেব বসিলেন। এই অপূর্বদৃষ্ট যুবকের গৌর অঙ্গের কাঞ্চনদীপ্তি দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। এইখানে একটি পদে বাসুদেব বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নারীর পতিনিন্দা ও রূপমুগ্ধতার ঈষৎ অবতারণা করিয়াছেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে এই বিষয়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা বাসুদেবের স্মৃতিপথে আসিয়াছিল কি? গৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া আলোচনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কেশবভারতী সেখানে উপনীত হইলেন। তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া গৌরাঙ্গ প্রার্থনা জানাইলেন—

কৃষ্ণদাস কর গোসাঞি দেহ ভক্তিবর।

কেশব-ভারতীর কৃপা হইল। দীর্ঘ চাঁচর চুল মুড়াইয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া গৌরাঙ্গ গৈরিক বস্ত্র চাহিলে ভক্তেরা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, ক্রন্দনে আকাশ ভরিয়া তুলিল। কেশবভারতী তাঁহাকে কৌপীন ও দুইখণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধানের জন্য দিলেন। গৌরাঙ্গ ভক্তবন্ধুদের নিকট হইতে গদ্‌গদ্‌ভাবে বিদায় লইলেন—

করিলাম সন্ন্যাস— নহে যেন উপবাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে।

এই বলিয়া গৌরাঙ্গ পুনরায় সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

এদিকে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদ তড়িৎগতিতে আসিয়া সকলকে শোকার্ত করিয়া তুলিয়াছে। নবদ্বীপবাসী ভক্তদের প্রাণ তো গৌরাঙ্গের জন্য ব্যাকুল হইবেই, কেননা—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া। গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥

সাধারণ লোকের মন তো বোঝে না—তাহাদের নয়নের নিধি গৌরাঙ্গকে সংসার ছাড়াইল বলিয়া পরম বৈষ্ণব কেশবভারতীকে পর্যন্ত গালি পাড়িতে ছাড়িল না। কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ কাহারই বা সহ্য হয়! সমবেদনায় নারীরাও বলে—

আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি,
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

চৈতন্যের কৈশোর-লীলার নিত্যসহচর শ্রীবাস, মুকুন্দ, গদাধর ভূমে গড়াগড়ি দিয়া উচ্চরোলে শিশুর মত কাঁদিতেছে। হরিদাস সকলকে প্রবোধ দিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইতেছে। এ বেদনা কি ভুলিবার? তাহারা তো কল্পনাই করিতে পারে না—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ।

* * * *

জ্বলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগিতেছিল তার লেহ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের ভাবাও বাসুদেব দিয়াছেন। নব-যৌবনা পত্নীর প্রতি গৌরাঙ্গের নির্দয়তা যে তাহার ধারণারও অতীত, কিন্তু সন্ন্যাসের প্ররোচনাদাতা কেশবভারতীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না. কেশবভারতীর তুলনায় অক্রুর যে তত ক্রুর নয়; কেননা—

অক্রুর আছিল ভাল রাজ-বলে লৈয়া গেল
রাখিল সে মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করিল দেশান্তরী॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
ধরণীরে মাগয়ে বিদরি।

পুত্রবিয়োগবিধুরা শচীদেবী একরাত্রে বড় অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। নিমাই যেন অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মা মা বলিয়া উচ্চরবে ডাকিতেছেন। সাড়া পাইয়া শচীদেবী ঘরের বাহির হইতেই নিমাই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥

শচীমাতা রোরুদ্যমান পুত্রকে সাগ্রহে বুকে লইতে গিয়া দেখেন—এ যে নিদারুণ স্বপ্ন! কিন্তু এই স্বপ্নও একদিন সত্য হইল।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণপ্রেম উন্মাদনায় বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে ছলনায় ভুলাইয়া তিনদিনের জন্য নবদ্বীপে লইয়া আসেন। নদীয়ায় সেদিন আনন্দের বান বহিয়া গেল। বর্ণনা করিতেছেন—

ধাওল নদীয়া-লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে॥
চিরদিনে গোরাচাঁদ বদন দেখিয়া।
তৃষিল চকোর-আঁখি রহয়ে মাতিয়া॥
আনন্দ ভকতগণ দেখিয়া বিভোর।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর॥

এই অপূর্ব সৌভাগ্যলাভের আনন্দ আবার 'নদীয়া-নাগরী' ভাবে ভাবিত হইয়াও বাসুদেব বর্ণনা করিতেছেন—

এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আমি মিলায়ল মোরে গোরা গুণ-নিধি॥
এতদিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ-মুখ॥
চির-উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরা-পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ॥

এই ভাবের পদ রচনার সময় বিদ্যাপতির—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর"—এবং—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা"—ভাব-সম্মিলনের এই প্রসিদ্ধ পদ দুইটি কবির সমস্ত মন যে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি।

গভীর বেদনাদায়ক বলিয়া ইহার পরে গৌরাঙ্গদেবের পুনরায় দীর্ঘকালের জন্য গৃহত্যাগ বাসুদেব আর বর্ণনাই করেন নাই।

বিচার

(কবীর)

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

দেবতা পূজারী সুনিপুণ অতি কসা'য়ের ব্রত-ধারী
দুর্বল ছাগে বধিতে তাহার ঝরে না নয়ন বারি।
প্রাতঃস্নান সারি তিলক ধরিয়া দেবী পূজিবার ছলে,
পূজা-প্রাঙ্গণ ধুয়ায় বিবেকে রক্ত-নদীর জলে।

অতি উঁচু কুলে জনম বলিয়া গৌরব করে কত,
এরাই মোদের দীক্ষা-গুরু গো আধেক দেবতা মত।
কহে পাপ কথা কয়ে নীচ কাজ ঠিকানা এদের নাই,
গো-বধ করিলে বলিবে যবন! এরা কিসে কম ভাই?

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রথম অধিকরণ—বিনয়াধিকারিক

বিদ্যা-সমুদ্দেশ—প্রথম প্রকরণ

বার্ত্তা স্থাপনা ও দণ্ডনীতি-স্থাপনা—চতুর্থ অধ্যায়

(৭)

মূল :—কৃষি পাশুপাল্য ও বণিজ্যা—বার্ত্তা ; ধান্য পশু হিরণ্য-কুপ্য-বিষ্টি-প্রদানহেতু (উহা) উপকারক। উক্ত (বার্ত্তা জনিত) কোশ ও দণ্ড দ্বারা (রাজা) স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বশীভূত করিয়া থাকেন।

সঙ্কেত :—কৃষি—ক্ষেত্রে বীজবপনাদি-বিষয়ক শাস্ত্র—পরশরাদি-প্রণীত (গঃ শাঃ)। পাশুপাল্য—গবাদি-পশুপালন শাস্ত্র—গৌতম-শালিহোত্রাদি-প্রণীত। বাণিজ্যা—বাণিজ্যশাস্ত্র—ক্রয়-বিক্রয়াদি-ব্যবহার-শাস্ত্র—বিদেহরাজ-প্রণীত। কুপ্য—স্বর্ণ-রজতাতিরিক্ত তৈজস-ধাতুদ্রব্য (যথা তাম্রাদি) ; কাষ্ঠ-বেণু-লতা-বল্কলাদি অতৈজস দ্রব্যও কুপ্যের অন্তর্গত (গঃ শাঃ) ; **forest-produce (SH)**। 'কুপ্য'-শব্দটির অর্থ অমরকোষে প্রদত্ত হইয়াছে—স্বর্ণ-রজত-ব্যতিরিক্ত তাম্রাদি ধাতু। মনুসংহিতায় (৭।৯৬ ও ১০।১১৩) 'কুপ্য-পদটির প্রয়োগ দেখা যায়—মেধাতিথি অর্থ করিয়াছেন —"শয়নাসনে তাম্রভাজনাদি," ; কুল্লুক অর্থ করিয়াছেন—'সুবর্ণরজত-ব্যতিরিক্তং তাম্রাদিধনং', 'সুবর্ণরজতব্যতিরিক্তং ধান্যবস্ত্রাদি'। কিরাতে (১।৩৫) কুপ্য-শব্দের যে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহার টীকায় মল্লিনাথও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। **Forest-produce**—এ অর্থ শ্যাম শাস্ত্রী কোথায় পাইলেন? **Apte** অর্থ করিয়াছেন—**base metal, any metal but silver and gold.** বিষ্টি—কর্ম্মকর (গঃ শাঃ) ; নির্মূল্য কর্ম্মকরণ (মুকুট) ; অভৃতিক ক্লেশ ; unpaid labour (**Apte**) ; **free labour (SH)**। কোশ—ধন। দণ্ড—সেনা। বার্ত্তা-দ্বারা উৎপাদিত ধন ও সেনা (কোশ-দণ্ড) সাহায্যে রাজা স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বশীভূত করেন। **'Treasury and army oltained solely through Narta (SH).**

মূল : আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বার্ত্তার যোগক্ষেম সাধন—দণ্ড। তাহার নীতি দণ্ডনীতি—অলব্ধলাভার্থা, লব্ধ পরিরক্ষণী, রক্ষিত বিবর্দ্ধনী ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তের তীর্থে প্রতিপাদনী।

সঙ্কেত : দণ্ড—সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—এই চারিটি উপায় ; এই উপায়-চতুষ্টয়ের প্রধানভূত 'দণ্ড'। এই দণ্ড রাজার প্রয়োজন-সাধক—সর্ব্বভূতরক্ষক, ধর্ম্মস্বরূপ ও ব্রহ্মতেজোময়—ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল—ইহা মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে (৭।১৩)। এই দণ্ডই যথার্থ রাজা, উহাই যথার্থ 'পুরুষ'-পদ-বাচ্য, উহাই যথার্থ নেতা ও শাসিতা, আশ্রম চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের উহাই প্রতিভূ (মনু ৭।১৭)। সকল লোক দণ্ডজিত—দণ্ড-দ্বারা নিয়মিত—দণ্ড-দ্বারা সন্মার্গে প্রবর্ত্তিত। স্বভাবশুচি মানুষ অতি দুর্লভ। দণ্ড-ভয়েই সকল জগৎ আবশ্যক ভোগে সমর্থ হইয়া থাকে (মনু ৭।২২)। কেহ কেহ 'দণ্ড'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—রাজা। দণ্ডধারী, দণ্ডের অধিষ্ঠানভূত, দণ্ড-প্রয়োগ-কর্ত্তা বলিয়া রাজাই দণ্ড—"দণ্ডস্থত্বাৎ রাজা দণ্ডঃ" (গঃ শাঃ)। দণ্ড-ভয় আছে বলিয়াই ত লোক আন্বীক্ষিকী ইত্যাদিতে সম্যগ্ভাবে প্রবৃত্ত হয় —নতুবা হইত না। এই কারণেই বলা হইয়াছে—আন্বীক্ষিকী ইত্যাদির যোগক্ষেম-সাধন দণ্ড—"দণ্ডস্য হি ভয়াৎ কৃৎস্নং জগদ্ ভোগায় কল্পতে" (মনু ৭।২২) (গঃ শাঃ)। যোগক্ষমসাধনঃ—যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ; ক্ষেম—প্রাপ্তের পরিরক্ষণ। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ অদ্ভুত— **"That sceptre on which the well-being and progress of......depend is known as Darda (punishment)." Danda is the means of new acquisition and preservation of......**বলিলেই ভাল হইত। তাহার নীতি—নীতি অর্থে নয়ন —অনুষ্ঠান অর্থাৎ তাহার উপদেশ-শাস্ত্র। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ এক্ষেত্রেও অদ্ভুত—**"That which treats of Danda is the law of punishment or science of government." "The code treating of it is the science of Government"** —বলিলে হইত।

ইহার পর দণ্ডনীতির ফল বলা হইয়াছে—দণ্ড-দ্বারা অলব্ধ বস্তু লব্ধ হয়, লব্ধ বস্তু পরিরক্ষিত হয়, রক্ষিত বিষয় বর্দ্ধিত হয় ও বর্দ্ধিত বস্তু তীর্থে প্রদত্ত হয়। গণপতি শাস্ত্রী 'তীর্থ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—পুণ্যক্ষেত্র, অধ্বর (যাগ) ইত্যাদি। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় তীর্থ অর্থে উপযুক্ত পাত্র—সম্মানের যোগ্য পাত্র। এ অংশে শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ মন্দ নয় —**"It is a means to make acquisitions, to keep them secure, to improve them and to distribute among the deserved the prafits of improvement."** It has its uses in—the acquisition of what was not acquired, preservation of the acquired, increase of the preserved and the offering of the increased to the deserving (honoured).

মূল :—উহাতে লোকযাত্রা আয়ত্ত। অতএব, লোকযাত্রার্থী নিত্য উদ্যত-দণ্ড হইবেন।

সঙ্কেত : উহাতে—দণ্ডনীতিতে। উহাতে আয়ত্ত...উহার অধীন। "It is on this science of government that the course of the progress of the world depends (SH); on it (Dandaniti) is dependent the course of worldly life (affairs)—বলা উচিত। অতএব—যেহেতু লোক-ব্যবহার দণ্ডনীতির অধীন। লোকযাত্রার্থী—যিনি যথাযথভাবে লোকযাত্রায় উৎসুক। লোকযাত্রা—লোকব্যবহার, লোকবৃত্ত। এস্থলে লোকযাত্রার্থী বলিতে নিখুঁৎভাবে লোক-ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক রাজাকেই বুঝিতে হইবে; কারণ যে কোন লোকের পক্ষে দণ্ড-প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। এ হেতু শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ—'Hence", says my teacher, "Whoever is desirous of the progress of the world" —মূলানুগ নহে। (A king) desirous of worldly progress —বলা উচিত। উদ্যতদণ্ডঃ স্যাৎ—"shall hold the sceptre raised" (SH); দণ্ডপ্রণয়নে উদ্‌যোগী (গঃ শাঃ)। মোট অর্থ— যথাযোগ্যভাবে লোক-ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক রাজা নিত্য দণ্ডপ্রয়োগ করিতে উদ্‌যুক্ত থাকিবেন।

মূল :—দণ্ড যেরূপ, ভূতগণের এরূপ বশীকরণ সাধন (আর) নাই—ইহাই আচার্য্যগণ (বলিয়া থাকেন)।

সঙ্কেত :—বশোপনয়ন—অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিবার সাধন (গঃ শাঃ); instrument to bring under control (SH)। আচার্য্যাঃ (মূল)—এস্থলে আচার্য্যাঃ—বহুবচন—গৌরবেও হইতে পারে—আমার পূজনীয় আচার্য্যদেব—শ্যাম শাস্ত্রীর ইহাই আশয়। আচার্য্যাঃ—ইহার অনুবাদ শ্যাম শাস্ত্রী পূর্ব্ব-বাক্যের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। অথবা, আচার্য্যগণ—এ অর্থও হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী মূলাংশ-দর্শনে বেশ মনে হয় দ্বিতীয় অর্থটিই এস্থলে প্রযোজ্য। কারণ গৌরবান্বিত নিজ আচার্য্যের মত খণ্ডন করায় কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। "older teachers of Polity" (Tolly).

মূল :—না—ইতি কৌটিল্যের (অভিপ্রায়)। তীক্ষ্ণদণ্ড (রাজা) ভূতগণের উদ্বেগকর। মৃদুদণ্ড পরিভূত হইয়া থাকেন। যথার্হদণ্ড(ই) পূজ্য। যেহেতু সুবিজ্ঞাত প্রণীত দণ্ড প্রজাগণকে ধর্ম্মার্থকাম-যুক্ত করিয়া থাকে। কামক্রোধহেতু (বা) অজ্ঞানবশতঃ দুষ্প্রণীত (দণ্ড) বানপ্রস্থ-পরিব্রাজকদিগকেও কোপযুক্ত করে— গৃহস্থগণকে (যে করিবে)—এ আর এমন কি? (আর) অপ্রণীত হইলে মাৎস্যন্যায় উদ্ভাবিত করে। দণ্ডধরের অভাবে বলীয়ান্ অবলকে গ্রাস করে। তাঁহার (উহার) দ্বারা রক্ষিত (দুর্ব্বলও) প্রভুত্বলাভে (সমর্থ) হয়।

সঙ্কেত :—তীক্ষ্ণদণ্ড—উগ্রদণ্ড-প্রয়োগকারী রাজা। Whoever imposes severe punishment (SH); whoever না বলিয়া the king who imposes বলাই উচিত। উদ্বেজনীয়ঃ (মূল) উদ্বেগজনক (অপাদানে অনীয়র্-প্রত্যয়); repulsive (SH); cause of anxiety. পরিভূত হন—অভিভূত হন—becomes contemptible (SH); is disregarded. যথার্হদণ্ডঃ—যোগ্যদণ্ড-প্রয়োগকারী; দেশ-কাল-অপরাধানুযায়ী দণ্ড-প্রযোক্তা; punishment as deserved (SH)। পূজ্য—লোকমান্য হইয়া থাকেন। সুবিজ্ঞাত-প্রণীত—শাস্ত্র হইতে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত ও যথাযথভাবে প্রযুক্ত (গঃ শাঃ); punishment awarded with due consideration (SH); punishment duly imposed (or inflicted) after consultation (of the codes)—বলা উচিত ছিল। রাজা শাস্ত্রালোচনা-দ্বারা যথাযোগ্য-দণ্ডস্বরূপ-নির্দ্ধারণ ও যথাযথভাবে উহার প্রয়োগ করিবেন— ইহাই তাৎপর্য্য। কামক্রোধাভ্যামজ্ঞানাৎ (মূল)—কামবশে, ক্রোধবশে অথবা অজ্ঞানবশতঃ। দুষ্প্রণীত—অযথাবৎ প্রযুক্ত; ill-awarded (SH)। কাম-ক্রোধ-অজ্ঞানবশে যথাযথভাবে প্রযুক্ত দণ্ড সংযতেন্দ্রিয় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদিগকেও যখন কোপান্বিত করিয়া তুলে, তখন উহা যে অসংযতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণকেও কোপযুক্ত করিবে—এ আর এমন কি কথা! (গঃ শাঃ)। অপ্রণীত—প্রযুক্ত না হইলে—when the law of punishment is kept in abeyance (SH); punishment if not imposed বলাই সরলতর। মাৎস্যন্যায়—বৃহৎ মৎস্য (রাঘব-বোয়াল ইত্যাদি) যখন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে, তখন মৎস্যরাজ্যে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত তুলনায় দেশের অরাজক অবস্থাকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়—proverb of fishes (a great fish swallows a small one (SH)। বলবান্ শত্রুকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়নই মাৎস্যন্যায় (গঃ শাঃ)—a state of anarchy. The rule of fish consists of the big fish swallowing the small ones; as of the powerful roasting the weak, like fish on a spit. See Mame VII. 20, Nar. XVII. 15, M6p XII. 15. 30, kamasutra 21. 2. (Jolly) দণ্ডধর— রাজা; magistrate (SH)। বিচারক রাজার প্রতিনিধি বলিয়াই দণ্ডধর—রাজাই মুখ্যতঃ 'দণ্ডধর'-পদ-বাচ্য। তেন গুপ্তঃ (মূল)— তাঁহার (রাজার) দ্বারা অথবা তাহার (দণ্ডের) দ্বারা রক্ষিত। যিনি দণ্ডের সুপ্রয়োগ করেন, সেই রাজার দ্বারা রক্ষিত—এইরূপ অর্থ শ্যাম শাস্ত্রী করিয়াছেন—under his protection (SH); being protected by him—বলা উচিত। তেন সুপ্রণীতেন দণ্ডেন রক্ষিতঃ —সুপ্রণীত দণ্ডদ্বারা রক্ষিত (গঃ শাঃ)। প্রভবতি—অর্থাৎ দুর্ব্বলঃ বলযুক্তো ভবতি—দুর্ব্বল বলযুক্ত হয় (গঃ শাঃ)। "The weak resist the strong" (SH); prevails, predominates, attains power—বলা ভাল।

মূল :—চতুর্ব্বর্ণাশ্রম (বিভাগান্তর্গত) লোক রাজকর্ত্তৃক দণ্ড-দ্বারা পালিত হইলে স্বধর্ম্মকর্ম্মাভিরত (অবস্থায়) নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করে।

সঙ্কেত :—চতুর্ব্বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চারি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুরাশ্রম বিভাগে লোক বিভক্ত। দণ্ড-দ্বারা—সুপ্রণীত (সুপ্রযুক্ত) দণ্ড-দ্বারা (রক্ষিত)। স্বধর্ম্মকর্ম্মাভিরত:—নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর ; **ever devotedly adhering to their respec.ive duties a .d Occupations (S H)**। বর্ত্ততে স্বেষু বেশ্মসু (মূল)—নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করে অর্থাৎ স্বস্থভাবে অবস্থান করে (গ: শা:) ; **will keep t› their respe:tive paths (S.l)**। এ অনুবাদও মূলানুগ নহে—**remain in their respective abodes** বলা উচিত।

গণপতি শাস্ত্রী তাৎপর্য্য দিয়াছেন—দণ্ড-দ্বারা পালনের অভাবে লোকের নিজ গৃহেও স্বস্থভাবে অবস্থান দুর্ঘট।

শ্যাম শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'দণ্ড'-শব্দটি এই প্রকরণে তিনটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—রাজার হস্তধৃত দণ্ড (**sceptre**), রাজ-বিহিত দণ্ড (**punishment**) ও সেনা (**army**)। যে স্থলে যে অর্থটি সঙ্গত ও শোভন তথায় সেটি প্রযোজ্য।

"This passage has been conjectured by some scholars to contain a punning allusion to king Chandragupta, the powerful patron of Kanti ya. It seems preferable, however, to give the text its natural meaning" (Jolly).

ইতি শ্রীকৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে বিদ্যাসমুদ্দেশ-নামক প্রথম প্রকরণে বার্ত্তা-স্থাপনা ও দণ্ডনীতি-স্থাপনা নামক চতুর্থ অধ্যায় ॥

"The V.dyasamuddesa...is quoted as an independent work in...Va syayana's N.ayabhashya" (Jolly).

॥ বিদ্যাসমুদ্দেশ-নামক প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত ॥

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

দিগন্ত জুড়িয়া আজি প্রলয়ের ঘন দুর্বিপাক ;
সসাগরা এ পৃথিবী ভীত ত্রস্ত হতাশে নির্বাক !
কোথা' পথ ! কই আলো ?
আকাশ কালোর কালো,
এরি মাঝে কী আশায় এলি ফিরে পঁচিশে বৈশাখ ?

দিকে দিকে তার স্বরে বাজে ওই রুদ্রের বিষাণ ;—
বাত্যাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে গীত হ'বে আজি কোন্ গান ?
কবির এ জন্মদিনে
কী সুরে বাজাবে বীণে ?
কোন্ মহামিলনের মন্ত্রে আজি জাগাইবে প্রাণ !

মেঘে মেঘে ঢাকা সূর্য অন্ধকারে ম্লান নভতল ;
তবু দীপ্ত রহিবে কি ভারতের আজও পূর্বাচল !
ঝটিকার উর্ধ্বে থাকি'
আজও সে সবারে ডাকি'
দেখাবে মুক্তির পথ সত্য-শিব-সুন্দরে উজ্জ্বল !

সশস্ত্র জগত আজি অস্ত্রে অস্ত্রে করে আস্ফালন,
এক প্রান্তে পড়ে রহে এ ভারত বিষাদে মগন।
নীরবে সবার পাছে
সে আজি বসিয়া আছে,
ভাবিতেছে :—ধ্বংস-যজ্ঞে কোন্ ব্রত হ'বে উদযাপন !

শক্তি নাই ব'লে সে কি দূরে আছে রণাঙ্গন হ'তে ?
বলশালী বলী নাই আজিকার এ মহাভারতে ?
শৌর্যহীন—বীর্যহীন
এ ভারত আজি ক্ষীণ ?
নহে ! নহে !! এত দীন ভাবিয়ো না তা'রে কোনমতে !
ভারতের শৌর্য-বীর্য-প্রেমে তা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয় ;
কবির কণ্ঠের এই শুভ বাণী—হউক্ অক্ষয়।
অস্ত্র জয়ে নহে তা'র
পরিচয় প্রতিভার,
জীব হ'তে তৃণাবধি ঐক্যে তা'র জয় চিরজয় !!
ভ্রান্ত জগতেরে ডাকি' বলো আজি পঁচিশে বৈশাখ ;
মদমত্ত রে দাম্ভিক, মারণাস্ত্র উঠাইয়া রাখ্ !
দুর্বলে চরণে দলি'
আজি বটে তুই বলী,
অন্য বলবান্ আসি' কালি তোর ঘটাবে বিপাক।
এক শক্তি ইতিহাসে আজি গর্বে লেখে রক্তলেখা,
অন্য উচ্চতর শক্তি পুনরায় কালি দিবে দেখা !
এই প্রতিযোগিতার
খেলা চলে বার বার,
চূড়ান্ত পরীক্ষা কবে কে টানিবে তা'র শেষ রেখা !
হিংসা নহে চিরজয়ী আজিকার এ মহাভারত,
সমগ্র পৃথ্বী রে ডাকি দেখাইছে অহিংসার পথ।
তোমার সঙ্গীতে কবি
এই ভারতের ছবি
বন্দিত দেখিয়া শান্ত হোক্ রণ উন্মত্ত জগৎ।
পঁচিশে বৈশাখে আজি পূর্ণ হোক্ এই মনোরথ ॥

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বহুদিন পরে ডায়েরীর পাতা খুলিলাম।"

মলাটের উপরে ধুলা জমিয়াছে, পাতাগুলির রঙ্ ক্রমশ হলদে হইয়া আসিয়াছে। লিখিতে গেলে অক্ষরগুলি জাবড়াইয়া যায়। যেন বলিতে চায়, ওর কাজ ফুরাইয়াছে, এতদিন পরে আবার ওকে আলোতে টানিয়া আনা ওর নিশ্চিন্ত বিশ্রামের উপরে খানিকটা উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নয়। মনটাও আজ আর কিছু ভাবিতে চায় না—নিরুত্তাপ ও নিরুত্তেজ শান্তিতে ঝিমাইয়া পড়িতে চায়—মনের প্রতিলিপিও বুঝি তেমনি করিয়া মুছিয়া যাইতে চায় স্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে। যা গিয়াছে, তাহাকে যাইতে দাও। যে তুমি আজ আর বাঁচিয়া নাই, নতুন করিয়া ডায়েরী লিখিতে বলিলেই কি আজ আবার তাহাকে পুনর্জীবন দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? কোন লাভ হইবে না, কেবল অনর্থক হতাশায় ভরিয়া যাইবে সমস্ত।

ডায়েরীর পাতা খুলিয়া লেখাগুলি পড়িতেছি। সেই আমি—পশ্চাতের আমি। কত কল্পনা, কত আশা, কত আত্মবিশ্লেষণ। এই ডায়েরীর পাতায় নিজের মধ্যে যেন একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলাম। সেই জগতে আমি স্রষ্টা, আমি সর্বময়, সেখানে আমার একচ্ছত্র রাজত্ব। কত সহস্র রূপে নিজেকে বিচার করিয়াছি, রচনা করিয়াছি, ভাঙিয়া ফেলিয়াছি। সেই আমি কি এই? আজ আমার সমস্ত কিছু সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বৃহত্তর ভাবনা নাই, মহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মনের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শনের প্রয়াস নাই। আমার মধ্যে সেদিন কত অসংখ্য কাহিনীর নায়ককে পাইয়াছিলাম, কত অগণ্য সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেদিনের আমি আজ কী হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ভাবিতে ভয় পাই। জীবনের এই নির্দিষ্ট গতিপথ ছাড়া চলার যে আর কোনো দিক আছে, এটা কল্পনা করিতেই মন আতংক এবং আশংকাগ্রস্ত হইয়া ওঠে।

মপাসাঁর একটা উপদেশ মনে পড়িতেছে: **No man should read his old letters**; পুরানো চিঠি পড়িলে একান্ত সার্থক জীবনেও মূল্যহীন এবং মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সমগ্রব্যাপী একটা শোচনীয় ব্যর্থতার সুস্পষ্ট রূপ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় আত্মহত্যার পথে। কিন্তু আত্মহত্যা আমি করিব না—অতখানি মনোবিলাস বা মনের প্রবণতা আমার নাই। শুধু পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনটার দিকে চাহিয়া কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ হইতেছে। আমি কী হইতে পারিতাম—কী হইয়াছি।

কেন এত সব কথা মনে পড়িল? মনে পড়িল এই চর ইসমাইলে আসিয়া। জীবনের সব চাইতে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আর সব চাইতে বিস্ময়কর অনুভূতি আমি এখানেই লাভ করিয়াছি। সেই মেয়েটি—সেই বর্মী মেয়েটি। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। কী হইবে তাহার নাম দিয়া? সে যেন এখানকার আদিম প্রকৃতির মূর্ত প্রতীক। এখানকার ঝড় আর হিংস্র সৌন্দর্যের উচ্ছল তরঙ্গ লইয়া আমাকে গ্রাস করিয়াছিল, আবার তেমনিভাবেই রিক্ত গম্ভীর ঔদাসীন্যে আমাকে পিছনে ফেলিয়া সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

কী হইত সেদিনের স্রোতে ভাসিয়া পড়িলে? কী হইত সেদিন সেই বন্য সৌন্দর্যের করাল গ্রাসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিলে? পশ্চাতের আমি লোভ দেখাইতেছে। বলিতেছে: তাহা হইলে সহস্র সংঘাতের মধ্য দিয়া তুমি বাঁচিয়া থাকিতে—নিজেকে সহস্র সত্তায় বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিতে, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া সার্থক হইতে পারিতে। এমন করিয়া জীবনের একমুখী আলস্য মন্থরগতির মধ্য দিয়া তোমার সমস্ত সত্তার মৃত্যু ঘটিত না।

না, না, এভাবে নিজেকে লোভ দেখাইয়া লাভ নাই। দশবছর বয়স বাড়িয়াছে, পদোন্নতি হইয়াছে, উন্নতির শীর্ষ শিখর তো এখন সম্মুখেই পড়িয়া। তা ছাড়া পাশেই রাণী ঘুমাইতেছে। ওর শান্ত কোমল মুখের উপরে আলো পড়িয়া অপরূপ শ্রীতে ওকে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ও যেন পূর্ণ বিশ্রাম—সমস্ত সংগ্রাম ও ক্লান্তির একান্ত শান্তিময় অবসান। নীড় আর ভালোবাসা। ঝিণ্টুর মুখখানা ওর মায়ের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমার সন্তান আমার সজীব দেহ ও মনের ধারাবাহক। এই ভালো। যা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি পথের ধুলাতেই তাহার শেষ চিহ্নটুকু মিলাইয়া যাক। চর ইসমাইল আজ আর আমার রক্তে প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহার ডাকিনীমন্ত্রকে আমি জয় করিয়াছি।"

৪

চর ইসমাইলের বাহিরে বৃহত্তর পৃথিবী ঘুরিয়া চলিয়াছে। দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মানচিত্রের রেখাগুলি

প্রত্যেকদিন বদলাইয়া চলিয়াছে নূতন করিয়া—ইয়োরোপে, চীনে, প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারতবর্ষে। চর ইসমাইল কি তাহার স্পর্শ পায় নাই? পাইয়াছে বই কি? মাথার উপর দিয়া বিমান ওড়ে—নদীর জলে ফেনিল তরঙ্গ জাগাইয়া সৈন্যবাহী জাহাজ ভাসিয়া যায়। ভারত মহাসাগরে জাপানী মালোয়ার হানা দিয়া ফিরিতেছে। বর্মা, আরাকান শত্রুপক্ষ গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। আসামের সীমান্তে কামান গর্জন—খাসিয়া, জয়ন্তী, লুসাই পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কাঁপিয়া উঠিতেছে। চট্টগ্রাম বোমা পড়িতেছে।

উন্মাদ ডি সুজাকে লইয়া গিয়াছিল গঞ্জালেস। লিসিকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবে—উদ্ধার করিবে। যেমন করিয়া হোক, যতদিনেই হোক্। কতটুকু এই পৃথিবী, কতখানিই বা এই মহাসাগরের ব্যাস? তাহাদের দিগ্বিজয়ী জলদস্যু পূর্বপুরুষেরা একদিন সাতটি সাগর চষিয়া বেড়াইত, তাহাদের ড্রাগন আঁকা রক্তপতাকা সমুদ্রের নীল জলে রক্তের ছায়া ফেলিত। সন্ধান সুরু হইল। চট্টগ্রাম হইতে আরাকান খুব বেশি দিনের পথ নয়—ডি-সুজাকে লইয়া গঞ্জালেস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল সমস্ত। কিন্তু লিসির সন্ধান পাওয়া গেলনা—না পাওয়া গেল বর্মীদের কাহাকেও। তারপর একদিন সকালে উঠিয়া গঞ্জালেস দেখিল ঘরের চালে একটা দড়ি ঝুলাইয়া তাহার সঙ্গে ডি সুজাও ঝুলিতেছে। গলাটা সারসের গলার মতো লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের জিভ যে অতখানি বড় হইতে পারে, এর আগে সেটা কোনোদিন কল্পনাই করিতে পারে নাই গঞ্জালেস। নাকের ফাঁক দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িয়া বুকের উপরে কালো হইয়া জমিয়া আছে। আত্মহত্যা করিয়াছে ডি-সুজা। এতবড় বীর, এমন দুঃসাহসী পুরুষ। তাহার অমিত শক্তিমান জীবনকে সে আর কাহারো হাতেই শেষ করিতে দেয় নাই, স্বাভাবিক মৃত্যুকেও মানিয়া লয় নাই। যে আলো সমস্ত জীবন ধরিয়া সে সহস্র ছটায় জ্বালাইয়া দিয়াছিল—নিজের হাতেই সে আলোকে সে নিবাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তারপরেই ক্রমে কেমন একটা প্রতিক্রিয়া আসিয়া দেখা দিল গঞ্জালেসের মনে। লিসির জন্য সে উদ্দামতাটা যেন আস্তে আস্তে শান্ত হইয়া আসিল। ডি সুজার মৃত্যুটা একখণ্ড পাথরের মতো হইয়া চাপিয়া বসিল তাহার চেতনায়। মনে হইল, তাহারও শেষ পরিণতি হয়তো বা এমনি করিয়াই ঘনাইয়া আসিবে। তাহার শিরায় শিরায় অতীতের সেই সংস্কারবাদী হিন্দুরক্ত ক্রিয়া করিল।

গঞ্জালেস্ ফিরিয়া আসিল বাড়িতে।

কাজ কারবারে মন দিল, কিন্তু মন বসিল না। জীবনটা যেন দুইটা ভাগে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেছে। যে বিদ্রোহী বহু দিনের ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, সে কিছুই করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই অস্বস্তির একটা তীব্র জ্বালায় নিজেকে যেন জ্বালাইতে থাকে। অথচ, কাজ কারবারও দেখিতে হইবে। জোর করিয়া মনটাকে বাঁধিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে পুরাণো অভ্যাসগুলিকে ঝালাইয়া লইতে সুরু করিল। তারপরে মদ টানিতে লাগিল অশ্রান্তভাবে। ডেভিড্ গঞ্জালেসের মতো বেপরোয়া হইবার ক্ষমতা তাহার নাই, কিন্তু কপালে বাপের দেওয়া সেই কাটা চিহ্নটার জয়-তিলক বহন করিয়া সে পূর্ণ উদ্যমে নেশার সেবায় লাগিয়া গেল। ভাব সাব দেখিয়া পাকা হুইস্কিখোর বন্ধু পেরিরাও তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

একদিন পেরিরা ঠাট্টা করিয়া মন্তব্য করিল: হ্যাঁ, বাপের নাম রাখতে পারবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

আরক্ত চোখ দুইটা পাকাইয়া গঞ্জালেস্ পেরিরার দিকে তাকাইল: বাপের নাম। বাপকে ছাড়িয়ে যদি যেতে না পারি, তা হলে আমার নাম স্যামুয়েলই নয়। সে ব্যাটা ধেনো পেলে ধেনোই টানত, আমি হুইস্কির নীচে নামব না—এ তোমাকে বলে রাখলাম।

পেরিরা খুসি হইয়া গঞ্জালেসের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল: সাবাস ভাই সাবাস। বুকের পাটা আছে তোমার।

অবশ্য খুসি হইবার কারণ আছে তাহার যথেষ্টই। নেশার জন্যে অনেকগুলা কাঁচা পয়সা তাহার বাহির হইয়া যাইত, সেগুলি বাঁচিয়া গেল আপাতত। তা ছাড়া গঞ্জালেসের কারবারে সেও অংশীদার; লোকটা যতদিন নেশার মধ্যে তলাইয়া থাকিবে, ততদিনই সে নিজের জন্য কিছু করিয়া লইবার সুযোগ পাইবে। অবশ্য, কৃতঘ্নতা বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু ব্যবসা করিতে বসিয়া যখন দুনিয়াশুদ্ধ লোককেই ঠকানো চলিতেছে, তখন অংশীদারকেও কিছু ঠকাইলে তাহাতে পাপের মাত্রাটা এমন ভয়ঙ্কর কিছু বাড়িয়া উঠিবে না। মাতা মেরী তো আর একেবারে হৃদয়হীনা নন; একটা গতিও তিনি করিয়া দিবেনই পেরিরার। সংসারে নিজের কাজ নিজে গুছাইয়া না নিলে তোমার জন্যে কে আর হাত বাড়াইয়া বসিয়া আছে বলো।

গঞ্জালেস্ তলাইয়া গেল মদের বোতলের মধ্যে, তলাইয়া গেল তাহার রক্ষিতা সেই মেয়েমানুষটার মধ্যে। বাহিরের ব্যর্থ সন্ধান যেন অন্তরের মধ্যে আসিয়া তাহার অবলম্বন খোঁজে। মদের বোতলের মধ্যেই কি সে তাহার উদগ্র জ্বালাকে নির্বাপিত করিতে চায়? পণ্য নারীর ভ্রূ ভঙ্গির মধ্য দিয়াই কি গঞ্জালেস্ খুঁজিয়া পায় লিসিকে।

আর তাহারি আড়ালে আড়ালে স্রোতের মতো দিন বহিয়া চলে—বয়স বাড়িয়া চলে গঞ্জালেসের। ছয়—সাত—আট—নয় দশ বৎসর। (ক্রমশঃ)

উমেশচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

১১

রবার্ট নাইটের মোকদ্দমা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র একটি চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমায় অসাধারণ আইনজ্ঞানের ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু ষ্টেট্‌সম্যানের তৎকালীন সম্পাদক রবার্ট নাইট বর্দ্ধমানের অন্যতম রাজ-সচিব ডাক্তার

রবার্ট নাইট

যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রদত্ত তথ্যাবলম্বনে তৎসম্পাদিত পত্রে বর্দ্ধমানাধিপতির তৎকালীন য়ুরোপীয় ম্যানেজার টমাস ডি বরা মিলার-এর বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ প্রকাশ করেন, যথা,

(১) তিনি বর্দ্ধমান রাজকোষ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বা রাজসংসারের সাধারণ ব্যয়ের জন্য গ্রহণ করিয়া পরে ইংলণ্ডে কোন ব্যবসায়ীকে দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া বিল প্রদর্শনাদি করত প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন।

(২) স্যর এশলি ইডেনের নিকট হইতে নূতন মহারাজাধিরাজের খিলাত আনাইবার খরচ বলিয়া ৪ লক্ষ টাকা রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) রাজ্য পরিচালনায় অনেক গলদ আছে; যতদিন বর্ত্তমান ম্যানেজার থাকিবেন বোর্ডের পক্ষে যথার্থ সংবাদ পাওয়াও সুকঠিন।

(৪) মেসার্স মেনার্ড ও হ্যারিস নামক কোম্পানীকে প্রায় ৭০০০০ পাউণ্ডের য়ুরোপীয় দ্রব্য পাঠাইতে আদেশ দেওয়া হয়, তাহার মূল্য অত্যধিক, অর্থাৎ মিলার সাহেব বর্দ্ধমানাধিপতিকে ঠকাইয়াছেন।

(৫) এরূপ অর্থলুণ্ঠনকারী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে অনেক ছিলেন, কিন্তু আশা করা গিয়াছিল এখন তাহাদের অস্তিত্ব নাই।

(৬) তিনি তরুণ মহারাজার প্রতি একপ্রকার বল-প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত করাইয়াছেন এবং রাজকোষ হইতে তাঁহার ও তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পত্নীর পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিষ্টার মিলার ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবার্ট নাইট ও মুদ্রাকর মিষ্টার বার্লোর নামে মানহানির মোকদ্দমা করিলেন। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এফ্-জে-মার্সডেন এই মোকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ করেন। ইতোমধ্যে মিলারসাহেব হঠাৎমৃত্যুমুখে পতিত হন এবং রবার্ট নাইট তাঁহার কাগজে শোকপ্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি যে মানহানিকর কথা সাধারণের হিতার্থ কর্ত্তব্যশীল সম্পাদকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া তাহা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু মিলারের মৃত্যুতে এবং রবার্ট নাইটের প্রকাশ্য ক্রটী স্বীকারেও ব্যাপারটা মিটিল না। হাইকোর্টে বিচারপতি ওকিনিলির নিকট গবর্ণমেণ্ট মিলারের হইয়া রবার্ট নাইটের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইলেন। সরকার পক্ষে ব্যারিষ্টার মিষ্টার গ্যাম্পার (এটর্ণি ডিগন্যাম ও রবিন্সন), মিষ্টার নাইটের পক্ষে ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ও আপকার (এটর্ণি মেসার্স ব্যারো ও অর), মিষ্টার বার্লোর পক্ষে ব্যারিষ্টার মিষ্টার অ্যালেন (এটর্ণি মেসার্স ব্যারো এণ্ড অর)। দাঁড়াইয়াছিলেন, কোর্টে দর্শকের অসম্ভব ভীড় হইয়াছিল। দিনের পর দিন উমেশচন্দ্র এরূপ সওয়াল জবাব এবং যুক্তি-

তর্কপূর্ণ আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন যে সকলে চমৎকৃত হন। সরল বিশ্বাসে এবং সাধারণের হিতার্থে মিষ্টার নাইট ঐ সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন কিনা জুরীকে তাহাই বিচার করিতে বলিলে অধিকাংশ জুরী উমেশচন্দ্রের যুক্তি মানিয়া লইয়া রবার্ট নাইটকে নির্দ্দোষ স্থির করিলেন। বিচারপতি নূতন জুরী দ্বারা পুনর্বিচারের নির্দ্দেশ দিলেন। বিচারপতি ট্রেভেলিয়ানের কোর্টে পুনর্বিচার হয়। ইতোমধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন—কি জন্য একজন মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত মানহানির জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয়-বহুল মোকদ্দমা চালাইতেছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বলিলেন এ বিষয়ে তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন, সরকারী উকীলরা মোকদ্দমা চালাইতেছেন। আসল কথা, কয়েকটি ব্যাপারে বোর্ড অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুনাম রক্ষার্থ বর্দ্ধমানের ম্যানেজারের কার্য্য নির্দোষ প্রতিপাদিত করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে জর্জ্জ ইউলের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দমা তুলিয়া লন এবং নাইট ষ্টেটসম্যানে একটি ক্রটী স্বীকার সূচক পত্র প্রকাশিত করেন।

দাদাভাই নৌরোজী

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন

পূর্ব্ববর্ষের অবধারণ অনুসারে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। উমেশচন্দ্র প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে এবারে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ৪৩৬ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন এবং প্রবীণ দেশনায়ক দাদাভাই নৌরোজী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার রাজা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-রূপে বলিয়াছিলেন :—

"আমার বিক্ষিপ্ত স্বজাতীয়গণ একদিন মিলিত ও একাত্ম হইবেন, কেবল ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া আমরা একদিন এক মহাজাতিরূপে বাস করিব, ইহাই আমার জীবনের স্বপ্ন। এই সভায় সেই মহামিলনের সূচনা দেখিতেছি। আমি আশা করি—সে মিলন বেশী দূরবর্ত্তী নহে। হয়ত আমি সে দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইব না, কিন্তু আমরা যে এস্থলে সমবেত হইয়াছি ইহা আমার পক্ষে অতীব আনন্দজনক—দেশের কল্যাণের জন্য উদীচি হইতে, দাক্ষিণাত্য হইতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশ হইতে, প্রতিনিধিগণ এক জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আগ্রহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন।

উৎপত্তিতে, ধর্ম্মে, ভাষায়, আচারে ও ব্যবহারে আমরা পৃথক হইলেও আমরা তথাপি একই জাতির অন্তর্গত। আমরা একই দেশে বাস করি, একই সাম্রাজ্ঞীর প্রজা এবং দেশের যে সকল বিধি ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত করেন আমাদের সকলেরই ইষ্টানিষ্ট তাহার উপর নির্ভর করে।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(২)

কলেজ বারটায়।

উড়িয়া ঠাকুরের বিস্বাদ রান্না মহাতৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াই অমল উপরে উঠিয়া আসিল। মাত্র দশটা বাজিয়াছে। এত সকালে কেমন করিয়া কলেজে যাওয়া যায়! যাহা হউক মনে মনে একটা অজুহাত ঠিক করিয়া ফেলিল— লাইব্রেরীতে পড়া যাইবে।

লাইব্রেরীর প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া বারবার রাস্তার দিকে চাহিয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু অপর্ণা আসে নাই। হয় ত একেবারে ক্লাসেই যাইবে, হয়ত আজ সে নাও আসিতে পারে, তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার মন বিষণ্ন হইয়া উঠিল। প্রতীক্ষাচঞ্চল অন্তর লইয়া পড়া সম্ভব নয়, সে পাতা উল্টাইতেছিল মাত্র।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বারটার আর বিলম্ব নাই—একটি একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সে নানা কথা ভাবিতেছিল, হয়ত' সিঁড়িতে দেখা হইবে, হয়ত সে প্রশ্ন করিবে, হয়ত করিবে না; তাহাকেই যাহা হয় বলিতে হইবে—

অমল হঠাৎ চাহিয়া দেখে অপর্ণা তিনতলার বারান্দা দিয়া যাইতেছে, কিন্তু দূরত্বটা কথা বলিবার মত নয়। বেশ তাহার আজ উল্লেখযোগ্য—অতি মিহি এবং জরিদার শাড়ী, ঘন নীলরংএর গভীর পটভূমির সামনে তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি সুন্দরতর দেখাইতেছে—

অপর্ণা ফিরিয়া চাহিল কিন্তু কথা বলিবার কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়াই সে তাহাদের কমন-রুমে চলিয়া গেল। অমল দুঃখিত হইয়াছিল, গত কালের অকুণ্ঠ ও আগ্রহপূর্ণ আলোচনার পর আজকার এ উপেক্ষা খুব স্বাভাবিক নয়। শঙ্কা ও দ্বিধার মাঝে অমল ভাবিল— তাহার সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহল হয়ত তাহার পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত তাহার অনেক তফাৎ, এখানে তাহার পক্ষে বন্ধুত্বের লোভ করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

অমল ক্লাসে বসিয়াছিল—অধ্যাপকের বক্তৃতাও শুনিতে-ছিল। অদূরে অপর্ণা বসিয়া আছে তাহা স্পষ্ট না দেখিলেও দৃষ্টি-পথের প্রান্তভূমির মাঝে তাহার মুখখানি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

চারটা পর্য্যন্ত পর পর ক্লাস করিয়া অমল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বার বার সে নিজেকে বুঝাইয়াছিল— অপর্ণার ওই ক্ষুদ্র কথা কয়েকটিকে এত মূল্য দিবার, এত বড় করিয়া ভাবিবার কোন কারণই নাই, তবুও অপর্ণার পরিচয় ও কথা কয়েকটিকে সে কিছুতেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। মানুষের মনের যে এত বড় দুর্ব্বলতা আছে অমল তাহা পূর্ব্বে ভাবে নাই—

চা খাইয়া সে ভাল ছেলের মত পড়া আরম্ভ করিবে মনস্থ করিল। মনকে সে কিছুতেই আর বিমনা হইতে দিবে না।

অতএব চা পানান্তে সে হন্ হন্ করিয়াই লাইবেরীতে যাইতেছিল। কে যেন তাহাকে ডাকিল—অমলবাবু।

ফিরিয়া চাহিয়া দেখে—অপর্ণা!

—ও—নমস্কার—কি ব'লছেন?

অপর্ণা রুমালে মুখ আড়াল করিয়া একটু ব্যঙ্গ করিল, —কি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন যে জ্যান্ত মানুষ, এমন কি মেয়েমানুষগুলোও চোখে পড়ে না?

—ও আপনাকে লক্ষ্য করিনি, ক্ষমা করবেন। লাইব্রেরীতে যাচ্ছি।

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া বলিল—বলা বাহুল্য মাত্র!

—আপনি যাবেন না?

—যাবো চলুন।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল, অমল বলিল— আপনাকে আজ যেন একটু কেমন দেখাচ্ছে?

—কেমন অর্থাৎ ভাল না মন্দ?

—সম্ভবতঃ ভালই।

—ও চোখও খারাপ হ'য়েছে, ভালমন্দ বুঝতে পারেন না!

—না ঠিক তা নয়, চোখে স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু মনে ঠাহর ক'রতে পাচ্ছি না।

—আটপৌরে মিলের কাপড় পরলে ভাল হতো?

—সে বেশে দেখ্‌লে বিবেচনা ক'রতে পারি।

—বেশ। আপনার বিদ্রূপ বুঝ্‌লাম।

—বিদ্রূপ?

—হ্যাঁ, এ কাপড়খানা যে আপনার চক্ষুশূল সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি কিন্তু কি ক'রবো; আমার চোখে ত ভালই লাগ্‌লো—তাই। যাকগে—

অমল হাসিয়া কহিল—যাক্‌গে ব'ল্‌লেই ত যায় না। আমি বল্‌তে চাই যে এখানা আপনাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু ভাষা আমাকে প্রতারিত ক'রেছে—

—আপনিও করেছেন। যাক্‌, আমাদের একটা ক্লাব আছে, নাম হ'চ্ছে নিও কালচারাল সোসাইটি। আপনাকে মেম্বার হ'তে হবে। মাসিক চাঁদা দু' টাকা। কেমন? নামটা তুলে নেব ত?

অমল বলিল—সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা আলোচনা হয় না ত!

—তার মানে?

—আমার বড্ড ভয় করে ও শুন্‌লে? আর ক্লাসিক গান হয় না ত?

—ভয় নেই।

—ভরসাটা কি পরিষ্কার করে বলুন। সাদা কাগজে নাম সই করাটা হঠকারিতা নয় কি? অমলের ভয় প্রশমিত হয় নাই—প্রকৃত ভয়টা তাহার ছিল চাঁদার ব্যাপারে। মাসিক দুই টাকা চাঁদা দিলে বৈকালের চা ও টোষ্ট খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে—সেটা খুব সহজসাধ্য ও স্বাস্থ্যকর নয়।

—আমি ওই ক্লাবের সেক্রেটারী, তা জেনেই কি আপনার মেম্বার হওয়া সম্ভব নয়?

—খুব সম্ভব ছিল কাল, কিন্তু আজ নেই; কারণ আজ মনে হচ্ছে আপনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে জড়িত।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া চোখের দৃষ্টিটা অমলের মুখের উপর হানিয়া বলিল—বাইরে দেখে মনে হয় আপনি নেহাত বেচারী কিন্তু আপনার পেটে এত!

—পেটে নয় মুখে। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন, যা হয় করি। একটা অপ্রিয় স্বীকারোক্তি করি—আমি একটু দেরীতে বুঝি এটা মনে রাখবেন।

—তবে শুনুন, এ ক্লাবে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সকলে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পড়েন। যার বাড়ীতে সভা হয় তিনি কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত রাখেন—

—বটে! তবে—তবে ত সভ্য হ'তেই হবে।

—জলযোগের জন্য?

—হ্যাঁ, নইলে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান-সঞ্চয়ের মত মহৎ অভিপ্রায় আমার নেই। আমি পড়ি ডিটেকটিভ বই, দেখি অভিযানের ফিল্ম, আর থিয়েটারের নাচ গান—কারণ আমার মতে থিয়েটার সিনেমায় যেয়ে যারা হিতোপদেশ শুন্‌তে চায় তাদের মত ভণ্ড পাষণ্ড আর নেই।

—থিয়েটার সিনেমার ওপর আপনার রাগ কেন?

—রাগ নয়, অনুরাগ আছে—তাই বিশ্রামের সময় বিজ্ঞাপনগুলি আমি ভাল ক'রে দেখি, ছবির থেকে সেগুলো আমার আরও ভাল লাগে—

অপর্ণা বলিল—বেশ, ভগবৎ কৃপায় আপনি বিজ্ঞাপনই দেখুন। কাল থেকে আপনি তাহ'লে সভ্য।

অমল বলিল—আপনি যে এই সৌভাগ্যলাভের অবলম্বন একথা কোন দিনও ভুলবো না। মিস্‌-ডেজি—

—ডেজি, ডেজি আবার কি? মনে রাখবেন আমাদের ক্লাবের মেম্বার ইচ্ছা ক'রলেই হওয়া যায় না। কোন মেম্বার কাউকে উপযুক্ত মনে ক'রলে তবে তার মারফৎ তাকে সভ্য করা হয়। তেমনি ইচ্ছে ক'রলেই ডেজি নাম ধরে ডাকা যায় না।

উত্তরের অবসর না দিয়াই অপর্ণা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া গেল—এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন অমলকে সে কোন দিনও চিনে না।

অপর্ণার ছন্দময় কথাগুলিতে অমলের মনের মেঘ

কাটিয়া গিয়াছিল—মনে মনে সে গর্ব্বে এবং অনাগত সৌভাগ্যের আশায় পুলকিত হইয়াছিল। অপর্ণার সহিত পরিচয় ও এই সামান্য ঘনিষ্ঠতা তাহার জীবনে মহা মূল্যবান সামগ্রী—জন্মাবধি অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধন অনটন ও অসচ্ছলতার মধ্যে তাহার মন মুমূর্ষু মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ তাহা যেন শতদলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ লইয়া আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলিয়াছে।

রাস্তায় দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে, স্বল্প কিশোর পত্রের সমাবেশে বৃক্ষের শ্যামলতা যৌবনের সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। অমল ভাবিল—রমলার সহিত হয়ত সাক্ষাৎ হইবে, সে হয়ত তাহাকে তাহার একনিষ্ঠ ভগ্নহৃদয় উপাসক রূপে চাহিবে। মন্দ কি, সে তাহারই অভিনয় করিবে—এ অভিনয়ে যদি সে আনন্দিত হয় ক্ষতি কি?

ছাত্র তারস্বরে এ, বি, সি, ত্রিভুজের বাহু ও কোণের পরিমাণ ও সমতা সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিতেছে। অমল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমার অঙ্ক হ'য়েছে—

ছাত্র ভীত চিত্তে অর্দ্ধভুক্ত ত্রিভুজকে ত্যাগ করিয়া বীজগণিত আরম্ভ করিল। অমল আশ্চর্য্য হইল নিজেরই দুর্ব্বলতা দেখিয়া—যাহার সহিত সে মাত্র অভিনয় করিতেই চাহিয়াছে, তাহার আগমন পথের দিকেই সে বারবার চাহিতেছে।

রমলা আসিল এবং বিনা ভূমিকায়ই প্রশ্ন করিল—কতক্ষণ এসেছেন মাষ্টার মশায়?

—অল্পক্ষণ, মিনিট দশেক হবে। আপনি ভুলে গেছেন, বাপমার দেওয়া নামটা হ'চ্ছে অমল। মাষ্টারিটা আমার বৃত্তি।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, অমলবাবু, চা খাবেন?

—প্রয়োজন নেই, তবে খেতে পারি। হ্যাঁ, আপনি সেই বইটা পেয়েছেন?

—কলেজের পত্রিকা—হ্যাঁ। আচ্ছা দেব'খন, আপনি ভুলে যান নি তা হ'লে? রমলার চোখে মুখে একটু আনন্দের অভিব্যক্তি ধরা-পড়ার-মত-ভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অমল হাসিয়া বলিল—আপনার স্মৃতিশক্তির অভাবের জন্যে কেবলমাত্র সমবেদনাই জানানো যায়।

—তার মানে?

—আপনি আমার নামটাই ভুলে গেলেন, আর আমি কতদূর মনে ক'রে আছি ভাবুন ত!

রমলা হো হো করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া বলিল—ভুলি নি, অভ্যাসবশতঃ মুখে আসে—

—আমিও ত মিস্ মিত্র না বলে খোকার দিদি বল্‌তে পারি।

—তা'তে ত অসম্মান হয় না কিছু, ইচ্ছে হ'লে ব'লবেন। আচ্ছা বসুন আমি আসি।

অমল বীজগণিতের সূত্র বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছিল কিন্তু মনের মধ্যে এ ও বি পরস্পর মিশিয়া যেন গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে। চাকরের মারফতে চা আসিতে না আসিতে রমলা আবার আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে তাহার ম্যাগাজিন।

অমল চা খাইতে খাইতে অত্যন্ত আগ্রহেই পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল। কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া সে হাসিতেছিল—কবিতার ত্রুটি বা অক্ষমতাই তাহার কারণ নয়। কবিতাটি তাহার সুপরিচিত এবং বি-এ পড়িবার সময় তাহার যে কবিতাটি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আজ বেমানান একটি নাম লইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। অমলের হাসি আত্ম-গোপন করিতে পারে নাই তাই রমলা বলিল—হাস্‌ছেন যে!

অমল আর একটু হাসিয়া বলিল—চমৎকার, চমৎকার হ'য়েছে!

—ঠাট্টা করবেন না।

—ঠাট্টা! বলেন কি, আপনার মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তাকে উপেক্ষা ক'রবেন না, বা অকারণ বিনয়ে ও আত্মনির্ভরতার অভাবে তার অনাদর ক'রবেন না। অবশ্য আমি কাপালিক, তবুও ব'লতে পারি যে কাপালিকের অন্তরকে এ কবিতা দোল দিয়েছে—

রমলা এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় খুশী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সে বলিল—কবিদের মধ্যে কিপলিংকে আমার বড্ড ভাল লাগে, তার যথেষ্ট প্রভাব আমার মাঝে রয়েছে; তাই এ সব কবিতা ঠিক সাধারণ পাঠকের জন্যে নয় তারা বোঝে না। আপনার মধ্যে অন্ততঃ পাঠক হিসাবে যথেষ্ট অসাধারণত্ব রয়েছে—আপনার মত সমালোচক আমার যথেষ্ট উপকার ক'রবে।

—হ্যাঁ সাধ্যমত উপকার ক'রতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত কিন্তু যে কিপলিং-এর প্রভাব আপনার মাঝে রয়েছে তার অভাব ঘটলে আপনি যে নিরুপায় হ'য়ে পড়বেন—মানে, প্রভাবটা কাটিয়ে উঠ্‌লে কবিতা যদি এমন সুন্দর আর না থাকে ?

—প্রথম প্রথম তরুণ লেখক লেখিকার মধ্যে কারও না কারও প্রভাব দেখা যাবেই, অতএব ও ব্যঙ্গ আপনি না ক'রলেও পারতেন।

অমল গম্ভীর হইয়া বলিল—আমাকে একেবারেই ভুল বুঝেছেন মিস্ মিত্র, ব্যঙ্গ নয় ওটা স্তুতি—বড় ভাবকে আয়ত্ত ক'রতে হ'লে জগতের ভাবরাজ্যের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক।

রমলা বলিল—ঠিক তাই।

—আপনার মারফতে সেই ভাবরাজ্যের অস্পষ্ট আলোক লাভ ক'রেছি বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

রমলা স্মিতহাস্যে বলিল—থাক্, আপনার বিনয় বৈষ্ণব-বিনয়ের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা উঠি, খোকা রাগ ক'রছে—কাল আলোচনা হবে, কেমন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাদকতাপূর্ণ একটা চাহনি হানিয়া বলিল—আপনার হাসি সর্ব্বদাই দ্ব্যর্থক—ভেবে পাই না, ওটা ব্যঙ্গ না কি ?

—বিধাতা আমাকে যথেষ্ট কার্পণ্য ক'রেছেন সেটা আজ বুঝেছি। (ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

ভারতসরকারের নূতন অর্থ-সচিব

ভারতসরকারের সাধারণ অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাইয়া স্বনামধন্য অর্থসচিব সার জেরেমী রেইসম্যান বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ঘটনা পরম্পরায় যুদ্ধের জালে জড়াইয়া পড়া ভারতের রাজকোষ সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যের নামে যদেচ্ছ ব্যবহার করিবার কীর্ত্তি ত সার জেরেমীর স্বদেশবাসীর দ্বারা পরম সমাদৃত হইবে, কিন্তু যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের তীব্র পেষণে মুমূর্ষু ভারতবর্ষ তাঁহার এই অবিমৃষ্যকারিতার মাশুল যোগাইতে আগামী সম্ভাবনাময় দিনগুলিতেও যে নিতান্ত বাধ্য হইবাই ব্যর্থ থাকিয়া যাইবে, এমন দুর্ভাবনা আজ এদেশের হিতৈষী অনেকের মনে জাগিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থসচিব নূতন নূতন করভার স্থাপন করিয়া ভারতের রাজস্ব তহবিল বাড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতেও সর্ব্বগ্রাসী সামরিক ব্যয়ের যে অংশ মিটান সম্ভব হয় নাই, তাহা মিটাইয়াছেন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া। কিন্তু এই ঋণের বোঝা হইতে একদা যে ভারতবর্ষকে মুক্তি দিতে হইবে, একথা অস্থায়ী অর্থসচিব তাঁহার কার্য্যকালের কর্ম্মব্যস্ততার আভিজাত্যে স্বীকার করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। সার জেরেমীর এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একচক্ষুতার জন্যই বলিতে গেলে ভারতসরকারের যুদ্ধকালীন বাজেটসমূহে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বা ভারতের শিল্পপ্রসার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন আগ্রহই দেখা যায় নাই। অথচ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যাঁহারা নিতান্ত অল্প সংবাদও রাখেন তাঁহারা জানেন যে, এদেশে সামান্য সরকারী সহযোগিতা হইলেই যথেষ্টসংখ্যক অত্যাবশ্যক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে এবং এখানকার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সুলভ শ্রমসম্ভার ভারতকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশরূপে গড়িয়া তুলিবারও সম্পূর্ণ উপযোগী। তাছাড়া যুদ্ধের অবশ্য প্রয়োজনে যে নগণ্য শিল্পপ্রগতি এদেশে সম্ভব হইয়াছে এবং জোগানদার ও ব্যবসাদারদিগের সাময়িক সাফল্যে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনের হাতে এখন কিছু টাকা আসিয়াছে, তাহাদের দৌলতে স্বাভাবিকভাবে ভারতসরকারের আয়করজনিত আয় পূর্ব্বের অনূর্দ্ধ ২০ কোটি টাকার স্থানে বর্ত্তমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ২ শত কোটি টাকায়; এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্পাদি প্রসারিত হইলে এবং সেই শিল্পজাত সামগ্রীসমূহের বাজার গড়িয়া উঠিবার জন্য অর্থের অন্তর্দেশীয় প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইলে ভারতসরকারের আয়কর বা অন্যান্য খাতে আর কেবলমাত্র এখনই বাড়িয়া যাইত না, রাজস্ব তহবিলে স্থায়ী আয়বৃদ্ধির একটা ব্যবস্থা হওয়াও সম্ভব ছিল।

যাহা হউক, অতীতকে টানিয়া আনিয়া তাহার আলোচনায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সার জেরেমী রেইসম্যানের কার্য্যকাল অন্তে সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস ভারতসরকারের অর্থসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এখন তিনি কিভাবে ভারতসরকারের অর্থনীতি পরিচালনা করিবেন তাহার উপরও ভারতের শুভাশুভ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। অবশ্য অনেকের বিশ্বাস যে, সামরিক অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ রক্ষণশীল সার আর্চিবল্ড সামরিক স্বার্থরক্ষায় সার জেরেমীর পদাঙ্কই অনুসরণ করিবেন এবং ভারতের বেসামরিক সমৃদ্ধি সাধনের যে সকল

সাহস ও ঔদার্য্যসাপেক্ষ পথ আছে, সেগুলি গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার দিক হইতে এই যুদ্ধের সময় উল্লেখযোগ্য কোন সাড়াই পাওয়া যাইবে না।

অবশ্য কার্য্যকলাপ না দেখিয়া এখন হইতে নূতন অর্থসচিবের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া লাভ নাই। যুদ্ধ এখন প্রকৃতপক্ষে শেষ হইতে চলিয়াছে, সার আর্চিবল্ডের সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধকালীন অর্থসচিব না হইয়া যুদ্ধোত্তর কালেও কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ যখন অর্থসচিব থাকিবার আশা আছে, তখন তিনি সেই যুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক জগতের অনিবার্য্য মন্দাভাব অতিক্রম করিবার উপযুক্ত কোন আয়োজন করিবেন, ইহা আশা করা মোটেই অন্যায় নহে। আমরা প্রকৃতই বিশ্বাস করি যে, দায়িত্ব সম্পন্ন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সার আর্চিবল্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং সেইরূপ অনুমানে করিয়াই আমরা কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

অর্থসচিবকে বর্ত্তমানে ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতে সংস্কারসাধন করিয়া ভারতের আর্থিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। বাহিরের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন অফিসে সঞ্চিত ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা দেড় হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটির কথা। সার জেরেমীর আমলেও এই ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্পর্কে এদেশে যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের দাবী বলিষ্ঠ না হওয়ায় সেই আন্দোলন কার্য্যতঃ ব্যর্থ হইয়াছে। এই পাওনা টাকার বিনিময়ে ভারতে শতকরা তিন টাকা সুদে ঋণপত্র বিক্রীত হইয়াছে, এদেশে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, সরকারী আর্থিক সঙ্গতি স্বর্ণাভাবে বিপন্ন হওয়ায় জনসাধারণের নিকট ভারতসরকারের মর্য্যাদাও কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাছাড়া এই পর্ব্বতপ্রমাণ পাওনা টাকার বিনিময়ে ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী হইত, তাহা হইলেও ভারতে শিল্পপ্রসার সম্ভব হইয়া নূতন যুগের সূচনা হইতে পারিত। সার আর্চিবল্ড যদি এদেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তি সত্যই দৃঢ় করিতে চান, তাহা হইলে ভারতের পাওনা এই টাকা আদায় করিবার চেষ্টা তাঁহাকে করিতেই হইবে। তবে আর্থিক হীনতার জন্য ব্রিটেন যদি একান্তই এখন দেনা শোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে এবং পাওনা টাকার অধিকতর সুদ সংগ্রহের ব্যাপারে অর্থসচিবের অধিকতর মনোযোগী হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী হইয়া শতকরা ১ টাকা হারে সুদ লাভ করিতেছে, অথচ এখনও ব্রিটেনে শতকরা ২ টাকা সুদের অনেক স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণপত্র বাজারে বিক্রীত হইতেছে। যে টাকার জন্য ভারতসরকারকে ভারতে সুদ দিতে হইতেছে গড়ে শতকরা ৩ টাকা হিসাবে, তাহার জামিন স্বরূপ গচ্ছিত অর্থের শতকরা ১ টাকা হারে সুদ আদায় মানে ভারতের বাৎসরিক বহু কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতসরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ শত কোটি টাকার সামান্য বেশী, এইভাবে ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক খরচ নির্বাহের উপলক্ষে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালের শেষে ২ হাজার ২ শত কোটি টাকায় পৌঁছাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এই ঋণ শোধ দেওয়াই শুধু বিবেচনার বিষয় নহে, ইহার জন্য বৎসরের পর বৎসর সুদের দরুণ ভারতের যে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও অর্থসচিবের অবশ্য বিবেচনা করা উচিত।

ইহার উপর ভারতে এখন অন্তর্দ্দেশীয় যে অর্থ-নৈতিক ক্ষতি হইতেছে তাহাও উপেক্ষার বস্তু নয়। বর্ত্তমানে সরকারী সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগেই বিপুল পরিমাণ খরচ হইতেছে, অথচ সেই খরচের সবটাই যে ন্যায্য হইতেছে এমন কথা সত্যই জোর করিয়া বলা যায় না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইউরোপীয় দলের দলপতি মিষ্টার টাইসনের বেসামরিক বিভাগের ব্যয়বাহুল্য কমাইবার যে ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সরকারী বেসামরিক বিভাগের অযথা ব্যয়বাহুল্য সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং তাঁহারা সত্যই চান যে, দরিদ্র ভারতের রাজকোষের এই অপব্যয় বন্ধ হউক। সামরিক বিভাগের অন্যায় খরচ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ সরকারীভাবে জানানো হয় নাই সত্য, কিন্তু ভারত-সীমান্ত হইতে যুদ্ধ সরিয়া গিয়া যখন প্রকৃতই ভারতকে বিপদমুক্ত করিয়াছে, তখন আকণ্ঠ ঋণভারে জর্জ্জরিত ভারতের স্কন্ধে এখনো বৎসরে ৪ শত কোটি টাকার বেশী সামরিক ব্যয় চালাইবার যৌক্তিকতা কি? ভারত যে আত্মনির্ভরশীল নহে একথাতো সকলেই জানে, এখন সিঙ্গাপুর, মালয় বা প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের কবল হইতে মুক্ত করিবার যে যুদ্ধ চলিবে তাহার ব্যয়ভারের একাংশ বহনের আর্থিক দায়িত্ব হইতে মিত্রশক্তি যাহাতে ভারতকে রেহাই দেন, সেবিষয়েও চেষ্টা করিতে আমরা সার আর্চিবল্ডকে অনুরোধ জানাইতেছি।

সব শেষে আমরা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের যুদ্ধকালীন সামরিক ব্যয়বাহুল্য মিটাইতে ভারতসরকারকে নিত্যনূতন ঋণপত্র বিক্রয় করিতে হইতেছে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত সুদ দানেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। এইভাবে চলতি ঋণপত্র সমুদয় এবং নূতন ঋণপত্রগুলির উপর দেয় সুদের পরিমাণ বহু কোটি টাকায় পৌঁছাইয়াছে এবং আমাদের মনে হয় সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ চেষ্টা করিলে এই সুদের দরুণ একটি মোটা টাকা বাঁচাইয়া দিতে পারেন। অবশ্য ১৯৩১ সালে ভারতসরকার যেখানে শতকরা ৬ টাকা ৪ আনা হারে সুদ দিতেন, সেখানে বর্ত্তমানে সাধারণতঃ ৩ টাকা হারে সুদ প্রদানের ব্যবস্থা অর্থসংগ্রহনীতিতে সাফল্যেরই পরিচায়ক, কিন্তু এই সাফল্য স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, যে যুগ বর্ত্তমানে চলিতেছে তাহা সস্তা টাকার (Cheap money) যুগ এবং আগে যেখানে শতকরা ৫ টাকা সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়াও সাধারণ দেশীয় ব্যাঙ্কে চলতি আমানত জুটিত না, এখন শতকরা মাত্র ৪ আনা সুদ দিয়াই যে কোন ব্যাঙ্ক অনায়াসে প্রভূত পরিমাণ আমানত জমা নিতেছে। মাঝারি শ্রেণীর দেশী ব্যাঙ্কে পর্য্যন্ত এখন এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের সুদের হার শতকরা ২ টাকা ৮ আনায় নামিয়া আসিয়াছে, এই বাজারে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে শতকরা ৩ টাকা

হারে ঋণপত্র বিক্রয় মোটেই কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে এবং এইজন্য যে আর্থিক ক্ষতি হইতেছে তাহাও ভারতবর্ষের স্বীকার করিবার কথা নহে। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের উপর দেশবাসীর যে বিশ্বাস আছে তাহাতো শতকরা বার্ষিক ৫।৬ আনা সুদে সাপ্তাহিক ৪ কোটি টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় দেখিলেও বুঝা যায়। শতকরা ৩ টাকা ৮ আনা সুদের যে কোম্পানীর কাগজ আছে, তাহার মূল্য প্রত্যর্পণের জন্য নূতন অল্প সুদের ঋণপত্র বাহির করিলেও গভর্ণমেণ্টের সুদের দরুণ অনেকগুলি টাকা প্রতি বৎসর বাঁচিয়া যাইবে। অবশ্য এই সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের উপর আমাদের দেশের বহু হাঁসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান চলিতেছে এবং এই কাগজ পরিশোধ করার সময় গভর্ণমেণ্টের অবশ্য উচিত এই সকল প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

যাহা হউক, মোটের উপর আমরা আশা এবং বিশ্বাস করি, নূতন অর্থসচিব তাঁহার নিজের সহিত ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিবের কার্য্যকালের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, যুদ্ধ যে কোন দিন শেষ হইয়া যাইবার পর তাঁহাকে যুদ্ধোত্তর কালের অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। সার জেরেমী আর যাহাই করিয়া থাকুন, যুদ্ধের বিপর্য্যয়ের মধ্যে তিনি একদিক হইতে দক্ষতার সহিত যুদ্ধকালীন সামরিক অর্থনীতি পরিচালনা করিয়াছেন এবং যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হইয়া উঠায় সম্মিলিত সামরিক প্রচেষ্টায় তাঁহার সাহায্য আশাতীত স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সার আর্চিবল্ড রোল্যাণ্ডস্ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেশব্যাপী অর্থাভাব ও বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হইবেন। এই অনিবার্য্য দুর্বিপাক হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাঁহার আশু কর্ত্তব্য —ভারতে নূতন নূতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচ্যুত এই সকল লোকের মোটামুটি কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেওয়া এবং এইভাবে উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইলে ইহারা এবং শিল্পপতিগণ দেশের বা গভর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সক্রিয় সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

ভারতের কাপড়ের কলে উৎপাদন সমস্যা

১৯৪৩ সালের বাংলা, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি প্রদেশের ভীষণ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতেই ১৯৪৫ সালে ভারতে মারাত্মক বস্ত্রাভাব দেখা দিয়াছে। ভারতের শিল্পবিপ্লবের অন্যতম সার্থক নিদর্শন হিসাবে আমরা বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়া থাকি এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ বস্ত্রের দিক হইতে প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের কাপড়ের কলগুলির সাফল্যই এই আত্মনির্ভরশীলতার কারণ এবং এদেশের ৪০১টি কাপড়ের কলে এখন যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও বহুলাংশে আমাদের বস্ত্রাভাব মিটাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধকালীন অন্যান্য বহু অসুবিধার মত কাপড়ের অভাবও আজ আমাদের সম্মুখে দারুণ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে এবং নানা কারণে ভারতের মিলজাত কাপড় (যাহার দাম উপরে লেখা থাকে এবং ক্রেতারা যাহা ন্যায্যমূল্যে পাইবার দাবী করিতে পারে) বর্ত্তমানে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, প্রকৃতপক্ষে অপ্রাপ্য পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতে এখন কাপড়ের এই যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সরকারী বণ্টননীতিই বলিতে গেলে বেশী দায়ী। একে তো সময়মত কয়লার জোগান না পাওয়ায় ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে অনেক সময় কাপড় তৈয়ারী বন্ধ রাখিতে হইয়াছে, তাহার উপর ভারতের কাপড় হইতে সামরিক বিভাগের জন্য বৎসরে ৯০ কোটি গজ এবং বাহিরে রপ্তানীর জন্য বৎসরে ৬০ কোটি গজ বস্ত্র বরাদ্দ করায় এদেশের আমদানী বন্ধ-জনিত বস্ত্রাভাব বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাছাড়া মোটামুটি মাথাপিছু বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সামরিক বিভাগের লোকেরা এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা বাজারে কাপড় কিনিতে পাইয়াছে বলিয়াও খোলা বাজারে সামান্য পরিমাণ কাপড় শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ক্রেতাদের সময় ও সুবিধার অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পায় নাই।

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিলজাত বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন এবং মিলের কাপড়ের উপর দরের ছাপ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু মিলজাত বস্ত্রের যথেষ্ট জোগানের ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এদিকে মিলের কাপড়ের অভাবের সুযোগে তাঁতের কাপড়ের ব্যবসাদারগণ রাতারাতি রাজা হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, কারণ তাঁতের কাপড়ের কোন নিয়ন্ত্রিত মূল্য নাই এবং চাহিদা ও জোগানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে যে কোন দামে তাহা বিক্রয় করিলেও বর্ত্তমানে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। অবস্থা যখন এইরূপ, তখন সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার সুতা জোগানের ব্যাপারে মিলগুলির উপর সমূহ অবিচার করিয়া তাঁতের জন্য অধিকতর সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে তাঁতের কাপড় তৈয়ারীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুতা পাওয়া গেলে এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্য সম্বলিত মিলের কাপড় বাজারে পাওয়া না গেলে তাঁতের কাপড় খোলা বাজারেই এমন অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকিবে যাহা স্পর্শ করা প্রকৃতই সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে টেক্সটাইল কমিশনার মিলগুলিকে একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া দেন যে, ১৯৪৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মিলে যতগুলি তাঁত কাজ করিয়াছিল, এখন তাহার চেয়ে বেশী তাঁত কাজ করিতে পারিবে না এবং উক্ত দিন পর্য্যন্ত এক বৎসরে মাসে গড়ে মিলগুলি যত ঘণ্টা কাজ করিয়াছিল এখন মাসে তদপেক্ষা বেশী সময় কাজ করিতে পারিবে না। এইভাবে সুতা ব্যবহার বা কাপড় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারত সরকার যে আদেশ দেন তাহার প্রতিবাদে সমগ্র দেশে তীব্র আন্দোলন দেখা যায় এবং সকলেই বলেন যে, মিলের কাপড় দরে সস্তা এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্য হওয়ায় মিলে বস্ত্র উৎপাদন বেশী হইলেই দরিদ্র জনসাধারণের অধিকতর সুবিধা হইবে। এই প্রতিবাদ লক্ষ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য ভারত সরকার মতের পরিবর্ত্তন করেন এবং গত ৩১শে মার্চ্চের গেজেট অফ ইণ্ডিয়ায় এই পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের

উপর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তবে এই পরিবর্ত্তিত সিদ্ধান্তও যে দেশবাসীর সম্পূর্ণ দাবী পূরণ করিয়াছে এমন কথা মনে করাও ভুল, কারণ, এই নূতন বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ব্বেকার নির্দ্দেশগুলিই কার্য্যতঃ বজায় আছে এবং যে নূতন বিধানটি সংযোজিত হইয়াছে তাহা এই যে, যে সকল মিলে সুতা তৈয়ারীর এবং কাপড় বুনিবার ব্যবস্থা আছে তাহারা ১৯৪৪ সালে যে পরিমাণ সুতা বাহির হইতে কিনিয়াছিল, এ বৎসর তাহার এক চতুর্থাংশ ভাগ মাত্র কিনিতে পারিবে এবং ১৯৪৪ সালে যে পরিমাণ সুতা বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল, এ বৎসর তাহার একচতুর্থাংশ বিক্রয় করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, এই নূতন নির্দ্দেশের দ্বিতীয়ার্দ্ধটুকু বড় বড় সুতা তৈয়ারী ব্যবস্থা সম্বলিত কাপড়ের কলের উৎপাদন বৃদ্ধির কতকটা পরিপূরক, কিন্তু প্রথমার্দ্ধে সুতা ক্রয়ের ব্যাপারে মিলগুলির উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের কিছু সুবিধা হইবার আশা থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত সুতার অভাবে মিলের কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পাইবে।

আসল কথা, ভারতবাসীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং এখন ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যাপারে তাহাদের কিছু কিছু সুবিধা না দিলে তাহারা শেষপর্য্যন্ত কোনক্রমে প্রাণধারণেও সমর্থ হইবে না, একথা ভারতসরকার সম্যকভাবে জানিয়াও ইচ্ছা করিয়া স্বীকার করেন না। বাস্তবিক মিলের কাপড় বেশী উৎপন্ন হইলে ভারতবাসীর সুবিধা কত এবং মিলের নিয়ন্ত্রিতমূল্যের কাপড় বাজারে না থাকিলে অনিয়ন্ত্রিত তাঁতের কাপড় বাজারে কিরূপ মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ যেন জানিয়াও না জানিবার ভান করেন। গত ১২ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতসরকারের বাণিজ্যসদস্য সার আজিজুল হককে প্রশ্ন করা হয় যে তাঁতের কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ হয় নাই, অথচ তাঁতের কাপড়ের জন্য সুতা জোগানোর সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, ইহার ফলে ভারতবাসীকে প্রয়োজনীয় বস্ত্রক্রয়ে কি নূতন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না? ইহার উত্তরে মাননীয় সদস্য পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে সরকার কাপড় যোগানোর ভার লইতেছেন, প্রয়োজনমত ন্যূনতম পরিমাণ কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের দায়িত্ব, সেই কাপড় মিলে বা তাঁতে কি ভাবে উৎপন্ন হইতেছে তাহাও দেখা তাঁহাদের কাজ নহে। সার আজিজুলের জনসাধারণের আর্থিক স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। মিলের জন্য সুতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া যখন ভারতসরকার মিলজাত বস্ত্রের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, তখন ভারতবাসী কি আশা করিতে পারে না যে তাঁতের কাপড় যাহাতে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতে পারে, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁতের কাপড়ের উপরও নির্দ্দিষ্ট মূল্য লিখিয়া দিবেন এবং বস্ত্র রেশনিং করিয়া যে কোন উপায়ে সকলের পক্ষে বরাদ্দ বস্ত্র সহজলভ্য করিয়া তুলিবেন। বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী সিদ্ধান্তে জনসাধারণের স্বাভাবিক কষ্ট যদি বাড়িয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে আহা-কী নিতান্ত দুঃখের কথা হইবে না?

৪-৫-৪৫

পোড়ো মন্দির

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, কাব্যভারতী

সেই যে প্রভাতে যাত্রা আমার জগতে ক'রেছি সুরু ;
অজানার ভয়ে শঙ্কিত-চিত কাঁপিয়াছে দুরু দুরু।
চলার পথেতে কত হাসি গান,
কুড়ায়েছি যত বেদনার দান,
স্মৃতির পিছনে তারা অবসান ;
বাণী যত অতিথির,
নদীর কিনারে প'ড়ে আছে দেখি ভাঙ্গা পোড়ো মন্দির।
জীবনের পথে এসেছিল যারা ফেলে আসি কতদূর !
সুমুখের পথে আমি শুধু চলি কানে বাজে নবসুর।
কত সন্ধ্যায় কত যে সকালে,
কত সাথী মোরে হাসালে কাঁদালে,
আমার মাঝেতে কত যে জ্বালালে,
দীপশিখা আরতির ;
পশ্চাতে রয় বেদনার ভারে ভাঙ্গা পোড়ো মন্দির।

উৎস যে মোর—যাত্রাপথের মিলাল আঁধার মাঝে,
ভবিষ্যতের আলো আর ছায়া আনে মায়া সবি কাজে ;
জীবনের পথে যত মোর স্মৃতি,
গাহে তারা সবে অতীতের গীতি,
বিগতের মাঝে রহে পরিচিতি ;
আলো ছায়া সন্ধির,
অতীতের বুক ভ'রে আছে শুধু ভাঙ্গা পোড়ো মন্দির।

যুদ্ধের শেষ—
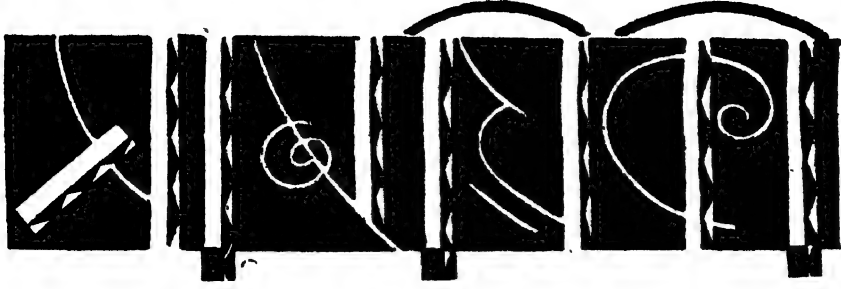
গত ৭ই মে সোমবার সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গিয়াছে যে জার্ম্মানীর সকল সৈন্য বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কাজেই গত প্রায় ৬ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছিল তাহার শেষ হওয়ায় দেশের সর্ব্বত্র উল্লাস দেখা দিয়াছে। ভারতেও বিজয়-উৎসবের আয়োজন হইয়াছে, তদুপলক্ষে ২।৩ দিন সকল সরকারী অফিস-আদালত বন্ধ করা হইয়াছে ও সরকারী বাড়ীসমূহ পতাকা ও আলো দ্বারা সাজান হইয়াছিল। গত প্রায় ৬ বৎসর কাল আমরা যে দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে বাস করিতেছি, তাহার অবসান হইবে, এই আশায় আমরাও আশান্বিত হইয়াছি। কিন্তু এই বিজয়-উৎসরের সহিত পরাধীন ভারতবাসীর আন্তরিক যোগ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? যুদ্ধান্তের পূর্ব্বে ভারতবাসীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করে নাই এবং আজও তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। লর্ড ওয়াভেল বিলাতে যাইলে লোকে এ বিষয়ে বহু আশা পোষণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। কাজেই যুদ্ধ বিরতি বিজয়ী জাতির মধ্যে যতই জয় ও উল্লাসের কারণ হউক না কেন আমাদের মত পরাধীন নিগৃহীত জাতির তাহাতে কোন আনন্দ নাই।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৫ তম বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি রক্ষা সমিতির সভাপতি সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আবেদন-মত গত ১লা মে হইতে ১৫ দিন দেশের সর্ব্বত্র রবীন্দ্র স্মৃতি-রক্ষা সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্পাদক সুরেশবাবুর চেষ্টায় ইতিমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে—এই এক পক্ষ কালের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন। ২৫শে বৈশাখ সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহাসভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকল সুধী ব্যক্তিই সমবেত হইয়াছিলেন। স্মৃতি সমিতি সংগৃহীত অর্থে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোস্থ পৈতৃক গৃহটি বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া তথায় একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে স্থির হইয়াছে। সুরেশ-বাবুর মত উৎসাহী কর্ম্মীর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব হইবে না বলিয়াই সকলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের দানের কথা আমরা প্রতি বৎসর এই দিনে স্মরণ করিলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা এই পবিত্র দিবসে রবীন্দ্র-নাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতায় কাপড় আটক—

গভর্ণমেণ্টের লোকে ৫।৬ দিনে কলিকাতার ১৫ শতেরও অধিক দোকানে ও গুদামে হানা দিয়া সকল কাপড় শীলমোহর দ্বারা আটক করিয়াছিল। গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে সে কাজ ৫।৬ দিন চলিয়াছিল। তাহার পর ২রা এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহারা মোট ১৪৩৬টি দোকান বা গুদামের শীল খুলিয়া দিয়া প্রায় কোটি টাকার কাপড় ব্যবসায়ীদের হাতে দিয়াছে। কিন্তু ঐ কাপড় কোথায় গেল, লোক তাহার সন্ধান পায় না! গত এক মাসেরও অধিককাল টাকা দিয়া বাজারে ক্রয় করিবার কাপড় নাই।

ফ্রিস্‌কোয় ভারতীয় সাংবাদিক—

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের পক্ষ হইতে ৩ জন ভারতীয় সাংবাদিককে সান্‌-ফ্রান্সিস্‌কো

সম্মিলনে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইলে প্রথমে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে ও নিম্নলিখিত ৩ জন সাংবাদিক গত ২০শে এপ্রিল করাচী হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম (১) শিবরমণ্ (দিনমণি পত্রিকা) (২) সারবল্ল (বোম্বাই ক্রনিকেল) ও (৩) অমৃতলাল শেঠ (জন্মভূমি)। এক সময়ে বাঙ্গালার সাংবাদিকরা সকল ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। আজ এই দলে একজনও বাঙ্গালী নাই। ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে। যাহা হউক, ইহারা ফিরিয়া আসিলে দেশ ফ্রিস্‌কো সম্মিলন সম্বন্ধে সত্য ঘটনা জানিতে পারিবে।

ভারতের প্রতিনিধি—

তিন জন ভারতীয় নেতা ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে ফ্রিস্‌কো সম্মিলনে যোগদান করিতে গিয়াছেন—(১) সার রামস্বামী মুদালিয়ার (২) সার ফিরোজ খাঁ নুন (৩) সার ভি-টি কৃষ্ণমাচারী। ইঁহারা যে ভারতের প্রতিনিধি নহেন ও ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার অধিকার যে তাঁহাদের নাই, সে কথা মহাত্মা গান্ধীও সকলকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মৌলনা আবুল কালাম আজাদকে যদি আজ ফ্রিস্‌কো সম্মিলনে প্রেরণ করা হইত, তাহা হইলে সকলে তাহাদের ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিত। যে ৩ জন গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বৃটীশ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী ও কৃপাপ্রাপ্ত—কাজেই তাঁহারা প্রভুদের মনোরঞ্জন করিয়া কথা বলিতে ত্রুটি করিবেন না।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন—

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ম সার জন উড্‌হেডকে সভাপতি করিয়া যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দিল্লীর দপ্তরে পেশ করা হইয়াছে। কমিশন সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ৩ পক্ষকেই তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে—(১) ভারত গভর্ণমেণ্ট—তাঁহারা খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর রাখেন নাই—এবং প্রথম দিকে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তাঁহাদের অবহিত হইতে বলিলেও তাঁহারা দায়িত্ব এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (২) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের দোষ ত্রুটির সীমা ছিল না—যতপ্রকার অন্যায় কার্য্য আছে, তাহার সকলগুলিই বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (৩) অতিলোভী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—তাহারা যখন অতিরিক্ত লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট তাহাতে কোনরূপ বাধা দেন নাই। কাজেই দেশের ব্যবসায়ীরা দেশবাসীকে খাইতে না দিয়া হত্যা কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে। কমিশনের মত, বাঙ্গালায় ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে ২০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। কমিশন এক খণ্ড রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিয়াছেন উহা প্রথম খণ্ড। তাঁহারা সকলে এখন কয়েক মাস কুন্নুরে বাস করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করিবেন। এই বিবরণ প্রকাশিত হইলে গভর্ণমেণ্ট যদি অপরাধীদের ক্রমে ক্রমে সন্ধান করিয়া তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তবেই কমিশন নিয়োগ করা সার্থক হইবে। নচেৎ এত অর্থ ব্যয় করিয়া বিবরণ সংগ্রহ, প্রস্তুত ও প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হইবে না।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী—

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াও চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ৯৩ ধারা জারী করিয়া গভর্ণর শাসনভার নিজের হস্তে গ্রহণ করায় মন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর তিনি চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দেন। তাঁহার স্থানে গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বিনা বাধায় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শৈলবাবু হাওড়া সালিখার সুপরিচিত স্বর্গত রামলাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও স্বর্গত আশুতোষের পুত্র। তিনি ১৯১৯ সালে বি-এ পাশ করিয়া ১৯২৬ সাল হইতে এটর্ণী হইয়াছেন। গত ৪০ বৎসর কাল তাঁহাদের বাড়ীর কোন না কোন ব্যক্তি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার আছেন। শৈলবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্ত্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান মিঃ মহম্মদ সরিফ খাঁ সর্ব্বপ্রথমে শৈলবাবুর নির্ব্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

জগত্তারিণী স্বর্ণপদক—

খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকট নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার উপন্যাস পাঠ করেন নাই বাঙ্গালা দেশে এমন কোন পাঠক নাই, তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় হিন্দু মহাসভা দলের নেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বতন্ত্র মুসলেম দলের নেতা মিঃ সামসুল হক যথাক্রমে মিঃ ডি-জে কোহেন ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষকে
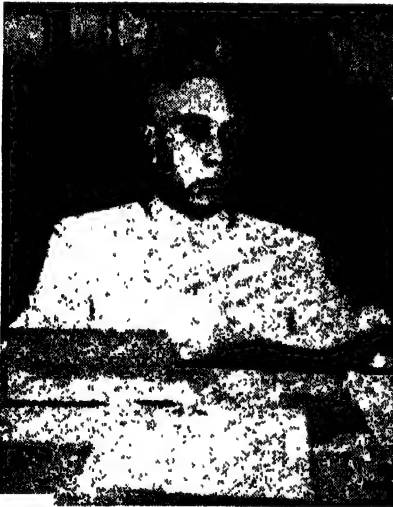
মেয়র শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পরাজিত করিয়া মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবুর বয়স ৫৮ বৎসর, তিনি আলিপুরের উকীল। ১৯৪০ সালে তিনি ১নং ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমানে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক। তিনি আলিপুর উকীল সভার পূর্ব্বে সম্পাদক ছিলেন, এখন সহকারী সভাপতি। কিছুদিন তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ২৪ পরগণা বসিরহাটের নিকটস্থ ধলতিথায় তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। ডেপুটী মেয়র মিঃ সামসুল হকের বয়স ৬৮ বৎসর—তিনি ১৪নং ওয়ার্ড হইতে গত ২১ বৎসর কাল কাউন্সিলার আছেন। মিঃ হক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমীদার। তাঁহার বাড়ী খুলনা জেলার বাগেরহাটের কান্দারপাড়া গ্রামে।

অধ্যাপক দাশগুপ্তের দান—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিজ্ঞানের 'পঞ্চম জর্জ্জ' অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সি-আই-ই মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী গবেষণাগারে দান করিয়াছেন। ১৯১৬ হইতে আজ পর্য্যন্ত অধ্যাপক দাসগুপ্ত ঐ লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উদ্যোগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত লাইব্রেরী পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হইবে।

শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি দাবী—

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া বিলাতে কমন্স সভার বিরোধী দলের নেতা মিঃ আর্থার গ্রীণউডের নিকট নিম্নলিখিত নেতাদের স্বাক্ষরিত এক তার প্রেরণ করা হইয়াছে—(১) এ-কে-ফজলুল হক (২) কিরণশঙ্কর রায় (৩) সন্তোষকুমার বসু (৪) সামসুদ্দীন আহমদ (৫) হেমচন্দ্র নস্কর। গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস হইতে শরৎবাবু জ্বরে ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন। উক্ত ৫ জন নেতা বাঙ্গালার সমগ্র অধিবাসীদের মনের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষক সমিতির রজত-জয়ন্তী—

গত ১লা বৈশাখ হইতে কলিকাতায় এবং বঙ্গের অন্যান্য নানা স্থানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসব সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সমিতি স্থাপিত হয়—স্বর্গীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ইহার প্রথম সভাপতি। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষকগণের অবস্থা উত্তরোত্তর হীন হইয়া আসিতেছিল, সমিতি স্থাপনাবধি শিক্ষকগণের অবস্থা, চাকুরির স্থায়িত্ব, বেতন প্রভৃতি বিষয়ে কতকাংশে উন্নত হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। কলিকাতায়

সপ্তাহকালব্যাপী উৎসবের সভাগুলিতে বিচাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক মিঃ হুমায়ুন কবির, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং অন্যান্য বহু জননেতা ও শিক্ষাব্রতী শিক্ষার আদর্শকে নানা দিক দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূল কয়েকটী বিষয়ে সকলের অভিভাষণেই একটা সুন্দর মিল দেখা গেল। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হয় বিদেশীয় শাসকবর্গ দ্বারা আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই পদ্ধতি জাতি-গঠনের পরিপোষক
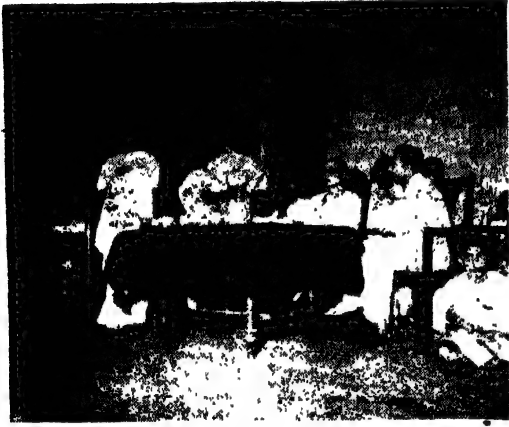
শিক্ষক সম্মিলন

হইতে পারে না। অথচ গত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া এই পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করিয়া সকলেই পরীক্ষায় পাশ করা ও চাকুরি খোঁজা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না।

প্রশ্ন এই যে স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা কি অপেক্ষা করিয়াই থাকিব? ইহার উত্তরের ইঙ্গিত পাই, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের বক্তৃতায়। তিনি বলিয়াছেন—শক্তিমান (Dynamic) শিক্ষক শিক্ষার সমস্ত অপূর্ণতাকে শিক্ষাদানের গুণে পূর্ণ করিতে পারেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহনও বলিয়াছেন—পূর্ব্বে ছাত্রেরা শিক্ষা পাইত সাক্ষাৎ গুরুর নিকট হইতে, আর বর্ত্তমানে ছাত্রেরা শিক্ষা পায় পুস্তক হইতে—শিক্ষক সেই পুস্তকের পশ্চাতে থাকিয়া কত সহজে উহা আয়ত্ত করিয়া পাশ করা যায় তাহাই বলিয়া দেন মাত্র।

শিক্ষকের দায়িত্ব তাহা হইলে কত বেশি! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিক্ষককে আমরা কৃপার পাত্র করিয়া রাখিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে দেখে না—ইহা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বহির্ভূত। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কাছে শিক্ষক অপেক্ষা পুলিশ বড়—সুতরাং শিক্ষকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। সমাজ ভাবে, আমরাই দরিদ্র—সুতরাং শিক্ষার জন্য যাহা দিতেছি ইহার অতিরিক্ত আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। হতভাগ্য শিক্ষক দেশপ্রেম বা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃই হউক বা অন্য কোনও কারণেই হউক, এতদিন কোনও রূপে শিক্ষার বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

আজ মহাযুদ্ধের ফলে দেশে যে নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছেন দেশের শিক্ষক। ইহার ফলে বহু প্রবীণ অভিজ্ঞ শিক্ষক আজ অন্নসমস্যা সমাধানে অক্ষম হইয়া শিক্ষকতা বৃত্তি পরিহার করিয়া চাকুরি-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপযুক্ত নূতন শিক্ষক সংগ্রহ করাও আজ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা পূরণ করিবে কে?

শিক্ষকগণের দুর্দ্দশা—

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের দুর্দ্দশার শেষ নাই। গভর্ণমেণ্ট সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদের জন্য যে সময়ে মাসিক ১৮ টাকা 'মাগ্‌গী-ভাতার ব্যবস্থা করিলেন, সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের দরিদ্র শিক্ষকগণের জন্য মাত্র মাসিক ৫ টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাও শিক্ষকগণ মাত্র ১ বৎসর কাল পাইয়াছেন। সকলেই আশা করিয়াছিল, এ বৎসর ঐ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। উপযুক্ত শিক্ষক দেশে দুর্লভ হইয়াছে—পূর্ব্বে যে বেতনে শিক্ষক পাওয়া যাইত, এখন আর সে বেতনে শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নহে। অথচ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহের আয় এমন বাড়ে নাই যাহা দ্বারা তাহারা অধিক বেতনের শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারে। সে জন্য শিক্ষকের অভাবে বহু বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাইতেছে ও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে কোন কর্ত্তব্য আছে, তাহা বোধহয় কেহ চিন্তা করেন না। মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইয়া যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের সমান করিয়া দেওয়া

হয়, তাহা হইলেও কতকটা উপকার হইতে পারে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির গত রজত জুবিলী উৎসবে অনেকেই বার বার এই সকল কথা বলিয়াছেন। এখন দেশ শাসনের ভার স্বয়ং গভর্ণর গ্রহণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গীয় অধ্যাপক সম্মিলন—

গত ১৪ই এপ্রিল কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য ঐ সম্মিলনে সভাপতি হইয়া বলিয়াছেন—"আমাদের স্কুল ও কলেজসমূহে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহার সাহিত্যিক দিকটা প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক দেখা হয়। উহা অবাস্তব ও পুঁথিগত—সে জন্য ছাত্রদের সহিত প্রকৃত জগতের কোন পরিচয় হয় না। সে জন্য শিক্ষা লাভের পর ছাত্ররা তাহা দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। সে জন্য গতানুগতিক শিক্ষার জন্য সাধারণের কোন আগ্রহ নাই। এই শিক্ষা প্রথা পরিবর্ত্তন করা না হইলে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই।" এই কথা সর্ব্বদা সকল বক্তৃতা মঞ্চ হইতে বলা হইতেছে, কিন্তু কে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবে?

আড়িয়াদহ পাঠাগারে ষষ্টিউৎসব—

১৬ই চৈত্র শুক্রবার ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে ২৪ পরগণা আড়িয়াদহ পব্‌লিক লিটারারি এসোসিয়েসনে ৭৫তম বার্ষিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি হন। সভায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গুপ্ত "নাটক" সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী "সাহিত্যের উপাদান" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায় লাইব্রেরীর ইতিহাস ও কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। আবৃত্তি, সঙ্গীতাদির পর রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনীত হয়। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

প্রচারে বিপত্তি—

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হওয়ারপর হইতে লেখক, পুস্তক ব্যবসায়ী ও ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন অসুবিধা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি বিভিন্ন ব্যবসায়িগণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র প্রকাশেরও অসুবিধা হইয়াছে। ফলে ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের নানারূপ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন টিনের প্লেট কাটিয়া কালি দিয়া দেওয়ালে আঁকিয়া দেওয়া সুরু করিয়াছেন। প্রচারপত্র হিসাবে যখন কেবলমাত্র কাগজের পোষ্টার আঁটা হইত তখন ঐ সকল বিজ্ঞাপনে গৃহের শ্রী নষ্ট করিত বটে, কিন্তু রৌদ্রে ও বর্ষায় তাহা কিছুদিন বাদে আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে টিনের প্লেট কাটিয়া যে বিজ্ঞাপন দেওয়া সুরু হইয়াছে তাহা স্থায়ীভাবে গৃহের শ্রী ত নষ্ট করিতেছেই অধিকন্তু নানারূপ ঔষধের বিজ্ঞাপন কদর্য্য ভাষায় দেওয়ালের উপর স্থায়ীভাবে লিখিয়া দেওয়ার ফলে স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ পথে হাঁটা লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল ব্যবসায়ী কদর্য্য ভাষায় এইরূপ প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকেন তাঁহাদের লজ্জা ও সম্মানের ভয় আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; কিন্তু সরকার অথবা কর্পোরেশন কি এ বিষয় কিছু করিতে পারেন না?

আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন—

বিগত ১৩৫১ সালের ৩০শে চৈত্র হইতে ১৩৫২ সালের ২রা বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন দিবস ধরিয়া নিখিল আসাম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইলেও আসাম প্রদেশ, অন্ততঃ আসামের অনেকাংশ, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়া যে বঙ্গদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত তাহা নিঃসন্দেহ। সংখ্যানুপাতের দিক দিয়া আসামপ্রদেশে যে বাঙ্গালীরই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া আসাম প্রদেশে যে এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিল ইহা পরম আনন্দের বিষয়। আমরা বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতের বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হইতে সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ৩০শে চৈত্র অপরাহ্ণে। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশ সম্মেলনের উদ্বোধন করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সোম তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর মূল সভাপতি মিঃ ওয়াজেদ আলি সাহেব তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে সন্ধ্যায়

সেদিনকার কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। ১লা বৈশাখ সাহিত্য ও ইতিহাস শাখার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডাঃ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে ঐ দুই শাখার সভাপতিত্ব করেন।

২রা বৈশাখ পূর্ব্বাহ্নে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে লোকসাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। তাহার পর শিশুসাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-শাখার অধিবেশন হয়।

আসামবাসী বাঙ্গালীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে উক্ত অধিবেশনে যে কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক আগ্রহের দ্বারা এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয় প্রথম অধিবেশনের সম্পাদক ছিলেন। সম্মেলনের স্থায়ী সম্পাদকের পদেও তিনিই নির্বাচিত হইয়াছেন।

কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—

খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ বার-এট-ল মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা ছোট আদালতের
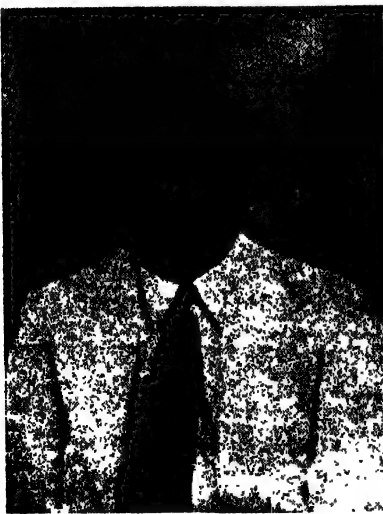
কবি শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিলেন। গত কয়েক মাস তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগে এক উচ্চপদে কাজ করিয়াছিলেন। দেশ সেবার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুইবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সাহিত্য-বাসরের সম্পাদক এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা অবহিত।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতার খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়সমাত্র ৪৫ বৎসর এবং তিনি অবিবাহিত। তিনি সুদীর্ঘকাল 'ক্যালকাটা উইক্লি নোট্স' নামক আইন-বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার

বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

আইন-জ্ঞান ও তাহা লিখিয়া প্রকাশের শক্তির জন্য তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। তিনি বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় সাংবাদিক জগৎ প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ফণিভূষণবাবুর কর্ম্মশক্তিও যথেষ্ট এবং আমাদের বিশ্বাস, বিচারপতির কার্য্য করার সহিত তিনি দেশের সেবা করিয়া দেশবাসী সকলকে নানাভাবে উপকৃত করিবেন।

বাবাজী ব্রজমোহন দাস—

গত ৯ই এপ্রিল শ্রীধাম নবদ্বীপে খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ভক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্ম্মের প্রসারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ধনীর পুত্রের পক্ষে সর্ব্বস্ব ত্যাগ

করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মাহাত্ম্য প্রচারে এইভাবে জীবন পণ করিতে অতি অল্প লোককেই দেখা যায়। তিনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যলাভ করেন। সম্প্রতি বাগবাজারের শতংজীব বৈষ্ণবাচার্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যা ভূষণের সভাপতিত্বে এক সভায় তাহার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে।

বাবাজী ব্রজমোহন দাস

রসিক জয়ন্তী—

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বয়স ১০৬ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বাঙ্গালা দেশের সুধীবৃন্দের পক্ষ হইতে সম্প্রতি তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উৎসবে কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া রসিক মোহনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের গৃহেই উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার জীবন কথা ও তাঁহার কার্য্যাদি সম্বন্ধে বহু সুধী ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধ সম্বলিত এক পুস্তক ঐ দিন তাঁহাকে উপহার প্রদান করা হইয়াছে। এই বয়সেও তাঁহার স্মরণশক্তি, চক্ষু ও কর্ণের স্বাভাবিকতা, বাক্‌শক্তি প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

যতীন্দ্রনাথ বসু—

বালীগঞ্জ হাজরা রোড-নিবাসী খ্যাতনামা সামাজিক ও রসিক সুধী যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ১৭ই এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি যশোহর নড়াইলবাসী উকীল যোগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র। বাল্যে শিক্ষালাভের পর তিনি সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান উমারাণীকে বিবাহ করেন। তিনি কিছুদিন ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্যের শাসন পরিষদে কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাহা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেন। জীবনের শেষ ১৫ বৎসর তিনি হিন্দুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীর প্রচার বিভাগে উপদেষ্টার কাজ করিতেন। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, সাহিত্য প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নাটোরের মহারাজা ৺জগদিন্দ্রনাথ, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ৺ক্ষৌণীশচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার সহজ, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মত সামাজিক লোক এযুগে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

যতীন্দ্রনাথ বসু

যুদ্ধে হতাহত ভারতীয়—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৮৬ জন ভারতীয় হতাহত হইয়াছে। মোট নিহত—১৯৪২০, নিখোঁজ—১৩৩২৭, আহত—৫১০৩৮, যুদ্ধে বন্দী ৭৯৭০১ (ইহার মধ্যে ২১১৮১ জন নিখোঁজকে যুদ্ধে বন্দী আছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে)।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
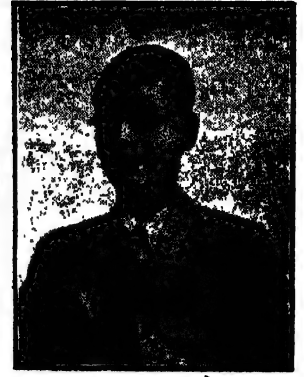
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাইটন কাপ ফাইনাল ঃ

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ৬১তম ফাইনাল খেলায় বি এন রেলদল (এ) ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার কাপ বিজয়ী হ'ল।

প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বি এন রেলদল ১-০ গোলে ই আই রেলদলকে (জামালপুর) হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে জামালপুর দলই ভাল খেলেছিল, তারা মন্দ ভাগ্যের জন্তেই হেরেছে। অপরদিকে মহমেডান সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে রেলদলের সঙ্গে মিলিত হয়।

ফাইনাল খেলার সূচনাতেই মহমেডান দল আক্রমণ ক'রে খেলতে থাকে ফলে তাদের কোয়াম খেলার প্রথম দিকে একটি গোল করে। এই গোলের দুমিনিট পর রেলদল গোল পরিশোধ করার সুযোগ পায়, অল্পের জন্তই সে গোল বেঁচে যায়। কিন্তু তাদের আক্রমণের ধারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীঘ্রই গোলটি শোধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভের আট মিনিট পর রেলদলের সি টাপসেল সর্ট কর্ণার থেকে গোল করে ২-১ গোলে দলকে অগ্রগামী করে। রেলদলের লিনোন খেলার ২১ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন।

বি এন রেলদল (এ) : ডেভিড, ট্যাপসেল ও ওয়েন-রাইট, ওয়াটসন, পিনটো ও গ্যালিবার্ডি, হিল, রোচী, গ্ল্যাকেন, বুনিয়ান ও লিনোন।

মহমেডান স্পোর্টিং : করিম ; নাসিম ও মহম্মদ দীন, ইয়াসীন, মোইন ও ওসমান ; মুনীর, সাইক, জাফর, জাকী ও কুয়াম।

এ বছরের বিভিন্ন হকি খেলায় নিম্নলিখিত ট্রফিগুলি বিতরণ করা হয়।

বি এন রেলদলকে বাইটন কাপ বি এই এ চ্যালেঞ্জ কাপ এবং রাসমণি গোল্ড কাপ দেওয়া হয়।

মহমেডান দলকে হেডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জ শীল্ড দেওয়া হয়।

হকি প্রথম বিভাগের লীগ : লীগের প্রথম স্থান অধিকারী মহমেডান ক্লাব লোম্যান মেমোরিয়াল কাপ পেয়েছে। লীগে রানার্স কাপ : মোহনবাগান ক্লাবকে কার্ণোবিস কাপ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগ : লীগ চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা পাশা ক্লাবকে ললিত চ্যালেঞ্জ কাপ দেওয়া হয়।

তৃতীয় বিভাগের লীগ : লীগ চ্যাম্পিয়ান ওয়াই এম সি একে (ওয়েলিংটন ব্রাঞ্চ) বি এইচ স্মিথ চ্যালেঞ্জ কাপ দেওয়া হয়।

কাইভন কাপ দেওয়া হয়েছে গ্রেস ক্লাবকে। স্যার আশুতোষ চৌধুরী কাপ পেয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজ।

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড পেয়েছে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স। রানার্স-আপ কাপ দেওয়া হয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে। **বাইটন কাপের পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল ঃ**

১৮৯৫-৯৬—নেভাল ভি এ সি, ১৮৯৭-৯৮—এস পি ভি মিসন, রাঁচী, ১৮৯৯—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব, ১৯০০—সেণ্ট জেমস স্কুল, ১৯০১-২—রয়েল আইরীস রাই-ফেলস, ১৯০৩—এস পি ভি মিসন, রাঁচী, ১৯০৪—হর্ণেস এসি, ১৯০৫—বি ই কলেজ শিবপুর, ১৯০৬-৭—এস পি জি মিশন, রাঁচী, ১৯০৮-৯-১০—কাষ্টমস এ সি, ১৯১১—ক্যালকাটা রেঞ্জাস, ক্লাব, ১৯১২—কাষ্টমস, ১৯১৩—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স, ১৯১৪—এম এণ্ড কলেজ, আলীগড়

১৯১৫—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স, ১৯১৬—বি ওয়াই এসোঃ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৭—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স, ১৯১৮—বি ওয়াই এসোঃ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৯—সেন্ট জেভিয়ার্স, ১৯২০—আসানসোল রিক্রিয়েশন ক্লাব, ১৯২১—বি ই কলেজ শিবপুর, ১৯২২—ই বি আর স্পোর্টস ক্লাব, ১৯২৩—লক্ষ্ণৌ ওয়াই এস এ, ১৯২৪—ক্যালকাটা এফ সি, ১৯২৫-২৬—কাষ্টমস, ১৯২৭—জেভিরিয়ান ক্লাব, ১৯২৮—টেলিগ্রাফ রিঃ ক্লাব, ১৯২৯—ই আই রেল স্পোর্টস ক্লাব, ১৯৩০-৩১-৩২—কাষ্টমস, ১৯৩৩—ঝান্সী হিরোজ, ১৯৩৪—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব, ১৯৩৫—কাষ্টমস, ১৯৩৬—বোম্বাই কাষ্টমস, ১৯৩৭—বি এন আর, ১৯৩৮—কাষ্টমস এস সি, ১৯৩৯—বি এন আর, ১৯৪০—ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স, ১৯৪১—ভগবত ক্লাব ও ভূপাল ওয়াণ্ডার্স, ১৯৪২—রেঞ্জার্স, ১৯৪৩-৪৪—বি এন আর।

ফুটবল খেলা ঃ

গত ১লা মে থেকে ক'লকাতার মাঠে সরকারীভাবে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা দিয়েই কলকাতা ফুটবল মরসুমের সূচনা। গত কয়েক বছর লীগের সকল বিভাগেই উঠা নামা বন্ধ, সকলেই ভেবেছিলেন লীগ খেলার জৌলুষ উপে যাবে, খেলার মাঠে জনসমাগম আগের মত আর হবে না। লীগে উঠা নামা বন্ধ হওয়াতে লোকের উৎসাহের কোন অভাব দেখছি না বরং বেড়ে গেছে। 'লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ' নিয়েও রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে; অবশ্যি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আগের তুলনায় অনেকখানি পড়ে গেছে। বিলাতের পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলা আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের প্রভাম্বিত করিতে পারে যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁরা লীগ খেলার সূচনা থেকে হতাশ হয়েছেন। লীগ খেলার আরম্ভের পূর্ব্বে যে অনুশীলন খেলার প্রয়োজন তার কথা খুব কম খেলোয়াড়ই ভেবেছেন। সবে মাত্র লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে এখনও হ'তে যথেষ্ট সময় আছে, খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে হ'লে নিয়মিত অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করি।

ভারতীয় হকি খেলা ঃ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় এবং হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদ সম্প্রতি হকি খেলার খ্যাতনামা সমালোচক মিঃ গিরী এ গ্রীনের নিকট এক বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে এক বিবৃতি দান করেছেন। ধ্যানচাঁদ পৃথিবীর তিনটি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রেছিলেন সুতরাং বিদেশের হকি খেলা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্য যথেষ্ট। তাছাড়া গত পঁচিশ বছর কাল ভারতবর্ষের হকি খেলার সঙ্গেও পরিচিত আছেন। সম্প্রতি সার্ভিসেস স্পোর্টস সার্কাস ভ্রাম্যমাণ দলে থেকে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হকি দলের সঙ্গে খেলেছেন। 'ন্যাশানালিষ্ট' দৈনিক পত্রিকায় তাঁর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, ভারতীয় হকি দলের ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা ষ্টিক দিয়ে বল সুট করা একেবারে ভুলে গেছে। ধ্যানচাঁদের থেকে ভারতীয় হকি খেলা সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ খেলোয়াড় এবং সমালোচক কেউ নেই সুতরাং তাঁর এ বিবৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ক'লকাতার হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড একেবারে পড়ে গেছে সে সম্বন্ধে তিনি দ্বিমত নন। তবু তিনি পোর্ট কমিশনারের খেলোয়াড় জনসেনের খেলার উপর আস্থা রাখেন। তাঁর মতে, মিঃ জনসেন যদি নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে সত্যই একজন উঁচুদরের খেলোয়াড় হতে পারবেন। তিনি আশা করেন, বিগত অলিম্পিক খেলার পর ভারতীয় হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বর্ত্তমানে যে অবস্থায় নেমে এসেছে তার থেকে যদি আর বেশী খারাপ না হয় তাহলে আরও দু'বার ভারতীয় দল অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকি খেলায় জয়ী হতে পারবে।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নিকৃষ্টতার কারণ সম্বন্ধে ধ্যানচাঁদ নিম্নলিখিত অভিমত দিয়েছেন (১) তাঁর মতে যদিও প্রাদেশিক হকি এসোসিয়েসনগুলি হকি খেলার পরিচালনার দিক থেকে সাফল্য লাভ করেছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া হকি খেলার উন্নতির দিক থেকে সত্যিকারের কাজ দেখাতে পারে নি। খেলোয়াড়দের দিকটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। এছাড়া দর্শকবৃন্দের উৎসাহের অভাবেও খেলার প্রসার লাভ হয়নি।

(২) বর্ত্তমানে নিখুঁত 'stick work'এর একান্ত অভাব খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা গেছে; বর্ত্তমানের Gallary showকে stick work বললে মস্ত ভুল করা

হবে। এই fancy খেলার গতি বেশীক্ষণ থাকে না এবং অপর খেলোয়াড়ের কাছে পরাজিত হলেই ষ্টিক চালিয়ে খেলোয়াড়রা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে। এই ভাবের ষ্টিক চালিয়ে খেলাকে ধ্যানচাঁদ 'লকড়ি মার' বলেছেন।

(৩) হকি খেলার রক্ষণভাগের খেলা বরং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা স্যুট করতে একেবারে ভুলে গেছে। গোল এরিয়া অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বল স্যুট করার অভ্যাস এবং দক্ষতা যদি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের না থাকে তা হলে বিশেষ কিছু সাফল্যলাভ করা সম্ভব হবে না। তিনি বিদেশী হকি দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে গোল দেবার চেষ্টা রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পদ্ধতির কাছে কোন কাজের হবে না। এই প্রসঙ্গে ধ্যানচাঁদ বলেছেন যে, এক সময়ে তিনিও খুব selfish খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু সে সময় ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের stick work খুবই উন্নত ছিল এবং রক্ষণদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বল ড্রিবল করে নিজের পথ তৈরী করে নিতে পারত সুতরাং অল্প বিস্তর এই ধরণের selfish খেলাতে খেলার ক্ষতি হ'ত না। বর্ত্তমান সময়ে selfish খেলোয়াড় অতি সহজেই বিপক্ষের rough and tough খেলোয়াড়ের কাছে ধরাশায়ী হয়।

(৪) ধ্যানচাঁদ বলেছেন, বর্ত্তমানের খেলার সম্মিলিত খেলার (team-work) একান্ত অভাব লক্ষিত হয়, খেলায় ব্যক্তিগত চাতুর্য্যই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড়রা বুঝতে পারে না খেলার ধারা কোনদিকে ঘুরবে; তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এত বেশী যে, তারা খেলার একটা সম্মিলিত ধারা অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু তাঁদের সময়ে ফরওয়ার্ডের প্রত্যেক খেলোয়াড়ই বুঝতে পারতো বলটি কোন দিকে যাবে; সেই অনুযায়ী খেলোয়াড়রাও প্রস্তুত থাকতো, অযথা বল নষ্ট হ'ত না। খেলোয়াড়দের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং শারীরিক অক্ষমতার জন্যও হকি খেলা অনেকখানি নীচে নেমেছে এইরূপ অভিমতও তিনি প্রকাশ করেছেন। শরীর চর্চ্চা এবং অনুশীলনা খেলার অভাবেও খেলা নিম্নস্তরের হবার কারণ বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ব্যোমকেশের কাহিনী"—২৲
শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সায়াহ্নিকা"—১৲
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পদধ্বনি"—৩।০
বাণীকুমার প্রণীত নাটক "সন্তান"—৩৲
রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়"—১০৲
শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত উপন্যাস "বেণুমতীর তীরে"—২৲
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "বাস্তবতার ইতিহাস"—৩৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "গল্প ভারতী" ১ম গ্রন্থ—১॥০
শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ"—১৷৵০
শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত উপন্যাস "নিঃসহ যৌবন"—৩৲
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-হরি লীলামৃত"—১।০
গিরীন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ইতিহাসের গল্প" (১ম ভাগ)—১।০
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত "কণ্টামারা"—২৲

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের ত্রয়ত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত